# ৭ম বর্ষ—২য় খণ্ড

## ভাদ্র—মাঘ, ১৩২২

## ষাণ্মাসিক সূচী

[ লেখকগণের নামানুক্রমে ]

## চিত্র সূচী

"বিষমস্মৈ প্রদাতব্যং ত্বয়া মদন ! সুন্দরে
পার্ব্বতীরমিতি জ্ঞাত্বা কন্যার্থং স্যাৎ তে বরম্ ।"

* * * *

"বিষয়াস্মৈ প্রদাতব্যা ত্বয়া মদনসুন্দরে
পার্ব্বতীরমিতি জ্ঞাত্বা কন্যার্থং স্যাৎ তে বরম্ ।"

—চন্দ্রহাস ও বিষয়া

৭ম বর্ষ ২য় খণ্ড | ভাদ্র ১৩২২ সাল | ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা

# কাব্য-কথা।

## কাব্যের উদ্দেশ্য।

তর্ক করিবার একটা নেশা আছে। অনেকেই তাহাতে একটু ঝাঁঝাল আমোদ অনুভব করেন। তাই প্রায়ই দেখা যায়, সভা সমিতিতে, সংবাদ বা সাময়িক-পত্রে কোনও না কোনও বিষয় লইয়া একটা অনাবশ্যক আন্দোলন চলিতেছে। স্বীকার করি, জীবনে তর্ক বা আলোচনার বিষয় অনেক আছে। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাদের মীমাংসা এখনও হয় নাই। চিরসমস্যার ন্যায় তাহারা আবহমানকাল মীমাংসার নাগাল অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে, এবং যতদিন না মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহাদের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিতেছে, ততদিন সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যেমন বেদান্ত এবং সাঙ্খ্যের মতদ্বন্দ্ব। কিন্তু মীমাংসার আশা না থাকিলেও মানুষ তাহার নিজের প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সেই অন্ধকার ঘরে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মীমাংসার তল্লাস করিবেই। সুতরাং তদ্বিষয়ক তর্ক বা আলোচনা কখন থামিবে না—নিয়তই চলিবে।

আবার এমনও অনেক বিষয় আছে, যাহা এত সূক্ষ্ম এবং জটিল তথ্যে পরিপূর্ণ, যে মীমাংসিত হইলেও, তাহাদিগকে বুদ্ধির আয়ত্ত করা এতই দুষ্কর যে, মাঝে মাঝে তাহাদের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন আমাদের ষড়্‌দর্শনের অনেক কথাই। সুতরাং তর্ক বা আলোচনার বিষয় অনেক আছে; এবং তাহাতে ব্যাপৃত থাকা মানুষের একটি প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ সকল ছাড়া, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাদের চরম মীমাংসা বহুকাল হইতে নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে। তাহাদের পুনরালোচনায় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়েরা হয় পাণ্ডিত্য ফলাইবার ইচ্ছায়, নয় বুদ্ধির সঙ্কোচে বা প্রকৃতিগত খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সকল মীমাংসিত প্রশ্নের ধ্রুব সত্যকে আরও পরিষ্কার এবং সুগম করিবার ভাণে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যধূলিমধ্যে প্রোথিত করেন; এবং তাহাদের লইয়া বুদ্ধির ডিগ্‌বাজী খেলিতে থাকেন।

সাহিত্যের এমন একটি প্রশ্ন লইয়া সাময়িক পত্রে কিছুদিন হইল আলোচনা চলিতেছে। "সবুজ পত্রে" "বাস্তব", "সাহিত্যের বাস্তবতা" প্রভৃতি প্রবন্ধে "সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি" এই পুরাতন এবং সুমীমাংসিত প্রশ্ন পুনরালোচিত হইয়াছে। "বাস্তব" কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। রস-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবির মুখে এই কাব্য-কথা প্রকৃত এবং শিক্ষণীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রবাবু পাণ্ডিত্য না ফলাইয়া সরল সহজ ভাষায় এবং পদ্ধতিতে আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া—পাণ্ডিত্যের দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ না লইয়া—দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, রস-সাহিত্যের বস্তু—রস! "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"—তা আমাদের সাহিত্যের নবরসই লও, আর ইউরোপীয় সাহিত্যের emotionই লও। যে সাহিত্যে রস আছে, তাহা বস্তুহীন নহে—তাহা বাস্তব এবং তাহাই—কেবলমাত্র তাহাই কাব্য। তাহার পর কথা উঠিল কাব্যের দর লইয়া। ইহার উত্তর খুব সোজা এবং সংক্ষিপ্ত। রসই যদি কাব্যের বস্তু হইল, তবে কাব্যের যাচাই করিতে হইলে রসের যাচাই করিতে হয়; দেখিতে হয় সে রস খাঁটি কি না—তাহার মাত্রা এবং পরিমাণ নৈসর্গিক সীমা অতিক্রম করিয়াছে কিম্বা তাহার নিম্নে আছে; এক কথায়, যে রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে কি না। এইখানে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণ তাঁহাদের অতিবুদ্ধি প্রভাবে একটি নিতান্ত অভিনব এবং অনন্যদৃষ্ট তথ্যের উদ্ভাবন করিলেন। রসেরও ত একটি বস্তু থাকা চাই। কবি "তথাস্তু" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, রসের একটি আধার আছে। কিন্তু সেইটিরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়? রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে, আজও তাহা বাতিল হয় নাই"। এই চির এবং অভ্রান্ত সত্যের প্রতিবাদ করিলেন—পণ্ডিত

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি বলিলেন "রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। কাব্য যে গুণে স্থায়ী হয়, তাহা নিত্য রসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়—নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর গুণে।" রসের মধ্যে একটা অনিত্যতা আছে, ইহা কোনক্রমেই আমাদের বুদ্ধির গোচর করিতে পারি না। কতক রস কি নিত্য, এবং কতক অনিত্য? অথবা এক রসেরই অংশবিশেষ নিত্য এবং অপর অংশ অনিত্য? আমরাও আজ পর্য্যন্ত জানি রস মাত্রেই নিত্য, এবং আমাদের ধারণা, "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে।" এই কথায় রবিবাবু তাহাই বুঝিয়াছেন এবং বলিয়াছেন। মানব-হৃদয়ে রস মাত্রেরই আবহমানকাল একটি অপরিবর্ত্তনশীল প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের হৃদয়-বৃত্তিসমূহের স্ফুরণকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের পারিভাষিক ভাষায় রস বলে। সুতরাং রসের মূল মানবের স্বভাবজ হৃদয়বৃত্তিসমূহ—ভক্তি, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন একটি বৃত্তি পাত্রবিশেষে কম বা বেশী হইতে পারে—অচিরস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন মানুষের হৃদয়বৃত্তি-সঞ্জাত রসও থাকিবে—সেই অর্থেই রস নিত্য এবং তাহার মূল্যও নিত্য। কিন্তু রসের বস্তু বা আধার সম্বন্ধে এই কথা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বথা খাটে না। রসের বস্তু কল্পনা করা যাইতে পারে এবং প্রায়ই কাব্যাদিতে কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু রস মানবের স্বভাবজাত চিত্তবৃত্তির অনুরূপ—প্রতিকৃতি মাত্র। তাহা ছাড়া বাস্তব বা কল্পিত বস্তুর দর মানবের বিচার-সাপেক্ষ; এবং যদিও আমরা Swiftএর মতের একেবারে প্রতিপোষক নই, ইহা অনেকটা সত্য, মানুষ উড়িতে যেরূপ সক্ষম, বিচার করিতেও সেইরূপ সক্ষম—"Mankind is as much fitted to reason as to fly." প্রতিদিনের ঘটনায় দেখিতে পাই, আজ যে বস্তু, যে ঘটনা, যে মত সকলের শিরোধার্য্য, কাল তাহা পদদলিত। কিন্তু প্রেম, ভক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতির প্রভাব এবং মূল্য বাল্মীকির সময়েও যাহা, Kiplingএর সময়েও তাহাই। রসের যুগ বা জাতি নাই—সত্যযুগেও যাহা—কলিযুগেও তাহা। হিন্দুর নিকট যেরূপ—ম্লেচ্ছের নিকটও সেইরূপ।

রসোদ্ভাবনেই কবির মর্য্যাদা, কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তু-সমাধানে কবির কৃতকার্য্যতা থাকিতে না পারে, তাহাতে আসিয়া যায় না। কিন্তু রসোদ্ভাবনে অসামর্থ্য অমার্জ্জনীয়। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহার বস্তু যৎকিঞ্চিৎ—সামান্য এবং চিত্তকে আকৃষ্ট করে না; কিন্তু রসের প্রাবল্য এবং

প্রাচুর্য্যে—রসোদ্ভাবনের গুণে তাহারা সাহিত্য-সংসারে এক একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। পদ্য কাব্যে Byron, Shelly, Keats প্রভৃতি এবং গদ্য কাব্যে Victor Hugo, Dickens, Thackeray, Ruskin বঙ্কিম প্রভৃতি হইতে ইহার প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

Shakespeare-লিখিত Tempest নাটকের ঘটনা-সংস্থান-বস্তু সামান্য। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যেও কেহ বা মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট—কেহ বা মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের—আবার কেহ বা মানুষ হইয়াও, মানুষের সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা হইতে বঞ্চিত; কিন্তু এই সকল উদ্ভট পাত্র-পাত্রী লইয়া, যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বনে মহাকবি মানবের চিত্তবৃত্তির কি অপূর্ব্ব খেলা দেখাইয়াছেন। নাটকের বস্তু সামান্য হইলেও—একাধিক বিচিত্র রসের বিস্ময়কর-উদ্বোধনে সাহিত্য-জগতে Tempestএর তুল্য দ্বিতীয় নাটক নাই।

ফরাসী কবি (Copre) কোপে লিখিত Passant ( পথিক ) নামক নাট্য-কাব্যের আখ্যানবস্তু কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নাটিকা আগাগোড়া মধুর রসে সিক্ত। একবার পাঠ করিলে হৃদয় তৃপ্ত হয় না—পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইয়া একাধিকবার পড়িতে হয়।

কালিদাসের "মেঘদূত" রসের ভাণ্ডার—কিন্তু ইহার বস্তু কি? এবং Coleridge এর Ancient Mariner ইংরাজী সাহিত্যে তুলনারহিত—বস্তু গৌরবে নয়, রসের গুণে। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বিখ্যাত ফরাসী কবি এবং সমালোচক রেমিডিগুরমে বলেন কাব্যকলায় বস্তু সম্বন্ধে আদর বা অনুরাগ শিশু বা অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাহারও নাই। ফরাসী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিতার বস্তু কি? Odysseyর কি এবং L'edrication Sentimentalএরই বা কি?

এখানে তর্কস্থলে দেখা দিলেন "সবুজপত্রের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী। তিনি সাহিত্যে—বিশেষতঃ রস-সাহিত্যে প্রবীণ, একাধিক ভাষার সহিত সুপরিচিত এবং নিজে কবি; কিন্তু তর্ক করিবার নেশা তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছে। তাই তিনি রসের বস্তু সম্বন্ধে রবিবাবুর মত সহজ কথায়, সাহিত্যিক প্রশ্নের সাহিত্যিক হিসাবে মীমাংসা করিতে না গিয়া হিন্দুদর্শন এবং পুরাণাদির আবাহন করিয়াছেন। তাহাতে তর্কের আড়ম্বর না কমিয়া, অবান্তর কথায় তাহা স্ফীতদেহ হইয়াছে। "বস্তুতন্ত্রতা" শব্দের গোত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি সাধারণ বঙ্গীয় পাঠককে বাধিত করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের

পারিভাষিক শব্দ হইলেও সাহিত্যে উহার চলন বিশেষ সুবিধাজনক এবং বাঞ্ছনীয়। প্রমথবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখন সে কথা পরিহার করিয়া প্রকৃতমনুসরামঃ। আমরা দেখাইয়াছি সাহিত্যে রস নিত্য এবং মুখ্য বস্তু; এবং সকলেই স্বীকার করিবেন, রবিবাবু ও রাধাকমল বাবুও স্বীকার করেন—রস একটি অবলম্বনকে—বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। কিন্তু রসের প্রাধান্য স্বীকার কর, বা বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার কর—রস-সাহিত্যের কার্য্য কি—উদ্দেশ্য কি? সকল কলাবিদ্যার যে কার্য্য—যে উদ্দেশ্য—রসসাহিত্যেরও তাহাই—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা;—যাহাই সৌন্দর্য্যের উপাদান, তাহাই সাহিত্যে গ্রাহ্য। সাহিত্য-মন্দিরে কোন পদার্থেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই—যদি তাহাদের দ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়; এবং যাহাতেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাহাতেই সাহিত্যের অধিকার—কোথাও তাহার হাত বাড়াইবার কারণ নাই। এক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অনুমতি-পত্র লইয়া ত্রিভুবনে যত্র তত্র সাহিত্যের অবারিত গতি—এবং সেই অনুমতি-পত্রের বলে ত্রিভুবনে যাহা, তাহা সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র। বাস্তব ঘটনা—কল্পিত ঘটনা—মানব-চরিত্র—প্রকৃতির দৃশ্য—কর্ত্তব্যের কঠোর পথ—স্বপ্ন বা খেয়ালের আকাশকুসুম—সকলই কাব্যের বিষয়। :কেবল সৌন্দর্য্য-উদ্ভাবন হইলেই হইল; অর্থাৎ উদ্ভাবিত রস এবং বর্ণিত বস্তুকে সৌন্দর্য্যের আলোকে মণ্ডিত করিতে হইবে। সে আলোকের উপাদান এবং প্রকৃতি Wordsworth চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুপম সুন্দর ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

> "The light that was never seen on sea or land
> The consecration and the Poet s dream!"

সে আলোক প্রতিভার আলোক। গ্রীক-পুরাণে আখ্যাত আছে Prometheus স্বর্গ হইতে অগ্নি আহরণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ কবি-প্রতিভা উচ্চতর স্বর্গ হইতে সৌন্দর্য্যের চিরোজ্জ্বল অনির্ব্বাণ—নিত্যনব আলোক বিকীর্ণ করে। এবং কবির স্বপ্ন, স্বপ্ন হইলেও কেবল সুবর্ণ হইতে সুবর্ণতর (more golden than gold) নয়—বাস্তব হইতে বাস্তবতর। কিন্তু ইহাতে রাধাকমল বাবুর ভাবনা হইয়াছে—লোকশিক্ষার কি হইবে? আমার ত বিবেচনায় যখন সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র—তখন এই প্রশ্নের উত্তর চক্ষুর সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। জীবন বা জগৎ হইতে লোক যদি শিক্ষা পায়, তবে সাহিত্য হইতেও পাইবে। এবং জীবনে যাহা জটিল—সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অসম্বদ্ধ—

নানা ঘটনা-সত্ত্বে আবৃত-প্রচ্ছন্ন-লুক্কায়িত, সাহিত্যে তাহা পরিষ্কার—পরিস্ফুট উজ্জ্বল। একটা কথা চিরকালই প্রচলিত--সাহিত্য জীবনের দর্পণ!—বাস্তবিকও তাই! কিন্তু কেবল দর্পণ নহে। সাহিত্য জীবনকে সংশ্লিষ্টভাবে (Synthetically) এবং বিশ্লিষ্টভাবে (analytically) দেখায়। বাস্তব জগতের পাত্রপাত্রী অপেক্ষা আমরা সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের নিকট হইতে বহুবিধ এবং অধিক মূল্যের শিক্ষা লাভ করি। কাল্পনিক হইলেও, তাহারা বাস্তব হইতে বাস্তবতর! তাহারা আমাদের জীবনের অংশ—হৃদয়ের সন্নিহিত। একবার মনে মনে স্মরণ কর দেখি, রামায়ণ ও মহাভারতের পাত্রপাত্রী—Shakespear, কালিদাস—ভবভূতি—বঙ্কিমের। তুমি জীবনে প্রতাপের ন্যায় মনোমুগ্ধকর বরেণ্য আদর্শ দেখিয়াছ? জীবনও কাহাকেও বলে না--সাহিত্যও কাহাকেও বলে না—আমার নিকট হইতে শিক্ষা লও বা শিক্ষা লইও না। যদি কেহ শিক্ষা লাভ করে, তাহাতে জীবন বা সাহিত্য দুইয়েরই কোন আপত্তি নাই—দুইয়েরই কেহ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না। Victor Hugoর কাব্য সম্বন্ধে Swinburne বলিয়াছেন—"As the laws that steer the world his works are just." যদি জগতের বিধি সকল ন্যায় ও যুক্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে জগৎ হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাহিত্য হইতেও পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য! এবং Victor Hugoর কাব্য জগতের অনুরূপ বলিয়াই তাহা হইতেও সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। তাহা হইতে তুমি, আমি অজ্ঞাতসারে বা অতর্কিতভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারি; কিন্তু সাহিত্য সে বিষয়ে উদাসীন। আত্রেয়ীর বাণী কেবল গুরু-শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে না, সকল শিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে—"প্রভবতি শুচিবিম্বোদ গ্রাহে মণি ণ মৃদাংচয়ঃ।"

শিক্ষাদানে সাহিত্যের এই উদাসীনতার উল্লেখ John Stuart Mill তাঁহার Poetry and its Varieties নামক প্রবন্ধে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। কবিতা এবং উদ্দীপনার পরস্পর পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:—

"Poetry and eloquence are both alike the expression or utterance of feelings. But if we may be excused the antithesis, we should say that eloquence is heard, poetry is over heard. Eloquence supposes an audience; the peculiarity of poetry appears to us to lie in the poet's utter unconsciousness of a listener. Poetry is feelings, confessing itself to itself in moments of solitude, and embodying itself in symbols, which are the nearest possible

re. resentations of the feeling in the exact shape in which it exists in the poet's mind. Eloquence is feeling pouring itself out to other mind, courting their sympathy, or endeavouring to influence their belief or move them to passion or to action.

All poetry is of the nature of soliloquy"

বঙ্গীয় সাহিত্যে এই কথার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাহার "উদ্দীপনা" নামক প্রবন্ধে। "দুইটি রসাত্মকবাক্য—কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। নির্জ্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। উদ্দীপনা সর্ব্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্য্যে লওয়ান, এইরূপ একটি না একটি তার চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। * * *

"তিনি কখন * * * ভূরি প্রস্ফুটিতা যূথিকা লতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না, চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কি না, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই।"

কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা—ইহা একটা পুরাতন সাহিত্যিক বৈধর্ম্ম্য—heresy—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ফরাসী কবি এবং সমালোচক Baudelaire যাহাকে heresie de l'ensignment বলিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গতায়ু "প্রদীপ" পত্রে মল্লিখিত "রস্কিন" প্রবন্ধে এই প্রশ্নেরই আলোচনায় যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে সঙ্গত বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"সত্য নিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য—শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধ্য। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বা উদ্ভাবন কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য—রুচি (taste) আমাদিগকে তাহার পথ দেখাইয়া দেয়। নীতি আমাদিগকে কর্ত্তব্য বিষয় শিক্ষা দেয়—এবং ইহা বিবেকের কার্য্য। এমন হইতে পারে যে, সত্য বা নীতির অপলাপে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বা—অবিকৃত বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কলা-শাস্ত্র হইতে আমরা সত্যের উদ্ভাবন বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় ঠিক করিয়া

লইতে পারি না। বিজ্ঞান বা নীতির উদ্দেশ্যের সহিত যখনই কলা-বিদ্যা সঙ্গত হইয়াছে, তখনই তাহার নিজ উচ্ছেদ বা বিলোপ অনিবার্য্য। সত্যেরও মর্য্যাদা আছে, কর্ত্তব্যেরও মর্য্যাদা আছে; সৌন্দর্য্যের তাহাদের অপেক্ষা কোনরূপ ন্যূন নহে। কলাশাস্ত্রে সৌন্দর্য্যের স্থান সকলের উপর। বালক-জীবনের সমস্ত মধুময় মোহ, উজ্জ্বল কল্পনা, বিচিত্র শোভা ও অর্দ্ধস্ফুট-কুসুম-কোরকবৎ কোমল ও কমনীয় কবিত্বের সারাদান করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখক কেনেথ গ্রেহাম ( Kenneth Graham ) মহাশয় যে 'গোল্ডন এজ্' ( Gol len Age ) নামক অতি সুন্দর ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে আমরা কল্পনা-প্রিয় বালকের এই অমূল্য আবিষ্কারের সন্ধান পাই, সত্যের অপেক্ষাও উচ্চতর পদার্থ আছে—( There are higher things than truth ) ইহার উদাহরণ কলাশাস্ত্রের প্রতিছত্রে—সে শাস্ত্রে সৌন্দর্য্য সত্যের অপেক্ষা উচ্চতর।" কিন্তু বাঙ্গালি পাঠককে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ফ্রান্স পর্য্যন্ত অত দূরে দৌড়াইতে হইবে না। আমাদের ঘরের লোক, আমাদের আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? অনেকে উত্তর দিবেন, নীতি-শিক্ষা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে, "হিতোপদেশ" "রঘুবংশ" হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতির বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

"কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা; কিন্তু নীতি নির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না! তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

ইহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করি না। তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, বঙ্কিম ইদানীন্তন বাঙ্গালার শুধু অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক ন'ন—সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্য ( sanity ) আদর্শ-

স্থানীয়। তাঁহার বিচারশক্তি এবং রসগ্রাহিতা সর্ব্বতোমুখী এবং অনিন্দ্য। তিনি যে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ভ্রমাত্মক মতকে প্রশ্রয় দেন নাই, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত এবং আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি ইতস্ততঃ না করিয়া অসঙ্কোচে পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা নয়।

এই সৌন্দর্য্য লইয়াই কবির ধ্যান ধারণা—কবির জীবন। কোন কালে কোন কবি তৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সৌন্দর্য্যে চিরপরিতৃপ্ত! যাহা এখন চরম সৌন্দর্য্যরূপে প্রতিভাত, পরক্ষণেই অভিনব সৌন্দর্য্যের মদির স্বপ্নে কবির হৃদয় চঞ্চল,—অনিবার্য্য ঔৎসুক্যে দোদুল্যমান,—"পাইলেও নাহি পাই মেটে না পিয়াস।" সৌন্দর্য্যের দিগ্‌বলয়ের পরিধি নাই—সীমা নাই,—তাহার অনন্ত বিকাশ কাহারও দ্বারা কখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"

এবং ইহার প্রভাবও অসীম। "Le Bante pent :ont chose"—সৌন্দর্য্যের অশেষ শক্তি—সকলই করিতে পারে,—পশুকেও মানুষ করে—লোকশিক্ষা কোন্ ছার! উপরে উদ্ধৃত বঙ্কিমবাবুর কথাগুলি স্মরণ কর।

সৌন্দর্য্যকে সংজ্ঞার (definition) মধ্যে আনা অসম্ভব—যদিও ইহাকে অনুভব করিতে সময় লাগে না। পার্থিব হইয়াও ইহা অপার্থিব। মানুষের চির আনন্দের সামগ্রী হইলেও ইহা দ্বারা মানুষের কোন অভাবই পূরণ হয় না—জীবনের কোন কাজেই লাগে না। হিতবাদীদের (utilitarians) গাত্রে কালি ছিটাইবার জন্য লিখিত হইলেও, Theophile Gantier সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য এবং আমার বিবেচনায় অভ্রান্ত সত্যের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত। যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না—যাহা কিছু মানুষের ব্যবহারে আসে, তাহাই অসুন্দর—কুৎসিৎ, কারণ উহা কোন না কোন অভাবের পরিচায়ক এবং মানুষের সকল অভাবই নীচ ও তাহার দীন দুর্ব্বল প্রকৃতিরই ন্যায় হেয়। বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান শৌচাগার। তথাপি আমরা কিছুতেই তত মুগ্ধ নহি—কিছুতেই আমরা তত তীব্র ও অসীম আনন্দ উপভোগ করি না, যেমন সৌন্দর্য্য। ইহার মধ্যে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর একটি রহস্য আছে বলিয়া বোধ হয়। Goethe এর কথাই সত্য! তিনি বলিয়াছেন—"সৌন্দর্য্য নিসর্গের গূঢ়

নিয়ম সকলের অভিব্যক্তি, সৌন্দর্য্যের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে যাহারা কথনই প্রকাশ পাইত না"। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, আমাদের জাগ্রত-চেতনার অন্তরে যে অব্যক্ত-চেতনা আছে, তাহা সৌন্দর্য্যের মোহময় স্পর্শে সেই সকল প্রচ্ছন্ন নিয়মের সঙ্গে অস্পষ্ট সহানুভূতি অনুভব করে এবং অনির্দ্দিষ্ট ভাব-সজ্যের আঘাতে চঞ্চল হয়। হৃদয় এই অবস্থায় কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পায় না বলিয়া উৎকট ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ণ উপভোগের অভাবে পরিতৃপ্তি পায় না। কিন্তু ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রশ্ন—আমাদের অনধিকারচর্চ্চা।

সেই সৌন্দর্য্য-সৃজনই কবির আত্মপ্রসাদ,—রবিবাবু যে আত্মপ্রসাদের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাই তাঁহার আদিম এবং একমাত্র অবলম্বন। অসংখ্য লোকের বাহবা বা প্রশংসা তাঁহার কার্য্যে তাঁহাকে সে পরিমাণে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, যেমন তাঁহার নিজ হৃদয়ের প্রীতি। যখন তিনি সেই প্রীতি লাভ করিলেন, তখন তাঁহার আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না—তাঁহার নিজের আনন্দ তাঁহার কৃত কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে চরম সাক্ষ্য—তৎপ্রতি চরম ব্যবস্থা (sanction)। যখন সৌন্দর্য্য তাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূত, তখন তিনি বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন—বাগদেবীর "ভর" তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। Coleridge যথার্থই বলিয়াছেন "Poetry has been to me its own exceeding great reward" লোকপ্রশংসা আসুক বা না আসুক, যতক্ষণ না তাহার সৃষ্টি কবির হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে ততক্ষণ তিনি অন্ধকারে। গোড়ায় তিনি সাধারণের প্রশংসার জন্য চেষ্টিত নন—অবজ্ঞার ভয়ে ভীত নন।—"তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ!"

সেই রসসাহিত্যকে—সেই আনন্দের সৃষ্টি বিশাল দেবমন্দিরকে—সৌন্দর্য্যের অসীম পীঠস্থানকে, কে পাঠশালার সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে? আশা করি কেহ নয়—রাধাকমল বাবুও নন—অন্ততঃ পুনরালোচনায়!

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

# দৈববাণী।

১

কে শুনিবি দৈববাণী—কে শুনিবি আয়,
অই যে উঠিছে ওম্,
ব্যাপিয়া ভূতল ব্যোম,
শিহরিয়া উঠে রোম পুলকিত কায়!
বধির অধীর প্রাণে
এ বাণী যে শোনে কাণে,
বেজে উঠে জয়গান শিরায় শিরায়!
কে শুনিবি দৈববাণী কে শুনিবি আয়!

২

সশরীরী দৈববাণী কে দেখিবি আয়,
অই যে উঠিছে ওম্,
জ্বলিয়া ভূতল ব্যোম্,
কে জানে কে করে হোম কোন্ দেবতায়!
অদূরে ও ভবিষ্যতে
উজলি বিজলী-রথে,
শোনিতের রাঙ্গা-পথে কে আসিছে হায়,
দীনতা ভীরুতা পাপ,
দিগন্তের অভিশাপ,
পিষিয়া সে পরিতাপ চাকায় চাকায়!
সশরীরী দৈববাণী কে দেখিবি আয়!

৩

সশরীরী দৈববাণী কে ছুঁইবি আয়,
অই যে গর্জ্জিছে ওম্,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ব্যোম্,
ভেঙ্গে চূরে রবি সোম রেণু কণিকায়!

যুগান্ত নরক ঘোর
হুঙ্কারে পলায় ওর
টঙ্কারে বিশাল বিশ্ব রসাতলে যায়!
মুহূর্ত উহারে ছুঁলে
লোহার অর্গল খুলে,
খোলে সে লোহার বেড়ী দৈবকীর পায়!
সশরীরী দৈববাণী কে ছুঁইবি আয়!

৪

সশরীরী দৈববাণী কে শুঁকিবি আয়!
সুরভি অমৃত ওম্,
প্লাবিয়া মরুৎ ব্যোম্—
অনল সলিল ক্ষিতি—দিকে দিকে ধায়!
মরে যদি শক্তিশেলে,
যুগান্ত বহিয়া গেলে,
শবে পায় নবপ্রাণ নাকে যদি যায়!
লাগিলে তাহার শ্বাস
খুলে যায় নাগপাশ,
বাহুর বন্ধন খোলে, রাহু ভয় পায়!
সশরীরী দৈববাণী কে শুঁকিবি আয়!

৫

সশরীরী দৈববাণী কে চাখিবি আয়!
তরঙ্গ গর্জ্জিছে ওম্,
মহা রস—মহা সোম—
ভাসায়ে ভূতল ব্যোম্—সাগরে কাঁপায়!
হলাহল কালকূটে
মরণ চরণে লুটে,
মহাদেব করপুটে পান করে তায়!

প্রহ্লাদ আহ্লাদ মন,
জয় যশ সিংহাসন,
লভিলা সে শুধা পিয়া পিতার আজ্ঞায়!

খাইলে সে মহাসুধা,
শত জনমের ক্ষুধা,
কত জনমের যেন তৃষা দূরে যায়!
অনাহারে উপবাসে,
দুরভিক্ষে মরে না সে,
আহরি বিশ্বের অন্ন সেবে অন্নদায়!

অনন্ত অলকা হর্ষে,
সুবর্ণ-চম্পক বর্ষে,
তাহার গাণ্ডীবে—তার মায়ের পূজায়!
বিঘ্নপূর্ণ কর্ম্মপথে,
শ্রীকৃষ্ণ সারথি রথে—
ভগবান বাসুদেব তাহারি সহায়।

তারি দৈববাণী গীতা
অগ্নিসিন্ধু উন্মথিতা
আলো জ্বলে কুরুক্ষেত্রে চিতায় চিতায়!
সে মহিমা এত দীপ্ত,
পতঙ্গও তাহে ক্ষিপ্ত,
মানুষ—মানুষ নাকি এত অন্ধ তায়?

ভীরু কাপুরুষ ক্লীব,
এমন অধম জীব
মানুষ—মানুষ নাকি পিযে পার পায়?
অই জ্বলে দৈববাণী গীতায় চিতায়!

# ক্রিসাসের স্বর্ণমুদ্রা।

প্রাচীন লিডিয়া দেশের কোন মুদ্রা ভারতবর্ষে এতাবৎ কাল মধ্যে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ; এবং এতদ্দেশে রাজা ক্রিসাসের ( C.oesus ) কোন স্বর্ণমুদ্রা এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইউরোপখণ্ডে উক্ত নরপতির যে কয়েকটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা তদ্দেশীয় কতিপয় বৃহৎ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। আমি সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত ক্রিসাসের একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিগত অক্টোবর মাসে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী 'মারি' নামক স্থানের জনৈক পোদ্দারের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছি। এই মুদ্রাটী বিশুদ্ধ স্বর্ণের। ইহার এক পৃষ্ঠে দুইটী অসমান চতুষ্কোণ ও কিঞ্চিৎ গভীর ছাপ এবং অপর পৃষ্ঠে একটী সিংহ ও একটী ষণ্ডের মস্তক অঙ্কিত আছে।

অধ্যাপক জে, বি, বারি (J. B. Bury) প্রণীত 'গ্রীসের ইতিহাসে' ঠিক এই প্রকার একটী মুদ্রার ছাপ আমি দেখিয়াছি। ঐ পুস্তকে উক্ত মুদ্রাটী "সার্দ্দির সুবর্ণমুদ্রা" (Gold coin of Sardis) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (১) ইহা ষষ্ঠশতাব্দির মধ্য ভাগের। উক্ত পুস্তকে অঙ্কিত মুদ্রার এক পৃষ্ঠে দুইটী চতুষ্কোণ ছাপ এবং অপর পৃষ্ঠে সিংহ ও বৃষের মস্তকচিহ্ন দৃষ্ট হয়। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এবং লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক ও এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রাতত্ত্বের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রাউনের (Prof C. T. Brown) নিকট আমার ক্রীত মুদ্রাটী পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তাঁহারা এই মুদ্রাটীকে 'আসল জিনিষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জি, এফ্‌ হিল প্রণীত 'Historical Greek coins' নামক পুস্তকে ঠিক এই রকম একটী মুদ্রার বর্ণনা আছে। যদিও শ্রীযুক্ত হিলের বর্ণিত মুদ্রাটীতে ক্রিসাসের রাজচিহ্ন তাদৃশ পরিস্ফুট নহে, তথাপি উহা যে ক্রিসাসের তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। ঐ মুদ্রাটীও বিশুদ্ধ স্বর্ণের। এই সকল মুদ্রা দুই প্রকার ওজনের হিসাবে প্রস্তুত। যথা ইহুদিদের টাকার ওজন হিসাবে

১। Macmillan & Co. History of Greece 1902 by Prof. J. B. Bury, top of P. 217.

৮·১৮ গ্রাম বা ১২৬ গ্রেণ এবং ( ২ ) বাবিলোনিয়ান ওজনের হিসাবে ১০·৯১ গ্রাম বা ১৬৮ গ্রেণ। বাবিলোনিয়ান ওজনের হিসাবে প্রস্তুত মুদ্রাতেও ঠিক এই রকমের রাজচিহ্ন অঙ্কিত আছে। অধ্যাপক বারি (Bury) লিখিয়াছেন লিডিয়ার রাজাদের প্রথমাবস্থায় শ্বেতবর্ণের মিশ্র ধাতুতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রজত একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ সকল মুদ্রা প্রস্তুত হইত। পরে রাজা ক্রিসাস বিশুদ্ধ স্বর্ণ এবং রজতের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার ক্রীত মুদ্রাটীর ওজন ১০.৬৮০ গ্রাম বা ১৬৪.৭৫ গ্রেণ; সুতরাং ইহা বাবিলোনিয়ান ওজনের হিসাবে প্রস্তুত। তৎকালে বাবিলোনিয়ান ওজনের হিসাবে প্রস্তুত মুদ্রাগুলি প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য-বিনিময়ের জন্য এবং ইহুদি দেশীয় ওজন হিসাবে প্রস্তুত মুদ্রাদ্বারা এসিয়া-মাইনরস্থিত গ্রীক নগরীসমূহে বাণিজ্য-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। (৩)

রাজা ক্রিসাসের সুবর্ণময় রাজচিহ্ন সমূহ ঐতিহাসিক হিসাবে সর্ব্বসাধারণের নিকট সমভাবে আদরণীয়। ক্রিসাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রচলিত শ্বেতবর্ণ ধাতুর মুদ্রাগুলির প্রচলন এই সকল স্বর্ণমুদ্রার দ্বারায় এক প্রকার স্থগিত হইয়াছিল। (৪) পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ঐ সকল মুদ্রায় স্বর্ণের পরিমাণ শতকরা ৫ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত দেখা যায়। দিল্লীতে পাঠান সুলতানগণের রাজত্বকালে তাম্র এবং রজত মিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। গ্রীস দেশেও পূর্ব্ববর্ত্তীকালে শ্বেতবর্ণের ধাতুর মুদ্রাগুলির প্রচলন ছিল এবং ঐ সকল মুদ্রায় মিশ্রিত ধাতু সমষ্টির আংশিক পরিমাণ ও তারতম্য কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ উল্লিখিত সুবর্ণমুদ্রাসমূহ তাৎকালীন সর্ব্বপ্রথম রাজকীয় মুদ্রারূপে লিডিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। ক্রিসাসের ধনসম্পদ এবং প্রবল প্রতাপ জগৎ বিখ্যাত। অদ্যাপিও বিলাতে ধনকুবেরগণকে লোকে ক্রিসাসের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দে লিডিয়া রাজ্যের শক্তি ও ধন-সম্পদের অনুরূপেই এই সকল সুবর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল।

লিডিয়া রাজ্যের অধঃপতনের পর পারস্যদেশীয় রাজমুদ্রা (Persian D. rics)

---

২। P. 18 No 7: see also Percy Gardner—The gold coin of Asia before Alexander the Great, p. 9,

৩। G. F. Hill, Historical Greek coions P. 19

৪। Percy Gardenr, the gold coinage of Asia before Alexander the great. P. 8

এসিয়ার সহিত বাণিজ্য-বিনিময়ে লিডিয়ার রাজমুদ্রার স্থান অধিকার করিয়াছিল। ক্রিসাসের বেবিলোনীয় ধরণে নির্ম্মিত রাজ মুদ্রাগুলি অপেক্ষা পারসীক মুদ্রা (Darics) গুলি ওজনে কিছু ভারী। শ্রীযুক্ত হিল (G F Hill) অনুমান করেন যে, প্রাপ্ত মুদ্রাটীর উপরে উৎকীর্ণ পরস্পর সম্মুখীন সিংহ এবং বৃষের শিরচিহ্ন 'এ্যানাটোলীয়' (Anatolian) দেবীগণের বাহন-চিহ্নের সহিত সাদৃশ্য আছে। এই প্রকারের শিল্পকলা এসিয়াখণ্ডের অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। সিংহ এবং বৃষ ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের উপাসিত দেবদেবীরও বাহনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ক্রিসাসের এইরূপ একটী মুদ্রা কি প্রকারে পঁহুছিয়াছে, তাহা যৎসামান্য প্রমাণ লইয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে সিন্ধুনদের উপরিস্থিত 'মারি' নামক স্থানে এই মুদ্রাটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—প্রাপ্তিস্থানের অবস্থান দেখিয়া আংশিক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মারি নগর সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরস্থ কালাবাগ হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে ঐ নদের বামতীরে অবস্থিত। ঐ স্থানে ঝিলম এবং রাউলপিণ্ডি হইতে আগত রাজপথ নদ পার হইয়া গিয়াছে। এইস্থান হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে 'ইশাখেল' নামক স্থানটী অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট (৫) হইতে কুরাম এবং টোচি নদী এই স্থানে আসিয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী দুইটীই ভারত-বর্ষের সহিত আফ্গানিস্থানকে সংযোগ করিয়াছে। ইহার একটী কাবুলের দিকে এবং অপরটী গজনীর দিকে গিয়াছে। যদিও এই জলপথ দুইটী দুর্গম এবং তাদৃশ পরিচিত নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ অতি পূর্ব্বকালে উহা বাণিজ্যপথরূপে ব্যবহৃত হইত। কালাবাগ প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্ত ছিল, এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য কালাবাগ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৬)

ক্রিসাসের এই নবাবিষ্কৃত মুদ্রাটী অতি সুন্দর এবং অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব ইহা আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে এতদ্দেশে আনীত হইয়া একাল পর্য্যন্ত কোন স্থানে বালুকানিম্নে প্রোথিত ছিল। লিডিয়া-রাজের সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রিত এই শ্রেণীর স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে এইটী কোন ক্রমে একজন

৫। Sir Thomas Holditch, Gates of India p. 512.

৬। V. A. Smith, Early History of India 2nd Edition I, page 34.

ভারতবাসীর হস্তগত হইয়া গুপ্তভাবে থাকিবার পর আজ আড়াই হাজার বৎসর পরে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যে আবিষ্কৃত হওয়া স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের ন্যায় প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ অতি পুরাতন দেশে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কে জানে, এ রকম আরও মুদ্রা ভূগর্ভে এই দেশে প্রোথিত নাই!

ক্রিসাস এ্যালেটাসের (Aly thes) পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। তাঁহার রাজত্বকালে 'লিডিয়া' প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্য হইয়াছিল। ক্রিসাস গ্রীকদিগের অধিকৃত এক 'মিলেটাস' নগর ব্যতীত আইওনিয়া, ইটোলিয়া প্রভৃতি নগরসমূহ আক্রমণ এবং অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব গ্রীস হইতে ইজিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং 'কারিয়ার' অন্তর্গত গ্রীক—'ডোরিয়ান' নগরসমূহ তাঁহার বাহুবলে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পারস্যের হথামনিষীয় (Achaemenian) গ্রীক রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর হইতেই লিডিয়া রাজবংশের পতন সূচনা হয়। পারস্য রাজ কুরোষ (Cyrus) ক্রিসাসের ভগিনীপতি মিডিয়ারাজ আস্তিয়াজিস্‌কে পরাজিত করেন। আস্তিয়াজিসের পতনের সময় রাজ্যাকাঙ্ক্ষী লিডিয়ারাজের পূর্ব্বদেশের দিকে অস্ত্রচালনা করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল—উদ্দেশ্য তাঁহার ভগিনীপতিকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ক্রিসাস "ডেল্‌ফির" সুপ্রসিদ্ধ দেবমন্দিরে 'ধরণা' দিয়া দৈববাণী পাইয়াছিলেন যে, যদি তিনি হেল্‌স নামক স্থান অতিক্রম করিতে পারেন, তাহা হইলে একটী ক্ষমতাশালী রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবেন। ক্রিসাস ক্যাপাডোসিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। সাইরস অতি সামান্যকাল মাত্র সার্দ্দিস নগরী অবরোধ করিয়া যুদ্ধে ক্রিসাসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া লিডিয়ায় বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ক্রিসাসের সৌভাগ্যরবি নানা প্রকার প্রহেলিকা, ষড়যন্ত্র এবং কৌশলজালে বিজড়িত হইয়া ভাগ্যচক্রের কঠোর আবর্ত্তনে অকালে অস্তমিত হইয়াছিল। ক্রিসাসকে চিতাশয্যায় স্থাপন করার পর তিনি হঠাৎ এথেন্সের সোলনের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি আছে। বর্ত্তমান সময়ে এফিসাসের কারুকার্য্যময় প্রাচীন দেবমন্দিরে ক্রিসাসের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী স্তম্ভ ব্যতীত তাঁহার আর কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই। এই সকল স্তম্ভের নিম্নদেশে "রাজা ক্রিসাস কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত" এই খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ("Dedic t d by King C oesus")

লক্ষ্ণৌ কলেজের অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের নিকট হইতে আমি এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সময় যথেষ্ট মূল্যবান উপকরণাদি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

# আবাহন।

১

শূন্য নীরব মন্দিরে-নব
উৎসব পুনঃ আজি,
শুভ মিলনের পুণ্য লগনে
শঙ্খ উঠিছে বাজি'।
এস গো লক্ষ্মী, পুষ্প-আসনে
বারেক দাঁড়াও আসি',
ঘুচাও পলকে সঞ্চিত যত
দীনতা হীনতারাশি।

২

এস—নিশান্তে গগনের কোণে
উজ্জ্বল শুকতারা,
এস—বন্ধুর পর্ব্বতপথে
স্বচ্ছ সলিলধারা,
এস—বীণা-তারে ঝঙ্কৃত গীতি
সন্ধ্যার সমীরণে,
এস—কুসুমের মৃদু সৌরভ
প্রভাতের উপবনে।

৩

এস কল্যাণি, সাথে লয়ে তব
শান্তি করুণা স্নেহ,
প্রেমে ও পুণ্যে মঙ্গলে—কর
ধন্য তোমার গেহ।
ব্যথিতের তরে বহি' সান্ত্বনা,
আশা—নিরাশের তরে,
এস বিধাতার মূর্ত্ত আশিস্
মর্ত্ত্য ভুবন 'পরে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

# বাঙ্গলা সাহিত্য—

## উহার অভাব ও তাহা নিবারণের উপায়।

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের প্রতিকৃতি বা চিত্রপট। উহা জাতীয় জীবনের আদর্শ;—উহার পূর্ণ বিকাশে জাতীয় জীবন সমুন্নত ও গৌরবান্বিত হয়। উহা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় জাতীয় উন্নতি, অবনতি, উত্থান, পতন, উৎসব ও বিষাদ এবং পরাক্রম ও দুর্ব্বলতা জনসাধারণের সম্মুখে বিশদরূপে প্রকাশ করে। সাহিত্যে যেমন জাতীয় হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই উহাতে জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় ও অধঃপতনের প্রকৃষ্ট বিবরণ জানা যায়। যে জাতির হৃদয় যখন যে ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, সেই জাতির সাহিত্যে তখন তাহার আলেখ্য সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—একের বিকাশে অপরের উন্নতি এবং একের অবনতিতে অপরের অধঃপতন অনিবার্য্য। কালচক্রের আবর্ত্তনে জগতে যখন যে জাতি জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থিতি করে, তাহার সাহিত্যও তৎকালে তাহার ন্যায় গতিহীন ও নিশ্চল বোধ হয়। পক্ষান্তরে যে সকল জাতি জাতীয়-সমাজে সগৌরবে সমুচ্চ আসন অধিকার পূর্ব্বক পৃথিবীর বিশাল বক্ষে বিপুল বিক্রম ও দুর্দ্দমনীয় তেজে নিজ নিজ শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দান করে, তাহাদের সাহিত্যেও তেমনই দ্রুতগতি প্রখর তেজে তাহাদের হৃদয়ের বল, পরাক্রম ও প্রভুশক্তি প্রকাশ করে। বর্ত্তমান যুগে যে সকল মহাশক্তিশালী জাতি জগতে বিপুল বল ও ক্ষমতা পরিচালন করিতেছে, তন্মধ্যে জর্ম্মাণ জাতি সকল বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য না হইলেও অনেক বিষয়ে নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। এই পরাক্রমশালী জাতি দুর্দ্দমনীয় তেজ ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বিশ্ব-বিধাতার মঙ্গলময় বিধান ভুলিয়া বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় মহাসমরে বহুলোকক্ষয়কারী ভীষণ অনল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। উহার বিগত পঞ্চদশ বর্ষের সাহিত্য ও সংবাদপত্র পাঠে বিশেষরূপে জানা যায়, উহার জাতীয় হৃদয় দীর্ঘকাল কি ভাবে বিভোর হইয়া কি মন্ত্রের সাধনায় এই মহাযুদ্ধে রুদ্রতালে নৃত্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে জর্ম্মাণি সমগ্র ইয়ুরোপের মধ্যে একটী নগণ্য দেশ বলিয়া উপেক্ষিত

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন।

হইত, সেই জর্ম্মাণি বিপুল সাধনায় জাতীয়-সাহিত্যের পরিচর্য্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমরনীতি প্রভৃতির পরিপুষ্টি সাধনে জাতীয় একতা বা একপ্রাণতা প্রভাবে কিরূপ বলশালী হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। এই নবজীবনের অব্যর্থ ফল, জর্ম্মাণির সহসা জাগরণ ও সাডোভার জয় কোলাহল, এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ফল, সিডানের বিজয়োৎসব। তৎপরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই জর্ম্মাণির সাহিত্য ও জাতীয়-জীবন অনির্ব্বচনীয় উন্নতিলাভে সমস্ত সভ্যজগতকে একান্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছে!

পক্ষান্তরে, যে বিপুল শক্তিশালিনী বৃটেনিয়া বর্ত্তমান অভূতপূর্ব্ব মহাসমরে জর্ম্মাণির অন্যতর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফ্রান্স, ও রুসিয়া প্রভৃতির সহিত একপ্রাণে মিলিত হইয়া উহাকে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সেই সাগর-মালা-পরিবেষ্টিত নানা দেশের অধীশ্বরী দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনায়—কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছেন, তাঁহার জাতীয় সাহিত্যে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যে ইংরাজী ভাষা পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান ভাষার রস, তেজ ও মাধুরী আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গপুষ্টি সাধনে শিক্ষিত জগতের অপার বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে, তাহার সাহিত্য, ইতিবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সমরনীতি প্রভৃতি বৃটেনিয়ার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের জাতীয় জীবনের কি অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। সকল সভ্য দেশের উন্নতির ইতিহাস একবাক্যে ইহাই প্রমাণ করে যে, জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি; এবং যে জাতি যখন উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তখন সেই জাতির সাহিত্যই তাহাকে তজ্জন্য বিশেষরূপে সহায়তা দানে তাহার অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছে। সাহিত্যের পরিচর্য্যা ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের বিকাশ ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম অবস্থার ও উহার ক্রমবিকাশের কাল পর্য্যায়ক্রমে নির্ণয় করা কঠিন হইলেও উহার প্রাচীন ইতিহাস-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে

বাঙ্গলা সাহিত্যের পূর্ব্বাবস্থা।

করিতে জানা যায় যে, উহার প্রথম অবস্থাতে কবিতা ও ছড়াই উহার জীবন, এবং ছন্দময় পদ্য-গ্রন্থই উহার ভূষণ ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয় ও বাঙ্গলা দেশ অধিকারের বহু পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উহার

তদানীন্তন ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থা বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের আলোচ্য বিষয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত উহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন ও উৎকর্ষ সাধনে কোন বাঙ্গালীর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি-প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিগণ তৎকাল-প্রচলিত মৈথিলী ব্রজবুলি ও বাঙ্গলা ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণে যে সকল মধুর পদাবলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ দীর্ঘকাল মুখরিত হইয়াছিল। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, জয়দেব ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি ভক্ত-সাধক কবিগণ আদিরসের তরল তরঙ্গে একস্বরে একতানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গানে বাঙ্গালীর চিত্ত দীর্ঘকাল মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল। উল্লিখিত প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব-কবিগণের হৃদয়োন্মাদক মধুময় পদাবলি সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান অনেক পরিমাণে অধিকার করিয়াছিল। ঐ সময় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবকালে তিনি ও তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য ও ভক্তগণ যে গগন-ভেদী মধুর সঙ্কীর্ত্তনে পুণ্য-সলিলা ভাগিরথীর তটবর্ত্তী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, ক্রমে অনন্ত প্রসারিত দিগন্ত-প্রধাবিত সুনীল গভীর সমুদ্রের বিপুলতরঙ্গরাজি-চুম্বিত পুণ্যময় মহাতীর্থ শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে সমস্ত বাঙ্গালী ও উড়িয়াদিগকে সমভাবে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন, সেই গানের মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কার তদানীন্তন বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি অনেক পরিমাণে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিল! একদিকে প্রেম-বিহ্বল বৈষ্ণব কবিদিগের মধুর পদাবলির মোহময় মুমন্তভাব, অপর দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের পরমভক্ত ও অনুচরগণের গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়োন্মাদক মধুময় সংকীর্ত্তনের জলন্তপ্রভাব! উভয়ের অপূর্ব্ব সংযোগে বাঙ্গলা দেশ প্রেম ও ভক্তিরসের বন্যায় দীর্ঘকাল প্লাবিত হইয়াছিল। উল্লিখিত পরমভক্ত ও ধর্ম্ম-প্রাণ-সম্প্রদায়ের লেখকগণের রচিত পদ্য গ্রন্থাবলি সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রভাতকাল সূচনা করিয়াছিল।

মহাকবি কৃত্তিবাস ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত বাঙ্গলা রামায়ণ কোন্ সময় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, উক্ত রামায়ণ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য ও অপূর্ব্ব সম্পদ। উহার ভাষা কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের ন্যায় শ্রুতিমধুর এবং কালিদাসের ভাষার ন্যায় পরিমার্জ্জিত ও তেজপূর্ণ না হইলেও তৎকালের বাঙ্গলা

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব।

সাহিত্যে উহার প্রভাব সম্যকরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী পদ্য মহাভারত রচয়িতা কাশিদাস বাঙ্গলা দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাভারতের ন্যায় আর একখানি কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যে সুদুর্লভ। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি মনোবিজ্ঞান ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ উপাদানে পরিগঠিত হইয়া উহা বাঙ্গলা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। কাশিদাসের রচনা-প্রণালী ও ভাব অবলম্বনে অন্যান্য কতিপয় লেখক বাঙ্গলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি আজিও বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয়ের বিষয় ও ভাব অবলম্বনে রচিত হইলেও উহা বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধন ও ক্রমোন্নতি বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া-ছিল। কৃত্তিবাস ও কাশিদাসের পর কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় সুকবি পদ্য গ্রন্থ-রচনায় বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কোন কোন লেখক বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে কয়েকখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধতা, এবং ভাব ও রুচির সুশ্লীলতা অভাবে ঐ সকল পুস্তক ভদ্রজন-সমাজে আদর লাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

এতক্ষণ আমরা সংক্ষেপে পদ্য রচনা ও পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ণের কাল আলোচনা করিয়া দেখাইলাম, কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের কি পরিমাণে পরিপোষণ ও উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। কৃত্তিবাসের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী লেখকগণ পদ্যগ্রন্থ রচনায় যত্নবান ছিলেন। তৎকালে গদ্য রচনায় কাহারও আস্থা ও উৎসাহ ছিল না। ছাপাখানা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলা গদ্যরচনা ও গদ্যময় প্রবন্ধপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ হয়। দীর্ঘকাল বাঙ্গলা গদ্যের অবস্থা পদ্যের রচনার তুলনায় অধিকতর নিকৃষ্ট ছিল। তৎকালে বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ গদ্যরচনায় পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালা এবং অধিকাংশ স্থলে আড়ম্বরপূর্ণ কঠিন সংস্কৃত শব্দ ও সমাসের ঘনঘটা বিদ্যমান থাকায় উহা জন-সাধারণের দুর্ব্বোধ্য ছিল। বঙ্গমাতার ক্ষণজন্মা-সুসন্তান মহাত্মা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতানুসারিণী দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালা ভাষাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সরল ও সহজে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার

প্রণীত কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও কতিপয় প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত পরিমার্জ্জিত ও সহজ ভাষায় লিখিত হইলেও তৎকালে জন-সাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না হওয়ায় উহা সঙ্কীর্ণ সীমা-মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তদীয় ভক্ত ও অনুচরবর্গের মধ্যে অনেকে ঐ সকল পুস্তকের প্রতি আদর ও অনুরাগ প্রদর্শন করিলেও জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক কেহ কেহ বাঙ্গলা গদ্য রচনায় অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা কঠিন সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর হইতে বিমুক্ত ও পরিমার্জ্জিত না হওয়ায় তাঁহাদের লিখিত পুস্তকগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন উপকার ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়ের লিখিত ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাঞ্জল না হইলেও তিনি বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে যে বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও বাঙ্গলা সাহিত্য।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের পর পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহা-প্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনে একান্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় যেমন সুপণ্ডিত তেমনই সুলেখক ছিলেন। ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি যে সকল প্রধান প্রধান বাঙ্গলা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজীর ছায়া ও ভাব অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল এবং কোন কোন পুস্তক কতিপয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে অনূদিত হইয়াছিল। ধর্ম্মানুরাগী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় একজন ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষকাল আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্য-ভার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সুনীতিপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধে উহার গৌরববর্দ্ধন ও বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বিবিধ বিষয় ও ভাব সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধ-রচনায় তিনি প্রকৃত ভক্তের ন্যায় বঙ্গবাণীর যথোচিত পরিচর্য্যায়

বাঙ্গলা-সাহিত্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার।

বিপুল মান ও যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত সুযুক্তিপূর্ণ সুপাঠ্য প্রবন্ধগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের পুস্তকগুলি পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইলেও প্রথমতঃ কিছুকাল ঐ সকল পুস্তকে অনেক কঠিন সংস্কৃত শব্দ ও সুদীর্ঘ সমাসপূর্ণ বাক্য বিদ্যমান থাকায় জনসাধারণের নিকট প্রথমতঃ কিছুকাল উহাদের বিশেষ আদর হয় নাই। ক্রমে ঐ সকল পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইলে সংস্করণের পর সংস্করণে অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। এই দুই মহাত্মার ভাষা সম্পূর্ণ-রূপে কঠিন সংস্কৃত শব্দের অবরোধ ও বিস্তর সমাসের আড়ম্বর হইতে মুক্ত না হইলেও বাঙ্গলা ভাষার বিমলতা ও ওজস্বিতা সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সাধারণ পাঠকবর্গের অভাব নিবারিত ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নাই।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাল।

বলা বাহুল্য যে, পঞ্চাশ বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের যথারীতি আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে মাতৃভাষার প্রতি এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিন্দুমাত্র অনুরাগ ও আস্থা ছিল না। তৎকালে সংস্কৃত-শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতগণ কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রালোচনায় আনন্দ লাভ করিতেন। ইংরাজী শিক্ষার স্রোত তখন তরতর বেগে বাঙ্গলা দেশের প্রধান প্রধান স্থানে প্রবাহিত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহারা দীনা মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় একান্ত বিমুখ হইয়া অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় রত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন উগ্র সাহিত্য-সেবী প্রকাশ্যভাবে মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক সময় সময় ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার পরিচয় দানে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন। অতীব সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এখন, আর সেদিন নাই—অর্দ্ধ শতাব্দীর সুশিক্ষা ও সাধনা প্রভাবে বাঙ্গালীর চৈতন্য সম্পাদন ও তাহার রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে ও প্রভাবে স্বদেশানুরাগী সুশিক্ষিত ও সহৃদয় বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকে প্রগাঢ়

অনুরাগভরে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেক ক্ষমতাশালী লেখকের প্রাণগত সাধনায় বাঙ্গলা সাহিত্য অতি অল্পকালের মধ্যে আশাতীত উৎকর্ষ ও উন্নতিলাভ করিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যজাতির সাহিত্য এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে কখনই এত দ্রুত উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। নানা কারণে আমরা নিতান্ত দীন, হীন ও দুর্ব্বল হইলেও ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় আমরা দিব্যজ্ঞানে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান আশা ও ভরসা আমাদের মাতৃভাষার পরিপোষণ ও জাতীয় সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। যেদিন বঙ্গমাতার অযুত কৃতবিদ্য সন্তান একনিষ্ঠ ভাবে একমনে একপ্রাণে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের পূর্ণোন্নতি সাধন জন্য কঠোর সাধনায় দীক্ষিত হইবেন, সেই শুভদিনে অনন্তকল্যাণময়ী বঙ্গ-ভারতীর আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের প্রকৃত উদ্বোধন হইবে।

যে সকল সুকৃতিশালী মহাত্মগণ বাঙ্গলা ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরলোকগত স্বদেশ-প্রেমিক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

বাঙ্গলা সাহিত্যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান ও কীর্ত্তি

তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ও পারসী ভাষাতেও তাঁহার বিলক্ষণ দখল ছিল। একসময় তৎকর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিস্তর অনুসন্ধানপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ "কলিকাতা রিভিউ", "হরকরা" ও "হিন্দু পেট্রিয়ট" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইয়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার লিখিত বিবিধ-বিষয়ক সুপাঠ্য প্রবন্ধ-পাঠে একান্ত প্রীত হইয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার সুপরামর্শ লইতেন। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে আজীবন উক্ত ভাষায় বিস্তর সদ্গ্রন্থ লিখিয়া বিপুল যশঃ ও সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। মাতৃ-ভাষার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। উহার হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত; এজন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে উহার পরিচর্য্যায় জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির সাধন ও গৌরববর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গলা ভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন, তখন বাঙ্গলা দেশে দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল; একটী সাধুভাষা, যাহা প্রবন্ধ পুস্তকাদি রচনায় ব্যবহৃত হইত। অপরটী চলিত সরল ভাষা, যাহা কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত। যখন

প্রতিভাশালী সহৃদয় প্যারীচাঁদ বুঝিলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিসাধন জন্য দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন সহজ উপায় অবলম্বন করিলেন না, তখন তিনি তাহাকে সংস্কৃতমূলক শ্রুতিকঠোর শব্দাড়ম্বর ও সুদীর্ঘ সমাসের ঘনঘটা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহজ বোধগম্য চলিত সরল ভাষায় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা যে কত সুখের ও সম্মানের বিষয়, উক্ত সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন পরিগঠনের পক্ষে যে কত অনুকুল ও উপযোগী, বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন ও উহার শোভা ও সম্পদ পরিবর্দ্ধনে বাঙ্গালীর হৃদয়ের বল ও সামর্থ্য নিয়োগ, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে যে কিরূপ পবিত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি উৎসাহের সহিত, প্রগাঢ় অনুরাগভরে নূতন পথ অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায় নূতন প্রাণ, নূতন আলোক, নবীন মাধুরী ও অভিনব তেজ ঢালিয়া দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিপুল উন্নতির এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "মাসিকপত্রিকা" "আলালের ঘরে দুলাল"

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা প্যারীচাঁদ তদীয় বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহিত বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিকল্পে তৎকালের উপযোগী সহজ চলিত ভাষায় "মাসিক পত্রিকা" নামযুক্ত বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধপূর্ণ একখানি পত্রিকা প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবলম্বিত ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী সাধুভাষানুরাগী পণ্ডিতগণের তীব্র সমালোচনার বাণবিদ্ধ হইবে। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উক্ত "মাসিক পত্রিকার" প্রত্যেক খণ্ডের শীর্ষদেশে এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিত হইতেছে। যে ভাষায় সচরাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রবন্ধ সকলের রচনা হইবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের জন্য এই পত্রিকা লিখিত হইতেছে না।"

উক্ত পত্রিকার প্রথম খণ্ড হইতেই প্যারীচাঁদের সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" উহাতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে তিনি স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গভীর অন্ধকারের পর ঊষার মধুর আলোক যেমন

পথভ্রান্ত পথিকরে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া তাহার গন্তব্যপথ প্রদর্শন করে, সহৃদয় প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলালের" তরল আবেগময়ী ভাষা ও অভিনব ভাব তেমনই সন্দেহাকুল সাহিত্যসেবিগণের সম্মুখে এক অভিনব আলোক আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের গন্তব্যপথ নিদ্ধারণের পক্ষে বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা দান করিল। এই সময় উক্ত গ্রন্থের ভাষা লইয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং কোন কোন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে তুমুল আন্দোলন, বিষম মতভেদ ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-রচনার পক্ষে প্যারীচাঁদের সরল বেগবতী ভাষা অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দুর্ব্বোধ্য জমকাল ভাষা প্রকৃষ্ট ও আদরনীয়, এই সমস্যার মীমাংসার জন্য নানাস্থানে বিস্তর সভাসমিতি এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের প্রকাশ্য সম্মিলনস্থলে বিস্তর বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে কত তীব্র সমালোচনা, কত উপহাস ও বিদ্রুপ অবাধে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। নির্ভীক প্যারীচাঁদ উহাতে দৃক্‌পাত-শূন্য হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপথে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত সরলভাষা সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের কঠিনতা ও আড়ম্বরপূর্ণ সমাসের অবরোধ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী বেগবতী তরঙ্গিণীর ন্যায় তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব শোভা, সম্পদ ও উন্নতি সম্পাদনের সূচনা করিল। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ও বাঙ্গলা ভাষানুরাগী বিস্তর সহৃদয় লেখক ও পাঠক প্যারীচাঁদের মন্ত্রশিষ্যরূপে উক্ত সহজ ভাষার পক্ষপাতী ও উপাসক হইলেন। দেখিতে দেখিতে উহা বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন এবং সম্পদ ও গৌরববর্দ্ধনের এক নবযুগ আনয়ন করিল। উহার প্রভাব দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া বিস্তর সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত ও অধ্যাপক প্যারীচাঁদের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে সুতীক্ষ্ণ উপহাস ও বিদ্রুপের বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত সুপণ্ডিত রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি তৎপ্রণীত "বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" প্যারীচাঁদপ্রবর্ত্তিত ভাষার "আলালীভাষা" নাম দিয়া উহার প্রতি কিরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত প্রবন্ধের পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। সহৃদয় প্যারীচাঁদ সাধারণভাবে উক্ত সমালোচকদিগের মতের প্রতিবাদ পূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন বাঙ্গলাভাষা বাঙ্গালির হৃদয়ের ভাষা। সংস্কৃত ভাষা কখনই

বঙ্গ সাহিত্যে "আলালী" ভাষার প্রভাব।

উহার জননী নহে। উহা কতক পরিমাণে ধাত্রীর কার্য্য করিলেও উহার মাতৃভাবের প্রভাব বাঙ্গলা ভাষার প্রতি নিপতিত হইলে তাহার প্রসারণ ও উন্নতি সাধনে বিস্তর বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ কূপোদক অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী বেগবতী স্রোতস্বিনীর জল যেমন নরনারীর স্বাস্থ্যের অনুকূল, সংস্কৃত ভাষার কঠিন শব্দের নাগপাশ মধ্যে আবদ্ধ প্রাণহীন নিস্তেজ ভাষা অপেক্ষা তরল তরঙ্গময় সরল জীবন্ত বাঙ্গলাভাষা বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন পরিগঠনের পক্ষে তেমনই উপযোগী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির প্রারম্ভকাল উল্লেখ করিতে যাইয়া আমি মহাত্মা প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃতরূপ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, আশা করি উহা সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না। প্যারীচাঁদের সরল প্রাঞ্জল ভাষা অনেক বিষয়ে নিরাভরণ হইলেও উহা হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক "আলালের ঘরের দুলাল" হইতেই বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির স্রোত উপযুক্ত পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থের পর প্যারীচাঁদ সহজ বাঙ্গলা ভাষায় আরও অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে ঐ সকল পুস্তকের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চ।

প্যারীচাঁদের পরমভক্ত ক্ষণজন্মা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যের পরিচর্য্যার্থে ষোড়শোপচারে অনন্ত গৌরবময়ী বঙ্গভারতীর পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি স্বদেশানুরাগী মহাত্মা প্যারীচাঁদ-প্রদর্শিত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইতে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি সাধারণের বোধগম্য সহজ ও পরিমার্জ্জিত ভাষায় "বঙ্গদর্শন" প্রচারে বঙ্গসাহিত্যের পরিচর্য্যা ও পরিপুষ্টি সাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদের পরলোকগমনের কিছুকাল পরে তদীয় পুত্রগনের যত্ন ও উৎসাহে তৎপ্রণীত বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থাবলী ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একসঙ্গে পুনঃ মুদ্রিত হইয়া "লুপ্ত রত্নোদ্ধার" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যে সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদের কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রাণের ভাষায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য প্যারীচাঁদের নিকট

কি পরিমাণে ঋণী। উক্ত ভূমিকার কিয়ৎ অংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—"বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের এবং বাঙ্গলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।"..............."দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গলা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য ও সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করেন এবং তিনিই প্রথমে ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে।"......"প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কিন্তু বাঙ্গলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে প্যারীচাঁদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ; ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি এই যে তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সমগ্রী তত সুন্দর বোধ হয়না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গলা-দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।" ইহাই প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় কীর্ত্তি।"

প্যারীচাঁদ প্রচলিত সরলভাষায় যে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ক্ষণজন্মা স্বদেশানুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পরিমার্জ্জিত ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতা প্রভাবে পূর্ব্বপ্রচলিত বাগাড়ম্বরময় শ্রুতিকঠোর রচনাপ্রণালী পরিহার পূর্ব্বক সাধারণের বোধগম্য সরল ও উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা-প্রণালী অবলম্বনে প্যারীচাঁদের সহজ, প্রাঞ্জল, ও অলঙ্কারবিহীন রচনা-প্রণালীকে অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও মনোরম করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। প্যারীচাঁদ-সম্পাদিত "মাসিক পত্রের" ন্যায় তিনি এক "বঙ্গদর্শনের" সহায়তায় বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও সম্পদবর্দ্ধনের পথ বিশেষরূপে প্রসারিত করিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনে"

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব।

তিনি যেমন নানা বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিতেন, তাঁহার মন্ত্রশিষ্য-গণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা লেখকও তেমনই অনেক সুপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এক একখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এক একখানি উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। তিনি বাণীর বরপুত্রের ন্যায় প্রকৃতির রম্যকাননে যথেচ্ছ বিচরণে সদ্য-প্রস্ফুটিত বিবিধ সুরভি কুসুম চয়ন পূর্ব্বক বিস্তর মনোমুগ্ধকর মালা গাঁথিয়া প্রাণগত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

বিদেশীয়ের নিকট বঙ্গসাহিত্যের সম্মান

বিদেশীয় পাঠক-সমাজেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন গ্রন্থের বিশেষ আদর হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত টেন্ সাহেবের ন্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফ্রেজার সাহেব ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। সহৃদয় ফ্রেজার সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলীর সমালোচনাস্থলে বলিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাশ্চাত্য-ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও উহা সর্ব্বথা প্রাচ্যভাবাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র নববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টিকরী প্রতিভার অধীশ্বর।" ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিভাশালিনী শ্রীমতী নাইট ইংরাজী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত "বিষবৃক্ষের" অনুবাদ করেন। সুবিখ্যাত "Light of Asia" নামক গ্রন্থের সহৃদয় কবি এডউইন আরণল্ড্ সাহেব উক্ত অনুবাদগ্রন্থের যে একটী সুন্দর ভূমিকা লিখেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত প্রতিভাশালী; তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রাণগত উদ্দেশ্য বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতির যুগে বিপুল উৎকর্ষের সূচনা করিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকগণের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি।

"বঙ্গদর্শনের" ন্যায় "আর্য্যদর্শন" "বান্ধব," "ভারতী" ও "নব্যভারত" প্রভৃতি অনেকগুলি মাসিকপত্র উপযুক্ত ক্ষমতাশালী সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বিস্তর কল্যাণ সাধন করিয়াছে এবং এই সময় হইতে অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া স্থায়ীভাবে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের পরলোকগমনের পর প্রতিভাশালী মহাকবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, ও স্বনামধন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির জ্বলন্ত সাধনা ও উদ্ভাবনীশক্তি প্রভাবে বাঙ্গলা কাব্যের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সমধিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল মহাত্মা এবং ইঁহাদের সহযোগী ও অনুযাত্রী সাহিত্য-সেবিগণের আন্তরিক যত্ন ও সাধনা-প্রভাবে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের বিপুল

উন্নতির স্রোত তরতর প্রবাহে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অনেক সহৃদয় লেখক উহার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও গৌরববর্দ্ধন জন্য প্রকৃত সাধকের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

বিগত ৫০ বৎসরের সাহিত্য-চর্চ্চার ফল।

বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, উহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল ও বিশেষ আশাপ্রদ। উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সমুন্নতি সাধনে উহাকে সভ্যজগতে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ-সাহিত্যে পরিণত করিতে বর্ত্তমান যুগের সুশিক্ষিত সাহিত্য-সেবী মহাশয়গণ নিশ্চয় প্রকৃত সাধনায় দীক্ষিত হইবেন। যে দেশে সাধারণতঃ কোন গ্রন্থ শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত না হইলে তাহা বাজারে বিক্রয় হয় না, এবং সাধারণের উৎসাহ ও প্রবৃত্তির অভাবে যে দেশে অনেক সদ্‌গ্রন্থ অনাদরে উপেক্ষিত হয়, সেই হতভাগ্য দেশের বর্ত্তমান সরস্বতীর সেবকগণ মধ্যে অনেকের প্রাণগত যত্ন ও সাধনার বিষয় চিন্তা করিলে অন্তরে স্বভাবতঃ এই আশা জন্মে যে, তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে বাঙ্গালা-ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান সমস্ত অভাব ও দীনতা সত্বর নিবারিত হইবে। তাঁহাদের সহৃদয়তা ও কঠোর সাধনা-প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের গৌরবে দুঃখিনী বঙ্গ-জননী একদিন সমগ্র অবনীর ললাট-মণিরূপে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইবেন।

এতক্ষণ আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম অবস্থার সময় হইতে বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলাম, এক্ষণে আমরা উহার অভাব ও তন্নিবারণের উপায় পর্য্যালোচনা করিব।

বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তাহা নিবারণের উপায়।

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যা ব্যক্তিগতভাবে নিবদ্ধ ছিল। উহার উপাসকগণ আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভানুসারে উহার গঠন ও পরিপোষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যের গঠন কার্য্য ব্যক্তিগত প্রতিভা, একাগ্রতপূর্ণ ধ্যান, ধারণা ও উপযুক্ত সাধনার আয়ত্ত হইলেও উহার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয়, অভাব নিরূপণ ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত, সহৃদয় ও উদ্ভাবনীশক্তিশালী ব্যক্তির সমবেত যত্ন ও সহায়তার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রতিভাশালী সুলেখক ও সুদক্ষ সমালোচকগণের সমবেত চেষ্টায় যাহাতে সহজবোধ্য পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন, নূতন শব্দ সংগঠন অথবা

ভাষান্তর হইতে সহজ শব্দ গ্রহণ, ভাষার বিশুদ্ধি সংরক্ষণ, রচনার প্রণালী ও ভঙ্গিমার উৎকর্ষ-সাধন, সুরুচির সমর্থন পূর্ব্বক কদর্য্যভাব পরিবর্জ্জন এবং সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও উহার নানা বিভাগের প্রকৃত উন্নতি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে দীর্ঘকাল বিস্তর আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত অভাব নিবারণের উপায় নিদ্ধারণেও তাঁহারা বিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্যারিসের একাডেমি অফ্ লিটারেচার যে মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং যাহার দ্বারা ফরাসী ভাষার ও ফরাসী সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহার আদর্শে বঙ্গদেশে একটী সমিতি সংস্থাপনের আবশ্যকতা অনেক দিন হইতে তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ উল্লিখিত অভাবগুলি নিবারণোদ্দেশ্যে কতিপয় উৎসাহশীল সাহিত্যানুরাগী মহাশয়ের যত্ন, উদ্যোগও সহায়তায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শুভদিনে শুভক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য।

পরিষদের গত কয়েক বৎসরের চেষ্টা কোন কোন বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রচলিত শব্দের অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন, পুরাতন লুপ্তপ্রায় কোন কোন গ্রন্থের উদ্ধার ও প্রচার, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, সাহিত্যসেবী সুকৃতী সন্তানের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্য-সেবকগণের অনুরাগ ও সহানুভূতি আকর্ষণে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতা সংস্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভাব ও গৌরব বিস্তার, প্রভৃতি কার্য্য এই পনর বৎসরের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সাহিত্য পরিষদের গৌরবের বিষয়। পরিষদের কার্য্য এক্ষণে নানা বিভাগে বিভক্ত থাকিলেও উহার দ্বারা একাল পর্য্যন্ত অন্যান্য অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অতঃপর যাহাতে সর্ব্বাগ্রে পরিষদের প্রকৃতি (constitution) পরিচালন-পদ্ধতি ও ক্ষমতা সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে ও সন্তোষজনক রূপে নির্ণীত হয়, তৎপক্ষে সকলের যত্নবান হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃতি ও কার্য্যপরিচালন-পদ্ধতি দেশের অধিকাংশ সাহিত্য-সেবীর মত অনুসারে সন্তোষজনকরূপে স্থিরীকৃত হইলে যে যে বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা নিবারণের জন্য বিস্তর ক্ষমতাশালী লোকের সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। বলিতে কি, বাঙ্গলা সাহিত্যে কতিপয় নাটক,

উপন্যাস, কাব্য, খণ্ডকবিতা গ্রন্থ ও কয়েকখানি জীবনচরিত ভিন্ন উহার অন্যান্য বিভাগে একাল পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া উহার কলেবর পরিপুষ্ট হয় নাই। অতঃপর যাহাতে অসার পুস্তকের পরিবর্ত্তে মৌলিক চিন্তা-প্রসূত ও গবেষণাপূর্ণ প্রকৃত সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়নে উপযুক্ত কৃতবিদ্য সুলেখক-গণের মন আকৃষ্ট ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হয়, সাহিত্য পরিষদের ও উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শাখার উৎসাহশীল সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী সভ্যগণের তৎপক্ষে অন্তরের সহিত যত্নবান ও উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যাহাতে উপযুক্ত, ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শারীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি বিবিধ অত্যাবশ্যক ও পরম হিতকর বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উপযুক্ত ক্ষমতাশালী লেখকগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইয়া জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের পথ সম্যকরূপে প্রসারিত হয়, তৎপক্ষে সাহিত্য-পরিষদের এবং বিভিন্ন স্থানীয় সমস্ত সাহিত্য-সমিতির সম্মিলিত ভাবে একাগ্রতাপূর্ণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। যাহাতে অসার ও অশ্লীল পুস্তক প্রশ্রয় না পায়, এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে অদূরদর্শী লেখক-গণের স্বেচ্ছাচার নিবারিত এবং রচনার প্রণালী ও ভঙ্গিমা বিশুদ্ধ ও সুরুচি-সম্পন্ন হইয়া সাহিত্যের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়। এতদ্ভিন্ন যাহাতে উপযুক্ত সহজ শব্দ সংকলন ও যথাযোগ্য পারিভাষিক শব্দ সংগঠন অথবা ভাষান্তর হইতে সহজ কথা সংগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপক্ষে সকলের সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত অভাবগুলি নিবারিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও গৌরব শত শাখায় বিস্তৃত এবং বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন পূর্ণ বিকশিত হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব নিবারণের উপায়।

উল্লিখিত গুরুতর অভাবগুলি নিবারণের জন্য সাহিত্য-পরিষদের যেমন কঠোর সাধনার আবশ্যক, তেমনই বাঙ্গালা দেশের সহৃদয় ধনশালী মহাশয়গণের মুক্ত হস্তে সাহায্য দান প্রয়োজনীয়। এই মহা সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিতে হইলে বিস্তর মহাপ্রাণ ও মহাশক্তিশালী সাহিত্যসেবীর ধ্যান-রত কর্ম্মযোগীর ন্যায় সুসংযত ভাবে একাগ্রতা সহকারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংগঠনকার্য্যে ব্রতী হইয়া তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের যে সকল সৌভাগ্যশালী সুসন্তানের প্রতি মা-লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি

আছে, উল্লিখিত গুরুতর জাতীয় কার্য্য সংসাধন জন্য তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে অকাতরে অর্থসাহায্য দান পূর্ব্বক স্বজাতির কল্যাণ-সাধনে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে দুরবস্থাপন্ন অসহায় গ্রন্থকারগণের জন্য ভাবিতে হইবে। তাঁহাদের রচিত প্রকৃত সদ্‌গ্রন্থ যাহাতে জনসমাজে প্রচারিত হয় এবং উক্ত পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ অর্থে যাহাতে তাঁহাদের অভাব নিবারিত ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে ও তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কি উপায়ে যথার্থ প্রতিভা-শালী গ্রন্থকারগণের প্রকৃত সদ্‌গ্রন্থাবলি বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সুশিক্ষিত নরনারীগণের নিকট উপযুক্ত আদর লাভ করে এবং পাঠক-সংখ্যা যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি ধনশালী ও মধ্যবিত্ত মহাশয়গণের সমানভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মাণি ও ইটালি প্রভৃতি দেশের সাহিত্যের যে এত উন্নতি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট ব্যক্তিগত প্রতিভা ও যোগ্যতার যথাযোগ্য আদর ও শ্রদ্ধা আছে। তথাকার নরনারীগণের জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল যে, তথায় কোন সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তাহার কিছুকাল পরেই সংস্করণের পর সংস্করণে উহা সমস্ত দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ সকল সভ্যদেশে সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া কাহাকেও অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় না। আমাদের দেশে যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর লোকের অর্থব্যয়ে সদ্‌গ্রন্থ ক্রয় করিবার প্রবৃত্তি নাই!

নূতন শব্দ সংগঠন ও সংকলন।

বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টি ও প্রসার জন্য প্রত্যেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপযুক্ত শব্দ সংকলন ও সংগঠনে উহার পরিপুষ্টি সাধনে অনেকের আগ্রহ জন্মিলেও উক্ত কার্য্য এক্ষণে সুচারু-রূপে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধিত হইতেছে না। অনেক সময় অনেকে নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন কথার অবতারণার আবশ্যকতা বোধ করেন। তৎকালে ধীর ভাবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সাব-ধানে নূতন সহজ শব্দ সংকলন বা সংগঠনে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। হিন্দী, পারসী, উর্দ্দু, মৈথিলী, মহারাষ্ট্রীয় উড়িয়া ভাষার যে সকল সহজ সহজ কথা বা শব্দ দীর্ঘকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে এবং যে সকল কথার দ্বারা মনের ভাব সহজে সুন্দর রূপে প্রকাশ করা যায়, সেই সকল কথা সতর্কতার সহিত বাছিয়া লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় যোগদান করিলে উহার বিশেষ লাভ হইতে পারে। কিছুদিন হইতে নূতন শব্দ গঠন, অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার ও

ভাষান্তর হইতে শব্দ সংগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় সংযোজন উপলক্ষ্যে বিস্তর মতভেদ চলিতেছে। কেহ কেহ কোন নিয়মের বাঁধাবাঁধি না মানিয়া যদৃচ্ছা-ক্রমে শব্দ সৃজন ও সঙ্কলনে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। কেহ বা খাঁটি বাঙ্গালা কথায় সাহিত্য সংগঠনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া চিরপ্রচলিত সহজ, শ্রুতিমধুর ও সাধারণের বোধগম্য সংস্কৃতমূলক শব্দকে সযত্নে পরিহার পূর্ব্বক চলিত কথায় এবং আবশ্যকতা বোধে গ্রাম্যকথা মিশ্রিত ইতর ভাষায় প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পূর্ণ করিবার পক্ষপাতী। ভাষা সহজবোধ্য ও স্বচ্ছন্দ-বিহারী হউক, ইহা সকলেরই ইচ্ছা ; কিন্তু ভাষাকে সহজ ও সুখবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যে যথেচ্ছাচার প্রদর্শন কাহারও অনুমোদনীয় হইতে পারে না। ভাষার অঙ্গপুষ্টি জন্য নূতন কথা গঠনের অথবা ভাষান্তর হইতে অপ্রচলিত শব্দ সংগ্রহ করার আবশ্যকতা বোধ হইলে যাহাতে ঐ সকল কথা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরিগৃহীত হয়, চলিত সহজ ভাষার সহিত ইতর ভাষার কথা মিশিয়া ভাষার রসভঙ্গ অঙ্গবিকৃত বা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট না হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেক সহৃদয় লেখকের সর্ব্বদা সতর্কতাপূর্ণ দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রার্থনীয়। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী না হইলেও উহা দীর্ঘকাল বাঙ্গালা ভাষাকে ধাত্রীর ন্যায় পোষণ করিয়াছে, তাহা মনে রাখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরপ্রচলিত সহজ, সরল, সুকোমল, শ্রুতিমধুর সংস্কৃত শব্দগুলিকে সযত্নে ও সাদরে স্থান দিতে হইবে। তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে বর্জ্জন করিলে চলিবে না। দেশের অধি-কাংশ সুশিক্ষিত লোকের মত উপেক্ষা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে জোর করিয়া কোন নূতন শব্দ বা কথা চালাইতে চেষ্টা করিলে তাহা অল্পদিনের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে পরগাছার ন্যায় স্থান পাইয়া সাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতি অভাবে আপনা-আপনি আসনচ্যুত ও অদৃশ্য হইবে।

এই বিরাট সম্মিলনের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় মহাশয় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শনে" "নূতন কথা গড়া" এবং বাঙ্গলা ভাষা শীর্ষক যে দুইটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ উদার মত জানা যাইবে। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ও উপদেশ আদরের সহিত গৃহীত হইবার উপযুক্ত, কারণ বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গলা ভাষার আদি ও প্রকৃতি অভিজ্ঞ ও উহার গতি-পর্য্যবেক্ষণশীল সুনিপুণ লেখক অতি অল্পই আছেন। ১২৮৮ সালের বঙ্গদর্শনে উক্ত প্রবন্ধ

দুইটী প্রকাশিত হইয়াছিল। উপযুক্ত শব্দ সংগঠন ও প্রচলন পক্ষে যাহাতে সকলের সতর্কতাপূর্ণ দৃষ্টি থাকে, রচনা-প্রণালীর ভঙ্গিমা সর্ব্বতোভাবে পরিমার্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন হয় এবং যাহাতে সাহিত্যে লেখকের যথেচ্ছাচার নিবারিত হয়, এই সময় হইতে সকলের সম্মিলিত ভাবে তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ ও সতর্কতা প্রদর্শন একান্ত প্রার্থনীয়।

ব্যাকরণের অনুশাসন মান্য করিয়া সাহিত্য সংগঠনের আবশ্যকতা

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন ক্ষমতাশালী লেখক ব্যাকরণের অনুশাসন না মানিয়া যথেচ্ছভাবে প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা হয় ত মনে করেন যে, রচনার স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলে ব্যাকরণের চিরপ্রচলিত নিয়মের বাঁধাবাঁধি না মানিলে ভাষার কোন অঙ্গ হানি হয় না। ওরূপ স্থলে ব্যাকরণ তাঁহাদের রচনার প্রণালী অনুসারে তাহার সূত্র সংশোধন করিয়া লইবে! স্থলবিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে ব্যাকরণের কড়া নিয়ম না মানিলে ভাষার কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু সাধারণভাবে ব্যাকরণের নিয়ম অমান্য করিয়া চলিলে ওরূপ স্বেচ্ছাচারের ফল কখনই শুভজনক হইবে না। ভাষার বিশুদ্ধতা ও গৌরব রক্ষার জন্য ব্যাকরণকে মানিতেই হইবে। বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রণ প্রতিষ্ঠার পর একাল পর্য্যন্ত যাহা অবাধে চলিয়া আসিতেছে স্বেচ্ছাচার প্রদর্শনে তাহা অমান্য ররিয়া ভাষার মূল প্রকৃতি ও প্রণালীকে বিশৃঙ্খল ও শিথিল করিবার কাহারও অধিকার নাই।

কাব্য-রচনায় স্বাধীন কল্পনা ও মৌলিক ভাব।

কাব্যগ্রন্থ এবং পদ্য-প্রবন্ধ প্রণয়নে যাহাতে রচয়িতার অনুকরণের প্রবৃত্তি শিথিল হইয়া কবির হৃদয়-জাত স্বাধীন কল্পনা এবং তাঁহার অন্তরনিহিত স্বাভাবিক ভাবনিচয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে রচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তৎপ্রতি সহৃদয় লেখকের সর্ব্বক্ষণ অনুরাগ-পূর্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। প্রাতঃস্মরণীয় কবি-গুরু বাল্মীকি যখন মহাকাব্য রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও অনুকরণ ক রন নাই; অথবা মহাপ্রাণ হোমার যখন বীররসে উন্মাদিত হইয়া মেঘ-মন্দ্রে বীরগাথা গান করিয়া জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, তখন তিনিও কাহারও নিকট হইতে কিছুই ধার করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই প্রকৃতির সযত্ন-প্রতিপালিত সরল কবির ন্যায় গভীরভাবে বিভোর হইয়া একমনে একপ্রাণে আপন আপন অন্তর্নিহিত অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দানে অমরতা লাভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালাদেশের অনেক খ্যাতনামা মহাকবির

সেরূপ সুকৃতি নাই। তাঁহারা প্রকৃতির সদা-উন্মুক্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণ ভরিয়া বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহ না করিয়া প্রাচীন কবিসম্প্রদায় এবং বিদেশীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাশালী কবিগণের সঙ্কীর্ণ ভাণ্ডার হইতে ভাব সঞ্চয় করিয়া বঙ্গ-ভারতীর শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অনুকরণের মাত্রা, যেন কিছু বাড়িয়া চলিয়াছে, উহাতে সাহিত্যের অনেক পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে।

উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ণ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ-গণের উদাসীনতা।

দীর্ঘকাল হইতে বাঙ্গলাদেশের বিদ্যালয়সমূহে যে সকল পুস্তক পাঠ্য-পুস্তক রূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে বিস্তর অসার পুস্তক বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির পরিবর্ত্তে অনিষ্ট সাধন করিতেছে। যেদিন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্য অনুশীলনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই শুভদিনে অযুত নরনারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ-গণের সহৃদয়তাকে এই বলিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছেন যে, এতদিনের পর বাঙ্গলা-সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় মহাশয়গণের যত্ন ও উৎসাহে কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে বাঙ্গলা সাহিত্য অধ্যয়নের নিয়ম প্রচলনে উহার উন্নতির পথ প্রসারিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকের উদাসীনতায় আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ হইতেছে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের-পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন কমিটির (টেক্সট্ বুক কমিটির) বিস্তর সভ্য ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরুর ন্যায় অনেক ভক্ত অনুচর-বর্গের প্রতিপালন ও উৎসাহবর্দ্ধন জন্য তাঁহাদের লিখিত রাশি রাশি ব্যাকরণ-দুষ্ট ও আবর্জ্জনাপূর্ণ অপদার্থ পুস্তক পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলনের অনুমোদন না করিলে এতদিন উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের অভাব নিবারিত হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির পথ সম্যক্‌রূপে প্রসারিত হইত। এখন আর কোন গ্রন্থকারকে মহা-শক্তিশালী বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার কষাঘাতকে ভয় করিয়া চলিতে হয় না। হিতবাদীর পরলোকগত পরিহাস-নিপুণ সুযোগ্য সম্পাদক কাব্যবিশারদের বেত্রাঘাতেরও ভয় নাই; অন্যান্য মাসিক পত্র ও সংবাদপত্রের শক্তিশালী সম্পাদকগণ অপ্রিয় কার্য্যসাধনে নিশ্চেষ্ট। এজন্য বিস্তর অসার ও অপদার্থ পুস্তক অবাধে শিক্ষা-বিভাগে প্রচলিত হইয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছে। এবিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহৃদয় স্বদেশানুরাগী কর্তৃপক্ষ মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে বাঙ্গলা-সাহিত্যের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির পথে বিঘ্নের আশঙ্কা

কিছুকাল হইতে বাঙ্গলার মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষার গঠন সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যাইতেছে। একদল সুশিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গলা-ভাষা যেভাবে গঠিত হইতেছে ও হইয়াছে তাহার পক্ষপাতী। আর একদল উহাকে সাধারণ মুসলমান-সমাজের উপযোগী করিয়া গঠনের জন্য যত্নবান। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর প্রবীণ, সুবিজ্ঞ ও সহৃদয়, তাঁহারা কোনরূপ ভেদনীতির অনুমোদন করেন না। তাঁহারা জানেন যে, বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও উভয়েই এক দেশ-জননীর সন্তান। হিন্দু ও মুসলমান একদেশের জল বায়ু ও ফলশস্যে পরিপুষ্ট, এক প্রকৃতিতে পরিগঠিত এবং এক-দেশ-জননীর স্নেহে প্রতিপালিত। উভয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও ভাষাগত কোন প্রভেদ নাই। বাঙ্গলা বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও মাতৃভাষা। বঙ্গ-বিভাগের পর হইতে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে পরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্ত্তে আরবী, পারসী, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষার বিস্তর চলিত শব্দও মুসলমানী ঢং পরিপূর্ণ এক মিশ্রভাষা প্রচলনের বিশেষ উদ্যোগ চলিয়াছিল। ভারত ভূমির ভাগ্য-বিধাতৃগণের, বিশেষতঃ উহার বর্ত্তমান সহৃদয় ও মহানুভব প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিং মহোদয়ের বিশেষ যত্নে বঙ্গ-বিভাগ রহিত না হইলে এতদিন পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে একটী নূতন ধরণের বিকৃত বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত হইত। অর্দ্ধ-বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ব্যামফিল্ড্ ফুলার মহাশয়ের শাসনকালে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে উক্ত মিশ্র কদর্য্য বাঙ্গলা ভাষার সূচনা ও হইয়াছিল। কিছুকাল হইতে ঢাকায় একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইলে তথায় এবং পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশে যাহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গলা-ভাষা অক্ষুন্নভাবে প্রচলিত থাকে এবং তথাকার বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক যাহাতে চির-প্রচলিত পরিমার্জ্জিত সরল বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনীতভাবে আবেদন প্রেরণ উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। কতিপয় সুশিক্ষিত ও সহৃদয় মুসলমান উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাঙ্গলা-ভাষা লইয়া যে মতভেদ ও বিরোধের আশঙ্কা ছিল, এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। আনন্দের বিষয় এই যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত মুন্সি আবদুল করিম ও নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ বাঙ্গলা-সাহিত্যানুরাগী মুসলমানগণ বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান প্রণালীর কোন-

রূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া আরবী, পারসী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা হইতে যথাসম্ভব উপযুক্ত সহজ শব্দ বাছিয়া লইয়া বাঙ্গলা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের প্রস্তাব করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ শব্দ-সংকলনের চেষ্টা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষাগত কোন পার্থক্য বা ভাবের আদান প্রদান লইয়া কোন মতভেদ বা বিরোধ আপনা হইতেই দূরে যাইবে। হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত উল্লিখিত কল্পিত বিরোধ দূরীকরণ জন্য এই সময় হইতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মুসলমান সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কৃতবিদ্য বাঙ্গলা-সাহিত্যানুরাগী লোক সাহিত্য-পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলে তাঁহাদের সহানুভূতিপূর্ণ যত্নে বাঙ্গলা-ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন সম্বন্ধীয় কল্পিত বিরোধের আশঙ্কা সহজেই নিবারিত হইতে পারে।

মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তকের আবশ্যকতা।

বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে কতিপয় প্রতিভাশালী লেখকের রচিত কিছু কিছু কাব্য, উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙ্গলা-সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি সাধিত হইলেও এখনও উহার প্রকৃত উন্নতির দিন উপস্থিত হয় নাই। উহাতে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ প্রকৃত হিতকর গ্রন্থের একান্ত অভাব রহিয়াছে। যাহাতে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যনীতি, ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি প্রভৃতি অশেষ কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধীয় প্রকৃত চিন্তা, আলোচনা, ও অনুসন্ধানপূর্ণ উপযুক্ত সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নে উহার প্রকৃত উন্নতি সাধনে দেশের কৃতবিদ্য ক্ষমতাশালী লেখকগণের মন আকৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ের সুব্যবস্থা অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে মৌলিক চিন্তা-প্রসূত এবং প্রকৃত আলোচনাপূর্ণ উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ, পুরস্কার ঘোষণা হইলে বিস্তর ফল লাভের আশা করা যাইতে পারে। পরিষৎ হইতে মাঝে মাঝে বিস্তর অর্থব্যয়ে অনেক প্রাচীন পুঁথি ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থ ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। অপাততঃ ঐ সকল পুঁথি ও গ্রন্থের অনুবাদ করিবার উপযুক্ত লোকাভাব। যে দুই এক-জন ক্ষমতাশালী লোক আছেন, তাঁহারাও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, সুতরাং তাঁহা-দেরও সময়াভাব। এরূপ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহার্থে অর্থব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মৌলিক আলোচনা ও অনুসন্ধান-পূর্ণ উপযুক্ত গ্রন্থ প্রচারে বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রকৃত মহৎ অভাব নিবারণের উপায় বিহিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যতদিন ঐ সকল পরম হিতকর বিষয়ে

গ্রন্থ রচনার উপযুক্ত লেখকের অভাব থাকিবে, ততদিন ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মাণি প্রভৃতি ভাষার প্রধান প্রধান সুবিখ্যাত পুস্তক অনুবাদের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন অনুবাদে কোন বিশেষ ফল লাভ করা যায় না; উহাতে স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীনভাবের উন্মেষ না হইয়া অনুকরণের প্রকৃতিই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একথা সর্ব্বথা সুসঙ্গত নহে। মূল গ্রন্থ হইতে নিপুণতার সহিত উপযুক্তরূপে অনুবাদ করিতে পারিলে এবং তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইলে তদ্দ্বারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতির পথ নিঃসন্দেহ কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত হইতে পারে। সকল সভ্য দেশেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের সুপ্রসিদ্ধ হিতকর গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। জর্ম্মাণি ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষার মূল গ্রন্থ অনুবাদ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। অনুবাদের অনুবাদ অথবা অনুবাদের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে মূল গ্রন্থের প্রকৃত সার বিষয় ও সৌন্দর্য্য বিকশিত হইবে না। সুতরাং এরূপ অনুবাদে আশানুরূপ সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভাষান্তর হইতে উপযুক্ত গ্রন্থানুবাদের আবশ্যকতা।

জাতীয় সাহিত্যের উল্লিখিত গুরুতর অভাবগুলি মোচন করিতে হইলে দেশের সহৃদয় ধনশালী মহাশয়গণের যথাসাধ্য অর্থসাহায্য ও উৎসাহদান সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অর্থ ভিন্ন জগতের কোন অত্যাবশ্যক মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। এতদিন গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে নানা বিষয়ে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য দান করিয়া দেশের অনেক অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এক্ষণে আমাদের দেশের লোকের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত। জাতীয় সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনে জাতীয় জীবনের পূর্ণবিকাশ-কল্পে জন্মভূমির সৌভাগ্যশালী ধনবান ব্যক্তিগণের ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক মুক্তহস্তে দান যে পরিমাণে আবশ্যক, দেশের মধ্যবিত্ত ও দীন সরস্বতী-সেবকগণের সেই পরিমাণে একাগ্রতাপূর্ণ কঠোর সাধনা প্রার্থনীয়। কে বলে লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর চির-বিরোধ? প্রকৃত সাধনার পথে এই অসার ভক্তিহীন কথা নিতান্তই অবিশ্বাসযোগ্য। আমরা চিরকল্যাণময়ী সারদার পবিত্র পূজার মন্দিরে চিরদিন অনন্ত গৌরবময়ী কমলার প্রীতিপূর্ণ প্রসন্ন দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া অনেক সময় একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। এই বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-

স্বদেশানুরাগী ধনশালী মহাশয়গণের সহায়তা।

সমিতির যিনি সম্মানিত সভাপতি, যাঁহার প্রাণগত যত্ন, উৎসাহ, সহৃদয়তা এবং মুক্তহস্তে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় জন্য মাতৃপূজার এই বিপুল আয়োজন দেবতাগণের আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছে, তাঁহার প্রতি মা-লক্ষ্মী ও মা-সরস্বতীর স্নেহ-দৃষ্টি সমান ভাবে বিদ্যমান আছে। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম ভক্ত এবং উহার প্রকৃত পরিচর্য্যা-পরায়ণ। যিনি তাঁহার লিখিত সুপাঠ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও গীতি-কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মনস্বিতা সহৃদয়তা ও স্বদেশানুরাগের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া একান্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাশিমবাজারের মাননীয় সহৃদয় মহারাজা, স্বনামধন্যা পুণ্যবতী রাণী ভবানীর সুযোগ্য বংশধর নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মগণের এবং সাহিত্য-পরিষদের অন্যান্য ধনশালী পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণের স্বদেশভক্তি ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা কে না জানেন? ইঁহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানের কোন কোন সুশিক্ষিত ধনশালী মহাশয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতির চিরগৌরব বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচর্য্যা ও পরিপোষণে ব্রতী হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় নহে। সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিচালিত হইলে জাতীয় মহৎ কার্য্যে কখনই অর্থাভাব হইবে না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন আর সে অবস্থা নাই। এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় দেশের সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই জাতীয় অভাব ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন; অনেকের অন্তরে উক্ত অভাব নিবারণের বাসনা ও প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। সুবাতাস বহিতেছে, সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপায় সাহিত্যসেবিগণের প্রাণের আকুল পিপাসা উপযুক্ত সময়ে নিশ্চয় নিবারিত হইবে। যে দেশের পরলোকগত সুসন্তান স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয় স্বদেশবাসিগণের বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁহার স্বকৃতোপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ অকাতরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে প্রদান করিয়া স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে অমরতা লাভ করিয়াছেন—এবং তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক জন্মভূমির অন্যতর সুসন্তান শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় উচ্চ শিক্ষার জন্য

স্বীয় পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থের বিস্তর অংশ মুক্তহস্তে দান করিয়া স্বজাতি-প্রেমের পরিচয় দান করিয়াছেন, সে দেশের জাতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কখনই দীর্ঘকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। উল্লিখিত মহাত্মগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে মাতৃভূমির কোন কোন ক্ষমতাশালী সুসন্তান জাতীয় সাহিত্যের কোন কোন বিভাগের বিশেষ অভাব মোচনে অগ্রসর হইবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা দেশের ধনশালী মহাশয়গণ কতদিকে কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকেন। জাতীয় জীবনের উন্নতিকর বিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিলে তাঁহাদের অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইবে।

উপসংহার

তাঁহাদের সহায়তায় মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল হইলে তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ সভ্যজগতে গৌরবান্বিত হইবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধনশালী সুসন্তানগণের যত্ন ও উদ্যোগে গত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গলা সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজনে এই যে সম্মিলিত ভাবে বিপুল সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হইয়াছে, পরম করুণাময় বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদে অচিরে উহার শুভফল জন্মিবে। আজি যদি কোন অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী মহাত্মা প্যারীচাঁদ ও মহাপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগত মুক্ত-আত্মা ক্ষণকালের জন্য দিব্যধাম হইতে অবতরণপূর্ব্বক এই সুবিশাল সাহিত্য-সম্মিলন ক্ষেত্রের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সঞ্চরণে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সম্মিলিত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর উৎসাহ ও জ্বলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ সাধনা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহা ভাবিয়া বিপুল আনন্দে অভিভূত হইবেন যে, তাঁহারা যে মহাসাধনা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া মহ-প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের পথ অবলম্বনে শত শত সুশিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী স্বদেশবাসী পরমাত্মাদেবের অপূর্ব্ব বিধানে কিরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁহাদের স্বস্তিবাচনে এই বিরাট্ সাহিত্য-সম্মিলনের মঙ্গলময় মহৎ উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হইবে। সমবেত স্বদেশানুরাগী মহাশয়গণ, মাতৃপূজার আজিকার এই পুণ্যময় পবিত্র মন্দিরে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার চরণে আমাদের হৃদয় লুটাইয়া বিনীতভাবে একাগ্রতাপূর্ণ ভক্তিভরে এক মনে এক প্রাণে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদের প্রাণের আকুল বাসনা পূর্ণ করুন। এই জাতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষিত হউক। তাঁহার অনুগ্রহে আমরা ক্ষতিলাভ গণনায় বিমুখ হইয়া প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায়

সুসংযত ভাবে পরস্পরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ অন্তরে একাগ্রচিত্তে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি আমাদের পবিত্রকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের জাতীয় জীবন অচিরে পূর্ণ-বিকশিত হইবে। যিনি সকল উন্নতির নিদান ও নিয়ন্তা, তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার পবিত্র চরণে আমাদের সকলের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অসংখ্য প্রণাম। *

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

# সাকীর প্রতি।

ওগো সাকী, ওগো প্রিয় আরো দাও ভরি
আমার হৃদয়পাত্র প্রেম-মদিরায়।
এখনো রয়েছে বাকি ;—পরিপূর্ণ করি
আরো ঢালো, আরো ঢালো, কানায় কানায়।
আকণ্ঠ করিব পান ; রাখিব না বাকি
কণামাত্র ;—দাও দাও পিয়াও অমৃত।
আমারে বঞ্চিত করি রাখিও না সাকী!
লুব্ধ প্রাণ,—পাত্রে চাহি বড়ই তৃষিত।
ওগো সাকী! এজগতে তব প্রেমসুধা,
করিয়া তুলেছে মোরে উন্মত্ত অধীর।
প্রত্যেক চুম্বন দানে বাড়িতেছে ক্ষুধা,—
ভাসিছে নয়নপরে স্বপন মদির।
ওগো প্রিয়! সত্য কহি,—বড় তৃষাতুর
চিরদিন এ হৃদয়, কর তৃষা দূর।

শ্রীমৃন্ময়ী দেবী।

* বর্দ্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

# স্বর্ণকার।

হরিচরণ কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু সরস্বতী দেবী যখন তাহাকে অর্থাগমের কোন উপায় বলিয়া দিলেন না, তখন সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে পিতার জীর্ণ ব্যবসায়টির উন্নতি হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে উদ্যত হইল।

একটি বিপুল অশ্বত্থগাছের ছায়ায় ছোট একটি কুটীর; এইটিই দুর্গাচরণ স্বর্ণকারের কারখানা। স্বর্ণকারের মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস এই কুটীর বন্ধ ছিল। একদিন সকালে হঠাৎ গ্রামবাসীরা শুনিল তাহার ভিতর হইতে হাতুড়ীর ঠক্ ঠক্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। সকলে আসিয়া দেখিল—হরিচরণ লেখাপড়া ছাড়িয়া পৈতৃক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছে। পাড়ার নন্দখুড়ো হুঁকা হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, বলিল "এইতো ঠিক, আজকাল কি লেখাপড়ায় কিছু হয়—কলিকাতায় কত বি, এ, এম, এ রাস্তায় গড়াগড়ি যাইতেছে।"

হরিচরণ কথা কহিল না। সে স্বভাবতঃ অল্পভাষী ছিল, তাহার উপর এতগুলা লোক তাহার নিকট জমিয়াছে দেখিয়া সে একটু সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, কেননা বেশী লোকের কাছে মাথা তুলিয়া নিঃসঙ্কোচে কথা কওয়ার অভ্যাস তখনও তাহার হয় নাই।

ভিড় সরিয়া গেলে হরিচরণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে দিন কাটিয়া গেল, পরদিন গ্রামের লোকেরা যখন সকলেই জানিতে পারিল—হরিচরণ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তখন দুর্গাচরণের পুরাতন খরিদ্দারগণ একে একে তাহার কারখানায় যাওয়া-আসা আরম্ভ করিল। হরিচরণ ক্রমশঃ সকলের সঙ্গে দু চারিটা কথা কহিতে শিখিল, তবুও কিন্তু তাহার 'বোকা' নামটি ঘুচিল না।

সকলেই বলিত সে বোকা, সে কথা কহিতে পারে না; পাড়ার ছেলেরাও কখনও কখনও তাহার দ্বারে উঁকি মারিত, কখনও তাহার ছাতা বা গামছাটি লইয়া সরিয়া পড়িত। হরিচরণ যখন তাহার অপহৃত জিনিসটির জন্য এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না।

হরিচরণের কারখানায় একজন সহকারী ছিল, তাহার নাম বিশু। আর একজন কারখানায় দিনের মধ্যে অনেকটা সময় কাটাইয়া দিত, সে পাড়ার একটি মেয়ে, নাম শচী।

শচীর বয়স বারো তেরো বৎসর। মেয়েটি বড়ই শান্ত, মুখে কথাটি নাই; সে

বোধ হয় তাহাদের গ্রামের মধ্যে হরিচরণের মত আর একটি সঙ্গী খুঁজিয়া পায় নাই।

স্ত্রীলোক দেখিলে হরিচরণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িত। সে মনে করিত এই জাতিটি নির্ব্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানবিহীন, অথচ তাহাদের অহংকারের সীমা নাই। সামান্য ঘরসংসারের কাজ ইহারা কোনমতে সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধা করে না। তাহাদের অন্তরটা কিরূপ বোঝা দায়, মানুষে যে অবস্থায় যাহা ভাবে, ইহারা সে অবস্থায় তাহা ভাবে না। যাই হোক্ এজন্য হরিচরণকে বড় কষ্ট পাইতে হয় নাই। এই জাতির একটা দোষ তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল, সে দোষ তাহাদের হাসি।

এই হাসি একদিন তাহাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়াছিল। সেদিন পাড়ার তাঁতি-বৌ হরিচরণের নিকট হইতে একটি নাকছাবি কিনিতে আসিয়া চলিয়া যায়। হরিচরণ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া যে নাকছাবিটি তৈরী করিয়াছিল তাহাই তাঁতি-বৌএর হাতে দিয়া ভাবিয়াছিল সে বিস্তর প্রশংসা লাভ করিবে। কিন্তু তাঁতি-বৌ নাকছাবি দেখিয়া এমন একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিল যে, হরিচরণ সে আঘাতটা কোন মতেই ভুলিতে পারে না।

আজ তাঁতি-বৌএর আদেশমত নূতন নাকছাবি গড়িয়া হরিচরণ ত্রস্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। আজ যদি আবার সেই হাসি উত্থিত হয়, তাহা হইলে সে মরমে মরিয়া যাইবে। তাঁতি-বৌ প্রায়ই ঘাটে যাওয়া-আসা করে; মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়াও থাকে; তাহার দৃষ্টি তীব্র, যেন গাত্রে বিদ্ধ হয়; তাহার বিদ্রূপ অন্তরে অগ্নিসঞ্চার করে। এই সব কথা বসিয়া বসিয়া হরিচরণ ভাবিতেছে, এমন সময় তাঁতি-বৌ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

আসিয়াই সে হাসিল, বলিল "হাঁ গা, কই?" হরিচরণ ভাবিতেছিল—এইবার তাহার লাঞ্ছিত হইবার পালা।

সে প্রার্থিত বস্তুটি খুঁজিতে খুঁজিতে মনে করিল—সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, অথচ একটা নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের নিকট লাঞ্ছিত হইবে কেন? হাজার হোক, সেত তাঁতি-বৌএর চেয়ে বুদ্ধিমান।

এমন সময় তাঁতি-বৌ শচীকে দেখিয়া বলিল "এই যে, হাবা মেয়ে, তুই এখানে কেন লো, নিজের মত সঙ্গী পেয়েছিস্ বুঝি?"

চী কথা কহিল না, কিন্তু হরিচরণের মুখ লজ্জা ও অপমানে আরক্ত হইয়া

উঠিল। ভয়ে ভয়ে নিতান্ত অপরাধীটির মত কম্পিত হস্তে সে নাকছাবিটি তাঁতি বৌএর হাতে দিল।

তাঁতি-বৌ বলিল "এবার মন্দ হয় নি, তবে বাবু তোমার বাপের মত কাজ তুমি করিতে পার না।"

হরিচরণ চুপ করিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, সে ভাবিল মাগী চলিয়া গেলেই বাঁচি।

তাঁতি-বৌ আঁচল হইতে নাকছাবির দাম বাহির করিয়া হরিচরণের হাতে দিতে গেল, কিন্তু হরিচরণ তখন আড়ষ্ট। তাঁতি-বৌ বলিল "কি গো, দামটা নেবে না নাকি?"

হরিচরণ হাত পাতিল, ব্যস্ততার জন্য তাহার হাত হইতে হাতুড়ি পড়িয়া যাওয়ায় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রক্তাক্ত হইল।

তাঁতি বৌ বলিল "আঃ কি হাবা মানুষ বাবু তুমি।"

হরিচরণ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, আর একটা দরজা দিয়া কুটীরের পশ্চাৎদিকে চলিয়া গেল। তাঁতি-বৌ হাসিয়া উঠিল, হরিচরণের কাণে সে হাসির শব্দ প্রবেশ করিল। হরিচরণ ভাবিল—পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।

তাঁতি-বৌ চলিয়া গেলে হরিচরণ ধীরে ধীরে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কেহ নাই; সহকারী বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁতি-বৌ যে পথে চলিয়া যাইতেছে সেই পথের দিকে চাহিয়া আছে। হরিচরণ একবার সেই দিকে চাহিল, তারপর একটু সাহস পাইয়া ঘরে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল।

শচী চুপটি করিয়া একপাশে বসিয়াছিল, এতক্ষণ সে হরিচরণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হরিচরণ এই বার তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "শচী, নাকছাবিটা কি খারাপ হইয়াছে?"

শচী ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না—ও মাগীর কিছুই পছন্দ হয় না—ও বড় ঝগড়া করে।"

হরিচরণের মুখ প্রসন্ন হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকার সামান্য কয়টি কথা তাহার হৃদয়ের সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার কালিমা মুছিয়া দিল। অন্যে হয়ত কোন বিষয়ে শচীর মতামত গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু আজ হইতে হরিচরণ মনে করিল—তাহার নির্ম্মিত গহণা সম্বন্ধে শচীর মতামতের একটা দাম আছে।

আজ হইতে সে যে গহণা তৈরী করিত, তাহা শচীকে দেখাইতে ভুলিত না। শচী যেটিকে ভাল বলিত সেইটিই সে নিঃসঙ্কোচে পরকে দেখাইতে পারিত।

শচী কে, হরিচরণের সহিত তাহার সম্পর্কই বা কি, সে কথার উত্তর না দিলেও চলে, কেননা দুজনের মধ্যে কেহ কোন দিন সেই পরিচয় কি সম্পর্কটুকুর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই। একটি অবসন্ন অপরাহ্নে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে গা ধুইয়া আসিবার সময় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শচী হরিচরণের কারখানার নিকটে আসিয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল—সেই দিনই তাহার মনে হইয়াছিল, সে প্রত্যহ এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে; বাড়ীতে বসিয়া যে সময়টা সে খেলায় কাটাইয়া দেয়, সেই সময়টা এই খানেই অতিবাহিত করিবে। আর হরিচরণ—সেও খুব সহজেই বুঝিয়াছিল—এই বালিকাটিকে সঙ্গী করিতে পারিলে তাহার অনেক দুঃখ ঘুচিয়া যায়।

হরিচরণ ও শচীর মধ্যে যে একটা প্রণয় ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত দাম্পত্য-প্রণয়ের কোন সাদৃশ্য ছিল কি না বলিতে পারি না। কেহ কাহাকেও প্রণয় সম্ভাষণ করিত না, কিন্তু দুজনের গতিবিধি, দুজনের মৌনভাব ও ওষ্ঠপ্রান্তের অনতিস্ফুট হাসিটুকুতে প্রণয়-সম্ভাষণ অপেক্ষা অনেক বেশী কথাই প্রকাশ পাইত।

প্রভাত হইতে-না-হইতেই হরিচরণ কারখানার দ্বার খুলিয়া আপনার কাজে মনোনিবেশ করিত। সূর্য্যালোক দূরে দীর্ঘ তালগাছগুলির উপর দিয়া পুষ্করিণীর জল স্বর্ণাভায় মণ্ডিত করিয়া যখন কুটীরের চৌকাঠ স্পর্শ করিত, তখন হরিচরণ মাঝে মাঝে সম্মুখের অপ্রশস্ত পথটির পানে চাহিয়া দেখিত। তারপর তাহার সমস্ত ব্যগ্রতা, সমস্ত ব্যাকুলতা বিলুপ্ত করিয়া যখন একটি বালিকা ধীরপদে তাহার কুটীরপানে চলিয়া আসিত, তখন সে আবার একমনে আপনার কাজে তন্ময় হইয়া পড়িত।

শচী বসিয়া থাকিত। কখন-কখন দুএকটি বালিকাসুলভ প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। তারপর বেলা যখন বাড়িয়া উঠিত, পাড়ার লোকেরা যে যাহার আফিসে চলিয়া যাইত, স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি সমাপন করিয়া গৃহস্থালীর একবেলার কাজ শেষ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তখন শচী কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইত। তারপর অপরাহ্নে সূর্য্যালোক যখন ম্লান আভা ধারণ করিত, নন্দখুড়ো যখন কাঁধে গামছা ফেলিয়া একহাতে ছিপ ও আর এক হাতে একখানি চৌকী লইয়া মাছ ধরিবার জন্য ধীরে ধীরে পুকুরপাড়ে

আসিয়া বসিত, তখন শচী আবার হরিচরণের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইত।

পিতামাতা হরিচরণের বিবাহ দেয় নাই। বিবাহের কথাটা হরিচরণও কখন ভাল করিয়া ভাবিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যৌবনের দীপ্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার অন্তর তখনও বাল্যে। বিবাহ জিনিসটা কি, তখনও সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। নির্জ্জন পথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন তাঁতি-বৌ ঘোমটার আড়াল হইতে তাহার মুখের উপর তির্য্যক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিত, তখন সে মাটির দিকে ব্যাকুলভাবে না চাহিয়া স্থির হইতে পারিত না। সে জানিত—বিবাহ করিলে একটি স্ত্রীলোকের সহিত একত্র থাকিতে হয়। এই জ্ঞানটুকু হরিচরণকে সতর্ক করিয়াছিল। পৃথিবীতে সে রমণী অপেক্ষা কোন ভয়াবহ জীব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত না।

সে নিজেও বিবাহ করিতে চেষ্টা করিল না। পৃথিবীর মধ্যে এখন সে কাহাকেও ভাল বাসে একথা বলা কঠিন। মা পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, পিতাও মৃত। পিতামাতার প্রতি যে ভালবাসা তাহার অন্তরে সঞ্চিত ছিল, সহসা তাহা অবলম্বনহীন হইয়া একটি কোন পাত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পাত্র মিলিল - সে শচী।

একদিন হরিচরণ প্রভাতে শচীকে দেখিতে পাইল না। সে দিন সে কোন কাজ করিতে পারে নাই। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই সে বাহিরে আসিয়া পথ পানে চাহিয়াছে। আবার নিরাশ হইয়া আপনার কাজে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেদিন দ্বিপ্রহরের সময় শূন্য কারখানায় বসিয়া বাতাসের উদাসকরা হু হু শব্দ শুনিতে শুনিতে সে এমন অনেক কথা মনে করিয়াছিল, এমন অনেক অভাবের বেদনা তাহার অন্তরকে আঘাত দিয়াছিল, যাহা জন্মের পর হইতে সে এতদিন শুনিতে বা অনুভব করিতে পারে নাই, যাহা শুনিবার বা অনুভব করিবার সম্ভাবনাও তাহার বুদ্ধির অতীত হইয়াছিল।

পরদিন শচী যখন সসঙ্কোচে অপরাধিনীর মত হরিচরণের কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন হরিচরণ বলিল "শচী, কাল আসিস্ নাই কেন?" শচী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সে কোন কৃত অপরাধের জন্য অবনত-মস্তকে তিরস্কার সহিতে প্রস্তুত।

হরিচরণ বলিল "আমি তোমাকে বকিতে চাহি না, তুমি আস নাই কেন আমাকে বল, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

শচী বলিল "কাল মা আমায় বকিয়াছে, বলিয়াছে—তুমি বাহিরে যাইতে পারিবে না।"

হরিচরণ বলিল "কেন?"

এমন সময় সহসা বাহিরে চুড়ির ঠং ঠাং শব্দ শোনা গেল। হরিচরণ দেখিল তাঁতি-বৌ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হরিচরণ শিহরিয়া উঠিল, বলিল "এঁ্যা তুমি? তুমি কেন?"

তাঁতি-বৌ "এই তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

নিকটেই শচীকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল "পোড়ামুখী, দুদিন পরে তোমার বিয়ে, আজ তুমি এখানে আড্ডা দিচ্ছ?"

হরিচরণ সাহস করিয়া দু একটি কথা কহিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তাঁতি-বৌএর কথা শুনিয়া হঠাৎ নির্ব্বাক হইয়া গেল।

তাঁতি-বৌ বলিল "তোমাকে কতকগুলি গহনা তৈরী করিয়া দিতে হইবে।"

এই বলিয়া সে কিরূপ গহনা নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহারই বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল।

কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তাঁতি-বৌ যখন শচীকে ডাকিয়া বলিল "আয় পোড়া-মুখী আমার সঙ্গে" তখন হরিচরণ যেন কাহাকেও সম্বোধন না করিয়াই বলিল "গহণা কার?"

তাঁতি-বৌ বলিল "তোমার একটা সম্বন্ধ দেখিয়াছি,—তোমারই বউএর গহনা।"

হরিচরণ আর কথা কহিতে পারিল না।

সহকারী বলিল "ঘটকীর ব্যবসা কবে হতে আরম্ভ করিলে?"

তাঁতি-বৌ বলিল "যাদের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেনা, তাদেরই বিবাহে ঘটকালী করা সবে আরম্ভ করিয়াছি।"

এমন সময় হরিচরণ বাধা দিয়া ম্লানমুখে আবার বলিল "গহনা কি শচীর? বিবাহ কি তার?"

তাঁতি-বৌ বলিল "বলিলাম তোমার বৌএর, শচীর কেমন করিয়া হইল, শচীকে মনে ধরিয়াছে নাকি?"

হরিচরণ বিব্রত হইয়া পড়িল, তাঁতি-বৌএর ঠাট্টা তামাসা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রাণ প্রশ্ন করিয়া উঠিল "গহনা কি শচীর ?" কিন্তু সে একটিও কথা কহিতে পারিল না।

তাঁতি-বৌ চলিয়া গেল। শচীও তাহার অনুগামী হইল।

হরিচরণ কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ফিরিয়া দেখাইল—সে কাজে ব্যস্ত আছে। কিন্তু তাহার মন সত্য সত্যই কোনও কাজে:ব্যাপৃত ছিল না। পাড়ার লোকেরা একে একে পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। কুণ্ডুদের মেয়েরা সকলের শেষে স্নান করিতে আসে। তাহারাও স্নান শেষ করিয়া চলিয়া গেল। আহার শেষ করিয়া হরিচরণ যে ঘুঘুটির একঘেয়ে সুর শুনিতে শুনিতে তন্দ্রা-বিষ্ট হইত, সেও আজ ডাকিয়া উঠিল, তবুও হরিচরণ স্নানের আয়োজন করিল না।

সহকারী চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পুষ্করিণীর পার দিয়া সে শচীদের বাড়ীর সন্ধানে যাত্রা করিল। যখন সে শচীদের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইল, তখনও সে কি করিতেছে ও কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। সে অনেকক্ষণ এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর বাড়ীর দ্বারের নিকট ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি বাহিরে আসিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া হরিচরণ সরিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিয়াছিল ঝিকে দু একথা কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার মুখ ফুটিল না। কিছুক্ষণ পরে ঝি যখন পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তখন হরিচরণ ভাঙ্গা-গলায় নিতান্ত নির্ব্বোধ অপরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ গা তোমাদের বাড়ী বিবাহ কার ?"

ঝি বলিল "বড়কর্ত্তার ছোট মেয়ে শচীর।"

ঝি চলিয়া গেল। হরিচরণ অনেকক্ষণ ধরিয়া বাড়ীটির আশে পাশে পায়-চারি করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর; সূর্য্যের কিরণজালে পুষ্করিণীর জল গলিত কাঞ্চনের মত ঝক্ মক্ করিয়া উঠিতেছে; নিস্তব্ধ মধ্যদিনে নীল নির্ম্মেঘ আকাশের নীচে ছোট গ্রামখানি পূর্ণযৌবনের প্রভায় মণ্ডিত। পুষ্করিণীর জলটুকুও সতেজ, সজীব—সর্ব্বত্র প্রাণের স্পন্দন। রৌদ্র উজ্জ্বল, বায়ুর বিরাম নাই, বৃক্ষশ্রেণীর সবুজ পত্রগুচ্ছে কে যেন স্নেহধারা ঢালিয়া দিয়াছে। কাণ পাতিয়া থাকিলে মৌমাছিদের গুঞ্জরণ কি একটা মাদক তানে প্রাণমন মাতাইয়া তোলে;

কত বর্ণের পতঙ্গ, কত বর্ণের প্রজাপতি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে দৃশ্য-ভূভাগটি যেন একটা উৎসব-গৃহ—কেবল যাহাকে লইয়া উৎসব সে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। হরিচরণ এই সময় কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সুদূর দিগন্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছিল। আজ তাহার আহারাদি ভাল হয় নাই, নিতান্ত রুক্ষবেশে দীন প্রপীড়িতের মত সে আজ বহুদিনের সঞ্চিত বেদনার ভার এই মৌনমুগ্ধ মেদিনীর নির্ম্মম আনন্দের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিয়া ধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া সর্ব্ব অভিলাষ, সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব কল্পনার অচিরোদ্গত অনতিদৃঢ় সৌধস্তম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চাহিল। ফলে কিছুই হইল না, বুকের ভিতর তীব্র হাহাকার কেবলি গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

রমণীর প্রতি হরিচরণ বিতৃষ্ণ হইলেও প্রকৃতিদেবী তাঁহার প্রাপ্যটুকু নিঃশেষে আদায় করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই। হতভাগ্য এতদিন বুঝিতে পারে নাই—সে আপনার অলক্ষ্যে কোন্ দিন তাহার প্রাণমন আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে।

একদিন সে দেখিল তাঁতি-বৌ কতকগুলি স্ত্রীলোকের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিয়া শচীকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া চলিয়া গেল। দুই দিন পরে কে একজন অপরিচিত নিমেষের দৃষ্টিতে সুপরিচিত হইয়া শচীকে সহগামিনী করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইল না, সংসার সমাজ জাতি নিঃসঙ্কোচে তাহা অনুমোদন করিল।

বরকন্যার গাড়ী তাহারই কুটীরের পার দিয়া চলিয়া গেল। সে গুম্ হইয়া ভিতরে বসিয়া রহিল, একবারও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল না।

কয়দিন কাটিল। হরিচরণ নিঃসঙ্গ হইয়াই তাহার কাজে মনোনিবেশ করিল। যে সময় শচী তাহার কুটীরে আসিত, সেই সময়টা কেবল সে তাহার চাঞ্চল্য দমন করিয়া রাখিতে পারিত না; সময়ে সময়ে কুটীরের চারিদিকে চাহিয়া একটা নিদারুণ অভাব, একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিত।

একদিন তাঁতি-বৌ দ্রুতপদে তাহার কুটীরে আসিয়া বলিল "হাঁ গা, তুমি যে গহনা দিয়াছ, তাহা কাহারও পছন্দ হয় নাই, তুমি আবার ভাল করিয়া তৈয়ারী কর।" এই বলিয়া হরিচরণ শচীর জন্য যে গহনাগুলি তৈরী করিয়াছিল, তাহা ফেরত দিল, কি ধরণে তৈরী করিতে হইবে, সে বিষয়েও উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

হরিচরণ দৃঢ়চিত্তে বসিয়া রহিল, আজ তাঁতি-বৌকে দেখিয়া অন্তরে একটুও ভয়, লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করিল না। তাঁতি-বৌ চলিয়া গেল।

সূর্য্য মাথার উপর জ্বলিতে লাগিল, আজ তাহার উত্তাপ বড় উগ্র, বড় প্রখর। সেদিন দ্বিপ্রহরে হরিচরণ এই সূর্য্যের তীব্র তেজ ভিন্ন আর কিছুই দেখিল না, আর কিছুই অনুভব করিল না। আজ চারিদিকে রুদ্র উত্তাপ, অন্তরের মধ্যেও দারুণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত সম্মুখে শচীর গহনার বাক্স খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

তাঁতি-বৌএর কথাটা তাহার কাণে তখনও বাজিতেছিল—তুমি যে গহণা দিয়াছ, তাহা কাহারও পছন্দ হয় নাই। কাহার পছন্দ হয় নাই? বরের? পাড়াপড়সীর? না শচীর? আমার সব গহণাই তো সে পছন্দ করে।

তারপর তাহার মনে হইল—সে ছেলে মানুষ, শুধু ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সে কুটীরে আসিয়া আমার কাজ দেখিত। তখন সে পরের গহনাসম্বন্ধে যে মত বিচারবিহীন হইয়াই প্রকাশ করিত, আজ নিজের গহণাসম্বন্ধে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। এ ত স্বাভাবিক।"

কিন্তু হায়, স্বভাবের কাজটাও হরিচরণের কাছে ইচ্ছাকৃত নির্য্যাতনের মত বোধ হইতে লাগিল।

অপরাহ্নে কতকগুলি মেঘের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস চতুর্দ্দিক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। হরিচরণ ধীরে ধীরে গহণার বাক্সটি লইয়া তাঁতি-বৌয়ের গৃহদ্বারে আঘাত করিল, আর কোন দিন সে সাহস করিয়া এত বড় কাজটা করিতে পারে নাই।

তাঁতি-বৌ দ্বার খুলিয়া মাথার কাপড় টানিতে-টানিতে বাহিরে আসিল, হরিচরণ তাহার হাতে গহণার বাক্সটি দিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "গহণা নির্ম্মাণ করার দাম আমি এখনও পাই নাই, আমি সে দাম লইব না, গহণা আর কেহ তৈয়ারী করিয়া দিক্।"

তাঁতি-বৌ একগাল হাসিয়া বলিল "কেন গো? অভিমান কিসের?"

হরিচরণ তখন দশ হাত দূরে চলিয়া গিয়াছে।

রাত নয়টায় হরিচরণ প্রতিদিন বাড়ী ফিরিয়া আসে, সে দিন কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে দশটার সময় বাড়ী আসিল। আসিয়া শুনিল বৈকালে শচী তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল, ছদিন হইল সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে, আবার কাল শশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে।

হঠাৎ গহনা ফেরত দিবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। হরিচরণ ভাবিল—শচীর সহিত তাহার দেখা হয় নাই ভালই লইয়াছে। তাহার সহিত এতদিনের পরিচয় সেদিনকার বিবাহরাত্রে সংসার, সমাজ ও জাতির নিকটে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আর তাহা দাবী করিবার সাহসও অন্যায়, বিবাহের পর গহণা ফেরত দিয়া সে ভাল করিয়াই এ কথা জানাইয়া দিয়াছে।

হরিচরণ চটিল শচীর উপর, সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও সমাজ তাহার নিকট বিষময় হইয়া উঠিল। সে একদিন পাড়ার ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণকে লোভী স্বার্থপর বলিয়া গালাগালি দিল, সামাজিক রীতিনীতির উপর জাতক্রোধ হইয়া দাঁড়াইল, অন্নপূর্ণা পূজার দিন একখানি প্রতিমার নিকটেও প্রণত হইল না।

দেবদ্বিজ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন কি না জানি না, তবে ভাগ্যদেবতা যে এই সময় হইতে তাহাকে বরপুত্র করিয়া লইলেন, সে বিষয়ে গ্রামের অনেক লোকই সাক্ষ্য দিবে। হরিচরণের আয় বাড়িল, কাগজে কাগজে তাহার কারখানার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। দুই বৎসরের মধ্যে সে দোতলা বাড়ীর ভিত্তি গঠন করিবার আয়োজন করিল। নূতন করিয়া কারখানা গড়িবার কথা হইল, কিন্তু নন্দখুড়া বাধা দিয়া বলিলেন—"তাহা হইতে পারে না, এ কুটীরের পয় আছে, ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তোমার ভাল হইবে না।"

যাই হোক, হরিচরণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বড়লোক হইয়া দাঁড়াইল। বিধাতা-পুরুষ লেখকেরই মত এই বিশ্বনাট্যের অনেক পাত্রপাত্রীর অবস্থা নিমেষের মধ্যেই পরিবর্ত্তন করেন।

সে অতীতের সব স্মৃতি জোর করিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিল—কতকটা রাগে, কতকটা ঘৃণায়। ব্যবসায়ে সে তাহার সমগ্র শক্তি, সমগ্র চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োগ করিয়া আপনাকে এতই অন্যমনস্ক করিয়া ফেলিল, যে পৃথিবীর স্নেহ, মায়া প্রেম কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। মানুষের প্রতি তাহার একটুও শ্রদ্ধা রহিল না। বিবাহের কথা তাহাকে অনেকে বলিত, কিন্তু তাহার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করে নাই।

তারপর গ্রামের সকলেই যে যাহার দুঃখসুখ লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তাঁতি-বৌ কিছু চঞ্চল ছিল, কালক্রমে সেও একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল, গ্রামে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়া পুরাতন শ্রী একটু একটু করিয়া লোপ করিতে লাগিল; যেখানে মাঠ ছিল সেখানে বাড়ী উঠিল, যেখানে আম, জাম, লিচু ফলিয়া পাড়ার

ছেলেদের দিনরাত প্রলোভিত করিত, সেখানে একদল ধোপা দুপুর বেলা হিস্ হিস্ করিয়া কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

অদূরে কানা নদী; নদীটা স্বল্পতোয়া হইলেও বর্ষাকালে তাহার উপদ্রব বড় কম ছিল না। বৎসরে বৎসরে বর্ষার পর, গ্রামের লোকেরা বলে, এই নদীটা নানা রকমের রোগের বীজ ছাড়াইয়া দেয়। নদীর দোষ হোক্ আর নাই হোক, গ্রামের বৃদ্ধলোকগুলা যে প্রতি বৎসর একে একে বটতলার শ্মশানে শেষশয্যা বিছাইয়া লইল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সেকালের স্মৃতি জাগাইবার জন্য রহিল কেবল নন্দখুড়া, তাঁতি-বৌ, হরিচরণ, আর তাহার কুটীর।

হরিচরণ এখনও মাঝে মাঝে কুটীরের মধ্যে আসিয়া বসে, তবে বেশী দিনই তাহাকে কাজের সন্ধানে বাহিরে যাইতে হয়। কর্ম্মচারীরাই সেখানে কাজ করে। একটি কুটীরে সব কাজ হইয়া উঠে না বলিয়া পাশেই আর একটি কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে।

হরিচরণ এখন আর পূর্ব্বের মত নয়। তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সে মুখচোরা নয়, সকলের সহিত এখন সে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে। সে স্বাধীন, দৃপ্ত, বলিষ্ট, কর্ম্মকুশল। এখন সে বড় কাহারও কথা মানিয়া চলে না; লোকে তাহাকে অন্তরে হয়ত এক আধটা গালাগালি দিতে পারে, কিন্তু কোথাও সে গালাগালি প্রকাশ করিতে সাহস করে না।

একদিন রবিবার হরিচরণের হাতে কোন কাজ নাই। সে ধীরে ধীরে আহারাদির পর পুরাতন কারখানার কুটীরে পুরাতন খাটটির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনটা সে দিন ভাল ছিল না। সে সুবিধা-দরে কিছু মাল কিনিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে—কিন্তু ঘরে টাকা নাই। পাঁচ হাজার টাকা পাইলে সে বিপুল অর্থের অধিকারী হইতে পারে।

সেদিন কাটিয়া গিয়াছে। ইদানীং হরিচরণ চিনিয়াছে কেবল টাকা। পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া, মানুষের সকল কোমল বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়া সে কেবল অর্থকেই মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। তারপর অধিক সুদে টাকা ধার দিয়া, অধমর্ণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সে আয় বর্দ্ধিত করিতে শিখিয়াছে। এখন সে অর্থের জন্য দয়া মায়া স্নেহ প্রেম সবই বিসর্জ্জন করিতে একটুও কুণ্ঠিত নয়।

খাটে শয়ন করিয়া সে ভাবিল—কোন্ উপায়ে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তখন দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বলতায় চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। দূরে পুষ্করিণীর পারে বাঁশগাছের উপর দু একটা ডা'ক পাখী মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিয়া বহুদিন পূর্ব্বের কতকটা স্মৃতি তাহার অন্তরে অস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল।

এমন সময় তাঁতি-বৌ কুটীরের দ্বারে দাড়াইল, তারপর বসিল, বলিল, "শচী আজ বাপের বাড়ী আসিয়াছে"।

হরিচরণ চমকিয়া উঠিল, বলিল "কখন ?"

তাঁতি-বৌ বলিল "আজ সকালে।"

হরিচরণ বলিল "যাক্ সে কথা, তাঁতি-বৌ, পাঁচ হাজার টাকা আমায় যোগাড় করিয়া দিতে পার ?"

তাঁতি বৌ ভাবিতে লাগিল। এখন সে হরিচরণের নিকট প্রায়ই যাওয়া আসা করে।

হরিচরণ ভাবিল, শচী আসিয়াছে—আসুক্—তাহাতে আমার যায় আসে কি ?

অপরাহ্ণে পুষ্করিণীর পানাগুলি একপাশে সরিয়া গিয়াছিল, ঘাটের স্বচ্ছ অনাবৃত জল বাতাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় হরিচরণ কুটীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল—একটি রমণী ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে আসিতেছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত, কপালে সিন্দুর-বিন্দু নাই, সে বিধবা।

হরিচরণ তাহাকে চিনিল—সে শচী; বহুকাল পরে আজ তাহার সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইল।

হরিচরণ ভাবিল, শচী আসিয়াছে—আসুক্—আমার তাহাতে যায় আসে কি ?

সন্ধ্যার সময় তাঁতি-বৌ আসিয়া বলিল "দেখ শচী বহুদিন বিধবা হইয়াছে।" তাহার স্বামীর কিছু টাকা তাহার নিকট আছে। তুমি বলিলে হয়ত সে দিতে পারে।"

হরিচরণ বলিল "আমি তাহার কে ? আমি বলিলে সে দিবে কেন ?"

তাঁতি-বৌ বলিল "কেন? বিবাহের পূর্ব্ব দিনও যে সে তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারে নাই। মনে আছে সে কথা?"

হরিচরণ বলিল "আমার মনে আছে, কিন্তু তাহার মনে নাই, বিবাহের পর তাহার সহিত আমার সব পরিচয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

তাঁতি বউ বলিল "তা কি হয়?"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল "তোমরা মেয়েমানুষ, বোঝ না।"

তাঁতি-বৌ হাসিয়া বলিল "মেয়েমানুষের কথা মেয়ে মানুষেই বেশী বোঝে, তুমি শচীকে বলিয়া দেখিও। আমি তাহাকে সন্ধ্যার পর ডাকিয়া আনিব।"

হরিচরণ চুপ করিয়া ভাবিল—তবে কি তাহার সহিত আমার পরিচয় অক্ষুণ্ণই আছে। তাঁতি-বৌ চলিয়া গেল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, হরিচরণ জানিতে পারে নাই; সে কতকগুলা ভাবনায় বিভোর হইয়াছিল। সে ভাবনা বর্ত্তমানের বা টাকাকড়ির নয়—তাহা অতীত জীবনের।

পুকুরঘাট হইতে যখন শেষ মানুষটি চলিয়া গেল, গলির মোড়ে মিউনিসিপ্যালিটির আলোটি যখন মসীময় হইয়া উঠিল, তখন হরিচরণ সহসা চমকিয়া দেখিল তাঁতি-বৌ দাঁড়াইয়া আছে।

হরিচরণ বলিল "খবর কি?" তাঁতি বউ বলিল "শচী আসিয়াছে?"

হরিচরণ বলিল "কোথায়? বাড়ীতে না এখানে?"

তাঁতি-বৌ বলিল "এইখানে।"

হরিচরণ শিহরিয়া উঠিল, তারপর বলিল "এস, এস, ভিতরে আসিতে বল।"

তাঁতি-বৌএর সঙ্গে সঙ্গে শচী ভিতরে প্রবেশ করিল, সেই পুরাতন খাটটির উপর বহুকাল পরে উপবেশন করিল।

তাঁতি-বৌ বলিল, "আমি সব কথা শচীকে বলিয়াছি; শচী টাকা দিবে বলিয়াছে।"

এই সময় আকাশটা আরও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল; একটা মত্ত বাতাস সহসা বিকট তাণ্ডবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। শচী বলিল, "তাঁতি-বৌ মেঘ করিয়াছে, বাড়ী যাইব; আমার যা কথা তাহাত বলিয়াছি।"

তাঁতি বউ বলিল, "বৃষ্টি আসিতে দেরী আছে; একটু বোস্; না হয় বৃষ্টি ধরিয়া গেলেই যাইবি?

শচী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুদিন পূর্ব্বের একটি দণ্ড আজ হরি-

চরণের অন্তরে দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিল। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। মেঘ ও বিদ্যুত প্রতি মুহূর্ত্তে সকলকে চমকিত করিতে লাগিল।

শচীর মুখে কথা নাই; হরিচরণ ও নীরব। তাঁতি-বৌ ও তাহার বাচালতা কেমন করিয়া ত্যাগ করিল বলা যায় না। তবে সে শীঘ্রই বুঝিল—শচীকে এভাবে এখানে আনা ভাল হয় নাই। হরিচরণের প্রতি তাহার একটু স্নেহদৃষ্টি ছিল, সেই জন্য সে দুটি প্রাণীর এই নিভৃত মিলনটুকু সহিতে পারিল না। হরিচরণের একটু উপকার করিতে আসিয়া সে আপনাকেই তাহার প্রিয় করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল; ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিল; কেহ নড়িতে চাহিল না। বিশ্বপ্রকৃতি নিঃসহায়-ভাবে কয়জনকে একটি কক্ষে বিচিত্র অবস্থায় বন্দী করিয়া ফেলিয়াছিল; চলিয়া যাইবার কথাটাও কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না। এইবার তাঁতি বৌ কথা কহিতে উদ্যত হইল।

একটু দূরে পুকুরের পাশেই হরিচরণের নূতন কারখানা সেখানে আলো জ্বলিতেছিল; এই বার আলোক নিভিল, ভৃত্য ভিজিতে ভিজিতে চাবী বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

এই কুটীর হইতে একটু দূরেই একটা খাদ; এই স্থান হইতে মাটী তুলিয়া নূতন কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাদে জলে জমিল; বেঙগুলা ভীষণ কলরব করিতে আরম্ভ করিল।

ঘড়িতে দশটা বজিল; তখন বৃষ্টির বেগ একটু .কমিয়াছে। তাঁতি-বৌ বলিল "এইবার আমরা যাই।"

হরিচরণ বলিল, দেখিও খাদটা দেখিয়া যাইও, পথ ভুলিয়া যেন তাহাতে পড়িয়া যাইও না।"

তাঁতি-বৌ শচীকে লইয়া গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইল। হরিচরণ দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল কতক্ষণে তাহারা খাদটা পার হইয়া যায়।

পরদিন হরিচরণ তাঁতি-বৌএর সঙ্গে শচীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল—গৃহে কেহই নাই, কেবল শচীর বৃদ্ধা মাতা রন্ধন করিতেছে। হরিচরণকে দেখিয়া সে বলিল "এস বাবা এস, কতদিন আস নাই। আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ কি?"

হরিচরণ বলিল "না মা, কাজে ব্যস্ত, সেই জন্য বড় যাওয়া আসা করিতে পারি না।"

এমন সময় শচী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। হরিচরণ দেখিল তাহার মুখে একটুও সঙ্কোচ, একটুও লজ্জার রেখা নাই। হরিচরণ বলিল, "শচী, আমাকে এবার বিদায় কর।"

শচী পাঁচখানি নম্বরী নোট হরিচরণের হাতে দিয়া বলিল, "মাকে যেন বলিও না।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া হরিচরণ শচীর হাতে একখানি হ্যাণ্ডনোট সই করিয়া দিল

শচী তাহা গ্রহণ করিল, দেখিল, তারপর সেখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

হরিচরণ বলিল "করিলে কি ?"

শচী উত্তর দিতে পারিল না, শুধু একবার হাসিয়া সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। এই হাসিটুকু হরিচরণের প্রাণে বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল।

রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে হরিচরণ ভাবিল—"পৃথিবীর মানুষ দেবতার অংশ—হায়রে, পৃথিবীকে যে ঘৃণা করে তাহার মত নরাধম আর নাই।"

পরদিন সে শয্যা হইতে উঠিয়া পথের উপর এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল, ভৃত্যকে আদেশ না করিয়া সে নিজেই তামাক সাজিল।

মানুষের ভালবাসা আজ তাহার অন্তরের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আনিয়া দিল। মনে হইল—একদিনে তাহার জীবন সমস্ত অভ্যাস, সমস্ত ধারণা তুচ্ছ করিয়া একটা নূতন পথ অবলম্বন করিবে।

স্নানের পূর্ব্বে সে শচীর গৃহে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। শচী নিকটে আসিতেই হরিচরণ বলিল "শচী, আমার প্রতি তোমার কি একটুও স্নেহ বিবাহের পর ছিল ?"

শচী বলিল, "কেন থাকিবে না ?"

"তবে তুমি আমার গহনা ফেরত দিয়াছিলে কেন ?"

"আমি ত ফেরত দিই নাই, ফেরত দিয়াছিল—আমার শাশুড়ী।"

হরিচরণ আর কথা কহিতে পারিল না, উন্মত্তের মত সে গৃহত্যাগ করিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হরিচরণ তাহার পুরাতন কারখানায় আসিয়া বসিল। তখনও আকাশে মেঘ থম্ থম্ করিতেছে—সে যেন বর্ষণের জন্য আকুল। পুকুরের এক প্রান্তে একটা বক আহারের প্রত্যাশায় এক পা তুলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। দূরে আমগাছে বাঁধা একটা গাভী সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছে—কি তাহার ভাবনা কে জানে। আকাশে একটা চিল চীৎকার করিতে করিতে চক্রগতিতে ঊর্দ্ধ পানে চলিয়াছে—কেন, কোথায়, কে বলিবে। আর কুটীরের মধ্যে হরিচরণও মাথায় একরাশি চিন্তা লইয়া ছট ফট্ করিতেছে—সে চিন্তা কি, তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলিবার তাহারও সাধ্য নাই। হরিচরণ খাটের উপর শুইয়া পড়িল, বালিসে মুখ লুকাইয়া নির্জ্জন কুটীরে সে সশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "পৃথিবীর মানুষ তুমি দেবতা, পৃথিবীর স্ত্রী তুমি দেবী।"

এমন সময় ভীষণ শব্দে কুটীরের দ্বার খুলিয়া শচীর মা ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল, বলিল, "আমার মেয়ের পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা খাইয়াছ, এখনই বাহির করিয়া দাও।

হরিচণ উঠিয়া বসিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত সঞ্চারিত হইতেছিল। চীৎকারে এখনই পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিবে, মান সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইবে মনে করিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি দৃঢ়স্বরে বলিল "চুপ কর, আমি টাকা দিব।"

শচীর মার সুর একটু কমিল, সে বলিল "দাও বাবা, আমরা গরীব মানুষ, মেয়েটা বড় বোকা।"

হরিচরণ বলিল "আমি তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছি, আইনে বলে তাহারই হাতে টাকা দেওয়া উচিত; তাহাকেআজ সন্ধ্যার পর পাঠাইয়া দিও।"

শচীর মা গর্‌গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অন্তর আবার ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল, আবার সে বলিল, "মানুষ পশু, মানুষজাতিটাই অধম।"

হরিচরণ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তাহার হাতে টাকা নাই, সে সবই খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। আজ টাকা ফেরত না দিলে তাহার অপমানের সীমা থাকিবে না।

একবার মনে হইল—শচী আসুক্—তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে হয়ত তাহার মা দিনকতক থাকিতে পারে।

হরিচরণ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আকাশের মেঘ আবার ঘনীভূত হইতে লাগিল। আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি, চারিদিক জলে ডুবিয়া গেল।

রাত্রি নয়টার পর শচী একা আসিয়া হরিচরণের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

হরিচ... ......... .. ..হার দিকে চাহিয়া বলিল "কেন?"

"তোমায় টাকা দিয়াছি—মা জানিতে পারিয়াছেন।"

"কে বলিল?"

"তাঁতি-বৌ।"

হরিচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হা তাঁতি-বৌ, তোমার মনে এই ছিল। হা মানুষ—মানুষ—মানুষ।" হরিচরণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শচী বলিল, "আচ্ছা, তুমি টাকার চেষ্টা কর, আমি আজ মাকে বুঝাইতে চেষ্টা করি।"

বাহিরে কড়্ কড়্ করিয়া বজ্রাঘাত হইল। শচী বলিল "আমি চলিলাম।"

হরিচরণ শুনিল—শচী জল ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জল ঠেলার শব্দ কমিয়া আসিল, তার পর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে তাহা অভিভূত হইয়া গেল। হরিচরণ ভাবিল—হায় মানুষ—মানুষ—মানুষ।

একবার সে দরজার সম্মুখে আসিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—বিদ্যুতালোকে দেখিল—দূরে রমণীমূর্ত্তি টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতেছে। হরিচরণ ভাবিল—হায়, তাঁতি-বৌ তুমি কি করিলে।

কপালে করাঘাত করিয়া আবার সে ভাবিল "শুধু তাঁতি-বৌ নয়, শচীও আমাকে টাকা দিয়া ভয় পাইয়াছে, আমাকে অবিশ্বাস করিতেছে। তাই সে নিজে টাকা চাহিতে আসিয়াছিল।"

মানুষের বিপক্ষে যত যুক্তি থাকিতে পারে হরিচরণের মাথায় অগ্নিশিখার মত সব একে একে জ্বলিয়া উঠিল। মানুষকে ঘৃণা করিয়া এক সময়ে সে তাহার অতীত জীবনের নিবিড় বেদনা-রাশি স্তম্ভিত করিয়াছে, আজ কিন্তু সেই ঘৃণাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়া সে উদ্‌ভ্রান্ত হইল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

সহসা দূর হইতে রমণীর আর্ত্ত চীৎকার বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া হরিচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল। হরিচরণ লাফাইয়া উঠিল। শচীকে ত খাদের কথাটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় নাই!

আবার সেই ধ্বনি! হরিচরণের মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। পায়ের

অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া সে দাঁড়াইল—যেন সে এখনই নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া যাইবে।

আবার সেই ধ্বনি! হরিচরণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভাবিল মুহূর্ত্তকাল কাটিয়া যাক—মানুষ—ঋণ—অপমান—শব্দটা থামুক্—তারপর যাহা হইবার হইবে। তবুও হরিচরণ একবার বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—কে যেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

আর শব্দ শোনা গেল না। ক্ষণেকের জন্য সে অচেতনের মত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে ছুটিয়া গেল।

তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আকাশের খণ্ডচাঁদ একটা রুক্ষ অগ্নিপিণ্ডের মত পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে সঞ্চিত জলরাশির উপর তাহার প্রতিবিম্ব কাঁপিয়া উঠিতেছে। উদ্দাম আকাশ, সিক্ত পৃথিবী; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছায়ালোক হরিচরণের সম্মুখে জীর্ণ ধ্বংসপ্রায় পৃথিবীর প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিল।

খাদের উচ্ছল জলরাশি ছল ছল করিয়া উঠিল। তারপর তাহার চঞ্চলতা থামিয়া গেল। হরিচরণ আর উঠিল না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# কালিকা রূপ।

প্রলয়-মেঘের কান্তি,
অঞ্জনাদ্রি-রূপ-ভ্রান্তি,
চতুর্ভুজা—দিগম্বরা,—মুক্ত কেশ-পাশ;
করালবদনা ঘোরা,
পীনোন্নত-পয়োধরা,
কটিতটে করকাঞ্চী—শ্মশানে নিবাস;
গলে দোলে মুণ্ডমালা,
শশী-সূর্য্য-বহ্নি-জ্বালা
ত্রিনেত্রে,—ললাটে শোভে অর্দ্ধচন্দ্র ভাস,
স্মেরাননে হাস।

মহাকাল—বক্ষে-ক্রীড়া,
নগ্নমূর্ত্তি—নাহি ব্রীড়া,
প্রকৃতি ও পুরুষের—প্রকট—বিহার!
ছিন্ন শির বাম করে,
অন্য বামে খড়্গ ধরে,
দক্ষিণে অভয়-বর দিতেছে আবার।
এক সৃষ্টি—আর নাশ,
প্রকৃতির কি বিলাস,
নিশ্চেষ্ট পড়িয়া কাল শবের আকার—
স্তব্ধ-গতি তার!

দয়া আছে—দয়া নাই,
প্রকৃতির লীলা তাই,
জন্ম মৃত্যু লয়ে খেলা,—নাহি দুঃখ-সুখ;
যারে করে স্তন্যদান,
তারি রক্ত করে পান!
শিশু-শব কর্ণে দোলে—রক্তলিপ্ত মুখ!
চরণে দলিত শিব—
দেখিয়া শিহরে জীব,
ডাকে—মাতা, দয়াময়ি,—ভয়ে কাঁপে বুক,
বিশ্ব মৌনী—মূক।
তারেই জননীরূপে,
পূজি গন্ধ-দীপ-ধূপে,
দেখি তারি পদে শিব—মঙ্গল-নিদান!
মৃত্যুময়ী—মৃত্যুহরা,
শব-বক্ষে নৃত্যপরা,
বরাভয়-ভুজে তার বরাভয়-দান।
মা, বলি' মরণে ডাকি,
মরণের কোলে থাকি,
দেখি জন্মমৃত্যুলীলা—সূতিকা-শ্মশান,
ভয়হীন প্রাণ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

# শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্য

( ২ )

The size of this city I do n t write her, because it cannot all be se n from any one spot, but I climbed a hill when I would see a great part of it;...........what I saw from thence seemed to me as large as Rome, and very beautiful to the sight .......The people in this city are countless in number.........I do not wish to write it down for fear it should be thought fabulous.........This is the best provided city in the world.—Narrative of Paes,

ক্রিষ্টোভাও-দা-ফিগারেদো রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে লইয়া বিজয়নগরে আগমন করিলেন। নূতন নগরী হইতে বিজয় নগর প্রায় ৩ মাইল ব্যবধান। আমাদিগের জন্য সুন্দর আবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সেনাপতিগণ এবং রাজার অন্যান্য অমাত্যবর্গ ক্রিষ্টোভাওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজার আদেশে তাঁহার জন্য বহু মেষ ও বিহঙ্গ প্রেরিত হইয়াছিল। কলস পূর্ণ ঘৃত, মধু ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী রাজ-উপঢৌকনস্বরূপ আনীত হইলে, ক্রিষ্টোভাও তৎসমুদয় তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন এবং পর্ত্তুগালরাজ কিরূপ রাজোচিত মর্য্যাদার সহিত বাস করেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

বিজয়নগর হইতে নূতন নগরী পর্য্যন্ত যে রাজপথ বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা প্রস্থে একটি মল্লভূমির তুল্য। পথের উভয় পার্শ্বে গৃহের পর গৃহের সারি—পণ্যবীথিকার পর পণ্যবীথিকা। সেই সকল বিপণীতে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যসম্ভার সর্ব্বদা বিক্রীত হইতেছে। আতপতাপ হইতে পথিকদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে সারিবিন্যস্ত বহু বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। রাজাদেশে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর দেবায়তন [ সম্ভবতঃ ইহাই অনন্ত-শয়ন-মন্দির। বর্ত্তমান হস্‌পেট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। ] রাজপথের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। সেনাপতি ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই রাজপথ সজ্জিত করিয়াছেন।

নগর প্রবেশের তোরণমুখে আসিলেই দেখা যায় একটি বিপুল প্রাচীরে নগরাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য প্রাচীরসমূহ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই বহিঃপ্রাচীর

এক একটি সুবৃহৎ পাষাণ-খণ্ডে বিরচিত এবং সুদৃঢ়। দেখিলাম ইহার কোনও কোনও স্থান একটু জীর্ণ হইয়াছে। ইহার ভিতরেও সৈন্য-সমাবেশের জন্য দুর্গাদির অভাব নাই। প্রাচীরের নিকটেই কোন কোন স্থানে জলপূর্ণ পরিখা। এতদ্ভিন্ন নগররক্ষার্থ আর একটি ব্যবস্থা নয়ন-গোচর হইল। এক মানুষ উচ্চ মৃন্ময় ভিত্তির উপর তীক্ষ্ণাগ্র সুদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ডগুলি প্রোথিত আছে দেখিলাম। প্রস্তরগুলি প্রস্থে প্রায় দেড়টি বল্লমের দণ্ডের সমান এবং প্রধান প্রাচীর হইতেও প্রায় সেই পরিমাণ দূরে অবস্থিত। এই তীক্ষ্ণাগ্র প্রাচীর অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-গাত্রে যাইয়া লাগিয়াছে।

প্রথম প্রাচীর হইতে নগরের প্রবেশ-দ্বার পর্য্যন্ত বহু বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র দেখিলাম। অগণিত ফলোদ্যান এবং বিপুল জলপ্রবাহ বর্ত্তমান। দুইটি হ্রদ হইতে এই জলরাশি আসিতেছে। অক্ষয় উৎসমুখে জল উঠিয়া হ্রদগুলি সর্ব্বদা বারিপূর্ণ করিতেছে।

জলধারা প্রথম প্রাচীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত। পূর্ব্বেই যে প্রথম নগর-তোরণের কথা বলিলাম, তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে হইলে একটি জলপূর্ণ স্থান অতিক্রম করিতে হয়। উহা অতিক্রম করিলেই সম্মুখে সুদৃঢ় পাষাণ-প্রাচীর নগর-প্রবেশে বাধা দেয়। তোরণের নিকটে উহা একটু বক্রভাবে অবস্থিত। তোরণের দুই পার্শ্বেই দুইটি সেনাবাস। সুতরাং তোরণ যে কিরূপ সুরক্ষিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তোরণটি দেখিতে সুন্দর এবং অতিশয় বৃহৎ।

তোরণ অতিক্রম করিলেই দুইটি নাতিবৃহৎ মন্দির দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দির প্রাঙ্গণ পত্রবহুল বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন। অপরটি কতকগুলি গৃহের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

প্রথম তোরণের পূর্ব্বকথিত প্রাচীর সেই রাজনগর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই তোরণ অতিক্রম করিলেই দ্বিতীয় তোরণ। তাহার সহিত সমসূত্রে প্রাচীর নির্ম্মিত। প্রথম প্রাচীরের মধ্যে নগর বেষ্টন করিয়া এই দ্বিতীয় প্রাচীর বর্ত্তমান। এই স্থান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত রাজপথের পর রাজপথ এবং গৃহের পর গৃহের সারি। সেনাধ্যক্ষ এবং ধনাঢ্যদিগের গৃহগুলি নয়ন-মনোহর। সারি সারি গৃহ নানাবিধ শিল্প-ভাস্কর্য্যের রত্নহারে সুসজ্জিত।

নগরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজপথ বহিয়া গমন করিলেই একটি প্রধান

বিজয়-তোরণ দৃষ্ট হয়। রাজপ্রাসাদের পুরোভাগে যে বিশাল মুক্ত স্থান আছে, এ তোরণ তাহারই সম্মুখে। এই বিজয়-তোরণের বিপরীত দিকে আর একটি দ্বার আছে। উহাই নগরের অপরাংশের প্রবেশ-মুখ। নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার বহিয়া এই পথে শকটাদি গমনাগমন করিতেছে।

অন্যান্য কতকগুলি অট্টালিকার ন্যায় এই রাজপ্রাসাদ সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। লিস্‌বনের রাজপ্রাসাদ যে পরিমাণে ভূমি জুড়িয়া আছে, এই প্রাচীরের মধ্যে তদপেক্ষা বহু অধিক স্থান বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি মন্দির। একটি মন্দিরে প্রতিদিন বহু মেষ বলি হয়। এই মন্দিরে বলি না দিয়া রাজনগরে মেষ-মাংস ব্যবহৃত হয় না। মেষ-শোণিতে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হয়। যাহারা মেষ বলি দেয়, তাহারা মেষমুণ্ড মন্দিরে রাখিয়া কিছু দক্ষিণা দিয়া প্রস্থান করে।..............মন্দিরের নিকটেই একটি বিশালকায় রথ আছে। রথটি নানা কারুকার্য্যে ও মূর্ত্তিশিল্পে সুসজ্জিত। বার্ষিক উৎসবকালে নগরের বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ দিয়া এই রথ টানিয়া লওয়া হয়। রথটি এতই বৃহৎ যে উহা রাজপথে মোড় ঘুরিতে পারে না।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেই একটি বিশালকায় সুন্দর রাজপথ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই পথের উভয় পার্শ্বে মনোহর প্রাসাদশ্রেণী বর্ত্তমান। গৃহগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমৃদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকেরাই উহাদের অধিকারী। দেখিলাম অনেক বণিক এই পথের ধারে বাস করেন। পৃথিবীতে যতপ্রকার হীরা, মতি, চুণি, পান্না প্রভৃতি আছে, পৃথিবীতে যতপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্রাদি আছে, ইঁহাদের নিকট সে সমুদায়ই বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রতিদিন সায়ংকালে এখানে যে হাট বসে, তাহাতে বহু শত সাধারণ অশ্ব, এবং অন্যান্য পশ্বাদি এবং আঙ্গুর কমলালেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও কাষ্ঠ বিক্রীত হইয়া থাকে। এই একটি রাজপথের উপরেই এই সমস্ত। পথের প্রান্তভাগেই আর একটি দ্বার। দ্বারসংলগ্ন প্রাচীর পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় দ্বার সংলগ্ন প্রাচীরের সহিত এইরূপে মিশিয়াছে যে, মনে হয় যেন নগরটি তিনটি দুর্গের দ্বারা রক্ষিত। রাজপ্রাসাদও একটি দুর্গ বিশেষ।

এই শেষোক্ত দ্বার অতিক্রম করিলেই আর একটি রাজপথ। তথায় শিল্পীদিগের আবাস। শিল্পীরা নানাবিধ পণ্য বিক্রয় করে। এখানেও দুইটি দেবমন্দির আছে দেখিলাম। প্রত্যেক রাজপথেই দেব-মন্দির নয়ন-গোচর হয় বটে

কিন্তু প্রধান মন্দির নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত। ক্রিষ্টোভাও-দা-ফিগারেদো অনুচরবর্গের সহিত এই রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস করিতেন। হাটে শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী, সমুদ্রের শুষ্ক মৎস্য এবং নানা দেশোৎপন্ন বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্য আসে যে, আমি সে সকল স্থানের নামই জানি না। নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে এইরূপ হাট প্রতিদিন মিলিত হয়।

এই রাজপথের প্রান্তেই মুসলমানদিগের থাকিবার স্থান। ইহারাই নগরের প্রান্তভাগে বাস করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই জন্ম এই দেশে। তাহারা রাজবেতনভোগী রক্ষী। এমন জাতি নাই, যাহা এই নগরে নাই—এমন দেশ নাই যাহার অধিবাসী এখানে দেখা যায় না। এদেশের অসাধরণ বাণিজ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তরের বিশেষতঃ হীরকের ব্যবসায়ই তাহার কারণ।

এই নগর যে কত বৃহৎ তাহা লিখিতে পারি না; কারণ কোন এক স্থান হইতে তাহা অনুমান করা যায় না। আমি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর উঠিয়া নগরের অনেকাংশ দেখিয়াছি। নগরের অংশ শৈলশ্রেণীর অন্তরালে পড়ে বলিয়া আমি পর্ব্বতে উঠিয়াও সমুদয় নগরটি দেখিতে পাই নাই। তবে যে পরিমাণ দেখিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি ইহা রোম নগরীর ন্যায় বৃহৎ এবং—দেখিতে পরম রমনীয়।

নগরে এবং গৃহে এখানে অগণিত বৃক্ষ কুঞ্জ। সেই সকল কুঞ্জের মধ্যে নিসেক করিবার জন্য জলধারা প্রবাহিতা। স্থলে স্থলে হ্রদও আছে। রাজ-প্রাসাদের সন্নিধানেই ভাল কুঞ্জ ও অন্যান্য ফলোদ্যান বর্ত্তমান আছে। দেখিলাম মুসলমান পল্লীর পরই একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া চলিয়াছে। নদীতীরে সংখ্যাতীত ফলোদ্যান। ফলের মধ্যে আম্র, পনস, গুবাক, কমলালেবু বেশী। বৃক্ষকুঞ্জগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে মনে হয় যেন একটি নিবিড় বনশ্রেণী। পূর্ব্ববর্ণিত প্রথম প্রাচীরের বহির্ভাগে অবস্থিত দুইটি জলাশয় হইতেই নগরের ব্যবহার্য্য সমুদয় জল সরবরাহ হয়।

নগরের জনসংখ্যা গণনার অতীত। এতই বিপুল যে আমার লিখিতে সাহস হয় না; লিখিলেই মনে হইবে উহা একান্ত অসম্ভব। কিন্তু বলিতে কি, এই নগরে এত লোক ও হস্তী আছে যে, কি পদাতিক, কি অশ্বারোহী কোন সেনা-দলেরই সাধ্য নাই যে, কোন একটি রাজপথের নাগরিকদিগকে পরাজিত করিয়া উহা অতিক্রম করিতে পারে।

শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ এমন আর একটি নগরী পৃথিবীতে নাই। এত

ধান্য, যব, মুগ প্রভৃতি কলাই এবং অন্যান্য শস্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শস্যের আমদানীও যেমন প্রচুর, মূল্যও তেমনি অল্প। নগরের রাজপথ এবং পণ্যবীথি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। সংখ্যাতীত ভারবাহী বলীবর্দ্দ শস্যাদি বহিয়া চলিয়াছে। কাহার সাধ্য সে সকল পথে হাঁটিতে পারে। অনেক স্থলেই বহুক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা না করিলে আর নির্দ্দিষ্ট পথে গন্তব্য স্থান যাইতে পারা যায় না। সুতরাং ভিন্ন দিক দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এখানে পক্ষীর আদৌ অভাব নাই। নগরের মধ্যে এক ভিণ্টেমে [ ১ সাত বিংশাংশ পেনি=১ ভিণ্টেম ] ৩টি কুক্কুট পাওয়া যায়। নগরের বাহিরে ৪টি কুক্কুটের দাম এক ভিণ্টেম। [ এই স্থানে লেথক পর্ত্তুগাল দেশের কুক্কুট ও অন্যান্য পশুর সহিত বিজয়নগরের কুক্কুটের ও পশ্বাদির মূল্যের তুলনা করিয়াছেন ] ... ... ... নগরের উত্তর দিকে একটি বিশালকায়া তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে। এই নদীতে বহু মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।... ... নদীতীরে একটি নগরী আছে, তাহার নাম আনেগুন্দি। পুরাকালে ইহাই বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখন অতি অল্পসংখ্যক লোকেই এই প্রাচীন নগরে বাস করে।

নগরটি দুইটি শৈলশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। নগরে প্রবেশ করিবার দুইটি মাত্র মুখ। এখনও নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, উহা সুন্দরই আছে। এক-জন সেনাপতি এখানে বাস করেন। বেত্রনির্ম্মিত গোলাকার ঝুড়িতে বসিয়া লোকে এখানে নদী পার হয়। ঝুড়ির বহির্ভাগ চর্ম্মে আবৃত। ঝুড়িগুলি এত বৃহৎ যে ১৫।২০ জন আরোহী অনায়াসে একত্রে নদী পার হইতে পারে। আবশ্যক হইলে এই বেতের নৌকায় অশ্ব এবং ভারবাহী বলীবর্দ্দ প্রভৃতিও পার করা হয়। সাধারণতঃ পশ্বাদি সন্তরণ দিয়াই পার হইয়া থাকে। ঝুড়িগুলি দাঁড়ের সাহায্যে যখন বাহিত হয় তখন কেবল ঘুরিতে থাকে, সোজা যায় না। এদেশে সর্ব্বত্রই এই প্রকার নৌকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গো-মেষাদি বিক্রয় করিবার জন্য এই নগরে অনেকগুলি হাট আছে। নগরের চতুর্দ্দিকে মুক্ত প্রান্তর মধ্যে অগণিত গো-মেষাদি বিচরণ করিতেছে, দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হয়। এক একটি মেষ আকারে এত বৃহৎ যে তাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করা চলে।

নগর প্রান্তরের বহির্ভাগে উত্তর দিকে তিনটি মনোহর দেব মন্দির আছে। তাহাদের একটির ভিথলস্বামীর অপরটি বিরূপাক্ষের। বিরূপাক্ষই এখানে বহুমানে পূজিত। কতলোক দূর হইতে এখানে দেব দর্শন করিতে আইসে।

বিরূপাক্ষমন্দিরের সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখী। দ্বারের বিপরীত দিকেই একটি দীর্ঘ রাজপথ আছে। উহা দেখিতে অতি সুন্দর। পথের উভয় পার্শ্বে চূড়া-সমন্বিত বহু অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। তীর্থ-যাত্রীগণ এই সকল গৃহে বাস করে। উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পথিপার্শ্বেই রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান। নৃপতি স্বয়ং দেব দর্শন করিতে আসিলে সেই প্রাসাদে বাস করেন।

তোরণশীর্ষে একটি রমনী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। বৃহৎ গম্বুজে তোরণটি সুশোভিত। কত নরনারীর মূর্ত্তি, কত মৃগয়ার দৃশ্যাবলী, আরও কত রূপ চিত্রাদি দ্বারা উহা সুশোভিত। গম্বুজ যতই উপরে উঠিয়াছে উহার আয়তনও ততই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, গম্বুজগাত্রের দৃশ্যাবলীও কাজেই আকারে ক্ষুদ্র হইতে হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এই প্রথম তোরণ অতিক্রম করিলেই সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ অঙ্গন। তাহার মধ্যস্থলে প্রথম তোরণের ন্যায় আর একটি তোরণ আছে। তবে উহা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ অঙ্গন মধ্যে আসিতে হয়। এই অঙ্গনের চতুর্দ্দিকেই বারান্দা। বারান্দার উপর সারি সারি প্রস্তর স্তম্ভ। এই অঙ্গনের মধ্য স্থলে দেবমন্দির।

প্রথম তোরণের সম্মুখে ৪টি স্তম্ভ আছে। তাহাদের দুইটি স্বর্ণের ন্যায় এবং অপর দুইটি তাম্রের। স্তম্ভগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। আমার মনে হয় সেই জন্যই দুইটির গাত্র হইতে সোণার হল্ উঠিয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলির মধ্যে যেটি তোরণের অধিক নিকটে বর্ত্তমান আছে, তাহা বর্ত্তমান নৃপতি কৃষ্ণরায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মন্দির তোরণের বহির্ভাগ তাম্র নির্ম্মিত, তাম্রের উপর সোণার গিল্টি। ঊর্দ্ধে উভয় পার্শ্বে দুইটি অতি বৃহৎ ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দুইটিও সোণার গিল্টি করা। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় উহার স্তম্ভে স্তম্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলুঙ্গি আছে। সায়ংকালে কুলুঙ্গির ভিতর প্রদীপ জ্বলে। শুনিলাম দীপের সংখ্যা প্রায় আড়াই কি তিন হাজার হইবে। মন্দিরের এই অংশ অতিক্রম করিলেই একটি অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর স্থানে আসিতে হয়। ইহার দুই পার্শ্বে দুইট দ্বার আছে। তাহার পরই মন্দিরটি আমাদের ভজনালয়ের ন্যায় বিস্তৃত। তাহাই দেবতার স্থান।

দেবতার নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বে তিনটি দ্বার অতিক্রম করিতে হয়।

যেখানে দেবতার স্থান তাহার উপরিভাগ খিলানে নির্ম্মিত। কোন দিন সূর্য্যালোক তথায় প্রবেশ করে না। এখানে দিবারাত্রি মোমের বাতি জ্বলে।

প্রথম দ্বারে যে সকল প্রহরী আছে তাহারা মন্দিররক্ষক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় না। আমি তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি আছে। প্রধান দেবতার মূর্ত্তি নাই। উহা একটি গোলাকার পাষাণস্তূপ মাত্র। মন্দিরের বহির্ভাগ তাম্রের উপর গিল্টি করা। মন্দিরের বহির্ভাগে আমি যে বারান্দার কথা কহিলাম, তাহার নিকটেই শ্বেত মর্ম্মরের একটি ষড়্ভুজা মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি অসিচর্ম্মাদি নানা প্রহরণধারিণী। ...... মন্দির মধ্যে দিবারাত্র ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। ...... এদেশবাসীরা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎসবে লিপ্ত হয়। কখনও কখনও তাহারা দিবারাত্র উপবাস করিয়া থাকে। প্রধান উৎসবের সময় স্বয়ং নৃপতি বিজয়-নগর হইতে এখানে আগমন করেন। রাজ্যের প্রথিতনামা নর্ত্তকীবৃন্দ, সানুচর সামন্ত নৃপতিগণ, সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া সমাগত হন। যুদ্ধবিগ্রহাদি গুরুতর রাজকার্য্যের জন্য যাঁহারা তৎকালে অন্যত্র থাকিতে বাধ্য হন তাঁহারাই কেবল উৎসবে যোগ দি'তে পারেন না। তাঁহারা নিজে আসিতে না পারিলেও কিরূপে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন তাহা পরে বলিতেছি।

এই উৎসব নয় দিন পর্য্যন্ত চলে। [ ইহা মহানবমীর উৎসব নামে পরিচিত। ইহা প্রায়ই আশ্বিন মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ হয়। ] রাজপ্রাসাদেই উৎসবের স্থান। প্রাসাদ কিরূপ ভাবে অবস্থিত তাহা বলিতেছি। ( ক্রমশঃ )

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

# আশ্বাস

মৃত্যু ? এরে ডরি মোরা ? একি সত্য ? নহে, তাহা নহে ;
তা হ'লে কি তা'রি বক্ষে নিরুদ্বেগে সবে শু'য়ে রহে ?
সে যে নিত্য আপনার, সেই যে রে একান্ত আপন ;
মরণেরি বুকে মোরা ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মতন,—
এই আছি, এই নাই ! যা'রে বড় ভাবি আপনার ;
—সে যে বড় অসহায়,—মিশে' যায় স্পন্দনে তাহার।
বহে' যায় কৃষ্ণ সিন্ধু, আঁধারের অনন্ত আধার ;
ফুটি' উঠি, ডুবে যাই ! মহাকাল গর্জ্জে অনিবার !

২

ওই দূরে দেখা যায় সে অদম্য, উন্মাদ, নর্ত্তন,—
রুধিরের রক্ত বন্যা 'টল-মল' করে আস্ফালন!
ভীম আর্ত্তনাদরাশি পিনাকের সম সুগম্ভীর;
রক্তিম জলদপুঞ্জ—ভ্রূকুটি ওকি গো ধূর্জ্জটির?
মহাকাল প্রলয়ের ধ্বংশরূপ আজি সমুত্থত,
কোন্ মহালক্ষ্যে আজি চলে সৃষ্টি অদৃষ্ট, অজ্ঞাত,
—কিছুই না বুঝা যায়! শুধুই এ দিশহারা মন
ভয়ার্ত্ত, বিস্মিত, স্তব্ধ,—প্রতীক্ষিয়া আছে সেইক্ষণ
যবে ভয়াবহ এহি ধ্বংরূপে করি' সংহরণ,
প্রসন্ন প্রশান্ত সৌম্য শান্তি আসি ভরিবে ভুবন।

৩

কেন হেন হানাহানি? দ্বেষাদ্বেষি কেন হেন হায়?
কৃষ্ণ মেঘরাশি সম স্তরে স্তরে ওকি উড়ে' যায়
—সংখ্যাহীন প্রাণপুঞ্জ ব্যাপি' স্বচ্ছ-নীল নভস্তল,
সিক্ত করি' রক্তধারে এ ধরার শ্যামল অঞ্চল!
চারিধারে বার বার হাহাকার উঠিতেছে ভরি'
সর্ব্বগ্রাসী এ কি নেশা, দুর্নিবার তৃষা ভয়ঙ্করী?
কি যে চাহে নাহি জানে; মানে শুধু মরণ-আহ্বান,
লঘু করে গুরু-ভার এ ধরায় তরী মজ্জমান।
কি যে লক্ষ্য, কি উদ্দেশ্য, সে ভাবনা ভাবিয়া কি ফল?—
ডাক শুনে' এবে সবে আত্মহারা, অধীর, চঞ্চল,
ধেয়ে' যায় রঙ্গ-ভূমে—ধূমে ধূমে আচ্ছন্ন যেথায়,
যে তমিস্রা অন্তস্তলে কি যে আছে বুঝাও না যায়;
অন্ধকারে একাকারে কেহ কারে চিনিতেও নারে,
নিবিড় রহস্য যেথা ঘিরি' আছে চির-স্তব্ধতারে।
প্রমত্ত গর্জ্জনে ক্ষুব্ধ শিহরিছে কাল-পারাবার,
বিম্ব সম সেই বক্ষে মিশে জীব নিত্য নির্ব্বিচার।
এই যে বিপুল সিন্ধু উদ্বেলিত করিলে রাজন,
নিহিত রহস্য কিবা, কি উদ্দেশ্য আছে সংগোপন,

বুঝিবার শক্তি নাহি। একি ভীম উন্মাদ, উদ্দাম
অনন্ত অদম্য রঙ্গ! এ লীলার কোথা পরিণাম?
বিশ্ব ভূপ, রুদ্ররূপ কেন হেন বিকাশিলে হায়,—
কোন্ পাপে পদ-দাপে আজি কাঁপে মর্ত্ত্য অসহায়!
তাণ্ডব নর্ত্তনে তব, 'থর থর' বিকম্পিত ক্ষিতি,
অতৃপ্ত তৃষায় তা'র ত্রাস ভরে শুষ্ক তালু নি'তি।
শোণিতের স্রোতধারে সে তৃষার নাহি অবসান,
সযত্নে রচিত তব এ কুঞ্জ যে হইল শ্মশান!

৪

এত ক'রে যা'র তরে আপনারে করিলে বিস্তার,
যা'র প্রতি অণুতলে স্ফূর্ত্ত তব দীপ্তি মহিমার,
কত গৃহ-লোকালয়, কত হর্ম্ম্য, কত কীর্ত্তিপণা,
কত গিরি-উপবন, নির্ঝরিণী-নদী অগণনা,
কতরূপে, কতভাবে কত শত সৌন্দর্য্যের মাঝে
যে আধারে চারিধারে হে সুন্দর তব স্মৃতি রাজে,
—সেই বড় আদরের মরতের একি দশা হেরি—
বক্ষোমাঝে থই-থই নৃত্য করে বন্যা রুধিরেরি!
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আসি ধ্বংশে সেই পার্থিব বিলাস,
মায়া-যবনিকা যত ছিন্ন হ'য়ে পড়ে চারি পাশ,
সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সনে সুখে যা'রা বেঁধেছিল ঘর,
চেয়েছিল দলিবারে যা'রা এহি বিশ্ব-চরাচর,
কাঞ্চন-রজত চক্রে চালাইয়া মাৎসর্য্য-শকট
ভেবেছিল যা'রা যা'বে উল্লঙ্ঘিয়া এ ভব সঙ্কট,
আজি সেই ভ্রান্ত জনে ভুলাইয়া সোনার স্বপনে
স্বার্থ সহচর আজি বক্ষ-রক্ত শোষে প্রতিক্ষণে!
দুর্নিবার হাহাকার ওঠে নিত্য আলোড়ি' অম্বর,
সংক্ষুব্ধ শোণিত-সিন্ধু শিহরিয়া বহে ভয়ঙ্কর!

৫

হে সত্য-সুন্দর-শিব, হে অনাদি, সৃষ্টির কারণ,
হে চির-নির্ভর, প্রভু, হে বিধাতঃ, পতিত পাবন,

সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ আসি' সর্ব্বনাশী দুরন্ত ক্ষুধায়
যবে তব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুজেরে গ্রাসিবারে চায়,
সত্য-প্রেম-পবিত্রতা, ভক্তি কিম্বা বিশ্বাসে যখন
পার্থিব প্রতিষ্ঠা হোম ক্রমে ক্রমে করে আচ্ছাদন,
আত্ম-পর ভেদ যবে জীবনের বেদ হ'য়ে ওঠে,
এ তব মন্দিরে যবে চিহ্ন তব নাহি রহে মোটে,
প্রলোভন, প্রবঞ্চনা-মিথ্যাচার-বিদ্বেষ-হিংসায়
দুর্লভ জীবন যবে ভরে' ওঠে কাণায় কাণায়,
তখন, তখন তুমি হে শঙ্কর, সংহারের রূপে
মরণের মাঝে ধীরে মঙ্গলে ফুটাও চুপে চুপে!

৬

মৃত্যু? সে তো শেষ নহে! সে যে শুধু পট-বিক্ষেপণ!
মৃত্যু-পদক্ষেপে চলে নিত্য এহি অনন্ত জীবন;
নিরবধি মহাকাল-ব্যবধানে হেন নিশিদিন
মরণ-স্পন্দনে বহে এ জীবন বিরাম বিহীন!
ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে এত হত্যা করি' ভগবান,
এ মোহান্ধ পাপী জনে পুনর্জ্জন্ম করিছ কি দান?
দিয়া গেছ যে আশ্বাস—সদা ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে
হে দয়াল, তব দৃষ্টি চিরদিন রহে ধরা'পরে;
ইচ্ছাময়, বলে গেছ—পুনঃ তুমি দেখা দিবে আসি'
যবে পাপে পূর্ণ পৃথ্বী, স্বার্থ-পঙ্কে মগ্ন অবিশ্বাসী।
আসিল সে শুভক্ষণ যদি নাথ, তবে কেন আর
এ দারুণ তৃষাপূর্ণ করিলে না মৌন ভরসার?
তোমারি, আশ্বাসে ওগো প্রিয়তম, প্রভু, প্রাণেশ্বর,
সান্ত্বনার মায়া মোহে বড় আশে বেঁধেছি অন্তর!
ধ্বংশের এ ভয়ঙ্কর পিনাকের শুনিয়া গর্জ্জন
সাগ্রহ-কম্পিত প্রাণে, কায়-মনে মেলেছি নয়ন!
এত যদি আয়োজন, দিলে যদি এতই আভাস,
কেন তবে প্রেমময়, পূর্ণ নাহি করিলে আশ্বাস?
সে আশ্বাস-আশে আজি নেত্রে মম বাষ্প ছেয়ে' আসে,—
বক্ষ মম ফুলে' ফুলে' দুলে' দুলে' ওঠে দীর্ঘশ্বাসে!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

# জীবনের মূল্য।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### অসম্ভব কথা।

সপ্তাহ মধ্যে বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অবশেষে তিনি যদি সম্মত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী বাঁকিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন—"পোড়া কপাল পোড়া কপাল!—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গা পানে পা করেছে—তার আবার বিয়ে করা কেন? লজ্জাও করে না বল্‌তে? টাকা আছে! টাকা নিয়ে ত ধুয়ে খাবে।"—বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিনী যাহাই বলুন, টাকা-ধোয়া জলও অনেক খাদ্য পানীয় অপেক্ষা পুষ্টিকর পদার্থ। জগদীশ, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট টাকা ধারিতেন। বাড়ীখানিও তাঁহার নিকট বন্ধক ছিল। কন্যার বিবাহে কিছুই ব্যয় হইবে না, উভয় পক্ষের সমস্ত ব্যয়ভারই মুখোপাধ্যায় বহন করিবেন,—মেয়েকে দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিবেন; তাহার উপর, বাড়ী-বন্ধকীর দলিলখানিও ফেরৎ দিবেন—এই সমস্ত প্রলোভনে পড়িয়া অবশেষে কর্ত্তা গৃহিনী উভয়েই বিবাহে সম্মতি দিলেন। এক বৈঠকে বা একদিনে এ সমস্ত স্থির হয় নাই। কয়েক দিন ধরিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বরের বাড়ী হইতে কনের বাড়ী এবং কনের বাড়ী হইতে বরের বাড়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে হাঁটাহাঁটি করিতে হইয়াছিল।

এ কয়দিন মুখোপাধ্যায় সেই মেয়েটির রূপ দিবানিশি ধ্যান করিতেছিলেন। শুধু কামিনী নহে, কাঞ্চনের চিন্তাও তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। এই বিবাহটি হইলে সত্যই যে কোনও দেশীয় করদ-রাজ্যের রাজতক্ত তিনি পাইবেন, অথবা গভর্ণমেণ্ট আগামী সংখ্যার গেজেটে তাঁহাকে রাজা খেতাবে ভূষিত করিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার নাই—তবে তিনি যে বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করিবেন, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিলনা।

যে দিন বিবাহ স্থির হইল সে দিন গিরিশের পিসিমার বড় আহ্লাদ। গিরিশকে তিনি অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পুঁটু বুচিকে বলিতে লাগিলেন—"তোদের নতুন মা আস্‌বে। খুব ভাল মা। তোদের কত ভাল-

বাসবে, সন্দেশ খেতে দেবে।" ইত্যাদি। পুঁটুর বয়স নয় বৎসর, বুচির বয়স চার। ঠাকুরমার সাক্ষাতে তখন তাহারা কিছুই বলিল না, কিন্তু পরদিন প্রভাতে অন্তরালে বসিয়া দুই ভগ্নীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

বুচি বলিল—"দিদি, আমাদেল্ নতুন মা এছে আমাদেল্ খুব ভাল বাছবে ছত্যি?"

পুঁটু মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"তা হলে আর ভাবনা ছিল না লো! সৎমা বুঝি আবার ভালবাসে? উঠতে বসতে আমাদের নাথি ঝাঁটা মারবে।"

একথা শুনিয়া বুচির মুখখানি চুণ হইয়া গেল। ভয়কম্পিত স্বরে বলিল—"মাল্‌বে? রোজ মাল্‌বে?"

পুঁটু অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে বলিল—"মারবে না ত কি।"

"তুই কি কোলে জানলি দিদি?"

"কেন, ও বাড়ীতে কাল যখন আমি খেলা করতে গিয়েছিলাম, রাঙা পিসিতে খুড়ীমাতে বলাবলি করছিল আমি শুনি নি?"

অতঃপর বুচি মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু বেলা হইলে গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিয়া মুখোপাধ্যায় যখন আহ্নিকে বসিতেছিলেন, বুচি তখন নির্জ্জন পাইয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহাকে বলিল—"বাবা—বাবা—আমলা নতুন মা চাইনে, আমাদেল পুলোনো মাকে এনে দাও।"

মুখোপাধ্যায় কোনও উত্তর করিলেন না—আহ্নিক আরম্ভ করিয়া দিলেন। মন্ত্র বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে তাঁহার চোখে জল ভরিয়া আসিতে লাগিল। সারাদিন তাঁহার মনটা বিমর্ষ হইয়া রহিল।

বৈকালে বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি ধূমপান করিতেছিলেন এমন সময় এক-ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া বলিল—"মুখুয্যে মশাই—প্রণাম।"

মুখোপাধ্যায় মাথা তুলিয়া দেখিলেন, বাবুপাড়ার সতীশ দত্ত। বলিলেন—"সতীশ যে—এস, বস।"

সতীশ স্থানীয় ইস্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত—এই গ্রামেই বাড়ী। উপবেশন করিয়া বলিল—"জগদীশ রাজি হয়েছে—শুনেছেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ—শুনেছি।"

"সেই ত মল খসালি, তবে লোকটা কেন হাসালি? গোড়া থেকেই আমি জগদীশকে বলছি—দাদা, এমন সুযোগটি হাতে পেয়ে ছেড়না। মুখুয্যে মশায়ের মত জামাই পাওয়া, তোমার মত লোকের পক্ষে অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"ওঁর ত একরকম মত হয়েছিল—কিন্তু ওঁর স্ত্রীই নাকি বেঁকে বসেছিলেন শুন্‌লাম।"

সতীশ বলিল—"বেঁকে ত বসেইছিলেন। কিন্তু সোজা হলেন কি করে তা শুনেছেন ত?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"না। কি হয়েছিল?"

গিরিশ বলিল—"অ্যাঁ!—শোনেন নি?—সে যে অতি আশ্চর্য্য কথা মশায়! আমি মনে করেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন।"

মুখোপাধ্যায় ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে সতীশের মুখপানে চাহিলেন।

সতীশ বলিতে লাগিল—"পটলি—ঐ যার সঙ্গে আপনার বিবাহ, এখন আর কচি খুকীটি নেই, ডাগর হয়েছে। আর, আপনি ধরুন নবীন যুবাটিও নন। হক্ কথা বলব মশায়, কারু খোসামোদ করা আসেই না—বাবা শেখায় নি। আপনি বুড়ো হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে—আপনার সঙ্গে বিবাহে সে মেয়েটির ঘোরতর আপত্তি হবার কথা। কেমন কি না?"

মুখোপাধ্যায়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া কেবল মাত্র বলিলেন—"হুঁ।"

সতীশ মনে মনে হাস্য করিল। কিন্তু সে ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিল—"কিন্তু শুন্‌লাম, বিয়েতে মা বাপের অমত হচ্ছে শুনে, পটলিই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসেছিল। এমন কি তার এক সখীকে দিয়ে আপনার মাকে বলিয়েছিল—যদি ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে না হয় তবে আমি বিষ খেয়ে মরব।"—বলিয়া সতীশ ওষ্ঠ ও হস্ত দ্বারায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইবার মূক অভিনয় করিল।

ইহা শ্রবণ মাত্র, মুখোপাধ্যায়ের মন হইতে সারাদিনব্যাপী বিষণ্ণতা এবং কিয়ৎক্ষণজাত বিরক্তি, চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের মত কোথায় যে পলায়ন করিল তাহার ঠিকানা রহিল না। সহাস্য মুখে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বটে? বটে? একথা তুমি কার কাছে শুন্‌লে ভায়া?"

"আমার স্ত্রীর মুখে শুন্‌লাম। আরও শুন্‌লাম, এ কদিন ভেবে ভেবে পটলির চেহারা শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে। চোখ পর্য্যন্ত বসে গেছে। কালকে বাপ মায়ের মত হওয়ার কথা জানতে পেয়ে তবে তার মুখে আবার হাসি ফুটেছে।" কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। মুখোপাধ্যায় ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া বসিয়া হুঁকা টানিতেছেন—মুখখানি বেশ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সতীশ

গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একটু পরে সে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"নাঃ, কিছু বোঝা গেল না। বিস্তীর্ণা পৃথিবী জনোঽপি বিবিধঃ কিং কিং ন সম্ভাব্যতে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কি বল্লে, কি বল্লে? ওর মানে কি?"

"মানে—এ পৃথিবীও বিস্তীর্ণ, কতরকমের লোক এতে বাস করে, এ পৃথিবীতে কোন ঘটনাই অসম্ভব নয়।—আচ্ছা, এর কারণ কিছু বলতে পারেন মুখুয্যে মশাই?"

মুখোপাধ্যায় নীরবে অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

ভৃত্য কায়স্থের হুঁকা আনিয়া সতীশের হাতে দিল। মুখোপাধ্যায় কলিকাটি সতীশকে দিয়া বলিলেন—"খাও ভায়া!"

সতীশ ধূমপান করিতে করিতে যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল—"কুমার-সম্ভবে, মহাদেবকে লাভ করবার জন্যে সতীর কঠোর তপস্যার কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর সেই কাঁচা বয়স—আর মহাদেবের বয়সের ত হিসেবই নেই—তবু মহাদেবকে পতিলাভ করবার জন্যে সতীর কি রকম ব্যাকুলতা কালিদাস বর্ণনা করেছেন!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"ঠিক—ঠিক।"

ইহার পর দুইজনে বসিয়া পটলি সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সখ্যের আবেগে মুখোপাধ্যায় স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্তটাও সতীশকে চুপি চুপি বলিলেন। সতীশ একথা পূর্ব্বে হইতেই অবগত ছিল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিল। বলিল—"আরে মশাই তাই বলুন!—এতক্ষণে ব্যাপারটা বেশ বোঝা গেল। সত্যি বলছি মুখুয্যে মশাই—পটলির কাণ্ড শুনে অবধি, আমি কিছু কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। তাই ত বলি, এ রকম অসম্ভব ব্যাপারটাই বা ঘটে কেন? হরিহে দীনবন্ধু!"

উত্তমরূপে জলযোগ করাইয়া মুখোপাধ্যায় সে দিন সতীশকে বিদায় দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঐখানে তার মাথা গরম হয়,
রাগটা বেশী তার !
এ দিকে ত মাটীর মানুষ যেন—
দেখে' দুঃখ হয় ;
সজ্জা-সাজের কোনই বালাই নাই,
ভুঁয়েই পড়ে রয় !

চায় না কিছুই, থাকে আপন ঝোঁকে,
পায় বা না পায়, তাকায় নাক' চোখে,
হাজার কথা বলে বলুক লোকে—
অমন মানুষ হয় ?
তোরা তারে পাগল বলিস্ নাক'—
পাগল কভু নয়।

সহজ চলন, সরল মুখের কথা,
শান্ত গলার স্বর ;
বুদ্ধি তাহার ভ্রান্তি হতে পারে,
ফুটফুটে অন্তর।

গুণের কথা—বল্‌ব সে আর কত ?
ধবধবে রং ধুতরো ফুলের মত ;
যতই দেখি মনে যে হয় তত—
ভোলা মহেশ্বর !
অম্‌নি পাগল জন্ম-জন্ম পাই—
সেই আশীর্ব্বাদ কর্।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

# শ্রুতি-স্মৃতি

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য যখন রাজসাহী যাই, সেই সময়ে আমার পিতামহী ও মাতা একজন গৃহ-শিক্ষক আমার সঙ্গে অভিভাবকরূপে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারই অধীন থাকিয়া কিছুকাল আমার বিদ্যাভ্যাস চলিল ; তারপর বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়া স্কুল বন্ধ হইলে যখন বাড়ী যাই, তখন সেই শিক্ষকের পরিবর্ত্তে আর একজন শিক্ষক আমার অভিভাবক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন ;

তাঁহারই অধীনে সুদীর্ঘকাল আমি ছিলাম। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি যখন কলেজে প্রবেশ করিলাম, তখন আমার সেই গৃহ-শিক্ষক অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদের এষ্টেটের সুপারইন্টেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়া নাটোর গেলেন এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জমিদারীকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি সম্প্রতি পেনশান লইয়াছেন। বাল্য হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন থাকিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি, দীর্ঘকাল জমিদারীকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নাটোর এষ্টেটের প্রভূত উপকার যিনি সাধন করিয়াছেন, সেই পরম শুভানুধ্যায়ী শিক্ষাগুরু এবং পরম হিতৈষী বন্ধুর বিষয়ে দুই চারিটি সংবাদ এই জীবনকথায় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বোধ করি আমার পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানের বিদ্যা-অর্জ্জন ধরণীর অষ্টম বিস্ময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি বিদ্যা-অর্জন করিতে পারি নাই সত্য, বিদ্বান বলিয়া দশের মধ্যে পরিচিত হইবার মত বিদ্যা আমার নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি প্রতিষ্ঠাপত্র পাইবার মত সৌভাগ্য আমার হয় নাই; তথাপি বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে বিদ্যার্থীগণের সহবাসে, দীর্ঘকাল থাকিয়া যেটুকু শিখিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্বকথিত এই গৃহ-শিক্ষক ও অভিভাবকের পরম যত্নে এবং অক্লান্ত শ্রমে। আজ তাঁহার কৃত সেই উপকার স্মরণ করিয়া আমার অন্তর কি কৃতজ্ঞতায় বারম্বার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য ভাষা আমি জানি না।

যেদিন হইতে আমার হিতাহিত জ্ঞান হইয়াছে, তদবধি সেই ধীর শান্ত আদর্শচরিত্র অভিভাবক ও শিক্ষাগুরুর প্রতি আমার অটল মনের অচলা ভক্তি আমি রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আমার আজ এই জীবনাপরাহ্ণে সেই মাধুর্য্যময় গুরুশিষ্যসম্বন্ধের অম্লান মধুরিমা আমার নানা দুঃখের নিবিড় নিষ্পেষণে পীড়িত হৃদয়ের ক্ষতবেদনার উপর এক বিন্দু সুধাও ঢালিয়া দিতেছে। বিন্দু হইলেও উহা সুধাবিন্দু এবং বর্ত্তমান দিনে উহা আমার চিত-সঞ্চিত স্বল্পসংখ্যক সম্পদের মধ্যে একতম। আধি-ব্যাধি-ক্লিষ্ট দেহমন লইয়া আজ আমাকে বঙ্গদেশ ছাড়িতে হইয়াছে; কত কালের জন্য, তাহা সর্ব্ব-দেশ-কালের একমাত্র মালিক যিনি তিনিই জানেন। যাত্রাকালে আমার প্রণম্য সকলের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় লইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই,

একমাত্র এই প্রবীণ শান্ত আদর্শপুরুষের চরণে প্রণিপাত করিয়া যখন বিদায়-বাণী বলিবার উদ্যম করিতেছিলাম, তখন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি এই বৃদ্ধের মুখে যে কাতর করুণার ছবি দেখিয়াছি এবং অন্তরের অন্তস্তল হইতে উচ্চারিত যে আশীর্ব্বচন শুনিয়াছি, তাহা এই বিষ্ণুপাদপদ্মের সন্নিধানে, প্রেতশিলার নির্জ্জন সানুদেশে বসিয়া আজ বার বার আমার মনে আসিতেছে এবং আমার এই দৃষ্টিক্ষীণ নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া যাইতেছে। এ অশ্রু আনন্দের কি নিরানন্দের জানি না; আনন্দাশ্রু বহিবার দিন আজ আর নাই, সে দিন আবার কখনও ফিরিবে কি না তাহা আমার ভাগ্যবিধাতা জানেন; হয়ত তাঁহার দয়ার সময় আসিতে আসিতে, আনন্দের সান্নিধ্য-লাভের দিন নিকট হইতে হইতে আমার দিন ফুরাইয়া যাইবে; তথাপি স্নেহপ্রযুক্ত আমার কল্যাণকল্পে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিবার জন আজও এ ধরায় আছেন জানিয়া গোপন-চিত্ততলে একটু আশ্বাসের আভাস না আসিয়া যায় না। হায়রে,—কাঙ্গাল! অনাদৃত স্নেহ ও ভক্তিভারের বিষম বেদনায় বৈতরণীর তীরে দাঁড়াইয়াও এতটুকু স্নেহের লোভে হস্ত প্রসারণ না করিয়া পার না? এত গুলি স্নেহ-কাঙ্গাল নরনারীকে ধরণীতলে পাঠাইয়া স্নেহের এমন নিৰ্ম্মম দুর্ভিক্ষ করিল কে এবং কোন্ প্রাণে? সংসারে স্নেহের একান্ত অজস্রা ও দুর্ভিক্ষই সর্ব্বব্যাপী নহে, ক্ষেত্রবিশেষে শস্যসম্ভারে হাস্যসমুজ্জ্বল এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িতের জন্মজন্মান্তরব্যাপী, জীবন-ভরা, ক্ষুধা হরণের পক্ষে প্রচুর হইতেও প্রচুরতর; কিন্তু পরিতাপ এই যে কণ্টকময় মন্দারের দুর্ভেদ্য বৃতী-বেষ্টনে ক্ষুধিতের পক্ষে তাহা দুষ্প্রাপ্য নহে, বুঝিবা স্থলবিশেষে অপ্রাপ্যই হইয়া উঠে! দাতা সর্ব্বস্ব দান করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফললাভের আনন্দ ভোগে একান্ত উদ্যত, চিরভিক্ষুক গ্রহীতা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুই খানির অধিক হাত নাই বলিয়া নিতান্ত ম্রিয়মান; তথাপি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানযজ্ঞ কোন্ পিশাচের অত্যাচারে অপূর্ণ থাকিয়া যায়, দাতা সংকল্পভ্রষ্ট এবং গ্রহীতা চিরবুভুক্ষু কেন রহিয়া যায়, হৃদয়-স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ সুনির্ম্মল স্নেহমন্দাকিনীর পবিত্র নির্ঝর-ধারার উপরে ফল্গুর বালুকারাশি চাপাইয়া কোন্ দৈত্য নিখিল নরনারীকে চিরতৃষ্ণাতুর রাখিয়া দেয়, তাহা কে বলিয়া দিবে? হায়রে অসহায় স্নেহ, কোন্ দেবতা তোমায় এমন অসহায় করিয়া সৃজন করিয়াছেন জানি না। এ সংসারের উচ্ছলিত কর্ম্মপারাবারের মধ্যে নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লাভ যে সম্ভবপর হয় না। যে শক্তি তোমায় সহিষ্ণু করিয়াছে, সেই শক্তিকে দণ্ডেকের জন্য কর্ম্ম-

পথে নিয়োজিত করিলে তোমার অভিলষিত প্রাপ্তির পথে দেব, নর, পিশাচ, রাক্ষস কেহই দাঁড়াইতে পারে না। তোমার দানময় বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে বিশ্বে এমন শক্তি কাহারও নাই। যে অভিভাবক ও শিক্ষাগুরুর পরিচয় আমার পাঠকপাঠিকাদিগকে দিতে বসিয়াছি, তাঁহার নাম শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার নিবাস নাটোরের সন্নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া গ্রামে। এখন গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া—E. B. S. রেলওয়ে বাসুদেবপুর ষ্টেসনের নামে নাম হইয়াছে। যে বংশে ইঁহার জন্ম উহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশ। শ্রীনাথবাবুর পিতা ৺কালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত ইঁহারা ভৃতিগ্রহণে বিষয়কর্ম্ম করেন নাই। সর্ব্বপ্রথম শ্রীনাথ বাবুই পৈতৃক সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত রাজসাহী জেলা স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। পৈতৃক ব্যবসায় একরূপ স্থিরই রাখিয়াছিলেন, কেবল দেবভাষা সংস্কৃতের অধ্যাপনার পরিবর্ত্তে রাজভাষার অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। পূর্ব্ব-গত অন্যান্য শিক্ষকের অধ্যাপনার প্রথায় এবং শ্রীনাথ বাবুর প্রথায় আকাশপাতাল প্রভেদ বলিয়া আমার মনে হইল। আর সে বিচুটী, অগ্নিদাহ, বেত, ভীমরুল কিছুই নাই; এমন কি তাঁহার অধীনে আমার মত **শান্ত** (!!) বালক সুদীর্ঘকাল কাটাইয়াও একটী দিনের জন্য তাহাকে সামান্য কর্ণমর্দ্দনের ব্যথা এবং অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। শৈশবোচিত চাপল্যে মাত্রা যখন মাষ্টার মহাশয়ের বিবেচনার সীমা অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন তিনি মৌখিক দুই একটী ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিতেন সে বাক্যের তীব্রতা জলবিচুটী, বা অগ্নিদাহ অপেক্ষা কম ছিল না; বরং অন্যান্য শিক্ষকের শাস্তি দেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই, শ্রীনাথ বাবুর বাক্য-সূচী অন্তরে গিয়া বিদ্ধ হইত এবং সে বেদনা নিতান্ত ক্ষণ-স্থায়ী হইত না।

এই স্বল্পভাষী শিক্ষকের দুই একদিনের বাক্যশলাকা-বেধ এখনও স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সে অস্ত্র-চিকিৎসার ক্ষত নাই, বেদনা নাই, যে ব্যাধির জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইয়াছিল সে ব্যাধির উপশম হইয়াছে; আছে কেবল চিকিৎসার স্মৃতি এবং আরোগ্যের আনন্দ।

রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে, স্বাস্থ্যে, সৌভাগ্যে, সর্ব্ব সময়েই এই ধীর শান্ত মানব-চরিত্র-অভিজ্ঞ, স্নেহশীল, অথচ স্বল্পভাষী কঠিন কঠোর শিক্ষকের প্রতি চাহিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল; পাকের ব্রাহ্মণ রান্না খারাপ করিলেও ইঁহার নিকট নালিস করিতাম, জ্বর আসিলে হাত দেখাইতে ইঁহারই কাছে যাইতাম।

যে বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম সে বাড়ীতে এই শিক্ষক মহাশয়ের তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্রও আমাদের সঙ্গে বাস করিতেন। তাহাদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পঠদ্দশায় আমার দিন কাটিয়াছে। আজও তাঁহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়া যায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কৃতী হইয়া আজ দশের মধ্যে মান্য গণ্য হইয়াছেন, কেহ কেহ দ্বিতীয় তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আজও হয়, তখন সুখময় বাল্য-জীবনের নানা প্রসঙ্গ উঠিয়া সেই দিন ফিরিয়া পাইবার জন্য চিত্তকে কাতর করিয়া তোলে; বার বার করিয়া সাশ্রুনেত্রে পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া গত দিবসের জন্য গোপনে আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে না, এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। আমার এক মাতুল লেখাপড়ার জন্য আমার সঙ্গে একত্রেই থাকিতেন; তিনি আমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং আমাদের গৃহশিক্ষক শ্রীনাথ বাবুর নিদেশমত তিনি পড়া বুঝাইয়া নিতে, অঙ্ক শিখিতে আমার নিকট আসিতেন; অর্থাৎ এক কথায় মাষ্টার মহাশয় আমাকে আমার মাতুলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন (অবৈতনিকভাবে); অর্থাৎ শ্রীনাথ বাবুর ইচ্ছা আমার ফাল্‌তু সময়টা একেবারে নিরর্থক নষ্ট না হইয়া কাগজ কলম পুথিপত্রের মধ্যেই কাটে।

ইহাতে মাতুল যোগেশচন্দ্রেরও বড় সুবিধা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের খেলিতে যাইবার সময়; ক্রীড়ার সঙ্গিগণ আসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, আমি প্রস্তুত হইলেই রঙ্গভূমিতে নামা যায়। বুদ্ধিমান্ যোগেশচন্দ্র ঠিক সেই সময়েই হ্যাণ্ডরাইটিং দেখাইতে, অঙ্ক বুঝিতে, বানান বলিয়া নিতে আসিতেন। আমি সংক্ষেপে কার্য্য সারিয়া তাঁহাকে ছুটী দিতাম, নিজেও ছুটী নিতাম। মাষ্টার মহাশয়ের একটী ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি এখন অনেক মারিয়া অনেককে সারাইয়া সহস্র-মারী উপাধিযুক্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছেন এবং প্রচুর উপার্জ্জনের অর্থে নিজ জীবন দীর্ঘ করিবার নানা আয়োজনে ব্যস্ত আছেন, তিনিও যোগেশের মত আমার ছাত্র ছিলেন। এই তিনটী ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ ছিল, বোধ করি জগতে আর কোথায়ও তাহা নিতান্তই অপ্রাপ্য না হইলেও দুষ্প্রাপ্য বে, সে কথা জোর করিয়া বলিতে পারি। এ জন্য মাষ্টার মহাশয়ের নিকট ভৎর্সনা পাইয়াছি, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে মাষ্টার মহাশয় বলিয়া গিয়াছিলেন যে অষ্টম বর্ষীয় ছাত্রদ্বয় এবং ত্রয়োদশ বৎসরের শিক্ষক তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলে কেবল অশোভনভাবে অস্বাভাবিক হইত তাহাই নহে, তাহারা এতদিন বাঁচিয়া

এই জীবনকথার লেখক পাঠক এবং উপাদান হইতে পারিত না; মুক্ত প্রকৃতির তৃণ-স্তীর্ণ শ্যাম ক্ষেত্রে অঙ্গ মেলিয়া না শয়ন করিলে, জগৎপ্রাণের নিকট হইতে মুক্ত প্রান্তরের প্রাণবর্দ্ধক সঞ্জীবন সমীরণ শ্বাসযন্ত্র পরিপূর্ণ করিয়া না লইলে, আজ এই সংসারের উপলবিষম বন্ধুর ক্ষেত্রে বারংবার পতনের বিষম বেদনায় কোন্ দিনে তাঁহার ছাত্রেরা তাহাদের জীবলীলা শেষ করিয়া দিত এবং তাঁহাকেও শিষ্যের অকালমৃত্যুর শোক এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইত।

একত্রে আমরা অনেকগুলি বিদ্যার্থী বাস করিতাম; তার মধ্যে মাষ্টার মহাশয়ের পুত্রকল্প ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও ছিলেন; কিন্তু আমার চিরন্তন বিশ্বাস যে মাতৃক্রোড়বিচ্যুত পিতৃহীন ভ্রাতাভগিনীর স্নেহবঞ্চিত, এই অসহায় ছাত্রটীর উপরই তাঁহার স্নেহ সমধিক ছিল; এ বিশ্বাস আমি আজীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। আমার এই বিশ্বাস সত্য কি না তাহা তিনিই বলিতে পারেন—হৃদয়ের সাক্ষী হৃদয়ই দিতে পারে, আর যদি অন্তর্য্যামী বলিয়া কেহ কোথায়ও থাকেন, তবে তিনিই জানেন।

বাল্যজীবনে জগতের কোন সামগ্রীর উপরেই লোভ ছিল না, কেবল আহারীয় পদার্থ আমার সমস্ত দেহ-মন-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিত। শৈশবে ম্যালেরিয়া জ্বর, শূলবেদনা, ইত্যাদি শত্রুর জ্বালায় এবং কবিরাজ মহাশয়ের রোগ-আরোগ্য-জনিত যশোলিপ্সায় আমাকে একরূপ বায়ু আহার করিয়াই থাকিতে হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাবিলাম বিদেশে পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিব, কারণ ম্যালেরিয়া নাই, শূলবেদনা কদাচিৎ কখনও দেখা দেয়, এবং কবিরাজ মহাশয়ও ৩০ মাইল দূরে থাকেন; কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট, খাদ্যের প্রতি ক্ষুধা-পীড়িত এই বালকের লোলুপ দৃষ্টি অপেক্ষা আমাদের পাচক দয়ারাম শর্ম্মার লোভ যে সমধিক তাহা কে জানিত! সকালবেলা স্কুলে যাইবার তাড়ায় যাহা পাই তাই খাইয়া যাইতে হয়, ভাগ্যে মসূরির ডাইল আর আধসিদ্ধ ভাত ছাড়া আর কিছুই জুটিত না। স্কুল হইতে আসিয়া লুচি ও হালুয়ার বরাদ্দ ছিল বটে, কিন্তু হালুয়ার দুধটুকু দয়ারামের উদর স্নিগ্ধ করিত, আমাদের ভাগ্যে জলে সিদ্ধ করা প্রতিমার গায়ে রাঙ্‌তা লাগাইবার সুজির আটা মিলিত; মাছ যাহা আসিত, দ্বিপ্রহরে নাকি সে মাছের পেটি কোন দিন বিড়ালে খাইয়া যাইত, কোন দিন বা প্রেতলোক হইতে দয়ারামের দূরসম্পর্কীয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতা কোন এক প্রেতিনী দিদিমা নাকিসুরে যাচ্‌ঞা জানাইয়া দয়ারামের দয়ার উদ্রেক

করিত! যাহার নাম গয়ারাম, তাহার দিদিমা এতদিন প্রেতত্বমুক্তা হয় নাই, এ বড় আশ্চর্য্য ও পরিতাপের কথা! সেই পরিতাপের জন্য আমরা সকলগুলি ছাত্র চাঁদা করিয়া গয়ারামের গয়াযাত্রার ও তাহার দিদিমার পিণ্ডদানের খরচা দিতেও চাহিয়াছিলাম; তবুও দিনক্ষণ দেখিতে সে বহু বিলম্ব করিতে লাগিল। এ দিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত ছাত্রাবাস অধীর হইয়া উঠিল এবং উদ্ভাবনীবুদ্ধিবিশিষ্ট বর্ত্তমান জীবনীলেখক জগদিন্দ্রকে ভূতশান্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য ধরিয়া বসিল। আমার পাঠকপাঠিকা সকলেই জানেন—বুভুক্ষা কাব্য, শাস্ত্র, নীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি মানবের মনোজ্ঞ নানা বিষয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া স্বয়ং প্রবল হইয়া বসে, অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট বালক বিদ্যার্থীবৃন্দ যে অধীর হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। আমাদের বিদ্যা"বিহারে"র দ্বারবান মন্নু সিংহের একটী জোড়া-সিং বিশিষ্ট পাটনাই মেড়া ছিল; মন্নু তাহাকে বহু যত্নে চানা দানা খাওয়াইয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিল এবং পিঁড়ি ধরিয়া তাহাকে ঢুঁ মারা বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী করিয়া তবে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে বালক-ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীবৃন্দের কাতর আর্ত্তরোদনে জগদিন্দ্রের আসন বিচলিত হইয়া উঠিল, সে ছাত্রগণকে অভয় দিয়া আগামী রবিবারের প্রভাতে দুষ্টের দমন করিবে বলিয়া রোরুদ্যমান ছাত্রনিবাসকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া রাখিল। বিপদে দেবতারাও অনেক ইতর প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়া বিপন্মুক্ত হইয়াছেন পুরাণে শোনা আছে; জগদিন্দ্র সেই সৎ দৃষ্টান্তে এই মন্নু-পালিত মেষাসুরের শরণাপন্ন হইল।

রবিবার প্রত্যুষে স্নাত গয়ারাম সদর দরজায় যেমন পা দেওয়া অমনি ভুক্ত-পলাণ্ডু-মর্দ্দিত-কর্ণ, * মন্নুর মেড়া ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের বেগে গয়ার প্রতি ধাবমান হইল; প্রাণভয়ে ভীত গয়া চক্ষু মুদিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, ভাবিল উহাতেই মেষাসুর ক্ষান্ত হইবে। এই ভ্রমাত্মক ধরণীতে মানব কত ভ্রমেই ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করে! মেষাসুর ক্ষাত্রনীতি অনুসারে ত যুদ্ধ করেনা যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন-কারীর অঙ্গে অস্ত্র প্রহার করিতে ক্ষান্ত হইবে—পাটনাই মেড়ার দুর্ব্বার জোড়া-শৃঙ্গ গয়ারামের পশ্চাতে সজোরে আঘাত করিল, মেষাসুরের দুর্নিবার বেগে গয়াসুর ভূলুণ্ঠিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ছাত্রা-

* পলাণ্ডু খাওয়াইয়া দিলে এবং মেষের কাণ মলিয়া দিলে তাহার ক্রোধ সমধিক বৃদ্ধি হয় এবং সে ঢুঁ মারিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে; বর্ত্তমান জীবনী-লেখক গয়ারামের আগমনের পূর্ব্বেই এ সমস্ত পূর্ব্বকৃত্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছিল।

বাসের প্রতি কক্ষ হইতে আনন্দের কলহাস্যরোল সমুত্থিত হইয়া আর্ত্তের মরণ-চীৎকারের সহিত মিশিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় সে সময় তাঁহার নিত্য প্রাত-র্ভ্রমণ হইতে ফেরেন নাই, সেই অবসরে এই বিগ্রহের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই গয়াসুরের সহিত মৎস্য ও দুগ্ধ প্রভৃতি সুখাদ্য ও সুপেয় পদার্থের যথারীতি প্রাপ্তির অঙ্গীকার লইয়া উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল। বহুকাল পরে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে এবার রাজসাহী গিয়াছিলাম। গয়ারামের অনুসন্ধান করিলাম; শুনিলাম সে বিদ্যার্থীবধব্যবসায়ে ক্ষান্ত দিয়া মেঠাইয়ের দোকান করিয়াছিল। তাহার লোলুপ লেলিহান জিহ্বা দোকানে লাভ করিতে দিয়াছে কিনা, ইতিহাস সেকথা বলে না; তবে তাহার দোকান উঠিয়া গিয়াছে এবং সেও এ ভবের হাট হইতে তাহার দেনাপাওনা চুকাইয়া দোকান-পাঠ তুলিয়া বিশ্বের সকলেই যে পথে যায় সেই অন্ধকারপথে অনির্দ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে। গয়ারাম বিদ্যার্থীদিগের বিশেষ বন্ধু ছিলনা সত্য; তথাপি সেই পূর্ব্ব-পরিচিত অত্যাচারপীড়িত ব্রাহ্মণের মৃত্যুসংবাদ আমায় কাতর করিয়া তুলিয়া-ছিল; বিশেষ নিজের আহারের সৌকর্য্য বিধান করিবার জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যৎপরোনাস্তি শারীরিক পীড়া দিয়াছি স্মরণ করিয়া নিজকে বারম্বার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইতেছিল। যে প্রকারেরই হউক দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন পাইলেই প্রাণ-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট হয়; তাহারই জন্য অপরের পীড়ার কারণ হইয়াছিলাম ভাবিয়া অন্তর বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষিত স্নেহ-হস্তের দত্ত এক সন্ধ্যার শাকান্নে জীবনধারণ, জীবনভরা তপস্যা করিয়াও সকলের অদৃষ্টে সংঘটন হয় না; যদি বা দুদিনের জন্য কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে, আবার কোন অজ্ঞাত এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধে সেই জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবের সুখময় পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্ব্বান্ধব ধরার মাধুকরীর অন্নে জীবনযাপন করিবার জন্য একাকী বাহির হইয়া পড়িতে হয়; এইত সংসারের জীবনযাত্রা! ইহারই জন্য খাওয়া-পরা চলা-ফেরার এত আয়োজন উদ্যোগ, এত সোরগোল! চিরদিবসের আকাঙ্ক্ষিত জীবনসঙ্গীটির সহিত দিনান্তের ক্ষুধার অন্ন কয়টি ভাগ করিয়া নিয়া নিরুদ্বেগ আনন্দে কয়টা দিন কাটাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলে তার বাড়া সৌভাগ্য কেহ চায় না। কিন্তু হায়, এই স্বল্প প্রার্থনাটি পূরণ হওয়ার পথে কত কণ্টক যে আমরা সৃজন করিয়াছি, তাহার শেষ নাই, সীমা নাই! মানবরচিত এই কণ্টকের আঘাতে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে, নয়নপথে নদী বহিয়া যায়, জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তথাপি ইহার

প্রতিবিধানকল্পে কিছুই করিবার সাধ্য কাহারও **নিজ হাতে** নাই, এই **ভ্রমাত্মক** জ্ঞানে আমরা নিত্যনিয়ত বাঁচিয়াও মরিয়াই আছি। এ মরা শুধু নিজের নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার একান্ত আশ্রিত, আমার মুখাপেক্ষী, যাহার সুখদুঃখের সমস্তভার আমি নিজ হাতে নিয়া বারম্বার আশ্বাসের অভয় বাণীর মধ্যে তাহার আশাকে দুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছি, সেই অনন্যশরণকেও আমরা যে দুর্ব্বার দুঃখ দিয়া তিলে তিলে তাহার আয়ুঃশেষ করিয়া দিই, সে বেদনা রাখিবার স্থান যে ধরণী খুজিয়াও পাওয়া দুষ্কর।

( ক্রমশঃ )

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

## ভাদরে

আজিকে মধুর ভরা ভাদরে।
দরদর ধারা বয় সুধারস ধরাময়,
দাদুরী মুখরা হলো আদরে॥

গিরিদরী বিদাধিয়া জলধারা চলিছে,
নদ নদী গদ গদ নাদে কি যে বলিছে।
কৃষাণী আদুরী হয়ে পতি কোলে ঢলিছে,
ডুবিল সকল বাধা বাদরে॥

কুলায়ে ঘেঁষিয়া বসে গায়ে গায়ে পাখীরা,
নিশীথেও মিলে আজি যত চখা চখীরা,
গৃহে করে কলরব মিলি সখাসখীরা;
নবীন মাধুরী বধূ-অধরে॥

হৃদয়ে বেদনা লয়ে মিলনের পিয়াসী,
কোন্ পাপে আছ আজি আনমনা উদাসী;
সব বাধা ভেঙে এস সুদূরের প্রবাসী,
মিছে কেন মেঘদূতে সাধ' রে॥

ঝাঁক ছেড়ে আজি মীন ঘুরে নাক সরসে,
আধ' ঘোমটার আড়ে আজি কা'র পরশে
শ্যামল দুকূলে ধরা ঢাকে লাজে উরসে?
করীশিরে ঝরে ধারামদ রে॥

শ্রীকালিদাস রায়

# পূর্ব্ববঙ্গে এক সপ্তাহ।

## ( ভ্রমণ-কাহিনী। )

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরের নিমন্ত্রণ যথেষ্ট প্রলোভনের সামগ্রী বিবেচনায় গত আষাঢ় মাসে মুক্তাগাছায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানের বিশ্ববিশ্রুত 'সাহিত্য-স্থয়' যজ্ঞে বন্ধু সম্মিলন, সীতাভোগ ও মিহিদানার প্রলোভন, এবং 'সুপক্ক' ( অর্থাৎ পাকা ) রোহিতের উৎকট মুণ্ডের আস্ফালনও যাহাকে বর্দ্ধমানে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার 'আষাঢ়স্য দশম দিবসে' গৃহত্যাগ করিয়া প্রবাসে যাত্রা উৎকটতর সমস্যার বিষয়। কিন্তু কবি বলিয়াছেন, 'য হি যস্য হৃদ্য, নহি তস্য দূরঃ' সুতরাং সুদূর মুক্তাগাছার কুমার-সম্ভাষণ-যাত্রা আমার পক্ষে আনন্দেরই কারণ হইয়াছিল; তাহা দূর বলিয়া মনে হয় নাই।

যে ঘোড়ার-গাড়ী আমাদের 'ডাক' লইয়া যায়—তাহার ঘোড়াগুলি 'বেতো' এবং গাড়ীর চাকায় 'পটি' দেওয়া!—কিন্তু গাড়ীতে চড়িয়া মনে হয় পুষ্পকরথে সুরপুরে যাত্রা করিয়াছি; রসাতলের পথে যাত্রা প্রায়ই এ রকম সুখদায়ক হয় না।—'কুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ' জেলবোর্ডের পথেরই বা কি শোভা! যেন নন্দন-কাননের প্রবাল-খচিত বাপীতট! কিন্তু পথের দুইধারের কৃশ বঙ্কিম বাবলা-গাছগুলাকে-মন্দারতরু বলিয়া কাহারও ভ্রম হয় না।—বেতোঘোড়া উচ্চৈঃ-শ্রবার বংশধরের মত ছুটিল।—চারিটার সময় ষ্টেসনে আসিয়া কর্ম্মভোগ—শেষে কিঞ্চিৎ জলযোগ।—ষ্টেসনের 'গুড্‌স্ ক্লার্ক' অতি সদাশয় ও বিনয়ী। বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত হৃদ্যতাসূত্রে তিনি বিরাট জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন; তন্মধ্যে চারিটি মর্ত্তমানরম্ভা ছিল;—তাহা দেখিয়া আমি প্রথমে পাকা-কাঁচকলা মনে করিয়াছিলাম এবং যাত্রারম্ভেই কাঁচকলা দর্শন ভাবিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা ক্ষুধানলে যে ইন্ধন-সংযোগ করিল, তাহার চাপে অনল সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইল।—খড়ের আগুন সুঁদরী কাঠের ভার সহ্য করে না।

আমার 'দার্জ্জিলিং মেলে'র আরোহী হওয়া আবশ্যক।—'হার্ডিঞ্জ সেতু'র উপর দিয়া যাত্রীগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবার সময় হইতেই ট্রেণ সমূহের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।—সন্ধ্যার পর যে ট্রেণ পোড়াদহে দীর্ঘকাল বিশ্রাম

করিয়া দারজিলিং মেলের আরোহী লইয়া গোয়ালন্দে যাইত, সে ট্রেণখানি এখন পোড়াদহে আসিয়া দারজিলিং মেলের পথ ছাড়িয়া দিয়া পরে ঈশ্বরদি ষ্টেসনে গিয়া দীর্ঘনিদ্রার আয়োজন করে।—আমি চুয়াডাঙ্গায় ময়মনসিংহের through টিকিট পাইলাম না, অগত্যা 'ঈশ্বরদি লোকালে' উঠিয়া পোড়াদহ যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়াছে।

'মুন্সীগঞ্জ'—'মুন্সীগঞ্জ' করিয়া হাঁকিতেই তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ী হইতে এক-দল লোক ঝুপঝাপ্ করিয়া নামিয়া পড়িল।—তাহাদের হাতে ন্যাক্ড়া-জড়ানো কাস্তে, মাথায় 'মাথাল'; এবং বগলে এক একটা মোট,—তৈজসপত্র কাঁথা দিয়া জড়ানো। পূবে 'টাকায় যোড়া মুনিস'; ইহারা পাট-কাটিতে পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবে; মুন্সীগঞ্জে তাহাদের 'সেথো'র বাস, তাই এখানে নামিল। তাহাদের কি স্ফূর্ত্তি!—হঠাৎ ইহাদের একটা প্রেমের গান মনে পড়িয়া গেল;—

"যখন ক্ষ্যাতে—ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি,
ও মোর মনে জাগে তার 'লয়ান' দুটি!"

ইহাদের হৃদয়েও স্নেহ, প্রেম, মায়া মমতার উৎস প্রবাহিত হইতেছে; তবে ইহারা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' বিরহী যক্ষের মত বিরহগাথা বর্ণনা করিয়া বিশ্বের বিরহী-হৃদয়ে অন্তর্ব্যথা ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। তথাপি তাহারা বনপথে, ধান্যক্ষেত্রে, পাঠ পচাইবার সময় বিলের জলে, নদীতীরে সঙ্গীগণের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে যে গান গাহিয়া থাকে,—আমাদের ভদ্র-সাহিত্যে আজও তাহার স্থান হয় নাই;—আমাদের ভাষাজননীর সেই ঐশ্বর্য্য আমরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করি।

রাত্রি আটটার কিছু পূর্ব্বে পোড়াদহ ষ্টেসনে নামিলাম।—আর আধঘণ্টা পরে 'দারজিলিং মেল' পবনবেগে উপস্থিত হইবে। আমি 'বুকিং' অফিসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 'কেরাণীবাবুকে' ডাকিলাম।—দুইবার আহ্বানের পর তিনি বলিলেন, "কাণ আছে, বলুন, কি চাই!"—আমি বলিলাম, "ময়মনসিংহের একখান টিকিট।"—'টিকিট বাবু' পেন্সিল দিয়া ঠিক গণিতেই লাগিলেন। আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "ময়মনসিংহ ভায়া তিস্তামুখঘাট একখান সেকেন্ ক্লাস রিটার্ণ টিকিট।"—বাবু পেন্সিল ফেলিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আবার আধঘণ্টা হিসাবের ফেরে ফেল্‌লেন দেখ্‌চি!"—তিনি লম্বা একখানা 'পিস্‌বোর্ড' দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া ঠিক দিয়া বলিলেন—"১৩।০ স-তের টাকা দেন।"—টিকিট কিনিয়া

কাঠের সাঁকো পার হইয়া নূতন প্লাটফর্ম্মে আসিয়া দেখি, একজন টিকিট-'চেকার' 'পঞ্চ' লইয়া লণ্ঠনের আলোকে যাত্রীদের টিকিট 'চেক্' করিতেছেন।—একটা লোক আলোকস্তম্ভে ঠেস্ দিয়া মাঠের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল;—টিকিট-'চেকার' বলিলেন, "তোমার টিকিট?"—সে কথাটা কাণে তুলিল না। টিকিট-'চেকার' 'পঞ্চ'দ্বারা তাহার স্কন্ধে আঘাত করিয়া বলিলেন,—"তোর টিকিট্ কোথা রে!"—লোকটা কটমট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, "আমার ঘরের গাড়ীতে যাব, আমার আবার টিকিট!"—প্রশ্ন হইল, "কোথায় যাবি?"—উত্তর "শ্বশুরবাড়ী!"

টিকিট-'চেকার' তখন তাহার ঘাড় ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে—ষ্টেসনের দিকে লইয়া চলিলেন। লোকটা বড়ই রসিক; সে বলিল, "তুমি আমার ঘাড়ে ধাক্কা দিচ্ছ, আমি কি তোমার "তগ্‌গিন্‌পোত্?" উত্তরে 'শালা' বলিয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক তাহার গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত!—সে গালে হাত বুলাইয়া বলিল, "ভগ্‌গিন্‌পোত বল। সম্বন্ধ ভুল!" বলিয়াই সে টিকিট-'চেকারের' লণ্ঠনে ফুৎকার প্রদান করিল।—একজন বলিল, "ও পাগল।" আর একজন বলিল "সেয়ানা পাগল,—বিনি টিকিটে নৈহাটী থেকে বরাবর আমাদের সঙ্গে আস্‌চে!"

দারজিলিং-মেল মহাগর্জ্জনে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া হুস্ হুস্ করিয়া কতকগুলা বাষ্প ছাড়িয়া দিল। আমি গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, প্রত্যেক কামরার কাচময় দ্বারের পাশে এক এক খানি টিকিট ঝুলিতেছে! কেহ হয় ত একটি অংশমাত্র 'রিজার্ভ' করিয়া ষোল-আনা কামরা দখল করিতেছেন; দুজনে দুখানি বেঞ্চিতে দেহ প্রসারিত করিয়া আরামে নিদ্রাভোগ করিতেছেন। কোন কামরায় হ্যাট ও লাঠির প্রাদুর্ভাব অধিক,—সাহেবরা ভোজনকক্ষে জঠরানল প্রশমিত করিতে গিয়াছেন।—অগত্যা বাছিয়া বাছিয়া একটি কামরায় প্রবেশ করিলাম; এক-কোণে এক সাহেব একটি ঝালরওয়ালা বালিস্ ঘাড়ে দিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে একখানি বিলাতী খবরের-কাগজ পাঠ করিতেছেন; তাঁহার পায়ের দিকে একজন বাবু যুদ্ধক্ষেত্রে-আহত বীরের ন্যায় পড়িয়া আছেন।—পোষাকের পারিপাট্য দেখিয়া বুঝিলাম—বড়লোকের ছেলে।—আর একখানি বেঞ্চিতে একটি কালোরঙ্গের সাহেব!—সাহেব রেলে কাজ করেন বলিয়া বোধ হইল।—আমি সেই বেঞ্চিতেই বসিয়া পড়িলাম।—মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছিল।—বড় আরাম বোধ হইল!

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

আমি বলিলাম, "ময়মনসিংহ।"

সাহেব যায়গার নাম ঠাহর করিয়া লইয়া বলিলেন, "মুঙ্গের যাইবে?"

কোথায় মুঙ্গের, কোথায় ময়মনসিংহ! সাহেব রেলের সাহেবই বটে!—আমি বলিলাম, "ময়মনসিংহ নামক একটা জেলা আছে,—সেইখানে যাইব।—তুমি কোথা যাইবে?"

সাহেব বলিলেন, "কার্সিয়াঙ্। আমি সেণ্ট্রাল-প্রভিন্সেস্ থেকে আস্ছি, বাবু! এ অঞ্চলে আর কখনও আসি নাই।"—

কিছুকাল পরে সাহেবের এক বন্ধু আসিয়া সাহেবকে কি বলিল, সাহেব তাঁহার লটবহর লইয়া প্রস্থান করিলেন; আমাকে বলিলেন, "তুমি make yourself comfortable, Babu!—সাহেবের উদারতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া একটু আরাম করিয়া বসিয়াছি,—এমন সময় নিদ্রিত বাবুটির এক বন্ধু কক্ষান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার কর্ণমূলে কি বলিলেন, তৎক্ষণাৎ বাবুটির নিদ্রা-ভঙ্গ,—তিনি উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন; কয়েক মিনিট পরে যখন ফিরিলেন, তখন বেশ প্রফুল্ল মনে হইল। আমি ময়মনসিংহে বেড়াইতে যাইতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার পছন্দ ত বেশ! - ময়মনসিংহে বেড়াইবার সময় বটে!"—আমি বলিলাম, "বৃষ্টিতে গলিয়া যাইব,—আশঙ্কা করিতেছেন না কি?"—ভদ্র-লোকটি হাসিয়া বলিলেন, "অসম্ভব কি?—বৃষ্টির বহরটা একবার দেখে নেবেন। সে চেরাপুঞ্জির মুলুক!"

ট্রেণ তখন বন্ বন্ করিয়া লৌহপথের উপর দিয়া বিশালকায় 'হার্ডিঞ্জ সেতু'র অভিমুখে ছুটিতেছিল।—ভদ্রলোকটি একাগ্রচিত্তে আত্মকথা বলিতে লাগিলেন, আমার মত সহিষ্ণু শ্রোতা বোধ হয় তিনি জীবনে পান নাই! তিনি বগুড়ার একজন জমীদার। তিনি প্রতিদ্বন্দী জমীদারের সহিত হাইকোর্ট পর্য্যন্ত ফৌজদারীতে লড়িয়া প্রতিদ্বন্দীকে ঘোল খাওয়াইয়াছিলেন!—তাঁহার ভগিনীপতিকেও জেলে দিতে দিতে দেন নাই। জেলা-আদালতে তিনি স্বয়ং ব্যারিষ্টারের পাশে দাঁড়াইয়া এমন সওয়াল-জবাব করিয়াছিলেন যে, জজ-সাহেব অবাক্ হইয়া দশ মিনিট এজলাসের কড়িকাঠ গণিয়াছিলেন! আর একবার ময়মনসিংহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল মহাশয় যেই শুনিলেন উক্ত ভদ্রলোক মামলার প্রতিবাদী, তৎক্ষণাৎ তিনি জিহ্বাদংশন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "মহাভারত! উঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিব না; তোমরা যে টাকা দিয়াছ ফিরাইয়া লও।"—আরও জানিতে পারিলাম, তিনি একজন অনরারি-ম্যাজিষ্ট্রেট;

একটা মেয়েচুরীর মামলার বিচারভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে ; মামলার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করিয়া তিনি সদম্ভে বলিলেন "আসামী-বেটাকে সেসন-সোপর্দ্দ করিব।"—আমি সভয়ে বলিলাম "অনেক অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট ত বিলক্ষণ আহার করিয়া থাকেন! এমন কি হাটে আসিয়া কলাটা মূলাটাও ভেট লইতে ছাড়েন না।"—হাকিম ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "সে বেটাদের কথা ছেড়ে দেন।"

দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া ট্রেণ সশব্দে 'হার্ডিঞ্জ সেতু'র উপর উঠিল। কি সুবিস্তীর্ণ সেতু! শুক্লা-ত্রয়োদশীর চন্দ্র পূর্ব্বাকাশের ঈষৎ ঊর্দ্ধে হইতে অমল-ধবল রজতচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিলেন। সেতুর ভিতর প্রবেশ করিয়া পদ্মা দেখিবার সুবিধা হইল না, কিন্তু সেতুর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পদ্মার যে নৈশ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম, তাহা বুঝি কখনও ভুলিতে পারিব না।—যখন সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন পদ্মা-তীরে—এই সেতু-সান্নিধ্যে বাহিরচরে নগর বসিয়াছিল।—এখন সে নগর পরিত্যক্ত; কতকগুলি টিনের কুটীর ও একটি সুদীর্ঘ 'চিম্‌নী' চন্দ্রালোকিত গগনে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া কালের কুটিলগতি নির্দ্দেশ করিতেছিল।—যেখানে নিয়ত কলকোলাহল-বিক্ষুব্ধ বহুজনপূর্ণ শব্দময়ী নগরী ছিল, সেস্থান এখন নীরব, নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীহীন!—তাহার পাশেই পদ্মা-তরঙ্গ বাহু প্রসারিত করিয়া কলপ্রবাহে মহাসিন্ধুর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইতে ছুটিয়াছে।—নদীর খরস্রোতে চাঁদের আলো পড়িয়া দূরে দূরে যেন সহস্র পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ-চ্ছটায় তাহা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে!—দুই একখানি জেলেডিঙ্গি তরঙ্গভঙ্গ ভেদ করিয়া মৎস্যানুসন্ধানে স্রোতের প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে; দাঁড়ের জলে চাঁদের আলো পড়িয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে—চিত্রকরের তুলিকাতেও তাহা যথাযথভাবে পরিব্যক্ত হয় না। নদীতীরে সুদূর প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে; তাহার প্রান্তভাগে অরণ্য—গাছগুলি পাহাড়ের মত ধূসর বোধ হইতেছে।—হঠাৎ ট্রেণ ঝন্ ঝন্ শব্দে সেতুর ভিতর প্রবেশ করিল। লোহা-লক্কড়ের বিরাট কাণ্ড! প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিতে হয়!—মনে হয় কি দারুণ অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তির সাহায্যে দুর্ব্বল মানব-হস্তের এই বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে! এই সেতুর উপর ট্রেণখানি পূর্ণ পাঁচ মিনিট রহিল; তবে সেতুর উপর ট্রেণের গতি হ্রাস হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম।—সেতু পার হইয়া ট্রেণ 'পাকুসী' ষ্টেসনে থামিল। পাকুসী ষ্টেসনের দৃশ্য বড় সুন্দর।

প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর শত শত লোক 'প্যাকিং বাক্সে' বরফ ঢালিয়া তাহাতে ইলিস-মাছ বোঝাই করিতেছে!—তিন চারি পয়সা মূল্যের এক একটি ইলিস্ ইলিস্‌হীন স্থানে গিয়া ছয় সাত আনা মূল্যে বিক্রয় হইবে। ইলিস-মাছের চালানী-কারবার এ অঞ্চলের একটি প্রকাণ্ড লাভজনক ব্যবসায়। শুনিলাম—এই ব্যবসায়ে অনেকেই কমলার বরপুত্র হইয়াছে। মনে পড়িল একজন লোক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, "মা-লক্ষ্মীর বিচার নাই, তাঁর প্যাঁচাটা তাঁহাকে যেখানে লইয়া যায়—সেইখানেই তিনি যান।"—মা-লক্ষ্মীর প্যাঁচা নিশ্চয়ই ইলিস মাছের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

পাক্‌সী নূতন ষ্টেসন; সাবেক ষ্টেসন 'সাঁড়া' হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। যখন ষ্টীমারে পদ্মা পার হইতে হইত, তখন সাঁড়াঘাটের লক্ষ্মীশ্রী ছিল; সাঁড়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগরের আকার ধারণ করিয়াছিল; সেই সাঁড়া এখন পরিত্যক্ত, কোলাহল-শূন্য। শ্মশানের নিস্তব্ধতা এখন সেখানে রাজত্ব করিতেছে। সাঁড়ার গৌরব-রবি অস্তমিত, 'সাঁড়া-সেতু' নামটি থাকিলেও তাহার অতীত-গৌরবের স্মৃতি-চিহ্ন থাকিত। কিন্তু আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় বড়লাট বাহাদুরের নামানুসারে সেতুর নাম 'হার্ডিঞ্জ সেতু' হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। এই সেতু চিরদিন ভারতবর্ষে অন্যতম বিস্ময়কেতু রূপে বিরাজমান রহিবে। তবে পদ্মা যদি সেতু অতিক্রম করিয়া অন্য দিকে বাহু প্রসারিত করেন, তাহা হইলে সেতু নির্ম্মাণ নিস্ফল হইবে। সেতুর এক একটি স্তম্ভ কলিকাতার 'অক্টরলোনী মনুমেণ্টে'র সমান উচ্চ! ভেড়ামারা ষ্টেসনের পর হইতেই রেলের লাইন ক্রমে উচ্চ হইতেছে,—দিবাভাগে ট্রেণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও কিছু-দূর অগ্রসর হইলে সেতুর উর্দ্ধভাগ নীল আকাশের কোলে ধূসর মেঘের মত দেখিতে পাওয়া যায়।

'পাক্‌সী' ষ্টেসনের যথেষ্ট কদর হইয়াছে। অনেকদূর পর্য্যন্ত লোকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। দিবাভাগে ট্রেণ হইতে এই নদীতীরবর্ত্তী নগরের দৃশ্য অতি মনোহর; যেন কোনও সুদক্ষ চিত্রকর একখানি ছবি আঁকিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর; পাবনা জেলার অন্তর্গত। মধ্যে একবার জনরব শুনিয়াছিলাম, এখানে একটি মহকুমা স্থাপিত হইবে। ইংরাজ-পছন্দ স্থান বটে! মহকুমা হইলে এখানে একজন যুবক সিভিলিয়ানের মনোজ্ঞ বাসস্থান হইতে পারে।—পাক্‌সীর পরে 'ঈশ্বরদি' ষ্টেসন।—নূতন ষ্টেসন, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের অধিকাংশ ষ্টেসনের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই,

নূতন ছাঁদে নির্ম্মিত।—ইহার এক দিকে সান্তাহার যাইবার লাইন, অন্য দিকে সিরাজগঞ্জের লাইন। সিরাজগঞ্জের লাইনের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, শীঘ্রই যাত্রী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইবে। পাট-মাহাত্ম্যেই এই লাইনের সৃষ্টি। এই লাইন খোলা হইলে কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ যাওয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়-সাধ্য হইবে, ব্যয়ও অনেক কম পড়িবে। গোয়ালন্দের পথে ময়মনসিংহ যাইতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়; দীর্ঘকাল পদ্মাবক্ষে ষ্টীমারে থাকিতে হয়। দক্ষিণাঞ্চলের যে সকল লোক ঢাকায় যাইবার ইচ্ছায় গোয়ালন্দে নামিয়া পদ্মার বিশাল তরঙ্গভঙ্গ ও বিপুলায়তন দেখিয়া সেখান হইতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অল্প আতঙ্কের বিষয় নহে। কিন্তু ময়মনসিংহের অনেক লোক—এইভাবে শিরোবেষ্টনে নাসিকা প্রদর্শনেরই পক্ষপাতী। সুতরাং এই পথেই তাঁহারা যাতায়াত করেন। কেহ কেহ বলেন,"ষ্টীমারে লম্বা হইতে পারিলে এক ঘুমেই যখন পদ্মা পার হওয়া যায়,—তখন এমন সুবিধার পথ ছাড়িয়া বিপথে কেন যাই। নামো আর ওঠো!"

'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'—আমি তিস্তামুখঘাট পার হইয়া যাওয়াই ভাল মনে করিয়াছি; বিশেষতঃ কুমার-বাহাদুর এই পথেরই বার্ত্তা দিয়াছিলেন; কোথায় কখন নামাউঠা করিতে হইবে, তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে তাঁহার পত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

'ঈশ্বরদি' ষ্টেসন হইতে ট্রেণ নাটোরে আসিয়া থামিল। এই সেই অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া নারীকুলগৌরব মহারাণী ভবানীর নাটোর, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে দিন সার্থক হয়। শুনিলাম, এ অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর জমী নাই, তিনি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান, এ কথা এখনও অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহে না! অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে ছিলেন না, যিনি মহারাণী ভবানীর নিকট নিষ্কর ভূমি না পাইয়াছিলেন।—বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুর নাটোরের গৌরব; কিন্তু সাধারণলোকে, বিশেষতঃ ভোজন-বিলাসীরা নাটোরের গোল্লা ও দধিকেই নাটোরের গৌরবের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঔদরিক সম্প্রদায় নাটোরের অত্যন্ত পক্ষপাতী। নাটোরের গোল্লা রেল-যোগে বঙ্গের বহু স্থানেই প্রেরিত হয়। মহারাজা বাহাদুরের কলিকাতাস্থ প্রাসাদে তাহার কিরূপ আদর, তাহা সুবোধ-যতীন-জলধরপ্রমুখ বন্ধুগণের বিদিত থাকাই সম্ভব।

যাত্রীগণের একটি অসুবিধা লক্ষ্য করিলাম। সেতু-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে সাঁড়া হইতে ছোট মাপের 'লাইন' ছিল, এখন বড় লাইন (ব্রড্ গেজ্) হইয়াছে।

ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মগুলি ছোট-মাপের লাইনের গাড়ীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন ট্রেণ হইতে নামিবার সময় প্ল্যাটফরমে নামিতে বড় কষ্ট হয়। সঙ্গে স্ত্রীলোক বা শিশু থাকিলে এঁড়ে গরুর লেজ ধরিয়া বৈতরণী পারের মত সঙ্কটে পড়িতে হয়! সান্তাহার পর্য্যন্ত অনেক ষ্টেসনেরই এই অবস্থা।—নাটোর ছাড়িয়া ট্রেণ একদম্ সান্তাহার ষ্টেসনে থামিল। বড় লাইন শেষ হইল। তথন রাত্রি প্রায়—সাড়ে এগারোটা।

বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে ও ট্রেণের মৃদুমন্দ ঝাঁকুনীতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। পথ নূতন বলিয়া নাটোর ছাড়িবার পর হইতেই ট্রেণের গতি হ্রাস হইয়াছিল, 'দারজিলিং মেল' যে এত ধীরে যাইতে পারে, এরূপ ধারণাই ছিল না। আত্রেয়ী নদীর সুদীর্ঘ সেতু কখন অতিক্রম করিলাম, স্মরণ নাই। হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, শত বৈদ্যুতিক দীপের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত সান্তাহার ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণ থামিয়াছে!—কুলির দল ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া সাহেব ও মেম সাহেবদের বিছানা বাক্স লইয়া টানাটানি করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার দরজার সম্মুখে কাঠের সিঁড়ি আনীত হইল।—ষ্টেসনে প্ল্যাটফর্ম্ম নাই, লাইনের উপর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর ভিতর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল; কারণ তাহারা অল্প ভাড়ায় আসিতেছে। আমি আমার ব্যাগটি হাতে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম। চারিদিকে জনস্রোত, শত শত আরোহী মোট গাঁটরী প্রভৃতি মুটের ঘাড়ে চাপাইয়া নির্দ্দিষ্ট ট্রেণের সন্ধানে ছুটিয়াছে!

আমরা যে ট্রেণে যাইব, তাহা কিছুদূরে লাইনের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেণখানি ক্ষুদ্র, গাড়ীগুলি ট্রাম গাড়ীর অপেক্ষা একটু বড়।—একখানি গাড়ীর অর্দ্ধাংশে প্রথম শ্রেণীর, অপরার্দ্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা; মধ্যে একটি দ্বার। এই একখানি গাড়ী ভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য গাড়ী নাই! আজকাল যেমন অনেক বাঙ্গালা কবিতা গদ্য কি পদ্য,—মাথায় লেখা না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না, এ গাড়ীর অবস্থাও সেই প্রকার; লেখা না দেখিলে কোন্‌খানি কোন্ শ্রেণীর কামরা, তাহা স্থির করা যায় না। বেঞ্চি দুইখানিতে চারিজন লোক অতি কষ্টে বসিতে পারে। ঊর্দ্ধে একটা কেরোসিনের আলো টিপ্ টিপ্ করিতেছে। এক পাশে ছড়ি বা টুপি রাখিবার

জন্য একটা 'র্যাক্' আছে; তাহার উপর একদল মাকড়সা মৌরুসি পাট্টা লইয়া জাল বুনিয়া শিকারের সন্ধানে বসিয়া আছে; ঝাড়ুদারের সম্মার্জ্জনী সেখানে ঘেঁসিবার অবকাশ পায় নাই। দারজিলিং মেলের বিদ্যুতালোক-সমুজ্জ্বল —বৈদ্যুতিক-'পঙ্খা'ন্দোলন-সুশীতল, আরামদায়ক স্থূল-আস্তরণ-সুশোভিত সুপ্রশস্ত কামরা ছাড়িয়া এই কামরায় প্রবেশ করিয়া আমার মনে হইল,—স্বর্গ ছাড়িয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছি!

দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ, একজন প্রৌঢ় ও পূর্ব্বোক্ত যুবক জমীদারটি এই কামরায় প্রবেশ করিয়া রাত্রির মত বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছেন।— আমি ট্রেণের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শুনিলাম ট্রেণ ছাড়িবার অনেক বিলম্ব! ট্রেণ ছাড়িবার সময়ের নাকি কোনও বাঁধা নিয়ম নাই!—ইতিমধ্যে যুবক জমীদারটি জলযোগের সন্ধানে চলিলেন; গাড়ীর বৃদ্ধ আরোহীকে দেখাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ ভদ্রলোকটিকে চেনেন কি?—উনি ময়মনসিংহের গৌরব, বাবু অনাথবন্ধু গুহ!"

অনাথ বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না; তবে আমার প্রণীত উপন্যাসাদির সহিত তাঁহার পরিচয় আছে, তাহা জানিতাম। কিন্তু আমি নিজের পরিচয় দিলাম না; তিনি তখন পূর্ব্বোক্ত আরোহী মহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছিলেন। তাঁহার গল্পগুলি আমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। যাঁহার সঙ্গে তিনি গল্প করিতেছিলেন, তাঁহার বাড়ী নবদ্বীপ; এখন তিনি মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুরের ময়মনসিংহের জমীদারীর একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী।—তিনি 'প্রদ্যোতনগর' ষ্টেসনে নামিয়া—'বক্সিগঞ্জে' যাইবেন। ইনি নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য হইলেও সম্পূর্ণ হাল-ফ্যাসনের লোক,—সুশিক্ষিত এবং সুরসিক; চেন ও চশ্‌মায় সুশোভিত।

লর্ড কর্জ্জন ময়মনসিংহে আসিয়া মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, অনাথ বাবুকেই বা কিরূপ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, অনাথবাবু তাহারই গল্প করিতেছিলেন। লর্ড কর্জ্জন মহারাজা বাহাদুরকে অনুরোধ,—অনুরোধ বলি কেন—আদেশ করেন, বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাবে তাহাকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে, প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া দিতে হইবে,—ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে!— এক কথায় ঢাকার (অধুনা স্বর্গীয়) নবাব বাহাদুরের ন্যায় লাট বাহাদুরের ইঙ্গিতে তাহাকে পরিচালিত হইতে হইবে। কিন্তু মহারাজা সূর্য্যকান্ত লাট

কর্ত্তৃপক্ষের এই আদেশ পালন করেন নাই ; স্পষ্টবাক্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় স্বাধীনমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।—অতিথি বড়লাটের সহিত ব্যবহারে মহারাজা যে স্বাধীন চিত্তের ও তেজের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।—এমন কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় যিনি এ ভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি যে দেশবাসিগণের নমস্ত—ইহা কে অস্বীকার করিবে ?' বাস্তবিক স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের যেরূপ সুদৃঢ় মেরুদণ্ড ছিল, একালে জমীদারশ্রেণীর মধ্যে তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

গল্প শুনিতে শুনিতে কোথা দিয়া সময় চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ ট্রেণ নড়িয়া উঠিল, তাহার পর বংশীধ্বনি ; গার্ডের হস্তস্থিত সবুজ আলোর আন্দোলন, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণের 'হুস্ হুস্' শব্দ।—মনে হইল, এতক্ষণে বাঁচিলাম। গাড়ীর মধ্যে ভয়ানক গরম, গুমোটে শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছিল।—তখন রাত্রি প্রায় দুইটা।

শ্রীযুক্ত অনাথবাবু একখানি বেঞ্চির উপর তাঁহার শয্যা প্রসারিত করিলেন ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশিষ্ট বেঞ্চির এক প্রান্তে ও আমি অন্যপ্রান্তে কুব্জভাবে শয়ন করিলাম ; পূর্ব্বোক্ত জমীদার মহাশয় জমি ত্যাগ করিয়া আসমানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; দোদুল্যমান পালঙ্কে সুখনিদ্রায় অভিভূত হইলেন ; তৎপূর্ব্বে আমাকে অনুরোধ করিলেন, বগুড়া ষ্টেশনে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া দিই।—ইতিমধ্যে আমিও যে নিদ্রিত হইতে পারি, এ চিন্তা বোধ হয় তাঁহার মনে স্থান পায় নাই, কারণ গরজ বড় বালাই।

আমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া ঘুমাইতে সাহস করিলাম না। এক একবার চক্ষু মুদিয়া আসে, তখনই চাহিয়া মনে করি হয়ত বগুড়া ছাড়িয়া গিয়াছি। কোন কোন ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে দুই একবার উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু বাহিরে চাহিয়া ষ্টেসনের চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, এ বগুড়া ষ্টেসন নহে।

অবশেষে রাত্রিশেষে বগুড়া ষ্টেসনে ট্রেণ থামিলে ভদ্রলোকটিকে জাগাইয়া দিলাম। তিনি ব্যস্তভাবে উঠিয়া লট্বহর গুছাইতে লাগিলেন ; তাঁহার ভৃত্যেরা গাড়ীতে উঠিয়া সম্মুখে যাহার বোঁচকা-বুঁচকি দেখিল, তাহাই লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ! অনেক বড়লোকের চাকর প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য আবশ্যাতিরিক্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া অন্য লোকের বিরক্তির কারণ হয়। যাহা হউক, জিনিসপত্র নামিলে ভদ্রলোকটি তাঁহার স্থূল যষ্টিহস্তে

আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যত হইলেন!—কিন্তু তিনি যষ্টি-প্রয়োগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া, মৌখিক ধন্যবাদ করিয়া নামিয়া চলিলেন; একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া তাহাতে দীপশলাকা স্পর্শ করিয়া হুঙ্কার দিলেন, "গুড্ নাইট্।"—আদবকায়দা বড়লোকের মতই বটে!

একটু ঘুম আসিয়াছিল। জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম; মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, কেশরাশিতে এত ধূলা জমিয়াছে যে, তাহাতে অবলীলাক্রমে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।—তথাপি এ আষাঢ় মাস। কৃষকেরা অনাবৃষ্টির অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে; বৃষ্টির অভাবে সৌরকরদীপ্ত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, আর পীরের দরগায় দুধ ঢালিতেছে—যদি তাহাদের প্রদত্ত দুগ্ধবিন্দু পীরের আশীর্ব্বাদে অমৃতবিন্দুতে পরিণত হইয়া ক্ষেত্রের মৃতপ্রায় ধানগাছগুলিকে সজীব ও সরস করিয়া তুলিতে পারে।

উষালোকে মাঠের দিকে চাহিলাম। ট্রেণ তখন হুস্ হুস্ শব্দে তিস্তাঘাটের অভিমুখে চলিয়াছে। রেললাইনের দুই দিকে পাটের ক্ষেত, ধানের জমি; বার আনা পাট, চারি আনা ধান। পথের দুই ধারে লোকালয় দেখিলাম না, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে হয় পাট, না হয় ধান!

সূর্য্যোদয় হইয়াছিল, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন; প্রভাতে বানারপাড়া জংসন-ষ্টেসনে ট্রেণ অনেকক্ষণ বিলম্ব করিল। ষ্টেসনের অন্য একটি প্ল্যাটফর্ম্মে আর একখানি ট্রেণ দাঁড়াইয়া ছিল; ট্রেণখানি বহুসংখ্যক যাত্রীতে পূর্ণ। শুনিলাম, এই ট্রেণ রঙ্গপুর গাইবাঁধার দিকে যাইবে। রঙ্গপুর অঞ্চলের যাত্রীরা আমাদের ট্রেণ হইতে নামিয়া এই ট্রেণে উঠিল। পনর বিশ মিনিট পরে আমাদের ট্রেণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া নিদ্রালস-নেত্রে শ্যামলপ্রান্তরের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার সহযাত্রীদ্বয় তখন ঘুমাইতেছিলেন।

বেলা সাতটার কিছু পূর্ব্বে আমরা তিস্তামুখঘাটে উপস্থিত হইলাম। নদী-তীরে মাঠের মধ্যে ষ্টেসন। ষ্টেসনটি ক্ষুদ্র, খড়ের ঘর। এত বড় নদীর ধারে রেল কোম্পানী বোধ হয় ভাঙ্গনের ভয়ে পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করিতে সাহস করেন নাই।

নদীকূলে একটু দূরে দূরে কয়েকখানি ষ্টীমার দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেণ নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র একখানি ষ্টীমার হইতে বংশীধ্বনি হইল; বুঝিলাম, ইনিই আমাদিগকে নদীর পরপারে লইয়া যাইবেন।

আমরা—ময়মনসিংহের যাত্রীগণ লটবহর লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমারখানির নাম 'এলিগেটর'। বেশ বড় ষ্টীমার, অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।—ষ্টীমারখানির স্নানের কক্ষ, পায়খানা অতি সুন্দর।—সাঁড়ায় যখন পুল হয় নাই, তখন এই ষ্টীমারখানি দামুকদিয়া হইতে সাঁড়াঘাটে যাত্রী ও ডাক পার করিত। ষ্টীমারে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত সুন্দর। কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা অধিক নহে; ইংরাজ-যাত্রী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি অল্পসংখ্যক যাত্রীর জন্য এরূপ দুইখানি ষ্টীমার রাখা হইয়াছে; ষ্টীমারে খালাসী কর্ম্মচারীও অনেক; এত খরচপত্র করিয়া এই s'eamer serviceএ কি লাভ থাকে, বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীত্রয় এক একখানি বেত্রাসন অধিকার করিয়া নদীর শোভা দেখিতে লাগিলাম। ব্রহ্মপুত্র নদী এখানে তিস্তানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এস্থানের নাম তিস্তামুখঘাট। প্রকাণ্ড নদী; অপর পারে সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি প্রভাতসূর্য্যকিরণে ধূ ধূ করিতেছিল। দূরে দূরে কাশবন। বর্ষার প্রারম্ভে নদীতে বান আসিয়াছে, ঘোলা জল। অনেক দূরে দেখিলাম, কয়েকখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গীতে চড়িয়া জেলেরা ইলিস্‌মাছ ধরিতেছে। প্রবল তরঙ্গভঙ্গে ডিঙ্গীগুলি ডুবু ডুবু হইতেছে, কিন্তু জেলেদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই! দলে দলে শঙ্খচিল আকাশে চক্রাকারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুই একখানি বড় বড় মহাজনী-নৌকা পালভরে গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রভাতের সুশীতল সমীরণ আমাদের জাগরণক্লিষ্ট চোখে মুখে লাগিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা পরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারের সিঁড়ি উঠিল। সারেঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল, "হাবেজ্"‌;—ইঞ্জিনঘরে সাঁ সাঁ শব্দ উঠিল। ক্রমে মৃদুগতি, তাহার পর দ্রুতবেগে ষ্টীমার 'বাহাদুরাবাদ' ষ্টেসন অভিমুখে ধাবিত হইল। নদীর এপারে রঙ্গপুর জেলা, অন্যপারে ময়মনসিংহ। দূরে ধূসর মেঘের ন্যায় গিরিশ্রেণী দেখিয়া একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওটা কোন্ পাহাড়?" তিনি বলিলেন, "গারো পাহাড়।—উহা ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তে অবস্থিত। সুসঙ্গ ঐ পাহাড়ের ক্রোড়দেশে অবস্থিত।"—শুনিলাম, এই পাহাড়ের অধিকাংশ পূর্ব্বে সুসঙ্গের মহারাজার জমীদারীভুক্ত ছিল, তাহা হইতে মহারাজার যথেষ্ট আয় হইত। কিন্তু গবমেণ্ট নাকি মহারাজাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান করিয়া পাহাড়ের মালেকান-স্বত্ব হস্তগত করিয়াছেন। এই অঞ্চলে নাটোরের মহারাজা বাহাদুরের যে জঙ্গল-মহাল আছে, তাহা বেশ লাভের সম্পত্তি।

ষ্টীমারে নদী পার হইতে ঠিক চল্লিশ মিনিট লাগিল। বাহাদুরাবাদ ষ্টেসনে একখানি ট্রেণ প্রস্তুত ছিল। আমরা ষ্টীমার হইতে নামিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ষ্টীমারে যে সকল মালপত্র ছিল, তাহা ট্রেণে তুলিতে কিছু সময় লাগিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ট্রেণখানি গজেন্দ্রগমনে চলিতে আরম্ভ করিল।—ইতিমধ্যে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া জলযোগ শেষ করিয়া লইয়াছিল; দেখিলাম এখানে অনেক রকম জলখাবার পাওয়া যায়, তবে কিছু দুর্ম্মূল্য। 'খাবার'গুলি কতদিন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল—নিরূপণ করা কঠিন; তাহার উপর খাবার-বিক্রেতাগণের পোষাক পরিচ্ছদ ও চেহারা দেখিয়া 'জলপানে' আমার প্রবৃত্তি হইল না। শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় তাঁহার বোঁচকা খুলিয়া বেদানা বাহির করিলেন, এবং বেদানার রসে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ, অন্য কিছু খাইবেন না। আমাকে জলযোগে বিমুখ দেখিয়া তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত কিছু খাইলেন না!" আমি বলিলাম, "এ সকল 'বাজারে' জিনিস খাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"—তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে আম আছে—খাইবেন?"—আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া মাথা নাড়িলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে দুই একজন ভোজন-বিলাসীর গল্প বলিলেন। তাঁহার একজন সহযোগী-কর্ম্মচারী মফস্বলে কোথায় inspectionএ গিয়া একাকী ছয় জনের ভাত তরকারী উদরস্থ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর কিছু হইলে ভাল হইত!"—কিন্তু 'আর কিছু' পাকশালায় না থাকায় অগত্যা অর্দ্ধাহারেই সে বেলা কাটাইলেন, রাত্রে একটি পাঁটা দিয়া উদর-দেবতার সেবা করিলেন। এই নিত্য-দুর্ভিক্ষের দিনে এরূপ ক্ষুধার প্রাচুর্য্য বড় সুবিধার কথা নহে। আমিও এক বৃদ্ধ পালমহাশয়কে জানিতাম; তিনি পূরাদম ফলারের পর তিনসের রসগোল্লা ও সেরদুই ক্ষীর গলাধঃকরণ করিয়া ভোজন শেষ করিতেন। কিন্তু একালে 'মুনকে রঘু' 'আশানন্দ ঢেঁকি' প্রভৃতি ঔদরিক মহাশয়গণের স্থান পূর্ণ করিতে পারেন—এরূপ লোক এদেশে আর নাই। দেশের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কে বলিবে?

গুহমহাশয় বলিলেন—তিনিও একসময় বেশ খাইতে পারিতেন, ব্যায়ামও খুব করিতেন। এমন কি প্রত্যহ তিনি অশ্বারোহণে অবলীলাক্রমে ১৫।২০ মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতেন! এইরূপ আহার ও ব্যায়ামের শক্তি ছিল বলিয়া তিনি সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর ওকালতী করিয়া—বহু অনিয়মে ও মানসিক শ্রমে

এখনও জরাজীর্ণ হন নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; এই জন্যই তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনে বিদেশে গিয়াছিলেন।

এইরূপ নানা গল্প করিতে করিতে আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ষ্টেসন ছাড়াইয়া 'প্রদ্যোতনগর' ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম;—এই লাইনের মধ্যে ইহা বেশ বড় ষ্টেসন! মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর মহোদয়ের নামে ষ্টেসনটার নামকরণ হইয়াছে। শুনিলাম, ইহা ঠাকুর-মহারাজারই জমিদারী। জমিদারীর 'এলাকা' বহুদূর বিস্তৃত। পূর্ব্বে অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী এই সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার উচ্চতম আদালতে ওকালতী করিবার সময় এই বিপুল সম্পত্তি যৎসামান্য মূল্যে ক্রয় করেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গন্তব্যস্থান বক্সী-গঞ্জ।—শুনিলাম নৌকাযোগে তাঁহাকে বক্সী-গঞ্জে যাইতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সেখানে পৌছিবার সম্ভাবনা নাই!—তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় আমাকে মুক্তাগাছা-গমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অনুমান করিলেন, আমি বিবাহযোগ্যা কন্যার পাত্রের সন্ধানে সেখানে যাইতেছি!—তাঁহার এরূপ অনুমান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না, পাছে মনে করেন 'ছোকরা (তাঁহার বয়সের তুলনায় আমরা ছোকরা ভিন্ন আর কি? দুই এক গাছি গোঁফ সাদা হইতে সুরু করিয়াছে বৈ ত নয়!) কি ফক্কড়!'—কিন্তু আমার ধারণা হইল, ময়মনসিংহ জেলা, বিশেষতঃ মুক্তাগাছায়, বুঝি কেবল বিবাহযোগ্য বরই ফলিয়া থাকে, এবং কন্যাদায়গ্রস্ত উদ্বাস্তু বামনেরা তাহা পাড়িবার লোভে দেশবিদেশ হইতে সেখানে ধাবিত হয়। মুক্তাগাছায় কার্ত্তিকের মত অনেক সুপুরুষ দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা কন্যাদায়গ্রস্তের ভার হরণ করিবার জন্য গোঁফে তা' দিতে দিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন কি না, সন্ধান লই নাই।

'সিংহজানী' বেশ বড় ষ্টেসন।—ইহা জামালপুর মহকুমার ষ্টেসন। এখান হইতে একটি রেলপথ পদ্মাতীরবর্ত্তী জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। জগন্নাথগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে গোয়ালন্দ যাওয়া যায়। শুনিলাম সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ লাইন সম্পূর্ণ হইলে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা যাইবার পথ অনেকটা সুগম হইবে; অল্পব্যয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে যাতায়াত করা চলিবে।—এ পাটের রাজ্য, অল্পব্যয়ে অল্পসময়ে কলিকাতা-কলে পাটের রপ্তানী করিবার জন্য ইংরাজ-

বণিকসম্প্রদায়ের চেষ্টায় পূর্ব্ববঙ্গে নূতন নূতন রেলপথের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। পাটের কৃপায় ময়মনসিংহবাসিগণকে ভবিষ্যতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ঘুরিয়া শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-মর্দ্দন করিতে হইবে না।

ময়মনসিংহ অভিমুখে যতই অগ্রসর হইলাম—দেখিলাম পথের দুই ধারে পাটের ক্ষেত। অতিবৃষ্টি-নিবন্ধন এবার না কি অনেক জমিতেই ভাল পাট হয় নাই; কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের অঞ্চলের পাটের তুলনা হয় না। এ দিকের অধিকাংশ পাটের ক্ষেতে হাতী লুকাইয়া থাকিতে পারে; আর আমাদের জেলায় পাট এখন মাটীর সঙ্গে কথা কহিতেছে! -বর্ত্তমান বৎসরে পাটের বাজার মাটী। গত বৎসর যাহারা ধানের আবাদ না করিয়া পাট বুনিয়াছিল, পাট তাহাদের উদ্বন্ধন-রজ্জুতে পরিণত হইয়াছে; তথাপি কোন্ সাহসে এবারও তাহারা পাটের আবাদ করিয়াছে—এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—এ অঞ্চলের কৃষকেরা বিশ্বাস করে—বর্ত্তমান যুদ্ধ-ফল যাহাই হউক, ইউরোপ রসাতলে যাউক, তাহাদের পাট বিক্রয় হইবেই; কারণ, ময়মনসিংহের পাটের মত উৎকৃষ্ট পাট পৃথিবীর অন্য কোথায়ও উৎপন্ন হয় না, পৃথিবীর কোন-না কোন দেশে তাহাদের পাটে টান্ ধরিবে।

দেখিলাম—আষাঢ় মাসেই পাট-কাটা আরম্ভ হইয়াছে। চাষারা দল বাঁধিয়া পাট কাটিতেছে, রাশি রাশি পাট আটি বাঁধিয়া বিল খাল ডোবা গর্ত্ত যেখানে একটু জল আছে, সেইখানে পচাইতে দিয়াছে। কেহ বা রাশি রাশি সদ্য-কর্ত্তিত পাট ক্ষুদ্র নৌকায় তুলিয়া নদীর এক পার হইতে অন্য পারে লইয়া যাইতেছে।—দেখিয়া মনে হইল কবিবর সার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ জেলায় বর্ষাযাপন করিতে আসিয়া 'সোণার তরী' লিখিলে হয় ত লিখিতেন,—

"রাশি রাশি ভারা ভারা
পাট-কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা
কাটিতে কাটিতে পাট, এল বরষা!"

চলিতে চলিতে পথের দুইধারে অরণ্য প্রান্তরে নানা প্রকার বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আমের গাছ ও নারিকেল গাছ কচিৎ কোথাও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, এই উভয় জাতীয় বৃক্ষের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প। নারিকের গাছ যাহা আছে, তাহাতেও অধিক

ফল হয় না। আর এ জেলার আমে পোকা ; আমের ডালে পর্য্যন্ত পোকা ! পোকায় গাছগুলিকে ক্রমে জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ স্থানীর আমে এত পোকা যে, এক ঝুড়ি পাকা আম কাটিতে বসিলে কীটাক্রান্ত অংশ ফেলিয়া দিয়া তদ্দ্বারা একজন লোকের 'আম্র যোগে'র কার্য্য কোন প্রকারে, সম্পন্ন হয় ! সুতরাং রঙ্গপুর দিনাজপুর এবং প্রধানতঃ রাজসাহী ও মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে পাকা-আমের আমদানী করিয়া ময়মনসিংহ-বাসিগণকে 'পক্কাম্রফলায় নমঃ' করিতে হয়। বর্ত্তমান-বর্ষে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে আম পাওয়া গিয়াছে। মিষ্ট আমও শতকরা তিন চারি আনায় বিক্রয় হইয়াছে ; কিন্তু ময়মনসিংহে কেহ কদাচিৎ কোন দিন দুইটাকা আড়াই টাকায় একশত পাকা-আম পাইলেও মনে করিয়াছেন, এ চূড়ান্ত সস্তা !

পথের দুইধারে কোন কোন স্থানে সমৃদ্ধ পল্লীও দেখিতে পাইলাম, কিন্তু অট্টালিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ গৃহই করোগেট্ টিনের। বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। যাহারা ধনবান, তাহারা বাঁশের বেড়ার পরিবর্ত্তে টিনের প্রাচীর দিয়াছে ; গৃহে একটিমাত্র দ্বার, বাতায়ন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—এক একখানি ঘর দেখিয়া মনে হয়—যেন লোহার সিন্দুক। এই সিন্দুকের মধ্যে পুত্রকলত্রাদি লইয়া তাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে !

গুহ মহাশয় ও আমি—আমরা দু'জন বেশ নির্ব্বিবাদে একখানি কামরা দখল করিয়া শুইয়া বসিয়া—কখন তন্দ্রায় কখন জাগরণে, এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেছিলাম ; ইতিমধ্যে একটা ষ্টেসনে হঠাৎ দুইজন মুসলমান ভদ্রলোকের আবির্ভাব হইল। একজনের হস্তে একখানি 'পুলিশ গাইড'—অর্থাৎ 'শান্তিরক্ষার পথপ্রদর্শক' (অনুবাদ ঠিক হইল কি ?) আর একজনের হস্তে একখানি কাগজে-জড়ানো গণ্ডাদশবার পাণ ! পুলিশ-গাইডধারী ভদ্রমহোদয় দয়া করিয়া তৃতীয়-শ্রেণীর একখানি টিকিট লইয়া আমাদের শান্তি ও সুপ্তি ভঙ্গ করিতে আমাদের কামরায় পদরজ দান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না ; তাঁহার সঙ্গীটিও নিশ্চয়ই এই মহাজনের পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। পুলিশের জমাদার বা দারোগা দয়া করিয়া টিকিট্ লইয়াছেন—ইহাই যথেষ্ট ; শ্রেণীবিচার বাহুল্যমাত্র।—তাঁহারা ট্রেনে উঠিয়াই বাদশা উজীর মারিতে মারিতে দুই তিন মিনিট অন্তর এক একটি পাণ মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, মিঞা সাহেবদ্বয় আমাদিগকে অব্যাহতি দান করিয়া 'বাইগুন-

বাড়ী’ নামক ষ্টেসনে নামিলেন। বোধ হয় সেখানে তাঁহাদের কোন ‘বিষয় কর্ম্ম’ ছিল। দশবার গণ্ডা পাণ এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা উদরস্থ করিয়াছিলেন!—এই ষ্টেসনের পরেই ‘ময়মনসিংহ’ ষ্টেসন। শুনিলাম ‘বাইগুন বাড়ী’ ষ্টেসন হইতে মুক্তাগাছার দূরত্ব তিনচারি মাইলের অধিক নহে; কিন্তু এখান হইতে মুক্তাগাছা যাইবার ভাল পথ না থাকায় মুক্তাগাছার যাত্রীরা ময়মনসিংহে নামিয়া ঘোড়ার-গাড়ী ভাড়া করিয়া মুক্তাগাছায় গমন করেন। ‘বাইগুনবাড়ী’ কি ‘বেগুনবাড়ী’ নামের পূর্ব্ববঙ্গীয় অপভ্রংশ? রেলের ব্যাকরণে প্রাদেশিক-উচ্চারণের প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শিত হয়, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ময়মনসিংহের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ত বেগুনকে ‘বাইগুণ’ বলেন না। আর ‘বাইগুণ’ই যদি অবিকৃত রহিলেন, তবে ‘বাড়ী’ ‘বারি’ হইলেন না কেন? ভাষা-বৈচিত্র্যের এই বিচিত্র রহস্যের আলোচনা করিতে করিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ময়মনসিংহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে! ময়মনসিংহের রেল-ষ্টেসনের চেহারা দেখিয়া আমর ভক্তি চটিয়া গেল। ষ্টেসনটি ক্ষুদ্র, এমন কি আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের রাণাঘাট, নৈহাটী, বারাকপুর প্রভৃতি প্রথম-শ্রেণীর ষ্টেসনগুলির ত কথাই নাই, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, পোড়াদহ প্রভৃতি ষ্টেসন অপেক্ষা ইহা অনেক ছোট—এত প্রকাণ্ড জেলার সদরের ষ্টেসন হইবার যোগ্য নহে।

শ্রদ্ধাভাজন গুহ মহাশয় আমাকে বলিলেন, বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, ময়মনসিংহে নামিয়া আহারাদি ও বিশ্রামের পর ধীরে সুস্থে মুক্তাগাছায় যাওয়াই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। এখন ঘোড়ার-গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই পক্ষীরাজের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া আমি অপরাহ্নের পূর্ব্বে মুক্তাগাছায় উপস্থিত হইতে পারিব না। এই কথা জানাইয়া গুহ মহাশয় তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম “রাজ-নিমন্ত্রণে যাইতেছি, মধ্যপথে আর আড্ডা লইব না।” কিন্তু একবার মনে হইল, সে বেলার মত ময়মনসিংহের নেতা গুহ-মহাশয়ের স্কন্ধে ভর করিলে মন্দ হয় না। তাঁহার বাড়ী গিয়া জোর করিয়া অতিথি হইলে তিনি হাঁকাইয়া দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ আদায় করিবার আবশ্যক হইল না। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মে থামিতে না থামিতে একটি দীর্ঘদেহ সুবেশধারী যুবক আমার গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, “আমি মুক্তাগাছা হইতে আপনাকে লইতে আসিয়াছি, চলুন।”—আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি আমাকে চিনিলেন কিরূপে?” তিনি

বলিলেন,"'ভারতবর্ষে' আপনার ছবি দেখিয়া; কিন্তু সে ছবিতে আপনাকে অনেকটা বুড়ো করা হইয়াছে। কাল বৈকালে কুমার-বাহাদুর আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। আমি মুক্তাগাছা হইতে গাড়ী আনিয়া অনেকক্ষণ আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম; আজ ট্রেণ বড় 'লেট্'।"—জানিতে পারিলাম, ইনি কুমার-বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী বাবু বিপিনবিহারী রায়। পরে জানিতে পারি, ইনি ডুগিতব্লা হইতে আরম্ভ করিয়া শিকার পর্য্যন্ত সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, রন্ধনবিদ্যাতেও সিদ্ধহস্ত, এবং কুমার-বাহাদুরের দক্ষিণ-হস্ত।

ষ্টেসনের বাহিরে একখানি সুন্দর বগী-গাড়ী লইয়া উচ্চৈঃশ্রবার একটি বংশধর দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা গাড়ীতে উঠিবামাত্র ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়িল। ইষ্টকবদ্ধ সংকীর্ণ রাজপথ ভেদ করিয়া শকট মুক্তাগাছা অভিমুখে ধাবিল হইল। সহরের পথ কিন্তু অতি কদর্য্য। পাটের গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী অষ্টপ্রহর এই পথে যাতায়াত করায় পথের অস্থি-পঞ্জর বাহির হইয়া গিয়াছে। বাজার, আদালত, ময়মনসিংহের মহারাজা বাহাদুরের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, জেলখানা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, পাঠের ক্ষেত, ও ধানের জমির পাশ দিয়া, গাড়ী ছুটিতে লাগিল। শুনিলাম, মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুর এখন প্রাসাদে নাই, মুক্তাগাছায় গিয়াছেন। সুতরাং সেখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা হইল।—ময়মনসিংহ ষ্টেসন হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে মধ্যপথে ঘোড়ার 'ডাক' ছিল; ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর অশ্ববরকে মুক্তি দান করিয়া, দ্বিতীয় ঘোড়া জুতিয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় বার মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যখন মুক্তাগাছার রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, তখন বেলা দেড়টা।—মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা-বাহাদুর, কুমার-বাহাদুর প্রভৃতি অনেকেই তখন বৈঠকখানায় বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

## এস

ধরার উর্ব্বশী ওগো মোর হৃদি-নন্দনের নারী,  
বিচ্ছেদ-বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?  
ওগো মোর হৃদিকল্পলতা,  
তোর চিরবিরহের সুকঠিন ব্যথা,  
সেই জানে,  
মর্ম্মবিদ্ধ কর যার দুর্নিবার আঁখির সন্ধানে।

বসন্তের অফুরন্ত কুসুমসম্ভার
প্রস্ফুটিত প্রতি অঙ্গে যার,
বরষার তটপ্লাবী নদী
অঙ্গের লাবণ্যে যার বহে নিরবধি,
প্রভাতের মধুর অরুণ,
রক্তিম প্রণয়-ব্যথা যার সকরুণ,
বিশ্বে মোর তুই এক নারী,
বিচ্ছেদ-বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?
প্রশ্বাসে যাহার,
মলয় সুগন্ধভার
বহিয়া প্রচ্ছায় বনতলে,
দক্ষিণের মন্ত্রপড়া গন্ধবহ চলে,
যার নীল নিচোল অঞ্চলে,
নীলিমা ছড়ায়ে দেয় শরতের গগনমণ্ডলে,
যার পাদপ্রক্ষেপের শোণিমা কুড়ায়ে
বসন্ত দিতেছে নিত্য অশোকে ও কিংশুকে ছড়ায়ে,
সেই মোর বিশ্বভরা তুই এক নারী,
বিচ্ছেদ-বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?
এস ওগো এস মোর প্রাণভরা ধন,
অরণ্যে বসাব মোরা সুরভি নন্দন ;
মোর কুটীরের অন্ধকার
দূর করিবার
দিয়াছে দেবতা ওগো তোরি'পরে ভার।
মিলন-বাসর-শয্যা পাতি',
রত্নবাতি
জ্বালাইয়া, রয়েছি বসিয়া,
এসগো উর্ব্বশী লক্ষ্মী, এস রতি, এস মোর প্রিয়া,
এস মোর প্রাণাধিক প্রিয়,
জীবনের সব শূন্য নিজহাতে তুমি ভ'রে দিও।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

# গ্রন্থ-সমালোচনা

"ভাষা ও সুর" একখানি কবিতা-পুস্তক; লেখক শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ। ইহাতে ছোট বড় অনেকগুলি কবিতা আছে। মূল্য ১৲ টাকা।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিলেও কবিতাগুলি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে।

বাগানের সব ফুলই দেবপূজায় নিয়োজিত হইতে পারে, তবে বাজারে বেচিতে গেলে ভাল ফুলগুলি বাছিয়া তোড়া বাঁধিতে বা মালা গাঁথিতে হয়। নতুবা ভাল দামে বিক্রয় হয় না।

আমাদের বিশ্বাস লেখক নিজের খাতায় যতগুলি কবিতা লিখিয়াছেন সব গুলিই ছাপিয়াছেন, কাজেই তোড়া বা মালার মধ্যের আধফুটন্ত এবং গন্ধহীন ফুলের ন্যায় কয়েকটি বাজে কবিতা পুস্তকখানির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও গ্রন্থকারের যশঃ কিছু খর্ব্ব হইয়াছে।

ফলে দাঁড়াইয়াছে—কয়েকটি কবিতার "ভাষা" আছে "সুর" নাই, কয়েকটি কবিতার "সুর" আছে "ভাষা" নাই, কয়েকটিতে আবার উভয়েরই অভাব।

তাহা হইলেও কয়েকটি কবিতার প্রকৃত কাব্য-সৌন্দর্য্য পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "অভিমানিনী," "তোমাতে আমাতে," "স্বপ্নের মত," "ভেবেছিনু," "দেখিতে দেখিতে," "আজিকে," "তবুও" শীর্ষক কবিতাগুলি আমাদের বেশ লাগিল।

স্থানে স্থানে কবির দৃষ্টি aesthetic ছাড়াইয়া উপরের স্তরে উঠিয়াছে। কবি লিখিয়াছেন,

"অভিমানিনী আমার
বুঝি নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম, বুঝি না শাস্ত্রের মর্ম্ম,
আমি শুধু বুঝি প্রেম প্রিয় দেবতার।
তাই সব দূরে রাখি, তোমাতে মগন থাকি
তুমি মোর একমাত্র ধন তপস্যার।
তোমারি সাধনা করি, চরমে পাইব হরি
তুমি মোর মুক্তিমার্গ ত্রিদিবের দ্বার।
অভিমানিনী আমার।"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও চিন্তামণির মধ্যে ভগবৎপ্রেমের আভাস পাইয়াছিলেন।

আশা আছে কবি "সাধনার" বলে কাব্যমার্গে উন্নতি লাভ করিবেন।

প্রভাবতী—গ্রন্থকার নবীন ঔপন্যাসিক শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি,এ, মূল্য সাত আনা।

গ্রন্থকার বলিতেছেন এখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস; বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—কর্ণেল উড সাহেবকৃত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে যতটুকু বিষয় গ্রহণ করা হইল, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল।

"রাজ্যলাভের বহুদিন পূর্ব্বে রত্ন অম্বররাজ পৃথ্বীরাজের কন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কেহই এই গুপ্ত-বিবাহের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। রাজকুমারীর

রূপে মুগ্ধ হইয়া হরবংশীয় রাজা সূর্য্যমল্ল তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন।..................
উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিল, কাল-স্বরূপ যৌবনকালের কুহকে পড়িয়া রাণা রত্ন অম্বরকুমারীর রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, গুপ্তবিবাহ করিয়া পরিশেষে ধর্ম্ম-পত্নীকে গ্রহণ করিলেন না, পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইল।"

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—ঔপন্যাসিকগণ সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না। তিনিও এ ক্ষেত্রে করেন নাই।

আক্ষেপ এই যে, উপন্যাসখানির মধ্যে যে অংশে তিনি আত্মনির্ভর করিয়াছেন, সেটা লিখিয়া প্রকাশিত না করিলেই ভাল করিতেন।

গ্রন্থকারের নিজস্ব—কিরূপে উক্ত "পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইল।"

অম্বররাজ পৃথ্বীরাজের কন্যা অমরাবতী অবশেষে যবনী হইয়া মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ বিলাস খাঁর উপপত্নী হইলেন। বিলাস খাঁ রত্নের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। "বিবিজান" ওরফে অমরাবতী সঙ্গে আসিলেন। পরে ছদ্মবেশে বিবিজান রণক্লান্ত নিদ্রিত রাণা রত্নকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন।

ঔপন্যাসিকগণ ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য নহেন বটে, তাহা হইলেও এরূপ কুৎসিৎ পাপের চিত্র আঁকিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। প্রাচীন ভারতের পদ্মিনী প্রভৃতি রাজপুত ললনাগণের সতীত্ব-গৌরবে আজ ভারত গৌরবান্বিত। তাঁহাদের নামে এরূপ পাপের চিত্র অঙ্কিত করিলে উক্ত স্বর্গীয় আদর্শের মর্য্যাদাহানি হয়। পরন্তু যখন স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস বলিয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ইহা স্ত্রী-পাঠ্য করাই উচিত ছিল।

ভাষার একটু নমুনা দিব।

"কোথাও নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিয়া মেদিনী প্লাবিত করতঃ প্রবাহিত হইতেছে।"

"দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে অশ্বস্থিত কতকগুলি সৈনিক ঘোরতর রব করিতে করিতে সূর্য্যমল্লের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন।"

**সুরভি**—ইহা একখানি কবিতার পুস্তক, লেখক শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ; মূল্য আট আনা, কাপড়ে বাঁধাই দশ আনা। কয়েকটি কবিতা আমাদের বেশ লাগিল। নদীপার-স্থিত বনভূমিজাত বনফুলের মলয়সমীরবাহিত সুরভির ন্যায় কোনও কোনও কবিতা বড়ই স্নিগ্ধ ও মধুর বোধ হইল। কয়েকটি কবিতার শব্দঝঙ্কার যেন ভাবের অভিব্যক্তির কিছু অন্তরায় হইয়াছে। বর্ণপ্রাচুর্য্যময় প্রসূনসমূহের সুরভির আপেক্ষিক অভাব বুঝি স্বাভাবিক। তাহা হইলেও আমরা কবির উত্তরোত্তর উন্নতির আশা ও কামনা করি।

**কৈশোরক**—রবিদত্ত বিরচিত ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক, মূল্য দুই আনা। কিশোর বালকরচিত কবিতাগুলির মাধুর্য্যে আমরা আকৃষ্ট হইয়াছি। কিশোর কবির "ভারতের দশা" পড়িবার জিনিষ, ভাবিবার বস্তু।

ত্রয়োদশ-বর্ষীয় কবির কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলে কবির উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিশোর কবি উত্তরকালে সাহিত্যসমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন আশা করা যায়।

গোধন—গোসম্বন্ধীয় নানা প্রকার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব-সম্বলিত সচিত্র গ্রন্থ। লেখক শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মূল্য রাজ সংস্করণ ২৷৷০ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।

এই উপন্যাসপ্লাবিত রঙ্গভূমিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোধন প্রকাশিত করিয়া যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকখানি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনেক অনুসন্ধান, গবেষণা ও অধ্যবসায়ের ফল। গোজাতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৌলিকতা ও গ্রন্থের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আমাদের বিশ্বাস পল্লীগ্রামের স্কুলগুলিতে যেখানে কৃষকসন্তানেরা প্রথম জীবনে কিছু শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সেখানে এ পুস্তকখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেরূপে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহাতে পরিচ্ছেদ-বিশেষ শ্রেণীবিশেষের জন্য নির্দ্ধারিত করা অতীব সহজ।

আমরা স্কুলবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক সংরক্ষিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালীর ঘরের কুলবধূরা পর্য্যন্ত এ পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃতা হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের উপকারিতা হিসাবে মূল্য অতীব অল্প, আশা করি এ গ্রন্থের আদর হইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বসু

# ডায়ারি

হে জন-রঞ্জন-পরায়ণ সত্যব্রত বিচারপতি, তুমি ত নিমেষের মধ্যে মনস্থির করিয়া তোমার চরণতললগ্ন চিরাশ্রিতকে "যাও" বলিয়া বিদায় দিলে; কিন্তু সে যায় কোথা? জানকীর যে অন্য আর কোন আশ্রয় নাই, তুমি তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলে নির্ব্বান্ধব অরণ্য ছাড়া তাহার জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় বিধাতা যে নির্ম্মাণ করেন নাই। অযোধ্যার উপান্তে উটজ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সে তোমার দিনান্ত-দর্শনের প্রত্যাশায় দিন কাটাইতে পারিত—সে দর্শনও দুর্লভ হইলে কোন উপায়ে তোমার নিরাময় মঙ্গলের সংবাদ-টুকু সংগ্রহ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কোন মতে যাপন করিবার ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইত না; নিতান্ত পক্ষে সে অযোধ্যায় তাহার হৃদয়দেবতার বসতি, সে স্থানের ভূমি, জল, বায়ুর স্পর্শটুকু পাইয়াও তাহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা থাকিত। আজ যে বিধান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে, জীবনব্যাপী স্নেহের প্রতিদাম কি এই? সত্যকে অঙ্গীকার

করিতে প্রাকৃত জনের চিত্তবলে কুলায় না জানি, দেবাংশসম্ভূত সত্যব্রত নরনাথ, তুমি যদি সত্যকে স্বীকার না কর, তবে সত্যধর্ম্মের মহিমা জগত হইতে লোপ হইয়া যায় যে! পরশ্রীকাতর নিন্দুকের বিষ-রসনার অলীক রচনায় তুমি ভীত হইলে সত্য কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে? যাহার জন্য হরধনু-ভঙ্গের ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ, পরশুরামের দুর্ব্বার ক্রোধকে উপেক্ষা করিয়াছ, বালী-বধের অনপনেয় কলঙ্ক মাথায় করিয়া নিয়াছ, প্রাণপ্রতিম লক্ষ্মণকেশক্তিশেলের দারুণ ব্যথা দিতে কুণ্ঠিত হও নাই, যাহার বিরহদিনে অশ্রুজলে বনস্থলে পথ দেখিতে পাও নাই, বনবীথিকায় যাহার আভরণ কুড়াইয়া পাইয়া বারম্বার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছ, যাহার অদর্শনক্লেশে হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির সৃজন করিয়াছ, কোন্ অপরাধে সেই অনন্যশরণ স্নেহপরায়ণ জনকে এমন করিয়া আজ ত্যাগ করিলে? অনেক দুঃখের পরে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার নির্ম্মম দিনগুলি কাটিয়া গিয়া আজ যে প্রণয়-লতিকায় অমৃতফল ফলিবার দিন আসিয়াছিল, রবি, চন্দ্র, তারকায় যে কক্ষটি আলোকিত হয় না সেই বাঞ্ছিততম বাসরকক্ষে মণিদীপ জ্বালাইয়া জীবনের সব অন্ধকার দূর করিবার দিনে আজ এমন নির্ম্মম অঘটন কেন ঘটিল? বহু বিচ্ছেদের পরে সুদীর্ঘ অপেক্ষার নিদারুণ হতাশ্বাসের অন্তে, আজ দুইজনে যে বড় কাছাকাছি আসিয়াছিলে, আজ দু'জন দুজনের স্নেহাশ্রয়ের জন্য, সহস্র বাহু বাড়াইয়া পরস্পরকে ধরিবার জন্য যে বড় ব্যগ্র হইয়াছিলে, বিধাতার দানকে মাথায় নিয়া দুইজনের জীবন ধন্য করিবার মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত আজ যে আসিয়াছিল, তবুও এমনটা হইল কেন গো? এ জীবনব্যাপী নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করাইল কে? নির্ব্বিচারে ত্যাগই কি সকল ধর্ম্মের বড় ধর্ম্ম, সকল মহিমার বাড়া মহিমা?

গ্রহণে কি ধর্ম্ম হয় না, গ্রহণ করিতে কি চিত্তবলের আবশ্যকতা নাই, গ্রহণের মহিমায় গ্রহিতা এবং গৃহীত ধন্য হইয়া, কৃতার্থ হইয়া, সফলমনোরথ হইয়া, আনন্দের মধ্যে এই জীবন-রহস্যের কি সমাধান করিতে পারে না? আনন্দসম্ভূত এই ধরণীতে চিরদুঃখের মধ্যে জীবনাতিবাহিত করিতে কাহারই জন্ম হয় নাই। এ বিশ্ব যদি পরমানন্দময়ের অভিব্যক্তি হয়, তবে আনন্দের সন্তান আমরা অশ্রু-অন্ধ নয়নে দিনাতিপাত করিব কেন? শারদীয় নীলিমায় পরিব্যাপ্ত গগনে কোজাগররাত্রির পরিপূর্ণ চন্দ্রমা, রাসরজনীর উৎফুল্ল মল্লিকার সুবিমল পরিমল, বসন্তপ্রভাতের প্রথমারুণমাধুরী, নিদাঘ সন্ধ্যার মৃদুমারুতস্পর্শ, এ সমস্তই যে আমারি আনন্দকর উপভোগের

নিমিত্ত বিধাতার প্রসন্ন হস্তের দক্ষিণ দান, ইহাকে অঙ্গীকার করিয়া আমার প্রাণপ্রিয়তমের সহিত একত্র উপভোগেই জীবনের সার্থকতা। জীবনাধিক স্নেহের সামগ্রীকে অবিচারে ও নির্ব্বিচারে ত্যাগ করিয়া জীবনের পরম আনন্দ লাভ করা যায় কি? জীবনোপলব্ধির দিন হইতে সে তোমারি চরণে চিরবিক্রীত হইয়া রহিয়াছে, প্রথমদর্শনের মুহূর্ত্তেই যে "মধুর মূর্ত্তিরসৌ" বলিয়া তোমারি কণ্ঠে বরণমাল্য দিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ধনুর্ভঙ্গ কামনায় আকাশস্থ সমগ্র দেবতার চরণে যোড়করে কায়মনের একান্ত প্রার্থনা জানাইয়াছে, তোমার বান্ধবহীন অরণ্যবাস-দুঃখ যথাসাধ্য লাঘব করিবার জন্য যে নিজের নিতান্ত অনাবশ্যক নির্ব্বাসনকে হাস্যমুখে অঙ্গীকার করিয়া প্রাণপণ প্রণয়ের প্রচুর পরিচয় দিয়াছে, চিরন্তন প্রেম ও চির সাহচর্য্যের আশ্বাসে আশ্বস্ত তোমার সেই হৃদ্‌পিঞ্জরের শারিকাকে, নিরালম্ব করিয়া আজ অসীম গগনতলে কাহার আশ্রয়ে বিদায় দিলে? তুমি ত জান বৈদেহির দেহমনপ্রাণ একান্ত তোমারই নিজস্ব ধন। তুমি তাহাকে স্নেহপুটের মধ্যে রক্ষা না করিলে এ বিশাল বিশ্বে তাহার অন্য রক্ষা-কর্ত্তা নাই, একথা ত তোমার অজ্ঞাত নহে। নিরপরাধা নির্ব্বাক হইয়া নির্ব্বাসনের কঠিনতম দণ্ড নতশিরে বহন করিয়াছে, তাহার দাবী দাওয়া বা অধিকারের, আশা আশ্বাস বা অভয়-বরের একটি কথাও সে বলে নাই। অভাগিনী বিদায়কালে তাহার একমাত্র জীবনসর্ব্বস্বধনের চাঁদ মুখখানি দেখিয়াও বিদায় হইতে পারে নাই, তার ইহপরলোকের দেবতার চরণ-বন্দনা করিয়া যাইবার সৌভাগ্যও তাহার হয় নাই। হায় রে, এ দুঃখ যে কত বড় দুঃখ তাহা যাহার হইয়াছে সেই জানে।

যাঁহার চরণের সহিত নিজের হৃদয় দুচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে বাঁধিয়াছি, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত পরম প্রেমের একমাত্র ধনের সঙ্গে একান্ত নিঃসংশ্রব হইয়া দূরান্তর বাস যাহার দুরদৃষ্টে ঘটে, তাহার বক্ষ যে কেমন করিয়া দীর্ণ বিদীর্ণ হয় তাহা সেই জানে। জীবনের সমস্ত দণ্ড, পল, মুহূর্ত্তগুলি যাহার চিন্তায় ভরা, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত যাহার মধুর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য নয়ন একান্ত তৃষার্ত্ত হইয়া আছে, সেই পরম প্রিয়ধনের সংবাদহীন অদর্শনের দিন জানকীর কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা জান-কীই। জানিত; তুমিও কি তাহা জান না হে জানকিজীবন! জান তুমি, নইলে হিরণ্ময়ী সীতার সৃজন কেন করিয়াছিলে? ওগো, স্বজন মনোরঞ্জনের

জন্য একান্ত স্নেহের প্রতি বিমুখ হইয়া তুমিও কি দুঃখ পাও নাই? তমসাতীরের স্মৃতিচিহ্নগুলি যখন তোমার চেতনা হরণ করিয়াছে তখন জানকীর কোমল করপদ্মের স্নেহস্পর্শে প্রতিবার তোমায় চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছে কেন? অকৃত্রিম প্রণয়ের আজন্ম অধিকার পাইয়াও স্বেচ্ছায় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, সেই দুর্ব্বিসহ বিয়োগব্যথার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবে বলিয়া সোণার সীতা নির্ম্মাণ! ওগো, তোমার ত সোণার সীতাই ছিল; সত্য, ধ্রুব, সুনিশ্চিত ও চিরন্তন প্রেমের গলিত স্বর্ণের বিমল দ্যুতি তোমার আকাশকে ইন্দ্রধনুর বর্ণবিভায় চিরদিন অনুরঞ্জিত রাখিয়াছিল। হায়রে, কাহার কথায় কোন্ ধর্ম্মসাধন জন্য কোন্ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া বিমল প্রেমপারিজাতের অমলিন মল্লিকা এক নিমেষে ছিঁড়িয়া ফেলিলে? স্বজনানুরক্তির নিকট হৃদয়ের অনুরাগ পরাজিত হইলে, হৃদয়লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়া রাজলক্ষ্মীকে বরণ করিলে, হয়ত ঋষিরচিত রাজধর্ম্মের, মনুর মনোমত সমাজধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হইল। কিন্তু হৃদয়ধর্ম্ম যে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া চিরদিন হাহাকার করিতে থাকিল, একনিষ্ঠ একান্ত প্রেমের অকারণ নির্ব্বাসনে প্রণয়দেবতা যে উপবাসী রহিল, তাহার দিকে দৃক্‌পাত করে কে? প্রকৃতিপুঞ্জ বা পরিজনবর্গের অনুরক্তি কি আত্মনির্য্যাতন কিম্বা চরণাশ্রিত প্রণয়শীলের দুর্ব্বিসহ দুঃখের সান্ত্বনা দিতে পারে? পারে না, সেই জন্য কবি তোমার দুঃখের উপমা দিতে গিয়া "পুটপাকপ্রতিকাশো-রামস্য করুণোরসঃ" প্রভৃতি বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন। অগ্নির উত্তাপে গলিত ধাতুর ন্যায় প্রিয়-বিয়োগ-সন্তাপে হৃদয়কে এমন করিয়া দগ্ধ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে দৃঢ়তা অবলম্বন করতঃ একান্ত আপনার জনকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া জীবন-ভরা দুঃখ বরণ করিয়া নিয়াছ এবং তোমার প্রাণপ্রিয়ধনকে দিয়াছ, সেই দৃঢ়তায় হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে তুলিয়া নিলে অবশিষ্ট জীবন যে বড় আনন্দে যাইতে পারিত, হে রাজাধিরাজ! এ বিশ্বে আপনার প্রাপ্য আপনি সংগ্রহ করিয়া নিতে হয়, কেহ কাহাকেও হাতে তুলিয়া কিছু দেয় না, বরং "অধিক সংখ্যকের প্রভূত সুখসাধন" রূপ মোহনমন্ত্রে দেহে মনে দুর্ব্বল যে তাহাকে প্রতারিত করিয়া বলবান জনে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া নেয়। পরোপকারনীতির যাদুমন্ত্র প্রথমে যাহার মনে আসিয়াছিল, সে পরের জন্য ভাবিতে বসিয়া এই নীতি আবিষ্কার করে নাই, সে নিজের স্বার্থ অপরের নিকট হইতে কেমন করিয়া সাধন

করিয়া নিবে, তাহারি উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে করিতে আলাদীনের এই আশ্চর্য্যপ্রদীপ পাইয়া আবহমানকাল ধরিয়া আত্মস্বার্থ সাধন করিয়া নিতেছে। এই চাতুর্য্য না বুঝিতে পারিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া কত লক্ষ কোটি প্রাণী যে দধীচির মত নিজ পঞ্জরাস্থি বাহির করিয়া দিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। দধীচির অস্থি দ্বারা যে দিব্যাস্ত্র প্রস্তুত হইল তাহা লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ চলিতে থাকুক; কিন্তু জীর্ণ-ঋষি কোথায় রহিলেন তাহার খোঁজখবর করে কে? স্বর্গোদ্ধার করিয়া ঐরাবত, উচ্চৈশ্রবা, পারিজাত, লক্ষ্মী প্রভৃতি উপভোগ্য সামগ্রী যে যাহার ভাগ করিয়া নিবার সময়ে অস্থিদাতা ঋষির কথা কেহ ভাবিয়াছ কি? সে কথা কেহ কোন দিন ভাবে না। স্বকার্য্য উদ্ধার করা পর্য্যন্তই প্রয়োজন। নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পারের নৌকার খোঁজ করিবার কোন আবশ্যক হয় না। স্বার্থপর সংসারের এই নিয়ম, ইহার জন্য আত্মনির্য্যাতন, আত্মবঞ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র।

সীতানির্ব্বাসনই অযোধ্যাবাসীর প্রয়োজন ছিল, দুর্ম্মুখের দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইয়া গেলে রামজানকীর দিন কি ভাবে কাটিল কি কাটিল না, অসংখ্য অযোধ্যাবাসীর মধ্যে সে অনুসন্ধান কেহ করে নাই। তাহাদের দিন যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিল; অচল হইল কেবল নির্ব্বাসিতের আর তোমার দিন। ত্রেতার দুর্ম্মুখ আজও মরে নাই, আজও সংসারে লক্ষ কোটি সীতার হৃদয়-বিদারণ নির্ব্বাসন দুর্ম্মুখের চক্রান্তে নীরবে হইয়া যাইতেছে, নির্ব্বাসিত জন বিপুল দুঃখের ভার তাহার **প্রিয়-হস্তের** দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া নেয়, কিন্তু দণ্ডদাতার সান্ত্বনা কোথায়, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না।

—পাগ্‌লু।

# মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

## ভারতবর্ষ, শ্রাবণ—

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরীর "দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচকের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাইলাম না। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন "কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আমার এই অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য প্রবন্ধে কোনো অশোভন, অসংযত অথবা অসঙ্গত কথা বলিয়া থাকি, মনীষিগণ নিজগুণেই তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমার এ তুচ্ছ সন্দর্ভ

যদি এক ব্যক্তিকেও কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তবেই, বলা বাহুল্য—ইহার চরম সাফল্য লাভ হইল মনে ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব।" যদিও লেখক এই প্রবন্ধ ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় ছাপাইয়া আমাদের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তবুও আমরা ইহা পরিত্যাগ করিলাম। বন্ধুপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া যাহা লেখা যায়, তাহা মাসিক পত্রে না ছাপনই উচিত।

"বিরোধ বা ব্যাঘাত দোষ বা বাধ এবং অদ্বৈতবাদ" শ্রীদ্বিজদাস দত্তের দার্শনিক প্রবন্ধ। লেখক রামানুজের বিরোধ বা ব্যাঘাত দোষের উল্লেখ করিয়া "প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তাহার অভাব জ্ঞানও অন্তর্নিহিত" এই সূত্রটি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। স্বপ্রকাশ গ্রাহক আত্মার পক্ষে যুগপৎ নানারূপে অনুভূতিলাভ অথবা নানা প্রকার ক্রিয়াসাধনসম্বন্ধে বিরোধজনিত বাধের আপত্তি আসিতে পারে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রে সে আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভোজবৃত্তিকার শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, লেখক দেখাইয়াছেন তাহা সুচিন্তিত নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বিরোধ দোষের বিভীষিকা দেখিয়া তাঁহার অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নিত্য "তমঃশব্দবাচ্য" "অচিৎবস্তুর সমষ্টিস্বরূপ" সাংখ্যপ্রকৃতির একপ্রকার সূক্ষ্মাবস্থা কল্পনা করিয়াছেন; তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচ্ছন্ন ভেদবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক তাদাত্ম্য স্বীকার করিয়া বিরোধদোষের বিভীষিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছেন।

লেখকের বক্তব্য বিষয় আমরা সংক্ষেপে সংকলন করিলাম। প্রবন্ধটি বিষয়ের গাম্ভীর্য্যের জন্য কিছু জটিল বলিয়া মনে হয়। লেখক ইচ্ছা করিলে এমন ভাবে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন যাহাতে তাঁহার প্রবন্ধ অধিকতর পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে। তাঁহার আলোচনা আধুনিক কালের উপযোগী। প্রাচ্য দর্শন এইরূপে পাশ্চাত্য ভাবে সমালোচিত হওয়াই এখন বাঞ্ছনীয়।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকার মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে মাতৃশক্তির বিকাশ কত সুন্দরভাবে হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কলাকৌশল অনেকস্থলে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ললিতবাবুর বিদ্যাবত্তা ও সমালোচনার শক্তির পরিচয় এ প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুণাল-কাঞ্চন" শীর্ষক কবিতায় ছন্দ ও ভাষার মাধুর্য্য আছে।

"উধাও—ঊর্দ্ধে—দূর-দূরান্তে কাঁপে অন্ধের গান
এ যেন নিশুতি নিশীথ-নিথরে ঝরণার কলতান"
"প্রাসাদ-কক্ষে নিদ্রোত্থিত রাজার পরাণ-মাঝে
সেই পুরাতন শিশুর কণ্ঠ—আরতির সুরে বাজে।"

প্রভৃতি যুগ্মে কবিত্ব আছে। তবে গল্পটি বলিবার রীতি ভাল বলিয়া মনে হয় না, অংশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য নাই; সেই জন্যই কবিতাটি কিছু দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

## প্রবাসী, শ্রাবণ—

প্রবাসীর "বিবিধ প্রসঙ্গ" সুপাঠ্য। সাময়িক সমালোচনার অনেক বিষয় এই অংশে পাওয়া যায়। অনেক স্থলেই সম্পাদকের চিন্তাশীলতার উদাহরণ আছে।

সমাধিসাধনা ও বিভূতি লাভের সম্বন্ধে শ্রীদ্বিজদাস দত্ত যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সংকলন মাত্র। লেখকের বিশেষ গবেষণার পরিচয় কোথাও নাই।

"পাতালের অক্সফোর্ড" প্রবন্ধে শ্রীবিনয়কুমার সরকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও এ প্রবন্ধে বিদ্যমান। পর্য্যটকের লেখায় এই সব বর্ণনাগুলি চিত্তাকর্ষক। প্রবন্ধটি পাঠ করিলে একটা উন্নত দেশের সভ্যতার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এ পরিচয় বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

"তাজ" শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ; স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে ; ভাব ও কবিত্বে মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু এ ধরণের কবিতা যদি পাঠকের ক্লান্তি উৎপাদন করে তাহা হইলে কবির কলাকৌশল একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা কবিতাটি পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়াছি, সেই জন্যই কবিকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

## সবুজপত্র, আষাঢ়—

"ঘরে বাইরে" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ; ভাষা ও ভাবে লেখকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এ সংখ্যায় যে অংশটুকু পড়িলাম তাহাতে হয়ত উপভোগ করিবার বা রসাস্বাদের বিষয় অল্প থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে ভাবিবার ও তন্ময় হইবার অনেক জিনিষ আছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখকের অনেক কথা সহজে অন্তরে গাঁথিয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় একটা নূতন ধরণের উপন্যাস তিনি লিখিতে চেষ্টা করিতে-ছেন, এ উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা যে দিন দিন বাড়িয়া উঠিবে সে আশা আমরা না করিলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা যে একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিবে তাহা অনুমান করিতে পারি। সন্দীপের আত্মকথাটি চিন্তনীয় বিষয়ে পূর্ণ—একটা সংযত ওজোগুণ তাহাকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছে। এ ধরণের মনস্তত্ত্ব নূতন না হইলেও আজ সর্ব্বত্র ইহা যে নূতন আকারে দেখা দিয়াছে, আমরা চারিদিকে তাকাইলে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইতে পারি। আমার ভাগে যাহা পড়িয়াছে, সেইটুকু লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে ক্ষমতাশালী জনে পারে না, এবং পারে নাই ; সেই জন্য যুগে যুগে এই বৈচিত্র্যময়ী ধরণীর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কত বিচিত্র কর্ম্মের নৃত্যলীলা আমরা দেখিয়া আসিতেছি, সে সকলকে আমরা নিন্দা করিতে পারি—এবং করিয়াও থাকি, কিন্তু সম্ভাবিত জনে নিজ প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করিয়া লইতে। নিন্দায় কর্ণপাত করিয়া, চেষ্টা হইতে বিরত প্রায়শঃই হয় না, যখন হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার ক্ষমতারই অভাব কারণ, আকাঙ্ক্ষিত লাভের উদ্যমে আমরা তখনই বিরত হই—যখন নিজকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে করি।

"বেদনা" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ; আকারে ছোট, কিন্তু ভাবে ও কাব্যরসে

উজ্জ্বল। কবি বেদনায় ভরা পেয়ালা সযত্নে বুকে রাখিয়া নিশার শেষে প্রিয়কে উপহার দিতেছেন—

রোদনের রঙে লহরে লহরে রঙীন্ হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো গো তোলো
মিশাক এ রসে তব নিশ্বাস
নব প্রভাতের কুসুমের বাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো।

এ উক্তি হৃদয়গ্রাহী। আত্মসমর্পণের সুরটিও বড় মধুর।

"যৌবনের পত্রে" রবীন্দ্রনাথ অনন্ত যৌবনের কথা বলিয়াছেন। এ যৌবন দেহের নয়, প্রাণের। উর্দ্ধগামী নিয়ত উন্নতিশীল ব্যক্তির যৌবন চিরস্থায়ী, জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির মধ্যেও তাহার যৌবন অক্ষুণ্ণ; কবি নিত্য নব নব লোকে আলোকে আলোকে বিচরণ করিতে চান; মরণ তাঁহার নিকট একটা উন্নতির দ্বার। সেই জন্যই যৌবন তাঁহাকে এই বলিয়া পত্র লিখিতে পারে—

"এস এস চলে এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে
মরণের সিংহদ্বার হয়ে এস পার
ফেলে এস ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।"

কবিতাটিতে যে ভাব লেখক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র তাঁহারই রচনায় বর্ত্তমান।

শ্রীমাধুরীলতা দেবীর ছোট গল্পে গল্পলেখিকার কৃতিত্ব স্থানে স্থানে দেখিতে পাইলাম। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণেও লেখিকার যত্ন আছে। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত না হইলেও আশা করা যায় তিনি বেশীদিন এ ভাবে থাকিবেন না।

"ছবির অঙ্গ" রবীন্দ্রনাথের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ; ছবির ছয়টি অঙ্গ কি কি, তাহাদের অর্থ ও শক্তি, কবিতার সঙ্গে তাহাদের কিরূপ মিল আছে এই সব কথাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মত আর্টিষ্ট আর্ট সম্বন্ধে যে কথা বলেন, তাহা সকলেরই আলোচনার বিষয় এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। প্রবন্ধটি পড়িয়াও দেখিলাম আমাদের অনুমান মিথ্যা নয়। এমনভাবে দর্শনশাস্ত্রের সহিত মিল রাখিয়া আর্টের ব্যাখ্যা আমাদের দেশে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

## ভারতী, শ্রাবণ—

রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যায়" একটি প্রাণস্পর্শী কবিতা—কয়েকটি কথার অন্তরালে যে নিবিড় ভাব জমিয়া আছে তাহা শান্ত, সরল, পবিত্র, নির্ম্মল !

"চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন গঙ্গাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমায় নত শিরে
নির্ম্মাল্য তোমার,
আকাশ হয়ে পার ;"

ভাবে, গাম্ভীর্য্যে, অলঙ্কারে মনোরম। চিত্রটি অবাস্তব, ভাবময়, কিন্তু স্পষ্ট ;

"ঐ যে সে তার সোণার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙ্গিনায়,
ঘুমে অলস কায়
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুণ ধুলি নিল সে বিদায়।"

ছবিখানি প্রাঞ্জল—সান্ধ্য আকাশের মাধুর্য্যটুকু নিঃশেষে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কবর-ই-নূরজাহান" একটি কবিতা, দীর্ঘ হইলেও ইহাতে কবিত্ব আছে, রস আছে। নূরজাহানের ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে কবির ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, কবিতাটি উপভোগ্য।

"ককারের অহংকার" শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক রচনা। প্রবন্ধটি পাঠকের অন্তরে যে হাস্যরসের সঞ্চার করে তাহা ক্ষণিক, কিন্তু দীপ্ত ও উজ্জ্বল।

শ্রীনলিনীনাথ দের "বর্ষার আগমনী" কবিতার সুর ও ভাব নূতন না হইলেও মধুর।

## নারায়ণ, আষাঢ় ও শ্রাবণ—

নারায়ণের এই দুই সংখ্যার কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের "অনিমা" উল্লেখ যোগ্য ; কবিতাটিতে বেশ একটু স্নিগ্ধতা ও গাম্ভীর্য্য আছে। অন্যত্র ভাষা, ভাব ও দৈন্য দেখিয়া মনে হয় নারায়ণের সহিত রসের একটা বিরোধ ঘনাইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ কবিতায় এক কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—মনে হয় নারায়ণের কবিগণ কোন উপায়ে কয়েকটি পৃষ্ঠা ভরাইবার জন্য যতটা যত্ন করেন, আপনাদের রচনার প্রতি তাহার সিকিও প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক। একটি দীর্ঘ কবিতা দীনভাব, ভাষা ও ছন্দ লইয়া নারায়ণের ছয়টি পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে। সমালোচককে অনেক স্থাবিশের মধ্যে বিচরণ করিতে হয়। সেই জন্য এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে কোন

মতে প্রায় শেষ অংশে আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় দেখি নীচে লেখা আছে "ক্রমশঃ"। এই "ক্রমশঃ" কথাটি লিখিয়া ভবিষ্যতে আরো খানিকটা অন্ততঃ ছয় পৃষ্ঠা এরূপ কবিতা পড়িবার সৌভাগ্য হইবে বলিয়া কবি আমাদের যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহাতে আমরা বড়ই ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কি, হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে, কেনই বা হীনযানকে হীন আর মহাযানকে মহা বলা হয়, মহাযান কোথা হইতে আসিল এই সব কথা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বৌদ্ধধর্ম্মে" আলোচনা করিয়াছেন। লেখক কথাগুলি বড়ই ফেনাইয়া বলিতেছেন। দুই সংখ্যায় যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সার সংকলন করিতে গেলে বড়ই নিরাশ হইতে হয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবনী ও কবিত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবির যতটুকু বিবরণ আমরা জানি, তাহা অপেক্ষা বেশী কথা এখানে নাই; কাব্য-সমালোচনার অংশে লেখকের কৃতিত্ব অতি অল্প। কবি সুরেন্দ্রনাথ প্রতিভাবান্ ছিলেন, তবুও তিনি সাধারণের নিকট আপনাকে ভাল করিয়া জাহির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি যদি কবিকে একজন নূতন পাঠকের নিকটও পরিচিত করিতে পারে, তাহা হইলেও ইহার কতকটা মূল্য আছে বলিয়া মনে করিব।

শ্রীসুখরঞ্জন রায় "কথা-সাহিত্যে" একটা সুনির্ব্বাচিত বিষয় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজীতে মূল ও অনূদিত গ্রন্থ অনেক আছে যাহা হইতে তিনি অনেক কথা গুছাইয়া লিখিতে পারেন। সাদা কথায় "কথা-সাহিত্য" লেখা যায়, লেখক যদি তাহাই করিতেন ভাল হইত। রচনায় অলঙ্কার বা কবিত্বের প্রয়োগ করিতে হইলে ভাষার উপর দখল চাই। আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া কাজ করা উচিত, নচেৎ অনেক স্থলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা। লেখক লিখিয়াছেন—

"বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের জাগ্রত মানবমনের যে তন্দ্রাবিজড়িত কল্পনা-নিবিড় কোনটির উপর এই অশরীরী হাওয়া-রাণীদের কোমল চরণ পড়ে, তাহার ইতিহাস প্রকাশ্য দিবা-লোকে কীর্ত্তন করার মতন, অথবা একটু উল্টাইয়া বলিতে গেলে, নিশীথ সমুদ্রের মত সুপ্ত মানবচৈতন্যের কিনারায় মরণালোকিত চঞ্চল বীচিগুলার উপর পরীরাণীদের লঘু পাদক্ষেপের খবর পাওয়া এবং দেওয়ার মত দুঃসাহস একমাত্র কবিদেরই আছে।"

যিনি এইরূপ রচনা চালাইতে চান্ তাঁহারও দুঃসাহস কম নয়। একটা উদাহরণ দিয়াছি, আরও অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। নারায়ণের সম্পাদক সাংখ্যোক্ত পুরুষ হইয়া আছেন, নচেৎ নারায়ণের পৃষ্ঠায় এসব আবর্জ্জনারাশি কেন?

"গতি ও স্থিতি" শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ; লেখক বলিতে চান ইউ-রোপের আধুনিক সভ্যতার আদর্শ এবং সাধ্য গতি বা progress, আর আমাদের এই ভারতবর্ষের শেষযুগের সভ্যতার আদর্শ এবং সাধ্যবিষয় স্থিতি বা conservation। তার পর জর্ম্মন পণ্ডিত নিজ্‌শ্ (Nietosche) গতিতত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট যে শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লেখক বলিতেছেন—গতি স্থিতির

বিপরীত ব্যাপার। আবার একটু পরেই বলা হইয়াছে "মনে হয় দুইটাই স্বাভাবিক ও সত্য।" লেখক কিন্তু স্থিতির পক্ষে কথা কহিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। লেখকের বিচারবিতর্ক অসম্পূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। শুধু তন্ত্রের দোহাই দিয়া একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝানো যায়, সমগ্র মনুষ্যজগতের অন্তরে তাহা রেখাপাত করিতে পারে না।

"আঁধার-ঘরে" ও "হাসির দাম" দুটি কথা-নাট্য—লেখক শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। আমরা জানি এইসব রচনা প্রকাশ করা আইন সঙ্গত নয়; তবে ব্যারিষ্টার সম্পাদক নিশ্চই আইন বাঁচাইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আইন বাঁচাইয়াও একটা অসংযত, কুৎসিৎ ও জঘন্য রচনা 'নারায়ণ'এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া তিনি নীতি ও সমাজের প্রতি যে আচরণ করিতেছেন তাহা ভাল কি মন্দ বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়কে এই সব রচনা পত্রস্থ না করিতে আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি। ইচ্ছা করিলে পাঠক সাধারণের মত গ্রহণ করিয়াও তিনি জানিতে পারেন—এ অনুরোধ একের নয় অনেকের। এসব রচনা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে এরূপ ধারণা যদি তাঁর থাকে, তিনি সব কথা প্রকাশ করিয়া আপনার ধারণাকে সমর্থন করুন। লেখকের রচনায় প্রায় সব নারীই পতিতা; পতিতা নারীদের মহলের সব কুকীর্ত্তিগুলি ইনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন। নাট্যের কোন পাত্রের মুখ দিয়া কোন নারীর প্রতি যে কথা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা অপাঠ্য, অবাচ্য, অশ্রাব্য। পৃথিবীর মধ্যে একটি নারীর প্রতিও যাঁহার সামান্য স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসা আছে তাঁহার রচনায় সে কথা প্রকাশ পাইতে পারে না। নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া "মানসী"র পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে চাই না। লেখক সমগ্র নারী জাতির অবমাননা করিয়াছেন। নারায়ণের পূজা-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র আপনার কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিন্।

আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী অনেক ভদ্র-মহিলা নারায়ণে প্রবন্ধাদি লেখেন "আঁধার-ঘরে" প্রভৃতির ন্যায় কুৎসিৎ ও অশ্লীল লেখার সহিত তাঁহাদের লেখা একত্র বাহির হওয়া আমাদের মতে বাঞ্ছনীয় নহে, আশা করি, মাননীয় 'নারায়ণ'-সম্পাদক মহাশয় এ কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

# জন্মাষ্টমী।

যেদিন তামসী নিশি কাঁপাইয়া দশ দিশি
আপন রাক্ষসী ক্ষুধা করিল বিস্তার।
যেদিনে এমনি করে বজ্র ছুটে ধরাপরে
একাকার যমুনার এপার ওপার।

লৌহদ্বারে ঝঞ্ঝা বলে, ঠেলামারে
ঝনঝন করি যায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।
সে রাতেও কংস-চর ভয়ঙ্কর দণ্ডধর
হুঙ্কারি মথুরাপথে বেড়ায় ঘুরিয়া।
এমনো দুর্দ্দিনে স্বামী যদি নাহি এসো নামি
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া এই ত্রস্ত ধরাতলে,
এ দুঃখে সবার সহ ভাগ যদি নাহি লহ
ডুবিবে তোমার সৃষ্টি প্রলয়ের জলে।
তোমারে হেরিতে হ'লে তোমারে পাইতে কোলে,
নিতে হবে শির পাতি, এমন দুর্দ্দিন
তোলপাড় টলমল কালোদুখ দীঘিজল,
তুমি তাহে ফুট' যে গো আনন্দ নলিন,
লীলাময় লীলাকর' দুখ দিয়ে দুখহর'
শিশিরে শোভিত তব কমললোচন
দুই দিন দুখ দিয়ে আপনার করে' নিয়ে
অনন্ত কালের দুঃখ করহ মোচন।
জন্ম তব কারাগারে আবির্ভাব অন্ধকারে
আলোকিত সৌধশিরে লভনা জনম,
যেখানে বন্ধন ভয় অত্যাচার লভে জয়
সেইখানে জাগ' তুমি-হে প্রিয় পরম।
যেখানে পাষাণ ভার কাতরতা, হাহাকার,
যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয় দিবারাত,
রক্ষিবারে সাধুগণে দুষ্কৃতির বিনাশনে
সেথানে সম্ভব তব ওগো দীননাথ।
বৈকুণ্ঠ তেয়াগি স্বামী ধরাতলে এস নামি'
আবার মর্ত্ত্যের হও হে মহাপুরুষ,
অবোধ কাঙ্গাল যারা শুষ্ক অন্ন দিয়ে তারা
আবার তোমারে প্রভু করুক মানুষ।

শ্রীকালিদাস রায়

# সাহিত্য-সমাচার

আগামী বড়দিনের অবকাশের সময় যশোহরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর একটু পূর্ব্বেই অধিবেশণ হইবে। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল বেদান্ত বাচস্পতি মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রধান সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা অবগত হইলাম যে, তিনি উক্ত পদ গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছেন; এক্ষণে অন্য কাহাকেও সভাপতি করিতে হইবে; শাখা সভার সভাপতিগণও এখনও নির্ব্বাচিত হন নাই।

---

প্রসিদ্ধ গল্প লেখিকা শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী 'স্তবক' নামে একখানি গল্পের পুস্তক প্রকাশিত করিতেছেন; পূজার পূর্ব্বেই পুস্তকখানি বাহির হইবে।

---

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটনের আত্ম-জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে।

---

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'গল্পাঞ্জলির' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছে; দুই চারি দিনের মধ্যেই বাজারে প্রকাশিত হইবে।

---

প্রসিদ্ধ গল্প লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নূতন গল্পপুস্তক 'চিকিৎসা-সঙ্কট' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আর একখানি গল্প-পুস্তক যন্ত্রস্থ; বোধ হয় পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

---

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'প্রবাস চিত্রের' তৃতীয় সংস্করণ এবং 'বিশুদাদা' 'ছোটকাকী' ও 'আমার বরের' দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

---

সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচি মহাশয়ের 'নাগকেশর' নামক কবিতা পুস্তক যন্ত্রস্থ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

---

এবার উত্তর বঙ্গের সম্মিলনের অধিবেশন আসাম ধুবড়ীতে হইবে; কখন হইবে এবং কে সভাপতি হইবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই; বোধ হয় গুড্ ফ্রাইডের সময়ই অধিবেশন হইবে।

---

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঙ্গালার বেগমের' ইংরাজী সংস্করণের ছাপা শেষ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

---
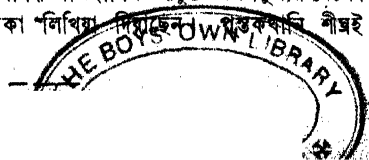
৭ম বর্ষ ২য় খণ্ড | আশ্বিন, ১৩২২ সাল | ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা

# শরদাগমে

যৌবনের মলয়-মন্ত্রে অন্তরের মালঞ্চতলে কত বিচিত্র বর্ণগন্ধময় পুষ্প পত্রেরই যে আবির্ভাব হয় তাহার সকলগুলি কি জীবন সার্থক করিয়া যাইতে পারে? কত ফুল ঝরিয়া যায়, কত পত্র শুষ্ক হয়, কত নিদাঘের ঝড়-ঝঞ্ঝা, কত কালবৈশাখী আসিয়া সে সমস্ত শুষ্ক, স্খলিত, ব্যর্থ ফুলপল্লবের আবর্জ্জনা-রাশি উড়াইয়া কোন সুদূরে নিয়া ফেলে কে জানে? হতাশ্বাস-নিদাঘের রুদ্রতাপে সাধের মালঞ্চ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তখন পুঞ্জীভূত বেদনার মেঘে বিষণ্ণ অন্তরলোকে অশ্রুর কত অবিরল বর্ষণই যে হয়! সে বর্ষণেও বসন্তের ঝরা ফুলের শুষ্ক আবর্জ্জনার পাংশুজাল নিঃশেষে ধুইয়া বুঝি যায় না! তার পর প্রৌঢ়ের শরৎসমাগম। তখন আর যৌবনের বসন্ত-চঞ্চলতা নাই, নিরাশার নিবিড় দুঃখের কাল-কাদম্বিনী তেমন করিয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণে অন্তরতলে আর প্লাবন আনিতে পারে না, কিন্তু যে কয় বিন্দু থাকিয়া থাকিয়া তখনও মাঝে মাঝে ঝরিয়া পড়ে তাহা জমাট দুঃখের কঠিন বিন্দু, করকাভিঘাতের মত নিবিড় বেদনা দিয়াই ঝরিয়া পড়ে! তবুও উহা শরৎ,—শুভ্র, শান্ত, সৌম্য, সেফালির মৃদুগন্ধামোদিত, মনোরম শরৎ, আয়ত্তের অতীত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা এবং কল্পনা-লোকের কুহকিনী আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাহরণ করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় ও নির্ভরের মত নীড় রচনা করিয়া অদৃষ্ট-দেবতার সহিত ভাগ্যবিধাতার সহিত সন্ধি করিবার দিনের শরৎ। সে দিন বিচিত্র বর্ণাঢ্য

রঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায়, নানাবর্ণ-সমুজ্জল শিখণ্ডীর কলাপশোভার ন্যায় বিচিত্র দুরাশা ও অনায়ত্ত দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বারা মুগ্ধ হইবার দিন নহে। অস্ত-মান যৌবন-সূর্য্যের ক্ষীণালোকের সেই বিষণ্ণ প্রদোষে, জীবন-কুরুক্ষেত্রের সেই শান্তিপর্ব্বে চাই আমরা আমাদের চিরাকাঙ্ক্ষিত, চিরাভিলষিত, চিরশরণ ও অন্তরের চিরন্তন একটি মানুষের মিলন-মাধুরী, আর একখানি ক্ষুদ্র নিভৃত কুটীরের একটি নিরালা কোন্ যেখানে আমাদের মরণাহত মস্তক সেই একান্ত প্রিয়মানুষটির ক্রোড়ে রাখিয়া নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত মনে মরিতে পারি।

আসন্ন হেমন্তের সমাগত-প্রায় অন্ধকারে আতঙ্কিত জনকে যদি প্রৌঢ় প্রদোষেও নির্ভরের মত, বিশ্রামের মত, স্থানটুকু না পাইয়া, আকাঙ্ক্ষিত মিলনের অনাময় সুখ ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে মরিবার অবসর না পাইয়া, অপরিচিত, নির্ব্বান্ধব ধরণীর অন্তহীন পথে বাহির হইতে হয়, তবে তাহার মত শোচনীয় কে তাহাও জানি না।

কি মানবের জীবনচক্রে, কি প্রকৃতির বর্ষাবর্ত্তনের মধ্যে অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে দেখিতে পাই যে, শরৎ যথার্থই ফল ফলিবার ও শস্য পাকিবার সময়। জীবন ভরিয়া বা বৎসর ধরিয়া যাহা কিছু রোপণ, বপন করিয়াছি তাহারি শস্য আহরণ করিবার সময় এই জীবনের বা বৎসরের শরৎকাল। দুর্দ্দান্ত দুরাকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা ও দুরাশার অধীরতা সব ঝরিয়া মরিয়া গিয়া যাহা কিছু অবশেষ রহিয়াছে, তাহারি সফলতা পাইবার সময় এই শরৎ—যে দুই একটি প্রাণী সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমাদের অন্তরতলে আজও বিরাজ করিতেছে তাহদের মিলনের মধ্যে এই জীর্ণ বিস্বাদু জীবনের কথঞ্চিৎ সুখস্বাদ অনুভব করিবার দিন এই শারদীয় দিন।

বৈচিত্র্যময় জীবন-বসন্ত বাসনার ব্যাকুলতা হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া তোলে; অপূর্ব্বদৃষ্ট পুষ্পের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব দূরাগত মধুগন্ধে মুগ্ধ মনো-মধুপের লোলুপ গুঞ্জন বনবনান্ত মুখর করিয়া তোলে, কিন্তু গভীর মর্ম্মতল একান্ত আপনার জনটির সহিত মিলনাশায় জীবনের শরতাপরাহ্ণে যেমন আকুল হইয়া উঠে, তেমন আর অন্য সময়ে হয় কি না বলিতে পারি না। নানা বিচিত্রবর্ণগন্ধময়পুষ্পসমাকীর্ণ বসন্ত-প্রভাতে রূপোন্মত্ত মধুকরের লীলাময় বিচরণ দেখিয়াছি, আবার আসন্ন হেমন্তের আতঙ্কত্রস্তা বিরল-পদ্ম-সরোবর-মধ্যস্থা একা-নলিনীর বক্ষ হইতে নিতান্তমুগ্ধ মধুব্রতের একান্ত

আগ্রহ-পূর্ণ পুষ্পাসব সংগ্রহের ব্যাকুলতাও দেখিয়াছি। এ দুইয়ে কত পার্থক্য! বসন্তের মত্তগুঞ্জনশীল মধুলেহী রূপগৌরব-মত্তা কুসুমকলিকার কর্ণকুহরে কোন্ বিস্মৃত মায়াপুরীর অলীক বারতা ও অসত্য স্বপ্নকাহিনী শুনাইয়া মুগ্ধা পুষ্পবধূকে মোহজালের মধ্যে ফেলিয়া সুদূরে সরিয়া যায়, আর শরৎসন্ধ্যার বন্ধুস্বরূপ শান্ত ষট্‌পদ শিশির-নিশীথিনীর ভয়ভীতা সরোবর সম্রাজ্ঞীর বুকের সম্পদ সুধীরে আহরণ করিয়া তাহার পুষ্পজীবনের দান-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া দেয়।

তাই মনে হয় কি মানবের জীবনে, কি বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির অভ্যন্তরে, যে দিকেই নয়ন ফিরাই, শারদীয় দিনের ব্যাকুলতা-ময় পরিপূর্ণ-মিলনাকাঙ্ক্ষা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কাশকুসুমের শুভ্রাবরণে ধরণী কাহার মিলনাশায় সাজিয়া দাঁড়ায় কেমন করিয়া বলিব? শুভ্র শেফালীর অরুণবৃন্তে তাহার আকুল মিলনাকাঙ্ক্ষা বেদনায় কাহার জন্য অমন রাঙা হইয়া উঠে কে জানে? অশোক, কিংশুক, কাঞ্চনের অগ্নিবর্ণে বসন্তে যাহা বিকাশ হইতে পারে নাই, ক্ষুদ্র শেফালিকার ক্ষুদ্রতর বৃন্তে বেদনাময় মিলনাকাঙ্ক্ষার সেই রক্তিমরাগ গোপন করিয়া রাখা শারদীয়া প্রৌঢ়া ধরিত্রীর পক্ষে আজ অসাধ্য ও অসম্ভব। সীমাহীন দিক্‌চক্রবাল হইতে হিম-স্পর্শ মন্দমারুত কি বারতা আনিয়া এই সুন্দরী ধরণীর কর্ণে আজ গুঞ্জন করিতেছে, সে মধুভাষিত আজ প্রৌঢ়া সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে কেতকীর পুলকাঙ্কুর কেন এবং কাহার একান্ত মিলনস্পৃহায় জাগাইয়া তুলিতেছে তাহা কেমন করিয়া জানিব? এই মাত্র জানি যে আজ পরিপূর্ণ-নদী-তড়াগ-সরোবর-সমন্বিতা ধরণী বেদনাতুর অশ্রুশ্রীর মধ্যে হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনীয় কাহারও আশায় উন্মুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর আকাশের চন্দ্র-পবন-দিনকরাদি-দেবতা আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিয়া তাহার বর্ষব্যাপী প্রতীক্ষাব্রতের সুফল সূচনায় ইঙ্গিত করিতেছেন।

শান্তশরতের এই বিশ্বব্যাপী মিলনোৎকণ্ঠা স্নেহ-কাতর মানবহৃদয়ে নিবিড় আবেগের সঞ্চার করে; স্নেহ, মায়া, প্রীতির বিপুল সম্ভারের তৃপ্তি জীবন ভরিয়া না পাইলেও জীবনের এই শরৎসন্ধ্যায় ব্যর্থজীবন সার্থক করিবার আশা অন্তরের মধ্যে আকুল আগ্রহে জাগিয়া ওঠে। অনাদৃত স্নেহভারে প্রপীড়িত হৃদয় লইয়া বৈতরণীর বালুবেলায় দাঁড়াইয়া চিরতৃষাতুর জন তাহার চিরাভিলষিত ও চিরকামনার স্পর্শমাণিককে, তাহার প্রাণপ্রিয়

অমূল্যনিধিকে প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে প্রাণপণ আকুলকণ্ঠে আহ্বান করে। সে দিনেও জীবন-বান্ধবের অবিচ্ছেদ সাহচর্য্যলাভে যাহার জন্ম সার্থক না হয়, সেই জীবন-প্রদোষের ঘনায়মান অন্ধকারেও যাহার জন্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার প্রিয়তমজনের অভাব রহিয়াই যায় তাহার মত দুঃখী জগতে খুঁজিয়াও পাওয়া দুষ্কর।

মানবের ক্ষুধিত স্নেহবৃত্তি মর্ত্ত্যজনেই আবদ্ধ হইয়া নাই, তাহা লোক-লোকান্তরবাসী দেবতার সহিত স্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের পদে স্নেহ-ভক্তির অঞ্জলি দিয়া বাসনা সিদ্ধির বর মাগিয়া লয়। এই মেঘ-নির্ম্মুক্ত, বর্ষণক্ষান্ত, শারদদিনে গিরিনন্দিনীর অর্চ্চনার বিধান স্নেহপ্রবণ মানবমনের কি অপূর্ব্ব মাধুরীময় সৃষ্টি! অফুরন্ত নীলিমায় অনন্ত আকাশে অকাতর আলোকস্পন্দন, বর্ষাস্নাতা মেদিনী আপক্ক শস্যপূর্ণ প্রান্তরের শ্যামলাঞ্চলে সমাবৃতা, মেঘলেশহীন গগনাঙ্গন হইতে শারদচন্দ্রমার অজস্র, অবারিত স্নিগ্ধসুধাধারার সুপ্রচুর বর্ষণ! ধরণীতলে দেবতার আবির্ভাব হইবার অনুকূল এমন দিন কি সহসা খুঁজিয়া মেলে? এই দিনে যাঁহাকে তিনটি দিনের পূজা গ্রহণ করিয়া মানবহৃদয়ের আরাধনা ও অর্চ্চনার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে ডাকিয়া আনা হয়, তিনি কেবল গিরিনন্দিনী নহেন, তিনি মহামায়া, তিনি শক্তিরূপা, তিনি শিবহৃদয়বাসিনী সর্ব্বমঙ্গলা। কি আকুল আগ্রহে, উদ্বেলিত ভক্তির কি উচ্ছ্বসিত আবেগে সমগ্র বৎসরের ব্যথা, বেদনা, লাঞ্ছনা, দীনতা, হীনতা, দেহমনহৃদয়ের সকল প্রকার আর্ত্তির উপশমকল্পে প্রাণমনের কি সভক্তি আরাধনা! অতি তুচ্ছতম দীন, দিন যাহার যায় না, সেও একবার দুঃখহারিণীর দর্শন পাইয়া অন্তরের দুঃখ নিবেদন করিবে এই আশায় শারদাকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। নিদারুণ-ব্যথা-কাতর জন, যে জীবনের প্রতিদিন এবং প্রতিদিনের সবগুলি দণ্ড পল মুহূর্ত্ত কেবল মরণ যাচ্ঞাই করে সেও এই মাতৃরূপা, কন্যারূপা, শক্তিরূপা, দয়ারূপা, স্নেহ-মায়া-প্রেম-প্রীতিরূপা শিবকরা দুঃখহরার রাতুল চরণতলে তাহার ব্যর্থ জীবনের বেদনার বার্ত্তা বহন করিবে বলিয়া এই শরতের উৎসবদিনের অপেক্ষায় সাশ্রুনয়নে বসিয়া থাকে।

শারদ উৎসব কেবল ভক্তগৃহে দেবতার আবাহন, অর্চ্চনা ও বিসর্জ্জনেই পর্য্যবসিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করে না, পিতৃগৃহের আনন্দদুলালী তনয়া

নিরানন্দ পিতৃভবন বৎসরান্তে আনন্দময় করিতে আসিতেছেন তাই উৎসবের সীমা নাই ; নীল গগনে আলোকের উৎসবমেলা, ধরণীর অঙ্গে শ্যামলতার উৎসব মেলা, শূন্যে শশী-তপন-তারকার উৎসবমেলা, আর প্রতি পিতার প্রতি মাতার, প্রতি দুহিতা বধূ, ও দয়িতের হৃদয়তলে সমাগতপ্রায় আনন্দ মিলনের আশার উৎসব, এবং দেহে সেই উৎসবের আনন্দপুলক! তিনটি মাত্র দিনের মিলন, কিন্তু সেই ক্ষণিক মিলনের কি বিপুল আয়োজন বৎসর ভরিয়া চলিয়াছে! কন্যাবিরহকাতরা জননী তাহার নয়নমণির দর্শন পাইবে, তাহার সম্বৎসরের চক্ষের জল তিনটি দিনের মুখের হাসির সূর্য্যকরের সহিত মিশিয়া তাহার মনে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর সৃজন করিয়া দিবে, তাই মা মেনকার চক্ষে নিদ্রা নাই।

এই তিনটি দিনের ক্ষণমিলনই যে কত দুর্লভ তাহা চিরবিরহের মধ্যে যাহার দিন যায় সেই জানে, তাই মা মেনকা ক্ষণিকের এই মিলন মহোৎসবের জন্য বৎসর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। তিন দিন ত দীর্ঘ সময়, জগতে এমন লোকও থাকিতে পারে যে একটি দিনের মিলনের মূল্যস্বরূপ তাহার সমগ্র পরমায়ু হাস্যমুখে দান করিয়া চরিতার্থতার আনন্দের মধ্যে ধরণীর সুখদুঃখের নিকট বিদায় লইতে একটুও দ্বিধা করে না।

কবে কোন্ বিস্মৃত দিনে পর্ব্বততনয়া পার্ব্বতীর বিরহদুঃখে কোন্ মেনকার নয়নে নদী বহিয়া গিয়াছে, কোন্ শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত দিবসে মাতার হৃদয়-গগনের মেঘভার কাটিয়া গিয়া নন্দিনীর মুখ-চন্দ্র উদয় হইয়াছিল তাহা কে জানে? আজ যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবের বিরহকাতর মনে সে পুরাণ কাহিনী চিরজাগরুক রহিয়াছে। শরদাগমে আনন্দময়ীর আগমনে এ নিরানন্দ বসুধাতল আনন্দ-প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে, বিরহীর চির-বিধুর-বক্ষ প্রিয়-সম্মিলন-সুখের রসধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া আবার সরস হইয়া উঠিবে। দুঃখী হৃদয়ের এ আশা যে বড় আশা! মাতা সন্তানের মিলনাশায় বধূ বল্লভের সমাগম সম্ভাবনায়, প্রণয়ী তাহার একনিষ্ঠ কামনার একমাত্র স্পর্শমাণিকের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় কেমন করিয়া মিলনের সেই পরম মুহূর্ত্তটির প্রত্যাশায় আজ দিন কাটাইতেছে তাহা বলিবার মত ভাষা বুঝি আজও সৃষ্টি হয় নাই!

সে মুহূর্ত্ত আসিল, ত্র্যম্বকের নিকট তিনটি দিনের অবসর মাগিয়া নিদ্রা

হরহৃদয়চারিণী, দুর্গতিহারিণী গিরিগৃহে আসিলেন। সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধি, নবমী সবই একে একে কাটিয়া গেল। পাষাণ-নন্দিনীর কৃপা কে পাইল, কে পাইল না তাহা কেমন করিয়া বলিব?

পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া নির্ম্মল উৎসধারার সৃজন প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায়, যিনি সর্ব্বপ্রকৃতির মূলাধার তিনি পাষাণীর তনয়া, তবুও ভক্তের জন্য একান্ত চরণাশ্রিত অনন্যশরণের জন্য, করুণার উৎস একদিন পাষাণনন্দিনীর বুকেও কি জন্মলাভ করিবে না? হায় রে! সে দিন কত দূরে?

নিষেধসত্ত্বেও নবমীর নিশি প্রভাত হইল, কত ভক্ত সভক্তি আরাধনার অবকাশ পাইয়া, অপরাজিতার অপরাজিত কৃপা-সম্ভার হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, আবার অশ্রুসিক্ত বিজয়ার সন্ধ্যায় কত লোকের বক্ষপঞ্জরের বিপুল বেদনার মধ্যে বিসর্জ্জনের করুণ বাদ্য সমতানে বাজিয়া বাজিয়া কি ব্যাকুলতার সৃজন করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার ভাষা সরস্বতীর ভাণ্ডারে আছে কি?

ত্রিনয়নের তিন নয়নে এই তিনটি দিনে কি বেদনার কত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া কৈলাসের তপঃকানন ভাসাইয়া দিয়াছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইয়াছে? মেনকা মিলন-মাধুরীর মধুসাগরে নিমজ্জিতা, তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছে। পরের দুঃখ বুঝিবার তাঁহার সময় নাই! দিনান্তের ক্ষুধার অন্ন যে অন্নপূর্ণার সুবর্ণ-দর্ব্বী দত্ত না হইলে ভিখারীর মুখে উঠিবে না, তপঃসাধনার নিভৃতকুটীরসন্নিহিত নক্তমাল-মূলে গৌরীর অর্দ্ধাঞ্চল বিনা মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরের যে বসিবার দ্বিতীয় আসন নাই তাহা গিরিবালিকা নিজে না বুঝিলে কে আর বুঝিবে? পাষাণীর তনয়া হইয়াও তিনি তাঁহার পথনিরীক্ষণকারী ভিখারীর মনের কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই মায়ের বাধা হৈমবালার মন টলাইতে পারে নাই; পূর্ব্ব বিরহে মহাযোগীর চিত্তবিকারের কথা উমা আজও ভুলিতে পারেন নাই, তাই বিজয়ার দিনে মাতৃভবন আঁধার করিয়া রাজরাজেশ্বরী ভিখারীর হৃদয়ব্যথা নিবারণ জন্য নিরানন্দ কৈলাসপুরী আবার আনন্দিত করিতে চলিয়াছেন! হে জগন্মোহিনী, ওগো ত্রিনয়নের নয়নতারা, তারাহীন নয়নে যাহার জীবন ভরিয়' ধারা বহিয়া যাইতেছে তাহার কি করিয়া গেলে মা?

গয়া, ২৮শে ভাদ্র ১৩২২ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# অপূর্ব্ব মৌচাক্

প্রমত্ত মধুপ সম, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ করি,
মেলিয়া সুনীল পাখা, আমার এ শুভ্র চিন্তাগুলি,
হরিপাদপদ্ম হ'তে পদ্মমধু আনিয়াছে হরি!
প্রথম-চুম্বন-মধু নবযুবা লয় যাহা তুলি
অধর-বান্ধুলি হ'তে,—রূপে ভোর, বসন্ত-বুল্‌বুলি,
গোলাপের কাণে কাণে ঢালি দেয় যে সুধা-লহরি,
নহে এত সুমধুর! হের দেব, গুঞ্জর গুঞ্জরি,
অলিবৃন্দ ঝঙ্কারিছে!—মুখে সদা আনন্দের বুলি,
আজি এই সনেটের মধুচক্র, ভাবের আবেশে
রহিয়াছে অলিবৃন্দ! ভক্তবৃন্দ, বিহ্বল হরষে,
হউক রসনা তব "হরি-মধু"—রসের পরশে!
রে অলি, দুর্জ্জন কেহ, তোর পাশে গুপ্তবেশে এসে,
চাকেতে মারিল ঢিল্, রোষবশে হুল্ বসাইয়া
দিস্ না শ্রী-অঙ্গে তার,—মুখে দিস্ এ সুধা ঢালিয়া!

২৯শে আগষ্ট, ১৯১৫ ইং ডেরাডুন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

# পদ্মা-বক্ষে

প্রতি বৎসরই পূজার সময় অনেক পুরাতন কথা মনে হয়—অনেক শুষ্ক ক্ষত-স্থান বেদনাযুক্ত হয়—অনেক লুপ্তপ্রায়-স্মৃতি সজীব হইয়া উঠে; তাই প্রতি বৎসরই পূজার সময় অতীত-জীবনের সামান্য দুই একটি কথা লিখিয়া থাকি;—এবারও একটি কথা বলি।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমি দেশেই থাকিতাম। পশ্চিমাঞ্চল তখন আমার নিকট ভূগোলসূত্রের বিভীষিকাই ছিল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে, অভিন্নহৃদয় বন্ধুবরের বিশেষ কৌশলে যে সংসার পাতিয়াছিলাম, যে আনন্দের হাট বসাইবার আয়োজন করিতেছিলাম—এক ঘনান্ধকার রজনীর দ্বিতীয় যামে দেখি, ছায়াবাজীর মত সে সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যেখানে নন্দনকানন সাজাইতে গিয়াছিলাম, সে স্থান উষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে:—যেখানে মধুর বংশীনিনাদ শ্রবণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম,

সেখানে অকস্মাৎ একদিন বিকট হৃদ্‌কম্পকর হরিধ্বনি উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া দিল।

এই দুঃসময়ে এক বৈশাখ-মধ্যাহ্নে আমি গৃহত্যাগ করিলাম। আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে নৌকাযোগে পদ্মানদী দিয়া গমন করা ব্যতীত পথান্তর বা যানান্তর ছিল না। বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে বিশেষ গুরুতর কার্য্য না থাকিলে কেহ নৌকাযোগে স্থানান্তরে যায় না। বিশেষতঃ পদ্মানদীতে চৈত্র বৈশাখ মাসে খুব পাকা-মাঝিও অপরাহ্নকালে নৌকা চালাইতে চায় না;—'কালবৈশাখী' বড় ভয়ানক।

বেলা দুইটার সময় যখন নদীতীরে নৌকাভাড়া করিতে গেলাম, তখন কেহই অপরাহ্নকালে নৌকা ছাড়িতে সম্মত হইল না। যে মাঝিকে বলি সেই বলে—"না বাবু, এমন অবেলায় নাও ছাড়তি পারব না। রাত্রিরডা থাকুন, ভোর বেলায় নাও ছাড়ব।" ঘাটে অনেকগুলি নৌকা ছিল; কিন্তু কি জেলে-মাঝি, কি মুসলমান-মাঝি—কেহই সেই বৈশাখের অপরাহ্নকালে ভাড়ায় যাইতে স্বীকৃত হইল না;—সকলেরই সেই এক কথা "কালবৈশাখী।" কেমন করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব যে, কালবৈশাখীর প্রচণ্ড আবর্ত্ত কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—আমি মরি নাই; কেমন করিয়া বুঝাইব যে, সপ্তাহ পূর্ব্বেই আমার মস্তকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে—আমি মরি নাই; সুতরাং আর দশটা কালবৈশাখীতেও আমাকে মারিতে পারিবে না। নৌকার মাঝি-দিগকে ত সে কথা বলা যায় না!

আমার বাল্যকাল হইতেই কেমন একটা অভ্যাস ছিল, এখনও তার অবশিষ্টাংশ কিছু আছে যে, কোনও কাজ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিতে পারি না;—কোনও স্থানে যাইতে হইলে অর্দ্ধপথে অপেক্ষা করা আমার কোষ্টীতে লেখে না।

সেদিন সেই নদীতীরে গমনে বাধা পাইয়া আমি বড়ই অসাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। যেখানে ভাড়াটিয়া-নৌকাগুলি বাঁধা ছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি ছোট জেলে-ডিঙ্গী দেখিলাম। আমি ধীরে ধীরে নদীতীর দিয়া অগ্রসর হইয়া সেই ডিঙ্গীর নিকটে গেলাম। ডিঙ্গীখানি অতি ছোট। ডিঙ্গীর উপরে যে আবরণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি মানুষ অতি কষ্টে বসিতে পারে—ডিঙ্গীর একজন মাঝি, আর একজন দাঁড়ী।

আমি মাঝিকে ডাকিয়া বলিলাম, "ওহে মাঝি, ভাড়ায় যাবে?" নৌকা

হইতে একজন উত্তর দিল, "হাঁ যাব। দাঁড়ান, উপরে আসি,ত শুনি।" উপরে যে আসিল, তাহার বয়স সাতাশ আটাশ বৎসর হইবে। তাহাকে আমার গন্তব্য-স্থানের কথা বলিলাম; এবং একথাও বলিলাম যে, তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিতে হইবে---কালবৈশাখীর ভয় করিলে চলিবে না। লোকটা একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, "একটু দাঁড়ান, ভাইকে জিজ্ঞেসা করি।"—এই বলিয়া সে ডাকিল, "নফরারে, এদিকি আয় ত।" দাদার আহ্বান শুনিয়া একটি অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক নৌকা হইতে বাহির হইয়া উপরে আসিল। মাঝি তাহাকে বলিল, "নফরা, বাবুকে নিয়ে এই অবেলায় পদ্মায় যাতি পারবি?" নফরচন্দ্র অকুতোভয়ে বলিয়া বসিল, "পার্‌ব না ক্যান্‌, আসেন বাবু—এখনই নৌকা ছাড়ে দেব। জিনিষপত্তর কই?" আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে জিনিষপত্র কিছুই নাই।"

নফরচন্দ্রের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তাহার দাদা ফটিকচন্দ্র বলিল, "চলেন, আর দেরী করবেন না—এই একটা বাঁক উজায়ে যায়েই পদ্মার ভা'টেনের মুখে নৌকা ধরে দিতি পারলি, রাত্তির চারদণ্ডের মধ্যে পৌছিয়ে দেব।"

আড়াই-টাকা ভাড়া স্থির করিয়া আমি নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। ফটিক বলিল, "বাবু একটু সবুর করেন, উপরের দোকান থিকে এক পয়সার তামুক কিনে আনি।" আমি বলিলাম, "আমি তামাক খাই না। তোমাদের যদি তামাক না থাকে, ত কিনে আন। পয়সা দেব?"

"না, পয়সা দিতি হবি নে, আমার কাছেই পয়সা আছে।"—এই বলিয়া ফটিকচন্দ্র নদীর উপরের দোকানের দিকে চলিয়া গেল।

প্রায় দশমিনিট অতীত হইয়া গেল, তবুও ফটিকের দেখা নাই। আমি এতক্ষণ নফরের সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলাম—তাহাদের ঘরের সংবাদ লইতে-ছিলাম। ফটিক আর নফর দুই ভাই। নফর যখন আট বছরের, তখন তাহা-দের পিতার মৃত্যু হয়; আর বিগত বৎসর তাহাদের মাতাও মারা গিয়াছেন।—এখন তারা দুই ভাই; তাহাদের একটি ভগিনী আছে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সে শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে। বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেহই নাই। নফরের দিদি এবং অন্যান্য জাতিকুটুম্বেরা ফটিকের বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু "দাদা একেবারে কাট-কবুল—কিছুতিই সে বিয়ে করবি নে। দুই ভাই গাঙে মাঝ ধরি, হাটে বাজারে বেচি—যখন মাছ থাকে না তখন ভাড়া-খাটি—নৌকোয়ই রাঁধিবাড়ি খাই—এক একদিন বাড়ী যাই। দিদি যখন বাড়ী আসে তখন রোজই বাড়ী যাই, তা নইলে এই নৌকোয়ই থাকি।"—এই রকম কথা-

বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ফটিক ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিহে ফটিক, এক পয়সার তামাক আন্‌তে এত দেরী!" ফটিকচন্দ্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "আর কবেন না বাবু, আপনাগারে এই ভদ্দরলোক বাবুগুণো এমন জুয়েচোর তা আর কি বলবো! কা'ল একটা বাবুর ভাড়া নিছিলাম; বাবু সাঁজের বেলায় এই ঘাটেই আ'সে একটা টাকা ভাড়া দিয়ে গেল। বাবু ভদ্দরলোক, তার সুমুখে কি টাকাডা বাজায়ে নিতি পারি! টাকাডা কাপড়ের খুটে বাঁ'ধে রাখিছিলাম—আপনি ত পয়সা দিতিই চা'লেন। আমি মনে করলাম, শুধু ত আব তামুক কিন্‌তি যাচ্ছিনে—রাত্তিরি আপনারে নামায়ে দিয়ে অত রাত্তিরি আর কেডা রান্‌তি যাবি? তাই মনে করলাম, সেরখানেক চিঁড়ে, আর পয়সা দুয়ের গুড় কিনে নিয়ে আসি—তেঁতুল ত নৌকোই আছে! দোকানে চিঁড়ে গুড় আর তামুক কিনে সেই টাকাডা তারে দিলাম। সে না টাকাডা বাজায়ে ফিরেয়ে দিল—টাকা মেকী—চল্‌বিনে। আমি টাকাডা হাতে নিয়ে দুই তিনবার বাজায়ে দেখি, বাজেও না—কিছুই না। হা রে বেটা বাবু! আমরা গতর খাটায়ে রোজগার করি—গরীব মানুষ পা'য়ে সাঁজের বেলায় খারাপ টাকাডা চালায়ে গেল। যাক্‌গে বাবু, গরীব মানষের বহুৎ সয়! তখন আর কি করি, দোকানদারের বললাম, ভাই এই তেরডা পয়সা বাকী থাক্‌ল, এখন আবার নায়ে যা'য়ে পয়সা আনতি গেলি দেরী হয়ে যাবি। কালই আবার ঘাটে আস্‌ব, তখন তোমার পয়সা ক'ডা দিয়ে যাব। দোকানদার ত সে কথা কাণেই তোলে না, ভাগ্যি আমারে গাঁয়ের করমশায় সেই দোকানে ব'সে ছিল, সে বল্‌ল, 'রামতনু, ফট্‌কে তেমন ছেলে নয়, ও কালই তোমার পয়সা দিয়ে যাবে।'—তবে গে বাবু আসি। দেখেন ত বাবু হেঙ্গামডা! ভদ্দরলোক—"

ফটিক আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল। তাহার কথায় বাধা দিয়া নফর বলিল, "তা যা কও দাদা—এই জুয়েচুরিডা ভদ্দরলোকেই বেশী করে। আমরা যারে মারবো, ত দেব তার মাথায় বাড়ি; আর ভদ্দরলোক করে কি জান—এক দিক হা'সে কথা ক'বি, আর তলেতলে তার মাথা খাবি। এই মাচ বেচার সময় দেখ না—যত ঘসা-পয়সা, যত কোঁড়া-নাগান সিকি দুয়ানী—সে সব ঐ বাবুরাই চালায়।"

দুই ভাইয়ের কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কথাগুলি গায়ে পাতিয়াই লইতে হইল। আমি বলিলাম, "যাক্, ও সব কথা থাক, এখন নৌকা খুলে দাও।" নফর কিন্তু তখনও সূত্র ছাড়ে না—সে বলিল, "দাদা, লগি তোল—

আচ্ছা দেখেন ত বাবু, আপনিই বিচের করুন—ভদ্দর-লোকের এত ক’রে নিয়ে আলাম্—চান করতি পান না—আমরাই তেল দেলাম ;—শুধু চারডে চিঁড়ে আনিছিলেন; নুন রে,তেঁতুল রে—আর যতখানি গুড় ছিল—তামাম খানিই বাবুরে দেলাম—তা না দিলি কি আজ আর গুড় কিন্‌তি হয়—তার জন্যি ত আর পয়সা নেলাম না—ভদ্দরলোক খাবি—নৌকোয় ছিল, তার জন্যে কি আর পয়সা নেওয়া যায় ?—কি বলেন ?—এখন দেহেন ত—আমাগারেই খালি-দালি, নায় চড়ে আলি ; গলদঘর্ম্ম হয়ে ঘাটে আসে “টায়েন” ধরায়ে দিলাম—আর সে কি না দিয়ে গেল একটা মেকী টাকা ! ভুত্তোর ভদ্দরলোকের কিছু বুলে !”

আমি বলিলাম, “নফর, ও টাকা তোমার ঠিক আস্‌বে ; কিন্তু যে তোমাদের ঠকিয়ে গিয়েছে, তার ঐ একটাকার বদলে পাঁচ টাকা বেরিয়ে যাবে।”

“দরিয়া পাঁচ পীর গাজির বদর” বলিয়া দুইভাই নৌকা ছাড়িয়া দিল। ফটিক বলিল, “নফরা, তুই হা’লডা ধর, আমি দাঁড়ে তিন ‘থাবা’ দিয়ে পাড়ি জমায়ে দিয়ে গুণে নামি। একটানে বেলাবেলি পদ্মায় পড়া চাই।” —এই বলিয়া ফটিক দাঁড়ে বসিল। সত্যসত্যই দেখিতে দেখিতে নৌকা-খানি নদীর অপর পারে লাগিল। ফটিক তখন ‘গুণ’ ঠিক করিয়া লইয়া নৌকা হইতে নামিয়া গেল।

নৌকা তরতরবেগে চলিতে লাগিল। নফর নৌকার পশ্চাতে হা’ল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছে “সাবাস জোয়ান—ভ্যালারে মোর ভাই।” কণিষ্ঠের সাধুবাদে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ফটক আরও জোরে গুণ টানিতে লাগিল। নৌকা চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ করিয়া শব্দ হইতেছে—বৈশাখ-অপরাহ্নের মৃদুমন্দ বাতাস নফরের দীর্ঘকেশ দোলাইতেছে। নফর মনের আনন্দে গান ধরিল—

“আমার মন কেন উদাসী হতে চায়
ওগো দরদী গো।—
ও সে ডাক নাহি, হাঁক নাই,
সে যে আপনি আপনি চলে যায়।”

কি সুন্দর নফরের কণ্ঠস্বর! গান অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এই ধীবর পুত্র সে দিন সেই নদীর মধ্যে অপরাহ্নকালে যখন “দরদী গো” বলিয়া সুরের টান দিতে লাগিল, তখন সত্যসত্যই মনে হইতে লাগিল, এ গান

শুনিয়া 'দরদী' কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না। নৌকার মধ্যে বসিয়া ছিলাম—নফরের মুখখানি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া মাস্তুল ধরিয়া নফরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়াই নফর লজ্জিত হইয়া গান ছাড়িয়া দিল এবং দাদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "সাবাস ভাই, আর একটু জোরে—ঐ সুমুকের গাঁ-খানা—"

আমি বলিলাম "নফর, গান ছেড়ে দিলে যে! গাও, বেশ ত গাচ্ছিলে।" নফর সলজ্জভাবে বলিল "আজ্ঞে এঁ্যা, এঁ্যা—"আমি বলিলাম "লজ্জা কি? তুমি গাও।" নফর গায়িতেছে না দেখিয়া আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমি ছ'য়ের মধ্যে যাচ্ছি, তুমি গাও।"

আমি ছ'য়ের মধ্যে বসিলাম—নফর আবার গান ধরিল—

"ও সে এমন করে দেয় গো মন্ত্রণা,
সে যে উড়ায়ে দেয় প্রাণের পাখী,
নিষেধ মানে না;
সে যে উড়ে যায় বিমানের পথে,
ও তার শীতল বাতাস লাগে গায়।"

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল আমিও নফরের সঙ্গে সঙ্গে গান ধরি—

"সে যে উড়ে যায় বিমানের পথে,
ও তার শীতল বাতাস লাগে গায়।"

হায় নবীন যুবক! শীতল বাতাস গায় লাগিলেই যদি হৃদয়ের প্রজ্বলিত বহ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত হইত, তাহা হইলে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন নদী-সৈকতে বসিয়া শীতল বাতাসই গায়ে লাগাইতাম!

নফর প্রাণ খুলিয়া গান করিতে লাগিল। তাহার স্বরলহরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া নদীর অপর-প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে লাগিল—নদীতরঙ্গ সেই গানের সঙ্গে সঙ্গত করিতে লাগিল;—দূর গ্রামের বৃক্ষরাজি হইতে সুকণ্ঠ পক্ষিগণ মধ্যে মধ্যে বাহবা দিতে লাগিল—আমি তন্ময় হইয়া সেই অশিক্ষিত-কণ্ঠের অপূর্ব্ব-গীত শুনিতে লাগিলাম। কত কথা মনে হইতে লাগিল;—কত দুঃখের স্মৃতি—কত অরুন্তুদ যন্ত্রণা হৃদয়কে মথিত, ক্লিষ্ট ও পিষ্ট করিতে লাগিল।

নদীতীরে একস্থানে পাঁচ ছয়খানি বড় বড় মহাজনী-নৌকা মাস্তুল উচ্চ করিয়া তীরসংলগ্ন হইয়াছিল। নফর নৌকা হইতে হাঁকিল, "দাদা

গুণ তোল।" ফটিক তীর হইতে বলিল, "গুণ তুলে কাজ নেই, ছাড়ায়ে নিয়ে যাব।" নৌকার গতি মন্দ হইল। ফটিক নৌকা কয়খানির উপর উঠিয়া গুণ ছাড়াইয়া লইল—আবার নৌকা চলিতে লাগিল।

যখন সন্ধ্যা হয় হয়, সেই সময় আমাদের নৌকা পদ্মার মোহানার নিকট উপস্থিত হইল। নফর নৌকাখানিকে তীরসংলগ্ন করিল; ফটিক গুণ ঠিক করিয়া নৌকায় উঠিয়া বলিল, "নফরা, এক ছিলুম তামুক সাজ ভাই!" নফর তামাক সাজিতে বসিল। আমি বলিলাম, "ফটিক দেরী করো'না—নৌকা ভাটিতে ছেড়ে দিয়ে তামাক খেও।" ফটিক বলিল, "ভয় কি বাবু! টানের মুখি ডিঙ্গি ধরে দেব, রেলগাড়ীর মত ছুটে যাবিনি।" আমি আর কথা বলিলাম না। দুই ভাই তখন তামাক খাইতে লাগিল। নফর বলিল, "দাদা, আর দেরী করো'না—নাও ভাটেলের মুখে ফেলে দিয়ে বসে বসে তিন ছিলুম তামুক খাও। কালবৈশেকি, কওয়া ত যায় না!"

ভ্রাতার এই পরামর্শই সঙ্গত মনে করিয়া ফটিক নৌকা ঠেলিয়া দিল। নফর দাঁড় ধরিল, ফটিক নৌকার পিছনে গিয়া হা'ল ধরিয়া বলিল, "নফরা, খুব জোরে গোটাকয়েক থাবা মা'রে এইটুকু উজায়ে যায়ে টানের মুখি নৌকো ফেলে দে।" আমি বলিলাম, "বার-গাঙে না গিয়ে কিনারা দিয়ে যাও না কেন।" ফটিক বলিল, "কিনারায় তেমন সোঁত নেই, আর দোয়ানির টানও বেশী—ভয় কি বাবু! দেখতি দেখতি চলে যাব।"

দেখিতে দেখিতে আমাদের সেই ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পদ্মায় যাইয়া পড়িল। তখন প্রায় সন্ধ্যা; সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; পশ্চিমদিকে একটু একটু লালের আভা দিতেছে; পাখীরা সব পদ্মার চর ত্যাগ করিয়া দূরগ্রামে চলিয়া যাইতেছে; আকাশে সারিসারি বকের মালা চলিয়াছে। আমি নৌকায় বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যার এই শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

নফর নৌকার হাল ধরিয়া আছে, ফটিক দাঁড় টানিতেছে। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় কি নফর চুপ করিয়া থাকিতে পারে। সে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

"বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
ক্ষণেক কাল বিরাম নাই এ দুনিয়ার।
ডিঙ্গা ডিঙ্গী পিনেশ বজরা মহাজনী নৌকায়,
ওরে, পাপী তাপী সাধু ভক্ত চড়ন্দার তার সমুদায়;

ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে,

হা'ল ধ'রে তার সুকৌশলে বসে আছে কর্ণধার, মন সবার।"

যেমন সুন্দর গান, তেমনই সুকণ্ঠ গায়ক, আবার তেমনই পবিত্র মনোরম স্থান। পদ্মা আপনমনে গান করিতে করিতে সাগর-উদ্দেশে যাইতেছেন; দূরে পাখীরা ভগবানের আরতি-গান করিতেছে; অন্ধকারের যবনিকা ধীরে ধীরে নদীবক্ষে প্রসারিত হইতেছে,—আর তাহারই মধ্যে যুবক নফর প্রাণ খুলিয়া গায়িতেছে—"বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার!"

ফটিকচন্দ্রও দাঁড় টানিতে টানিতে মধ্যে মধ্যে ভাইয়ের সুরে সুর মিলাইতেছে। আমিই বা চুপ করিয়া থাকি কেন। নফর যে গান গায়িতেছে, তাহা ত আমাদেরই গান; আমরা সে গান কতবার গায়িয়াছি, তবুও কোন দিন সে গান গায়িয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হই নাই। আমিও তখন নফরের সেই গানে যোগদান করিলাম; বার বার করিয়া একই অন্তরা গায়িতে লাগিলাম।

আমরা গানে এমনই তন্ময় হইয়াছিলাম যে, পশ্চিমে যে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ উঠিয়াছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটু জোরে বাতাস আসিতেই ফটিক বলিয়া উঠিল, "ওরে নফরা, হাওয়ার যে বড় জোর দিল। আঁধারে ত ঠাওর করতি পারতিছি নে। হাওয়াডা যে পশ্চিমে, মেঘ করে নেই ত?"

নফর পিছন দিকে আকাশে চাহিয়া দেখিল; তাহার পরই বলিল, "পশ্চিমে মেঘই করেছে দাদা!"

ফটিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "নৌকো কিনারা ধর" এই বলিয়াই সে জোরে দাঁড় ফেলিতে লাগিল।

নফর তীরের দিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া কিঞ্চিৎ ভীতস্বরে বলিল, "দাদা, যাবা কনে, ওদিকি যে কাছাড়, কোল-টোল ত নেই! ঝড় যে উঠে আ'লো, বড়ই যে মুস্কিল হবিনি।"

ফটিক বলিল, "ভয় নেই, ঝড় উঠে আস্‌তি আস্‌তি আমরা বানেপাড়ার কোলে যাতি পারবনে।"

আমি এতক্ষণ কথা বলি নাই, সুধু দুই ভাইয়ের কথাই শুনিতে-ছিলাম। এক্ষণে আমি বলিলাম, "কোন ভয় নেই নফর, ঐ ত বেনেপাড়া দেখা যাচ্ছে।"

আর দেখা! বলিতে বলিতেই শন্‌শন্‌ করিয়া ঝড় উঠিয়া আসিল;

নৌকার মুখ ফিরিয়া গেল; নফর কিছুতেই নৌকা ফিরাইতে পারিল না—নৌকা পদ্মার মধ্যের দিকে ছুটিয়া চলিল।

আর রক্ষা নাই! নফর চীৎকার করিয়া বলিল, "দাদা, তুমি হা'লে আস, আমি পারলাম না।"

ভাইয়ের এই কাতরোক্তি শুনিয়া ফটিক সেই ঝড় তুচ্ছ করিয়া নৌকার পাশ-দিয়া অতি কষ্টে হা'লের কাছে গেল। তখন দুই ভাই সেই হালখানি চাপিয়া ধরিল। আমি তখন বাহিরে আসিয়া মাস্তল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি; তখন আর কাপড়খানি বেশ আঁটিয়া পরিবারও উপায় নাই। ছোট ডিঙ্গি নৌকাখানি নাগরদোলার মত পদ্মার সেই উত্তাল-তরঙ্গের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

ফটিক চীৎকার করিয়া কি বলিল, কিন্তু আমি শুধু তাহার কথার আওয়াজ পাইলাম, কথা বুঝিতে পারিলাম না।

সকলেই জানেন যে, এই প্রকার ঘোর বিপদের সময়ই ভগবানের নাম মনে আসে। যে কোনদিন তাঁহাকে ডাকে নাই,—তাঁহার নাম করে নাই, বিপদে পড়িলে সেও তাঁহার নাম করিয়া থাকে। আমার মত পাষণ্ডও তখন উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে লাগিল।

সে আর কতক্ষণ—এক মিনিটও নয়;—পশ্চাৎ হইতে ফটিক চীৎকার করিয়া উঠিল—এ যে অন্তিম চীৎকার! তাই, সেই প্রবল ঝড়, ভয়ানক ঝঞ্ঝা, ভীষণ তরঙ্গগর্জ্জন ভেদ করিয়া সেই স্বর আমার কর্ণে পৌছিল—"বাবারে—গেল।" আর তৎক্ষণাৎ আমাদের সেই ছোট ডিঙ্গিখানি একবার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া একেবারে সেই পদ্মাতরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার মত হইল। নফর প্রাণপণ-শক্তিতে বলিয়া উঠিল, "বাবু—জলে ঝাঁপ দেন।" হায় অশিক্ষিত যুবক! এই প্রাণান্ত সময়েও তোমার বাবুর কথা মনে হইল। আমি জলে ঝাঁপ দিলাম—একবার চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "নফর!" তুমুল ঝড়ে সে আর্ত্তনাদ কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল।

আমার বয়স তখন তেইশ বৎসর। আমি পল্লীবাসী যুবক; নদী দেখিয়া আমি কোনদিন ডরাই নাই; সন্তরণেও আমার কম দক্ষতা ছিল না; কিন্তু আজ পদ্মার এই ভীষণ তরঙ্গে পড়িয়া, এই তুমুল ঝড়ের মধ্যে আমি দিশাহারা হইয়া গেলাম। সাঁতার দিব কি, মুখে চোখে যে জলের ছাট আসিয়া পড়িতে লাগিল—তাহাতে দম-বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। অনেকখানি জল পেটেও

গেল। চেষ্টা করা বৃথা বুঝিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পদ্মার গর্ভে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলাম। হাত পা ছাড়িয়া দিলাম—সাঁতার দিবার চেষ্টা মোটেই করিলাম না;—কোন রকমে জলের উপরে ভাসিয়া থাকিবার জন্য যেটুকু করা যায়, প্রাণপণে তাহাই করিতে লাগিলাম। প্রবল ঝড়ে, পদ্মার ভীষণ তরঙ্গ আমাকে দ্রুতগতিতে মৃত্যুর দ্বারে লইয়া চলিল।

কিছুক্ষণ আমার সংজ্ঞা ছিল। সে কতক্ষণ, তাহা আমি বলিতে পারিব না;—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও পারিতাম না—আজও পারিতেছি না।

হঠাৎ আমার সংজ্ঞা হইল। আমি বেশ অনুভব করিলাম,—সত্যসত্যই অনুভব করিলাম—একখানি কোমল হস্ত আমাকে ঠেলিয়া দিতেছে—আমাকে সোজা হইয়া দাঁড় করাইয়া দিতেছে। এ কি! আমার পায়ে যে মাটি ঠেকিল! আমি তখন বুকজলে দাঁড়াইয়া! আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তখনও সেই কোমল হস্ত আমাকে ঠেলিতেছে; আমার অবসন্ন চরণদ্বয় ধীরে ধীরে একটু অগ্রসর হইল, আমি কোমর-জলে আসিলাম। শরীর একেবারে অবসন্ন, নড়িবার শক্তি ছিল না বলিলেই হয়। তবুও একবার প্রাণপণ চেষ্টায় নদীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম—কি দেখিলাম—তাহা আর বলিব না—এ জীবনে আর সে কথা বলিব না। আমার হতভাগ্য অভিশপ্ত চক্ষুদ্বয় সহসা সেই সময়ে কেন যেন একবার মুদিত হইল। পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি—সম্মুখে গভীর অন্ধকার—আর সেই প্রলয়ঙ্করী পদ্মা তীরবেগে ছুটিতেছে—আমি এক বালুকাপূর্ণ চরের নিকটে আজানু-জলমগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছি।

আর দেখিতে পাইলাম না;—সেই গভীর অন্ধকার, সেই প্রবল ঝটিকা বিদীর্ণ করিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিলাম, "ও গো—একবার দেখা দেও, একবার! একবার!"

ক্লান্ত হইয়া জলের উপর আসিয়া বালুকাময় তটে বসিয়া পড়িলাম। বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন যে মনে কি হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে ঝড় থামিয়া গেল—আমি নিশ্চেষ্টভাবে সেই অন্ধকাররাশি বেষ্টিত হইয়া বসিয়াই আছি। নড়িবার শক্তিও নাই—ইচ্ছাও নাই। থাকিয়া থাকিয়া সুধু সেই পদ্মাবক্ষের অন্ধকাররাশির দিকে চাহিতেছি—যদি একবার তাহার মধ্যে আলোকসম্পাত হয়—ওগো, যদি একবার

তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাই—যদি এক পলকের জন্য সেই কোমল-স্পর্শ অনুভব করিতে পাই।

এইভাবে বসিয়া আছি, এমন সময় মনে হইল, কে যেন দূর হইতে ডাকিতেছে, "বাবু!"

আবার সেই ডাক—আবার সেই কণ্ঠস্বর! এ যে নফরের স্বর! আমি সাড়া দিলাম—কি বলিলাম তাহা বলিতে পারি না।

ক্রমে সেই স্বর,—সেই 'বাবু'-ডাক নিকট হইতে লাগিল। আমি বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—নফরই ডাকিতেছে। আমি এবার উত্তর দিলাম "নফর!"

নফর তখন দৌড়াইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

আমি তাহাকে একেবারে আমার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম। নফর বলিল, "বাবু, মা-দুর্গা খুব বাঁচায়ে দেছেন।"

আমি বলিলাম, "নফর, তোমার দাদা?" নফর উত্তর করিল, "দাদার ত তালাস করি নাই। মা-দুর্গা যে ব'লে দিলেন 'বাবুর কাছে যা, বাবু একেলা আছেন।' তাই ত আপনার তালাসে আলাম।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি বল্‌ছ, নফর!"

নফর বলিল "বাবু, প্রাণ ত গিছিল। জলের মধ্যি ডুবে যাচ্ছি, তখন দেখি কি না মা-দুর্গা আ'সে আমারে ঠেলে এই চরার উপর তুলে দেলেন। আমি ঠিক দেখিছি বাবু—মা-দুর্গা!"

"তারপর।"

"তারপর মা-দুর্গা বুল্লেন 'বাবুর কাছে যা, বাবু একেলা আছেন।' এই বুলেই মা দুর্গা জলের তলায় ডুবে গ্যালেন, আর দেখ্‌তি পালাম না।"

আমি অবাক্ হইয়া গেলাম্; কি বলিব ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "নফর, কেমন চেহারা দেখ্‌লে, বল্‌তে পার?"

নফর বলিল, "তা আর পারব না। সেখেনে কি আর আঁধার ছিল, আমি বেশ দেখিছিলাম। বেঁটে মানুষটা, কপালভরা সিঁদুর, বেশ মোটাসোটা রকম, একখানি লালপাড়ে সাড়ী-পরা, মুখখানি কিন্তু বাবু বড়ই কাঁদো কাঁদো। বাবু—"

আমি তাহাকে আমার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম।

# আশ্বিনের ব্যথা

শ্বশুরের ঘর স্বামীর আদর—বড় সুখ তাহা মানি,
তবু আজি মন করিছে কেমন কেন যে তাহা না জানি!
কোন্ ঘরখানি মনে পড়ে থেকে-থেকে,
প্রাণের ভিতরে কে যেন ফিরিছে ডেকে;
ঘরে-ঘরে ঘুরি—মুখে বাস আর বুকের বেদনা টানি'।

হেথা সোহাগের অভাব ত নাই, যতনের হেলা-ফেলা,
নিত্য নিয়ত মন-যোগানর আয়োজন সে ত মেলা;
তাই নিয়ে ভুলে' থেকেছি এগারমাস,
আজি মনে হয় কণ্টক-গৃহে বাস—
আজ শুধু বুকে জমে' উঠে শ্বাস শরৎ সন্ধ্যাবেলা।

কাঁচপোকা ঐ উড়িয়া বেড়ায় ঘরেরই জানালা-পাশে,
এত কাছে—তবু সাধের টীপের কথাটি মনে না আসে!
এয়োতী নারীর লক্ষণ সব আগে—
চুল-বাঁধা—সেও আজ ভাল নাহি লাগে;
কি হয়েছে মোর—ভিখারীর গানে অশ্রুতে বুক ভাসে!

পোড়া আকাশেরও কি হয়েছে আজ—নীলের উপরে নীল;
সেই নীলিমায় নাহিবে বলিয়া ঘুরে-ঘুরে' উড়ে চিল।
রাত না পোহাতে সাদা রোদখানি উঠি'
পায়ের তলায় করে যেন লুটোপুটি,
লঘু হাওয়াখানি মার বুকে যেন মিলাইতে চাহে মিল!

সকল গন্ধে পেরে উঠি—শুধু পারিনাক শিউলিকে—
হিয়ার পরতে হারা মুখখানি কেটে'-কেটে' দেয় লিখে!
সন্ধ্যা না হ'তে মৃদু বাসখানি উঠে'
হায় হায় শুধু জাগায় বক্ষপুটে—
মনে হয় যেন অমনি সে ছুটে' চলে' যাই কোন্দিকে।

ওগো ছেড়ে দাও ! ওগো ছুটী দাও—তিনটি দিনের ছুটী ;
মাকে একবার দেখিয়া আসিব, নামাও নয়ন দু'টি ।
　এত ভালবাস—রাখ আজিকার সাধ,
　এ অধীরতায় নিওনাক অপরাধ ;
তোমারি পূজার ফুলটি আনিব মায়ের চরণে লুটি' ।

মায়ের আমার মা এসেছে ঘরে—আমি যে মায়ের মেয়ে ;
সারা বছরটি দু'টি আঁখি তাঁর দুদিকে যে আছে চেয়ে ;
　যে চোখ চাহিবে মায়ের পায়ের তলে—
　সে চোখ তাঁহার ভরিওনা আজ জলে,
সে চোখের জল সব আলো যে গো দিবে সে আঁধারে ছেয়ে !

বিশ্ব জুড়িয়া শোন কান দিয়া মা এসেছে সব ঘরে,
মায়ের মেয়ের সে মিলনটুকু দিওনা মলিন করে';
　সারা বৎসরে এ দিন ফিরেনা আর,
　পথের কাঙাল—সেও মুছে' আঁখিধার
সেই মুখখানি বছরের মত দেখে' নেয় চোখ ভরে' ।

ঐ যে সানায়ে বিনায়ে-বিনায়ে কাঁদিয়া কাঁপিছে স্বর,
নয়ন থাকিলে করুণায় বুঝি ঝরিত সে ঝর-ঝর !
　যে পূরবী আজ পরতে-পরতে উঠে,
　বেদনা তাহার ঘনায়ে-বনায়ে ফুটে—
বেতসের মত বেপথু তাহার মর্ম্মের মর্ম্মর !

চূণীর বলয় নীলার কণ্ঠী—সব থাক্ তব সাথে,
তোমারি স্মরণ শুভ-শঙ্খটি নিয়ে যাব শুধু হাতে ;
　মায়ের স্নেহের মিলনের মধু দিয়া
　তোমারি প্রসাদ আনিব সে ফিরাইয়া
বিজয়ার রাতে সঁপি' দিব হাতে জ্যোৎস্না-নিভৃত ছাতে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

# বিলম্বিতা

( ১ )

সেদিন অপরাহ্ণে পাড়ার কতকগুলি ছোট মেয়ে পুকুরধারে আসিয়া গা ধুইতে বসিয়াছে; সকলেই প্রায় সমবয়সী। তাহাদের মধ্যে তরু সকলের চেয়ে বড়। প্রায় একমাস হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

তরুর শ্বশুর খুব বড়লোক; বড়ঘরের বধূর চালচলন যেমন হইয়া থাকে, তরু তাহা অনুকরণ করিতে সবেমাত্র চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারগুলি সখীদের দেখাইয়া সে যখন সামান্য একটু গর্ব্বের সহিত দু চারিটি কথা কহিতেছিল, তখন সখীরা তাহাতে যোগদান করিতে একটুও সঙ্কোচ অনুভব করে নাই। ভবিষ্যতে খুব বড় ঘরে তাহাদেরও বিবাহ হইতে পারে, এই আশাই হয়ত তাহাদের সঙ্কোচকে দূরীভূত করিয়াছিল।

একটি বালিকা কেবল দূরে দাঁড়াইয়া একমনে কি ভাবিতেছিল। তরুর সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব সকলের চেয়ে বেশী, আজ কিন্তু সে দূরে, তরুর সঙ্গে সহজভাবে মিশিতে অক্ষম।

সে দরিদ্রের কন্যা; এতদিন সে যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে, বিশেষতঃ তাহার সখীদের সকলেরই অবস্থা ভাল। এত দিন ছেলেবেলাকার হাসি-আনন্দের মধ্যে তাহারা সকলেই অবস্থার কথাটা ভাবিবার অবকাশ পায় নাই; কিন্তু যে দিন বড় ঘর হইতে তরুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিল ও যেদিন রাজপুত্রের মত একটি বর আসিয়া কত নদ-নদী,-বন-প্রান্তর পার হইয়া কোন্ কল্পিত সুবর্ণময়ী অট্টালিকায় তরুকে লইয়া চলিয়া গেল, সেদিন সরযূর মস্তিষ্কে একটা স্বপ্নলোকের সুখময় ছবি কেবলই ফুটিয়া উঠিল, সেদিন সরযূ বুঝিল সে দরিদ্রের কন্যা, বড় ঘরে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং সে হতভাগিনী, আর তরু—সে রাজরাণীর গৌরব ও সম্পদের ক্রোড়ে চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিবে।

এইরূপ একটু পার্থক্যের ভাব তাহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই সে তরুর বিবাহবাসরে বেশী কথা কহিতে পারে নাই। সে গান গাহিতে জানিত না। যেদিন একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্রের সহিত তরুর প্রথম বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, সেদিন কিন্তু সে সখীদের নিকট একটি গান শিখিয়া বলিয়াছিল সে তরুর বিবাহ-বাসরে গান করিবে। সেদিন পিতামাতার দারিদ্র্য-

দুঃখে পরিপূর্ণ কুটীরখানি যথাসময়ে পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্র সংসারের শত কর্ম্মের অবসরে সে তরুদের বাড়ীতে আসিয়া একটি নিভৃত কক্ষে তাহার সখী লবঙ্গলতার নিকট শিখিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিয়াছিল :—

আমারে যবে ডেকেছিল সে
তখন তারে চাহিনি সই,
আজি এ রাতে তাহারি লাগি'
কাঁদিতে শুধু জাগিয়া রই।

তারপর যখন আর একজনের সহিত তরুর বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত হইল, যখন বরের অতুল সম্পদের কথা চারিদিকে রটিয়া গেল, তখন সরযূর আর তেমন উৎসাহ রহিল না। তরুর বিবাহের দিন বাসর-ঘরে এক কোণে সে চুপটি করিয়া বসিয়াছিল। তাহার বড় ইচ্ছা ছিল—তরুর বিবাহ বাসরে গান করিয়া সে সকল সখীদের স্তম্ভিত করিয়া দিবে। কিন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। কি একটা বাধা সে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিল না। সখীরা যখন তাহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন অঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে আর সে তরুদের বাড়ীতে আসে নাই।

সরযূর এই ব্যবহারে সখীরা খুবই বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা বলিল—সরযূ বড় এক-গুঁয়ে—অবাধ্য। লবঙ্গলতা গালে হাত দিয়া খুব বিস্ময়ের সহিত বলিল "সরযূ কি মেয়ে!" আর সরযূ—সে দীনের কুটীরে প্রবেশ করিয়া দরিদ্র সংসারের দীনোচিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

গৃহ কাজ করিতে-করিতে অনেক সময় সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত, সে মনে করিত তাহার একটা বড় সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

ব্যর্থ আশার বেদনা ও দারিদ্র্যদোষ তাহার অন্তরে বিশেষভাবেই আঘাত করিল। কেহ তাহার যাতনা বুঝিল না। সে গৃহকাজ সুসম্পন্ন করিয়া দ্বিপ্রহরের পর যখন একটু অবসর পাইত, তখনই নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। কখনও কখনও তাহাকে অঞ্চলাগ্রে দু-এক বিন্দু অশ্রুজলও মুছিতে হইত।

আর একটা ভাবনা তাহাকে খুবই বিচলিত করিল। সখীদের কাছে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে; তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে, তারপর তাহাদের কথা না শুনিয়া সে তাহাদিগকে রাগাইয়াছে; তাহারা তাহার

নিকট আর আসিবে না। সরযূ একবার স্থির করিল—সে সখীদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে; কিন্তু দারিদ্র্যের গর্ব্ব ধনগর্ব্ব অপেক্ষা কম নয়; তাহার কোমল প্রাণ যে কাজটা করিতে চাহিল, গর্ব্ব তাহাতে বাদ সাধিতে ছাড়িল না।

আজ শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একপ্রান্তে যখন রৌদ্রের স্বর্ণ আভা ফুটিয়া উঠিল, তখন সরযূ ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল; সে দূর হইতে দেখিল—তাহার সখীরা হাসিতে-হাসিতে গল্প করিতে-করিতে পুকুরধারে গা ধুইতে আসিয়াছে; লবঙ্গলতা, কামিনী, মালতী, তরু, সকলেই একত্র রহিয়াছে, কেবল সে দলভ্রষ্ট। সরযূ একবার মনে করিল সে চলিয়া যাইবে, কিন্তু পারিল না। সখীরা কেহই তাহার সহিত কথা কহিল না, সে অনেকক্ষণ তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে আপনার কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেল।

( ২ )

সরযূ কুটীরে আসিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল। মা আসিয়া মেয়েকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "এ আবার কি?" সরযূ কথা কহিল না, মায়ের তিরস্কার শুনিতে-শুনিতে সে কাঁদিয়া ফলিল। মা তাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিলেন না।

যখন সন্ধ্যার ছায়া ধরণীকে স্পর্শ করিতেছে, তখন সরযূ বিছানা হইতে উঠিল। মা সেদিন মেয়ের দ্বারা কোন কাজ হইবে না স্থির করিয়া সংসারের কাজে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সরযূ তাঁহার দিকে না চাহিয়াই ধীরে ধীরে পুকুরঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল; বকুল গাছ হইতে অবিরত ফুলরাশি ঝরিয়া পড়িতেছিল, সরযূ আঁচল ভরিয়া অনেক ফুল কুড়াইয়া লইল, তার পর ধীরে ধীরে আপনার কুটীরে আসিয়া একটি ঘর অর্গলবদ্ধ করিল।

আজ বর আসিয়াছে, তাই তরু তাড়াতাড়ি পুকুরঘাটে গা ধুইয়া গৃহে ফিরিয়াছে, এতক্ষণ সে নবসাজে সাজিয়া, চরণযুগল অলক্তকে ও অধর পল্লব তাম্বুলরাগে রঞ্জিত করিয়া গৃহকোণে বসিয়া মিলনকালের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সরযূ অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার কল্পনাপ্রবণ অন্তরে কত কথাই জাগিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল একবার সে ছুটিয়া তরুর বরকে দেখিয়া আসে।

কিন্তু আর ত সেখানে যাওয়া যায় না। সরযূ অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিল। তারপর ফুলগুলি লইয়া সে দু-ছড়া মালা গাঁথিল। মালা দুই গাছি লইয়া সে পাশের বাড়ীতে আসিয়া ডাকিল "রতি"। রতি তাহার দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী। সরযূ বলিল, "ভাই রতি, মালা দুগাছি তরু ও তরুর বরকে দিয়া আয়, আর তরুকে বলিস্ সে যেন আমায় মাপ করে।" রতি মালা দুগাছি লইয়া চলিয়া গেল।

এইবার সরযূ আপনার কুটীরে আসিয়া বসিল, সে ভাবিল—তরু কি তাহাকে মাপ করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে, কিংবা নিজেই তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে। যেখানে তাহার বর বসিয়া আছে সেখানটা এখনও হয়ত বাসরঘরের মতই সজ্জিত, এখনও নিশ্চয়ই সেখানে সখীদের পুষ্পনির্য্যাস-অনুলিপ্ত কোষেয় বসনের মৃদুগন্ধের সহিত চাঁপা ও রজনীগন্ধার সৌরভ মিশিয়া চারিদিক আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইখানে সে যাইবে, সমস্ত সংকোচ ভুলিয়া মনোমালিন্যের সব চিহ্নগুলি নিঃশেষে মুছিয়া পূর্ব্বের মতই সে তাহার সখীদের সহিত মিশিবে। সখীরা যদি তাহাকে গান করিতে বলে, তাহা হইলে সেই গানটি গাহিয়া সে মনের সব ক্ষোভ, সব বেদনা নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিবে।

তারপর হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে গানটি সে গাহিবে না। সে গান গাহিলে হয়ত তরুরা তাহার মনের কথাটি ধরিয়া ফেলিবে, হয়ত তাহারা বুঝিবে—সরযূ ঐ গানটা গাহিবার জন্যই ব্যাকুল।

সে একখানি গানের বই কিনিয়াছিল, কুলুঙ্গি হইতে বিধ্বস্ত বইখানি লইয়া সে গান মুখস্ত করিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বই ফেলিয়া মাকে রন্ধনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

কিছু ক্ষণ পরে রতি উঠানে আসিয়া ডাকিল "দিদি"। সরযূ তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রতি তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

সরযূ আপনার ঘরে আসিয়া প্রদীপালোকে চিঠিখানি অনুচ্চস্বরে পড়িল "সরযূ, তুই ভাই আমাদের বাড়ী আসিস্ না কেন? কাল সকালে একবার আসিস্—তোর মালা পাইয়াছি।" চিঠির নীচে লেখা আছে "তরু"। সরযূর অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে মায়ের তিরস্কার চুপ করিয়া

শুনিতেছিল, এইবার সে যদি মায়ের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকে তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল।

( ৩ )

প্রভাতে হাতের কাজ সব শেষ করিয়া সরযূ তরুদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সে মনে করিল আগে সে যেমন নিঃসংকোচে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইত, সেই ভাবেই যাইবে, যেন তাহার কোন সংকোচ প্রকাশ না পায়, কোন কাজের জন্য সে যে সখীদের দলছাড়া হইয়াছিল, একথা ঘুণাক্ষরে কেহ যেন জানিতে না পারে।

সরযূ চলিল—সেদিন ভাদ্রের প্রারম্ভে আকাশের সুনীল নির্ম্মেঘ পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে সূর্য্যকররাশি ফেনোপম মেঘপুঞ্জকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দ্রুত প্রবাহের মত পৃথিবীর জল, তরুগুল্ম, নবদূর্ব্বাস্তৃত প্রান্তর ও স্নিগ্ধশ্যাম তৃণাঙ্কুরের উপর অবারিতভাবে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সেদিনকার রৌদ্রে নূতন নীলাম্বরী কাপড়খানি রঞ্জিত করিয়া পথের উপর ধীর অথচ দ্রুত চরণ নিক্ষেপ করিতে করিতে সরযূ আপনার অন্তরে কি একটা গভীর অনিমিত্ত আনন্দ অনুভব করিয়া মস্তক অবনত করিল। তখন তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে। সে খেলা ধূলা ছাড়িয়া এখন চারিপাশের জীবন্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছে।

তরুদের গৃহসন্নিকটে আসিয়া সরযূ কোন মতেই তাহার সংকোচকে বাধা দিতে পারিল না। অভিসারিকার মত সে প্রতিপাদক্ষেপে সচকিত হইতে লাগিল। তাহার পদদ্বয় কাঁপিল, অন্তর গুরু গুরু করিয়া উঠিল। সে বুঝিল না—কেমন করিয়া এক দিনের একটা তুচ্ছ ঘটনা তাহার সুপরিচিতকে এত অপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

মস্তক অবনত করিয়া তীরবেগে সে সোপান অতিক্রম করিল, তারপর ধীরে ধীরে একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার পুরাতন সখীরা সকলেই বসিয়া আছে। কক্ষের বাহিরে বারান্দায় বর বসিয়াছিল। সখীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার নিকটে আসিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার অজ্ঞতা সপ্রমাণ করিতে নানা প্রকার কৌশলের অবতারণা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই জন্য ঘরে বসিয়া কি একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবে, তাহা লইয়াই সকলে পরামর্শ করিতেছিল।

সরযূকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সখীরা যখন একটু চমকিয়া উঠিল, তখন পাশের ঘর হইতে তরু উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল এবং তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে একটা নিভৃত কক্ষে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর তরু বলিল "ভাই, আমি তোমার উপর ত রাগি নাই, তুমি মাপ চাহিয়াছ কেন?"

সরযূর চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, সে কথা কহিতে পারিল না।

তরু অঞ্চলে তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিল "ভাই, আমি আর কথা কহিব না, তুমি ও ঘরে যাও, দুঃখ করিও না, ও ঘরে বিমলা আছে, লবঙ্গ আছে, তাহাদের সহিত কথা কও গিয়ে।"

সরযূ উঠিল, ধীরপদে যে ঘরে সখীরা ছিল, সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তরু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। তাহার সহিত যেন একটুও মনকসাকসি হয় নাই, এইরূপ ভাব সকলেই দেখাইল। বিমলা বলিল "সরু, তোকে গান করিতে হইবে।"

এই অনুরোধটি রক্ষা করিবার জন্য সরযূর প্রাণ বর্ত্তমান অবস্থাতেও চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রথমেই লবঙ্গের শেখানো গানটি মনে পড়িল। তারপর মনে হইল সে গান আর গাওয়া হইবে না, সে গান গাহিয়া আর সে পুরাণো কথা সকলের মনে জাগাইয়া দিবে না। যদি গান গাহিতে হয়, তাহা হইলে একটা নূতন গান গাহিতে হইবে।

এত কথা ভাবিয়াও সরযূ বলিল "না বিমলা, আমি কি ভাই গান জানি?"

লবঙ্গ বলিল "জানিস্ না?"

সরযূ বলিল "আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

লবঙ্গ বলিল "আমি আবার বলিয়া দিব, তুই সেই গানটাই গা।"

সরযূ কাতরভাবে বলিল "ভাই পারিব না, তোমরা আমায় মাপ কর।"

তাহার কাতরতার ভাব দেখিয়া সখীরা আর কেহই তাহাকে অনুরোধ করিল না।

সরযূ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কেহ তাহার সহিত কথা কহিল না। একবার সে ভাবিল—আর একবার যদি কেহ তাহাকে বলে, তাহা হইলে সে গান করিবে—না-গান গাহিবার দুঃখ সে দূরীভূত করিয়া দিবে। দ্বিতীয় সুযোগ পাইয়াও সে অন্তরের ইচ্ছা মিটাইতে পারিল না, তাহার ভয় হইল পাছে কেহ তাহার অন্তরের ভাবটি জানিতে পারে।

বিমলা গান ধরিল, সরযূ ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তরুকেও কোন কথা বলিয়া গেল না।

( ৪ )

ধীরে ধীরে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরযূ ভাবিল ভগবান্ তাহাকে আরও একটা সুযোগ দিয়াছিলেন—তবুও সে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না, এ দোষ আর কাহারও নয়, এ দোষ তাহারই নিজের।

উঠানের প্রান্তে জীর্ণ প্রাচীরের গায়ে একটা টিকটিকি ঘুরিয়া-ফিরিয়া কতকগুলি পিপীলিকাকে উদরসাৎ করিতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সরযূ ভাবিল—সে যদি নিজের উপায় নিজে না করিয়া লয়, তাহা হইলে দোষ আর কাহারও নয়, তাহারই।

তাহার বড় সাধ ছিল সে গান করিবে; বাসরঘরের ছোট মেয়েরা যত আনন্দে হাসিয়া লুটোপুটি খায়, ততটা আনন্দ সেও উপভোগ করিবে। এ আনন্দ সে ভোগ করিত, যে তীব্র বাসনা অন্তরে সঞ্চিত করিয়াছিল, সাধের গানটি গাহিয়া সে তাহা সফল করিত, কিন্তু হায়, তাহার ইচ্ছায় বাধা দিল কে?

কে বাধা দিল? সরযূ অনেকক্ষন ধরিয়া ভাবিল কে তাহার সাধে বাদ সাধিয়াছে। সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, কেবল তরুর বরের কল্পিত মূর্ত্তিখানি তাহার চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সরযূ বুঝিল—তরুর বরই তাহার সব সাধে বাধা দিয়াছে, তারপর তাহার সখীরাও তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া প্রতিবন্ধকের কাজ করিতে একটুও ত্রুটী করে নাই।

সে রাগিল তরুর বরের উপর; সে স্থির করিল—সখীদের সহিত সে আর এজন্মে কথা কহিবে না।

তরুকে সে সই বলিয়া ডাকিত। গ্রামের শীতলা ঠাকুরের মন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া সে তরুর সঙ্গে সই পাতাইয়াছিল, সইয়ের সহিত তাহার চিরদিনই সদ্ভাব ছিল, মাঝে হয়ত তাহা লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু এখন পুনরায় তাহা দৃঢ় হইয়া আসিল। তবে দুজনে পূর্ব্বের মত আর অবাধে মেলা-মেশা করিতে পারিল না।

সে প্রতিজ্ঞা করিল, সে ঘরেই বসিয়া থাকিবে, বাড়ীর বাহিরে আসিয়া আর সে কাহারও সহিত খেলা করিবে না, সে গরীবের মেয়ে, বাল্যকালে

আপনার অবস্থা না বুঝিয়া সে বড় ঘরের মেয়েদের সঙ্গে ধূলাখেলা করিয়াছে, এখন সে বুঝিয়াছে তাহাদের সহিত তাহার অবস্থার পার্থক্য অনেক বেশী, আর তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সে বাল্যকালের ভুলকে প্রশ্রয় দিবে না।

সরযূ এইবার মায়ের গৃহকর্ম্মে যোগদান করিল। আর সে বাহিরে আসিয়া সখীদের ধূলাখেলায় মাতিল না। তাহার ম্লান, গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত যেন সে বারো তেরো বৎসর বয়সে বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করিয়া একেবারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছে।

( ৫ )

পুকুরঘাটে যে সখীর দল কোন পার্থক্যের সন্ধান না পাইয়া ধূলাখেলার কাল্পনিক জগতে অবাধেই মিশিয়াছিল, সত্যের সংস্পর্শে আর তাহারা সে ভাবে থাকিতে পারিল না। সকলে ভিন্ন ভিন্ন পথে ধূলাখেলার ঘরটিকে পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া কালের অপ্রতিহত প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিল।

গ্রামের কোন কোন গৃহে এক একদিন উৎসবের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, পরদিন তাহা নিবিয়া গেল। সরযূ বুঝিল—তাহার এক একজন সখী ক্রমশঃ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। রতির বিবাহ হইল, বিমলাও শ্বশুরঘর করিতে চলিয়া গেল, সরযূ কাহারও বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিল না। সে মনে করিল—কোন উৎসবে যোগদান করিবার অধিকার সে এজন্মে পায় নাই, ভগবান্ যদি দিন দেন, তাহা হইলে পরজন্মে সে তাহার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রাণ ভরিয়া মিটাইয়া লইবে।

কেবল যেদিন পুকুরের পাড়ে লবঙ্গদের দ্বিতল গৃহের প্রতি গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল উৎসবালোকের রশ্মি নির্গত হইতে লাগিল, কম্মরত নরনারীর কোলাহলের মধ্যেও শানাইয়ের বেহাগ রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াইল, সেদিন সরযূ আর স্থির থাকিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ক্রমশঃ উৎসবগৃহের কোলাহল থামিয়া গেল। সরযূ জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—সেই দ্বিতল গৃহের একটি কক্ষে কতকগুলি রমণী নানা সাজে সাজিয়া যেন অসীম আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। সরযূ বুঝিল—সেটা বাসরঘর, তাহার মধ্যে রতি, বিমলা সকলেই আছে, তরুও হয়ত শ্বশুরবাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছে, সব সখীরাই আজ একত্র মিলিয়াছে, কেবল সে আজ বিচ্ছিন্ন।

এমন সময় সেই কক্ষ হইতে স্ত্রীকণ্ঠের একটি গান ভাসিয়া আসিল, সরযূ

গানটি কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিল। গানটি তাহাদের সকলেরই জানা গান। সে একমনে গানটি শুনিল, গায়িকা কে তাহা ধরিতে অনেকবার চেষ্টা করিল, তারপর গভীর ভাবনার মধ্যে কখন্ তাহার অশ্রুসিক্ত নয়নপল্লব মুদিত হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

পরদিন অপরাহ্ণে যখন সে বেশ বুঝিল তাহার সখীদের মধ্যে কাহারও সহিত তাহার দেখা হইবে না, তখন সে ধীরে ধীরে সাহসে ভর করিয়া নিঃসংকোচে পুকুরঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিনও বকুলগাছটি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়া মৃদু আসবগন্ধে চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সরযূ দেখিল—তাহাদের বাল্যস্মৃতি সবই অক্ষুন্ন আছে—তাহাদের শূন্য খেলাঘর ছাড়িয়া কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। গত বৎসরে যে স্থানটি তাহার অন্তরে বিপুল আনন্দ আনিয়া দিত, সরযূ দেখিল আজও সে স্থানটি বর্ত্তমান—তবে আর সে আনন্দ আনিয়া দেয় না, তাহার দিকে চাহিলে নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া আসে।

প্রেতের মত সে তাহার পূর্ব্বপরিচিত স্থানটির আশেপাশে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। বকুলগন্ধে আমোদিত অপরাহ্ণের বাতাস তাহার অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র হাহাকার আনিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় আকাশের প্রান্তে বড় একটি নক্ষত্র যখন কোন গুপ্ত সাক্ষীর মত আপনাকে প্রকাশ করিল, তখন সরযূ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ধীরে ধীরে আপনার কুটীরে আসিয়া উপনীত হইল।

সহসা একদিন সরযূদের বাড়ীতেও উৎসবালোক জ্বলিয়া উঠিল। একটি মধ্যবিত্ত সামান্য গৃহস্থের সন্তান বরবেশে আসিয়া পরদিন তাহাকে তাহার গ্রাম ও কুটীর হইতে কোন্ একটা অজানা গ্রামে অপরিচিত কুটীরে লইয়া গেল। সেদিন সরযূ মায়ের গলা জড়াইয়া কেন যে অতি করুণভাবে কাঁদিয়াছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

( ৬ )

বিবাহের পর দিনকতক সরযূ কেমন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। হঠাৎ এক গৃহ ও এক পরিবেষ্টনের মধ্য হইতে আর একটা গৃহ ও আর একটা অবস্থায় আসিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, অকূল সমুদ্রে সে একখানা কর্ণধারবিহীন তরণীর মত, স্রোতের টান যে দিকে, সেই দিকেই তাহাকে ভাসিতে হইবে, পৃথিবীতে আপনার বিবেচনা বা শক্তির দ্বারা চালিত

হইয়া কোন কাজ করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহাকে শুধু ভাসিতেই হইবে, এই ভাসিয়া যাওয়াই তাহার জীবনের কাজ।

কোথায় রে উপকথার রাজপুত্র, কোথায় রে বাল্যের সোণার কল্পনা! ছেলেবেলায় খেলাঘরে বসিয়া যাহা সে নিমেষের ভিতর অনায়াসে মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারিত, যাহা সত্যের মত প্রতীয়মান হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে কোন্ স্বপ্নলোকের মায়াজাল প্রসারিত করিয়া দিত, তাহা সত্যের একটি আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। একটি দরিদ্র গৃহস্থের পুত্রকে স্বামিরূপে লাভ করিয়া, একটি বিপুল একান্নবর্ত্তী দরিদ্র পরিবারের মধ্যে আপনার মজ্জাগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সাশ্রুনেত্রে বিসর্জ্জন করিয়া, শুধু আপনাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বিলাইবার জন্যই দাতা সাজিয়া বসিতে বাধ্য হইল, তখন প্রথম-প্রথম সরযূ আপনাকে কোন মতেই স্থির রাখিতে পারিল না।

কেহ তাহার মুখ চাহিল না, কিন্তু তাহাকে সকলেরই মুখ চাহিতে হইল। তাহার অসুখ হইলে কেহ একবারও নিকটে আসিত না, কিন্তু অন্যের অসুখ হইলে তাহাকে দিনরাত জাগিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে হইত। নিজের অংশ, নিজের প্রাপ্য পরিত্যাগ করিয়া পরের প্রাপ্য তাহাকে আগে পুরাইয়া দিতে হইত, পর কিন্তু একবারও তাহার অভাব-অভিযোগ শুনিতে আসিত না।

সংসার তাহার সকল সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা—এমন কি পিতৃদত্ত কয়েকখানি অলঙ্কার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল, কিন্তু মুখে বলিল—সে দান গ্রহণ করিতেছে। দাতা তীব্র হাহাকার অন্তরে চাপিয়া মুখে বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিল "হাঁ, আমি দানই করিতেছি"। অমনই সংসার গর্জ্জিয়া উঠিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে এ দান তাহার কর্ত্তব্য, ইহার জন্য সে কোন অহঙ্কার করিতে পারে না, ইহার জন্য প্রশংসা বা সুখ্যাতি লাভ করাও অসম্ভব। এইরূপ অদ্ভুত উৎকট দানযজ্ঞের পূর্ণাহুতির পর অলঙ্কারহীনা, কঙ্কালাবশিষ্টা মলিনবসনা সরযূ একদিন বুঝিয়া দেখিল—বিশ্বে সে অনেক দান নিঃস্ব হইয়াই করিয়াছে, একদিন পাঞ্চভৌতিক দেহটুকুও তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে, কিন্তু পরের নিকট হইতে যাহা পাইবার, তাহার সামান্য অংশটুকুও যে, সে এখনও লাভ করিতে পারে নাই।

তাহার স্বামী সঞ্জীববাবু কিছু লেখাপড়া শিখিয়া সাংসারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি এককথায় মীমাংসা করিতে পারিতেন। ইংরাজী শিখিয়া দেশ যে ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে, সমাজের বাঁধাধরা আইন-কানুন লইয়া তর্ক-

বিতর্ক করিতে-করিতে দেশ যে পুরাতন আর্য্য ঋষিদের নির্দ্দিষ্ট সুপথ পরিত্যাগ করিয়া অবনতি ও ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহার একটুও সন্দেহ ছিল না। তিনি পত্নীকে সতী সাধ্বী পতিব্রতা হইতে উপদেশ দিতেন। তাহার একটুও বিলাস বা পরিচ্ছন্নতা দেখিতে পারিতেন না। তিনি সংসারের অগ্নিকুণ্ডে আপনার সাধ-আহ্লাদ কিছু কিছু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু পত্নীটিকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিতে তিনি একটুও সংকুচিত হন নাই।

একদিন সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া সরযূ একটি প্রচ্ছায়-শীতল আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে চাহিল। শত বাধা, শত বিপদ, শত যন্ত্রণার মধ্যেও তাহাকে যে বাঁচিতে হইবে এ কথাটা সে সহস্র চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিল না। সকলের মন জোগাইয়া চলিলে আপনার মনকে চাপিয়া চলিতে হয়। আপনাকে কেবলই দমন করিতে যাইয়া যে দিন সে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেদিন সংসার ও সমাজের অত্যাচার হঠাৎ তাহার কাছে উর্ণনাভের ক্ষীণ তন্তুর মত প্রতীয়মান হইল, হঠাৎ তাহার বোধ হইল এই মায়াজালটা ছিন্ন করিতে পারিলে একটা আনন্দের জগৎ তাহাকে বাহু প্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

সেদিন বর্ষার শেষে আকাশ হঠাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত মালিন্য হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল। সরযূ স্বামীকে বলিল "হাঁ গা, আমাকে একবার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিবে ?"

স্বামী বলিলেন "বাপের বাড়ী হইতে কেহ লইতে আসিল না, কেমন করিয়া পাঠাই ?" সরযূ বলিল "কেন ? মেয়ে কি আপনিই মা বাপের কাছে যাইতে পারে না ?"

স্বামী বলিলেন "আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অত স্বাধীনতা পাইবে না, বাবা রাগ করিবেন।"

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

( ৭ )

আর একদিন শরতের নূতন মেঘমুক্ত রৌদ্র যখন পৃথিবীকে নবসাজে সাজাইয়া মানুষের জীর্ণ প্রাণেও নবীনতার আলোক সঞ্চারিত করিল, সেদিন সরযূ একখানি নূতন কাপড় পরিয়া আপনার মলিন দেহকে যৎসামান্য প্রসাধনে কেন যে শ্রীসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পর সে তাহার শেষ আভরণ সোণার রুলিগাছটি পরিধান করিয়া শয্যারচনায় মনোনিবেশ করিল। আজ তাহার প্রাণমন একটা নবীনতার ঈষৎ উত্তেজনায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রে সঞ্জীববাবু আহারান্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পত্নী বিবাহ-বাসরের সাজে সাজিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। সরযূর রূপ ছিল না তাহা নয়, তাহার উপর প্রসাধন ও পরিচ্ছদের জন্য তাহা আজ একটু অপেক্ষাকৃত অধিক লাবণ্যে লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সঞ্জীববাবু এতটা সহিতে পারিলেন না, কেন না, এতদিন তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে সৌন্দর্য্যকে চরম বলিয়া ভাবিয়াছিলেন ইহা তাহারও অধিক। আপনার আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেলেও মানুষ তাহার ভগ্নস্তূপ প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে, তবুও আর একটা সত্য, উজ্জ্বল আদর্শকে প্রশ্রয় দিতে চায় না। সঞ্জীববাবু সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি পত্নীর নূতন বেশের প্রতি অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আজ এত সাজ কেন?"

সরযূ সেদিন কোথা হইতে খানিকটা সাহস লাভ করিয়াছিল। আজ সে মনে করিল—সে স্বামীর সব কথাগুলির যথাযথ উত্তর দান করিবে। সে জানিত তাহার স্বামী অতিশয় তার্কিক। তবুও কিন্তু আজ হঠাৎ সে বুঝিয়াছিল—সে স্বামীর তর্কবিতর্ক দুই চারিটি কথায় একেবারে উড়াইয়া দিবে।

সরযূ উত্তর দিল, "আজ ষষ্ঠী, নূতন কাপড়-চোপড় পরিতে হয়।"

সঞ্জীববাবু বলিলেন "শুধু পরিতে হয়, তাই? তোমার কি পরিতে ইচ্ছা ছিল না?"

সরযূ বলিল "সাজিতে কাহার না সাধ যায়?"

"কই, আমার ত যায় না।"

"তুমি যখন বাহিরে যাও ভাল কাপড় পর কেন?"

"আমি বাহিরে যাই, তুমি যে ঘরে থাক।"

"আমি ঘরেই সাজিতে চাই।"

"তুমি সাজিতে চাও কাহার জন্য?"

"তুমিই বা কাহার জন্য সাজিয়া বাহির হও?"

"কাহারও জন্য নয়—নিজের জন্য।"

"আমিও কাহারও জন্য সাজি না।"

সঞ্জীববাবু ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তা নয়, একটা কথা আছে জান—স্ত্রী সাজে স্বামীর জন্য।"

সরযূ বলিল "সে কথাটা মিথ্যা।"

সঞ্জীববাবু বলিলেন "তুমি নির্ব্বোধ—কিছু জান না, তাই শাস্ত্র ছাড়া কথা বলিতেছ।"

সরযূ বলিল "আমি শাস্ত্র জানি না। তবে তুমি যদি শুনিতে ভালবাস, তাহা হইলে বলিতেছি—আমি তোমারই জন্য সাজিয়াছি।"

"আমি সাজ ভালবাসি না, অতএব তুমি তাহা পরিত্যাগ কর।"

সরযূ বলিল "তোমার ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু আমি সাজিয়াই তোমার কাছে দাঁড়াইতে ভালবাসি। তবুও কি তোমার শাস্ত্র আমাদের বেশ পরিত্যাগ করিতে বলিবে?"

সঞ্জীববাবু আর কথা কহিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমি এ সব সহ্য করিতে পারি না, এমন হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে", ইত্যাদি।

সরযূ ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে গিয়া আপনার জীর্ণ, মলিন আটপৌরে কাপড়খানা পরিয়া আবার স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সঞ্জীববাবু কেন যে সেদিন পত্নীর সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তাহার কারণ তিনি নিজে না ভাবিলেও সরযূ বুঝিয়াছিল।

পরদিন সঞ্জীববাবু খুব গম্ভীরভাবে পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন "দেখ, শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিও না, তারপর সব করিও, আমি কিছুতেই বাধা দিব না, সেদিন তুমি বাপের বাড়ী যাইবার কথা বলিতেছিলে, যদি যাও তোমার মাকে একখানা পত্র লিখিও, তিনি লোক পাঠাইলে, কিংবা তোমাকে যাইতে বলিলে, পাঠাইয়া দিব।"

( ৮ )

সরযূ দেখিল—তাহার বিবাহের পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক দিন সে হতাশভাবে কাল কাটাইয়া মনের দুঃখে কতকটা বায়ুগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্তারা সে দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই। সঞ্জীববাবু মাঝে একখানা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন ও পত্নীর মানসিক রোগের লক্ষণ দেখিয়া পাঁচ পয়সায় এক শিশি ঔষধ আনাইয়া একমাস চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়া যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন সে রোগ অসাধ্য

বলিয়া প্রকৃতির উপর তাহাকে নির্ভর করিলেন। সরযূর বিষণ্ণতা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল।

আজ হঠাৎ যখন সে দেখিল—স্বামী তাহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে তাঁহার ভাবান্তরের কারণ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া বুঝিল—সে এতদিন যে ভাবে চলিয়াছে সে ভাবে না চলিয়া যদি সে একটু ভিন্নভাবে চলিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে হয় ত আজ তাহার অদৃষ্টাকাশ এত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিত না।

সে আরও ভাবিল—তাহার জীবনটা একটা দারুণ ভ্রমের সহিত জড়িত। ভগবান্ আনন্দের পাত্রটি তাহার হাতে দিয়াছেন, কিন্তু সময়ে সে আধেয়টুকু পান করিতে পারে নাই, যখন তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে, তখনই সে তাহার জন্য লালায়িত হইয়া কেবল অশ্রুই বিসর্জ্জন করিয়াছে।

যখন সে জাগিল, তখন তাহার সাধ-আহ্লাদ মিটাইবার জন্য আর কেহ জাগিয়া নাই। একটি পুত্রকে কোলে করিয়া যখন সে তাহার অন্তরে একটা প্রবল মাতৃ-স্নেহের প্রবাহ অনুভব করিয়াছিল, তখন সে বিষণ্ণতার বিষে ম্রিয়-মাণ, যেদিন সে পুত্রকে কোলে করিয়া, বুকে চাপিয়া, সহস্র চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া মাতৃস্নেহের সকল দাবী মিটাইতে চাহিল, সেদিন সে আর পুত্রকে দেখিতে পাইল না। ব্যর্থ জীবন লইয়া সে কেবলই কাঁদিল, অথচ সে ক্রন্দন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না।

ছুই দিন পরে মাতার পত্র আসিল—সঞ্জীববাবু পিতার মত লইয়া পত্নীকে যেদিন পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন, সেদিন পত্নীর মুখে একটু হাসি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু পিত্রালয়ে যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ পূর্ব্বের মত ছিল না। তাহার ইচ্ছা ছিল—যদি যাইতে হয়, সে নিজের মতেই যাইবে; মাতাকে পত্র লিখিয়া নিজের বাড়ীতে পরের মত যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে একবার মনে করিয়াছিল স্বামীকে তাহার অভিপ্রায় জানাইবে, কিন্তু স্বামীর ভাবান্তর দেখিয়া তাহার একটু আশা হইয়াছিল সেই জন্য সময়ে সে উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে নাই; কিন্তু ছুই চারি দিন পরে শ্বশুর যখন পত্র লিখিয়া বধূকে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, স্বামীও যখন এখনই পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসিবে বলিয়া কড়া হুকুম জারি করিলেন, তখন তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মা বলিলনে "সরযূ, চলিয়া যা।" সরযূ বলিল "মা, আমি এখন যাইব না।"

( ৯ )

বহুদিন পরে পিত্রালয়ে আসিয়া সে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গেল। আজ এ বাড়ী কাল সে বাড়ি ঘুরিয়া, বাল্যের স্মৃতিগুলিকে নিরন্তর বুকে করিয়া সে তাহার জ্বালা-যন্ত্রণা কিয়ৎ পরিমাণে ভুলিতে চেষ্টা করিল।

বাল্যসখীদের প্রতি তাহার যে অভিমান ছিল, তাহা এখন সে আদৌ অনুভব করিল না। সখীরা কখনও পিত্রালয়ে আসিলে সে তাহাদের সহিত দেখা করিতে যাইত। নির্জ্জনে বসিয়া তাহাদের সহিত নানা প্রকার গল্প করিত। তাহার জীর্ণ কঙ্কালশেষ দেহ দেখিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিত, সে কিন্তু সর্ব্ব দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া সকলকে জানাইত—যাহার জন্য তাহারা দুঃখ করিতেছে তাহাতে সে একটুও ক্লিষ্ট হয় নাই।

একদিন সে শুনিল—তরু বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সে অমনি ছুটিয়া তাহাকে দেখিতে গেল। বহুদিন পরে দুই সখী মিলিয়া গল্প করিতে বসিল। অভাগিনী সরযূর আনন্দ সেদিন এত অধিক হইয়াছিল যে, তরু তাহা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই।

সরযূ শুনিল—তরু আসিয়াছে তাহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য। স্বামী কন্যার বিবাহ আপনার গৃহেই দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তরুর অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তরু মায়ের কথামত এই অনুরোধ স্বামীর নিকট করিতে একটুও সংকুচিত হয় নাই, তার শ্বশুর-শাশুড়ীও পুত্রবধূর কথায় একটিও প্রতিবাদ করেন নাই।

সরযূ সব কথা শুনিল, তরুর কন্যাকে কাছে ডাকিয়া তাহাকে সাজাইতে বসিল—কতবার কত রকমে সাজাইয়াও সে তৃপ্ত হইতে পারিল না। তরু বলিল "সই, তুই চলে' আয়, তোকে আর অত পরিশ্রম করতে হ'বে না।"

সরযূ তাহার কথা শুনিল না। প্রাণ ভরিয়া সে যত উপায় জানে সকল উপায়েই তাহাকে সাজাইল, তারপর তাহার মুখচুম্বন করিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিল। সরযূ আর তাহাকে কাছে রাখিতে সাহস করিল না, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার বোধ হইতে লাগিল এখনি সে বালিকার মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে।

সরযূ একবার তরুর গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার কাজকর্ম্ম বালিকার মত দেখিয়া তরু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় সরযূ বাড়ী ফিরিল। মা কন্যার এতটা স্বেচ্ছাচারিতা

সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "সরু, এ সব কি? এত রাত করিয়া বাড়ী ফিরিলে লোকে কি বলিবে?"

সরযূ বলিল "মা, এতদিন পরের মতে চলিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, এখন আমাকে দিনকতক নিজের মতে চলিতে দাও।"

মা বলিলেন "তুই শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যা, জামাই রাগ করিয়া পত্র লিখিয়াছে, বেয়াই ছেলের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সরযূ বলিল "মা, তোমার জামাই যদি আর একটা বিবাহ করেন, করুন; সরযু বানের জলে ভাসিয়াছে; সে ভাসিবে, তাহাকে তোমরা বাধা দিতে পারিবে না।"

মা বলিলেন "লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, তুমি সুখী কখনই হইবে না।"

সরযূ বলিল "মা, এতদিন সুখ পাই নাই; তোমার কাছে থাকিয়া সুখ কাহাকে বলে জানিয়াছি। তুমি মা যদি মেয়েকে অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে বল, এ হতভাগা মেয়ে তোমারও কথা শুনিবে না।

পরদিন তরু সরযূর কাছে আসিয়া বলিল, "সই, কাল আমার মেয়ের বে, আসিস্ দিদি।

মা বলিলেন "তরু, তুই একটু বস্‌বি না মা?"

তরু বলিল না মা, আমি নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছি, আমাকে লবঙ্গদের বাড়ী যাইতে হইবে।"

তরু চলিয়া গেলে মা বলিলেন "সরযূ, তরুর মত হস্‌নি, ও মদ্দা-মেয়ে,—সমাজ, সংসার ও গ্রাহ্য করে না। আপনিই নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছে।"

সরযূ বলিল "মা, তাই আমি তরুকে ভালবাসি।"

এমন সময় পোষ্ট পিওন আসিয়া হাঁকিল "চিঠি—চিঠি।"

মা তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি আনিয়া কন্যার নিকটে দাঁড়াইলেন।

কন্যা বলিল "মা, চিঠি কার?"

মা "বলিলেন আমার।"

"কে লিখিয়াছে?"

"জামাই।"

"কি লিখিয়াছে?"

"লিখিয়াছে যে কাল তাহার বিবাহ।"

সরযূ গৃহকাজে মনোনিবেশ করিল।

মায়ের সেদিন আহার নিদ্রা হইল না। গ্রামের অনেকেই জানিতে পারিল—সরযূর স্বামী আবার বিবাহ করিবে।

( ১০ )

পরদিন সরযূ সকালে উঠিয়া মাকে বলিল "মা, আমি তরুদের বাড়ী চলিলাম, আজ আর বাড়ীর কোন কাজ আমি করিতে পারিব না।"

অন্য দিন হইলে কন্যার এই কথাটা মা কখনই সহ্য করিতেন না, আজ তিনি মনে করিলেন মেয়েটা যাহাতে অন্যমনস্ক থাকে তাহাই করুক।

সরযূ চলিয়া গেল। তাহার চালচলনে উদ্বেগের লক্ষণ একটুও দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি সে তরুদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সেদিন মুক্ত আকাশের তরুণ রৌদ্র, দিগন্তব্যাপী স্নিগ্ধ নীলিমা সে সর্ব্বপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল যেন সে কোন সুদূর স্বপ্নালোক-রঞ্জিত আনন্দময় অতীতে দীর্ঘনিদ্রার পর সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার চারিদিকে কোথাও একটুও মালিন্য নাই; সর্ব্বত্র নূতন প্রাণ, নূতন আনন্দ, নূতন স্ফূর্ত্তির প্রবাহ প্রবৃদ্ধবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশের নীচে ছোট গ্রামখানি যেন একটি উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত সজীব চিত্রপট। পথপার্শ্বস্থ ও দিগন্তস্থিত বৃক্ষরাজির সবুজ চিক্কণ পত্রগুচ্ছে পথভ্রান্ত বাতাস দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঊর্দ্ধে—বহুঊর্দ্ধে কতকগুলি শুভ্র পারাবত সূর্য্যালোকে নক্ষত্রের মত ঝকমক করিতেছে। পথ এখনও বর্ষাবারিতে সরস, রৌদ্র এখনও তাহাকে ধূলিতে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সরোবরে কমলশ্রী বিকশিত হইয়াছে, তীরে রক্তজবা লাবণ্যে ঢলঢল করিতেছে, বাতাস বহিতেছে, শূন্যে অসংখ্য পতঙ্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, শিশু রোদন ভুলিয়াছে, বৃদ্ধ নূতন প্রাণে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, দুঃখ নাই, জড়তা নাই, বিরোধ নাই; আজ পৃথিবী মুক্ত আকাশের নীলিমায় সাজিয়া উঠিয়াছে, স্বর্গমর্ত্ত্যে আজ প্রভেদ নাই। ওগো বদ্ধ, জীর্ণ, সন্তপ্ত জীব, আজ এই মুক্ত আকাশের নীচে এই নূতন আলোকে দাঁড়াইয়া মুক্তির আনন্দ উপভোগ কর।

তরুদের বাড়ী ভৈরবী রাগিণীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সরযূ ধীরে ধীরে ফটক পার হইয়া উপরে চলিয়া গেল। আজ তাহার অন্তরে কোন

ভাবনা আকুল হইয়া উঠে নাই অথবা অনেকগুলি ভাবনা একত্র হইয়া তাহাকে কেমন অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

সকাল হইতে সে তরুদের বাড়ী নানা কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এক মনে সে কাজ করিতে লাগিল, কাহারও দিকে চাহিল না, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না।

দিনের বেলা সে বাড়ীতে গেল না। তরুদের বাড়ীতেই নামমাত্র আহার করিল। আহারান্তে তরু একবার তাহার নিকটে আসিয়া নিতান্ত বিষন্নের মত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল "সই, তোর মায়ের কাছে একটা কথা শুনিলাম, কথাটা সত্য কি ?"

সরযূ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল "হাঁ, সই, সত্য"।

তরু সরযূর অকুঞ্চিত, চিন্তালেশশূন্য কঠোর মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না, সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

বৈকালে সরযূ কন্যাকে সাজাইতে বসিল, তারপর হঠাৎ তরুর নিকটে আসিয়া বলিল "ভাই, বড় একটা অন্যায় করিয়াছি, তোমার মেয়েকে সাজাইতে গিয়াছিলাম।"

তরু বলিল "কেন সই, তাতে দোষ কি ?"

সরযূ বলিল "ভাই, আজ আর আমি ও কাজটা করিব না।"

তরুর নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

সূর্য্যালোক নিবিয়া আসিল, উৎসবগৃহের কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

( ১১ )

বর আসিয়াছে, ওরে বর আসিয়াছে, গাড়ী ঘোড়া, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও আত্মীয়বর্গ লইয়া, রাজসম্পদে ভূষিত হইয়া, আলোক জ্বালাইয়া, বাদ্য নির্ঘোষে চারিদিক কম্পিত করিয়া, রূপের ছটায় সভাগৃহ আলোকিত করিয়া বর ওই যে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। সরযূ বর দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে কি একটা আকুলতা কেবলই গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। সরযূ বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না।

রাত্রি দশটার সময় বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেল। বর বাসরঘরে আসিয়া বসিল। নিমন্ত্রিত দল গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পুরাঙ্গনাগণ বর দেখিতে আসিলেন।

রতি আসিয়াছে, লবঙ্গ আসিয়াছে, বিমলা ও তরু তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সরযূও আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া তাহাদের পিছনে দাঁড়াইল।

বর্ষীয়সীরা একে একে সে স্থান ত্যাগ করিলেন, রতি, লবঙ্গ, বিমলা একঘরে আসিয়া বসিল, বাসরঘরে তরুণীদের কথা ও হাসির উচ্ছ্বাস বাধা মানিল না।

অনেকে চলিয়া গেলেন, অনেকে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বাসরঘরের কলরব ক্রমশঃ মিলাইয়া আসিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে হঠাৎ একটি বালিকা বলিয়া উঠিল "কেহ গান কর ভাই, অনেকক্ষণ গান হয় নাই।" বাসরঘরের অন্যান্য তরুণীও সেই কথায় যোগদান করিল।

পাশের ঘরে সরযূ শয়ন করিয়াছিল, রজনীর নীরবতা ও তন্দ্রার জড়তার মধ্যে অনেক কথাই তাহার অন্তরে সজীব হইয়া উঠিতেছিল। আর একটা বাসরঘরের ছবি কেবলই তাহার স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইতেছিল, সেদিন সে তাহার একটা সাধ লজ্জা ও সংকোচের জন্য মিটাইতে পারে নাই।

প্রতিক্ষণে তাহার মনে হইতেছিল—সে উঠিয়া গিয়া এই গীতহীন, নীরব বাসরঘরটিকে গান গাহিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, কিন্তু সে যে বরকন্যার মাতৃস্থানীয়া, কেমন করিয়া সে এ বাসরঘরে গান করিবে?

রজনী শেষ হয় হয়, তবুও কেহ গান গাহিল না। সরযূর প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। হয়ত কেহ গান গাহিতেছে না বলিয়া ইহাদের একটা আনন্দের অভাব ঘটিতেছে, হয়ত বা তাহারই মত কোন অভাগিনী লজ্জা ও সংকোচে গান না গাহিয়া চিরদিন একটা দারুণ বেদনায় পীড়িত হইবার আয়োজন করিতেছে।

সরযূ আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মনে যে একটা ইচ্ছার উদয় হইয়াছে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া—সময়ে অলস হইয়া ভবিষ্যতে দুঃখের দিনকে ডাকিয়া আনিতে সে কুণ্ঠিত হইল।

সে উঠিল, ধীরে ধীরে এখানে সেখানে লুণ্ঠিত সুপ্ত পুরাঙ্গনাদের পাশ দিয়া অতি সন্তর্পণে বাসরঘরে প্রবেশ করিল। সে কি করিতেছে তাহা তাহার জ্ঞাত ছিল না। যে কাজটা করিবার জন্য তাহার মন আকুল, সেই কাজটিই শেষ

করিতে সে কৃতসংকল্প হইল, কোন বাধা, কোন সংকোচ আজ তাহার বিরোধী হইতে পারিল না।

সে বাসরঘরের এক কোণে বসিয়া কাহারও দিকে না চাহিয়া যেন আপনার মনেই গান ধরিল।

আমারে যবে ডেকেছিল সে
তথন তারে চাহিনি সই,
আজি এ রাতে তাহারি লাগি'
কাঁদিতে শুধু জাগিয়া রই।

কে গান করিতেছে কেহই জানিতে পারিল না। কেবল তরুর কানে গানটা পুত্রহারা জননীর আকুল ক্রন্দনের মত ধ্বনিয়া উঠিল।

সরযূ নিবিষ্টচিত্তে গাহিতে লাগিল :—

প্রভাতে যবে গেল সে চলি'
হৃদয় মোর চরণে দলি'—
ঘুমায়েছিনু, জাগিয়া শেষে
অশ্রুভারে আকুল হই,
আমারে যবে ডেকেছিল সে
তথন তারে চাহিনি সই।

গান শেষ হইয়া গেলে তরু চুপি চুপি সরযূর পিছনে আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিল. ডাকিল "সই, এখানে আয়।"

সরযূ শিহরিয়া উঠিল, তারপর মস্তক অবনত করিয়া ধীর পদে বাহিরে চলিয়া আসিল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ তথন কাঁপিতেছিল। তরু বলিল "এ কি? এমন করিতেছিস্ কেন?"

সরযূ বলিল "আমি বাড়ী যাইব।"

তরু একজন দাসীকে সঙ্গে দিয়া সরযূকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

আকাশে শুকতারা উঠিয়াছিল। একপাশে চন্দ্র অস্ত যাইতেছিল। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া সরযূ গৃহদ্বারে করাঘাত করিল, মা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

দাসী চলিয়া গেল। কন্যা মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া সশব্দে কাঁদিয়া উঠিল।

মা বলিলেন "কাঁদিস না মা, জামাই বিবাহ করে নাই, দেখগে যাও বাড়ীতে কে আসিয়াছে।"

সরযূর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর সে দাঁড়াইতে পারিল না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

# দেহ ও প্রেম

## ( গাথা )

শ্রেষ্ঠ নটী মোতিয়ার নাম অবিদিত কারো নাই আজ
মোহিছে যে এ বিপুল পুর দিয়া নিত্য নানা গীত নাচ।
কত ধনী বিলাসী পুরুষ পেতে যার তুচ্ছ অঙ্গ সুখ
ব্যর্থ হ'য়ে নিন্দে মোতিয়ায়—হ'য়ে আছে আজিও উন্মুখ।
যে নারীর নূপুর নিক্কণে মুগ্ধ হয়ে লালসা বিপুল
পণ করে সর্ব্বস্ব নিমেষে দিতে পায় ঐশ্বর্য্য অতুল;
যে নটীর নৃত্য গীত রীতি, কণ্ঠ, স্বর, ভঙ্গী আদি, যারে
কালোয়াৎ প্রশংসে হাজার, নবীনেরা সদা অনুকারে।—
আজি তার বুঝি শেষ দিন, শেষ প্রায় এই জীবনের—
আসে ছুটী দীর্ঘ অক্রূরান্ ধরি' হাত কম্প্র মরণের।

*　　*　　*　　*　　*

সুরম্য এ অট্টালিকা মাঝে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে শয়ান
শঙ্খ-শুভ্র শয্যাতলে নারী, মৌন রুগ্ন, প্রদীপ্ত নয়ান।
শ্লথ দু'টি চরণের তলে নৃত্য তাল মাগিছে বিদায়
অঙ্গ ঘেরি' বিলাস-পরীরা অশ্রু রাগে শেষ-চাওয়া চায়।
চিত্র-পুষ্প-স্ফাটিক-সজ্জারা ম্লান স্মরি' ও কর-পরশ
সারা গৃহ নিঃশব্দে ভয়াল—থাকিত যা' সঙ্গীতে সরস।
ললিত ডাক্তার বসি পাশে এক খানি কাষ্ঠ কেদারায়
হতাশ্বাসে গণিতেছে কাল—এই বুঝি ফুরাইয়া যায়!
শয্যাতলে নীরব রোগিণী, পাশে তার নীরব ডাক্তার
কারো মুখে কথা নাই কোনো—চাহে মুখ দু'জনে দোঁহার।

কহিলা মোতিয়া ভগ্নকণ্ঠে নয়ন উজ্জ্বলতর করি'
"আর কেউ আছে কি এ ঘরে ? থাকে যদি যেতে বল সরি'।"
"কেহ নাই তুমি আমি ছাড়া"—উত্তরিল ডাক্তার ললিত !
উপাধানে ভর করি' বসি' কহে নারী কণ্ঠ বিকম্পিত !—
"আজি এই মরণের ক্ষণে অনুরোধ একটি আমার
তোমারে তা' রাখিতে হইবে, শেষ সাধ এই পতিতার।
এই মোর অলঙ্কারগুলি উপহার পত্নীরে তোমায়
সহ মোর স্নেহ-আশীর্ব্বাদ ঘটকালি কর' পৌছাবার।"
এত কহি' শয্যাতল হ'তে বাক্স এক ভরা গহনায়
ললিতের হাতে তুলি' দিতে আঁখিজলে দেখিতে না পায়।
"ভাবিওনা নিন্দিতার দান সতী-তনু স্পর্শিবে কেমনে—"
বাধা দিয়া কহিল ললিত কৃতজ্ঞতা-সজল-নয়নে :—
"ওকি কথা ? বলিওনা, ওগো, কেন আজ পাষাণ কঠিন ?
কেমনে কাহব আমি, দেবী, তব পাশে নিয়েছি কি ঋণ ;
আজো মনে পড়ে মোর সেই—আসি হেথা প্রথম যখন
কেহ না জানিত মোরে, কেহ মোরে ডাকি' পুছেনি কখন !
এই অন্ন বন্ধু খ্যাতিহীন নগরী, এ দরিদ্রজনায়
করে' দেছ' তুমি তারে হেন আশা-ভরা সুখ পূর্ণিমায় !
এ অখ্যাতে তুমি স্নেহময়ী পরিচিত করাইয়া দিলে
আজ মোরে তাই ডাকে সবে কি ধনী কি গরীবেরা মিলে !
যাহা কিছু আছে মোর আজি স্বল্প ধনখ্যাতি কিম্বা মান—
ভাবিওনা মিথ্যা চাটু ইহা—এ সকলি জানি তব দান।
স্বার্থান্বেষী মানব আমরা স্বার্থতরে ক্রীতদাস হই—
তাই বলে দেবীরে চিনিনা, হেন মূর্খ আমি কভু নই !
কে বলে পতিতা তোমা' নারী ? তুমি দেবী অনিন্দিতা অয়ি
দেখিয়াছি, শুনিয়াছি যাহা, তাহে তুমি সতী স্নেহময়ী !"

মৃত্যুচ্ছায়া পাণ্ডুর বদনে উদ্ভাসিল কি যে বর্ণ-বিভা
চমকিল দেখি তা' ললিত উপেক্ষিতা সুন্দরী সে কিবা !
কিছুক্ষণে পুছিল ললিত—"ওগো মোরে ক্ষমা যদি কর
সুধাই তোমারে এক কথা, জানিতে তা' ইচ্ছা মোর বড় ;"

"কর প্রশ্ন, লও পরিচয়, রাখিওনা এতটুকু ফাঁক
দিব আমি উত্তর সবার, নাহি আজ মান লজ্জা জাঁক !"
"নহে' তুমি ইন্দ্রিয়ের দাসী, নহে' তুমি অর্থের কাঙালী,
তবে কেন তুমি এই পথে আসিয়াছ—একি চতুরালী ?
মনে হয় সতত আমার দেবতার নির্ম্মাল্য এ কোন্
ঝটিকায় উড়ে-পড়া' ছাড়া, পথে তার কিবা প্রয়োজন ?"
দৃঢ়কণ্ঠে কহিল মোতিয়া—"সত্য, বন্ধু, উড়ে-পড়া' ফুল !
আমিও যে ছিনু কুলবধূ, ভাগ্যদোষে হারাইনু কুল !"
"কহ ওগো কহ বিবরিয়া বড় বাঞ্ছা শুনি সে কাহিনী
কোন্ পশু সাধিল এ বাদ তব সনে, সুন্দরি কামিনী !"
"নিন্দিও না আজি আর বৃথা, হয়ে গেছে বড় দেরী এবে
গুরুজন সে ব্যক্তি তোমার ! যাক্ কথা, কায নাই ভেবে।"
"গুরুজন সে ব্যক্তি আমার ? একি কথা রহস্য ভীষণ।
কহ নারী, কহ সত্য কথা, জ্বলে প্রাণে তীব্র হুতাশন !"
কৌতূহলে, চিন্তায়, উচ্ছ্বাসে ললিতের বদনমণ্ডল
ঘন-পাংশু পাণ্ডুর মলিন ললাটে ফুটিল স্বেদজল !
উপাধান তলে মুখ রাখি' কহে নারী সসংকোচে ধীরে—
"পিতা তব, শ্বশুর আমার, নমি' তাঁয় ভক্তিনত শিরে !
এত দিন মিথ্যা মরে' ছিনু, আজ মোর সত্য সে মরণ
বড় ভাগ্যবতী আমি তাই পেনু আজ তোমার চরণ !"
বজ্রাঘাতে স্তম্ভিত যেমন কণ্ঠরুদ্ধ নিশ্চেতনপ্রায়
স্পন্দহীন বসিয়া ললিত কি বলিবে খুঁজিয়া না পায়।
"সেই দিন শ্বশুর আমায় আনিতেছিলেন তাঁর ঘর ?
পথে দস্যু যখন আমারে অসম্মানে হ'ল অগ্রসর
পিতা তব প্রাণভয়ে নিজে পলাইল ফেলে' বালবধূ
কি করিব নিরুপায় আমি—বয়স যে চৌদ্দ বর্ষ শুধু !
ভার ল'য়ে রক্ষক যে সাজে, সে যদি না রাখে অঙ্গীকার
অর্পে যদি সেই দস্যু-করে—নিঃস্ব তবে বাঁচে কি প্রকার ?
নাহি বল, নাহিক সম্বল, নিরুপায়, আত্মসমর্পিতা
ত্যাজি' যে পলায়—সে নিষ্পাপ ; যত দোষ সেই উৎপীড়িতা !

বেশ ধর্ম্ম, বেশ সে সমাজ, বিবেচনা অবিবেকী যথা
পুরুষেরা কাপুরুষ সব, অধর্ম্মই ধর্ম্মের বারতা !
নিত্য নব রচিয়া শাসন সেবারতা রমণীর তরে
গর্জ্জিছে নির্ব্বিষ সর্প সম, দণ্ড ধরি' বলহীন করে !
সহে নারী, আসিতেছে সহে', সহিবেও সৃষ্টি যতদিন,
যত খুসী দাও তার শিরে, সর্ব্বংসহা রবে অমলিন !

যাক্ সব বাজে কথা, শোন'—শেষে যবে পঁহুছিনু ঘরে
'দূর দূর কলঙ্কিনী' বলে' ধূলা পায় খেদাইল মোরে,
কার দোষে, কাহার ত্রুটীতে হ'নু আমি ত্যজ্য কলঙ্কিনী ?
নিরুত্তর ! ত্যজিয়া আশ্রিতে নিজ দোষ ঢাকিলেন তিনি।
এড়াইয়া নানা দুঃখ লোভ কাটাইনু পথে পথে, হায়,
কত দিন কত যে রজনী—জানে সেই নিঃস্বের সহায়।
প্রিয়তম, ছিলে অধ্যয়নে পরবাসে তুমি সে দুর্দ্দিনে
কত বল, কত প্রলোভন, দলিয়াছি তার পর হ'তে
নিজ ভার নিতে নিজ করে শিখিনু গো দাঁড়াইয়া পথে,
এই দেখ ছবি তব মম আছে মোর আজও বক্ষতলে
এই সাক্ষী আছে মোর চির-পবিত্রতা রাখা যার বলে !
"একদিন, শুধু একদিন, এ জীবনে হয়েছি পতিতা—
নহি আমি চিরদিনকার ! উপেক্ষিতা আমি উৎপীড়িতা !
পঞ্চত্রিংশ বর্ষে আজি এই পেনু আমি পতি দরশন
এ প্রথম, এই শেষ মোর পরিচয়, আলাপ, মরণ !
তুমি মোরে চিনিতে পার'নি চিনিয়াছি তোমারে ত আমি—
সে কি আজ ? বিংশতি বরষ—আমি ছিনু পত্নী, তুমি স্বামী !
নৃত্য গীত কলাবিদ্যা শিখি' অর্জ্জিয়াছি অন্ন পুণ্যপথে,
না হইয়া আত্মঘাতী, আর জলাঞ্জলী দিয়া নারীব্রতে !
তবু ভাবে নির্দ্দয় জগত এ আমার মন আর দেহ
সব ভাল অপমান ছলে সুসজ্জিত প্রমোদের গেহ !
যেন হেথা নাহি পুণ্য প্রাণ, শঙ্খরবে খুলে না দুয়ার,
কামনা ও কাঞ্চনেই হয় সন্ধ্যারতি চিত্ত দেবতার।

ক্ষম' মোর প্রগল্‌ভতা আজি, থেকো সুখে, ভুলো এ দুঃস্মৃতি,
করেনিক' যারে কেউ ক্ষমা, তুমি তারে ক্ষম',—এ মিনতি!
দেহ মোর হয়েছে পতিত, প্রেম আছে চির অমলিন
গেছে ফুল যদিও শুকায়ে তবুও সে নহে গন্ধহীন।"
"ওগো বধু, ওগো সতী, প্রিয়া, উপেক্ষিতা হে মোর দয়িতা,
এস কক্ষে, বক্ষে মোতিমালা, এস ফিরে ও প্রাণের মিতা!"
উচ্ছ্বসিত আবেগ-উন্মাদ শয্যাতলে পড়িল ললিত
তনুলতা প্রিয়ার তখন প্রাণহীন আছিল পতিত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

# বিদ্রোহী

( ১ )

"হেম্! হেম!—কোথায় সে?"

কর্ত্তার ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজন ও ভৃত্যবর্গ প্রমাদ গণিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। পড়িবার ঘরে হেমের গৃহ-শিক্ষক বসিয়াছিলেন, প্রৌঢ় কালিদাস রায় পুত্রের সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হেমকে তথায় না দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল।

কর্ত্তা হাঁকিলেন, "দরোয়ান!"

বহুদিনের দ্বারবান নেহাল সিং ছুটিয়া আসিল। তাহার চরণদ্বয় শঙ্কায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কালিদাস বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "খোকাবাবু কোথায়?"

প্রমাদ গণিয়া নেহাল সিং মস্তক নত করিল। সে জানিত খোকাবাবু ময়দানে খেলা দেখিতে গিয়াছে। স্কুল হইতে আসিবার সময় দ্বারবান কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই; কিন্তু খোকাবাবুর দুইটি মিষ্ট কথায় সে অবশেষে চলিয়া গিয়াছিল। কর্ত্তাবাবু জানিতে পারিবেন না ভাবিয়া সেও আর বেশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু এখন যে ঘোর বিপদ! সত্যকথা বলিলে, আগুন জ্বলিয়া উঠিবে যে! কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারবান বলিল, "হুজুর, কসুর কি জিয়ে।"

তীব্রকণ্ঠে কালিদাস বলিলেন, "ওসব কথা শুনিতে চাহিনা। তুমি খোকাবাবুকে সঙ্গে করে বাড়ী আন নাই কেন?"

দ্বারবান মহা বিপদে পড়িল। মনিবের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিলে খোকা-বাবুর অদৃষ্টে লাঞ্ছনাভোগ অনিবার্য্য। উত্তর না দিলেও নিস্তার নাই। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, খোকাবাবু, ময়দান্‌মে ঘোড়া—"

"বটে!" কালিদাস বাঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন, "তুমি বুড়া হইয়াছ, কিন্তু মনিবের নিমকের ইজ্জত রাখিতে জাননা, এখন হারামী আরম্ভ করিয়াছ। কাল হইতে তোমার মত অপদার্থ লোকের আমার প্রয়োজন নাই। বস্‌—ভালো!"

দ্বারবান নতশিরে চলিয়া গেল। ভৃত্যবর্গ দ্বারের পার্শ্বে অথবা থামের অন্তরালে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনিবের আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল, তাহাদের কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিলনা। স্বামীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া হেমের জননীও অন্তঃপুরের দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতে-ছিলেন।

কর্ত্তা চটিজুতার চট্‌ পট্‌ শব্দ করিতে করিতে পুত্রের পড়িবার ঘরে ফিরিয়া গিয়া অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে বসিলেন। সমগ্র অট্টালিকাও যেন ভাবী বিভীষিকার আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভাবগতিক দেখিয়া বাতাসও যেন স্বচ্ছন্দে সঞ্চালিত হইতে পারিতে ছিলনা।

কালিদাস রায় বাল্যকালে ও প্রথম যৌবনে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও অসংযত ছিলেন। বৃদ্ধবয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া তিনি জনকজননীর নয়নের মণি ও আদরের দুলাল ছিলেন। পিতা মাতার অত্যধিক আদরে লালিত পালিত হইয়া তাঁহার স্বেচ্ছাচার এত বাড়িয়াছিল যে, তিনি যাহা ধরিতেন তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। কেহ বাধাও দিতনা। দুর্দ্দমনীয় বাসনার স্রোতে তিনি ভাসিয়া যাইতেন। এজন্য কালিদাস প্রথম যৌবনে বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই। চরিত্রেও নানারূপ দোষ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তারপর সংসারে প্রবেশ করিয়া অধিক বয়সে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দোষ বা ত্রুটী বুঝিতে পারিলে মানুষ অনেক সময় আপনাকে ফিরাইয়া লইয়া আসে। তিনিও প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় গতিকে সংহত করিয়াছিলেন; কিন্তু যে শুভ সুন্দর মুহূর্ত্ত তিনি হেলায় হারাইয়া ছিলেন তাহাত ফিরিয়া আসিবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা! এজন্য কালিদাসের মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছিল। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। নিজের জীবনে যে সকল ভ্রম

প্রমাদ ঘটিয়াছিল, পুত্র যাহাতে সে সকল ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া না ফেলে সেদিকে তাঁহার কঠোর দৃষ্টি ছিল।

শৈশব হইতেই হেমচন্দ্রের কোনও ক্রুটী বা অপরাধ তিনি উপেক্ষা করিতেন না। কঠোর শাসনে তাহার দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শাসনের অভাবেই শিশু বিগড়াইয়া যায়। স্নেহ মমতা দেখাইলেই বালকের ভবিষ্যৎ মাটী হয়। "Spare the rod and spoil the child" এই ইংরাজী প্রবচনের তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। পিতা যে পুত্রের শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেকথা কালিদাস মানিতেন না। চাণক্য নীতির প্রথম ও শেষাংশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি মধ্য পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিচারকের অত্যুচ্চ আসনে বসিয়া তিনি পুত্রের অপরাধের বিচার করিতেন, শাস্তি দিতেন। পুত্রের চিত্তবৃত্তির সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা কখনও করিতেন না। স্নেহের শাসনের দ্বারা মানবচিত্তে কতখানি স্থান অধিকার করা যায় বৃদ্ধ কালিদাস তাহা জানিতেন না, জানিবার চেষ্টাও তাঁহার ছিলনা। ক্ষমাহীন শাসনকারীর শারীরিক দণ্ড যে মনের বিদ্রোহ ভাবকে আরও প্রবল করিয়া তুলে সে সত্য জীবনে তিনি কখনও উপলব্ধি করেন নাই।

কালিদাস মধ্যবয়সে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন পুত্রও যাহাতে বিলাসী না হয় সে দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মিতাচারী ও কঠোর শ্রম-সহিষ্ণু করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রকে কখনও রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য আহার করিতে দিতেন না; কোমল শয্যায় শয়ন করিতে দিতেন না। সামান্য মূল্যের মোটা কাপড়, চিনের বাড়ীর শাদা কাপড়ের জুতা ও জিনের চায়না কোট বা ফতুয়া বাল্যকাল হইতে হেমচন্দ্রের পরিধেয় ছিল। শীতের সময় দোলাই বা বালাপোষ গায় দিয়া তাহাকে শীত নিবারণ করিতে হইত।

বিদ্যালয়ের ছেলেরা এজন্য হেমচন্দ্রকে "মান্ধাতা" বলিয়া ডাকিত, বিদ্রূপ করিত। বাস্তবিক, সাদা ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া, চায়না কোট পরিয়া অথবা ছিটের দোলাই গায় দিয়া সে যখন স্কুলে আসিত তখন বিংশশতাব্দীর সুবেশ ছাত্রগণ তাহাকে নিতান্তই প্রাচীন যুগের অদ্ভুত জীব বলিয়া বিদ্রূপ করিবে তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু উপায় ছিলনা। হেমচন্দ্রকে নীরবে সে বিদ্রূপ পরিপাক করিতে হইত; কারণ পিতার শাসনের ভয় সহপাঠীদিগের বিদ্রূপের অপেক্ষাও ভীষণ। একদিন হেমচন্দ্র সখ করিয়া বাবু ফ্যাশানে চুল কাটিয়াছিল, কালিদাস তাহা দেখিবামাত্র পরামাণিক ডাকাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বহুসাধের

কেশবিন্যাস ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাছে কোনও সঙ্গীর সহিত মিশিয়া পুত্র উৎসন্ন যায়, এজন্য এক বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যত্র কোনও সহপাঠীর সহিত তাহার মুহূর্ত্তের জন্যও দেখা করিবার উপায় ছিলনা। দ্বারবান প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে পঁহুছিয়া দিত; আবার ছুটীর সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত। বাড়ীর ছাদের উপর বা প্রাঙ্গনে হেমচন্দ্র একা খেলা করিত, বেড়াইত। বাহিরে যাইবার আদেশ ছিল না। কোনও আত্মীয়ের গৃহে যাইবার প্রয়োজন হইলে সঙ্গে লোক যাইত। কোথাও একা যাইবার উপায় ছিল না।

কিন্তু এত কঠোর শাসনে পিতা কি পুত্রের হৃদয় সত্যই বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন? শৃঙ্খল যত দৃঢ় হয়, বাঁধন যত শক্ত হয়, মন সেই শৃঙ্খল হইতে—সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ততই ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এ সত্যটুকু কালিদাসের কাছে গুপ্ত রহিলেও হেমচন্দ্রের কাছে পরিস্ফুট হইয়াছিল। পুত্র প্রকাশ্যে পিতার বিধান মানিয়া চলিত বটে; কিন্তু সুযোগ পাইবামাত্র গোপনে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিত। কালিদাস অনেক সময় সে সকল গুপ্ত পলায়ন কাহিনীর ইতিহাস জানিতে পারিতেন না। হেমচন্দ্র তাহার পিতারই সন্তান। তাহার চিত্ত বৃত্তি পিতারই ন্যায় দুর্দ্দমনীয়। কাজেই সে যতই বাধা পাইত, পিতার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বন্ধনজাল হইতে মুক্তিলাভ করিবার উৎকট নেশা ততই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

(২)

লক্ষকণ্ঠ বিজয়ী "মোহন বাগান" দলের জয় ঘোষণা করিতেছিল। আজ তাহারা ফুটবল খেলায় অজেয় গোরাদলকে হারাইয়া দিয়া দুর্ল্লভ জয়মাল্য লাভ করিয়াছে। জয়োন্মত্ত জনতার সহিত হেমচন্দ্রও প্রাণপণ চীৎকার করিয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছিল। লাফাইতেছিল, শূন্যে ছাতি নিক্ষেপ করিয়া উৎকট আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। বাঙ্গালীর সে দিনের সে উৎসাহ, সে উদ্দীপনা হেমচন্দ্রের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। জীবনে সে এমন করিয়া কোনও দিন দেশবাসীর সহিত এমন ভাবে মিলিয়া প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিবার সুযোগ পায় নাই। আজ এ কি আনন্দ! কি অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ সে আজ উপভোগ করিতেছে! হায়! ঐ সৌভাগ্যশালী এগারটি যুবকের যদি অন্যতম সে হইতে পারিত।

খেলাশেষে দর্শকের দল ট্রামের উদ্দেশে দৌড়িল। কয়েকটি সহপাঠীর সহিত হেমচন্দ্রও বাড়ীর দিকে ফিরিল। আজ তাহার আননে এক অপূর্ব্ব আনন্দদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মোহনবাগান দলের জয়গর্ব্ব সে যেন নিজেই অনুভব করিতেছিল। পিতারশাসন-রজ্জুর বাঁধন হইতে কয়েক দণ্ডের জন্য মুক্তিলাভ করিয়া সে সহজ ও সরল ভাবে সতীর্থগণের সহিত মুক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে পাইয়াছে এই ভাবটি তাহার আননে, নয়নে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। দিবারাত্র দ্বারবান, ভৃত্য, মাষ্টারমহাশয় এবং পিতার সতর্ক দৃষ্টি তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল; মাঝে মাঝে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সে সঙ্গীদিগের সহিত মিশিত বটে, কিন্তু আজিকার মত এত দীর্ঘ সময় এমন বিচিত্র, অননুভবনীয় আনন্দলাভের অবকাশ পূর্ব্বে তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। পরম উৎসাহভরে সে সহপাঠীদিগের সহিত খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

হ্যারিসন রোডের মোড়ের কাছে আসিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। গৃহের নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকাশে দিবালোকের ক্ষীণমাত্র আভাসও ছিলনা। এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে? হেমচন্দ্র দ্রুত চলিল। পিতা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিয়াছেন, তাহার সন্ধান লইয়াছেন। সে বাড়ী নাই, তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে সে খেলা দেখিতে আসিয়াছে জানিতে পারিলে, তাহার অদৃষ্টে কিরূপ নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ঘটিবে কল্পনানেত্রে হেমচন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল। এতক্ষণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার আতিশয্যে বাড়ীর কথা তাহার আদৌ মনে ছিলনা। কিন্তু সে মোহঘোর অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল আননে আতঙ্কের ছায়া নিবিড় হইয়া আসিল।

নিঃশব্দে সদর দরজা পার হইয়া সে সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। এমন সময় দ্বারবান পশ্চাৎ হইতে মৃদুস্বরে ডাকিল, "খোকা বাবু!"

চমকিয়া সে পশ্চাতে চাহিল। পুরাতন দ্বারবান মাথার পাগড়ী বাঁধিতে বাঁধিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হামারা জবাব হো গৈ, খোকাবাবু!"

হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "কেন, নেহালসিং?"

"নসিব, খোকাবাবু!—বাবু বহুৎ খাপ্পা হুয়া—"

হেমচন্দ্র ব্যাপারটি অনুমান করিয়া লইল। আজ তাহারই জন্য এতকালের দ্বারবান চাকরী হারাইয়াছে। নেহালসিং কোনও মতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে

চাহে নাই। কত বুঝাইয়া কত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া সে বৃদ্ধের হাতে বই খাতা দিয়া খেলা দেখিতে গিয়াছিল। সেই অপরাধেই আজ বেচারার চাকরী গেল। হেমচন্দ্রের মনে আঘাত লাগিল; কিন্তু সে বিষয় চিন্তা করিবার অবসর তাহার ছিল না। নিজের আসন্ন বিপদের চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

নিঃশব্দচরণে হেমচন্দ্র পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল।

ও কে? চেয়ারে সত্য সত্যই তাহার পিতা বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া হেমচন্দ্রের পা আর উঠিল না। স্তম্ভিতভাবে সে দ্বার-পথে দাঁড়াইল। বক্ষের শোণিতস্রোত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

শত বজ্র যেন অকস্মাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের মস্তক ধীরে ধীরে অবনত হইয়া পড়িল।

আসন সরাইয়া রাখিয়া কালিদাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"জবাব দিচ্ছ না যে? কোথায় ছিলে?"

কে উত্তর দিবে হেমচন্দ্রের কণ্ঠতালু অবধি শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

ক্রুদ্ধ কালিদাস আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। সপ্তদশবর্ষবয়স্ক পুত্রের মস্তকের কেশাকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "উত্তর চাই, জবাব দাও।"

কর্ত্তার গর্জ্জন শুনিয়া আশে পাশে ভৃত্যবর্গ সমবেত হইয়াছিল। অন্তঃপুরের দ্বারপথেও হেমচন্দ্রের জননী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অবনত মস্তকে থাকিলেও হেমচন্দ্র সকলের নিঃশব্দ গমনাগমন বুঝিতে পারিতেছিল। অনেক বিষয় চর্ম্মচক্ষুর অগোচর থাকিলেও অনুভবশক্তির দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। মাষ্টার মহাশয়ের সম্মুখে ভৃত্যবর্গের সাক্ষাতে পিতার দ্বারা এরূপ লাঞ্ছিত হইয়া অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের আত্মসম্মান জ্ঞান যেন জাগিয়া উঠিল। সে মস্তক ঈষৎ উন্নত করিয়া বলিল, "খেলা দেখিতে মাঠে গিয়াছিলাম।"

বটে! এত সাহস? পিতার আদেশ অবহেলা করিয়া তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে একবারও তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল না? এতটুকু শঙ্কা জন্মিল না? আবার সে কথা মুখের উপর বলিয়া বসিল? কালিদাসের স্ফীত ললাটরেখা আরও ফুলিয়া উঠিল, সমগ্র মুখমণ্ডলে মেঘ ঘনাইয়া আসিল। আত্মবিস্মৃত কালিদাস প্রবল বেগে হস্তস্থিত চটিদ্বারা পৃষ্ঠে কয়েকবার আঘাত করিলেন। তারপর তীব্রস্বরে বলিলেন, "ভবিষ্যতে মার্জ্জনা করিব না। যদি

কোনও দিন আমার আদেশের এতটুকু বিপরীত কাজ করিতে দেখি, সেই দিন হইতে এবাড়ীতে তোমার স্থান হইবে না।"

জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে তীরস্কার ও প্রহার সহ্য করিতে অভ্যস্থ, বোধ হয় অপমানের তীব্র দাহ তাহাকে তেমন ভাবে দগ্ধ করিতে পারে না। আত্মমর্য্যাদা বুঝিবার বয়স হইলেও অবিরত তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া হেমচন্দ্রের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বাড়িয়াও বাড়িতে পারিতেছিলনা। পিতার হস্তে এরূপে নিগৃহীত হইয়া যদিও তাহার অন্তরেন্দ্রিয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় আজন্মবর্দ্ধিত আতঙ্কের প্রবল অভাব অতিক্রম করিবার মত শক্তি লাভ করে নাই। অধিকতর অপমানের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে হেমচন্দ্র অবনতমস্তকে পড়িবার টেবিলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

৩

স্নেহহীন কঠোর শাসনে দেবতার অভিসম্পাত আছে কি না জানি না, কিন্তু বিধাতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ যে, তাতে নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মার্জ্জনা-শূন্য, শুষ্ক, নির্ম্মম শাসনে হৃদয়ে আতঙ্ক ও বিভীষিকার সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু চিত্ত তাহাতে সংশোধিত হইবার অবকাশ পায় কি? স্নেহের শাসন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি আহরণ করে, কিন্তু কঠোর পীড়ন শুধু নরকের পূতিগন্ধ বাড়াইয়া তুলে। স্নেহের শাসনে মানুষ দেবতা হয়, আর নির্ম্মম পীড়নে—মানুষ দূরের কথা—দেবতাও পিশাচে পরিণত হইয়া পড়ে।

হেমচন্দ্রের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। পিতার অতিরিক্ত শাসন ও পীড়নে তাহার হৃদয়ের গতি ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। পিতা যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন, সেই কার্য্য করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জন্মিত। পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেই যেন তাহার হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিত। সে ভাবিত, বুঝি তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু শাসনের ভয়ে সে প্রকাশ্য ভাবে পিতার আদেশ অবমাননা করিতে সাহসী হইত না। সর্ব্বদাই পিতার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিত।

জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে পিতাকে আতঙ্কের বস্তু বলিয়াই জানিয়াছিল। তাহার বক্ষের মধ্যে যে, একটা অপরিমেয় অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, বাৎসল্যের মধুর নির্ঝর ধারা বহিতেছে, বহিতে পারে, এ কথা বুঝিবার অবকাশ হেমচন্দ্র কখনও পায় নাই। তাহার মনে হইত,

পিতা যেন বৃক্ষলতাদিপরিশূন্য এক বিরাট পাষাণ স্তূপ—তাঁহার চারিদিকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপদীপ্ত সীমাহীন মরুভূমি ধূধূ করিতেছে! সেখানে পঁহুছিবার বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল কোনও পথ নাই—কোনও জীব সেখানে পঁহুছিতে পারে না। অতি কষ্টে কোনও ভাগ্যহীন যদি দুস্তর মরুসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পাষাণ স্তূপের সন্নিহিত হয় নিদারুণ ক্লান্তি ও তৃষ্ণায় তাহার অবসন্ন দেহ সেইখানেই সমাহিত হইবার সম্ভাবনা। নির্ঝরিণীর স্নিগ্ধ সলিলধারা দূরে থাকুক বিন্দুমাত্র বারিও তাহার দগ্ধ দেহ ও প্রাণের শান্তিবিধানের জন্য সেখানে মিলিবে না। তাই হেমচন্দ্র দূর হইতেই সেই ভীষণ দৃশ্যের দিকে চাহিয়াই আবার আতঙ্কে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইত। মৃদুস্বভাবা জননীর স্নেহ-নির্ঝরিণীর স্নিগ্ধ, শীতল, পূত সলিলে অবগাহন করিয়া সে এই পার্থক্য আরও তীব্রভাবে অনুভব করিত। পিতার অত্যাধিক শাসনে ও পীড়নে যখন তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তখন সে মাতার স্নেহশীতল বক্ষে মুখ লুকাইয়া তিরস্কারের তীব্রতা ও প্রহারের জ্বালা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিত।

পুত্রের ব্যথা জননী বুঝিতেন। তাই তিনি প্রায়ই তাহাকে প্রবোধ দিবার ছলে বলিতেন, "উনি যা বলেন, তার বিপরীত কিছু করিস্ না বাবা! কথা না শুন্‌লে উনি রাগ কর্‌বেন। তোর ভালর জন্য উনি অত শাসন করেন। জানিস ত তুই তাঁর বড় ছেলে! তাঁর সকল আশা ভরসা তোর উপর।

হেমচন্দ্র মাতার স্নেহের প্রবোধে অনেকটা সুস্থ হইত; কিন্তু তাহাতে পিতার সম্বন্ধে তাহার হৃদয় যে ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, সে ভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিত না। সে অন্যান্য বালকের সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিত। তাহাদের অবস্থার সহিত তাহার আকাশ পাতাল ব্যবধান। তাহারা অপরাধ করিলে পিতার নিকট তিরস্কৃত হয়, আবার সাদরে বক্ষে স্থান পায়। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে শুধুই প্রহার, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা! কাজেই সে কোনও মতেই তাহার মনকে পিতার শাসনের অনুকূলে মতাবলম্বী করিতে পারিত না। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না যে, তাহার অখণ্ড মঙ্গলের জন্যই পিতা তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী বা অপরাধ সহ্য করিতে পারেন না।

ক্লাশে সে পড়া বলিত মন্দ নয়। তাহার অসাধারণ মেধা ছিল। কিন্তু

বলিয়া অনেক সময় সে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠাভ্যাসে অবহেলা করিত। সেটা যে তাহার পক্ষে আদৌ শুভ নহে তাহা সে অনেক সময় মনে করিতেই পারিত না। তাহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি এইরূপে তাহাকে নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া তুলিল।

পড়াশুনায় অমনোযোগ বশতঃ সে তিন বৎসরের মধ্যে একবারও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না! পিতার ক্রোধ ইহাতে বাড়িয়া গেল। হতভাগা সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি যতই চেষ্টা করিতেছেন সে ততই ভিন্ন পথে চলিয়াছে। এত শাসনেও তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইল না! প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের অঙ্গে হস্তার্পণ করিবার অসুবিধা না থাকিলে তিনি আর একবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। কিন্তু বিশ বৎসরের ধেড়ে ছেলের গায়ে হাত তোলা—থাক্ কাজ নেই। কালিদাস হেমচন্দ্রকে ডাকিয়া বহু তিরস্কারের পর বলিয়া দিলেন যে, এবার যদি সে পরীক্ষা দিতে না পারে তাহা হইলে তিনি তাহার বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস বন্ধ করিয়া দিবেন।

পুত্র মনে মনে হাসিল। সে ত তাহাই চায়।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে স্নেহময়ী জননী যখন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বাবা মূর্খ নামটা ঘুচাতে পাল্লি না? আমার যে বড় সাধ তুই লেখাপড়া শিখে মানুষের মত হবি।"

জননীর স্নেহের অনুযোগে হেমচন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হইল। সে রাত্রিতে সে ভাল করিয়া আহার করিতে পারিল না।

-

মনস্থির করিয়া হেমচন্দ্র এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার বড় বিলম্ব নাই। সেদিন রবিবার। কালিদাস বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। হেমচন্দ্রের আজ আনন্দের সীমা নাই। সারাজীবনে এমন মুক্তির আনন্দ সে কোনও দিন অনুভব করে নাই। তাহার জ্ঞান সঞ্চারের পর হইতে পিতা একদিনের জন্যও অন্যত্র অবস্থান করিয়াছেন এমন কথা হেমচন্দ্রের মনে পড়েনা। বিশেষ জরুরী কার্য্য হইলেও কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কালিদাস তাহা করাইয়া লইতেন। একদিনের নিমিত্তও পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিবেন না ইহাই তাঁহার ব্রত ছিল। পিতা যে স্থলে গিয়াছেন আজ আর সেখান হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা

নাই। হেমচন্দ্র অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সহিত সহপাঠীদিগের সহিত নানাবিধ আমোদ প্রমোদে যোগ দিল। পরীক্ষা হইয়াছে, স্কুল কলেজ বন্ধ, মাষ্টার মহাশয়ও দেশে গিয়াছেন, সুতরাং হেমচন্দ্রের চারিদিক আজ মুক্ত।

কয়েকটি সহপাঠী বলিল যে, আজ ষ্টারে দুর্গাদাসের অভিনয়, দেখিতে গেলে হয়। থিয়েটারের অভিনয় হেমচন্দ্র জীবনে কখনও দেখে নাই। বন্ধুবান্ধবের কাছে শুধু রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র দৃশ্যের বর্ণনা শুনিয়াই আসিয়াছে; কখনও অভিনয়-দর্শনের সৌভাগ্য তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। কারণ তাহার পিতা থিয়েটারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অবশ্য পিতার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অগোচরে সে বহু অন্যায় কার্য্য করিয়াছে সত্য; কিন্তু সারারাত্রি জাগিয়া অভিনয় দর্শন করিবার মত দুঃসাহস তাহার ছিল না এবং সেরূপ সুযোগও কখনও ঘটে নাই। সতীর্থগণের পীড়াপীড়িতে হেমচন্দ্র সম্মত হইল। তাহার প্রধান আপত্তি ছিল—সে কপর্দ্দকশূন্য, থিয়েটার দেখিবার অর্থ সে কোথায় পাইবে? পিতা ত তাহাকে কখনও এক পয়সা দিতেন না। কদাচিৎ জননীর নিকট হইতে দুই এক পয়সা সে চাহিয়া লইয়া ব্যয় করিত; বন্ধুবান্ধব যখন বলিল যে, থিয়েটার দেখার সমস্ত ব্যয় তাহারাই বহন করিবে, তখন হেমচন্দ্রের আর আপত্তি রহিল না। বিশেষতঃ পিতার আজ গৃহে ফিরিবার সম্ভাবনা অল্প সুতরাং বহু ঈপ্সিত রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র অভিনয় দর্শনের এমন সুযোগ ও অবসর সে ত্যাগ করিবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেই হেমচন্দ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অলক্ষ্যে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল; আনন্দের আতিশয্যে সেদিকে হেমচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। নির্দ্দিষ্টস্থলে সহপাঠিযুগল তাহার অপেক্ষা করিতে-ছিল। হেমচন্দ্র তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া স্পন্দিতবক্ষে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইল।

আলোকিত রঙ্গমঞ্চ, অভিনব দৃশ্যপটে, অভিনয় ও সঙ্গীতের বিচিত্র মোহে হেমচন্দ্র এমনই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সর্ব্বপ্রকার চিন্তা তাহার মানসপট হইতে তখনকার মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। উৎকট নেশার মাদকতায় নবদীক্ষিতের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, হেমচন্দ্রের অবস্থাও আজ সেইরূপ। মুগ্ধের ন্যায় সে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়াই রহিল। এমন অপূর্ব্ব আনন্দের নির্ঝরিণী এতদিন কোন্ পাষাণ-

স্তূপের অন্তরালে গুপ্ত ছিল। কি হতভাগ্য সে, এতকাল ইহার সন্ধান সে পায় নাই!

দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিক্রম করিয়া অবশেষে যবনিকা যখন পড়িয়া গেল, আর উঠিবার সম্ভাবনা রহিল না, দর্শকদল আনন্দকলরোলে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল, তখন হেমচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। সঙ্গীরা বলিল, "চল হেম, বাড়ী যাবে না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যই ত এখন বাড়ী ফিরিতে হইবে। কি নিরানন্দময় তাহাদের গৃহ! সেখানে উৎসবের আনন্দের একটি ক্ষীণরশ্মি-রেখারও প্রবেশাধিকার নাই। শুধু শুষ্ক কাঠের জীবনযাত্রা! এখন সেই গৃহে আবার ফিরিতে হইবে! কি বিড়ম্বনা!

কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত পিতার কঠোর মূর্ত্তি ও তীব্র তিরস্কারের স্মৃতি সে বিস্মৃত হইয়াছিল; পথে চলিতে চলিতে আবার সে সকল কথা মনে জাগিয়া উঠিল। হেমচন্দ্র দ্রুত চলিতে লাগিল। সঙ্গীরা যে যাহার গন্তব্য-পথে চলিয়া গিয়াছিল। নির্জ্জনপ্রায় পথে সে একা। আকাশ মেঘস্তম্ভিত, কোথাও বিন্দুমাত্র চ্ছেদ নাই। প্রকৃতিতে আসন্ন বিপ্লবের চিহ্ন প্রকটিত।

বাড়ীর সদর-দরজার কাছে পঁহুছিবামাত্র দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। বাতাসের বেগ বাড়িতে লাগিল। ভিজিবার আশঙ্কায় হেমচন্দ্র রুদ্ধ দ্বারের কড়া ধরিয়া সবলে নাড়িল। উপর হইতে গম্ভীরকণ্ঠে কে বলিল, "এত রাত্রে কে কড়া নাড়ে?"

সর্ব্বনাশ। এ যে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর! তিনি কি আজই ফিরিয়া আসিয়াছেন?

উপরেই তাঁহার বৈঠকখানাগৃহ। হেমচন্দ্র এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য করে নাই। সে চাহিয়া দেখিল, রুদ্ধবাতায়ন-রন্ধ্রপথে আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। হেমচন্দ্রের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে কড়ানাড়ার শব্দে দ্বারবানেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে জানালা খুলিয়া বাহিরে চাহিল।

হেমচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল, "দরোয়ান, আমি, শীঘ্র দরজা খোল।"

"খোকাবাবু?"

দ্বারবান তাড়াতাড়ি দ্বারমুক্ত করিবার জন্য উঠিল। এমন সময় উপরের জানালা খুলিয়া কালিদাস বলিলেন, "দরোয়ান, কে এতরাত্রে দরজার কড়া নাড়ে?"

দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে বলিল, "হুজুর, খোকাবাবু—

গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ হইল, "দরজা বন্ধ করে দাও। বলো, এখানে জায়গা হবে না। দোস্‌রা জায়গায় চলে যাক্, এ বাড়ীতে স্থান নাই।"

বাতায়ন সশব্দে রুদ্ধ হইল।

দ্বারবান্ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তথন সে দ্বার মুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু হেমচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিল না। সেও স্তব্ধভাবে পিতার আদেশ শুনিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার অন্তরে বহুদিনের সঞ্চিত বিদ্রোহভাব মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া জাগিয়া উঠিল। সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে, পিতা তাহার সহিত এমন ঘৃণিত ব্যবহার করিতে পারেন? অপরাধ থাক বা নাই থাক্, তজ্জন্য তিরস্কার করেন, কটু বলেন, তাহার একটা অর্থ আছে; কিন্তু গৃহ হইতে দ্বারবানের দ্বারা তাড়াইয়া দেওয়ার নাম কি শাসন? এই কি সংশোধনের উপায়? তাঁহার অজ্ঞাতসারে সে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল, তজ্জন্য তিরস্কার করিলেই কি যথেষ্ট হইত না? কিন্তু এই অপরাধে যদি সামান্য ভৃত্যের দ্বারা পিতা পুত্রকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাহাকে শাসন করিতে চাহেন, তবে হেমচন্দ্র সে শাসন মানিবে না। এতটুকু আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান কি তাহার নাই? এখন সে কচি খোকা নহে যে, শিশুর মত এখনও তাহাকে শাসন করিতে হইবে! ছি! এমন ঘৃণিত জীবন বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়! না—এ জীবনে সে আর পিতৃগৃহে প্রবেশ করিবে না।

দ্বারবান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা তাহার পশ্চাতে আলোকাধার হস্তে কালিদাস আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত দেখিয়া কঠোর-স্বরে বলিলেন, "দরোয়ান, আমার হুকুম এখনও শোন নাই কেন? দরজা বন্ধ কর। এরকম বেয়াদবি আর যেন কখনও না হয়।"

"হুজুর! হুজুর! আভি পানি গিরেগা। বাহারমে খোকাবাবু—"

"চোপ্‌রও। দরজা বন্ধ কর।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া কালিদাস স্বহস্তে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন।

প্রবলবেগে বারিধারা নামিয়া আসিল। অট্টহাস্যে বিজলী দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইয়া হেমচন্দ্র রাজপথে উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইল। হেমচন্দ্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ তাহার অন্তরের সমস্ত বন্ধন কোন নিষ্ঠুর দৈত্য যেন সবলে ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল।

অন্তঃপুর হইতে রাজপথে আসিবার আর একটি দরজা ছিল। হেমচন্দ্র সেখানে আসিয়া দেখিল লণ্ঠনহস্তে তাহার জননী দাঁড়াইয়া; তাঁহার দুই-গণ্ড বহিয়া স্রোতধারা ঝরিতেছিল।

মাতা অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা হেম, চুপি চুপি আয় বাবা, কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।"

উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া শুষ্ককণ্ঠে হেমচন্দ্র বলিল, "কোথায় যাব মা? যেখানে মাথা-উঁচু করিয়া যাইবার অধিকার নাই, চোরের মত সেখানে যাইব না। বাবা আমায় দরোয়ানকে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমাদের হেম নেই।"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে জননী বলিলেন, "কোথায় যাস্‌ বাবা! তোর জন্য যে আজ আমি কত রকম খাবার তৈরি করে রেখেছি!"

অন্যদিন হইলে হেমচন্দ্র কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত; কিন্তু আজ তাহার নয়নের সমস্ত অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "নরুকে দিও মা! সেই তোমায় সান্ত্বনা দিবে। আমি কখনও তোমাদের সুখী করিতে পারি নাই। আমার কথা ভুলিয়া যাও।"

উন্মত্তের ন্যায় বেগে হেমচন্দ্র অন্ধকাররাশির মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

( ৫ )

সারারাত্রি ধরিয়া প্রবল ধারাপাত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য হেমচন্দ্র কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিল না। তাহার মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। অবিশ্রান্ত বারিপাতেও সে অগ্নি নিভিল না। কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবার চিন্তা একবারও হেমচন্দ্রের হৃদয়ে স্থান পাইল না। কলিকাতায় তাহার আত্মীয়স্বজনের একান্ত অভাব ছিল না; কিন্তু কাহারও অনুগ্রহ-ভাজন হইবার বিন্দুমাত্রও বাসনা তাহার ছিল না।

হেমচন্দ্রের শরীর কোনওকালে ব্যায়ামপুষ্ট ছিল না। ব্যায়াম করিলে লোকে গুণ্ডামি শিখে, কালিদাসের এই ধারণা ছিল; এজন্য পুত্রকে তিনি অতি সাবধানে ব্যায়ামের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সারারজনী জাগিয়া ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া, হেমচন্দ্রের দুর্ব্বল শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু মানসিক উত্তেজনার প্রাবল্যবশতঃ এতক্ষণ সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন মস্তিষ্ক শ্রান্ত হইয়া আসিল, তখন প্রকৃতির প্রভাব তাহার শরীরে কার্য্য করিতে লাগিল।

সে আর চলিতে পারে না। সমস্তদেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল পা আর উঠে না। অত্যন্ত শ্রান্তভাবে সে সন্নিহিত কোনও অট্টালিকার বাহিরের রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি থামিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বগগনে উষার প্রথম দীপ্তি দেখা যাইতেছিল।

হেমচন্দ্র বুঝিল, তাহার সমস্ত শরীরের মধ্য হইতে একটা অসহ্য উত্তাপ বাহির হইতেছে; চক্ষে এবং কর্ণে অত্যন্ত জ্বালা; দেহ টলিতেছে; সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে প্রাচীরে দেহভার রক্ষা করিয়া সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ সে সেই ভাবে ছিল, তাহা সে জানে না। সম্ভবতঃ সে চৈতন্য হারাইয়াছিল। অকস্মাৎ কাহার হস্তভাড়নে সে চাহিয়া দেখিল। আর্দ্র রোয়াকের উপর কখন সে হতচেতন অবস্থায় শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না। হেম তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

যে তাহার দেহে করস্পর্শ করিয়াছিল, সে সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "এ কে, হেম? তুমি এখানে, এ অবস্থায়?"

হেমচন্দ্র দেখিল প্রশ্নকারী তাহারই জনৈক সহপাঠী; কাল রাত্রিকালে যাহাদের সহিত অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল, তাহাদেরই অন্যতম।

ক্লান্তস্বরে সে বলিল, "আমার শরীর বড় অসুস্থ, কাল সারারাত জলে ভিজিয়াছি। একটু আশ্রয়—"

সহপাঠী হেমচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ব্যাপার কতকটা অনুমান করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি ডাকিল, "বাবা, একবার এদিকে আসুন?"

জনৈক প্রৌঢ় বাহিরে আসিলেন। পুত্র পিতাকে হেমচন্দ্রের পীড়িত অবস্থার কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল। প্রৌঢ় তখনই হেমচন্দ্রকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; বলিলেন, "সারারাত জলে ভিজেছ বাবা! ছিঃ, আমাদের এখানে এলেই হত। যাক্, এখন ভিতরে চল।"

পিতাপুত্রে হেমচন্দ্রকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া চলিলেন। বাহিরের বৈঠকখানাগৃহে হেমচন্দ্রের জন্য শয্যা রচিত হইল। সিক্তবস্ত্রের পরিবর্ত্তে শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া উভয়ে সযত্নে তাহাকে শয্যায় শায়িত করিলেন।

( ৬ )

শ্যালক রামজীবন পত্রখানি পড়িয়া ভগিনীপতির মুখের দিকে চাহিলেন; প্রশান্তভাবে দৃঢ়কণ্ঠে কালিদাস বলিলেন, "আমার এখানে তাহার স্থান নাই।

তোমার ভাগিনেয়, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। সে যদি মরিয়া যায়, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই। অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ সন্তান থাকা অপেক্ষা নিঃসন্তান হওয়াও উত্তম। তাহার জন্য এক কপর্দ্দকও আমি ব্যয় করিব না। রাগ করে চলে যাওয়া হলো; এতবড় স্পর্দ্ধা!"

কালিদাসের প্রকৃতি রামজীবনের অগোচর ছিল না; কিন্তু গৃহবিতাড়িত পুত্রের সাংঘাতিক অবস্থার কথা শুনিয়া পিতা এরূপ কঠোর হইতে পারেন, এরূপ পূর্ব্বে তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই। মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেও আশ্রয়দাতা ভগিনীপতির মুখের উপর তাঁহার ব্যবহারের সমালোচনা করিবার সম্ভাবনা রামজীবনের ছিল না। তিনি বলিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য তোমার কাছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নাই। তবে তোমার স্ত্রী অত্যন্ত কাঁদিতেছেন, পুত্রের এমন পীড়ার সংবাদে মার মন—"

বাধা দিয়া কালিদাস বলিলেন, "তোমার ভগিনীকে বলিও, যেরূপ হতভাগা সন্তান তিনি জঠরে ধারণ করেছেন, তা'তে সারাজীবনই তাঁকে চোখের জল ফেল্‌তে হবে। কিন্তু উপায় নাই। তিনি সে পুত্রের আর মুখদর্শন করিতে পাইবেন না। এই আমার শেষ আদেশ।"

কালিদাস দৃঢ়চরণে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামজীবন ভগিনীর সহিত দেখা করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রোরুদ্যমানা হেম-জননী বলিলেন "দাদা, আমার হেমকে একবার দেখাও। উঃ, সে না খেয়ে রাত্রিতে জলে ভিজে চলে গেছে!"

ভগিনীকে সান্ত্বনা দিয়া রামজীবন বলিলেন "জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে। এত চিন্তা কেন? তবে আপাততঃ হেমের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। কালিদাস যা বলেছেন, তার বিপরীত কিছু করা কঠিন। উপস্থিত একটু ধৈর্য্য ধরেই থাক। চিকিৎসা হলেই আরোগ্য হয়ে যাবে।"

হেমের জননী একটি পুটুলি ভ্রাতার হস্তে দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, হেম যেন অচিকিৎসায় না মারা যায়। এই পাঁচশতটাকা লও, যদি বেশী লাগে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। সাহেব ডাক্তার দেখিও। এ টাকা আমার নিজের।"

( ৭ )

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; একাদশ দিবসে ডাক্তার বলিলেন যে পীড়া সাংঘাতিক; এরূপ রোগে শতকরা একজনের বেশী বাঁচে না। বিশেষতঃ

রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ভাল নহে। রাত্রি নয়টার সময় হেমচন্দ্রের জ্ঞানসঞ্চার হইল। শিয়রে স্নেহময় মাতুলকে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মামা, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?"

মাতুল ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহাকে যে তিনি কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। নিজে তিনি অপুত্রক; ভাগিনেয়দিগকে বুকে করিয়াই তাঁহার দগ্ধহৃদয় শান্ত হইত। সেই স্নেহাধারকে মহাপ্রস্থানে পাঠাইয়া কিরূপে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন! জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পাষণ্ড পিতা একবারও পুত্রের কোন সংবাদ লইল না! গর্ভধারিণীর সহিতও জন্মের মত একবার দেখা করিতেও দিল না? ক্ষোভে, দুঃখে ও নিষ্ফল ক্রোধে রামজীবন আরও অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন। অশ্রুচিহ্ন গোপন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

"মামা!"

"কি বাবা?"

"আমি ত চলিলাম! কেঁদো না। বাবাকে বলো, তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। নিজে আমি তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারলাম না। সে দুঃখ এ যাত্রা র'য়ে গেল!"

হেমচন্দ্র ক্লান্তিজনিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। রামজীবন বলিলেন, "থাক্ বাবা, তুমি বেশী কথা বলো না। কষ্ট হবে।"

হেমচন্দ্র একটু ম্লান হাসি হাসিল। মৃদুস্বরে বলিল, "কষ্ট? না মামা, আর কষ্ট নেই। এখন বেশ আছি। আর কতক্ষণই বা! যা বলবার ছিল, এইবেলা বলে যাই! আর ত সময় পাব না, মামাবাবু!"

রোগী আবার কিয়ৎকাল ক্লান্তভাবে নেত্র-নিমীলিত করিল। তারপর সহসা ঈষৎ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "বাবাকে বলবে, মামাবাবু, আমি তাঁর বিদ্রোহী সন্তান। যদি এই বিশবৎসরের মধ্যে একদিনও তিনি একটু স্নেহ দেখাইতেন, শুধু কঠোর শাসন ও তিরস্কারের পরিবর্ত্তে যদি একবারও মিষ্টভাবে ডাকিতেন, মামাবাবু, তা হ'লে হেমচন্দ্র অধঃপাতে যেতো না। তার জীবন অন্য রকম হতো।"

হেমচন্দ্র আবার থামিল। দুই চারি মুহূর্ত্ত পরে সে বলিল, "আমি তাঁরই সন্তান। সুতরাং আমার প্রকৃতি তাঁরই মত দুর্দ্দমনীয়। অতিরিক্ত শাসনে বাঁধন ছিঁড়িয়াছিল। বাবাকে বলো, আমায় যেন ক্ষমা করেন। আরও বলো,

নরুকে যেন আমার মত করে না গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা পান। একটু স্নেহমমতা যেন সে পায়। অতিরিক্ত শাসনে আমার মত দুর্দ্দশা যেন তার না হয়। আর মা—দেখা হলো না—প্রণাম নিও। মামা, তুমিও নিও!”

ক্লান্তভাবে হেমচন্দ্র শয্যায় পড়িয়া রহিল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী-পরীক্ষান্তে মুখ বিকৃত করিলেন।

মুমূর্ষুর আননে অপরিচিত রাজ্যের ছায়া যেন নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। পরলোকের অগ্র-দূত তাহার কর্ণে কোন্ মন্ত্র দান করিতেছিল?

( ৮ )

রুক্ষ-মূর্ত্তি, শুষ্ককেশ শ্যালককে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া কালিদাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। স্থির কণ্ঠে বলিলেন, “তুমি যাহা বলিতে আসিয়াছ, অনায়াসে বলিতে পার। তুমি না বলিতেই বুঝিয়াছি। বলিয়া ফেল, শুনিলে আমার মূর্চ্ছিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।”

এমন পাষাণ, এমন হৃদয়-হীন,নিষ্ঠুর,বিধাতার সৃষ্ট জীব থাকিতে পারে কি? রামজীবনের হৃদয়ে বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, “তুমি পাষাণ তাহা জানিতাম, কিন্তু এত কঠোর তাহা ভাবি নাই। হেম মরিয়াছে—বাঁচিয়াছে।” প্রৌঢ় রামজীবনের স্বর কম্পিত হইল।

কিন্তু কালিদাস গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তারপর?”

রামজীবন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা সে ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, “সে ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে। আর তাহার শেষ অনুরোধ এই যে, তাহার ছোট ভাই নির্ম্মলকে তাহার মত অমন নির্দ্দয় পীড়ন করিও না। যদি পাষাণে স্নেহকণা থাকা সম্ভব হয়, তবে সেটুকু তাহাকে দিও। তাহা হইলে সে অকালে মরিবে না। হয় ত মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।”

কালিদাসের মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ সহজস্বরে বলিলেন, “আর কিছু আছে?”

পার্শ্বস্থ কক্ষে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কালিদাস বলিলেন, “যাহাদের কাঁদিবার ইচ্ছা থাকে, বাড়ীর ভিতরে গিয়া কাঁদুক। আমার কাণের কাছে ওসব ভাল লাগে না।”

ক্রন্দনধ্বনি দূরে সরিয়া গেল।

এমনসময় দ্বারপথে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখা গেল। কালিদাস বলিলেন, “কে?—মাষ্টার মহাশয়! আসুন।”

"আজ্ঞা হাঁ।" বলিয়া হেমচন্দ্রের গৃহ-শিক্ষক ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

"কাল বাড়ী হইতে আসিয়াছি! কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই। একটা সুসংবাদ আছে, তাই তাড়াতাড়ি আজ আসিলাম। হেমচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছে। হেড্ মাষ্টার বলিলেন, তিনি সংবাদ লইয়াছেন, অঙ্কে সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বোধ হয় জলপানি পাইবে। হেম কোথায়?"

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ, বালক নির্ম্মল, দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "দাদা নেই, মাষ্টার মশায়!"

কালিদাস কঠোরস্বরে বলিলেন, "নিরু, তুই ওখানে কি কচ্ছিস্?"

অন্তঃপুর হইতে চাপা-কণ্ঠে মর্ম্মান্তিক শোকের করুণধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। মাষ্টার মহাশয় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নয়নে দুইবিন্দু অশ্রু উদ্গত হইল। তিনি বাতায়ন-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া রুমালে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। হেমচন্দ্রকে তিনি যে আট বৎসর পড়াইয়াছেন! এত শীঘ্র, এত অতর্কিত ভাবে সে চলিয়া গেল!

শোকের গাঢ়ছায়া কক্ষমধ্যে ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু বিদ্রোহী সন্তানের বিয়োগে কালিদাসের বহিরিন্দ্রিয়ে তাহার বিন্দুমাত্র প্রভাব দেখা গেল না।

কে বলে শোক দুর্জ্জয়? পুত্রশোক অনতিক্রমনীয়?

* * * * *

কিন্তু পুত্রশোকাতুরা জননী নিশীথ রজনীতে বাতায়ন খুলিয়া নিস্তব্ধ আকাশপানে চাহিয়া যখন অপহৃত সন্তানের জন্য অলক্ষ্য-দেবতার চরণে শোকাশ্রু নিবেদন করিতেন, তখনই তিনি দেখিতে পাইতেন দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ মুক্ত-ছাদে পাদচারণ করিতেছেন। এক একবার হেমচন্দ্রের শূন্য প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইতেন। তারপর আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া যাইতেন। সে পরিক্রমণের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। রাজপথের উজ্জ্বল গ্যাসের আলোক-রশ্মি তাঁহার শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত করিত। নয়নকোণে মুক্তাবিন্দু ঝরিত কি না, তাহার ইতিহাস অন্যে না জানিলেও, শোকক্লিষ্টা জননীর দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করে নাই। আকাশে বদ্ধ-দৃষ্টি বৃদ্ধের অন্তরতলে শো-
সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইত কি না, তাহা অন্তর্য্যামীই জানিতেন। কিন্তু
যে, তিনি নক্ষত্রালোকিত আকাশতলে, জনশূন্য ছাদে পাদচারণ ক
শব্দ—নিম্নতলে অবস্থিত ভৃত্যবর্গেরও অবিদিত ছিল না; কার
পদশব্দে প্রায়ই তাহাদের অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইত।

শ্রীসরোজন

# শরৎ-লক্ষ্মী।

এস কল্যাণী শরৎ-লক্ষ্মি,
এস এস অয়ি শোভনে!
বরষার বারিধারায় নাহিয়া,
স্বচ্ছ মেঘের তরণী বাহিয়া,
এস, নামি এস ভুবনে!
এস নির্ম্মল মুক্ত-আকাশে,
তরুণ ঊষার আলোক-বিকাশে,
শান্ত শীতল পবনে।

এস রঞ্জিয়া প্রান্তর-বন
গলিত স্বর্ণ-বরণে,
এস ফুলে-ঢাকা শেফালির মূলে,
জলে ছল-ছল সরসীর কূলে,
কাশের শুভ্র-শয়নে।
এস প্রস্ফুট কুমুদ-কমলে,
শিশির-সিক্ত নবতৃণদলে
এস গো অরুণ চরণে।

এস পুষ্পিত মালতী-বিতানে
নিভৃত মিলন-স্বপনে,
শস্য-শ্যামল ধরার আঁচলে,
এস পল্লব-ঘন তরুতলে,
ফুল্ল কপোত-কূজনে।
এস গো রৌদ্র-ছায়ার খেলায়,
চঞ্চল চখা-চখীর মেলায়
নদীর পুলিনে-বিজনে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

# কাব্য ও সমালোচনা *

"তুমি পার্‌বে না'ক ফোটাতে !
যতই মার, যতই ধর,
যতই জোরে আঘাত কর
বোঁটাতে !
তুমি পার্‌বে না'ক ফোটাতে।"

কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে এই যে কুসুমের বিকাশ, নদীর প্রবাহ, বায়ুর হিল্লোল প্রভৃতির তুলনা করা হয়, তাহার যাথার্থ্য আমরা সম্পূর্ণরূপে মানি না বলিয়াই কাব্যে ও সমালোচনায় চিরকাল একটা জোরাজুরি চলিয়া আসিতেছে। কাব্য যদি বাস্তবিক এমন একটি নৈসর্গিক সৃষ্টি হয়, তবে বাহ্যজগতে ও বিজ্ঞানে যেমন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, কাব্যে ও সমালোচনায়ও তেমন একটা আপোস-নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। নিউটনের আইনে আতাফল ঊর্দ্ধেও যায় না, অধঃতেও পড়ে না। দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু একটি অম্লজানের পরমাণুর সঙ্গে ডাল্‌টনের নিয়মের জোরেই মিশিয়া থাকে না। বিজ্ঞান তাহা জানে বলিয়াই সে কেবল বাহ্য-জগতের দ্রষ্টা ও বোদ্ধা—ইহার বেশী আর কিছু সে হইতে চায় না। সমালোচনা কিন্তু সাহিত্য-সম্বন্ধে আরও কিছু বেশী দাবী করে—এবং তাহা নিতান্ত খামখেয়ালি দাবী নয়। বিজ্ঞানের নিয়মগুলি মানুষের মনের ক্রিয়ার ফল। মানুষের মন জড়জগতের গতি ও স্থিতি একটুও বদ্‌লাইতে পারে না। কাজেই বিজ্ঞানের নিয়ম গভর্ণমেণ্টের আইন বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিতেও পারে না; কিন্তু মানুষের মনের উপর মানুষের মনের ক্রিয়া মানস-জগতের চিরন্তন ব্যাপার। সাহিত্য যে মানব-মনের অভিব্যক্তি, সমালোচনাও তাহারই ক্রিয়া—এই হিসাবে সমদেশীয়তা-হেতু সাহিত্য ও সমালোচনার পরস্পর প্রভাব অসম্ভব কিছুই নয়। কিন্তু এই প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত, তাহাই একবার বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

"মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হ'য়ে কেন ফোটে না,
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেনরে
বাঁশী হ'য়ে বেজে ওঠে না ?"—

* সাহিত্য-সঙ্ঘের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

ক. . . . . . প্রশ্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ-বেদনার আভাস দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাব্যবিকাশপদ্ধতির ইঙ্গিত রহিয়াছে। যে মর্ম্মবেদন ও দীর্ণ হৃদয় 'লিরিকে'র মূলে, তাহা স্বতঃই মূর্ত্তিমান্ হয় না—তাহা স্তরে স্তরে গড়িয়া কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কালিদাস বাল্মীকির কথা বলিতে বলিয়াছেন—'শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।' এই আদিকবির জীবন সম্বন্ধে করুণ কিংবদন্তীটি রূপকভাবে গ্রহণ করিয়া কবি যেন শোক কি করিয়া শ্লোকত্ব পায়, এই অপূর্ব্ব মানস-পদ্ধতির গূঢ় আভাস দিয়াছেন। এই মানসপদ্ধতি কিছু বুঝিয়া দেখিলেই কাব্যে ও সমালোচনায় অনেকটা গোলযোগ কাটিয়া যায়।

শুধু কবির জীবনের নহে, মানুষমাত্রেরই জীবনের বিশেষত্বটুকু এই যে, ইহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। দিনের ও সংসারের কাজ জীবনের যে অংশটুকু গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছাড়াইয়া আরও কত শত অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয় ভাব সন্ধ্যাসূর্য্যের চারিদিকের মেঘমালার মত আমাদের কর্ম্মজীবনের চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে! এই কথাটি স্বীকার করিয়া একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছিলেন—দেখ, যখন আমরা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করি, তখন কোথা হইতে একটি কুসুমের মূর্ত্তি, সূর্য্যাস্তের একটু ছায়া, ইউরিপিডিসের কোন কোরাসের শেষাংশ জীবনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। এইখানেই সকল কাব্যের নিগূঢ় বীজ লুকাইয়া আছে। বাহির হইতে কবির অপূর্ব্ব 'মেঘদূত' দেখিতেছি। কিন্তু কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে কালিদাসের মনে এই কাব্যের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহার প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করা চলে না। হয়ত, রবীন্দ্রনাথ যেমন কল্পনা করিয়াছেন, সেদিন উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মেঘমালা এলাইয়া পড়িয়াছিল—হয়ত, সেদিন কবির প্রিয়াও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না। হয়ত দান্তের কোন দিন ইচ্ছা হইয়াছিল যে, স্বর্গতা প্রিয়ার সঙ্গে যখন দৈহিক সম্বন্ধ শেষ হইল, তখন অদৃশ্য-জগৎ-কল্পনার মধ্য দিয়া তাহার সঙ্গে একটা গাঢ়তর মানস-সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে। এই সকল অস্ফুট, অনির্ব্বচনীয়, অন্তরতম, আশা, নিরাশা, আকাঙ্খা, সুখ ও দুঃখগুলি বিশ্বমানবহৃদয়েরই সাধারণ ভাব। এই ভাবজগতেই কাব্যসৃষ্টির আরম্ভ। এই ভাবরাশি ব্যাকুল হইয়া মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিতে চায়, অন্তর্নিহিত উৎসাহে ঘনাইয়া উঠে, ছায়ারেখাগুলি স্ফুট হইতে স্ফুটতর ছবিতে জাগিয়া উঠিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কবি তাই প্রশ্ন করেন—'দীর্ণ হৃদয় আপনি কেনরে বাঁশী হ'য়ে বেজে ওঠে না?'

কিন্তু এই বিশ্বমানবহৃদয়ের অসম্পূর্ণতা ও চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি—এই মেঘ-

মালার মত আকারহীন ভাবগুলি, কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া ঘনাইয়া উঠিবে, তাহা দেশ, কাল ও পাত্রের উপরই নির্ভর করে। একযুগে যে রাম-সীতার করুণ-কাহিনী কুশীলবগণের মুখে ঘরে ঘরে সংসদে সংসদে গাথারূপে ভাসিয়া বেড়াইত, পরবর্ত্তিকালে তাহাই আবার কালপ্রভাবে মহাকাব্য রামায়ণ হইয়া ফুটিয়াছে। অবশেষে তাহাই আবার নানা কবির মনের নানা রং মাখাইয়া সহস্র গীতিকবিতায় পরিণত হইয়াছে। এই বিভিন্ন কাব্য-প্রকাশের প্রণালী কাব্যজগতের যুগধর্ম্মের পরিচায়ক। এলিজাবেথের যুগের নাট্য-সাহিত্য, আর ভিক্টোরিয়ার যুগের উপন্যাস-সাহিত্য—এই দুই কি কেবল কাব্যের মূর্ত্তিপরিবর্ত্তন বলিয়া মনে হয় না? আমাদের দেশে যে ভাবটি যে ভাবে ফুটিবে, ভিন্ন দেশে তাহা হইবে না। আমার হৃদয়ের ভাব যে প্রকাশের পন্থা খুঁজিয়া বেড়ায়, অন্যের হৃদয়ের সেই ভাবটিই হয়ত ভিন্ন-পথান্বেষী। এই যে ভাবরাশি নানাভাবে ঘনাইয়া উঠে—মহাকাব্যের গম্ভীর ভঙ্গীতে, নাটকের জীবন্ত গতিতে, গীতি-কবিতার বিদ্যুৎ-চমকে, উপন্যাসের গভীর হৃদয়ানুসন্ধানে—তাহার মনোরাসায়নিক ক্রিয়া বাহির করা সকল সময়ে সম্ভবে না। ভাবের এই আকৃতিগঠনে ব্যক্তিত্বই প্রবল—যে ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়াছে জাতি, বংশ, কাল ও শিক্ষা এবং তাহার সঙ্গে অদৃষ্ট বলিয়া একটি অজানা শক্তির প্রভাব। আরও—আমার ধাত্ একটু সহজ-কোমল—আমার ভাব শেলীর লিরিকের মত গলিয়া গলিয়া ঘনাইয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। হয়ত, আমার ধাত্ আর একটু কঠিন ও জটিল—আমার ভাব মিল্টনের মহাকাব্যের মত কটি-বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সচেষ্ট হইতেছে; কিন্তু মানবহৃদয়ের সাধারণ ভাব, যাহা ব্যক্তিত্বের তেজে কবির মনে স্বতন্ত্রমূর্ত্তি ধরিল, সে কোন্ রূপে ও পরিচ্ছদে সাহিত্য-জগতে বাহির হইয়া আসিবে?

এই পরিচ্ছদ লইয়াই যত গোলযোগ। এই পরিচ্ছদ লইয়াই কাব্যের প্রধান সমালোচনা। যথা—এই কাব্যের গায়ের জামা একটু ঢিলা হইয়াছে, অর্থাৎ ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য নাই ইহার পরিচ্ছদ নিতান্তই ছিন্ন ও মলিন, অর্থাৎ ভাবাভঙ্গী ভ্রমপূর্ণ ও নিস্তেজ; এখানে জামা একটু বেশী লম্বা হইয়াছে, অর্থাৎ কাব্যের আতিশয্য-দোষ হইয়াছে। কিন্তু ভাষা, ভঙ্গী, ইত্যাদি হইতে পৃথক্ যে ভাবটি বিকশিত হইয়াছে—তাহা জীবনের অভিব্যক্তি, জীবনের নিয়মে গড়িয়াছে। বিজ্ঞান যেমন বাহ্যজগতের খুঁৎ ধরিবার চেষ্টা করে না, আতাফলকে উর্দ্ধে যাইতে বলে না, কিংবা সূর্য্যকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে বলে না, কেবল বাহ্যপ্রকাশের নিয়মটিই লক্ষ্য করে, সেইরূপ বাহ্য বা দৃশ্যমান্ রূপ হইতে পৃথক্

এই মূর্ত্তিমান্ ভাবটিকে সমালোচক কোনরূপ শাসনে আনিতে পারেন না। শুধু তাহার বিকাশ লক্ষ্য ও সমালোচনা করিতে পারেন। তাহার পর এই যে কাব্যে প্রকাশ-ভঙ্গী বা পরিচ্ছদের কথা বলিতেছিলাম, তাহাতেই বা সমালোচকের কতটুকু শাসনক্ষমতা? অস্রস্তবসন শিশু, সন্ন্যাসী বা ভাবোন্মাদকে কোন বিজ্ঞব্যক্তি শাসন করিতে যায় না; কারণ তাহার মধ্যে আমরা একটা সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করি। সেই রকম যে কাব্য নিজের তেজে পরিচ্ছদ-পারিপাট্য সরাইয়া দিয়া একেবারে আশাসিত সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহা সমালোচনার বেত্রাঘাতের উপযুক্ত নয়।

তবে কথাটা দাঁড়াইল এই—যে কাব্য তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতেছে,—যথা প্রথম, মানব-হৃদয়ের সাধারণ ভাবোন্মেষ। ইহা বাস্তবিকই নৈসর্গিক। সেই কুসুমের বিকাশ, নদীর প্রবাহ বা বায়ুর হিল্লোলের মতই নৈসর্গিক। ইহা কাহারও শাসন মানে না; যাহার হৃদয়, তাহারও শাসন মানে না। ইহাতে স্বাতন্ত্র্য নাই, ব্যক্তিত্বের চিহ্নমাত্রও নাই, দেশ ও কালের কোন ছায়াই নাই। যে বিরহ একদিন কালিদাসের হৃদয় কাঁদাইয়া তুলিয়াছিল, আমাকেও তাহা কাঁদাইবে, লক্ষ বৎসর পরেও তাহা তেমনিই ব্যাকুল ও মুখর হইয়া উঠিবে। গ্রীক 'আর্ণের' উপর কবি যে ছবি দেখিয়াছিলেন—যে প্রেমিক প্রেমিকার মুখচুম্বন করিতে গিয়া শিল্পীর চাতুর্য্যে চিরদিনের মত অচল দাঁড়াইয়া আছে—তাহাই এই কাব্যের মূলীভূত ভাবরাশির রূপক। দ্বিতীয় স্তর—এই মানবহৃদয়ের সাধারণ ভাবরাশির স্বাতন্ত্র্যলাভ। এইখানে ব্যক্তিত্বের প্রভাব অব্যাহত; কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব কেবল এই ভাবরাশিকে একটি স্বতন্ত্র আকৃতির মধ্যে ঘনাইয়া আনিতে পারে। এই পদ্ধতির উপর দেশ ও কাল অলক্ষ্য-প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে,—ব্যক্তিত্বও আপনার ক্রিয়ায় সে প্রভাব ছাড়াইয়া যাইতে পারে না,—অলক্ষ্য গ্রহের influenceএর মত তাহা দূর হইতে আকর্ষণ করিতেছে। তৃতীয় স্তর—এই মূর্ত্ত ভাবরাশির ভাষার ভঙ্গিমায় প্রকাশলাভ। যেমন এপিকের নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গী, নাটকের অঙ্কপরিচ্ছেদরক্ষা, লিরিকের, ছন্দো-বন্ধন, ইত্যাদি। এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়া কাব্য সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্য-বিকাশের ঠিক এই তৃতীয় স্তরে সমালোচকের শাসন। কিন্তু সেখানেও তাহার শাসন পূর্ণমাত্রায় নয়। কারণ যে সকল কাব্য আপন নির্ভীকতেজে ও অন্তরের উৎসাহে এই তৃতীয় স্তরে শিশুর মত কিংবা ভাবোন্মত্তের

মত জাঁকিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহাকে আর শাসন করা চলে না। কেবল যাহার অতটা তেজ নাই, সে-ই সমালোচকের শাসনের কাছে মাথা নত করিবে। এই সমালোচনার বাধ্য স্বল্পতেজ কাব্যকে বিদ্রূপ করিয়া সমালোচনার অতীত স্বতন্ত্র সতেজ কাব্য বলিয়া থাকে—

তুমি পার্‌বে না'ক ফোটাতে!
যত মার, যতই ধর
যতই জোরে আঘাত কর;
বোঁটাতে;
তুমি পারবে না'ক ফোটাতে!

অর্থাৎ—আপন তেজে জাঁকিয়া দাঁড়াও। নিয়মে যতই বদ্ধ কর, এমন কাব্য তুমি রচনা করিতে পারিবে না, যাহা বনের ফুলের মত সমালোচনার শাসনের অতীত হইবে।

শ্রীসুকুমার দত্ত

# আগমনী

অই যে আমার মায়ের হাসি
উথলে যেন সুধার রাশি—
আকাশ-ভরা চন্দ্রিকায়,
মালতী আর শেফালিকায়;
অই যে মায়ের চরণ-আভা শতদলে ফুটেরে!
অই যে সোণার ধানের ক্ষেতে
কে রেখেছে আঁচল পেতে,
আমার মায়ের চরণধূলি নিবে বলি' লুটে রে।

মায়ের পূজার গঙ্গাজল
কূল ছাপিয়ে ছল-ছল,
আদর পাবে অপরাজিতা,
তাই সে আজি প্রস্ফুটিতা,
মায়ের চরণ পাবে ব'লে জবার মুখে হাসি রে!

লক্ষ তারায় দীপের মালা
মায়ের সন্ধ্যারতি জ্বালা,
মায়ের পূজার অর্ঘ্য করা শরত-শোভা-রাশিরে !

অই যে ধবল কাশের ফুলে
মায়ের আমার চামর দুলে ;
নীলাকাশে দুধের ধারায়
ছায়াপথটি গড়া তারায়,
অই পথে মা, তোমার আশায় ধরা আছে চাহি রে !
উষার আলো সোণার-বরণ ,
মায়ের রূপটি চিত্ত-হরণ—
নয়ন ভরে দেখিতে চাই—মীনের আঁখি নাহি রে।

আয় মা আমার হৃদয়মাঝে,
বিদায় দিয়ে সকল কাজে,
তোমার দুটি চরণ ধরি'
ফুলের মত লুটিয়ে পড়ি ;
ভিজিয়ে দিয়ে রাঙা চরণ—নয়নজলে ভাসি রে ;
দুঃখ-সুখের ঘূর্ণিপাকে,
প্রাণ যে আমার ত্রাহি ডাকে,
ভয়ের মাঝে দেও মা, দেখা—মুখে অভয় হাসি রে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

# পঞ্চম পক্ষ।

( ১ )

উপর্য্যুপরি চারিটি পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করায় বৃদ্ধ গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনে ভয়ঙ্কর বৈরাগ্য-সঞ্চার হইল। সংসার মায়াময় ও অনিত্য, এবং অন্তিমে জাহ্নবীজলে তনুত্যাগই পারলৌকিক সুখের একমাত্র উপায়—বহু শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি আলোচনার পর এ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল কাশীধামে বাস করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গের কোনও ক্ষুদ্র গ্রামে। এই গ্রামখানি তাঁহার জমীদারীভুক্ত। তাঁহার জমীদারীর আয় বার্ষিক ছয় হাজার টাকার কম নহে। সংসারে তাঁহার নিজের বলিতে কেহই ছিল না। কয়েকক্রোশ দূরে তাঁহার ভগিনীর বাড়ী। ভগিনীর অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না; দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া তাঁহার ভগিনী অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু জমীদার-ভ্রাতার নিকট তিনি কখন কোনও প্রকার সাহায্য পান নাই। তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয় কখন কখন মাতুলগৃহে আসিত, কিন্তু সেখানে অশনবসনের ব্যবস্থা ও মাতুলের ব্যবহার দেখিয়া মাতুলালয়ে আসিবার জন্য তাহাদের আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দূরসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী কখন কখন কাকার বাড়ী আসিয়া পিতৃব্যের তত্ত্বতল্লাস লইত বটে; কিন্তু চক্রবর্ত্তীর ধারণা ছিল—তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার সম্পত্তি হস্তগত করিবার ফন্দীতেই বাপাজীবন তাঁহার কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিতে আসেন।—সুতরাং এই ভাইপোটিকেও তিনি বড় আমোল দিতেন না। চতুর্থপত্নীর বিয়োগের পর ক্রমে দেড়বৎসর চলিয়া গেল। গৃহে এক বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন, তিনিই চক্রবর্ত্তীকে দু'বেলা দুটি রাঁধিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন পরিবারে একটি ব্রাহ্মণসন্তান ও একটি ভৃত্য ছিল। ব্রাহ্মণটির নাম ভজহরি; বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর। ভজহরিকে তাঁহার জুতাসিলাই হইতে চণ্ডীপাঠ সকলই করিতে হইত। ভজহরি তাঁহার দেওয়ান, গোমস্তা, মুহুরী এবং গৃহ-বিগ্রহের পুরোহিত,—একাধারে সকলই। ভজহরি তাঁহার স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইলেও বংশমর্য্যাদায় কিছু হীন ছিল। এজন্য তিনি ভজহরির সহিত একাসনে বসিতে কুণ্ঠিত হইতেন। ভৃত্য গোবৰ্দ্ধন ঘোষ তাঁহার পয়স্বিনী গাভীগুলির পরিচর্য্যা

করিত, হাট বাজার করিয়া আনিত, অবসরকালে তাঁহাকে তেল মাখাইয়া দিত, তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিত, আর গ্রীষ্মকালের রাত্রে পত্নীবিয়োগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া যখন তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া ছটফট করিতেন, তখন তাঁহাকে মাথার বাতাস দিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণের ব্যবস্থা করিত। চক্রবর্ত্তীর অহিফেনের মাত্র। ঘরে প্রত্যহ চারি পাঁচ সের দুধ হইত,—সেই দুগ্ধে ও সরে, ক্ষীর, ছানা ও ঘৃতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আফিংয়ের ধাত দিব্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বয়সেও তাঁহার শরীরের যেরূপ অবস্থা ছিল,—তাহাতে তাঁহার কেশকলাপ কাশক্ষেত্রে পরিণত না হইলে তিনি অনায়াসে যুবক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। কিন্তু ভৃত্য গোবর্দ্ধন—ওরফে গোবরা প্রতিদিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কম্বলকে নির্লোম করিতে সমর্থ হইত না। সুতরাং একদিন গোবর্দ্ধন কর্ত্তাকে বলিল, 'কর্ত্তা, কল্‌কেতায় এক শিশি কলপের জন্যে লিখে পাঠালে হয় না?"—চক্রবর্ত্তী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "চুলে আর কলপ দিয়ে কাকে ভোলাবো রে গোবরা?"

গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর পদসেবা করিতে করিতে বলিল, "এজ্ঞে কর্ত্তা, আপনার বয়সই বা কি? এ বয়সে সকলেই সংসারধর্ম্ম করচে। আমাদের দে-গাঁয়ের নরহরিবাবু তিনকুড়ি দশ বছর বয়সে সংসারধর্ম্ম করে পুত্তুরের মুখ দেখে স্বর্গে গিয়েছেন।—আপনিই কেবল 'কাশী যাব, কাশী যাব' করে অস্থির হয়ে উঠেছেন! —কাশী যে যেতে চাচ্ছেন, এই তালুকমুলুক, জোতজমি ভোগ করবে কে? আর ঘরে নিত্যি পাঁচ ছয় সের দুধ হচ্ছে, এই ক্ষীর সর ছানা মাখন ঘি দুধ—এ সকল ছেড়ে কাশীবাস করলে আপনার শরীর কয় দিন টিকবে?"

চক্রবর্ত্তীর নিদ্রাকর্ষণে ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি বলিলেন, "তবে কি তুই বলিস—বুড়োবয়সে আমি কাশী যাব না? ধর্ম্ম কর্ম্ম করবো না? বিষয়-বিষে চিরদিনই মত্ত থাক্‌বো?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "কর্ত্তা, আমি 'মুরুখ্‌খু' গোয়ালা; বয়স তিনকুড়ি পার না হলে আমরা সাবালক হইনে,—সকলেই একথা বলে।—আমি আপনাকে 'জ্ঞানে'র কথা কি বল্‌বো? তবে আপনি ছিচরণে রেখেছেন, ভালও বাসেন, —তাই অনেককেলে খানসামা আমি, জোর করে দুটো কথা বলি। আপনি এরই মধ্যি বুড়ো হয়ে গেলেন, কর্ত্তা! ঘরে নারায়ণ আছেন—ধর্ম্মকর্ম্মের কি বাকি রাখ্‌চেন কর্ত্তা! আর বিষয় যদি বিষই হবে, তবে 'অমত্ত' কি কর্ত্তা?— যে বেটাদের নুন্‌ আন্‌তে পান্‌তো ফুরোয়,—তারাই বিষয়কে বিষ মনে ক'রে;

লোটা-কোপ্‌নি নিয়ে কাশী গয়া মথুরা 'বিন্দাবনে' ভেসে পড়ুক! আপনি কর্ত্তা কোন্ দুঃখে কাশীবাস করতে যাবেন?"

চক্রবর্ত্তী সস্নেহে বলিলেন, "গোবরা, তুই বেটা গোবরে পদ্মফুল! তু গোয়ালার ছেলে বটে, কিন্তু তোর বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ; আর কথাগুলো ভা মিষ্টি!—তা আমি আজই ত আর কাশী যাচ্ছিনে। যা, তুই খাওয়াদাও কর গে!"

গোবর্দ্ধন সেদিন একটু সকালেই পদসেবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি —চক্রবর্ত্তী পাশফিরিয়া শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "দে-গাঁর নরহ সান্যাল সত্যই কি সত্তর বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া পুত্র মুখ দেখিয়াছিলেন?— আশ্চর্য্য কি! আমার বয়স ত এই সবে পঁয়ষট্টি। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে —আমার পরমায়ু পঁচানব্বুই বৎসর। তার মধ্যে যদি পাঁচটা বৎসর ছুট্‌বাদ দেওয় যায়,—পাপে পরমায়ুক্ষয় হয় কি না; আর মানুষের মধ্যে পাপী নয়ই বা কে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যা কথা বলিয়া নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল। ত যাক্, নব্বুই বৎসরও যদি বাঁচি, তবে এখনও পঁচিশ বৎসর! তাহলে বিশ বৎসর অনায়াসে বাড়ীতে থেকে যেতে পারি। কিন্তু খালিঘরে মন টেঁকে না যে বিশ বৎসর কাল একাকী বাস, বড়ই কঠিন! কি কুক্ষণেই কাশী যাইবার সঙ্ক মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল; যে 'ভেড়ো'র সঙ্গে দেখা হয় সে-ই বলে, 'ঠাকুর্দ্দা কবে কাশী যাওয়া স্থির করলেন?' মর বেটারা! আমি কাশী গেলে কি তোর আমার সম্পত্তির অংশ পাবি? গোবরা কথাটা নিতান্ত ভেমোগোয়ালার মত বে নি। নারায়ণ যা করেন হবে।"

( ২ )

দীর্ঘকাল চিন্তার পর চক্রবর্ত্তীর দৃঢ়বিশ্বাস হইল, আরও বিশ বৎসরকা তিনি নিশ্চয়ই বাঁচিবেন। দে-গাঁর নরহরি সান্যাল থুন্‌থুনে বুড়ো, লাঠিতে ভ করিয়া দুই চারি পা চলিতে হইলে লাঠি পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপে! সে য সত্তর বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া পুন্নাম নরকের দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া থাকে তবে তাঁহার এই পঁয়ষট্টি বৎসরের অপরাধ কি? তাঁহারও ত পুত্রমুখ দর্শনে সময় আছে। সত্য বটে, তিনি চারিটি গৃহিনীকে উপর্য্যুপরি পুন্নাম নরকে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু সে জন্য কি তিনি দায়ী? যাহারা বন্ধ্যা, যাহাদে অদৃষ্টে পুত্র-মুখ-দর্শন-সুখ নাই, তাহাদিগকে তিনি কিরূপে সে সুখ দা

করিবেন ? হয় ত তাঁহার "পঞ্চম সংসার" পুত্রবতী হইতে পারে ; তাহা হইলে তাঁহার বংশ বজায় থাকে, বিষয়-সম্পত্তিরও সদ্গতি হয়। এতটা সম্পত্তি পাঁচ-ভূতে লুটিয়া খাইবে, না হয় তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহা গ্রাস করিবে, ইহা অসহ্য ! ভগবান চারিজনকে দিয়া তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চমপক্ষের সাহায্যে তাঁহার আশা পূর্ণ করিবেন না, কে বলিল ? এই সকল চিন্তার ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িয়া চক্রবর্ত্তীর কাশীবাসের কল্পনা 'শিকায়' উঠিল। নিজের মুখে এমন একটা অসঙ্গত, উদ্ভট, অসার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন, নিজের অসংযত জিহ্বার উপর তাঁহার বিষম ক্রোধ হইল। তিনি মনে মনে ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন।

দুইদিন পরে মনোহরপুরের বিশ্বনাথ বিশ্বাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ করিতে আসিলেন।

বিশ্বনাথ কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "খুড়া মশায় আমাদের মস্ত মুরুব্বি, বিপদে-আপদে আপনি ভিন্ন আর কে আমাদের রক্ষা করবে ? আপনি ছিলেন, আমাদের কত সাহস-ভরসা ছিল ; এই দেখুন, ছেলেটার বিয়ে দিতে বসেছি, হাতে একটা পয়সা নেই ! ভাবলাম্, একখানা তমঃস্সুক লিখে দিয়ে খুড়োর কাছে হতে শতখানেক টাকা নিয়ে আসি। তা আপনি কাশীবাসী হবেন মনস্থ করেছেন, সে ভালই ; কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের ( উদ্দেশে প্রণাম ) চরণ দর্শন করবেন, গঙ্গাস্নান করবেন, এ বুড়োবয়সে কি আর আপনার মত লোকের সংসারাশ্রমে থাকা ভাল দেখায় ; খুব উত্তম সঙ্কল্প—"

চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সংসারাশ্রমে থাকা ভাল দেখাবে কেন ? বনবাস করা ভাল দেখায়! কে তোকে বল্‌লে, আমি কাশী যাব ? কেন, আমি কি মরতে বসেছি যে, কাশী না গেলে আমার চল্‌বে না ?"

ভাল কথায় উল্টা ফল হইবে, ইহা বিশ্বনাথ পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। সে ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "খুড়ো-মশায়, আপনি ক্ষাপ্পা হন কেন ? পাঁচজনে বলাবলি করচে—"

চক্রবর্ত্তী দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "কি বারবার খুড়ো খুড়ো কচ্ছিস্ ? তুই আমার দশবছরের বড়, আমাকে 'খুড়ো' বলে ছোকরা সাজতে চাস্ ? পাজী, বদমায়েস ! আমার কাছে টাকা ধার করতে এসেছেন। আমি যেন টাকার গাছ !—টাকা ফাকা এখনে কিছু হবে না ; যে বেটারা বলেছে, আমি কাশী যাচ্ছি—যা তাদের কাছে টাকা ধার করগে। তোদের

মত 'নেমকহারাম'কে আমি একটি আধলাও ধার দেব না। ভাত জোটে না, টাকা ধার করে ছেলের বিয়ে দেবে! আমি বুড়ো! যে সব বেটার বয়সের গাছপাথর নেই, তারাই আমাকে বুড়ো বলতে আসে! বেরো আমার বাড়ী থেকে, আমার বাড়ী বসে আমাকে গাল্?"

বিশ্বনাথ, চক্রবর্ত্তী খুড়োর এই আকস্মিক ক্রোধের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তাঁহার মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিল; কিন্তু এই অন্যায় তিরস্কার সে পরিপাক করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তা টাকা না দেন না দেবেন, এরকম গালাগালি করছেন কেন? আমি আপনার খাই না পরি যে, যা মুখে আস্‌চে তাই বলে গাল দিচ্ছেন! বুড়োকে বুড়ো বল্‌বো না ত কি খোকা বল্‌বো? আমি ওঁর দশবছরের বড়, বলতে লজ্জা করলো না? কাশী-বাসটা বড় কুকর্ম্ম কি না, তাই সে কথা বলায় ভারি অপরাধ হয়েছে! তুমি এমন কি পুণ্য করেছ যে, কাশীবাসী হবে? থাক্‌বে তুমি কইতনপুরের ভাগাড়ে, তোমার কেন—"

চক্রবর্ত্তী ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বেরো শালা, আমার বাড়ী থেকে! গোবরা, গোবরা, এই ক্যাওট শালাকে কাণ ধরে বাড়ীর বাইরে রেখে আয়।"

বিশ্বনাথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "জাত তুলোনা ঠাকুর, বামুন বলে তোমার মুখের মত জবাব দিই নি। তা যাচ্ছি, আমি নিজেই যাচ্ছি; গোবরা টোবরাকে আর ডাক্‌তে হবে না।"

অপমানিত বিশ্বনাথ ক্রোধে কম্পিতপদে চক্রবর্ত্তীর গৃহত্যাগ করিল এবং সেইদিনই সে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট করিল, বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কেহ তাহাকে বুড়া বলিলে ও তাহার কাশীবাসের কথা জিহ্বাগ্রে আনিলে তাহাকে কামড়াইতে আসিতেছে!

পরদিন রমানাথ সরকার বিঘাকয়েক জমী মৌরসী করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে চক্রবর্ত্তীর নিকট দরবার করিতে আসিল। রমানাথ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, চক্রবর্ত্তীর স্বগ্রামবাসী। তাহার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয় নাই; মুখখানি সদা-প্রফুল্ল; সুরসিক ও অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া গ্রামে তাহার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। রমানাথ চক্রবর্ত্তীর মনের ভাব সে কতকটা অনুমান করিতে পারিল। পাড়াগেঁয়ে হইলেও মনুষ্য-চরিত্রে তাহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল। সে চক্রবর্ত্তীর গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ধকারে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের সঙ্কল্প করিল। অন্যান্য দিন চক্রবর্ত্তীর

সহিত দেখা হইলে সে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিত, আজ সে অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল, "গোপীকান্ত ভায়া, বাড়ী আছ? ভায়ার আজকাল টিকি দেখাই ভার! তা 'যৌবন' কালে সকলেই টেরির বাহার দেখাতে চায়, টিকিফিকিগুলো গর-পছন্দ করে।"

চক্রবর্ত্তী এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "তা বুড়ো বলে কি এতই ঠাট্টা করতে হয়। হ্যা—হ্যা—তোমার সকল তাতেই রসিকতা!"

রমানাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া বলিল, "বুড়ো! বুড়ো তোমাকে কে বলে ভায়া! আমার বয়স সবে এই ঊনপঞ্চাশ, তুমি আমার সাত বছরের ছোট, তোমার অন্নপ্রাশনে বাবার সঙ্গে এসে ফলার করেছি, আজও তা মনে আছে। দুটা একটা দাঁত পড়লে, কি চুল পাক্‌লে যদি মানুষ বুড়ো হয় —তাহলে আমাদের জগন্নাথ ঠাকুরকেও ত বুড়ো বল্‌তে হয়। সাতাশ বছর বয়সে তার বিল্‌কুল চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। দাঁতও দুই তিন্‌টে পড়েছে; তা বলে কি তাকে বুড়ো বল্‌তে হবে? আর আমাদের ঐ 'কেঁড়ে' ঠাকুর—"

চক্রবর্ত্তী সহাস্যে বলিলেন, "কেঁড়ে ঠাকুরটা আবার কে?"

রমানাথ বলিল, "ঐযে—দূর হোগ্‌গে ছাই, নামটা মনে আস্‌চে, মুখে আস্‌চে না, তেলের 'কেঁড়ে' বল্‌লেই যে ক্ষেপে লাঠি নিয়ে তাড়া করে;—তাকেও কি বুড়ো বল্‌তে হবে?"

চক্রবর্ত্তী মহাখুসী হইয়া বলিলেন, "গোবরা, এক সিলিম তামাক দিয়ে গেলিনে?—আমি যে তামাক খাই, সেই তামাক দিস্‌—রমানাথ-দা আবার মোটা তামাক খেতে পারে না—বুঝেছ দাদা, যত বেটা বুড়ো আমাকে খুড়ো বলে ছোক্‌রা সাজতে চায়!

রমানাথ জলচৌকীর উপর 'গ্যাঁট' হইয়া বসিয়া বলিল, "ওটা বুড়োদের স্বভাব। কি বল্‌বো ভাই, যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে গুপি চক্রবর্ত্তী কাশী যাবে।—আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, বলি, কাশী যাবে সে কি দুঃখে? তার কি কাশীবাসী হবার বয়স হয়েছে?—আমার নিজের সহোদর ভাই হ'লে এতদিন তার বিয়ের যোগাড় করে ফেল্‌তাম; হলোই বা পঞ্চম পক্ষ! পঞ্চম পক্ষে কি কেউ বিয়েথাওয়া করে না? সেকালে কুলীনেরা যে দশ পনের গণ্ডা বিয়ে করতো!"

চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গোবরা, শীগ্‌গির তামাক আন্‌।"—তাহার পর রমানাথের মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া বলিল, "দেখ রমাই দাদা, এ গাঁয়ে আমার ব্যথার ব্যথী তুমি ভিন্ন আর কেউ নেই।"

রমানাথ দেখিল, অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ বৃথা হয় নাই; সে সোৎসাহে বলিল, "সে কথা আর কেন বল, ভাই! সব বেটা হিংসুক, কেউ কি পরের ভাল দেখ্‌তে পারে? বিশেষতঃ, ঐ যে তোমার গুণবান্ ভাইপোটি, সেই ত রটিয়েছে, কাকা এবার নিশ্চয়ই কাশীবাসী হবে।"

চক্রবর্ত্তী অধীরভাবে বলিলেন, "আর উনি আমার বুকে ব'সে দাড়ি উপড়োবেন!—আমার বিষয়সম্পত্তি ভোগ করবেন।—তা হচ্ছে না রমাই দাদা, তা হচ্ছে না। বলেছিলাম বটে একবার কাশী যাব, কিন্তু আর যাচ্ছি নে।"

রমানাথ বলিল, "তার চেয়ে এক কাজ কর না। ফস্ করে একটা বিয়ে করে ফেল। তোমার শরীরের বেশ জুত আছে। যদি কোন রকমে বংশ-রক্ষাটা করতে পার—তা হ'লে এক ঢিলে দুই পাখী মরবে। তোমার জ্ঞাতি-গুলোর আশায় ছাই পড়বে, আর তুমিও পুন্নাম-নরক থেকে উদ্ধারলাভ করে চোঁচা স্বর্গে পুষ্পকরথ চালিয়ে দেবে।"

চক্রবর্ত্তী এবার হাসিয়া ফেলিলেন; মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "কিন্তু কার এত সস্তা মেয়ে আছে যে, এই বুড়োকে কন্যা-সম্প্রদান করবে?"

রমানাথ বলিল, "ভায়া, নিজেই ধরা দিচ্ছ? বুড়ো তোমার কোন্ খানটায়? খবরদার, আর ও কথা মুখে এনো না।—মেয়ের অভাব কি?—যার বিস্তর তপস্যার জোর আছে, সেই তোমার গলায় মালা দেবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন. "মনের কথা টেনে বের করেছ দাদা! কি জান, একা কিছুই ভাল লাগে না। মনটা যেন খপ্ খপ্ করে। এক 'পাউলি' খাবার জলের জন্যে একপ্রহর উমেদারী করতে হয়। রাত্রে যখন বিছানায় শুই, তখন মনে হয় যেন কাঁটাবনে গড়াগড়ি দিচ্ছি,—

'পহিল বদরি সম'—

আঃ, চণ্ডীদাস ঠাকুর কি পদই লিখে গিয়েছে!"

রমানাথের ভিতরেও কবিত্বের অন্ধকূপ ছিল; সে সোৎসাহে বলিল, "রায় গুণাকর তার চেয়েও উচ্চ অঙ্গের কবি,—

"শিহরে কদম্ব-তরু, দাড়িম্ব বিদরে।"

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল, আপাততঃ যখন কাশীবাসের আবশ্যক নাই, এবং পূর্ব্ব-পুরুষগণ এক গণ্ডূষ জলের জন্য হা করিয়া চাহিয়া আছেন,—তখন একটা বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। রমানাথ ঘটকালীর ভার লইল।

বলা-বাহুল্য, সেইদিনই রমানাথের নামে জমী লেখাপড়া হইয়া গেল।

রমানাথ কাজ গুছাইয়া পথে আসিয়া বলিল, "বুড়ো বেটা—বিয়ের জন্যে ক্ষেপে উঠেছে! দীনবন্ধুর বিয়েপাগলা বুড়োর মত চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে একটা রতা-নাপ্‌তেকে চাপিয়ে, থোক্ কিছু টাকা মেরে নিতে পারলে মজা মন্দ হয় না।"

( ৩ )

কিন্তু গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী রমানাথকে ঘটকালী করিবার অবসর দিলেন না।

সেইদিন অপরাহ্নে চক্রবর্ত্তী একদলা অহিফেন উদরস্থ করিয়া, তাঁহার বৈঠকখানার ফরাসে বসিয়া, রূপার ফরসী সম্মুখে রাখিয়া মুদিতনেত্রে এক সিলিম 'অম্বুরী' তামাক পরিপাক করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে তখন সহস্র সহস্র কল্পনা গজাইয়া উঠিয়া, তাঁহাকে ক্ষীর-সমুদ্রে নাকানী-চুবানী খাওয়াইতেছিল; তাহার ফলে তাঁহার বদন-নিঃসৃত কুণ্ডলীকৃত ধূম পুঞ্জীভূত হইয়া শূন্যে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

ফরাসের নীচে একখানি ছেঁড়া কালিপড়া সতরঞ্চির উপর বসিয়া গোপী-কান্তের দেওয়ান ভজহরি জমা-খরচ লিখিতেছিল।

চক্রবর্ত্তী হঠাৎ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ডাকিলেন, "ভজ!"

ভজহরির ভাগ্যে এমন সস্নেহ সম্ভাষণ বড় দুর্লভ ছিল; সে কলমটা কাণে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "কি আজ্ঞে কচ্ছেন, কর্ত্তা!"

চক্রবর্ত্তী গাঢ়স্বরে বলিলেন, "উঠে এসে ফরাসের ঐ কোণটা ঘেঁসে বোস।—দেখ ভজ! আমি মনিব, তুমি চাকর; তুমি আমার সঙ্গে এক ফরাসে বস্‌তে পার না বটে, কিন্তু আমি তোমাকে 'স্নেহ' করি।—অন্য লোকের সাম্‌নে তুমি আমার ফরাসে বস্‌লে আমার মানের 'খর্ব্ব' হতে পারে; তা এখন ত এখানে কেউ নেই, তুমি অনায়াসে বস্‌তে পার। বুঝেছ ভজ, সংসারে বাস করতে গেলে নিজের মানসম্ভ্রমটা আগে দেখ্‌তে হয়।"

ভজহরি সুবোধ বালকের মত 'কর্ত্তা'র নির্দ্দেশ অনুসারে ফরাসের এক কোণ অধিকার করিয়া বসিল, নত মস্তকে বলিল; "আজ্ঞে কর্ত্তা, সে কথা ত সত্তি। আমার পূর্ব্ব-পুরুষের 'ভাগ্যি' যে আপনি আমাকে আপনার ফরাসে কখন কখন বস্‌তে দেন। তা শ্রীরামচন্দ্রও গুহক চাঁড়ালকে কোল দিয়াছিলেন।"

চক্রবর্ত্তী খুসী হইয়া বলিলেন, "বাহবা, ভজ, তুমি যে দেখ্‌চি শাস্ত্রও জান! বেশ বেশ; তা ও সকল কথা এখন যাক। আমি বল্‌ছিলাম কি, ঐ যে কি বলে ওর নাম—ঐ রমাই দা—লোকটা খুব ভাল, আমার হিতৈষীও বটে; অন্য

লোক হলে কি আর এমন সেরা-জমি মৌরসী করে দিই?—যাক্, রমাই দা আমাকে নাছোড় হয়ে ধরেছে; বলে, কাশী যখন যাওয়া হলো না, তখন একটা বিয়ে কর। দেখ দেখি ভজ, কি অন্যায় কথা!—আমার কি আর বিয়ে করবার বয়স আছে, না সেটা ভাল দেখায়?"

ভজ বলিল, "আপনি বল্‌ছেন কি কর্ত্তা? আপনার বিয়ের বয়স নেই, ত কার আছে?—ইচ্ছে করলে আপনি এখনও একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পারেন। আমার মামার বাড়ীর দেশে লাটু চাটুর্য্যে মস্ত কুলীন; সে বাহাত্তর বৎসর বয়সে তিন দিনে সাতটা বিয়ে করে। আপনার রাজার সংসার,—গিন্নির অভাবে যে খাঁ খাঁ করছে। গয়লারা তাদের গোয়াল খালি রাখে না, আর অপনার এ রাজপুরী খালি পড়ে রয়েছে! এক এক সময় আমার কান্না পায়। আহা, এতটা সম্পত্তি ভোগ করবার মানুষ নেই, বাপ-দাদাদের জল-গণ্ডুষের 'পিত্যেশা' নেই; একি কম আপ্‌শোষের কথা!"

চক্রবর্ত্তী পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, গোবরা বেটাও ঐ কথাই বল্‌ছিল। যারা আমার একটু টান্ টানে,—তারাই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছে। আমার কিন্তু আর বিয়ে-থাওয়া করতে ইচ্ছা নেই। চার চারটি গিন্নি গত হয়েছেন, বয়সও দুকুড়ি আড়াই কুড়ি পার হয়ে গেল—কেমন? এখন কি আর বুড়ো বয়সে চুড়োকর্ম্ম ভাল দেখায়?"

ভজ বলিল, "কর্ত্তা আপনি পঞ্চম সংসার করলে—এ দিগরের তাবৎ লোক খুসী হবে, তবে দুটো একটা হিংসুকের গা-জ্বালা করতে পারে বটে; সেই জন্যই আপনার আরও জিদ্ করে বিয়ে করা উচিত। চক্ শ্যামনগরের প্রজারা বল্‌ছিল, কর্ত্তা যদি বিয়ে করেন, ত আমরা ইংরাজী-বাজনা ও রসুনচৌকীর সমস্ত খরচ 'পড়তা' করে তুলে দেব।"

চক্রবর্ত্তী ফরসীর নলটা সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, " 'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ,' তা সকলেরই যখন ইচ্ছে—আমি একটা বিয়ে করি, তখন তোমাদের দশজনের মনঃক্ষুন্ন করা আমার ভাল দেখায় না। তা আমি বিয়ে করতে পারি—যদিস্যাৎ এমন একটি সুন্দরী 'সুলক্ষণাবতী' মেয়ে পাওয়া যায়—যার গর্ভে অবধারিত একটা পুত্র সন্তান হবার আশা আছে।"

ভজ বলিল, "আজ্ঞে, মেয়ের অভাব কি কর্ত্তা?—হুকুম করুন না, আমি এক হপ্তার মধ্যে পাঁচগণ্ডা কনে যোগাড় করে দিচ্ছি। আপনি বিয়ে করবেন শুনলে কত বেটা মেয়ে ঘাড়ে করে এনে আপনার দরজায় 'হত্যে' দেবে।—

তবে একটা গোলের কথা আছে বটে, কোন্‌টিকে বিয়ে করলে আপনি পুত্তুর সন্তানের মুখ দেখবেন, তা ঠাহর করা শক্ত।—আর শক্তই বা কি, আমার খোঁজে একটি মেয়ে আছে—'আচায্যি' ঠাকুর কুষ্টি তৈয়েরী করে বলেছেন—তার গর্ভে মহাধার্ম্মিক পুত্র জন্মাবে; সেই পুত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বটে, বটে! এমন মেয়ে তোমার খোঁজে আছে?—তা' সে মেয়েটীর বয়স কত?"

ভজ বলিল, "এই পোনেরতে পা দিয়েছে। সুপাত্রের অভাবে আজও মেয়েটির বিয়ে হয় নি।"

তিনি বলিলেন, "বটে, বটে! পনেরতে পা দিয়েছে!—ভজ, মেয়েটি দেখ্‌তে-শুন্‌তে কেমন হে!"

ভজ বলিল, "একেবারে পরী। লোকে বলে মেয়েটির জন্যে কত রাজপুত্র 'তপিস্যা' করছে! কিন্তু কর্ত্তা, আপনি আমাকে একটু 'সেঁহ' করেন বলেই বল্‌তে ভরসা করচি—হরিপ্রিয়ার 'তপিস্যে', কবে কর্ত্তার ঘরে এসে জীবন 'সাথ্‌ক' করবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কি বল্লে ভজ! আমার সংসারে আস্‌বার জন্য সে তপস্যা করছে? পনের বছরের যুবতী জীবন-যৌবন ঢেলে তপস্যা করছে,—আমার গলায় মালা দিবার জন্যে? বল ভজ, মেয়েটির নাম কি?—হরিপ্রিয়া, না কি বল্লে?"

ভজ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, হরিপ্রিয়েই তার নাম।"

চক্রবর্ত্তী (ভাবে বিভোর হইয়া)—'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট!' দেখ ভজ, ভগবানের কি মিলজ্ঞান! গোপীকান্ত আর হরিপ্রিয়া; যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী—হরিহে, তোমারই ইচ্ছে!"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ভজ, একটা ত বড় ভুল হয়ে গিয়েছে!—কার মেয়ে তা ত জানা হয় নি। কোন্ গ্রামে বাড়ী, মেয়ের বাপের নাম?"

ভজ বলিল, "আজ্ঞে কালীতলা গ্রামে বাড়ী, মেয়ে এই অধমেরই।" (বক্ষে হস্ত স্থাপন।)

চক্রবর্ত্তীর আলোকপ্রদীপ্ত মুখ সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে! তোমার মেয়ে

আমি বিয়ে করবো ? ছিঃ, তোমাকে এক ফরাসে বস্‌তে দিইনে, আর তুমি চাও আমাকে জামাই করতে !—তা তোমার মেয়ের খুব ভাল প্রশংসাপত্র আছে,—পনেরোয় পড়েছে ?—হরি হরি !"

ভজ মুখ নতঃকরিয়া বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, পনেরোয় পড়েছে,—কিন্তু দেখ্‌তে সে কুড়ির মত ! আমি কর্ত্তা, বড় গরীব ; মেয়েটি নিয়ে যদি আমাকে কৃতার্থ করেন, তাহলে'আমি এক দায় থেকে উদ্ধার পাই। গরীবের কন্যাদায় কর্ত্তা, বড় দায়।"

চক্রবর্ত্তী সদয়ভাবে বলিলেন, "তোমাকে উদ্ধার করতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি জাত্যাংশে অনেক খাটো যে !—তোমার মেয়ে বিয়ে কল্লে যে সমাজে মস্ত 'ঘোঁট' উপস্থিত হবে ! আর তুমি চাকর, আমি মনিব। চাকর-বাকর না থাক্‌লে তুমিই আমার তামাক সাজ, পায়খানার জল এগিয়ে দাও। তোমাকে কি করে শ্বশুর বলে মান্য করি ?—মস্ত সমস্যায় ফেল্লে দেখচি।" ( চিন্তা )

ভজ গলায় কাপড় দিয়া করযোড়ে বলিল, "দোহাই কর্ত্তা, আমাকে এবার রক্ষা করতেই হবে। আমি নিজের জন্যে বলছি না ; আপনার শরীরটা কি হয়ে গিয়েছে,—আয়না দিয়ে কোন দিন দেখেছেন কি ?—আধখানা হয়ে গিয়েছেন ; আর সে কান্তি নাই, আহারে রুচি নাই ;—কি করে বাঁচবেন ? আমার মেয়ে যে রাঁধে, যেন সাক্ষাৎ 'দ্রৌপদী' !—তার রান্না একদিন খেলে আর ভুলতে পারবেন না।"

চক্রবর্ত্তী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না, পিসিমার রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছে !—কি বল্লে, হরিপ্রিয়া বেশ ভাল রান্‌তে শিখেছে ?"

ভজ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "চমৎকার !—তার রান্না খেলে আপনার "প্রেমাই" আরও বিশ বৎসর বেড়ে যাবে, কর্ত্তা !"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দেখ ভজ, আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লাম, পতিতকে উদ্ধার করাই মহতের কাজ ; বিশেষতঃ শাস্ত্রে বলেছে, স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি। —তা আমি তোমার দুষ্কুল হতেই স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করবো। কিন্তু দুটি-একটি সর্ত্ত আছে।"

ভজ বলিল, "নিবেদন করুন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আমি তোমার জামাই, এ পরিচয় কাউকে দিতে পাবে না। অন্যের সাক্ষাতে তুমি আমার ফরাসে বস্‌বে না। আমি যখন তামাক

খাব, তখন সরে যাবে। শ্বশুরের সাক্ষাতে তামাক খাওয়া ভদ্রতাসঙ্গত নয়।—তোমার মেয়েকে বিয়ে করার খাতিরে বুড়ো বয়সে ( জিহ্বাদংশন পূর্ব্বক) —এ—এত কম বয়সে আমি চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করতে পারব না।"

ভজ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল,"তবে মেয়েটিকে ত একবার দেখা কর্ত্তব্য।"

চক্রবর্ত্তী সোৎসাহে বলিলেন, "সে ত বটেই! ঐটেই যে আগে। কিন্তু আমি তো বাপু, তোমার বাড়ী মেয়ে দেখ্‌তে যেতে পারবো না।—দু'ক্রোশ পথ না হয় গরুর গাড়ীতে গেলাম; কিন্তু তাতে লোক জানাজানি হবে।—আর তুমি আমার চাকর, তোমার বাড়ী যাব? তাতে আমার কুলগৌরব নষ্ট হবে।—তবে তোমার মেয়ে আমি বিয়ে করছি,—সে কেবল তোমাকে দয়া করে।—পতিতের উদ্ধার মহতেরই কাজ।—হরিহে, তোমারই ইচ্ছা!"

ভজ বলিল, "তবে কি কর্ত্তা, এখানেই তাদের আনাবো কি?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তাদের;—তোমার পরিবার, আর মেয়েকে?—তা মন্দ কি?—তোমার স্ত্রী এসেও জামাইয়ের ঘরসংসার দেখে যাক্; কিন্তু হঠাৎ আনা হবে না। নানা কথা জন্মাবে, আমার অনেক শত্রু!—একাদশীতে আমার বাড়ী হরিবাসর,—সেই দিন নিয়ে এসো, ধর্ম্মকথা শুনবে।"

দুই দিন পরে—একাদশী; সেই দিন ভজ স্ত্রীকন্যা সহ 'কর্ত্তার' গৃহে উপস্থিত হইল।

( ৪ )

পিসিমা 'ঝুণো' গৃহিনী; তিনি ঠিক আঁচিয়া ফেলিলেন!—চক্রবর্ত্তী আহারে বসিলে তিনি পাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "বাবা গুপিকান্ত!—আমাদের এই ভজোর মেয়েটিকে দেখেছিস্? বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে।—অনেক দিন ত আমাদের বাড়ী আসেনি।—ভজোর ঘর কিছু মন্দ নয়।—আমি বলছিলাম কি, ভজোকে বলে ক'য়ে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কর না কেন?—তুই ত ছেলে-মানুষ! বিয়ে-থাওয়া না করলে কি মানায়? বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করচে!—আমি তেকেলে বুড়ো পিসী, আমি কোথায় কাশী যাব, না, তুই কাশী যাবার জন্যে ক্ষেপেছিলি!—বিয়ে-থাওয়া কর, ঘর-সংসার বজায় থাক। আমি আর ক'দিন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "পিসিমা, আজ তুমি চমৎকার রেঁধেছ।—আমার অরুচি সেরে গেল। এমন মোচার-ঘণ্ট অনেকদিন খাই নি।"

পিসিমা মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "ভজোর মেয়ে শুনেছি আমার চেয়ে খুব ভাল রাঁধে।—তুই বিদ্যেবাগীশকে ডেকে একটা দিন দেখা।—বংশরক্ষা কর।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "পিসিমা, একথা নিয়ে গোল করো না। আমি ভজোকে আশা দিয়েছি, তাকে উদ্ধার করবো। পিসিমা, সংসারে আর রুচি নেই। কি করবো, তোমাদের মায়া কাটাতে পারিনে, তাই এখানে আট্‌কে পড়ে আছি।—তা ভজর স্ত্রীকে বল, দু'এক দিন এখানে থাক; এ ত মনিববাড়ী, লজ্জা নেই।"

অপরাহ্নে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া বৈঠকখানায় তাঁহার ফরাসে বসিলেন।—আজ ফরাসে নূতন চাদর; বালিসের ওয়াড়গুলি সদ্যধৌত।—চক্রবর্ত্তী ফরাসে একটি পৈত্রিক 'জাজিম' পাতিয়া, গেন্দা বালিসে ঠেস্ দিয়া যুবরাজ অঙ্গদের মত বসিয়া আছেন!—তিনি জিঞ্জিরী-বিশিষ্ট সরপোষে সমাচ্ছাদিত কলিকাস্থিত সুগন্ধি তাম্রকূট ধূমপান করিতেছিলেন, ফরসীর মুখে 'ফুরুৎ-ফুরুৎ' শব্দ হইতেছিল।

আজ তাঁহার নটবর বেশ! পরিধানে মিহি লাল কল্কাপেড়ে ঢাকাই ধুতী, অঙ্গে একটি বুটিদার 'মেরজাই', মাথায় কাঁচাপাকা চুলের বেষ্টনীমধ্যে ক্ষুদ্র একটি টাক, টাকের নীচে খর্ব্বকায় একটি টিকি। বিরলকেশের মধ্যে চেরা সিঁথি। নয়নে অঞ্জন।—তাঁহার দক্ষিণ হস্তের চারি অঙ্গুলীতে চারিটি হীরক অঙ্গুরী; কণ্ঠে দুই কণ্ঠি সুদীর্ঘ সরু স্বর্ণহার। তাহার মধ্যে একটি সোনার মাদুলী;—এই মাদুলীর গুণে গরু হারাইলেও পাওয়া যাইত। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া, নবযৌবন লাভের আশায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই মাদুলীটি একটাকা পাঁচ আনা ভি, পি, খরচ করিয়া গ্রহণান্তে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।—কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহার গুণাগুণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হারগাছটা মেরজাইয়ের গলার বোতামের উপর দিয়া টানিয়া আনিলেন; হাতের অঙ্গুলীগুলি স্পষ্ট দেখা যায়, এভাবে হাতখানি রাখিলেন, এবং বামহস্তে পিঠ চুল্‌কাইতে লাগিলেন। দক্ষিণ মুষ্টির ভিতর লাল রেশমী রুমালখানিতে আতরের গন্ধ 'ভুর ভুর' করিতেছিল।

এমন সময় হরিপ্রিয়া একখানি পার্শি সাড়ীতে সজ্জিত হইয়া একটি আবলুস্

রঙ্গের 'জ্যাকেট' পরিয়া, খোপায় একটি গোলাপফুল গুঁজিয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় প্রবেশ পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তীর পায়ের কাছে 'ঢিপ্' করিয়া এক প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তীর চারিটা হীরার আংটী তাহার সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে বিগলিতপ্রায় হইয়া বলিলেন, 'চিরজীবী' হয়ে বেঁচে থাক। তা বোস, ঐখানে লক্ষ্মী! পিসীমা, তুমি ওর কাছে দাঁড়াও, একটু লজ্জা হয়েছে!"

পিসীমা বলিলেন, "তুই একবার ভাল করে দেখ্।"—

চক্রবর্ত্তী কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

ভজনন্দিনী নতবদনে বলিল, "শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দেখি তোমার হাতখানি।"

চক্রবর্ত্তী হাত দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, হাতখানি ভাল, আর পুত্র-স্থানে দাঁড়ী আছে।—বংশরক্ষে হতে পারে।"

প্রকাশ্যে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "রাঁধতে শিখেছো?"

হরিপ্রিয়া বলিলেন, "পারি এক রকম, খুব ভাল হয় না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "রাঁধবার জিনিস পেলে তুমি খুব ভাল রাঁধ্‌তে শিখবে।—তুমি আমাকে রেঁধে খাওয়াতে পারবে?"

হরিপ্রিয়া নিরুত্তর।

হরিপ্রিয়ার বয়স হইয়াছিল। লজ্জায় তাহার মাথা প্রায় কোলের কাছে আসিল!—তাহার বক্ষস্থলে তখন কত বিভিন্ন চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল। সে সকল কথাই বুঝিয়াছিল; সে বড় গরীবের মেয়ে। কতদিন দুইবেলা খাইতে পায় নাই। তাহার মায়ের দুঃখ দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। এতদিনে কি ভগবান সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন?—আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।—তাহার জীবন যেভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে চিত্তের স্বাধীনতা, নির্ব্বাচনের শক্তি, বিচারের প্রবৃত্তি, রূপের মোহ, তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেও পারে নাই। সে কুড়ি বৎসর ও তিনকুড়ি বৎসরের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইল না; সে দেখিল, তাহার চির-দারিদ্র্যের মধ্যে সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা করুণাময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি তাহাকে বর দিতে আসিয়াছেন।—সে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া উঠিল; চক্রবর্ত্তী ট্যাঁক্ হইতে একটি বাদসাহী মোহর বাহির করিয়া হরিপ্রিয়ার হস্তে প্রদান করিলেন।

হরিপ্রিয়া অবনতনেত্রে সেই কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে গেল; তাহার মা

উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিপ্রিয়া মোহরটী মায়ের হাতে দিয়া বলিল, "ত্যাখ্ মা, এটা কি!"

মা দেখিলেন,—"মোহর।"

( ৫ )

এতবড় কথা পল্লীগ্রামে ঢাকা থাকে না। ক্রমে কথাটা বহুজিহ্বাগ্র ঘুরিয়া অবশেষে গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত ভাইপো কালীকান্ত চক্রবর্ত্তীর শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিল। শুনিয়া কালীকান্তের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভঙ্গ হইল।—সে সরোষে বলিল, "দাও ত গিন্নি, লাঠিগাছটা! বুড়োকে একবার গুঁড়ো করে থুয়ে আসি!"

গিন্নি স্বামীর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল না; বলিল, "কোন্ বুড়ো?"

কালীকান্ত বলিলেন, "খুড়ো মশায়! ভীমরতি ধরেছে, এখন বিয়ে করবেন! ভজাবেটা লক্ষীছাড়া—এমন মেয়েটাকে দিয়ে দুদিন পরে একাদশী করাবে? সম্পত্তিটা দেখ্‌ছি ভজা বেটার কপালেই নাচ্‌ছে!"

গিন্নি বলিল. "বেল পাক্‌লে কাকের কি?"

কালীকান্ত চটিয়া বলিল, "দেখি, খুড়োর বেলের মত পাকা মাথা গুঁড়ো করে দিয়ে আসি। কাশী যেতে যেতে বিয়ে!—সব ভণ্ডামী।—আর দশ দিনও বিলম্ব সইল না!"

কালীকান্ত স্থূল বংশদণ্ডহস্তে পিতৃব্য-সম্ভাষণে যাত্রা করিল। গিন্নি বলিলেন, "যেন একটা খুনোখুনি করো না। তাহ'লে তোমাকে জাঙ্গি পরিয়ে মাথায় ইঁটের ঝুড়ি বহাবে, বামন বলে মাফ্ করবে না।"

"সে চিন্তা তোমার চেয়ে আমার ঢের বেশী"—বলিয়া কালীকান্ত যষ্টিহস্তে অদৃশ্য হইল।

গোপীকৃষ্ণ তখন জলচৌকীতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন। মুখ ধুইয়া জলের ঘটিটা খড়মের উপর তুলিয়াছেন, এমন সময় দণ্ডধারী কালীকান্ত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করাল কৃতান্তের ন্যায় রক্তনেত্রে বলিল, "কাকা, বুড়ো-বয়সে আবার নাকি বিয়ে কচ্ছেন! কার দুধের মেয়েকে দিয়ে হবিষ্যি করাবেন!"—ভজর দিকে চাহিয়া "তুমি বুঝি! পেটেপেটে ত খুব বুদ্ধি খেলেছ! কাকা না ক্ষেপ্‌লে আর মেয়েকে বিয়ে করতে চাবেন কেন?"

গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী জলের ঘটিটা ফেলিয়া, উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিকট মুখভঙ্গি সহকারে বলিলেন, "তোমার কথায় আমি '—

করে দিই। আমি কি করব না করব, তা তোমার জেনে দরকার কি ?—তুমি আমার অভিভাবক হয়ে এসেছ নাকি ?”

কালীকান্ত লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া বলিলেন, “আপনার যে রকম বুদ্ধি-বিকার হয়েছে, তাতে একজন অভিভাবকেরই দরকার বটে! কাশী যেতে যেতে আপনি যে বাসর-যাত্রা করবেন, এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। ধন্য লালসা!”

চক্রবর্ত্তী দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, “বেরো পাজী বেটা, আমার বাড়ী থেকে!—কেবল আমার সম্পত্তিটা ভোগ করবার ফন্দিতে বেড়াচ্ছ। আমার পুত্র এ সম্পত্তি ভোগ করবে।”

কালীকান্তের মুখ হইতে কি একটা কদর্য্য কথা বাহির হইতেছিল, কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া চুপ করিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “আচ্ছা কাকা, আপনি বিয়ে করুন, শেষে যেন ‘পস্তাতে’ না হয়।”

“তোকে সেজন্যে আহারনিদ্রা ত্যাগ করতে হবে না,”—বলিয়া চক্রবর্ত্তী বারান্দা হইতে খটাখট্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। উত্তেজিতস্বরে ভজকে বলিলেন, “আজই ঢাকায় পত্র লিখে দে, দু’দল ‘ব্যাণ্ড’ আর ‘ব্যাগ্-পাইপ্’ পাঠাতে। আমি মনে করেছিলাম, চুপ্‌চাপ্ কাজ সারবো। মানুষের ত একটা চক্ষুলজ্জা আছে; তা এই কটা হিংসুটে শয়তানে মিলে আমার চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে দিলে! ঢাকে-ঢোলে বিয়ে করবো, সাত দিন নহবৎ বাজাবো! হুঁ, আমার নাম গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী আমি বাপেরও নই, মায়েরও নই। রামা ঘরামীকে ডেকে নহবৎ বাঁধতে হুকুম দে।”

কিন্তু কালীকান্ত তখন অদৃশ্য হইয়াছে! সুতরাং চক্রবর্ত্তীর বীরদর্প বৃথা হইল।

কালীকান্ত বাড়ী আসিয়া পিতৃব্যকে একঘরে করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও বিবাহ বন্ধ হইল না। গোপীকান্ত তাঁহার ‘চাকর’ ভজহরির গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। গোপীকান্তের একটি দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার বাড়ী হইতেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহে সমারোহের সীমা রহিল না। বিবাহে ঢাক নিষিদ্ধ বলিয়াই ঢাকের বায়না দেওয়া হয় নাই; তদ্ভিন্ন ঢোল, কাড়া, জগঝম্প, দুইদল ইংরাজী-বাদ্য, একদল ‘ব্যাগ-পাইপ্’, রসুনচৌকী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের বিচিত্র শব্দে ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! বংশমঞ্চে নহবত বসিল। সানাইয়ের মধুর স্বরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উদ্দামবেগে

প্রবাহিত হইতে লাগিল। ময়মনসিংহ জেলায় হস্তীর অভাব নাই, অনেকগুলি হাতী ও ঘোড়া শোভাযাত্রার শোভা সমধিক বর্দ্ধিত করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজন তেমন কেহ না আসিলেও তাঁহার আশ্রিত, অনুগত প্রভৃতি অনেক লোক শুভকার্য্যে যোগদান করায় বিবাহে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। পাকাচুলের উপর টোপর পরিয়া চতুর্দ্দোলে চড়িয়া মহা ঘটা করিয়া চক্রবর্ত্তী যখন বিবাহ করিতে চলিলেন, তখন গ্রামের কতকগুলি দুষ্ট ছেলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বল হরি, হরিবোল!"—ঢোলের বাদ্য ডুবাইয়া, সেই শব্দ চতুর্দ্দোলস্থিত বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তীর কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি হুঙ্কার দিলেন, 'মর বেটারা!—আমি তোদের শ্রাদ্ধ করি।—এসব কালীকান্তেরই কারসাজি! আগে শুভকর্ম্মটা শেষ হোক, তারপর দেখাবো গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী কি চিজ্!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিবাহ করিয়া 'পঞ্চম পক্ষ'কে গৃহে আনিলেন। তাঁহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীও কন্যাজামাতার পরিচর্য্যার জন্য তাঁহার গৃহে স্থায়ীভাবে আশ্রয়লাভ করিলেন। কিন্তু বৌ-ভাত হইল না। চক্রবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নীচ ঘরে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা কেহ তাঁহার বাড়ী খাইতে আসিল না। গ্রামস্থ শূদ্র ভদ্র ও মহালের প্রজাগণকে তিনি পেট ভরিয়া ফলার খাওয়াইলেন। চারিদিকে কেবল 'দিয়তাং ভুজ্যতাং!—আর তার সঙ্গে সানাইয়ের গান, "বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের!"

কয়েক মাস পরেই দুর্গোৎসব। সংবৎসর পরে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আনন্দ কলরব উত্থিত হইল। গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৃহে পূর্ব্বে কোনদিন দুর্গোৎসব হয় নাই; এবার তিনি মহা সমারোহে দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিবে,—তিনি তাহাদের প্রত্যেককে দুই টাকা হিসাবে মর্য্যাদা দিবেন।—বিবাহের সময় যাঁহারা তাঁহাকে 'একঘরে' করিয়াছিল, মর্য্যাদার লোভে তাঁহারা সকলেই পূজায় তাঁহার গৃহে পাতা পাড়িলেন। কেবল কালীকান্ত আসিল না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

# বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে

ননীর চেয়ে কোমল-হিয়া
বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে,
স্বর্গ-পুরীর স্বর্গ হেরি
তোমার পানে চেয়ে ;
তোমার আঁখি ভর্‌লে' জলে
তারা-লতায় মুক্তা ফলে,—
শাঁখের অধর ধন্য হ'ল
তোমার চুমু পেয়ে।

টগর বকুল, দোলন্‌-চাঁপা
তোমার খোঁপার ফুল—
কমল-বনে নাইতে নাম'
এলিয়ে কালো চুল ;
'পুণ্য-পুকুর আলোয় ভরে'
'সন্ধ্যা' জ্বাল' মোদের ঘরে,
দোদুল সোণার কাণ-বালাতে
পদ্মরাগের দুল।

খেল্‌ছে আলো ভোম্‌রা-কালো
চুলের তরঙ্গে—
হাস্‌ছ মধুর, বিজুলি-টীপ
উজল ভ্রূভঙ্গে।
আকাশভরা জীবন-গানে
সুর দিতেছে উতল তানে—
মূর্ত্তি ধরে বসন্ত-রাগ
মনের সারঙ্গে।

ফুল হ'য়ে ওই তোমার হাসি
ফুট্‌ছে উপবনে,
চির-শরৎ-জ্যোৎস্না-রেণু
বিলাও গৃহ-কোণে ;
অফুট মুকুল খুলে' খুলে'
ভর্‌ছ মধু মনের ভুলে,
ঝঙ্কারিছে রঙ্-ফোয়ারা
তোমার পরশনে।

অধর-পুটে ফুল-পেয়ালায়,—
আদর-গোলাপ-বারি—
চাইলে পরে পলক ফেল'
লাজের অরুণ-ঝারি,—
ওরে স্নেহের পরাগ-কেশর,
ফাগুন পরিমলের বাসর,
নীল আকাশের স্বপন-মাখা
সোণার খাঁচার সারি।

বাঙ্‌লা দেশের বধূ তুমি,
বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে,
তোমার দিঠি, মধুর শ্রীটি
মধুর সবার চেয়ে।
চারু-চিক্কণ-রুচির গায়ে,
বেড়াও তুমি আল্‌তা পায়ে,
শিউরে ওঠে কবির হিয়া,
তোমারি গান গেয়ে।

কোথায় এমন স্নিগ্ধ-শুচি,
উদার সরলতা,
আনন্দেরি মন্দাকিনী,
তরল কলকথা !

তোমার মনোহরণ লীলা
ধূসর মরুর তপ্ত শিলা
টলিয়ে দিয়ে গলিয়ে দিয়ে
ভুলায় নিঠুর ব্যথা।

পল্লী-মায়ের ফুল্ল মুখের
ঘোম্‌টা খুলে' দিয়ে
মিটাও ক্ষুধা হৃদয়-গলা
ক্ষীর-পসরা পিয়ে,—
লো দুলালি, আলোর দেশে
উষার ডালি আস্‌ছে ভেসে,
কোন্ মলয়ে চন্দনেরি
গন্ধটুকু নিয়ে।

দেবপূজার ফুলের সাজি,
রে নির্ম্মলা বালা,
সুধায় ধুয়ে দাও দরদীর
দুখের গরল জ্বালা;
তোমার সরল ভক্তি-মধুর
অঞ্জলিতে প্রাণের ঠাকুর
আপ্‌নি এসে পরেন গলে
তোমার গাঁথা মালা।

আঁক্‌চ দ্বারে লক্ষ্মী মায়ের
পায়ের আলিপনা;
ধানের শীষে কড়ির ঝাঁপি
সাজাও সুলোচনা;
চঞ্চলারে আঁচল ধরে'
বরণ কর খেলার ঘরে,
পালায় তোমার কাঁকণ-স্বরে
অমঙ্গলের কণা।

লুকিয়ে আছে তোমার মাঝে
শকুন্তলা, সীতা,
গায়ত্রী সে ভগ্নী তোমার
সাম-গীতোত্থিতা ;
শক্তি তুমি, কান্তি তুমি,
শান্তিময়ী তীর্থভূমি,
বিবেক-দিবার অমর বিভা,
হে চিত্ত-বন্দিতা।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

# উপ

হে উপ, তুমি সকল উপসর্গের উপরে, কারণ তুমি না থাকিলে উপসর্গের নামটি পর্য্যন্ত থাকিত না। তুমি পতি ও পত্নী উভয়েরই এক বিষম উপসর্গ। তাহারা ধাতু না হইলেও তোমার সহযোগে তাহাদের ধাতুগত পরিবর্ত্তন ঘটে। তোমার চরিত্র বড়ই মন্দ। তাহা না হইলে তোমার সংস্পর্শে আসিয়া দেবতা পর্য্যন্ত সৃষ্টিনাশক হইয়া দাঁড়াইবে কেন? কথার মুখপত্তনে তুমি থাকিলেই বুঝিতে হইবে, সে কথায় একবর্ণ সত্য নাই, তাহা আগাগোড়া গল্প।

তোমার অনেক দোষ। তুমি বড়কে ছোট করিয়া দাও, যেমন বেদকে কর উপবেদ, সাগরকে কর উপসাগর; তুমি যাহার স্কন্ধে চাপ, অনেক সময় তাহার রসও শোষণ কর; যেমন বৃক্ষের। তুমি কোথাও জ্যেষ্ঠের সহিত যুক্ত থাকিয়া কনিষ্ঠত্ব গ্রহণ কর, সুবিধার জন্য—যেমন সুন্দর ও নন্দের;—কোথাও শক্তিমানের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ কর—যেমন গ্রহের; আবার কোথাও অকারণ কাহারও সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াও—যেমন জীবকের অর্থাৎ ভিক্ষুকের। তুমি দেশে বসিয়া দেশের অগ্রণী সাজিয়া কেবল উপদেশ দাও, কিন্তু কর্ম্মে তোমাকে কখন প্রযুক্ত হইতে দেখি না; যদিও হও ত সে বোধ হয় 'অপ'-মূর্ত্তি ধরিয়া। আসল কথা, কাজকর্ম্মের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। তুমি হয় ত স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবে 'আমি জগতের অনেক উপকার করি', কিন্তু আমরা জানি 'কারে' না পড়িলে তুমি কখন উপকার কর না। বরং যে উপকার করে, অনেক সময় তাহার উপকারিত্বটুকু কাড়িয়া লও। যে জিহ্বা মানুষের এত উপকারী, তোমার সহিত

মিলিত হইলে, উৎকাশীরূপ উৎপাত উৎপন্ন করা ভিন্ন তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। দুর্জ্জনের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করা যে সর্ব্বতোভাবে উচিত, তাহা তোমা হইতেই প্রতীয়মান হয়। রত্নকেও তোমার অঙ্গে গাঁথিয়া দিলে তাহা হীনমূল্য ও হীনপ্রভ হইয়া যায়।

তুমি ভয়ঙ্কর লোক; শঠতা ও কৃত্রিমতা তোমার হাড়ে হাড়ে। উপনাম (কল্পিত নাম) ও উপবন (কৃত্রিম বন) এ দুয়ের ভিতরই তোমার কৃতিত্ব বিদ্যমান। তুমি সাদৃশ্যের ছদ্মবেশ দিয়া ধাত্রীকে মাতৃতুল্যা করিয়া দাও,—শিশুকে ভুলাইবার জন্য (উপমাতা) এবং যাহাকে তাহাকে আচার্য্য করিয়া দাও,—আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে কার্য্য চালাইবার জন্য (উপাচার্য্য)। তোমার চক্র এমনই ভীষণ যে, ব্যাঘ্রকেও তুমি অনতিবিলম্বে শৃগালে পরিণত কর (উপব্যাঘ্র) এবং ভেকের দ্বারাও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া দাও (উপপ্লব)। তোমার উপর সকলেরই এমন উত্তম ধারণা যে, তোমার পার্শ্বে বসিয়া হাস্য করাকেও লোকে উপহাস বলিয়া বিবেচনা করে। আর তোমার উচ্চারণও এত সুমিষ্ট যে, তোমার সহিত একত্র যে চীৎকার করে, লোকে তাহাকে গর্দ্দভ বলে (উপক্রোষ্টা)। তোমার সহিত একত্র বাস করাও কষ্টকর। তোমার সহিত একত্র বাস করিলে মুখের গ্রাস হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

তুমি কতকগুলি কাজ কর, যাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে ভাল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নয়। তুমি দান কর সত্য, কিন্তু তুমি যে দানে আছ তাহা নিঃস্বার্থ দান নয়; তাহা অনুগ্রহ লাভের উপায়মাত্র। তুমি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কখন কখন চক্ষুকে সাহায্য কর বটে, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য চক্ষুকে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন করা। তোমার প্রভুত্বলিপ্সাও যেরূপ প্রবল, শক্তিও সেইরূপ। তোমার প্রভাবে যে পূর্ব্বে অপরের দ্বারা নীত হইত, সে নিজে আসিয়া উপনীত হয়, এমন কি তোমার আকর্ষণে স্থিত পদার্থেরও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয় না। আমার বোধ হয়, তোমার ভিতর 'নারভিগার' কিম্বা 'মকরধ্বজে'র উপাদান আছে, অথবা তুমি 'হিপ্‌নটিজম্' বিদ্যায় পারদর্শী। মদনভস্মের পরে রতি যদি তোমাকে পাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইত; কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ আলঙ্কারিক বিলাপ হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম। তুমি নাগরীর কণ্ঠে না হইলেও নগরীর কণ্ঠে সততই লগ্ন। ইহা অশিক্ষিত লোকের মিথ্যা দোষারোপ নয়; শিক্ষিতদিগের অভিধানই ইহার প্রমাণ। তুমি অযাচিত সখিত্ব প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদাই নিকটে আসিয়া দাঁড়াও, সম্ভ্রমের দূরত্ব

রক্ষা করিবার অভ্যাস তোমার নাই। তুমি আগত হইতে হইলেই একেবারে উপাগত অর্থাৎ সমীপে আগত হও। ইহার কারণ কি? শুনিয়াছি সমীপতা অর্থাৎ নৈকট্য প্রকাশ করাই তোমার একটি প্রধান অর্থ। কিন্তু কেবল নৈকট্য জানাইলেই কি নৈকট্য সংস্থাপিত হয়? উৎপত্তিগত অর্থাৎ বংশগত প্রভেদ দূর হইবে কিরূপে? তুমি অব্যয়; অবস্থাভেদেও তোমার কোন প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয় না। যে চিরদিনই এক, তাহার উন্নতি কোথায়? কিন্তু যে উন্নতি-শীল, যাহার শরীরে ধাতুর লেশমাত্র বিদ্যমান, সে তোমার সগোত্র হইবে কি রূপে?

তোমার ধর্ম্মমত ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। তোমা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম (উপধর্ম্ম) অতি জঘন্য অন্ধ-বিশ্বাসের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। তুমি অপরেরও ধর্ম্ম-নাশ কর। যিনি যাপক, দিবারাত্র মালা জপ করেন, তিনিও তোমার সহচর্য্যে নারদত্ব লাভ করেন অর্থাৎ অপরের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখেন।

এ পর্য্যন্ত তোমার নানা দোষেরই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইংরাজিতে বলে সয়তানের কিছু গুণ আছে এবং সেজন্য সে প্রশংসার্হ। সুতরাং তোমার যে দু' একটি গুণ আছে, তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তুমি কেশের উপর অবস্থান করিলে তাহার বিরলত্ব আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি ব্রাহ্মণের উপবীতে আছ বলিয়াই তাহা এখনও বীত (বিগত) হয় নাই, টিকিয়া আছে। তুমি উপঢৌকনে আছ বলিয়াই তাহা উৎকোচ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। নাট্যকার যখন তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলির সংহার কল্পনা করেন, তখন সে সংহারের পূর্ব্বে তুমি আসিয়া পড়িলে, হত্যালীলা অচিরাৎ পরিসমাপ্ত হয়। আবার পুস্তকের প্রারম্ভে তুমি উপক্রমণিকাতে আছ বলিয়াই তাহা অসম্পূর্ণ-কলেবর হয় না। বিষয়-সম্পত্তিতে আইন-সঙ্গত সত্ব থাকিলেও তুমি ভিন্ন সে বিষয় হইতে উপস্বত্ব আদায় হয় না এবং যদিও তুমি কিছু হরণ কর, তথাপি তাহা কর কেবল উপহার দিবার জন্য। তুমি উপত্যকায় ছিলে বলিয়াই তাহা মনুষ্য-বাসের যোগ্য হইয়াছে এবং দ্বীপের অন্ততঃ একদিকের জলকে স্থলে পরিণত করাই তোমার সংকল্প। আত্মমর্য্যাদা তোমার যত থাকুক্ বা না থাকুক্, আত্ম-সম্মানের জ্ঞানটা খুব প্রখর। এই জন্যই তুমি কোথাও কাহারও পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন কর না; সকলের সম্মুখেই তুমি চিরদিন বসিয়া আসিতেছ। এটা শুধু তোমার নয়, উপসর্গ মাত্রেরই দস্তর। আমাদের উপসর্গগুলি যদি আমা-দিগকে আড়াল করিয়া না রাখিত তাহা হইলে আমাদিগের আত্মপ্রকাশের আর কোন বিঘ্নই ছিল না; তাহা হইলে বোধ করি আমরা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

# শিলিমপুর প্রশস্তিতে ঐতিহাসিকতথ্য।

উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার শিলিমপুর নামক মৌজায়, মাণিকগঞ্জ মহকুমার থলসিগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের ভূসম্পত্তিতে, প্রশস্তি-সমন্বিত একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের পাষাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, এসংবাদ সংবাদপত্রে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। মাণিকগঞ্জ হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, বিগত বৈশাখ মাসের শেষভাগে, আমি তথায় যাইয়া বিজয়বাবুর আত্মীয়গণের নিকট হইতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে এই শিলা-লিপিখানি উপহার-রূপে গ্রহণ করিয়া সমিতিকে দিয়াছিলাম। সম্প্রতি পাষাণখণ্ড সমিতির প্রতিমাগৃহে রক্ষিত আছে। এই প্রশস্তির পাঠোদ্ধার সাধন করিয়া, তাহার পরিচয় ও সটীক অনুবাদ সহ যে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে, বিগত ২৩ শে শ্রাবণ তারিখে তাঁহাদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। আমার সেই প্রবন্ধটি প্রতিকৃতি সহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এই প্রশস্তিটি বঙ্গবাসিজনের সাধারণ সম্পত্তি মনে করিয়া, তাহার পাঠ ও মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য অনেকেই উৎসুক আছেন, এই জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া—স্থানে স্থানে প্রশস্তির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া—লিপি হইতে উদ্ভূত কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। বিনা আলোচনায় ইতিহাসের এই জাতীয় উপাদানের সম্যগ্‌ব্যবহার হইতে পারে না।

যে কৃষ্ণ-পাষাণ-খণ্ডে লিপিটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে—তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১ফুট ৪$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৮$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চ। লিপিটি সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দুই একটি বর্ণমাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি অক্ষর কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শিল্পীর বা লেখকের প্রমাদ বড় লক্ষিত হয় নাই। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত পাষাণ-লিপি বা তাম্রলিপি সমূহের মধ্যে এরূপ নির্ভুল লিপি কমই পাওয়া গিয়াছে। লিপি-পাঠ ও পাষাণখণ্ডের আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা কোন সময়ে কোন মন্দির-গাত্রে প্রোথিত ছিল। সমগ্র লিপি ২৫ শ পংক্তিতে সমাপ্ত। লিপি-প্রারম্ভে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥"—এই গদ্যাংশ ব্যতীত, ইহাতে সংস্কৃত-ভাষায় নানাচ্ছন্দে বিরচিত ২৯ টি শ্লোক আছে। যে অক্ষরে ইহা উৎকীর্ণ তাহা একাদশ-শতাব্দীতে, পূর্ব্বভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ও মগধে, প্রচলিত-লিপি বলিয়াই ধার্য্য করিতে হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিপিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া লিপিকাল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

এই শিলা-লিপিতে বরেন্দ্র-ভূমি-নিবাসী প্রহাস নামক এক বিপ্রের কুল-প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে প্রশস্তিকার কবির নামোল্লেখ নাই। প্রথম শ্লোকে ভগবান চতুর্ভুজ বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা যায় যে, প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রহ্মার অন্যতম মানস-তনয় অঙ্গিরার বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভরদ্বাজ ঋষির সমান-গোত্র ছিলেন,—শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধ তর্কারি নামক স্থান তাঁহাদের আদি-নিবাস ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত পরিচয় থাকায়, তাঁহারা শ্রৌত ও গৃহ্য আহুতির আচরণ-কারী ছিলেন। চতুর্থ শ্লোকে পুণ্ড্রজনপদের অন্তর্গত বরেন্দ্রীমণ্ডলে অবস্থিত বাল-গ্রাম নামক এক বিশ্রুত গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রাম পূর্ব্বোক্ত তর্কারি নামক স্থান হইতে সকটী নামক [ নদী বিশেষের বা স্থান বিশেষের নাম (?) ] স্থান দ্বারা ব্যবধানযুক্ত ছিল। পঞ্চমশ্লোক হইতে জানা যায় যে, এই বালগ্রামের দ্বিজগণ প্রত্যেকেই নিজকে বিদ্যা, আভিজাত্য ও তপঃ-কার্য্যাদির আশ্রয় বলিয়া মনে করিতেন। বালগ্রামের "পূর্ব্বখণ্ড-ভব-পণ্ডিতগণের" বংশে উৎপন্ন দ্বিজগণ "বিরল-বাস" ইচ্ছা করিয়া এই গ্রামের সন্নিহিত "শীয়ম্ব"-নামক ভূখণ্ডে যাইয়া বাস নির্দ্দেশ করেন ( ৬ষ্ঠ শ্লোঃ )। পূর্ব্বকালে শীয়ম্বেও তপশ্চরণে, বিনয়ে, ও নিজ নিজ বিদ্যাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন—কুলি-বিধি-পালনকারী তাঁহাদেরই মধ্যে দুই তিনজন শ্রুতি স্মৃতির অর্থবিষয়ে জগজ্জনের সংশয়চ্ছেদে পটু থাকিয়া, সেই সময় পর্য্যন্তও উচ্ছিন্ন হন নাই ( ৭ ম শ্লোঃ )। এই শীয়ম্ব নামক স্থানে পশুপতি-নামা "ষট্-কর্ম্মাচরণ-নিপুণ" এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণের উদয় হয় ( ৮ ম শ্লোঃ )। নবম-দশম-শ্লোকপাঠে জানা যায় যে, পশুপতির প্রতিষ্ঠাবান পুত্র সাহিল পিতার উদ্দেশ্যে এক বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপন করেন ও মাতার উদ্দেশ্যে একটি জলাশয় খনন করান। সাহিলের পুত্রের নাম মনোরথ ( ১১ শ শ্লোঃ )। মনোরথের অন্বর্থ নামা পুত্রের নাম সুচরিত ( ১২ শ শ্লোঃ )। সুচরিতের পুত্র তপোনিধি ভাবি-কুলসমুন্নতির "আদিহেতু" বলিয়া ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি কুমারিল-ভট্টের মতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সূক্তিরসায়নের স্বয়ংস্রষ্টা, ও সদাচারের আকররূপী ছিলেন ( ১৪ শ শ্লোঃ )। তপোনিধির পুত্র কার্ত্তিকেয় স্বশক্তি-বলে বহু দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ( ১৫ শ শ্লোঃ )। কার্ত্তিকেয় মীমাংসা-সাগরকে গোষ্পদে পরিণত করিয়াছিলেন এবং "স্মৃত্যর্থসংদেহচ্ছিৎ" বলিয়া লোকে বিদিত ছিলেন, —ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অনঘ-বৃত্তি এই বিপ্র সত্যানুরাগ-

প্রভৃতি অসংখ্যগুণাবশিষ্ট ছিলেন ( ১৭ শ শ্লোঃ )। কার্ত্তিকেয়ের পুত্রের নাম প্রহাস। ১৮-১৯ শ্লোকার্থ হইতে, প্রহাসের মাতৃকুলের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কুটুম্বপল্লী-কুল-জাত বিষ্ণুনামক বিপ্রের প্রপৌত্রী, অজমিশ্রের পৌত্রী, অঙ্গদের পুত্রী কলিপর্ব্বা-নাম্নী রমণী তাঁহার জননী ছিলেন। ভবিষ্যতে প্রহাস যে "ভূয়ঃ-প্রতিষ্ঠ", "নিষ্ঠাবান্" ও "দক্ষিণাত্মা" [ সরল-প্রকৃতিক ] হইবেন—তাহা তাঁহার জন্মসময়ের গ্রহ-সম্পৎ হইতেই সূচিত হইয়াছিল। তর্কে, তন্ত্রে, ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান ছিল বলিয়া, এবং তিনি সত্যবাদী, অলোভী, ও অন্যান্য-সদ্‌গুণ-বিভূষিত ছিলেন বলিয়া, সেই সময়ের জনসাধারণ তাঁহার পূজা করিত এবং নৃপতি-বৃন্দ তচ্চরণে শিরঃপাত-পূর্ব্বক প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিতেন ( ২০ শ শ্লোঃ )। যুক্তিদ্বারা সন্দেহ-নিরসনে সমর্থ হইলেও, বিচারকালে তিনি তুলা-পরীক্ষা দ্বারা মতামত দিতেন ( ২১ শ্লোঃ )। মহাপ্রভাবশালী জয়পালদেব-নামা এক কামরূপরাজ তুলাপুরুষদানকালে সদ্-ব্রাহ্মণ প্রহাসকে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা ও দশ-শতমুদ্রার আয়-বিশিষ্ট শাসন-ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেও, তিনি কোনক্রমেই তাহা লইতে স্বীকার করেন নাই ( ২২ শ শ্লোঃ )। ২৩-২৬ শ শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতে, প্রহাস পিতামাতা ও নিজের উদ্দেশ্যে কি কি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায়। গ্রামের দুইটি দেবায়তনের জীর্ণসংস্কার করাইয়া, তিনি পিতার উদ্দেশ্যে একটি ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং মাতার উদ্দেশ্যে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য প্রহাস অন্ন-সত্র স্থাপন করিয়া, একটি উত্তুঙ্গ শুভ্র মন্দিরে বিধিবৎ অমরনাথ স্থাপিত করিয়া, বাসুদেবের শরণাগত হইয়াছিলেন। এই দেবতার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি উদ্যান ও দেবতার পূজাদি-সিদ্ধির জন্য শিরীষপুঞ্জ-নামক স্থানে সপ্তদ্রোণ-পরিমিত ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পার হইলে, প্রহাস পুত্রগণের উপর গৃহভার সমর্পণ করিয়া, আসক্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক গঙ্গাতটে বাস করিতে লাগিলেন ( ২৭ শ শ্লোঃ )। ২৮ শ শ্লোকে কবি স্বকাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন। শেষ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রশস্তি-লেখক শিল্পী সোমেশ্বর মগধ-দেশবাসী ছিলেন এবং তিনি তন্মনাঃ হইয়া উৎকীরণ-কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত প্রস্তর-প্রশস্তিতে রাজা, মন্ত্রী বা প্রজার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথার উল্লেখ না থাকিলেও, ইহা মধ্য-যুগের বাঙ্গালার

সামাজিক ইতিহাস-সঙ্কলনের পক্ষে একটি অতীব মূল্যবান উপাদান বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে। ইহা পুণ্ড্রজনপদের অন্তর্গত বরেন্দ্রী-ভূমিরই এক ব্রাহ্মণকুলের কুল-প্রশস্তি। ইহা যাঁহাদের কুলপ্রশস্তি, তাঁহারা অঙ্গিরার বংশ হইতে উৎপন্ন ও ভরদ্বাজের সমান গোত্র বলিয়া বর্ণিত। অঙ্গিরার পুত্রের নাম বৃহস্পতি—তাই বৃহস্পতির নামপর্য্যায়ে আমরা তাঁহাকে "আঙ্গিরস" বলিয়া উল্লিখিত পাই [ অমর ১।৩।২৪ দ্রষ্টব্য ]। বৃহস্পতির তনয়ের নাম ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজ-ঋষির পুরাণোক্ত জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, বৃহস্পতি তাঁহার অগ্রজ উতথ্য ঋষির পত্নী মমতাদেবীর গর্ভে ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ( ১ ) ভরদ্বাজের নাম-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, যথা,

"বৃহস্পতি-বীর্য্যাদুতথ্যপত্নী-মমতাসমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ পুত্রো মরুদ্ভির্দত্তঃ।"
তাহা হইলে দেখা গেল যে, প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষ দ্বিজগণ অঙ্গিরার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই পৌত্র [ বৃহস্পতি-পুত্র ] ভরদ্বাজ ঋষির সহিত সমান গোত্রীয় বলিয়া উৎকর্ষ-গৌরব অনুভব করিতেন। অতএব, তাঁহাদের গোত্র প্রবরও যে আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-ভরদ্বাজ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। অদ্যাবধি বরেন্দ্রীমণ্ডলে এই ত্র্যার্ষিপ্রবর-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হয় নাই। এখন প্রশ্ন এই—প্রহাস কোন্ সময়ের লোক ছিলেন? লিপিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে, আলোচ্য পাষাণ-লিপিটি গৌড়েশ্বর নয়পাল-দেবের সমসাময়িক বা তাঁহার রাজ্যকালের অনতিপূর্ব্বের বা অনতিপরের লিপি হইতে পারে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের এই লিপির প্রশংসার পাত্র প্রহাস নামক দ্বিজ। কিন্তু, লিপিতে প্রহাসেরও ঊর্দ্ধতন ছয়পুরুষের কীর্ত্তি-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রহাসের প্রশস্তিতে সাত পুরুষের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, কুলের প্রথমপুরুষ পশুপতি প্রহাসের প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বের লোক হইবেন। তাহা হইলে নবমশতাব্দীর শেষভাগে বা দশমের প্রথমভাগেই পশুপতির উদ্ভব-কাল স্থিরীকৃত হইতে পারে। এখানেও ভ্রান্ত হইবার উপায় নাই। পশুপতির পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রুতি-স্মৃতিতে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা [ "বিদ্যাভিজনতপসামাশ্রয়ত্বেন" ] বিদ্যা, আভিজাত্য ও তপঃক্রিয়াদির

( ১ ) বিষ্ণুপুরাণ—চতুর্থাংশ, ১৯ অধ্যায়।

আশ্রম বলিয়া দর্পিত ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বরেন্দ্রীর অলঙ্কারস্বরূপ বাল-গ্রাম-নামক গ্রামে বাস করিতেন। তৎপর তাঁহারা নিকটবর্ত্তী শীয়ম্বনামক স্থানে বিরল্-বাসের জন্য চলিয়া যান। আলোচিত গণনা অনুসারে, নবমশতাব্দীর শেষভাগে বা দশমের প্রথমভাগে যখন তাঁহারা শীয়ম্বে চলিয়া যান—তথনও শীয়ম্বের পূর্ব্ব-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের কুল একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কতকাল ধরিয়া যে সেই স্থানের দ্বিজগণও [ "তপসি বিনয়ে স্বাসু বিদ্যাসু" ] তপঃ-কার্য্যাদিতে, বিনয়ে ও স্বস্ববিদ্যাতে ( শ্রুতি-স্মৃতিতে ) নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বালগ্রামে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় ছিলেন, তাহার উল্লেখও প্রশস্তির ২-৩ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,

"যেষাং তস্য হিরণ্য-গর্ব্ভবপুষঃ স্বাঙ্গপ্রসূতাঙ্গিরো-
বংশে জন্ম সমানগোত্রবচনোৎকর্ষো ভরদ্বাজতঃ।
তেষামার্য্য-জনাভিপূজিতকুলং তর্ক্কারিরিত্যাখ্যয়া
শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জ্জন্মনাং ( ম্ ) ॥ ২ ॥
যস্মিন্ বেদ-স্মৃতি-পরিচয়োন্নিদ্র-বৈতান গার্হ্য -
প্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্বোম্নি শুভ্রে।
ব্যভ্রাজস্তোপরি-পরিসর দ্ধোমধূমা দ্বিজানাং
দুগ্ধাম্ভোধি-প্রসৃত-বিলসচ্ছৈবলালীচয়াভাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধ তর্কারি-নামক স্থানই তাঁহাদের কুলস্থান ছিল—সেখানে আর্য্যজনের পূজিত অনেক অনেক কুল ছিল। এখানকার দ্বিজগণের শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত পরিচয় ছিল বলিয়া, তাহারা সর্ব্বদা প্রভূত ভাবে শ্রৌত ও গার্হ্য আহুতির সম্পাদন করিয়া থাকিতেন। এমন কি, তাঁহাদের হোমধূমে নভোমণ্ডল আবৃত হইয়া যাইত। এখন জিজ্ঞাস্য এই "শ্রাবস্তি" কোন্ শ্রাবস্তী ?

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এক শ্রাবস্তী নগরীর উল্লেখ আছে—রামের দূতগণ শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইয়া, রামকর্ত্তৃক লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, রামের প্রতিজ্ঞা, কুশ-লবের রাজ্যাভিষেক ও পৌরজনের রামানুগমনের ইচ্ছার কথা নিবেদন করিয়া

২ ) যে,

"কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্য পর্ব্বত-রোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা ॥

( ২ ) রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড, ১২১ অধ্যায়, ৪-৫ শ্লোক।

শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য চ।
অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা॥
স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কৃতবন্তো মহারথৌ।”

রামচন্দ্র লবের রাজধানীর জন্য যে পুরী নির্দ্দিষ্ট করিলেন—তাহার নাম করা হইল “শ্রাবস্তী”। এই শ্রাবস্তী যে কোশল দেশান্তর্ভুক্ত তাহাতে সংশয়ের কারণ দেখা যায় না। বায়ুপুরাণেও রামপুত্র লবের রাজধানী “শ্রাবস্তী” যে উত্তরকোশলে অবস্থিত ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা (৩),

“কুশস্য কোশলা রাজ্যং পুরী বাঽপি কুশস্থলী।
রম্যা নিবেশিতা তেন বিন্ধ্য-পর্ব্বতসানুষু॥
উত্তরা কোশলে রাজ্যং লবস্য চ মহাত্মনঃ।
শ্রাবস্তী লোকবিখ্যাতা কুশবংশং নিবোধত॥”

কিন্তু মৎস্য পুরাণে ও কূর্ম্ম-পুরাণে আর একটি শ্রাবস্তীর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেই শ্রাবস্তী কোশলে অবস্থিত বলিয়া কোনরূপ ইঙ্গিত নাই—তাহা “গৌড়দেশে” অবস্থিত বলিয়া উভয়ত্র বর্ণিত যথা;

“শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসকস্তৎ-সুতোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়-দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥” (৪)

এবং,

“তস্য পুত্রোঽভব দ্বীরঃ সাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
নির্ম্মিতা যেন সাবস্তিঃ গৌড়-দেশে মহাপুরী।” (৫)

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় লবের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী [ যুবনাশ্বপুত্র ] শ্রাবস্ত নামক রাজা এই পুরী “গৌড়দেশে” নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মনীষী কানিংহাম রাপ্তি নদীর দক্ষিণে অবস্থিত গোণ্ডা নামক স্থানকেই উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে উক্ত “গৌড়-দেশ” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন (৬)—

“In the Vayu Purana LAVA the Son of Rama is said to have reigned in Uttara Kosala; but in the Matsya Linga and Kurma

(৩) বায়ুপুরাণ—৮৮ অধ্যায়, ১৯৯-২০০ শ্লোক।

(৪) মৎস্য-পুরাণ—১২ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক।

(৫) কূর্ম্মপুরাণ—২০ অধ্যায় [ Bibli. Bid. ] N—পুঁথিতে “শ্রাবস্তিঃ” পাঠ আছে বলিয়া পাদটীকায় উল্লিখিত আছে।

(৬) Ancient Geography—P. 408.

Puanas, SRAVASTI is stated to be in GAUDA. These apparent discrepancies are satisfacto:ily explained when we born that GAUDA is only a subdivision of UTTARA KOSALA, and that the ruins of Sravasti have actually been discovered in the dlstrict of GAUDA, which is the Gonda of the maps."

অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছেন—"বায়ু-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, রাম-পুত্র লব উত্তর কোশলে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু মৎস্য লিঙ্গ ও কূর্ম্ম-পুরাণে শ্রাবস্তী গৌড়-দেশে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত। দৃশ্যতঃ পরস্পর-বিরোধী এই উক্তিদ্বয়ের সুন্দর-রূপে একটি সামঞ্জস্য এইরূপে সাধিত হইতে পারে—উত্তর কোশলের একটি অংশের নাম "গৌড়" ( ? ) এবং বাস্তবিক এই গৌড়েই ( ? ) [ ম্যাপে যাহার নাম "গোণ্ডা" ] শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।" ইহার উত্তরে, আমরা বলিতে চাই যে, রামায়ণে ও বায়ু-পুরাণে উল্লিখিত রামপুত্র লবের রাজ-ধানীরূপে বর্ণিত "শ্রাবস্তী" নগরী বাস্তবিকই কোশলে অবস্থিত শ্রাবস্তী বলিয়াই ধরা যায় ; এবং ইহা যে অযোধ্যার "গোণ্ডা" নামক স্থানে অবস্থিত তাহাতেও আপত্তি কি ? প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ এই কোশল দেশের "গোণ্ডা" নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও সত্য। বুদ্ধের সমসাময়িক কোশলাধিপ প্রসেনজিৎ এই শ্রাবস্তী নগরীতে রাজধানী-স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠেই অনাথ-পিণ্ডদ-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধগণের সুপ্রসিদ্ধ জেতবন-বিহার অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধগণের পালিগ্রন্থে কোশলের শ্রাবস্তীরই বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু, মৎস্য, লিঙ্গ ও কূর্ম্ম-পুরাণে উল্লিখিত "গৌড়দেশে" অবস্থিত "শ্রাবস্তী" নগর লবের প্রসঙ্গে উক্ত হয় নাই—তাহা লবের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ইক্ষ্বাকু বংশীয় যুবনাশ্ব-পুত্র শ্রাবস্ত নামক রাজ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার সহিত কোশলের শ্রাবস্তীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ লক্ষিত হয় না—অতএব তাহারা দৃশ্যতঃ ("apparently") নহে, বাস্তবিকই (really) পরস্পর-বিরোধী। দুইটি শ্রাবস্তী স্বীকার না করিলে, এই বিরোধের ভঞ্জন হইবে বলিয়া মনে হয় না। "শ্রাবস্তী" এই নামটির অনুরোধে, "গৌড়কে" কোশলের "গোণ্ডা" বলিয়া স্থির করিয়া লইয়া সামঞ্জস্য বিধান করা সঙ্গত মনে হয় না। বিশেষতঃ রামায়ণের ২—৬ কাণ্ডের কোন স্থানে কোশলের রাজধানী-রূপে শ্রাবস্তী-নগরীর উল্লেখ নাই, অযোধ্যারই উল্লেখ আছে। শ্রাবস্তীর উল্লেখ কেবল উত্তর

কাণ্ডেই পাওয়া যায়। শ্রাবস্ত-প্রতিষ্ঠিত কোন শ্রাবস্তী যদি বাস্তবিকই কোশলে অবস্থিত ছিল বলিয়া বিখ্যাত থাকিত, তাহা হইলে রামায়ণের প্রাচীনাংশে ১—৬ কাণ্ডে তাহার উল্লেখ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। পণ্ডিতগণের মতে কিন্তু উত্তর-কাণ্ড পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের সমৃদ্ধ নগরী কোশলের শ্রাবস্তীকেই, হয়ত, পরবর্ত্তী কালের পুরাণ-রচয়িতা লবের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিতে পারেন। বায়ু-পুরাণকারও সম্ভবতঃ তাহাই করিয়া থাকিবেন। মৎস্য লিঙ্গ ও কূর্ম্ম-পুরাণের রচয়িতৃগণও হয়ত, গৌড়দেশের শ্রাবস্তিকে শ্রাবস্ত-প্রতিষ্ঠিতপুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। একশ্রেণীর পৌরাণিক লেখকগণ, পরস্পর বিভিন্ন শ্রাবস্তী নগরদ্বয়ের মধ্যে, একটিকে লবের রাজধানী-রূপে ও অন্য শ্রেণীর পৌরাণিক লেখকগণ অপরটিকে শ্রাবস্ত-প্রতিষ্ঠিত রূপে কল্পনা করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, বিনা-বিচারে কানিংহামের মতানুসরণ করিয়া, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (৭) যে,—"বর্ত্তমান অযোধ্যা-প্রদেশের গোণ্ডা জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতক স্থান লইয়া গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল।" আমাদের মনে হয় যে, শ্রাবস্ত-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত শ্রাবস্তি নগর আমাদের বাঙ্গালায় ["গৌড়দেশে"ই] অবস্থিত ছিল। আমাদের গৌড়দেশে যে শ্রাবস্তি বলিয়া একটি নগর ছিল, তাহার প্রমাণও আলোচ্য প্রশস্তির দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্লোকের শ্রাবস্তিকে যদি কোশলের শ্রাবস্তী বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে প্রশস্তির চতুর্থ শ্লোকের অর্থসঙ্গতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই শ্লোকটিও এস্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"তৎ-প্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু সকটী-ব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রী-মণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ॥"

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে "শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধ তর্ক্কারি" নামক স্থানের বর্ণনার পর, এই শ্লোকে বলা হইল যে, বরেন্দ্রীর অলঙ্কার-স্বরূপ বালগ্রাম-নামক বিখ্যাত গ্রামটিও "তৎপ্রসূত" হইয়া, "সকটী" [নদী বা স্থানবিশেষের নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়] দ্বারা ব্যবধানযুক্ত হইয়া পুণ্ড্রজনপদেই অবস্থিত ছিল। বাল-গ্রামকে শ্রাবস্তি প্রতিবদ্ধ তর্ক্কারি হইতে "প্রসূত" বলা হইয়াছে। "বালগ্রাম"

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমভাগ [দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬৮ পৃঃ]

—এই নামটি হইতেও অনুমিত হয় যে সে সময়ে ইহার প্রতিষ্ঠাও নূতন (বাল) ছিল। এক গ্রামকে অন্য স্থান হইতে প্রসূত বলিলে—মনে করা যাইতে পারে যে, গ্রামটি সেই বৃহত্তর স্থানেরই অংশবিশেষ, অথবা সেই স্থান হইতে ত্যক্ত-নিবাস লোকজন দ্বারা গঠিত। সে যাহা হউক, বরেন্দ্রীর বালগ্রাম ও শ্রাবস্তির তর্কারি—এতদুভয় স্থানের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা "সকটী" শব্দদ্বারা উল্লিখিত। এখন যদি এই শ্রবস্তি ও কোশলের শ্রাবস্তী একই হয়, তাহা হইলে বরেন্দ্রীতে অবস্থিত বালগ্রাম ও কোশলের শ্রাবস্তী [ বা তৎপ্রতিবদ্ধ তর্কারি ] এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূখণ্ডের নাম "সকটী" ধরিতে হয়-কিন্তু ইহার নাম যে "সকটী" ছিল, তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। চতুর্থ শ্লোকের "চ" শব্দ হইতেও আমরা পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত তর্কারিকেও পুণ্ড্রে অবস্থিত মনে করিতে পারি। এই ব্যাখ্যা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে এই শ্রবস্তি পুণ্ড্রজনপদেই [ "গৌড়দেশে" ] অবস্থিত ছিল তাহার সন্দেহ থাকে না, এবং এই হিসাবেই উপরি উদ্ধৃত মৎস্য ও কূর্ম্মপুরাণাদির বচনার্থও সঙ্গত হইয়া, আমাদের "গৌড়দেশেই" শ্রাবস্তি নামক নগরান্তরের অস্তিত্ব প্রতি-পাদন করে।

বাঙ্গালার শ্রাবস্তি নগর ও তৎপ্রতিবদ্ধ তর্কারি, বালগ্রাম ও বালগ্রামের নিকটবর্ত্তী শীয়ম্ব নামক স্থানসমূহে, অতিপ্রাচীনকাল হইতে সাগ্নিক বেদবিৎ "শ্রৌতস্মার্ত্তার্থ-বিষয় জগৎ-সংশয়চ্ছেদক" ও "গোত্রস্থিতি—বিধিভৃৎ" স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। যে শিলিমপুরে এই প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নিকটে "বলিগ্রাম" নামক এক গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বগুড়ার-ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি এল্ মহাশয়ও লিখিয়াছেন (৮) যে "ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত ও উক্তথানা হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে 'বলিগ্রাম' নামক একটি গ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়"। হয়ত, প্রশস্তিতে উল্লিখিত "বালগ্রামই এখন "বলিগ্রাম" নাম ধারণ করিয়া থাকিবে! এই বলিগ্রামের সন্নিকটে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণ প্রহসিত শর্ম্মার নামাঙ্কিত একটি প্রস্তরস্তম্ভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহাএখন সমিতির প্রতিমাগৃহের প্রাঙ্গণে রক্ষিত আছে। কিন্তু লিপি-হিসাবে উহাকে প্রহাসের পরবর্ত্তী কোন সময়ের স্তম্ভ বলিয়া

(৮) বগুড়ার ইতিহাস (ভুমিকাংশ) [ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎগ্রন্থাবলীভুক্ত ]—

নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। শীয়ম্বের সহিত বর্ত্তমান শিলিমপুরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহাও বলা যায় না। যে স্থানে আলোচ্য প্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহেও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অনেক চিহ্ন অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রহাস. পিতার জন্য ও নিজ পুণ্যোপচয়ের জন্য, যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেবতার প্রতিষ্ঠা করা য়াছিলেন এবং মাতার জন্য যে জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, তাহাও প্রশস্তির প্রাপ্তি স্থান হইতে বেশীদূরে হইবে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ সেই স্থানের জমিদার বিজয়বাবুর লোকজনের মুখে শুনিয়াছি যে, সেই স্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহদায়তন বহু জলাশয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণ সেই স্থানে শীঘ্রই যাইবেন বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন এবং বিজয়বাবুও তাঁহাদের পরিদর্শনের সহায়তা বিধান করিবেন বলিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এখানে আর একটি প্রশ্নের উত্থাপন করা যাইতেছে। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, প্রশ্নটি এই—কি অবস্থায়, কোন্ সময়ে, পঞ্চগৌড়েশ্বর (?) আদিশূর কান্যকুব্জ বা কোলাঞ্চল হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন এবং বাস্তবিকই তিনি ব্রাহ্মণানয়নের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, কি, না? এই প্রশ্নের উত্তর ও মীমাংসা অদ্যাপি সম্যগ্‌রূপে প্রদত্ত হইতে পারিবে না। প্রথমতঃ আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ মহাশয় এই আদিশূরের কাহিনীতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন (৯)। তিনি অনেক সভাসমিতিতে প্রবন্ধ লিখিয়াও এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নানা তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। তৎপর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ও তদীয় অচিরে প্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাসে" এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া (১০) দেখাইয়াছেন যে, কুলশাস্ত্রের পরস্পর-বিরোধী উক্তি-সমূহের উপর নির্ভর করিয়া, আদিশূরের কাল-নির্ণয় একরূপ অসম্ভব। এই জন্যই তিনি "বাঙ্গালীর জনশ্রুতিমূলক ইতিহাসের প্রধানপাত্র আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে" গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিয়াছেন। কেহ এই উভয় ঐতিহাসিকের মতামত পাঠ করিবার জন্য

(৯) গৌড়রাজমালা—১৮-১৯ পৃঃ [পাদটীকা দ্রষ্টব্য]।

(১০) বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথমভাগ)—২৩৮-২৪৪ পৃঃ।

উৎসুক হইলে, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়িলেই জানিতে পারিবেন। এই স্থানে আমাদের এইটুকুমাত্র বক্তব্য যে, একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপূর্ব্বে কখনও যে বাঙ্গালায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলোচ্য কুলপ্রশস্তিতেও দেখা যায় যে, ভরদ্বাজগোত্রীয় প্রহাসের বহুপূর্ব্বপুরুষগণেও পৌণ্ড্রজনপদের বরেন্দ্রী-মণ্ডলে চিরকাল বসতি করিয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাদের জন্মভূমিও এই বরেন্দ্রী-মণ্ডলেই পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা কান্যকুব্জাদি অন্য কোন স্থান হইতে আনীত হইয়াছেন বলিয়া ত কোন বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না! ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি (১১) হইতে যেমন আমরা রাঢ়াশ্রীর অলঙ্কারস্বরূপ সিদ্ধলগ্রামের ভট্টভবদেবের সাবর্ণসগোত্র ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ ভবদেবকে বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষকে কোন স্থান হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লিখিত পাইতেছি না, সেইরূপ বরেন্দ্রীর অলঙ্কারস্বরূপ বালগ্রামের সন্নিহিত শীয়ম্ব নামক স্থানের প্রহাস নামক বিপ্রের ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ পশুপতিকে বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষকে কোন স্থান হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লিখিত পাইতেছিনা। যদি তাঁহারা কান্যকুব্জ বা অন্য কোন স্থান হইতে কোন রাজকর্ত্তৃক আনীত হইতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহা তাঁহাদের কুলপ্রশস্তিতে বর্ণিত থাকিত। তবে কখনও যে মধ্যদেশ হইতে এদেশে ব্রাহ্মণ আসেন নাই, সে কথাও বলা যাইতে পারে না। এখনও ত নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া নানাগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন? বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মার বেলাব লিপিতে (১২) আমরা সাবর্ণসগোত্র পীতাম্বর-শর্ম্মাকে মধ্যদেশ-বিনির্গত বলিয়া উল্লেখিত পাইতেছি। উত্তর-রাঢ়ার সিদ্ধলগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। এমনও হইতে পারে যে এ দেশের সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ (যথা, ভট্টভবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ) বহুপূর্ব্বকাল হইতেই সিদ্ধলগ্রামে বাস করিতেছিলেন—বেলাব-লিপিতে উল্লেখিত সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ হয়ত, পরবর্ত্তী কালে মধ্যদেশ হইতে তথায় আসিয়া পূর্ব্বকাল হইতে অবস্থিত সমানগোত্রীয়গণের সহিত মিশিয়া যাইয়া থাকিতে পারেন। বিভিন্ন কুলপঞ্জিকার মতে, যে যে বিভিন্ন

(১১) Epigraphia Indica, vol vi, p. 303 ff.

(১২) Epigraphia Indica, vol xii, p. 41.

সময়ে আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণানয়নের কথা বর্ণিত পাওয়া যায়, সেই সেই সময়ে কিন্তু আমরা বাঙ্গালাতে সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, শ্রৌত ও গার্হ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। প্রসিদ্ধ গরুড়-স্তম্ভলিপি (১৩) হইতে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর নারায়ণপাল-দেবের মন্ত্রী গুরবমিশ্র ও তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ, গৌড়েশ্বর দেবপাল দেবের মন্ত্রী, শ্রীদর্ভপানিও গৌড়দেশবাসী ও শাণ্ডিল্য-বংশোদ্ভব ছিলেন। গৌড়কবি চতুর্ভুজের "হরি-চরিতম্" নামক কাব্যে কবি প্রসঙ্গক্রমে, স্ববংশের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তিনি কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্ণরেখের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বরেন্দ্রীর বন্দ্যতম করঞ্জনামক গ্রামটি এই স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপালনামক নরপালের নিকট হইতে ["নৃপধর্ম্মপলাৎ"] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "গৌড়কবি চতুর্ভুজ" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩), শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের মতে আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়দেশে আনীত সুষেণ মুনির বংশধর স্বর্ণরেখের কাল নির্ণয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—"স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপাল দেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা কুলশাস্ত্রের আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। না পারিলে, ইতিহাস চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণেরই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে।" আমরা কুলশাস্ত্রের আলোচনায় লিপ্ত নহি বলিয়া, ইহার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না। বরেন্দ্রীভূমির ভাব-গ্রামনিবাসী কৌশিকসগোত্র শ্রীধরনামা ব্রাহ্মণকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপরাজ বৈদ্যদেব ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণও বেদার্থ-রহস্যবিৎ ছিলেন বলিয়া তাঁহার কমৌলি লিপিতে বর্ণিত হইয়াছেন—যথা, (১৫)

"কর্ম্মব্রহ্মবিদাং মুখ্যঃ সর্ব্বাকার-তপোনিধিঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্ত-রহস্যেষু বাগীশ ইব বিশ্রুতঃ॥"

অতএব নবম হইতে দ্বাদশ শতব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কোন সময়েই বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ও স্বকর্ম্মকুশল ব্রাহ্মণের অভাব লক্ষিত হয় না। যাঁহাদের মতে "বেদবাণাঙ্গশাকে" অর্থাৎ পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, আনুমানিক

(১৩) গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃঃ।

(১৪) সাহিত্য—আষাঢ়, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

(১৫) গৌড়লেখমালা—১৩৪ পৃষ্ঠা. ২৭ শ্লোক।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে, রাজা আদিশূর বিদ্যমান ছিলেন এবং বৌদ্ধপ্রভাব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য, বৈদিক বিধির আচরণ-কারী ব্রাহ্মণ-গণ কর্ত্তৃক এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে মনে করিয়া, রাজা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মতও যে সমীচীন নহে, তাহার প্রমাণ করিতে হইলে সামন্তরাজ লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসনে উল্লেখিত লোকনাথের "ভরদ্বাজ-সদ্বংশজাত" পূর্ব্বপুরুষের কথা এবং অগস্ত্য-সগোত্র তাঁহারই মহাসামন্ত, সাগ্নিক ব্রাহ্মণকুলের দৌহিত্র, প্রদোষশর্ম্মার কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত (১৬) প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত [ষষ্ঠ শতাব্দীর] চারিখানি তাম্রশাসনের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়খানিতে ভরদ্বাজসগোত্র ব্রাহ্মণের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৭)। গুপ্তযুগেও যে বঙ্গে সদ্ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণও সেই যুগের পাঁচখানি অপ্রকাশিত অচিরাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বা তাঁহাদের রাজ্য-সময়ে, এমন কি তাঁহাদের পরে কোন সময়েই বাঙ্গালায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবের প্রমাণ না পাওয়ায় বলিতে হয়, যে আদিশূর নামক কোন রাজা বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার নিকট বৈদিক ব্রাহ্মণের অভাব অনুভূত হইতে পারিত না; এবং সেই অভাব পূরণের জন্যও তাঁহাকে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইবার প্রয়োজন অনুভব করিতে হইত না। অন্ততঃ বরেন্দ্রীভূমি যে চিরকালই ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভবক্ষেত্র ছিল—সে কথা গৌড়েশ্বর মদন-পালদেবের সমসাময়িক কবি সন্ধ্যাকর-নন্দীও স্বরচিত "রাম-চরিতম্" নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। একপক্ষে রামবনিতা সীতাদেবী ও অপর পক্ষে রামপালের "জনকভূ" বরেন্দ্রীর বর্ণনা করিতে গিয়া, কবি উভয়কে "ব্রহ্মকুলোদ্ভবাম্" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন (১৮)। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে স্থান বরেন্দ্রী চিরকাল ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভব ছিল। ইহাই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের গৌরবের কথা হওয়া উচিত। জনশ্রুতি বড়ই ভয়ানক বস্তু,—সমসাময়িক অন্যান্য প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হইলে জনশ্রুতিকে

(১৬) সাহিত্য—১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

(১৭) Indian Artiquary, 1910, p, 196 and 204.

(১৮) Mem. A. S. B. vol iii, No 1, p. 47. [v. 9. chap iii.]

ইতিহাসের উপাদান বলিয়া ঐতিহাসিক গ্রহণ করিতে পারেন। কাজেই কান্যকুব্জ হইতে বিপ্রানয়ন-কাহিনী সতর্কতার সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে। পাষাণ-লিপি বা তাম্রলিপি প্রভৃতির সমর্থন না পাইলে, পাষাণ-পন্থিদিগের নিকট জনশ্রুতিমূলক কাহিনী সংশয়ের কাহিনী বলিয়াই থাকিয়া যাইবে।

আর একটি ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রশস্তির ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রহাস জয়পালদেবনামা এক কামরূপ-নৃপতির তুলাপুরুষ-দানকালে রাজকর্ত্তৃক অত্যন্ত যাচ্যমান হইয়াও, তাঁহার নিকট হইতে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা ও একসহস্র মুদ্রার আয়-বিশিষ্ট শাসনভূমি প্রতিগ্রহরূপে গ্রহণ করেন নাই। শ্লোকটি এইরূপ,

"যঃ কামরূপনৃপতের্জ্জয়পালদেব-
নাম্নঃ তুলাপুরুষদাতুরচিন্ত্য-ধাম্নঃ।
হেম্নাং শতানি নব নির্ভরমর্থ্যমানো
নৈবাদদে দশশতোদয়-শাসনং চ॥"

প্রহাস নিজে যে সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, নচেৎ তিনি কি প্রকারে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, পিতার উদ্দেশ্যে ও নিজ পুণ্যবৃদ্ধির জন্য ত্রিবিক্রম ও অমরনাথের বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া, মাতার উদ্দেশ্যে জলাশয় খনন করাইয়া, অন্নসত্র স্থাপন করিয়া দিয়া একটি দেবতার জন্য উদ্যান ও সপ্তদ্রোণ পরিমিতভূমি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন? সৎপ্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মভুক্ত হইলেও, প্রহাস কেন যে কামরূপরাজের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন নাই, তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রহাস নিজে সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ব্রহ্মবর্চ্চস-রক্ষা-কামনায় সগৌরবে রাজপ্রতিগ্রহের প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকিতে পারেন। হয়ত বা, সেই সময়েও ব্রাহ্মণের পক্ষে সুবর্ণ প্রতিগ্রহ সমাজে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, নচেৎ দাতার হীনকুলতা প্রভৃতি কোন দোষের পরিচয় না দিয়াও, তিনি কেন প্রতিগ্রহ অস্বীকার করিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। তবে প্রতিগ্রহ পাইয়াও তাহার প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা উৎকর্ষের কথা। যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাই বলিয়াছেন (১৯) যথা—*

* "প্রতিগ্রহ-সমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্॥"

"প্রতিগ্রহ-সমর্থ হইয়াও, যিনি প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন না,—দাতৃগণ [দান-মাহাত্ম্যে] যে লোক প্রাপ্ত হন—তিনিও সেই লোক প্রাপ্ত হন।"

(১৯) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি—১ অধ্যায়, ২১৩ শ্লোঃ।

এখন জিজ্ঞাস্য, উদ্ধৃত শ্লোকের কামরূপ রাজ জয়লাল-দেব কে, এবং কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের মতে আলোচ্য প্রশস্তি একাদশ শতাব্দীর লিপি। একাদশ শতাব্দীতে কামরূপের কিরূপ অবস্থা ছিল, কাহারাই বা তখন তথায় রাজত্ব করিতেন ? গৌড়াধিপ দেবপাল-দেবের অনুজের নাম ছিল জয়পাল। এই জয়পাল [ "পূর্ব্বজ" ] দেবপাল দেবের নিদেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, কামরূপের বিরুদ্ধে এক অভিযান করিয়াছিলেন; এই তথ্য নারায়ণপাল-দেবের ভাগলপুর-লিপি (২০) হইতে জানা গিয়াছে, কিন্তু এই জয়পালের সময় আলোচ্য প্রশস্তির সময়ের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। এখন দেখা যাউক, অন্য কুত্রাপি কোন জয়পাল-দেবের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না। সারনাথে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে যে জয়পালের কথা উল্লিখিত আছে, তিনিও মনীষিগণের মতে দেবপাল-দেবেরই ভ্রাতা (২১)। আরও একটি জয়পালের কথা ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে বলিয়া তাঁহার কথা সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় "রাম-চরিতম্" কাব্যের অনুক্রমণিকার ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সেই জয়পালও দেবপালেরই ভ্রাতা—অনুজ নহে, কিন্তু, তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র। তৎপর শস্ত্রিমহাশয়ের মতানুসরণ করিয়া, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ মহাশয় একবার তাঁহার "The Palas of Bengal" (২২) নামক ইংরেজী প্রবন্ধে ও আর একবার তাঁহার স্বরচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' (২৩), ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশের সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া উভয়ত্র সমান সিদ্ধান্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তদীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে "দেবপালদেবের খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল তাঁহার পিতা বাক্‌পালদেবের শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহাদান উমাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উমাপতির উত্তর-পুরুষ নারায়ণ তদ্‌রচিত ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ নামক গ্রন্থে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন"। শ্লোকটির এস্থলে পুনরুদ্ধার-পূর্ব্বক আলোচনা কর্ত্তব্য মনে করিয়া, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

(২০) গৌড়লেখমালা—৫৭-৫৮ পৃঃ।

(২১) A. S. R. 1907-8, p. 35.

(২২) Mem. A. S. B, vol v, No 3. p, 58.

(২৩) বাঙ্গালার ইতিহাসে—১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা

"তস্মাদ্ ভূষিতসাব্ধিভূমি-বলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্য ব্রজৈ—
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকর-গ্রামণীঃ।
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ সহি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা—
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥"

শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর ইতিহাসে "প্রাভাকর"কে "প্রভাকর"রূপে এবং "ক্ষ্মাপালাৎ"কে "ক্ষ্মাপালৎ"রূপে মুদ্রিত দেখা যায়। সে যাহা হউক, শ্লোক হইতে আমরা কি অর্থ পাইতেছি? যেরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহা এইরূপ বলিয়াই প্রতিভাত হয়—জয়পাল নামক কোন "ক্ষ্মাপাল" (নৃপতি) হইতে, প্রাভাকর-শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান উমাপতি নামক পণ্ডিত, মহাদান-রূপ প্রভূত মহাশ্রাদ্ধ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই"ক্ষ্মাপাল"জয়পাল যে দেবপালদেবের খুল্লতাত-পুত্র ছিলেন এবং তিনি যে পিতা বাক্‌পালদেবের শ্রাদ্ধকালে উমাপতিকে মহাদান দান করিয়াছিলেন—এত কথাত শ্লোকার্থ হইতে পাওয়া যায় না। জয়পালের সহিত দেবপাল ও বাক্‌পালের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, শ্লোকে তাহার কোন পরিচয় নাই, কেবল জয়পাল যে রাজা ("ক্ষ্মাপাল") ছিলেন, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেবপালানুজ জয়পাল যে কখনও কোন স্থানের "ক্ষ্মাপাল" ছিলেন, এযাবৎ তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব, নিঃসংশয়ে ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশের জয়পালকে বাঙ্গালার পালবংশীয় জয়পালরূপে গ্রহণ করিবার কারণ পরিদৃষ্ট হয় না। আলোচ্য শিলিমপুর-প্রশস্তির ২২শ শ্লোকে উল্লিখিত কামরূপ-রাজ জয়পালদেবই যে ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশের "ক্ষ্মাপাল জয়পাল" নহেন—তাহাও বলা কঠিন। বরং এই দুই স্থানে উল্লিখিত জয়পাল যে একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, আমরা আলোচ্য প্রশস্তিতে দেখিতে পাইতেছি যে কামরূপ-রাজ জয়পাল তুলাপুরুষদান-রূপ মহাদান দান করিতে উদ্যত হইয়া, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ প্রহাসকে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা ও দশশত মুদ্রার আয়-বিশিষ্ট শাসন-ভূমি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু, উমাপতি যেমন মহাদানের প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, প্রহাস তাহার প্রতিগ্রহ না করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; তবে উমাপতিও বোধ হয়, অনিচ্ছায় মহাদান স্বীকার করিয়াছিলেন—তাঁহার "অর্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ" এই বিশেষণটিতেই যেন তাহার হেতু প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রার্থীরা উমাপতি-সমীপে প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার হৃদয়কে অনুকম্পায় আর্দ্র করিয়া থাকিবেন—এবং হয়ত তিনি নিজে জয়পালদেবের প্রতিগ্রহ স্বীকার করিয়া তাহা অন্যান্য অর্থিদিগকে প্রদান

করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশে উল্লিখিত জয়পাল ও শিলিমপুর-প্রশস্তিতে উল্লিখিত জয়পাল যে অভিন্ন ব্যক্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত সম্প্রতি অচল হইলেও, ইহা একটি বিবেচ্য বিষয় বলিয়া এইস্থানে আলোচিত হইল। প্রশস্তির কামরূপাধিপ জয়পাল কোন্ বংশের রাজা? কামরূপেও যে পালোপাধিক রাজগণ মধ্য-যুগে রাজত্ব করিতেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। রত্নপাল নামক প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতির দুইখানি তাম্রশাসন (২৪) হইতে, এবং রত্নপাল-পৌত্র ইন্দ্রপালের গৌহাটি-তাম্রশাসন (২৫) হইতে জানিতে পারা যায় যে, পালোপাধিক ব্রহ্মপাল রাজাই এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন। এই পালবংশীয় রাজগণ নরক ও ভগদত্তের বংশে উৎপন্ন বলিয়া নিজদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মপালের পর, তৎপুত্র রত্নপাল, এবং রত্নপালের পর তাঁহার পুত্র পুরন্দরপাল কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুরন্দরপাল হইতেই পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্রপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই রাজত্বের অষ্টমসংবৎসরে তাম্রশাসন সম্পাদন-পূর্ব্বক কাশ্যপ-সগোত্র দেশপাল-নামক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রপাল পর্য্যন্ত রাজগণের মধ্যে আমরা জয়পাল নামক কোন কামরূপ-রাজের উল্লেখ প্রাপ্ত হইতেছি না। প্রাচীন অক্ষর-তত্ত্ব-পারদর্শী ডাঃ হর্ণলি ইন্দ্রপালের গৌহাটি-তাম্রশাসনের অক্ষর আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন (২৬)। ডাঃ হর্ণলি তাঁহার প্রবন্ধের সহিত গৌহাটি-তাম্রশাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন—তাহার অক্ষর দেখিয়া, ইহাকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লিপি না বলিয়া, বরং দশম-শতাব্দীর লিপি বলিলেই যেন অধিকতর যুক্তি-যুক্ত মনে হয়। সে যাহা হউক, এস্থানে সেই বিচার নিষ্প্রয়োজন। আমরা কিন্তু শিলিমপুর-লিপির কাল একাদশ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং কাজেই ব্রহ্মপাল হইতে ইন্দ্রপাল পর্য্যন্ত কামরূপ-রাজগণের মধ্যে (প্রশস্তির ২২শ শ্লোকে উল্লিখিত) জয়পালদেবের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি না। ইন্দ্রপালের প্রপিতামহ ব্রহ্মপাল নরপতির বংশে, গোপালবর্ম্মা, হর্ষপালবর্ম্মা ও ধর্ম্মপালবর্ম্মা নামে আরও তিনটি কামরূপরাজের গৌহাটির অন্য একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে

(২৪) J. A. S B. vol lxvii, p. 99 and p. 120.

(২৫) J. A. S. B. vol, lxvie, p. 113.

(২৬) J. A. B. S. vol lxvi, p. 116.

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এযাবৎ সেই তাম্রশাসনখানি কুত্রাপি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে (২৭) এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র। এই তিন নৃপতি বোধ হয়, জয়পালাদির পরবর্ত্তী রাজা হইয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, আলোচ্য প্রশস্তির জয়পালকে পালোপাধিক কামরূপ-রাজগণেরই অন্যতম বলিয়া মনে করা যুক্তি-যুক্ত বোধ হয়, এবং তাঁহার স্থান ইন্দ্রপালের পরে, একাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে নির্দ্দেশ করিতে হয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভগে চালুক্য-রাজ, আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের পুত্র, বিহ্লনের "বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিতে"র নায়ক, কুমার বিক্রমাদিত্য পিতার আদেশক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া, এক কামরূপ-রাজ্যের "প্রাচ্য-প্রতাপ-শ্রীর" উন্মূলন করিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত রমাবাবু তাঁহার গৌররাজ-মালায় (২৮) এই প্রসঙ্গে অনেক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। বিক্রমনির্জ্জিত কামরূপ-রাজ কে, তাহাও আমরা অবগত নহি। ব্রহ্মপালের বংশজাত জয়পাল বা একাদশ-শতাব্দীর অন্য কোন পালোপাধিক কামরূপরাজই কি বিহ্লনের কাব্যোক্ত কামরূপ-নৃপতি হইয়া থাকিবেন? জয়পালও যে প্রাচ্য-প্রতাপ-শ্রীর আধার ছিলেন, তাহা কিন্তু আমরা প্রশস্তিতে উল্লিখিত তাঁহার "অচিন্ত্য ধামা" বিশেষণটি হইতেও প্রাপ্ত হইয়াছি। এই রাজা "অচিন্ত্য-ধামা" হইলেও, প্রহাস তাঁহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন নাই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

(২৭) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ঊনবিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা।

(২৮) গৌড়রাজমালা—৪৬-৪৭ পৃঃ।

# পরিণাম

ছিল একদিন,
ছিলে যবে মূর্ত্তিমতী মোর বক্ষে লীন,
বাহুর আকুল-বন্ধ মাঝে,
নিতান্ত আবেগভরে ধরা দিতে নিত্য নব সাজে।
বাসন্তী-উষায়,
ফুটন্ত সরোজবনে গুঞ্জনে মধুপ যথা ধায়,
গেছি তব মিলন-আশায় ;
হে মানসী-রাণি,
নিত্য রচি নব স্তুতিবাণী,
হৃদয়-নন্দন-ফুলে গাঁথি' নব মালা,
দিতাম চরণে তব অর্চ্চনার নিত্য নব ডালা।
নয়নের কাছে আজি নাই,
আঁখি-পাখী দিকে দিকে তোমারে খুঁজিয়া মরে তাই।
অতি দূর দিগন্ত হইতে
কার বার্ত্তা কোথায় লইতে
বহে ধীরে মন্দ সমীরণ,
গুঞ্জরিয়া ওঠে কাণে প্রিয়-পদ-নূপুর নিক্কণ।
চামেলী শেফালি ফোটে বনে,
তোমারি অঙ্গের মৃদু মধুগন্ধ আসে, ভাবি মনে ;
ঘন পত্র-অন্তরালে কপোতীর ভাষ
কাণে আনে তব চির-মধুর আশ্বাস।
উষার প্রথমারুণ-প্রভা,
তোমার প্রথম-প্রেম-সরমের সুরক্তিম-শোভা ;
শরতের সুনীল গগন,
তোমারি নীলিম-নেত্রে চিরতরে রয়েছে মগন ;
কলকণ্ঠ কোকিলের বাণী,—
তোমারি সোহাগ অনুমানি,
কদম্ব ফুটিয়া ওঠে গায়,
আবেশে অবশতনু, নেত্র মুদে যায়।

তব বক্ষ আকুল অঞ্চল লোটে তৃণে,
কুসুমে লাবণ্য ঝরে, ফুটে যাহা বিপিনে বিপিনে।
যবে ভ্রম বুঝি গো আমার,
অনিবার
কাঙাল-নয়নে বহে নদী,
নিমেষ-দরশ-আশে দিশে দিশে চাই নিরবধি!
স্বপ্ন যাচি মুদিয়া নয়ন,
কোথা স্বপ্ন? মোর যে গো নিশি-নিশি বিনিদ্র শয়ন!
প্রাণপণে ডেকে নাই সাড়া!
এ কি ব্যর্থ অভিসারে আমারে করেছে ঘরছাড়া?
মিথ্যা কথা! ব্যর্থ নহে মোর অভিসার,
ব্যর্থ নহে এ প্রেমের দীপক-ঝঙ্কার,
ব্যর্থ নহে জন্মভরা তপস্যা আমার।
আমি যাহা প্রাণপণে চাই,
পাইতে হইবে মোরে তাই,
জীবনে বা মরণের পরে;
অগ্নির বসতি নহে চিরদিন চির-অন্ধকারে।
দু'দণ্ডের ছায়া,
স্বার্থ-ঘেরা দুদণ্ডের মায়া,
উন্মত্ত বজ্রের বেগ কে রাখে ধরিয়া?
একদিন নিতে হবে বক্ষমাঝে সত্যেরে বরিয়া।
বৈরাগিণী, যত ইচ্ছা সাধিও বিরাগ,
কামনা বুঝিয়া নিবে তার পরিপূর্ণ পূজা-ভাগ।

# সাংঘাতিক গল্প

(১)

সেজেগুজে রামধন বোস্‌দের বৈঠকখানায় বসে আছি। থিয়েটর্ দেখ্‌তে যাব। রামধন বোস্ একটা গোদা বানরের মত। কিন্তু গয়ার তামাক ছাড়া খায়না। অল্পে চটিয়া লাল হয়, এবং তৎক্ষণাৎ জল হইয়া যায়। যতক্ষণ চটিয়া থাকে, ততক্ষণ আমি তার গড়গড়ার নল লইয়া বসিয়া টানিতে থাকি। জল হইয়া গেলে তাকে দিই। না চটিলে সে নল্ ছাড়েনা।

আজ রামধন চটে নাই। সর্ব্বনেশে ব্যাপার! আজ তার মেজাজ্ ঠাণ্ডা। নল কিছুতেই ছাড়ে না। রাত্রি প্রায় আট্‌টা। এমন সময় গদাধর বাহির হইতে চাদর মুড়ি দিয়া উপস্থিত। সে চীৎকার করিয়া বলিল "দেশ্‌টা ভেসে যাচ্ছে"। রামধন তড়াক্ করিয়া এক লম্ফ দিল। "সে কি কথা, কি সর্ব্বনাশ! কোথায় ভেসে যাচ্ছে? কতদূর ভেসে যাচ্ছে? মেয়ে-ছেলেদের যে মিত্তিরদের বাটীতে নেমন্তন্ন'। ওরে রামা, একবার খবর নিয়ে আয়, খবর নিয়ে আয়।"

মুষলধারে বৃষ্টি! ভাড়াটিয়া-গাড়ী পাওয়া মুস্কিল্! আমার একটা আতঙ্ক হইল। যদি দেশ্‌টা ভেসে যায়, তবে নিশ্চয় আমার বাড়ী আগে ভাসিবে। সেটা খুব পুরাতন বাড়ী। একবার ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল, ভাসার আর আশ্চর্য্য কি?

খুব বৃষ্টি! প্রবল গর্জ্জন! ক্রমে মেঘ আরও ঘনতর হইল। ফুটপাথে জল উঠিল। রামধনও চটিয়া উঠিল। "গোল্লায় যাউক্, চুলোয় যাউক, এদের একটু আক্কেল্ নাই দেখ্‌ছ?"

আমি সুযোগে নল্ টানিতে টানিতে বলিলাম "মোটেই নাই"।

রামধনের গর্জ্জন মেঘগর্জ্জন হইতেও একপর্দ্দা চড়া সুরে উঠিল। "কিছু বুদ্ধি নাই। এই যে ঘোর যুদ্ধ, চতুর্দ্দিকে আতঙ্ক, এই যে প্রলয়বৃষ্টি, এতেও তাদের চক্ষু খোলেনা?"

অমনি আকাশে কড় কড় শব্দ। গদাধর চক্ষু মুদিয়া আরামে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "এন্‌কোর! দেশ ভেসে যাচ্ছে, দাদা! ভাস্‌তে আরম্ভ হয়েছে। এন্‌কোর!"

বাস্তবিক আমার বোধ হইল বাড়ীগুলো ভাস্‌ছে। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ভাস্‌ছি। আমার আতঙ্ক অধিকমাত্রায় বাড়িল। বুকের মধ্যের শব্দ মুরলি-

বাবুর পাখোয়াজের বোলের মত বাজিতেছিল। ভাবিলাম 'আমার বাড়ী এতক্ষণ ভেসেছে, হয়ত এতক্ষণ গেঁওখালি কিংবা ডায়মণ্ডহারবারের মোড় পর্য্যন্ত পহুঁচিয়াছে। তা'র দশা কি হবে? সেত ছেলেমানুষ। আমার আশায় নিশ্চয় রান্নাঘরে বসেছিল। একতালা বাড়ী। দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি ভাঙ্গা। ঝি'র কি তেমন বুদ্ধি আছে? জলপ্লাবনের সময় একটা গাছের উপর তাকে চড়িয়ে দেবার বুদ্ধি কি তার আছে? আমি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম।

গদাধর পুনর্ব্বার বলিল 'এন্‌কোর!' রামধন বোস্ আমার দশা দেখিয়া বিলক্ষণ দমিয়া গেল।

আমরা বেশ টের পাচ্ছিলেম যে, বাড়ীগুলো দ্রুতবেগে ভেসে যাচ্ছিল। রাস্তা ঘাট্, ছ্যাকড়া-গাড়ীর ঘোড়া এবং চাকা, ট্রামওয়ের কনডাক্‌টার, ছাপাখানা, শুড়কির কল, মনুমেণ্টের মাথা, এবং কলেজষ্ট্রীটের যত দোকানদারের বহি, স্তূপাকারে ভেসে যাচ্ছিল। রামধন বোসের বাড়ী খুব টন্‌কো, তাই হেলেদুলে যাচ্ছিল। গদাধর বলিল 'এনকোর!'

গদাধরের 'এন্‌কোর' শুন্‌লেই রামা সুন্দর করিয়া গয়ার তামাক সাজিয়া আনিত। রামা খুব বিচক্ষণ চাকর। এতবড় প্রলয়ের মধ্যে তার দেশলাইয়ের কাঠি ভিজে নাই, টিকের আগুণ নিভে নাই, ফুঁ'র জোর কমে নাই।

হটাৎ 'ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান্' বন্ধ হইয়া গেল। দেয়ালের টিক্‌টিকিগুলো ক্রমে উঁচুতে উঠিতে লাগিল। রামধনের কাবুলি বেরাল, সে কখন কাঁদে না, আজ কাঁদিয়া উঠিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম যে জল উঁচু দিকে উঠছে।

(২)

গদাধর অঙ্কশাস্ত্রে এম্ এ। সে একজন খাঁটিলোক। আমাদের মধ্যে তারই একটু সাহস ছিল। প্রলয়কালে গণিত এবং বিজ্ঞান কাজে লাগে। গদা ছাড়া আমাদের আর কোন ভরসাই ছিল না।

আমি গদার নিকট সরিয়া গেলাম। 'বাস্তবিক কি জল উঁচু দিকে উঠছে?'

গদা। বিনু! (আমার নাম বিনোদ—দর্শনশাস্ত্রে এম্ এ) অবস্থা খারাপ! জল নিচু দিকেই যায়, তবে দেশের সর্ব্বত্রই যদি নিচু দিকে চাপ্ পায়, তবে উঁচু-দিকে উঠিবে নিশ্চয়। আমাদের দেশে আর নিচু জমি নাই।

আমি। নদীতে স্রোত আছে ত।

গদা। বোকা! নদীর স্রোত বন্ধ। সমুদ্দুর এবং নদী এবং জমি সব এক

লেভেল্—( সমতল )। বাস্তবিক আমরা যে ঠিক ভাস্‌ছি, তা নয়। উঁচুদিকে উঠ্‌ছি। তবে একটু এদিক ওদিক উঁচুনিচু থাকাতে ঘণ্টাদুই ভাসিব মাত্র। দুপুর রাত্তিরে আমরা খুব উঁচুতে উঠে যাব নিশ্চয়। আমার বুক ফেটে যাবার মত হ'ল। যদি ঝি বুদ্ধি ক'রে তাকে সেই আমড়াগাছের উপর চড়িয়ে থাকে, তবে রাত্তির দুপুরে সে নিশ্চয় ডুবে যাবে। আমি বলিলাম "আর এখানে থাকা না।"

অমনি আবার কড়কড় মেঘ গর্জ্জন এবং মুষলধারে নূতন বৃষ্টি। রামধন চেঁচিয়ে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল "সব চুলোয় যাক্, গোল্লায় যাক্, এ দুর্যোগে বাহির হওয়া কি ভদ্রলোকের পোষায়?"

আমি বল্লেম "বোস্‌জা, তোমার ছেলেপুলের উপর মায়া না থাক্‌তে পারে, আমার সোমত্ত বৌ, এই সেদিন বিয়ে হয়েছে, আত্মরক্ষা কত্তে' জানে না।"

রামধন দা' চটিয়া গেলেন "যে বৌ—আত্মরক্ষা কত্তে' জানে না, সে আবার বৌ কি? সেত ঘাটের মড়া"।

রামধন দাদার মুখ সচরাচর খুব খারাপ হয়, সেই ভয়ে আমি আর প্রতিবাদ কল্লেম না। এমন সময় বহির্দ্বারে একটা 'গদাম' করিয়া শব্দ হইয়া থামিয়া গেল।

গদাধর বলিল "এ নিশ্চয়—পত্রিকার সম্পাদক। হয় সপরিবারে কিংবা একাকী 'বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠের' হাল্ এবং বকেয়া সংখ্যা একত্রে মুদ্রিত কাপি-গুলির পিঠে ভাসিয়া এখানে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

রামধন দা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁর ছাপাখানার তিনশত তেত্রিশটাকা এখনও সম্পাদকের নিকট বাকি। তিনি সুযোগ পেয়ে বল্লেন "রামা, উত্তরদিকে দেরাজের মধ্যের বিলের তাড়াটা নিয়ে আয়।"

গদা বলিল 'এন্‌কোর!'

এমন সময় কপাট ঠেলিয়া সিক্ত এবং ক্লিষ্ট বপু লইয়া সম্পাদক উপস্থিত। গদা বলিল "শিগ্‌গির কপাট বন্ধ করুন, নচেৎ ঝঞ্ঝাবাত্ ঢুকে পড়্‌বে।"

সম্পাদক। আমার কাপিগুলোর অবস্থা?

গদা। দেশ ভেসে যাচ্ছে, কাপিগুলো ক্রমে মাটি-লউক, জল ক্রমে উর্দ্ধে উঠ্‌বে। নিচে মাল্ জমুক। ভারি মাল্ নিচে বসিয়া পড়ুক। নচেত নিস্তার নাই।

সম্পাদক। এই যে বিমু বাবু! তুমি একটা ছোট-গল্প দিবে বলেছিলে, কতদূর?

আমি ভাবিলাম "লোকটা বড় রসিক। এই প্রলয়ের সময়েও সে ছোট-গল্পের ধুয়া ভুলে নাই। (প্রকাশ্যে) দাদা! তোমার কি একটু আক্কেল নাই। যাকে লয়ে ছোট-গল্প লিখ্‌ব, সে এতক্ষণ হয়ত আমড়া গাছে, নচেত গেঁওখালি কিংবা কুকড়োহাটীতে।"

সম্পাদক। বিনুবাবু! এটা একটা দুর্যোগ নিশ্চয়। আমি সমস্ত কলিকাতা সহর দিয়া এই রাত্রিকালে ভেসে এসেছি, কিন্তু কই? কারও ত আতঙ্কের সাড়া শব্দ পেলেম না। প্রথমে বড় ভয় হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, কেউ কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না।

রামধন দাদা চটিয়া বলিলেন "বস্‌, বাজে কথার দরকার নাই। তুমি যদি সব দেখে এসেছ, তবে বলত মিত্তিরদের বাটীর ব্যাপারখানা কি রকম?"

সম্পাদক। তাদের বরযাত্র সব ভেসে ভেসে বাদ্যিব্যাণ্ড বাজিয়ে এই মাত্র গেল।

(৩)

বাস্তবিক রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা দোতালার ছাতে উঠতে বাধ্য হ'লেম। সেখান হ'তে দেখ্‌তে পাওয়া গেল যে, একখানা পান্‌সির উপর অনেকগুলো লোক হরিসংকীর্ত্তনের জোরে অন্ধকার ভেদ ক'রে চ'লে যাচ্ছে। একটা ছোকরা গাচ্ছিল

'প্রলয় জলধি জলে,
ধৃতবানসি বেদং'

তার মাথায় কিন্তু টিকি ছিল না।

গদাধর দা বল্লেন 'এন্‌কোর।'

সে তাকিয়ে দেখে একটু মুচ্‌কে হাস্‌ল। আমি চেঁচিয়ে বল্লেম "ওহে ছোকরা, যদি আহিরীটোলার মোড় দিয়ে তোমাদের পান্‌সি যায়, তবে আমার স্ত্রীর খবরটা নিও, তার কচি বয়স, নিশ্চয় এই প্রলয়কালে ভয় পেয়েছে"।

ছোকরা হাসিয়া বলিল "ভয় নাই, আপনার স্ত্রীও মিত্তিরদের বাড়ীতে বাসরঘরে আড়ি পাতিতে গিয়াছে।"

রামধন বোস্‌ চটিয়া বলিল "ছোঁড়াটা নিতান্ত বয়াটে। ভদ্রলোকের ঘরের বৌ-ঝির এত খবর রাখ্‌বার দরকার কি? যদি আমার একখানা 'টরপেডো' থাক্‌ত, তবে পান্‌সিখানা ধ্বংস করে ফেলতেম্‌।"

আমি বলিলাম "রামধন দাদা, স্থির হও, এই প্রলয়ের সময় নিন্দাচর্চ্চা করিবার কোন দরকার নাই।"

মনের মধ্যে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম। যদি ভাসে, তবে বাসরঘর শুদ্ধ ভেসে যাবে। অতগুলি লোক, নিশ্চয় পরস্পরের সাহায্য করবে।

সম্পাদক বল্লেন "এরকম অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। দেশে কেউ কাহারও সাহায্য কর্'বে এমন বোধ হয় না। তবে অদৃষ্টের ফেরে যদি সকলের একদশা হয়, তখন কি হবে ঠিক বলা যায় না।"

এই রকম কথাবার্ত্তা চলিতে চলিতে জল আমাদের হাঁটুর উপর উঠিয়া গেল। গদাধর দাদা বল্লেন "এখন ছাত হ'তে সরিয়া পড়া ভাল, নচেত সকলকে এখানেই ডুবে মরতে হবে।"

তখন আমাদের জুতা কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে, কেবল মুখ শুষ্ক! রামধন দাদা বল্লেন "এখন ভগবানের নাম ক'রে ভেসে পড়া যাক্?"

যদিও আমরা সকলে সাঁতার জানিতাম, কিন্তু এই রকম দুর্যোগে সাঁতার কতক্ষণ কাজে লাগে?

ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে অনন্ত বারিরাশি! দুইটি প্রকাণ্ড অনন্তের মধ্যে জীবনের অন্ত যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃথা চেষ্টা! এত ঘন অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যায় না। আবার কালো মেঘের তৃতীয় সংস্করণ! আবার বজ্রের কড় কড় শব্দ।

এমন সময় একটা প্রকাণ্ড পদার্থ ছাতের আলিসার পাশে এ'সে লে'গে গেল। গদাধর দাদা সাহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বল্লেন "শীঘ্র ধর! এটা বরযাত্রীদের ময়ুরপংখী।"

ময়ুরপংখী জিনিষটা ফাঁপা। আমাদের সম্মুখে যেটা উপস্থিত হইল, সেটা বেতর রকমের ফাঁপা। কিছুতেই জলে ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া আমরা চারিজন সেই ময়ুরপংখীর চারিদিকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিলাম।

সম্পাদক যদিও খুব প্রশস্ত-কলেবর, তিনি সময়োচিত নিয়মরক্ষা করিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ! কর্ম্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ কর, বিশেষতঃ এই অন্তিম অবস্থায়।"

গদাধর দাদা 'এন্‌কোর' উচ্চারণ করিয়া ময়ুরপংখী ভাসাইয়া দিলেন।

তারপর আমরা কোথায় ভাসিয়া গেলাম, তাহার কোন কুলকিনারা পাওয়া

গেল না। তবে গদাধর দাদা বল্লে'ন যে আমরা ঘণ্টায় একত্রিশ মাইলের 'রেটে' ভাসিতেছিলাম। সম্পাদক বল্লে'ন যে ইতিহাসে এত দ্রুতবেগে কোনো দেশ যে কখন ভাসিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রামধন দাদা কেবল বলিতেছিলেন "বস্, এখন বকানির দরকার নেই। প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই অক্কা পেতে হবে।"

দুই চারি ঘণ্টা এই রকম ভাসিবার পর আমার বোধ হইল যে, সাংঘাতিক রকম অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি।

( ৪ )

প্রাতঃকালে, বোধ হয় বেলা আটটার সময় আমাদের সংজ্ঞার উদয় হ'ল। সূর্য্যদেবের তখনও উদয় হয় নাই, কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমরা চারিজনই সেই ময়ূরপংখীর দড়ি তখনও কসিয়া ধরিয়া আছি! হঠাৎ সম্পাদক মশায় বল্লেন "দেখ বিনু! এটা একটা পার্ব্বতীয় দেশ!"

গদাধর দাদা বল্লেন "ভূতত্ত্বে পড়া গিয়াছে যে, জল পাছে খুব উঁচু হইয়া উঠে, এই জন্য প্রকৃতি গিরিসঙ্কটের সৃষ্টি ক'রেছেন। এখন আমাদের ময়ূরপংখী ছেড়ে পাহাড়ে উঠা উচিত"। ইহাতে আমরা সকলে স্বীকৃত হইয়া একটা শাল-গাছের গোড়ায় ময়ূরপংখীকে বাঁধিয়া ফেলিলাম।

পাহাড়ের পরপারে বিস্তীর্ণ নিম্নতল ভূমি। গদাধর দাদা বল্লেন "ওটা তথাপিও সমুদ্রের 'লেভেল্' হইতে ছয়শত ফুট উচ্চ। সেই জন্য যদিও বাঙ্গলা-দেশ ভেসে গেছে, এ দেশটার কোন বিপদ ঘটে নাই। অনুমানে বোধ হইল যে, দেশটা মেদিনীপুর জেলা কিংবা ছোটনাগপুরের কোন করদ-রাজ্যের অন্তর্গত।"

লোকগুলোর চেহারা অনেকটা সাঁওতালের মত, কিন্তু বাঙ্গালা কথা জানে। একটা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই প্রথমতঃ ক্ষুধা লাগে। তাদের ক্ষেতে প্রচুর কচি শশা দেখে আমরা চারিজন আনন্দমনে কচ্মচ্ শব্দে খাইতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে আমরা মনে করেছিলেম যে তারা আমাদের ঠেঙ্গিয়ে মারবে, কিন্তু সেটা ভুল। মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্ম বলে' যে একটা জিনিষ আছে, সেটা চট্ করে প্রমাণ হয়ে গেল। বানর, ছাগল, গরু হ'লে তারা ঠেঙ্গাইত। আপন্ন মানুষ, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হেন জাতির এই দুরবস্থা দেখে তারা উচ্চবাচ্য করিল না। রামধন দাদার চর্ব্বণ উত্তরোত্তর বাড়্তে লাগ্ল। গদাধর বলিল "দাদা, থাম!

বিপদের সময় বেশী খাওয়া ভাল না। মনে পড়ে নাকি, পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত-বাসে দ্রৌপদী কেবল শাক-অন্ন খেয়ে থাক্‌ত ?”

মহাভারতের সেই অমৃত কথা স্মরণ করিয়া আমার খুব ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল। এমন সময় দলের সর্দ্দার কিংবা সেই চাসীদের জেঠ রেয়তের মত একজন আমাদের সম্মুখে এসে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়দের নিবাস ?”

আমরা। বঙ্গদেশ, চব্বিশপর্গনা, কল্‌কেতা।

সর্দ্দার। কলকেতার লোক অত্যন্ত খারাপ। তারা কেবল নাটক নবেল ও কবিতা লেখে, নাচ তামাসা গান করে, অখাদ্য খায়, সিগারেট্‌ ফোঁকে, এবং আমরা যত রাজস্ব ও ট্যাক্স দিই, তারই জোরে চাকুরি করিয়া আমাদের গালি পাড়ে। তোমরা শিগ্‌গির পথ দেখ।

সম্পাদক মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করে’ বল্লেন, “লোকটা সাময়িক ইতিহাসে খুব প্রবীণ।”

গদাধর দাদা কিন্তু খুব চালাক। তিনি করযোড়ে বল্লেন “সর্দ্দার মহাশয় ! প্রথমে আমাদের নিবেদনটা শ্রবণ কর। আমাদের দেশ, বাড়ী, ঘর, দুয়ার, স্ত্রী-পুত্র পরিবার সব ভেসে গেছে। এখন আমরা নিরুপায়, নিঃসহায়। চাকুরির আর কোন আশা নাই। দেশে জমি নাই যে চসিয়া খাই। এই যে একটা মহাপ্রলয় হয়ে গেল, ইহাতে লেখাপড়ার আদর একেবারে কমিয়া যাইবে। টাকা, গহনা, ধন সম্পত্তি, সব জলের নিচে। ভবিষ্যতে প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেগুলো খুঁড়ে বের ক’ল্লেও আমাদের আপাততঃ কোন কাজে লাগিবে না। এখন ভেবে দেখ, আমাদের দশা কি হবে। আমরাও তোমাদের মত কৃষ্ণের জীব ; ভগবান জুটিয়ে দিচ্ছিলেন, আমরাও ব’সে খাচ্ছিলেম। সে দিনের একেবারে অন্তর্দ্ধান ! দেশ ভেসে গেছে। এখন আমরা যে এই মহাপ্রলয়ের রাত্রিকালে দেড়শ’ মাইল ময়ূরপংখী ধ’রে এসেছি, এখন যাই কোথায় ? আর কিছু না থাক্‌ ধর্ম্মটা আছে ত ? এই যে দেশটা দেখছি, অনেকটা বৃন্দাবনের মত। তুমিই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই এখন আমাদের রাখালরাজা।”

গদাধরের লম্বা বক্তৃতায় সর্দ্দার নরম হইয়া গেল। সে বলিল “আচ্ছা দাঁড়াও, এই তল্লাটে প্রায় ছাব্বিশ হাজার লোক ভেসে এসেছে, তাদেরও একটা উপায় দেখ্‌তে হবে।”

( ৫ )

বাস্তবিক প্রায় ছাব্বিশ হাজার লোক সেই দেশে ভেসে এসেছিল। আমরা

গ্রামের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌লাম, লোকারণ্য! আবার, আশ্চর্য্যের কথা এই যে মিত্তিরদের বাড়ীর বিবাহের বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী, এবং বাসরঘরের বর-কন্যা, এবং যত স্ত্রীলোক সব সেখানেই উপস্থিত! একটাও মরে নাই। কাহারও গায়ে আঁচড় ও লাগে নাই।

রামধন দাদার পরিবারবর্গ, আমার কল্যাণী, সম্পাদকের পিসি-ঠাকুরাণী, গদাধর দাদার জেঠাই-মা, সকলেই সেখানে। এমন অপূর্ব্ব মিলন, 'সাহিত্য-সম্মিলনী' ছাড়া অন্য কোন উৎসবে এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সকলের সকলকে দেখিয়া গলদশ্রু বহিতে লাগিল। কেবল সেই সংকীর্ত্তনের পান্‌সিখানার কোন কুলকিনারা পাওয়া গেল না। রামধন দাদা বল্লেন "বেশ হয়েছে, ব্যাটারা যেমন পাজি, বোধ হয় ডুবিয়া মরিয়াছে, বিশেষতঃ সেই বয়াটে ছোকরাটা"। রামধন দা'র সরল মন সেই পার্ব্বতীয় দেশের উদার এবং উন্মুক্ত ভাবে একেবারে খুলিয়া গিয়াছিল।

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বরযাত্রিগণ একদিকে কচুসিদ্ধ করিয়া অনিমেষ-নয়নে তাহাই দেখিতেছেন; কন্যাযাত্রিগণ তালবৃন্তে সেগুলি ব্যজন করিতেছেন, কেহ শালপত্র, কেহ সৈন্ধব লবণ, কেহ নালিজুলির মধ্যে ছোট ছোট চুনা পুঁটি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত! স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা দ্বেষ, প্রভৃতি একেবারে শূন্য! আহা! এমন ভাব্‌টা যদি দেশের মধ্যে থাকিত, তবে আর ভাবনা ছিল কি?

এই রকম আমি ভাব্‌ছি, এমন সময় সর্দ্দার মশায় বল্লেন "আপনারা গরু দুহিতে জানেন"?

গদাধর দাদা কটাক্ষপূর্ব্বক জানালেন যে, সম্পাদক মশায় জানেন। সম্পাদক সলজ্জে বল্লেন যে "খানিক্‌টা মনে আছে"।

আমরা বিশ ত্রিশজন লোক চেষ্টা ক'রে গোটা দশ বার গরু দুহিয়া ফেলিলাম। চা ও তামাকের কথা মনে পড়িয়া চক্ষে একটু জল আসিল। যাহা-হউক, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'।

বেলা একটার মধ্যে সেই প্রলয়বন্যাবিতাড়িত ষড়বিংশতি সহস্র চতুর্বর্ণের বাঙ্গালী সোনামুখে শালপত্র পাড়িয়া কচুসিদ্ধ খাইতে বসিয়া গেল। সর্দ্দার বল্লেন "ধন্য জাতি! আমাদের দেশে একটা সামান্য পার্ব্বণে একশত লোক খাওয়াইতে প্রায় দশঘণ্টা লাগে"।

গদাধর দাদা একমনে কচু খাইতে খাইতে বলিলেন, "এর ওস্তাদী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে পাশ না কল্লে শেখা যায় না। আমি শীঘ্রই একটা শিল্প কিংবা কৃষি-বিদ্যালয় খুলে তোমাদের শিখিয়ে দেব"।

খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হইয়া গেলে রামধন দাদা সর্দ্দারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এদেশে নেশাটেশা কিছু কর না? যেমন তামাক, গাঁজা প্রভৃতি?"

সর্দ্দার অবাক হইয়া বলিল "নেশা আমাদের ধর্ম্মে মানা। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি খায় বটে, কিন্তু আমরা খাই না।"

গদাধর দাদা চুপি চুপি বল্লেন "নেশাটা প্রায় জানোয়ারদের মধ্যে প্রচলিত নাই। তবে ইহারা কি রকম জানোয়ার তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য"। আহারের পর গয়ার তামাক না পাইয়া আমাদের অসামান্য কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সম্পাদক বল্লেন "প্রথমে এককাঠা জমিতে তামাকের চায আরম্ভ কর"।

গদাধর দাদা। বীজ কৈ?

সর্দ্দার বলিলেন "তাহার চেষ্টা হবে এখন। আমাদের দেশের ছাব্বিশ হাজার লোকের জন্য একটা বিশ্রামের বন্দোবস্ত হইল। পাহাড়ের উপর স্ত্রীলোক-দিগের এবং কচি কচি ছেলেপুলেদিগের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সেখানে ঘন শালবন অথচ হিংস্রজন্তুর ভয় নাই। বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষগণ সকলে সারি বাঁধিয়া খালের ধারে তালপত্রের কুটীরে। যুবাপুরুষগণ নিম্নভূমিস্থ তালবৃক্ষের উপরে মাচা বাঁধিয়া লইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। সেখানকার তালবন এত ঘন যে, এড়োভাবে বাঁশ বাঁধিয়া দিলেই মাচান হইয়া যায়। যিনি এ পরামর্শ দিলেন, তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব আসিষ্টাণ্ট হেলথ্‌-আফিসার সুশীল বাবু। সুশীলবাবুর মতে অজানা জায়গায় অন্ততঃ বত্রিশ ফুট উর্দ্ধে বাস করাই শ্রেয়। কচি ছেলেরা পাছে পড়িয়া যায় কিংবা খালে ছুটিয়া যায়, সেই জন্যই তিনি পাহাড়ের উর্দ্ধে সমতলভূমিটুকু বাছিয়া লইয়াছিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যে আমরা সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

( ৬ )

আমাদের ভূতপূর্ব্ব জীবনের এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে কি রকম ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার বোধ হয় পরিচয় দিতে হইবে না। কিন্তু মানব-জীবনে এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নূতনত্বের সঙ্গে এত মিশিয়া যায়, যে দুঃখটাকেও সুখ বলিয়া বোধ হয়।

সেদেশের চাউল মোটা হইলেও, সকলের অতিশয় সুস্বাদু বোধ হইতে লাগিল। নদীতট বালুকায় ভরা, সেখানে আগুন জ্বালিয়া আমরা অপর্য্যাপ্ত মুড়ি ও খই ভাজিতে আরম্ভ করিলাম। ফলে, মানকচু, শশা, মোটাচাউল, অরহরের দাইল, রামটাঁ্যাড়স্, বেগুন, লঙ্কা, ঘুঘু এবং পুঁটি ও চ্যালা-মাছ, এই সকল নিরামিষ এবং আমিষ উপকরণ একত্র করিয়া যত রকম উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য হইতে পারে, তাহা সধবা এবং বিধবাগণ তৈয়ারি করিয়া বাংলাদেশের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছিল।

খালের ধার হইতে পাহাড় পর্য্যন্ত আমাদের নূতন উপনিবেশ। বিস্তীর্ণ পতিত জমি আমরা নিজেই খুঁড়িয়া ফেলিলাম। লাঙ্গল গরু তখনও জুটিয়া উঠে নাই, কেবল মাত্র কোদালি। গরু, লাঙ্গল, ও মানুষ এই তিন পদার্থেরই শক্তি যেন আমাদের বাহুতে জুটিয়া গেল। দশদিন কোদালি পাড়িয়া এবং মানকচুর তরকারি খাইয়া যাদের অম্লের ব্যারাম ছিল, তারাও মল্লের মত জোর প্রকাশ করিতে লাগিল। যারা ফুটবল খেল্‌তে জান্‌ত, তারা লাথির চোটে বড় বড় ঢ্যালা চক্ষের নিমেষে ভাঙ্গতে লাগ্‌ল। যাদের পূর্ব্বে কেবল বৈঠকখানায় বসিয়া থাকিবার অভ্যাস ছিল, তাদের আমরা ছোট ছোট ঢ্যালার মধ্যে তক্তার উপর চিৎ করিয়া দড়ি সহযোগে টানিতে লাগিলাম। এই রকমে মই দেওয়া সহজ হইয়া গেল।

সাহিত্যিকদিগকে নিয়ে আমাদের একটু বেগ পেতে হয়েছিল। যারা কবিতা লিখিত, তাদের ক্ষেতের একপ্রান্তে লইয়া আকাশের পাখীর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে বলিতাম। যাহারা গদ্য লিখিত, তাদের ফড়িং এবং কীটপতঙ্গ তাড়াইতে দেওয়া গেল। এই রকমে আকাশের পাখী এবং মৃত্তিকার পোকা-মাকড় প্রহরীর আধিক্য দেখিয়া ক্ষেতের নিকট আসিত না। যাদের থিয়েটরে অভিনয় করা অভ্যাস ছিল, তারা ধনুর্ব্বাণ হস্তে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি সাজিয়া ঘোর-রবে বানর তাড়াইত। এই রকমে নানাবিধ ছন্দে সাহিত্যচর্চা, বক্তৃতা, এবং ক্ষেতের চাষ একসঙ্গে চলিতে লাগিল। যাদের আফিং খাবার অভ্যাস ছিল, তাদের জন্য মাচান বাঁধিয়া রাত্রিকালে পাহারার কাজে নিযুক্ত করা গেল।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনটি দল ভাগ হইয়া গেল। যাহারা রাঁধিতে জানে না, তাহারা মালকোঁচা আঁটিয়া এবং তালপত্রের ঠোঙ্গা মাথায় দিয়া বীজধান্য বপন করিল। যাহারা বুনিতে এবং শেলাই করিতে জানিত, তাহারা কুটীরের ছাউনি তৈয়ারি করিতে নিযুক্ত হইল। যাহারা পূর্ব্বে নিতান্ত অকর্ম্মা ছিল,

লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু জানিত না, তাহারা সেই দেশের স্ত্রীলোকদিগের ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।

কচি ছেলেপুলে সকলেই খাল ও বিলের ধারে, ময়দানে ও গর্ত্তে সারাদিন দৌড়াইয়া বেড়াইত। ব্যাং কি করিয়া গর্ত্তে থাকে, ফড়িং কি করিয়া লাফায়, শাল এবং তালগাছে কত রকম পাখী আসে যায়, এই সব দুরূহ বিষয় তাহারা প্রত্যহ দেখিয়া শুনিয়া প্রাণীতত্ত্বে বিলক্ষণ দখল লাভ করিল। অনেক সময় বোধ হয় তাহারা জীবজন্তুর কথা বুঝিতে পারিত।

গদাধর দাদার গণিত-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকাতে, তিনি নব উপনিবেশের আমিন নিযুক্ত হইলেন। জমি মাপিতে, চৌকোনা আঁকিয়া ভাগ করিয়া দিতে, ফসলের হিসাব রাখিতে, তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। আমি, কোন্‌টা ন্যায়সঙ্গত, বৈধ, এবং হিতকরী, তাহা নির্ণয় করিয়া দিতাম।

কতকগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল; তাদের ক্রিয়া কর্ম্ম জানা না থাকিলেও আত্মগরিমাটুকু খুব ছিল। রামধন দাদা তাঁদের বেদধ্বনি করিতে নিযুক্ত করিলেন। প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময় (তখন বর্ষাকাল) যখন ব্যাং ডাকিত, তখন তাঁরা সেই সুরে গলা মিশাইয়া প্রাণপণে ধ্বনি করিতেন।

আমাদের উপনিবেশ যে পুরাণোকালের আর্য্যগণের উপনিবেশের মতো হয়েছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। একদিকে সামগান, অন্যদিকে চাষবাস, কোন স্থানে তর্পণ, কোথায়ও ছেলেপুলেদের আধ আধ ভাষ, কিংবা মেয়েদের কলহাস্য, নানা রকম দৃশ্য একত্র হইয়া স্থানটাকে অপূর্ব্ব সুন্দর এবং শান্তিময় ক'রে তুলেছিল।

এই অসাধারণ গুণপনা দেখে সে-দেশের লোক আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। পূর্ব্বে আমাদের উপর যে সন্দেহ ছিল, তাহা একেবারে দূরে গেল। দুই মাস পরেই তারা প্রাণ খুলে আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে লাগ্‌ল।

(৭)

তাদের সঙ্গে আমাদের যে ভালবাসা দাঁড়িয়ে গেল তাহা সাংঘাতিক। কি রকম করিয়া সাংঘাতিক, তা ক্রমশঃ বুঝ্‌তে পারবেন।

প্রথমতঃ এই বর্ব্বর জাতির শিক্ষার ভার যে আমাদেরই উপর ভগবান ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তা' ঘটনাক্রমেই বুঝা গেল। সুশীল ডাক্তার একটা ডাক্তারখানা খুলে ডাক্তারি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যদিও সে দেশে বড় ব্যায়রাম

ছিল না, কিন্তু শিখাইবার জন্য সব রকম ব্যায়রামের নমুনা মানুষের মধ্যে সঞ্চার করিয়া তাহার চিকিৎসা কেমন করিয়া করে, ডাক্তার তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। সম্পাদক মহাশয় সাহিত্য শিখাইতে লাগিলেন। গদাধর দাদা বিজ্ঞানের এবং গণিতের ভার নিলেন। রামধন দাদা অর্থনীতি, মহাজনী এবং সুদকসা, কো-অপারেটিভ্-ব্যাঙ্ক প্রভৃতির তত্ত্ব বিশদরূপে প্রচার করিলেন। আমি গীতার ধর্ম্ম, এবং সামাজিক কর্ম্ম, স্বায়ত্ত-শাসন এবং নিদিধ্যাসন প্রভৃতির বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম।

মেয়েছেলেরা বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দিল। আমাদের সঙ্গে যে সব পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁরা ছোট ছোট বালকের জন্য বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। নীতি-শিক্ষার খুব কড়া বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। প্রথমে 'নীতি' জিনিষটা কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ভাল ক'রে কুনীতি শিখিয়ে সেটাকে খণ্ডন ক'রবার জন্য সুনীতির সুন্দর বক্তৃতা হ'ত।

মহিলাগণ সে দেশের স্ত্রীলোকের কাপড় প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে, সেগুলি কি করিয়া শেলাই করিতে হয়, তাহা দেখাতে লাগ্‌লেন। সে দেশের কাপড় খুব মোটা, একজন্মে ছেঁড়ে না; তাই খুব শক্ত শক্ত কাপড় কাঁচি তৈয়ারি করিয়া কাটিতে লাগিলেন। তারি সূতা দিয়া কার্পেট, লেস, এবং মোজা প্রভৃতি বুনিবার কৌশল প্রচারিত হইল।

এইসব ব্যাপার কেবল রবিবারে হ'ত। একটা হৈ চৈ, রৈ রৈ ব্যাপার বল্‌তে হবে। অন্যান্য বারে চাষবাস করিয়া রবিবারে সকলে বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা করিত। সে দেশে সভ্যতার আলো ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু মানুষগুলো, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই কালো। নিত্তিরদের বাড়ীর বরযাত্রীর সঙ্গে খানকতক ভিনোলিয়া মার্কা সাবান ছিল। সেই সাবানের অনুকরণে একরকম স্বদেশী সাবান তৈয়ারি করিয়া গদাধর দাদা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখালেন। সকলে সেই সাবান মেখে একবৎসরের মধ্যে উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণে দাঁড়াইয়া গেল।

বরযাত্রীদের মধ্যে জনকতক কালোয়াত এসেছিল তারা ছেলেদের ও মেয়ে-দের রাগ-রাগিনী শিখাইবার জন্য গলা-সাধিবার বন্দোবস্ত করিল। মাঠের মধ্যে যখন অকস্মাদের তক্তার উপর শুইয়ে মৈ দেওয়া হ'ত, তখন দলে দলে কালো কালো ছেলে ও মেয়ে, কালো ওষ্ঠের আড়াল হতে শুভ্র কচি দাঁত বাহির করিয়া, যমুনা এবং অন্যান্য পুলিনের বাছা বাছা গান তালে তালে গাহিত।

আমাদের বিষাদভরা জীবনের মধ্যেও সেই কোমল করুণ আধ' আধ' সঙ্গীত শুনে' মনে হত যে, স্বর্গ সেখানে হুমড়িখেয়ে পড়েছে।

এই রকম শিক্ষার প্রাবল্যে এবং পরস্পরের সংঘর্ষে দুই জাতির মধ্যে খুব ঘন ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হ'ল। বিশেষতঃ তাদের সর্দ্দার এবং আমাদের সর্দ্দারের (রামধন দাদার) মধ্যে কি রকম প্রণয় দাঁড়িয়েছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

শুধু তাই নয়। রামধন দাদার পুত্রকন্যার সঙ্গে সর্দ্দারের পুত্রকন্যার খুব ভাব হইয়া গিয়াছিল। রামধন দাদার ছেলের নাম মধু ও মেয়ের নাম সাগরবালা। সর্দ্দারের ছেলের নাম 'ফ্যানা' ও মেয়ের নাম 'ভোমরা'। দুই পক্ষেরই খুব কালো মুখ এবং সাদা মন। নামের গুণেই হউক কিংবা ভবিতব্যের ফেরেই হউক, মধু ভোমরাকে খুব ভাল বাসিত, এবং সাগরবালা ফ্যানাকে খুব ভাল বাসিত। মধু ভোমরাকে ডিটেক্‌টিভের গল্প এবং নানা রকম কবিতা প্রভৃতি আওড়াইয়া মুগ্ধ করিত। সাগরবালার নিকট ফ্যানা ধনুর্ব্বাণ হাতে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে, শ্রবণ-মধুর গর্জ্জনে, রামচন্দ্র কিংবা ইন্দ্রজিতের অভিনয় করিত।

আর একটা কারণে তাদের ভালবাসা ক্রমে প্রগাঢ় হ'চ্ছিল। সুশীল ডাক্তার ডাক্তারখানায় অনেক সিড্‌লিট্‌জ-পাউডার সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সর্দ্দারের ছেলে ফ্যানা এবং রামধন দাদার ছেলে মধু সেগুলি চুরি ক'রে সাগরবালা এবং ভোমরাকে খাওয়াত। একজন 'সোডা' নিয়ে এবং অন্যজন 'অ্যাসিড্‌' নিয়ে খালের ধারে তালপাতের ঠোঙ্গায় জল দিয়ে মিশিয়ে ফেল্‌ত'। ফোঁস্‌ করে উঠ্‌লে, ভাগ করিয়া খাইত।

(৮)

আজকালকার ইংরাজীতে আমরা সে দেশে "ডোমিসাইলড্‌" হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কিন্তু সর্দ্দারের ছেলে ফ্যানার সঙ্গে রামধন দাদার মেয়ে সাগরবালার প্রণয় খুব গভীর রকম দাঁড়িয়ে যাওয়াতে আমাদের "ডোমিসাইলের" চেয়ে আরও একটু বেশীর আশা দাঁড়িয়ে গেল।

রামধন দাদার ছেলে মধুর সঙ্গে সর্দ্দারের মেয়ে ভোমরার তত প্রণয় জন্মায় নি। তার ঠিক কারণ কাহারও জানা ছিল না।

অবশেষে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ভোমরা একদিন চল্লিশ গ্রেন 'আসিডের' গোলা প্রথমে খেয়ে তারপর আশি গ্রেণ সোডার জল যেমন খাওয়া, অমনি পেটের মধ্যে পটকার মত একটা শব্দের উৎপত্তি!

পুষ্প প্রীতি

চক্ষু উল্টাইয়া যাওয়ার পর দলে দলে সেদেশের প্রবীণ লোক স্থির করিল যে, ভোমরার গলার মধ্যে মধু একটা পটকা কিংবা ততোধিক কোন একটা সঙ্গীন জিনিষ অধঃকরণ করানোর দরুণ এই দুর্ঘটনা।

ভোমরা বাঁচিয়া থাকিলে কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু আমরা যখন গিয়া দেখি, তখন তাহার আত্মা স্বর্গস্থ।

ডাক্তার, ভয়ে সিড্‌লিট্‌জ-পাউডারের কোন উল্লেখ করিলেন না। সেটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছিল, কেন না পটকা কিংবা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থের 'থিয়রি' সাব্যস্ত হইয়া গেলে সে দেশের লোকের আমাদের উপর ঘোর আক্রোশ জন্মিল।

তাহারা আমাদের জমিজারত্‌ কাড়িয়া লইয়া একাদিক্রমে আমাদিগকে ঠ্যাঙ্গাইয়া দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিল।

আমরা ঘরে রাশি রাশি মানকচু এবং বেগুনের বিচি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সেগুলি তারা অলক্ষণ মনে করিয়া হুকুম দিল "এদের পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া দে।"

সেই মানকচুর ও বেগুনের বোঝা লইয়া আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে পাহাড়ে উঠে গগনের শেষপ্রান্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

এত দুঃখেও দৃশ্যটি মনোহর বোধ হইল। নীল আকাশ, শস্যশ্যামল প্রান্তর, দূরে মস্ত নদী, তার পারেই আর একটা নূতন দেশ, তাহা বঙ্গের সীমা, এবং আমাদের শেষ ভরসা।

সকলে বোঁচকা পিঠে দলে দলে নদীর তীরে গিয়া দেখি, জল খুব কম।

গদাধর দাদা বল্লেন যে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁর কথায় নির্ভর করিয়া আমরা নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হইয়া গেলাম।

ওপারে গিয়া দেখি অসংখ্য নৌকা! নৌকায় মাঝিদের মুখে শুনা গেল যে, দেশে যে বন্যা হয়েছিল তাহাতে বড় কোন ক্ষতি হয় নাই। কেবল যাহারা ভেসে গিয়েছিল তাদেরি ঘর অন্ধকার।

তাহাদেরি নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা বামাল দেশে উপস্থিত। আবার উপস্থিত।

কল্‌কেতার গড়ের মাঠে আমরা গিয়া দেখি, সেখানে একটা ঘোর বক্তৃতা হ'চ্ছে। বুঝা গেল সেটা, আমাদের স্মরণার্থ একটা 'মনুমেণ্টের' জন্য। আমরা মানকচুর বোঝা নামাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম "আমরা এসেছি"।

প্রথমতঃ কেহ বিশ্বাস করিল না। কিন্তু পুরাণো বন্ধুবর্গ যায় কোথা। তারা আমাদের গলার আওয়াজেই সনাক্ত করিয়া ফেলিল।

আমরা সকলেই একতানে গোটাকতক স্বদেশী-গান গাহাতে গদাধর আবার সেকালের মত ডাকিলেন—

'এন্‌কোর'

সকলে আমাদের অপূর্ব্ব কাহিনী শোনবার জন্য উৎসুক। সম্পাদক বল্লেন "এইবার আমার আশ্বিনের কাপিতে সেটা বেরুবে। এখন গোলযোগে কাজ নাই।"

আমরা স্ত্রীপুত্র পরিবারগণকে সুস্থ করিয়া, পুরাণো বাটী ঝাড়িয়া, দাড়ি কামাইয়া, চুল ছাঁটিয়া, নূতন ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিয়া উৎফুল্ল আননে চারিদিকে তাকাইলাম, চলিতে ফিরিতে, হাসিতে গাইতে লাগিলাম।

রামধন দাদার বাটীতে আবার আড্ডা, আবার গয়ার তামাক! কেবল সে পুরাতন চাকরটি মারা গিয়াছিল। কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য কথা—সেটা পূর্ব্বে বলি নাই, আজ বল্‌ছি,—সর্দ্দারের ছেলে ফানা আমাদের সঙ্গে চুপি চুপি এসেছিল। সাগরবালা তাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করবে না। শেষে এই সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিল।—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

# কমলা

গ্রামসুদ্ধ লোক যখন ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিল যে, সমাজের বক্ষের উপর দিয়া অতবড় মহাপাপ কিছুতেই নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে না, বৃদ্ধ অভয় ঠাকুরদাদা দাওয়ায় বসিয়া তখন শিথিল, শুভ্র ভ্রূদ্বয় ঊর্দ্ধে সঙ্কুচিত করিয়া দারুণ দুর্ভাবনায় ঘন ঘন তামাকের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, এবং সকলে তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ঠাকুরদাদা হুকাটী নামাইয়া অন্যমনস্কভাবে অপরের হস্তে দিলেন, আকর্ণবিস্তৃত একটী হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তোমাদের ভাই স্পষ্ট কথা বলচি—হরেনবাবুরা ব্রাহ্মণ, জমিদার, সবই সত্য,—কিন্তু তা বলে যে একটা মহাপাপ তাঁহাদের সংসারে আধিপত্য করবে, আর আমরা সেটা সমর্থন করতে গিয়ে পূর্ব্বপুরুষের

নাম ডুবিয়ে, সমাজের মাথায় পদাঘাত করে, জাতধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দেবো, তা কোন মতেই হ'তে পারে না।"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল "আমরাও সেই কথা বলচি—তা কিছুতেই হ'তে পারে না। এখন কি করা কর্ত্তব্য, সেটা বিবেচ্য।"

তিনি বলিলেন "নন্দহরির মুখে যেরূপ শুন্‌লাম, সে স্বচক্ষে না দেখলেও তাঁর স্ত্রী স্পষ্ট দেখেচে যে, হরেনবাবুর পুত্রবধূ কমলা—নারায়ণ! নারায়ণ!" বলিয়া তিনি অত্যন্ত ঘৃণাসহকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর অল্প মৃদু করিয়া, চারিদিকে একবার কি জানি কেন, দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। পরে বলিলেন, "ওই যে ছোঁড়া নূতন নায়েব হয়ে এসেচে, বুঝলে কি না? ওর নামটা কি?" একজন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "হেমেন্দ্রবাবু।" "চুলোয় যাক্ হেমেন্দ্র আর টেমেন্দ্র, ও ছোঁড়া না কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়,—নারায়ণ! নারায়ণ! তোমারই ইচ্ছা! বুঝলে কি না? হাসি, ঠাট্টা আর সব কথা, শুন্‌লে কাণে হাত দিতে হয়! সে সকল কথা ত তোমরা পূর্ব্বেই সব শুনেচ!"

নন্দহরি সেখানে উপস্থিত ছিল; সমাজ-ধর্ম্মের রক্ষার্থে একটা অদ্ভুত আবিষ্কার যে তাহারই গুণবতী ভার্য্যা করিয়াছেন, এই স্পর্দ্ধা তাহাকে চন্দ্রের জ্যোতির মত শান্ত শীতল ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। খুব গম্ভীর হইয়া বলিল "আমি প্রথমে কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আমার স্ত্রী সহজে মিথ্যা বলবার লোক নন। চার পাঁচ দিন যখন নিত্য এই ব্যাপার হ'তে দেখ্‌লেন, তখন তিনি একদিন বল্লেন 'তুমি কেন কাল সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে এক-বার চল না. তাহা হ'লে স্বচক্ষে সব দেখতে পাবে।' এই সময় নসিরাম উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি, তার দুদিন পরেই হেমেন্দ্রের সঙ্গে হরেনবাবুর অত্যন্ত বচসা হ'য়ে-ছিল; এমন কি, হাতাহাতি হবার যোগাড় পর্য্যন্ত নাকি! কিন্তু হাজার হোক, জমিদার লোক; পাকা বুদ্ধি কি না, ভিতরে ভিতরে গুম্ খেয়ে ব্যাপারটা সব বেমালুম হজম করে নিল।"

অভয় ঠাকুরদাদা বলিলেন, "কি প্রবৃত্তি! কি ঘেন্নার কথা! সামনে পূজা আসছে, আর—মার ভোগ রাঁধবেন ঐ সব বাড়ীর সতী সাধ্বী মেয়েরা—কিছুতেই হ'তে পারে না। মনে আছে ঐ নন্দর বাপের শ্রাদ্ধের সময় হরেনবাবুরা

কি ঘোঁট না পাকিয়েছিল! তার ফল যাবে কোথা বাবা আজ।" স্বর আর একটু নীচু করিয়া বলিলেন, "নিজের বাড়ীর বৌ, কি কেলেঙ্কারীটা না করলে? স্পষ্ট কথা বলা ভাল, ও বৌটাকে ত্যাগ না করলে, আমরা কেউ ওবাড়ী জল-গ্রহণ পর্য্যন্ত করব না। ওকে একঘরে হ'য়ে থাকতে হবে। সমাজ! সমাজকে মানতে আমরা চিরদিন ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" অবশেষে স্থির হইল যে, হরেনবাবু এই দণ্ডে যদি তাঁর পুত্রবধূকে ত্যাগ না করেন, তবে কেহই তাঁহাকে লইয়া চলিবে না। বঙ্গবাসীর যে একতা-বন্ধন এখনও শিথিল হয় নাই, বেলা বারটা অবধি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাজ ও ধর্ম্মের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে সকলে স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

( ২ )

যে কথা পাঁচজনের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সহসা নদীর বন্যার মত স্থান, কাল, পাত্রাপাত্র, সময় অসময় বিচার না করিয়া হাটে-বাজারে অচিরে সর্ব্বত্রই সে কথা প্রচার হইয়া পড়িল। হরেনবাবু অর্থের বলে বলীয়ান্ হইলে কি হয়! গ্রামের মধ্যে বাস করিতে হইলে, গ্রামের লোকের সহিত সদ্ভাব না রাখিয়া বাস করা অসম্ভব। সেদিন সন্ধ্যার সময় পুত্র অজয়চন্দ্রকে তিনি নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি বোধ হয় জান, যে, বৌমার জন্য আমাদের এখানে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠেচে। ৺পূজার আর অধিক দিন বিলম্ব নাই; আমি অনুসন্ধান করে বেশ বুঝতে পারচি, যে তখন মস্ত একটা কেলেঙ্কারী হ'য়ে উঠবে, লোকে হাততালি দেবে, টিট্‌কিরি দেবে। তুমিই বল, এখন কি করা যুক্তি?"

অজয়চন্দ্র লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং উকিলও হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম হইতেই সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। পড়িবার সময় পড়িতে হয়, খেলিবার সময় খেলিতে হয়, এই সব নীতিবাক্যের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ছিল। কারণ পাস্ করিয়া উকিল হইবার পর অজয়চন্দ্র ধড়াচূড়া বাঁধিয়া আদালতে আনাগোনা করিত বটে, কিন্তু আইনের কেতাবগুলির সহিত কি অশুভক্ষণেই তার দেখাশুনা ঘটিয়াছিল যে, সেগুলিকে দেখিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত। সুতরাং আদালতে অচিরে তাহার এ যশঃ সর্ব্বজন-বিদিত হইয়া উঠিল সত্য, সে সকলের পরিচিত উকিল হইয়াছে সেকথাও খুব সত্য, কিন্তু ইহাতে অজয়চন্দ্রের একটা মস্ত লাভ হইয়াছিল! কোন

দিন তাহাকে ভিক্ষুকের মত কোন মক্কেলের নিকট হাত পাতিতে ত হয়ই নাই, এমন কি, আদালতগৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে কেহ কোন দিন তাহাকে দেখে নাই। ছায়াশীতলবটবৃক্ষতলদেশে একখানি অল্পপরিসর একফুট উচ্চ টুলের উপর বসিয়া সে সারাদিন তাম্রকূটের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিত। সেখানে অনেকগুলি বিগতযৌবনা হতশ্রী পতিতা স্ত্রীলোক বাবুদের পানতামাক দেওয়ার ব্যবসা করিত। তাহারাই অজয়চন্দ্রের সারাদিনের সঙ্গী ছিল এবং তাহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য তাহারাই লাভ করিয়াছিল। অনেক সময় অজয়চন্দ্র তাহাদের অশ্রাব্য রসিকতার মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া তাহাদের মধ্যে আপনার প্রতিপত্তি ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এই সংসর্গ তাহাকে নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থায় প্রতিদিন নির্ব্বিবাদে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল; সে যে, একজন জমিদারের পুত্র, একজন উকিল, এসব কোন কথাই যেন তার স্মরণ হইত না। অনেকগুলি নীচ প্রবৃত্তি তাহাকে সর্ব্বদিক হইতে এমন নিষ্ঠুরভাবে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল, যে লোক-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম, জ্ঞান মোটেই তাহার ছিল না। প্রকাণ্ড রাজপথে দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্কোচে অম্লানবদনে পতিতা রমণীগণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে এতটুকু লজ্জাও সে মনে করিত না। প্রতিদিন রাত্রে সুরাপানে সে তার সময় অতিবাহিত করিত। আদালত হইতে যখন গৃহে ফিরিত, তখন সে একরূপ মৃতের মতই আসিত। যখন বৃদ্ধ হরেনবাবু পুত্রের এই আচরণ অবলোকন করিয়া তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেন, তখন অকস্মাৎ বায়ুবিতাড়িত নদীতরঙ্গের মত সে, উদ্দাম হইয়া লাফাইয়া উঠিত এবং আইনের অতি সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া পিতার সহিত তর্ক করিয়া বলিত "কার সাধ্য আমাকে পৈতৃক-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে?" হরেনবাবু জানিতেন কথাটা খুব সত্য, কারণ অজয়চন্দ্র তাঁহার একমাত্র বংশধর। কেবল ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি এইরূপ বলিতেন। স্ত্রীর সম্বন্ধে পিতার অনুযোগ শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য-বিহীন, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অজয়চন্দ্র অনায়াসে বলিয়া ফেলিল "এক-জনের জন্য ত দেশশুদ্ধ লোকের সহিত একটা কলহ করা, বা এক-জনের নিমিত্ত পৈতৃক-ভিটা পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারা যায় না।" সুতরাং কমলা তার নিজ কর্ম্মফল নিজেই ভোগ করিতে ন্যায়সঙ্গত বাধ্য। অতএব তাহার স্ত্রী হইলে কি হয়? এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই তাহার মত।

হরেনবাবু নির্ব্বাক হইয়া পুত্রের মুখের প্রতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। আজ পাঁচ বৎসর অজয়চন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ পাঁচবৎসরের মধ্যে কি বধূমাতার সহিত পুত্রের কিছুমাত্র প্রণয় বা ভালবাসা হয় নাই? যাহাকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সে জীবনের সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি এক কথায় এতটা অবজ্ঞার বিচার সম্ভবপর। কথাটার মধ্যে সত্যমিথ্যা কতখানি আছে, তাহার অনুসন্ধান করা কি স্বামীর মোটেই কর্ত্তব্যের মধ্যে নাই? অসহায়া, পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বলা নারী-জীবন কি চিরজীবনের জন্য একজন দায়িত্ববিহীন পশু-প্রকৃতি লম্পটের কথায় কলঙ্কিত হইয়া যাইবে? তাহাতেই সমাজের সমাজত্ব অটুট থাকিয়া ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিবে? পুত্রের মুখে উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ হরেন বাবুর চক্ষে বহুদিন পরে আজ জল দেখা দিল। হরেনবাবু মনে করিয়াছিলেন, অজয় কিছুতেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না, এবং স্ত্রীর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এইরূপ সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য-পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির মতই নিজপক্ষ সমর্থন করিতে তিলমাত্র পশ্চাৎপদ হইবে না। কিন্তু আজ পুত্রের বিপরীতভাব দেখিয়া তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "তা হ'লে তোমার মত, বধূমাতাকে ত্যাগ করা, কেমন?"

"সে বিষয়ে আর কোন কথাই নাই।"

"আচ্ছা, বলিতে পার, কেন আমরা তাহাকে ত্যাগ করিব!"

"তাহার কলঙ্কের জন্য এবং সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত।"

"জিজ্ঞাসা করি, সমাজের আইনটা কি কেবল নারীর জন্যই, না সমাজস্থিত পুরুষ-নারী উভয়েরই জন্য?"

"বিশেষতঃ যখন নারীই এখনও আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা করছে তখন তাহাদেরই ত শাস্ত্রের আইন নির্ব্বিবাদে মাথা পেতে বহন করতে হবে।"

"কারণ তাহারা মনুষ্যজীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনা আপত্তিতে তোমাদের মত পশু-প্রকৃতি পুরুষের হস্তে অর্পণ করেছে, এই না অপরাধ।"

"যাহারা কেবল স্বামী ও সংসার ভিন্ন আর কিছু জানে না, বা যাহাদের জানা উচিত নয়, যদি তাহারা তাহার অতিরিক্ত কিছু জানিতে যায় বা চায়, তবে শাস্ত্রকার তাহাদের এই অন্যায় স্বাধীন আচরণের নিমিত্ত গুরুদণ্ডই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং সে দণ্ড দিবার ভার একমাত্র সমাজের হাতে আছে বলিয়া

আজও আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার অবাধে প্রবেশ করে নাই, এটা মানেন ত ?"

হরেনবাবু ক্রোধে কাঁপিতেছিলেন, উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন "বটে, শাস্ত্রটা কেবল পুরুষের সুবিধার জন্যই হয়েছে, না ? তোমরা পুরুষমানুষ, স্বাধীন, যা ইচ্ছা করবে, সব ভাল। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সমাজ-বহির্ভূত অভদ্রোচিত অন্যায় কাজ করবে, আর অন্ধ-সমাজ তোমার মুখের দিকে না চে'য়ে, তোমার অর্থের ও অবস্থার প্রতি চেয়ে, হেসে তাহা তোমার যৌবনসুলভ বা পুরুষোচিত চাঞ্চল্য ব'লে অনায়াসে উড়িয়ে দেবে ও প্রকারান্তরে পক্ষসমর্থন করবে, এমন একপেশে শাস্ত্র কোথায় আছে বাপু বলত ?"

"তবে কি বলেন, আমরা সমাজের সঙ্গে বিবাদ করে বাস করব ?"

"তোমার যদি মনের বল থা'কত, তুমি যদি সত্য সত্য শাস্ত্র মান্য করতে, তুমি যদি কোন দিন স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্ত্তব্য-পালন করতে, তুমি যদি মাসের মধ্যে ২৯ দিন রাত্রে বাহিরে কাটিয়ে না আসতে, ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য মদ না খেতে, তবে কি আজ এই বৃদ্ধবয়সে, কতকগুলা গণ্ডমূর্খের ঘরগড়া সুবিধাকরা অন্যায়গুলাকে মাথা পেতে সহ্য করতে হতো, তাহাদের গড়া শাস্ত্র ও সমাজ এমন করে ন্যায়ে মস্তকে কুঠারাঘাত করে, আজকের দিনে পার পেয়ে যেতো ?"

হরেনবাবু পুত্রের আর কোন কথা শুনিলেন না। দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অজয়চন্দ্র নির্ব্বাক হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া অবশেষে নিকটবর্ত্তী একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার মধ্যে তখন অনেকগুলি এলোমেলো চিন্তা তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল।

( ৩ )

কমলা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। দেখিতে সে অলোকসামান্যা রূপবতী। গরীবের কুটীরে অত রূপ ধরিবে না ভাবিয়া কমলার পিতা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া একমাত্র তনয়ার বিবাহ দিলেন জমিদারগৃহে। বড় আশায়, তিনি এ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে যে কল্পনাতীত সুখের আশায়, নিজকে সুখী মনে করিয়া যখনই নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ-টুকু আসিল ভাবে, তখনই কোথা হইতে অজ্ঞাত অমঙ্গলের নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া হতভাগ্যের সকল আশা আশ্বাস মুহূর্ত্তে বায়ুবিতাড়িত মেঘের মত কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে উড়াইয়া দেয়, কে তাহার উত্তর দিবে ?

শৈশবকাল হইতেই কমলা একটু স্বাধীন! নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া যে কোন রূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা সঙ্গত বা শোভন নয়, কেবল নীরবে সংসারের সকল ন্যায়-অন্যায় মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই নারীর মহিমা, এ যুক্তি কোন দিনই সে মানিয়া চলিত না। সংসারের সেবা করার মধ্যে যেমন তাহার অধিকার ও প্রয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং সেই কাজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য যখন তাহার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সে অনুমাত্র দুঃখিত বা কুণ্ঠিত নয়, তখন সংসার যদি তাহার প্রতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর অন্যায় অত্যাচার করে তবে সে কেন তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সাড়া দিবে না? সংসারের মধ্যে সে তাহার স্থান ও অধিকার পূরামাত্রায় দাবী করিতে কোন দিন পরাঙ্মুখ হয় নাই। কমলার এই স্বাতন্ত্র্যের ভাবটি—স্ত্রীলোকের অহঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ নাম পরিগ্রহ করিলেও তাঁহার মধ্যে নারীত্বের বিশেষত্বই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কারণ, সে বুঝিয়াছিল, প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সংসারের সেবা করার মধ্যে কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব আছে এমন কথা কোন দিন সংসার স্বীকার করে না বা ভাবে না; বরং অসুস্থ শরীরে কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটিলে, সংসার মুখ ফিরাইয়া বিরোধ করিতে একটুও কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয় না। সংসারের হিসাবে, স্ত্রী-লোকের জন্ম ও মহিমা কেবল নীরবে, তিল তিল করিয়া তাহার দেহ, মন, প্রাণ সংসারের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া; সংসারের নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য বা দাবী কিছুই আছে, এমন কথা মনে করিলে, নারীত্বের মর্য্যাদা খর্ব্ব করা হয়। অনেক সময় সতীত্বের অঙ্গে কলঙ্কের দাগ স্পর্শ করে না কি? বড়লোকের গৃহে কমলার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া জমিদার-গৃহের অনেকেই স্পষ্টভাবে তাহাকে ভাগ্যবতী, এমন কথা উল্লেখ করিলে, সে তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতে কিছুমাত্র অন্যায় মনে করিত না। এই সকল কারণে, জমিদারগৃহের অনেকেই কমলার প্রতি মনে মনে বিরূপ ছিল।

( ৪ )

কতদিন অজয়চন্দ্র সুরাপান করিয়া আসিয়া অন্যায় ভাবে কমলাকে গালিবর্ষণ করিত। কমলা বলিত; "এরূপ করলে আমি এখানে থাকব না।"

অজয় মুখ বিকৃত করিয়া অশ্রাব্য ভাষায় দাসী-চাকরাণীর মত তাহাকে কটুকথা বলিত, সময় সময়, এমন কি, প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইত।

এইরূপ আচরণ করিবার প্রধান কারণ ছিল, সে জমিদার-পুত্র, তার সকল অপরাধ ও সাত খুন মাপ্।—অজয় মনে করিত, দরিদ্রের কন্যা জমিদারগৃহের বৌ হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য সম্পদ তাহার কিছুরই অভাব নাই। স্বামী মূর্খ নয়, একজন উকিল; তথাপি সে কিসের জন্য নির্ব্বিবাদে তাহার শাসন মানিতে কুণ্ঠিত হয়। সামান্য কথায় তার মান বাড়িয়া উঠে! অনুগ্রহ করিয়া সে যে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, এই না তার পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্য!

অজয় রাগিয়া বলিল,"তুমি বাপেরবাড়ী যাওয়ার ভয় কা'কে দেখাও? তোমার মত চাকরাণী, আমি বাঁ-পা দিয়ে পঞ্চাশটা এখনি আনতে পারি, তা জান?"

কমলা চুপ করিয়া যাইবার মেয়ে নয়—সে এতটুকুও ভাবিল না, নির্ভয়ে বলিল "স্পর্দ্ধা করিবার শক্তি, যে কেবল বড়লোকের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে, এমন কথা ভেব না। মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ মানসম্ভ্রম রক্ষা করার মত শক্তি তার নিজের কাছে আছে। তবে অনেকে তা প্রয়োগ করে, অনেকে করে না বলে, যে আত্মসম্মানবোধ নারীর থাক্‌তে পারে না, এমন কথা যদি তোমার মনে এসে থাকে তবে জেনো সেটা প্রকাণ্ড ভ্রম। আমার উপর তোমার যতটা অধিকার, তোমার উপর ঠিক আমার যে ততখানি অধিকার আছে—একথা কেন ভুলে যাচ্ছ? তোমার জমিদারী বা ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ত আমার বিবাহ হয় নাই; তুমি আমাকে স্ত্রী বলে যখন গ্রহণ করেছ, তখন স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে আমার প্রাপ্য বুঝে নিতে আমিই ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তুমি যদি মনে কর, তোমার আমাকে দুটি দুটি খেতে দেওয়া ভিন্ন আর অপর কোন কর্ত্তব্য নেই, তবে কি স্বামীর প্রতি, স্ত্রীর সকল কর্ত্তব্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? কেবল সমাজগত সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, এতবড় একটা জন্মজন্মান্তরের বন্ধন এতযুগ ধরিয়া খাড়া থাকতে পারে?" অজয়চন্দ্র আজ কমলার কথা শুনিয়া স্তম্ভীত হইয়া রহিল। তারপর বলিল, "দেখ্‌চি, বেশ তর্ক করতে শিখেচ। তবে আর ঘরের গণ্ডীর মধ্যে থাকবার প্রয়োজন কি? আদালতে বাহির হ'লে, অনেক মকদ্দমা পাবে এখন, অনেক টাকা আসবে।"

কমলা এবার একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "প্রয়োজন হ'লে বেরুতে হবে বই কি। পৃথিবীর সকল কাজ যে, তোমাদের একচেটিয়া, এ অহঙ্কার বড় বেশী দিন টিকবে না। তোমরা যা ইচ্ছা তা করবে, আর আমরা অন্যায়কে অন্যায় বল্লেই, মহাভারত অশুদ্ধ হ'বে, অমনি নারীত্বের মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে বসব, না?"

"ক্রমে ক্রমে দেখ্‌চি তোমার স্পর্দ্ধা খুব বেড়ে যাচ্ছে, ভাল চাও ত এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি, নইলে একটা কেলেঙ্কারী হবে।"

কমলা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "ভাল চাই বলে, এখনও ঘরে মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি; যেদিন ভাল চাইব না, সে দিন, তোমাকে চলে যাবার জন্য অনুযোগ করতে হবে না। তার পথ আমি জানি" বলিয়া কমলা ক্ষিপ্রপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শারদাকাশে তখন চন্দ্র হাসিতেছিল। নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে যেন আনন্দাশ্রুর মত অবিরত চন্দ্রের শুভ্র রজতরশ্মিধারায় ধরণী ভরিয়া উঠিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যেন একটা পরিতৃপ্তির অম্লান আনন্দ ও উল্লাস ভাসিতেছিল। কমলা গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিল। তাহার নয়নপ্রান্তে যে অবাধ্য অশ্রু তাহার মর্ম্মঃবিদীর্ণ করিয়া আসিয়া জমিয়াছিল, চন্দ্রালোকে তাহা হীরকের মত আলোক-উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কমলা কি ভাবিল; একমুহূর্ত্তের ভিতর তাহার নয়ন শুষ্ক হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়, কমলার শ্বাশুড়ী সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা, এখানে বসে কেন গা? অজয় কিছু বলেচে নাকি—যাও, যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে, অনেক রাত হয়েছে। স্বামীর কথায় কি রাগ করতে আছে বাছা!"

কমলা কোন উত্তর দিল না। মনে মনে তার বড় ঘৃণা হইল। মনে হইল, "শ্বাশুড়ীঠাকরুণ অবশ্য মনে ভাব্‌চেন যে, আমি তাঁর পুত্রের অত্যাচারের আশঙ্কায় হয় ত ঘরে যাইতে পারিনি, সে কারণ এমন অবস্থায় বাহিরে বসে আছি।" তারপর আপনা আপনি কমলা মৃদুকণ্ঠে বলিল "স্বামীর কথায় কি রাগ করতে আছে বাছা, কেন নেই, স্বামী যদি যথেচ্ছাচারীর মত যা ইচ্ছা বলে, যা ইচ্ছা করে তবে তার সকল কথা মাথা পেতে সহ্য করার নাম কি স্বামীকে ভক্তি করা, শ্রদ্ধা করা; না তাকে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হবার সহায়তা করা। মুখ বুজে সকল কথাই হজম করাই কি স্ত্রীত্ব? অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কি নারীকে উদ্ধত-স্বভাবা, অহঙ্কারী, অলক্ষণা প্রতিপন্ন করে তুল'বে? তাহার যে প্রাণ আছে, মন আছে, ন্যায় অন্যায় বুঝিবার মত বিধাতা শক্তি, চিন্তা ও মনুষ্যত্ব প্রদান করে-ছেন, এসবগুলি তাকে জলাঞ্জলী দিয়া, প্রাণহীন কলের পুতুলের মত যতদিন না, সে অপরে ইচ্ছায় নড়িবে চড়িবে ততদিন তাহাকে আদর্শ-স্ত্রী বলা যাইতে পারে না—এই না তোমাদের সংস্কার! এই না তোমাদের সমাজ!" এই সকল

কারণেই প্রথম হইতে কমলার স্বামীর সহিত বনাবনি হয় নাই। কমলার অনেক গুণ ছিল। বাড়ীর কাহারও কোনরূপ অসুখ করিলে, সে তখন সকল বিরোধ ভুলিয়া প্রাণপণ করিয়া তাহার সেবা করিত। সামান্য দাসী পর্য্যন্ত তাহার সেবা হইতে কোন দিন বঞ্চিত হইত না। সে কমলাকে কি উদ্ধত-স্বভাব বলিব?

( ৫ )

একদিন অজয়চন্দ্র সুরা পান করিয়া পথে পড়িয়া মাথা কাটিয়া গৃহে ফিরিল। তাহার এরূপ অবস্থা হইবার একমাত্র কারণ, সে বলিল, সে যখন আদালত-বাহির হয় তখন নাকি কমলার সহিত তার দেখা হয়—এই অলক্ষণদৃশ্যই না কি, আজ তার অমঙ্গলের একমাত্র কারণ। বাড়ীসুদ্ধ সকলে অজয়ের সহিত একমত হইয়া অলক্ষণা বধূর যথেষ্ট নিন্দা করিল; কেহ কেহ বলিল "ছোট ঘরের মেয়ে এনে সংসারটী মাটী হতে বসেচে। অমন সোনারচাঁদ ছেলে, সেও বৌয়ের গুণে কি ছিল আর কি হ'য়েছে।" কমলা এই সকল অদ্ভুত যুক্তির কথা শুনিয়া রাগিয়া ফুলিতে লাগিল। মনে করিল, এই দণ্ডে তাহাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাপেরবাড়ী চলিয়া যায়। দশকথা শুনাইয়া দিবার নিমিত্ত বারংবার তার রসনা উত্তেজিত হইতেছিল, কিন্তু, সেদিন সে কোন কথা বলিল না। কেন বলিল না, তাহা বলিতে পারি না। তাহার নিরুত্তর ভাব দেখিয়া অনেকেই যে মনে মনে একটু বিস্মিত না হইয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। সেদিন সারারাত্রি কমলা ঘুমাইল না। অজয়চন্দ্রের মাথা কোলে লইয়া হাত বুলাইয়া দিল। স্বামী বলিয়া বা সকলে রাগ করিয়াছে বলিয়া যে কমলা এরূপ করিল তাহা নয়। যে কেহ অসুস্থ হইলে সে এরূপ সেবা করিয়া থাকে। সমস্ত রাত্রি সে সেবা করিল সত্য, কিন্তু একটী কথাও কহিল না। এইরূপ করিয়াই জমিদার-সংসারে কমলার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। স্বামীর সহিত তাহার একদিনের জন্য মনের-মিল হয় নাই। উভয়ের মধ্যে একটা প্রণয়বন্ধন আছে, তাহার কোন চিহ্নই কোন সূত্রে কোন দিক হইতেই পরিলক্ষিত হইত না। এইরূপ অবস্থায় অজয়চন্দ্র একদিন মদ খাইয়া গভীর রাত্রিতে আসিয়া দেখিল কমলা নিদ্রিত। স্বামীর জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্যে অবহেলার নিমিত্ত এবং তাহার প্রতি কমলার কিছুমাত্র অনুরাগ ও ভক্তি নাই এই, ধারণা যতই তার মনে হইল, ততই তার মত্ততা বাড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সে শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া টলিতে

লাগিল। অবশেষে চীৎকার করিয়া বলিল "এখানো লাটসাহেবের ঘুম ভাঙ্গল না? পাজি, বদমাইস্, বেরো বলচি আমার ঘর থেকে! মেয়েমানুষের এত বড় বুকের পাটা! স্বামী বাহিরে রয়েছে আর—তিনি না'ক ডাকিয়ে—বেশ আরামে ঘুমচ্ছে।" দীপালোকে অজয়চন্দ্রের অর্দ্ধনির্মিলিত রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় যেন আরও আরক্ত হইয়া উঠিল। কমলার সেদিন জ্বর হইয়াছিল। সুতরাং সে একরূপ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল—এ সব কথা কিছুই সে শুনিতে পাইল না এবং সাড়াও দিল না। সুরামত্ত অজয় রাগিয়া কমলার হাত ধরিয়া এমন জোরে টানিল, যে সে শয্যা হইতে মেঝের উপর আসিয়া পড়িয়া গেল। চুড়ী ভাঙ্গিয়া কমলার হাত কাটিয়া গেল, নিকটেই একটা টেবিল ছিল, তাহাতে আঘাত লাগিয়া কমলার মাথা কাটিয়া অজস্রধারায় রক্তপাত হইতে লাগিল। কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং চাহিয়া দেখিল, শয্যাপার্শ্বে মদমত্ত দস্যুর মত আরক্তনয়নে তাহার স্বামী দাঁড়াইয়া টলিতেছে। কমলার বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। সে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার মাত্র তাহার দিকে তাকাইয়া সেই মুহূর্ত্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

গভীর রজনী। সকলেই নিদ্রামগ্ন। ধরণী নীরব নিস্তব্ধ। কাহারও সাড়া শব্দ নাই। ঘনান্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। দূরে প্রেতের মত বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান। কেবল মাঝে মাঝে, দুই একটী বিহঙ্গমের পক্ষপুট সঞ্চলনের ক্ষীণ শব্দ শ্রুত হইতেছে। মেঘলেশহীন আকাশে দুই একটা তারা সতর্ক প্রহরীর মত ধরণীর পাহারায় নিযুক্ত। কমলা পাগলিনীর মত একবারে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় অপমানে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, সে যে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাছারী-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিল। মনে করিল আর একমুহূর্ত্ত সে এখানে থাকিবে না। এই দণ্ডেই সে বাপেরবাড়ী ফিরিয়া যাইবে, এবং একাই যাইবে। তাহাতে তাহার কোন অপমান হইবে না। পরক্ষণেই মনে হইল, এ ব্যর্থজীবনভার বহিয়া লাভ কি? এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকা কেন? তারপর মনে হইল এ প্রাণ আজ বিসর্জ্জন দিব। কিন্তু কমলার মধ্যে যে সত্য ও স্বাধীনতা এতদিন তাকে তার নারীত্বের মর্য্যাদায় উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল, কমলার হীন ও ক্ষীণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কমলার মনে হইল, "না কিছুতেই মরিতে পারি না। তাহা হইলে, এই অপদার্থ লোকগুলির আনন্দের সীমা থাকিবে না। তাহাদের

নীচতার জন্য কেন আমি আমার জীবন নষ্ট করিব।” কমলা যখন এরূপ চিন্তা-নিমগ্ন, ঠিক সেই সময় নায়েব হেমেন্দ্রবাবু গৃহ অর্গল মুক্ত করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আপনা আপনি বলিল, “বাবা! কি বেদম গরম পড়েচে, একবার চোখের পাতা মুড়তে পেলাম না” তারপর অকস্মাৎ তার দৃষ্টি কমলার দিকে পড়িতেই বেচারীর আশঙ্কায় সর্ব্বশরীর হিমশীতল হইয়া আসিল। সে নির্ব্বাক, স্তম্ভিত ও অচঞ্চল হইয়া দাঁড়াইল। অর্গলমুক্তশব্দে কমলার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল, সেও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভয়ব্যাকুল দৃষ্টিতে হেমেন্দ্রবাবু কমলার দিকে তাকাইয়া দেখিল—দেখিল সে যেই হোক, মানুষের অবয়ববিশিষ্ট। তখন তাহার একটু সাহস বাড়িল; ভাল করিয়া দেখিতেই ক্ষীণনক্ষত্রালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার অঙ্গে অলঙ্কারগুলি ঈষৎ উজ্জ্বলতর দেখা যাই-তেছে। মনে হইল যেন কমলা।—তাই কি সত্য? তিনি কেন অন্দর ছাড়িয়া এখানে আসিবেন। হেমেন্দ্র অজয়ের ব্যবহার ও চরিত্রের কথা বিশেষরূপ অবগত ছিল, সুতরাং ভাবিল, অবশ্য কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এরূপ করিয়া নীরব থাকা ভাল নয় মনে করিয়া হেমেন্দ্র অল্প জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে ওখানে?” তার পর মনে হইল যদি কমলা না হইয়া, অন্য কেহ হয়। তাতে তাহার ক্ষতি কি? কমলা কোন উত্তর দিল না; কেবল তাহার দিক ফিরিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্র নিকটে গিয়া দেখিল, সত্য সত্যই কমলা। কমলা তাহাদের গ্রামের মেয়ে। বাল্যকালে সে কতদিন হেমেন্দ্রদের বাড়ী খেলা করিতে গিয়াছে। কতদিন হেমেন্দ্রের মাতা তাহাকে আদর করিয়া বলিত, “কমলা, তুমি দিনরাত আমাদের বাড়ী থাক, তোমাকে আমরা বৌ করে নেব।” হেমেন্দ্র পাশের ঘরে বসিয়া পড়িতে পড়িতে, এই অসম্ভব আশ্বাসবাণীটি আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিয়া কমলাকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখিত। তাহার মনের মধ্যে কত আশাই জাগিয়া উঠিত। বাস্তব অপেক্ষা কল্পনায় কত সুখ, মনে করিতে করিতে তাহার পড়া ভুল হইয়া যাইত। একদৃষ্টে সে কমলার খেলার খুটিনাটিটি পর্য্যন্ত একমনে দেখিত। আজ সেই কমলাকে একা, রাত্রিকালে তাহারই গৃহদ্বারের নিকট নিরীক্ষণ করিয়া সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—হঠাৎ বহুদিনের লুপ্তবেদনা মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

এবার হেমেন্দ্র মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কমলা, তুমি কি আমায় কিছু বল্‌বে?”

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন সামান্য তৃণটি অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার প্রয়াস পায়, কমলার নিরবলম্ব অপমানিত অন্তর আজ আশ্রয় অনুসন্ধানে বিচারবুদ্ধিবিহীন। যে কোন উপায়ে হোক্ সে আজ এই জমিদার-সংসারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। আজ তাহার মস্তক কাটিয়া যে রক্ত পড়িতেছিল, কমলার মনে হইল, তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া তাহা পড়িতেছে। কমলার মন প্রাণ যখন সকল দিক হইতে একজনকে সহায়তা করিবার জন্য খুঁজিতেছিল, ঠিক সেই সময় হেমেন্দ্র অত্যন্ত স্নেহকরুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা তুমি কি আমায় কিছু বলবে ?"

কমলার মনে হইল, এমন মধুর স্বরে কেহ তাহাকে আজ পাঁচ বৎসর ডাকে নাই। অপমাননিপীড়িতঅন্তর অকস্মাৎ সহানুভূতির সাক্ষাতে আত্মহারা হইয়া যেন আপনার অনিচ্ছায় বলিয়া ফেলিল—"হেম দা, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করবে,—আমি আর জমিদার-গৃহের অর্থের অসহ্য গর্ব্ব —নিদারুণ অপমান সহ্য করতে পারি না—আমাকে তুমি রক্ষা করবে। আমি যেখানে ইচ্ছা, যেমন অবস্থায় হোক থাকা, সহস্রগুণে এর চেয়ে শ্রেয় মনে করি—" বলিতে বলিতে কমলার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

হেমেন্দ্র বলিল "কমলা আমার দ্বারা তোমার যে কেন উপকার হয় তা করব।"

"হেন-দা তবে এখনই চল্; আমি আর একদণ্ড এখনে থাকতে রাজি নই।"

"কমলা, তুমি আর একদিন অপেক্ষা কর। কাল সন্ধার সময় বাগানে গিয়ে দেখা করো, সব ঠিক করব।"

এই সময় একটী কেরোসিন তৈলের ডিবা হাতে করিয়া নন্দহরির স্ত্রী রাইমণি জমিদারগৃহের দ্বারে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া উপরিউক্ত কথোপকথন শুনিল। সেই রাত্রে হঠাৎ তাহার পুত্রের ভেদবমি হওয়ায় সে জমিদার-গৃহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইতে আসিতেছিল। কর্ত্তাবাবু সকলকে ঔষধ দিয়া থাকেন, তাহা সে জানিত। রাইমণির স্বামী নন্দহরি, সেদিন জেলায় মকদ্দমা করিতে গিয়াছিল, ঘরে ছিল না। সেজন্য সে নিজেই আসিয়াছিল। তাহার আর ঔষধ নেওয়া হইল না; সে একটা মস্ত গুপ্তরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে; তাই সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়া পুত্রকে একবাটী চুনের জল খাওয়াইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে কমলা হেমেন্দ্রকে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া অন্দরে ফিরিয়া গেল। হেমেন্দ্রের সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। কমলা যে কি বলিল তাহাও কমলার মনে রহিল না।

( ৬ )

বৃদ্ধ হরেনবাবু সমাজের মান রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। বৈবাহিককে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তিনি নীরবে কন্যাকে লইয়া গেলেন। কিন্তু তিনিও কমলাকে বেশী দিন গৃহে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তারের সংবাদ হয়ত কোন দিন বিলম্বে পৌছান সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু এ কাহিনী চারিদিকে তাহা অপেক্ষা শীঘ্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; লজ্জায় অপমানে বেচারীর মাথাকাটা গেল। কমলা একদিন বলিল "বাবা, আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দিন। এতটা অপমান মাথায় করিয়া কিছুতেই ঘর করা সম্ভবপর নয়। আমার জন্যে ভাববেন না; এটা নিশ্চয় জানবেন, এখন থেকে আপনার কন্যা বেশ শিখেছে, কেমন করে, তার মান-ইজ্জত রক্ষা করতে হবে।"

কমলাকে গৃহে স্থান দিবার নিমিত্ত কমলার পিতাকে দেশসুদ্ধ লোকে অস্থির করিয়া তুলিল। ভদ্রলোক অগত্যা কমলাকে তাহার কাশীর বাড়ীতে থাকিয়া অন্নপূর্ণার পূজায় মনোনিবেশ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কমলা ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না। বরং এই সকল তীব্র সমালোচনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইল। এদিকে কমলার শ্বশুরকে গ্রামের সকলেই পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ইঁহাদের প্রস্তাবে হাঁ, না, কোন উত্তর দিতেন না। পুত্রের গুণাগুণ জানিতে তাঁহার কিছুই বাকী ছিল না। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া অপর কোন বালিকার সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে আসে নাই। কমলার কাশীবাসের কথা, কমলার পিতা সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া রাখিলেন। কমলা যে কোথায় আছে, গ্রামের লোকেরা যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল না, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা এখানেই যে এই ঘটনার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইতে দিল, এমন কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। কারণ সমাজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে কমলার বারাঙ্গনাবৃত্তির কথা পুরামাত্রায় হাটে, বাজারে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে চলিতে লাগিল। নিষ্কর্ম্মা স্থবির পল্লীসমাজ অনেকদিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপার লইয়া আত্মরক্ষা করার জন্য বিশেষ ভাবে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

( ৭ )

সেদিন প্রভাতে মনিকর্ণিকার ঘাটে প্রাতঃস্নান করিয়া কমলা গৃহে ফিরিতেছিল। কমলা দেখিল, পথের ধারে অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়াছে।

এখন কমলা প্রতিদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান ও একবেলা আহার করে। সে তার এই নির্জ্জনবাসের মধ্যে অখণ্ড শান্তি ও তৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছে। তাহার নারীত্ব যেন পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে জাগিয়া তাহাকে দেবীত্বের প্রভায় উজ্জ্বল করিয়াছে। কমলা শুনিল, ভীড়ের ভিতর হইতে এক জন লোক কেবলই কাতরস্বরে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে "আমাকে হাসপাতালে পাঠিও না—সেখানে একঘণ্টাও বাঁচব না।"

এই কথা শুনিবামাত্র আজ সহসা কমলার দুই বৎসরের এক অতীত ঘটনা মনে পড়ায় তাহার সমস্ত শিরায় রক্ত-চলাচল যেন স্থির হইয়া আসিল। সে দিনও কমলার অন্তরাত্মা ঠিক এমনই করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়াছিল "ওগো সমাজ! তোমার পায় পড়ি, আমাকে পথের মাঝে দাঁড় করাইও না—সেখানে যে আমি এক মুহূর্ত্ত টিঁকতে পারব না; সে অনুরোধ যে কতখানি প্রাণস্পর্শী, তাহা কমলা ভিন্ন এ জগতে আর কেহ অনুভব করিয়াছিল কি না, তাহা কেহ জানে না। অপমান-পীড়িত ক্ষুব্ধ অন্তরের এক দিনের সামান্য আচরণের জন্য তাহার সমগ্র নারীজন্মটাই ব্যর্থ করিয়া দিতে তাহার স্বামী পর্য্যন্ত কি ব্যস্তই না হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পীড়িতঅন্তর আজ যেন চারি দিক হইতে নিঃসহায় পথিকের করুণ আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাতুর হইয়া সমস্বরে আর্ত্তকণ্ঠে করুণা ভিক্ষা করিতেছিল। কমলা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তখনই ঝিকে একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিল। গাড়ী আসিলে কমলা মুহূর্ত্তের ভিতর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। পীড়িত পথিককে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ঝিকে দিয়া সকলকে অনুরোধ করিল। গাড়ী দেখিয়া লোকটি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, তাহাকে এবার নিশ্চয় হাঁসপাতালে যাইতে হইবে। সে মাটি আঁকড়াইয়া পড়িল। কেহ তাহাকে গাড়ীতে উঠিতে সম্মত করিতে পারিল না। বেচারী পূজার ছুটিতে দুই জন বন্ধুর সহিত কাশী বেড়াইতে আসিয়াছিল। এখানে আসিয়া তাহার কলেরার মত হয় সুতরাং তাহার বন্ধুগণ বিপদ বিবেচনা করিয়া বন্ধুর কাশীতে অচিরে শিবত্ব লাভের ব্যবস্থা করিয়া পলায়ন করে। যখন কোন মতেই তাহার বিশ্বাস হইল না যে তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী আসে নাই, তখন অগত্যা কমলা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিজে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,"আসুন আপনার কোনরূপ আশঙ্কা নাই, আমি আমার নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার

নিমিত্ত গাড়ী আনিয়াছি। লোকটি ক্ষণকাল বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গাড়ীতে উঠিতে সে আর কোনরূপ আপত্তি করিল না।

দুই তিন দিন কমলার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবায় লোকটি আরোগ্যলাভ করিল। এই তিন দিন কমলা যে কি সুখে দিন কাটাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। কমলা যখন তাহাকে ঔষধ সেবন করাইয়া শান্ত ও নিদ্রিত অবলোকন করিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করিত, পশ্চিম আকাশ যখন অস্তমিত দিনদেবের রক্তিম আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত, কমলার নারী-হৃদয়াকাশ পর সেবার আনন্দ-অনুরাগ তখন উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠিত। সে তাহার নারীজীবনকে ধন্য মনে করিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া বার বার বিশ্বনাথের চরণে নমস্কার করিত। এত বড় বৃহৎ কাজ যখন তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন কেন সে সমাজের অন্যায় দণ্ডকে মাথা পাতিয়া কষ্টের বা দুঃখের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। এই কয়েকদিনে কমলা যেন একটা নূতন জীবন লাভ করিল। সে যখন জননীর মত কাছে বসিয়া ঔষধ সেবন করাইত, যখন ভগিনীর মত অনুরোধ করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করিত, যখন আত্মীয়ার মত, আপনার জনের মত তার সকল ভার নিজের স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইত, যখন সেই অনন্যোপায়, অসহায়, পীড়িত ব্যক্তি নির্ভয়ে তাহার সকল ভার এই অপরিচিতা নারীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার দিন কাটাইতে লাগিল—যখন একটুখানি পিপাসার জলের জন্য, সামান্য কারণে আপনার জনের উপর অনুযোগ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার লইয়া কমলার উপর সে অভিমান করিতে আরম্ভ করিল, তখন কমলা তার জীবনধারণ ধন্য মনে করিত; তার নারীজন্মকে কিছুতেই ব্যর্থ মনে করিতে পারিত না। কিছু দিনের মধ্যে যখন যুবক সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল, তখন কত দিন যুবকের মনে হইল, আর এখানে থাকা ভাল দেখায় না, শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু চলিয়া যাইতে, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কত কথাই তার মনে হইত। কমলা কেন একা, এমন অবস্থায় এখানে আছে, কেন তার আত্মীয় স্বজন তাহাকে এমন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এ সকল কথা কমলাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে সাহস পাইত না; পাছে কমলা কিছু মনে করে বা যদি বলে তোমার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কি?

একদিন কমলা জিজ্ঞাসা করিল "আপনার বাড়ীতে কি পত্র দিয়েছেন?" যুবক

উত্তর করিল "না, দিই নাই;—আমি দুই একদিনের ভিতরে বাড়ী যাইব।" কমলা বলিল "সে কথাই উত্তম, কবে যাবেন মনে করেচেন ?"

"আগামী কল্য যাব ঠিক করেছি।" এ উত্তরটা না ভাবিয়া চিন্তিয়াই সে দিল। সেইদিন মধ্যাহ্নে যুবক কমলার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় কমলাকে কিছু বলিবে মনে করিয়া অনেকবার সিঁড়িতে নামিতে নামিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার অন্তরের মধ্যে কমলা সম্বন্ধে একটা রহস্য রহিয়া গেল—কে এই দেবী ?

( ৮ )

যুবক চলিয়া যাইবার পর কমলা আবার তাহার পূজা, গঙ্গাস্নান লইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল। একদিন প্রখর মধ্যাহ্নে কমলা অন্যমনস্কভাবে জানালায় দাঁড়াইয়া পথের জনতার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পথের ধারে একজন লোকের উপর আকৃষ্ট হইল। লোকটি তাহারই বাতায়নের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে সেই একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা ঝিকে ডাকিয়া বলিল "দেখত লোকটি কে, আমার মনে হয় শ্রীশ বাবু হয়ত বা ?" ঝি জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া বলিল "হাঁ গো দিদিমণি, ও যে আমাদের শিরীশবাবু। উনি যে, সেদিন কল্‌কাতায় যাব ব'লে চলে গেলেন। আবার কি ফিরে এলেন নাকি ?" কমলা বলিল "হ'তে পারে।" ঝি বলিল "তবে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? বাড়ির ভিতর চলে এলেই ত পারেন" কমলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল "তুই যা, শ্রীশবাবুকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আয়"। ঝি নীচে নামিয়া গেল। কমলা জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, শ্রীশবাবু কি কাহারও সহিত দেখা করবার জন্য এই প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছেন—আচ্ছা তিনি কি আজও বাড়ী যান নাই, যদি না গিয়া থাকেন, তবে এতদিন একবারও আমার সহিত দেখা করেন নাই। হয়ত দেখা করিতে আসিয়াছেন, পরে মনে করিয়াছেন,একা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত নয়—সেজন্য হয়ত বা ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার মনে হয় যেন তিনি কি একটা আমায় বলিতে চান—কিন্তু বলিতে পারেন না। লোকটি বেশ ভাল-মানুষ, কিন্তু বড় লাজুক। উঃ এই গরমে, অমন করে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে কি কষ্ট দিয়েছেন তা বলতে পারি না। এই সব অন্যায় অত্যাচার

সহজেই মানুষকে পীড়িত ক'রে ফেলে। আচ্ছা, আমি যে ওঁকে ডেকে পাঠালাম, এলে কি বল্‌ব? উনি যদি অন্য কিছু মনে করেন। এরূপভাবে ডেকে পাঠানতে কিছু অপরাধ নেবেন না ত? কেন? আমি বল্‌ব অত রৌদ্রে কি দাঁড়িয়ে থাকতে আছে—এখানে ঠাণ্ডায় একটু বসুন। যার জন্যে অপেক্ষা করছেন, সেত এই দিক্ দিয়েই যাবে—এলে তার সঙ্গে তখন যাবেন। এই সকল কথা ভাবিতে কমলার অন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। ঠিক এই সময় ঝি সিঁড়ীর উপর হইতে বলিল "দিদিমণি শিরীশবাবু এসেছেন।" কমলা ক্ষিপ্রহস্তে অবগুণ্ঠনের পরিসর অল্প পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়া বলিল—"কি ভয়ানক রোদ, খুব কষ্ট হয়েছে বোধ হয় আপনার? আসুন, বসুন," শ্রীশচন্দ্রের মুখ রৌদ্রে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ললাটনির্গতস্বেদ কপোলদেশ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া বলিল—"রোদটা খুব প'ড়েছে বটে, একখানা পাখা দিন না।" কমলা নিজেই একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। শ্রীশ বলিল "ও কি করেন,আমায় দিন। আপনিকি আমায় ডেকেছেন?" কমলা বলিল "আপনি কি আজও বাড়ী যান নাই?" শ্রীশচন্দ্র একটু থতমত খাইয়া গেল, বলিল "না যাওয়া হয় নাই, বাড়ীতে চিঠি লিখেছি, এখনও টাকা আসে নাই।" কমলা বলিল "তা আমাকে বলেননি কেন? বাড়ীতে গিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিলেই চলত। বাড়ীতে কত ভাবছে বলুন দেখি?" শ্রীশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "চিঠি পেয়েছি, টাকা বোধ হয় কাল পাব।" কমলা ঝিকে ডাকিয়া বলিল "একটু সরবৎ করে আননা ঝি?" শ্রীশের কেবলই মনে হইতেছিল, এইবার বোধ হয় কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, পথের ধারে ওরকম ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম কেন? ঠিক তাহাই হইল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কাহারও জন্য কি অপেক্ষা কর্‌ছিলেন।" শ্রীশচন্দ্র বলিল "না।" কমলা পুনরায় সে কথায় উল্লেখ না করিয়া বলিল "এই নিন সরবৎ খান" শ্রীশ এক নিঃশ্বাসে সরবতের গ্রাস শেষ করিল। তখন তাহার কণ্ঠতালু একবারে শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। শ্রীশ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তবে এখন আসি।" কমলা বলিল "আপনি কি আমায় কিছু বলবেন মনে করছেন?" শ্রীশ স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইল। তারপর কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। কমলার মনেঃহইল, কিছু যেন বলিবার ছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

কমলা সেদিন সন্ধ্যার সময় ঝিকে সঙ্গে করিয়া আরতি দেখিতে গেল। আরতি দেখিয়া যখন ফিরিতেছিল; সহসা ভিড়ের ভিতর দেখিল, একজন

পুরুষ মানুষ তাহার সঙ্গীকে কমলার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া কানে কানে কি বলিতেছে। অন্ধকারে কমলা লোকটিকে ভাল চিনিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি সে বাড়ী ফিরিল। কমলা আর দুই তিন দিন বাড়ীর বাহির হইল না। একদিন সকালে কমলা পূজা শেষ করিয়া ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর সঙ্গে আর শ্রীশ বাবুর দেখা হয় নাই।"

ঝি বলিল, "না। তিনি বোধ হয় বাড়ী গিয়েছেন। তাঁর যে উপকার আপনি করেচেন, তিনি যদি মানুষ হন ত ভুলবেন না।"

কমলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল "আচ্ছা তুই যা এখন" বলিয়া কমলা মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে ঝি উপরে আসিয়া সংবাদ দিল "একজন লোক নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছেন ; বল্লেন এ বাড়ীতে কি কমলা থাকেন। আমি বল্লাম কে গা বাছা তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়, লোকটীর কথা যেন আমার ভাল মনে হল না। বল্লে বলগে আমার নাম অজয়বাবু তাহ'লে কমলা চিনতে পারবে।"

কমলা বসিয়া ছিল সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত শিরার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎবেগে রক্ত ছুটিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের ভিতর বিস্মৃত অতীত ঘটনা সহস্র বাহু দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাও, তাকে নিয়ে এস"। ইতিমধ্যে কমলা আপনাকে অনেকটা সংযত করিয়া লইল। সেদিন বিজয়া দশমী। অজয় গৃহে প্রবেশ করিলে, কমলা তাহাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অজয়চন্দ্র বোধ হয় সুরাদেবীর সেবা করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সে বেশ সরল হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। অল্প-জড়িতকণ্ঠে বলিল "একেবারে পগার পার। আমি কি কলকাতায় তোমায় কম খুঁজিচি। নন্দদাদার মুখে শুনেছিনু, যে সোণাগাছিতে তোমার খুব পসার হ'য়েছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজেচি, কিন্তু বাবা কোথাও সন্ধান করতে পারিনি। ভাগ্যে পুণ্য করতে কাশী এসেছিনু, ভাগ্যে সেদিন আরতি দেখ্‌তে গিয়েছিনু, তাই না তোমার সন্ধান পেনু—এমনি করেই, রাম সীতা উদ্ধার করেছিল, কি বল?"

অপমানে, ক্রোধে কমলার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে মনে মনে বলিল, "ভগবান আমার পাপ হয় হোক্, তথাপি এরূপ নরাধমকে কোনদিন স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুতে কোন রমণী রাজি হইতে পারে না। এখনও ত সমাজ এই হতভাগ্যের কিছুমাত্র শাসন করিতে পারে নাই—নিজের স্ত্রীকে অম্লান-

বদন বেশ্যা বলিয়াই তাহার পশার প্রতিপত্তি গৌরব শুনিয়া তাহার গৃহে আসিল, কমলা দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া ধরিল। তাহার হৃদয় ফাটিয়া কান্না যেন বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া ছুটিতে চাহিল, কিন্তু সে কাঁদিল না—নির্ভীকভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি এখনই এখান হ'তে চলে যাও।"

"আমি কি তোমায় ফাঁকি দেবো কমলা!"

কমলা ঘৃণায় দুই হস্তে কর্ণ চাপিয়া ধরিল। বলিল, "ভাল চাও ত এখনই যাও বলছি—সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাহা ইচ্ছা করতে পার, সেখানে তোমাদের আধিপত্য আছে সত্য; কিন্তু মনুষ্যত্ব তোমাদের সে সমাজের ভয় রাখে না, ভাল চাও ত আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করো না, নইলে আমি নারী—আমি তোমাকে জোর করে বের করে দিতে বাধ্য হব।"

"আর তখন আমার হাত দুটি বুঝি জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে" বলিয়া অজয় কমলাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শ্রীশচন্দ্র সে গৃহের মধ্যে আসিয়া বলিল, "মা আজ আমি তোমাকে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছি, এই যে সমাজের অলঙ্কার! পুণ্যভূমি তীর্থে এসেও লজ্জা হয় না! নরাধম, তুই আমার মার গায়ে হাত দিতে যাস্, আমি তোর সব কথা জানি" বলিয়া অজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিল।

শ্রীশ বলিল, "মা, আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার কিছু বলবার আছে কি না—আর আমার কিছু বলবার নাই,—দুর্ব্বল নারীর মধ্যে যে কেবল দুর্ব্বলতাই নাই—সেখানে তার মান, ইজ্জত রক্ষা করবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব আছে—তাহা স্বচক্ষে দেখলাম। আজ আপনার কথা শুনে, বুঝলাম, আমার বলবার আর কিছু নেই।" বলিয়া শ্রীশ ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। কমলা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# সূর্য্যমণি

হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গনে আমি ফুটেছি শবরী বালা;
এক কোণে রহি' দীনা কুণ্ঠিতা, সহিতেছি কত জ্বালা।
যখন সকলে ফুটে তখন আমি না ফুটি,
দুপুর রৌদ্রে জেগে ধূলায় পড়িগো লুটি,
আমি যে শবরী বালা,
আমাতে হয় না দেবতার পূজা, আমাতে হয় না মালা!

আমি যে গো জাপি পত্রলেখার নীরব বেদনা নিয়া,
জীবনের এই খেয়া নায়ে লুটে মীন-গন্ধার হিয়া ;
প্রেম শুধু তোমাদের তোমরা কি ভাব' শুধু ?
শবরীর হৃদি খানি মরু সম করে ধূ ধূ
সে কথা বলে কি ফল ?
তাই বলে কি গো কৃপা করে' কেহ মুছে দিবে আঁখিজল ?

বৈকাল হ'তে সন্ধ্যা মণিরা করে বারনারী সাজ,
কত সমাদর লভে গো তারাও আমিও যে পাই লাজ ;
বসোরা গোলাপ বালা কত গৌরবময়
বিলাতী হাস্নুহানা সেও ত হিন্দু নয় ;—
সে কথা বল কে কহে ?
পাতাবাহারের গরবী কন্যা তারাও আর্য্যা নহে।

তাহাদের আছে মধু রূপ জ্যোতিঃ মধুর গন্ধামোদ,
তাহাদের সাথে তুলনা চলে না আছে এত টুকু বোধ।
আমি ত শবরী, তবু আছে মোর ক্ষুধা তৃষা,
জীবন ধর্ম্ম সবি আছে যৌবন নিশা।
হৃদয় কেহ না খুঁজে ;
কুরূপার হৃদি নহে প্রেমহীন, একথা কেহ না বুঝে !

চাহি না করুণা, শুধু নিবেদন করোনা আমারে ঘৃণা,
কিছু অধিকার নাহিক আমার, জানি আমি নীচ দীনা,
তবু চুম্বন ধ্বনি কেন আসে ? নাহি খুঁজি,
মদিরার বিনিময় আঁখি মুদি, তবু বুঝি
বলিবার কিছু নাই,—
বলিতেছিলাম এ নহে আমার ফুটিবার ঠিক ঠাঁই।

শ্রীকালিদাস রায়

# চিত্র-পরিচয়

(সম্মুখের পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার চিত্রের নিম্নভাগে বাম-পার্শ্বস্থিত স্তিমিতনেত্রে জপনিরত সৌম্য পুরুষমূর্ত্তি স্বর্গীয় মহাত্মা নীলকমল সিংহের প্রতিকৃতি।)

কলিকাতা সহরে পটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনের ৫৮ ও ৫৯ নং বাটী তাঁহার আবাস ভবন ছিল। তিনি ১৭০০ শকাব্দের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ করেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যে অকাতরে ব্যয় করিতেন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন। তদানীন্তন কালে সিংহ মহাশয় একজন ধনী, দানশীল, পরম ধার্ম্মিক, জ্ঞানী ও সাধক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাটীর দুর্গোৎসব সেকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। তাঁহার দেবী-প্রতিমার সুন্দর সুঠাম গঠন, সাজসজ্জা এবং পূজার সমারোহ দেখিবার জন্য সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোকসমাগম হইত। বৎসরের মধ্যে শারদীয়া পূজার কয়দিনমাত্র দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত না, সেইজন্য বহু চেষ্টায় এবং বহু ব্যয়ে চিত্রশিল্পী দ্বারা তাঁহার বাটীর দুর্গা প্রতিমার অবিকল তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চারি বৎসর পরিশ্রমের পর ১৭৬০ শকাব্দে ১১ই আশ্বিন তারিখে চিত্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হয়। প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের চিত্রকলা কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা চিত্রখানি দেখিলে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অঙ্কিত দেবদেবীগণের বর্ণের আভা বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে ফুটিয়া চিত্রকরের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্যগুলিও বিশেষভাবে পরিস্ফুট হওয়ায় চিত্রের স্বাভাবিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে। আলিপুর জজ আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রমানাথ সিংহ এবং কলিকাতার ছোট আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত অমরনাথ সিংহ তাঁহার অন্যতম প্রপৌত্রদ্বয়। তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হইল।

# সাহিত্য-সমাচার

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পরলোকগত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত নূতন পুস্তক 'গৃহস্থালী' এতদিন পরে প্রকাশিত হইল। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখনই পুস্তকখানি ছাপাইতে দিয়াছিলেন; কিন্তু পুস্তকখানি ছাপায় আকারে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না; তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সুন্দর পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন।

---

কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের জুনিয়ার মেম্বারগণ দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যকল্পে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভীষ্ম অভিনয় করিয়াছে।

পরলোকগত বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পত্নী উক্ত ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

---

সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ মহাশয়ের নূতন গল্পের পুস্তক "সই-মা" প্রকাশিত হইয়াছে।

"বিক্রমপুর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের অর্জ্জুন প্রকাশিত হইয়াছে ও "ভীমসেন" নামে অপর একখানি গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থ "আকবর" যন্ত্রস্থ।

বঙ্গসাহিত্যের সুপরিচিত, যশস্বীলেখক বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় "গ্রহ-নক্ষত্র" নামক একখানি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ( As ro o y ) সুদীর্ঘ নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি এক শতের অধিক চিত্র সম্বলিত এবং লেখকের লিপি-কৌশলে জ্যোতিষের জটিল তথ্যগুলি সরল এবং মনোরম হইয়াছে।

---

সুপ্রসিদ্ধনাট্য লেখক শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'দধীচি' নামক একখানি নূতন নাটক প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের "বাঙ্গলার বেগমের ২য় সংস্করণ অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া ৺পূজার পরেই প্রকাশিত হইবে।

# মানসী

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল

২য় খণ্ড
৩য় সংখ্যা

## গান

তরী আমার কবে কিনার পাবে,
ওরে পাবে সেদিন যেদিন আমার
দিন ফুরায়ে যাবে।

ডেকেছিলে কাছে এসে,
চেয়েছিলে মধুর হেসে,
আবার আমায় ভালবেসে
মুখের পানে চাবে,
যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে।

একদা মোর কুঞ্জবনে
গেয়েছ গান আপন মনে,
ওগো শেষ বিদায়ের গানটি আবার
নয়নজলে গাবে
যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে।

নিভে নিভুক দিনের আলো,
ছেয়ে আসুক আঁধার কালো,
তোমার করুণ আঁখির উজল তারা
শেষের পথ দেখাবে
যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# মহানবমী

আজ চারি শতাব্দীর প্রাচীন বার্দ্ধক্যজীর্ণ একান্ত বিস্মৃত বিলুপ্ত কাহিনী পুরাতন স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সেদিনও আজিকার মতই মেঘলেশহীন স্বচ্ছ নীলাকাশ অরুণ কিরণে ঝক ঝক করিয়াছিল, সেদিনও আজিকার মতই প্রভাত পবনহিল্লোলে শিশিরসিক্ত সেফালিকার মধুর বাসে গগন পবন ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেদিনও আজিকার মত প্রতি হিন্দু হৃদয় আশায় ও আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, মহোৎসবের মহামিলনে সেদিনও হিন্দু কণ্ঠে কণ্ঠে বাহুতে বাহুতে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণদেবের বিজয়বাহিনী বিজয়পুরের বিপুল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তখন কেবল রাজধানী বিজয়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; তাঁহার ৭০৩,০০০ পদাতিক ৩২৬০০ অশ্বারোহী, তাঁহার ৫৫১টি হস্তী ও অগণিত রক্ষি-বর্গের বিজয় নিনাদে তখনও সমগ্র দাক্ষিণাত্য বিকম্পিত হইতেছে—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা তখনও পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাজিতেছে, রায়চূড়ের পাদমূল ধৌত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের যে তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তখনও সম্পূর্ণ বিশুষ্ক ও বিলুপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই!

সে দিন বিজয়নগরে মহানবমীর বার্ষিক মহোৎসব। সেদিন বিজয়নগরে বীরের পূজা। মহারাজ কৃষ্ণদেব সেদিন স্বহস্তে বীরের ললাটে বিজয় তিলক অঙ্কিত করিবেন, বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত স্বর্ণ নির্ম্মিত চামর উপহার দিয়া তিনি সেদিন ভাগ্যবান সামন্তদিগকে অভিনন্দিত করিবেন।

কৃষ্ণদেবের রাজ্য সুবিস্তৃত। তাহার নানা স্থান হইতে সেনাধ্যক্ষগণ সসৈন্যে বিজয়নগরে সমুপস্থিত হইয়াছেন। সামন্তগণ আপন আপন সেনাবল লইয়া সে উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, মহীশূর নৃপতি পর্য্যন্ত আমন্ত্রিত হইয়া মহারাজাধি-রাজ কৃষ্ণদেবের প্রীতিকামনায় বহু সেনাদি লইয়া সেই অপূর্ব্ব উৎসব-প্রাঙ্গণে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত প্রধান তোরণে বহু রক্ষী প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত। রক্ষী-সর্দ্দারের বিনানুমতিতে সে পথে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য! সেনাধ্যক্ষগণ অমাত্যগণ, সামন্তগণ কেহ রথে কেহ তুরগে কেহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর্ম্মে চর্ম্মে সুশোভিত হইয়া সেই তোরণ দিয়া মন্থরগমনে অগ্রসর হইয়াছেন। তপনকিরণে তাঁহাদের উজ্জ্বল ভূষণ জ্বলিতেছে, শানিত কৃপাণ ঝলসিতেছে;

বিশালকায় হস্তিবর্গের শোভাবর্দ্ধনকারী আভূমিনত বহুমূল্য অঙ্গবস্ত্র ধীর পবনে এক একবার উড়িতেছে। স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত অশ্ববল্গা এক একবার ঝকঝক করিতেছে। সুস্থকায় সুন্দর সবল অশ্বগণ ললিত গ্রীবাভঙ্গে তালে তালে অগ্রসর হইতেছে। বিপুল জয়োল্লাসে হিন্দুসাম্রাজ্যের সার রত্ন বিজয়নগর ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রথম তোরণের পরই দ্বিতীয় তোরণ। উহাও প্রথমটির ন্যায়ই সুরক্ষিত। তাহার পরই একটি মুক্ত ক্ষেত্র—পত্রে পুষ্পে পতাকায় সুসজ্জিত, বীরকরধৃত ভল্লে কৃপাণে কণ্টকিত, হর্ম্ম্যে মঞ্চে সুশোভিত।

ঐ যে প্রস্তর বিনির্ম্মিত হস্তীর স্তম্ভের উপর একটি বিরাট প্রাসাদ দণ্ডায়মান হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতে চাহিতেছে, ঐ যে তাহার প্রাচীরে প্রাচীরে হেম চারুকার্য্য সমন্বিত বহুবর্ণের উজ্জ্বল বসন বিলম্বিত রহিয়া চিত্রধনুর বর্ণ ফলাইতেছে—উহারই নাম "বিজয়মন্দির"। উড়িষ্যার নৃপতিকে যুদ্ধে জয় করিয়া কৃষ্ণদেব তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঐ বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও তাহার শেষ-নিদর্শন-অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের হৃদয়ে কত প্রাচীন কালের বিস্মৃত মহিমার, কত বিগত গরিমার, কত ধনৈশ্বর্য্যের, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের কত অতীত কীর্ত্তি কাহিনীর মধুর স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিবে।

বিজয়মন্দিরের বসনমণ্ডিত সুসজ্জিত সুচিত্রিত একটি কক্ষে মহারাজাধিরাজের গৃহদেবতা অধিষ্ঠিত। বৃহদাকার কয়েকটি হেম হর্য্যক্ষের গর্ব্বোন্নত শিরোপরি তাঁহার সিংহাসন সংস্থাপিত। উহা বহুমূল্য রেশমে আচ্ছাদিত। সুবর্ণের উপর মণিমুক্তাখচিত হইয়া সেই দেবাসন আজি দর্শকের নয়ন সার্থক করিতেছে। তাহার কোনরবন্ধে স্বর্ণ নির্ম্মিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। সে গুলিও বহুমূল্য প্রস্তরাদিতে সুশোভিত। উজ্জ্বল হরিন্মণি ও সুগোল মুক্তার হারে সে সিংহাসন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাহারই উপর স্তবকে স্তবকে সুবৃহৎ গোলাপ সুসজ্জিত রহিয়াছে, রাশি রাশি সুগন্ধ কুসুমের মধ্যে বসিয়া হিন্দু সাম্রাজ্যের বিজয় দেবতা ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সিংহাসনপার্শ্বেই একদিকে একটি পৃথক আসনে হীরককনকবিনির্ম্মিত দেবকিরীট ও অপর দিকে চরণ-নূপুর সংস্থাপিত রহিয়াছে। কিরীট চূড়ায় যে মুক্তা জ্বলিতেছে তাহা একটি গুবাকের ন্যায় বৃহৎ। নূপুরের বেধ মনুষ্যের বাহুর সমান। উহা বহু মুক্তা-মরকতে, হীরক-কনকে সজ্জিত। এই কক্ষের সম্মুখে একটি প্রশস্ত অলিন্দের উপর মহারাজাধিরাজের আসন স্থাপিত রহিয়াছে।

উৎসব ক্ষেত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বহু উচ্চে মঞ্চের পর মঞ্চের সারি। তাহাদের উপর কোথাও বা সবুজ ও রক্তরাগ রঞ্জিত মখমলের চন্দ্রাতপ, কোথাও আবার বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর বসনের আস্তরণ। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর সেই দিকেই কেবল বর্ণের পর বর্ণের সমাবেশ—চিত্রের পর চিত্র।

দ্বিতীয় তোরণের সম্মুখে পূর্ব্ব পার্শ্বে এবং ঠিক মধ্যস্থলে বিজয়মন্দিরের অনুরূপ আর দুইটি প্রাসাদ বর্ত্তমান। পাষাণ নির্ম্মিত সুন্দর সোপানশ্রেণী বহিয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিতে হয়। এই প্রাসাদদ্বয়ের কি প্রাচীর, কি স্তম্ভ, সমস্তই বহুমূল্য বসনে মণ্ডিত। প্রাচীর গাত্রের আচ্ছাদন বুটাদার।

প্রাসাদদ্বয় সংলগ্ন ক্রমোন্নত দুইটি মঞ্চের উপর মহারাজাধিরাজের অনুগৃহীত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মঞ্চদ্বয়ের পার্শ্বদেশ উন্নত ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সর্ব্বোচ্চ মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহারাজ কৃষ্ণদেব উৎসব দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রভাত হইতে না হইতেই মহারাজ বিজয়মন্দিরে আগমন করিলেন। বহু আড়ম্বরে গৃহদেবতার পূজা আরম্ভ হইল। সমবেত জনমণ্ডলী সেই মন্দির-তলে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাপূজা দর্শন করিতে লাগিল। সৈন্য সেনাপতি বহুমানাস্পদ রাজামাত্য আজ সকলেই সুন্দর বসন ভূষণে সুসজ্জিত। অশ্বশালা হইতে একাদশটি অশ্ব সুন্দর সাজে সজ্জিত করিয়া রক্ষিগণ তথায় লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের পশ্চাতে ৪টি সুসজ্জিত হস্তী। মহারাজ নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া তাহা অশ্ব ও হস্তীর উপর বর্ষণ করিলেন। বিপুল জয়োল্লাস ও বাদ্যোদ্যমে তখন উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে তথায় ২৪টি মহিষ ও ১৫০টি ছাগ আনীত হইল। মহারাজ ভক্তিপূর্ণচিত্তে দেবপদতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া বলি দর্শন করিতে লাগিলেন।* বলি অন্তে মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীম জনসঙ্ঘ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া রাজ্যের মঙ্গল কামনায় দেব-চরণে কৃপা ভিক্ষা করিল। মন্দিরসংলগ্ন একটি আবদ্ধ স্থানে যে বিরাট হোম-কুণ্ড প্রজ্জলিত ছিল, মহারাজ তন্মধ্যে চন্দন কর্পূর মণিমাণিক্যাদি চূর্ণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলেন। পবিত্র গন্ধে দিঙ্মণ্ডল প্রপূরিত হইয়া উঠিল।

অপরাহ্নে যখন সকলে আবার রাজপ্রাসাদে সমবেত হইল তখন মল্লক্রীড়ার

* এই উৎসব ক্রমান্বয়ে নয় দিবস পর্য্যন্ত চলিত। প্রত্যহই বলির সংখ্যা পূর্ব্বদিনের দ্বিগুণ করা হইত।

—লেখক।

সময়। মহারাজ কৃষ্ণদেব রত্নালঙ্কার ও কনকখচিত শ্বেত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার তাম্বুলকরঙ্কবাহী, ছত্রচামরধারী প্রভৃতি ভৃত্যগণ নিকটেই দণ্ডায়মান রহিল। এদিকে পুরোহিতগণ দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

সেনাধ্যক্ষগণ তখন একে একে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অধীন সেনানায়কগণও সেই সঙ্গে রাজদর্শনে আগমন করিলেন। দূরে সুসজ্জিত মঞ্চে ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারা আপন আপন আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। রাজ্যের সামন্তগণ, সেনাপতিগণ এইরূপে অভিনন্দিত হইবার পর পদাতিক সেনার অধিনায়কগণ ভল্ল ও চর্ম্ম হস্তে একে একে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে অভিবাদন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরই বীরবপু ধবন্ধদীগণ আসিলেন। সেনানায়কগণ এইরূপে আপন আপন সৈন্য লইয়া রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে পর নৃত্য আরম্ভ হইল।

নর্ত্তকীদিগের বেশভূষা বিচিত্র। কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে! তাহাদিগের কণ্ঠে, বাহুতে, প্রকোষ্ঠে, মণিবন্ধে, বক্ষে, চরণে, কর্ণে, কেশে যে কত বহুমূল্য রত্নাভরণ দুলিতে ছিল—তাহাদিগের সেই লীলান্বিত চরণভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ঝলসিয়া উঠিতেছিল কেই বা তাহার মূল্য অবধারণ করিতে পারে।

কিছুক্ষণ নৃত্যের পরই মল্ল-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সহস্র মল্ল বর্ষে বর্ষে রাজভোগে পরিপুষ্ট হইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা কৌশলী ও সুদক্ষ,—আজ তাহারাই আসিয়া সেই উল্লসিত জনসঙ্ঘের সম্মুখে ক্রীড়া আরম্ভ করিল। সকলে সমস্বরে মহারাজের জয় ঘোষণা করিল। মুষ্টির পর মুষ্টির আঘাতে এক মল্ল অপরকে ধরাশায়ী করিয়া 'শিরোপা' লাভ করিবার জন্য যত্নবান হইল। কাহারও মস্তক আহত হইল, কাহারও দেহ হইতে রক্তপাত হইল, কেহ বা ভগ্নদন্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অধ্যক্ষগণ যোগ্যতার জন্য যাহাদিগকে মনোনীত করিলেন, নাগরিকগণ ও দর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে তাহারাই মহারাজের হস্ত হইতে পারিতোষিক লাভ করিয়া গর্ব্ব-স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান রহিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়!

দেখিতে দেখিতে শত সহস্র মশাল প্রজ্জ্বলিত হইল।

মন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঝাড়ের বাতি, মধ্যে মধ্যে মশাল জ্বলিয়া উঠিল। বিরাট নগর-প্রাচীরের শিরে শত সহস্র দীপ-শিখা পবন-হিল্লোলে কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল।

বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নটগণ মহারাজের সম্মুখে নানাবিধ অভিনয় ও কলা-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। ইহাদের পরই কতকগুলি অশ্বারোহী আগমন করিয়া নানারূপ ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত-বিনোদন করিল। তাহারা রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিতে না করিতেই চারিদিক হইতে আতসবাজী জ্বলিয়া উঠিল। কোথাও অগ্নিময় প্রাসাদ দেখা দিল। তাহাদের অভ্যন্তর হইতে বোমের গুরুগর্জ্জন উত্থিত হইতে লাগিল। কোথাও বা বহু শত অগ্নিমুখ 'হাওয়াই' সর্পের ন্যায় আকাশমার্গে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। দর্শকগণ মুগ্ধচিত্তে এই অগ্নি-ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিল।

অগ্নি-ক্রীড়া থামিতে না থামিতেই বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত সুবৃহৎ রথগুলি রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতে লাগিল। কোনওটি রাজমন্ত্রীর, কোনওটি সেনাপতির, কোনওটি সামন্তের, কোনওটি বা ধনাঢ্য নাগরিকের। রথগুলি দেখিতে সুন্দর; ভাস্করের নিপুণ হস্তে গঠিত লীলাবিভঙ্গে নৃত্যশীলা রমণীদিগের মূর্ত্তিতে সুশোভিত থাকায় কোনও কোনও রথ অতি মনোরম দেখাইতেছিল! কাহারও আবার চূড়ার উপর চূড়া, কোনও রথে স্তরের উপর স্তর, ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিয়াছে।

তাহার পরেই রঙ্গভূমে সুসজ্জিত অশ্বগণ আনীত হইল। তাহাদিগের পৃষ্ঠাসন বহুমূল্য। অন্যান্য সজ্জাও তদুপযুক্ত সুন্দর ও মূল্যবান। স্বর্ণ বা রৌপ্যের বল্গাগুলি আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। অশ্বগুলির মস্তক, ললাট ও গ্রীবাদেশ কুসুমদামে সুসজ্জিত। উহারা গ্রীবা হেলাইয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইল। সর্ব্বাগ্রে মহারাজের একটি অশ্ব রাজছত্র বহিয়া যাইতে লাগিল, তাহার সাজসজ্জা অন্যান্য অশ্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। দুইবার উৎসবক্ষেত্র পরিক্রমণের পর অশ্বরক্ষিগণ অশ্বগুলি লইয়া রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থলে সারি সারি স্থাপন করিল। প্রধান পুরোহিত তখন তণ্ডুল, জল, নারিকেল ও পুষ্পাদি লইয়া উহাদিগের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং কতকগুলি মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

হস্তে একগাছি করিয়া বেত্রদণ্ড এবং স্কন্ধের উপর একগাছি করিয়া কশা

লইয়া তখন ২৫।৩০ জন প্রতিহারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের পশ্চাতে আসিল কতকগুলি খোজা প্রহরী।

অকস্মাৎ সুস্বর লহরীতে উৎসব-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলে চাহিয়া দেখিল—বংশী, বীণা, ভেরী, দামামা প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি নারী ধীরে ধীরে আগমন করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে ২০ জন বেত্রধারিণী। বেত্রগুলি রজতমণ্ডিত।

রজত বেত্রধারিণীদিগের পশ্চাত পশ্চাত ৬০ জন রাজান্তঃপুরচারিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—যেন এক একখানি জীবন্ত রত্নপ্রতিমা সেই বিরাট প্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া উদিত হইল, তড়িল্লতা যেন বিজয়নগরের মহোৎসবকে ধন্য করিবার জন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকস্মাৎ ধরাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কি মধুর মূর্ত্তি—কি মহামূল্য বসনভূষণ!

অতি সূক্ষ্ম রেশমের শাটীতে তাঁহাদের বরতনু সমাবৃত। প্রত্যেকের মস্তকে কারুকার্য্যখচিত এক একটি বৃহৎ মুকুট। মুকুট-গাত্রে সুবৃহৎ মুক্তার হার নানাবিধ কুসুমের আকারে গ্রথিত করিয়া সংবদ্ধ। তাঁহারা ধীর মরালগমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতি পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের হার দুলিতে লাগিল। সে হার কনকনির্ম্মিত—হরিণ্মণি হীরক ও মুক্তায় খচিত। তাঁহাদের অংশোপরি মণিমুক্তার হারের সারি।

প্রত্যেকের মণিবন্ধে ও প্রকোষ্ঠে হীরকাদি খচিত বহুমূল্য বলয়গুলি আলোকসম্পাতে জ্বলিতে লাগিল। তাঁহাদের গুরু নিতম্ব বেড়িয়া হীরক-খচিত স্বর্ণ-মেখলার সারি—একটির পর একটি করিয়া প্রায় উরুদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল।

মুক্তার মালায় সুসজ্জিত নূপুর তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে-ছিল। রমণীরা স্বর্ণ-কলসকক্ষে উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া পর্ত্তুগীজ বণিক বিস্মিত,বিমোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। স্বীয় বন্ধুর নিকটে তিনি অকপট চিত্তে বলিয়াছিলেন, যে এক একটি রমণীর দেহে কত যে বহুমূল্যের রত্নাভরণ ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—এমন কি অলঙ্কারভার বহন করাই তাঁহাদের অনেকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল! কেবল পরিচারিকাদিগের সাহায্যেই তাঁহাদের আনেকে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন!

সখীরা পুরপ্রবেশ করিবামাত্র অশ্বরক্ষিগণ অশ্বগুলি লইয়া গেল। হস্তি-

পকগণ তখন কতকগুলি হস্তী লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিল।

মহারাজ তখন আসন ত্যাগ করিয়া বিজয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব-কথিত গৃহ-দেবতার সিংহাসনতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা আরম্ভ হইল। পূজার পরই মহিষ ও ছাগের রক্তে মন্দিরতল রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ কৃষ্ণদেব তখন সমস্ত দিবসের উপবাসান্তে প্রসাদ গ্রহণের জন্য গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। নয় দিবসব্যাপী মহানবমীর মহোৎসবের একদিন এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

# ভারতের শকুন-শাস্ত্র

মানব ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য বড় কৌতূহলী। ভবিষ্যতে অদৃষ্টে সুখ আছে কি দুঃখ আছে, কোনও উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যৎ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কি না, যাইলে সে উপায় কি প্রভৃতি জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। এই অভিলাষ ও কৌতূহল থাকাতে বিবিধ শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া মানবের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংস্থান দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষের ভবিষ্যৎজীবনের ইতিহাস-জ্ঞাপক কোষ্ঠী প্রস্তুত হয়। সামুদ্রিক-শাস্ত্র হাতের রেখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলিবার চেষ্টা করে। এমন কি খনার বচন হইতে হাঁচি টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত কার্য্যসিদ্ধি বা বিঘ্নের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে এই ভবিষ্যৎ জানিবার কৌতূহল সমভাবে জাগরূক ছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনে এই বিশ্বাসও সমুদ্ভূত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর অথবা প্রকৃতি কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা আসন্ন বিপদ্ মানবকে জানাইয়া দেন। জড়জগতের পরিবর্ত্তনের সহিত মানব-ভাগ্যের এই সম্বন্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত মানবের স্থির বিশ্বাসের বিষয় ছিল। প্রাচীন মিসরে, বাবিলোনিয়ায়, আসি-রিয়ায়, রোমে, ভারতে সর্ব্বত্র এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। তখনও পর্য্যন্ত বহু স্থলে মানবজাতি এ বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেক্ষপীয়র 'জুলিয়স্ সীজারে' লিখিয়াছেন—

"you shall find
That heaven hath infused them with these spirits,
To make them instruments of fear and warning
Unto some monstrous state."

[ Act. I. Scene 3 ]

"তা হলে বুঝিবে তুমি, ভয় প্রদর্শিতে, আর
সতর্কিতে মর্ত্ত্যবাসিজনে।
দেবতারা প্রকৃতিরে, রুদ্রভাবে পূর্ণ করি'
করি' দেন বিকট আকৃতি।"

[ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

ঐ দৃশ্যেই আর এক স্থলে আছে—

"When these prodigies
Do so conjointly meet, let not men say,
'These are their reasons,—they are natural;'
For I believe they are portentous things
Unto the climate that they point upon"

"এই সব অলক্ষণ একত্তর হয় যবে
তখন মানুষ
এ কথা যেন না বলে :— 'আছে তার যুক্তি গত
স্বাভাবিক হেতু।'
আমার বিশ্বাস, উহা অশুভ সূচনা করে
দেশের উপর।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই বিশ্বাস সভ্য, অসভ্য সকল জাতিতেই অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, ধূমকেতু ও উল্কাপাত আসন্ন বিপদের চিহ্ন, নিশীথে বাজপক্ষী ডাকিলে তাহারা বলে কোনও শিশুর মৃত্যু হইবে। বাজপক্ষী শিশুর আত্মা লইয়া উড়িয়া যাইতেছে। কাহারও আঙ্গুল মটকাইলে বুঝিতে হইবে কোনদিকে কেহ তাহার উপকার করিতেছে, কাজেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে। আফ্রিকার জনগণ ঈগল্ বা পেচকের ডাকের বিভিন্ন মর্ম্ম বুঝিয়া থাকে। আরব দে
মিসরে বালক-বালিকার জন্মদিনে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থা দেখি

নির্দ্ধারিত হইত। অশুভক্ষণে জন্ম হইলে শিশুসন্তানকে হত্যা করা হইত। আমাদের দেশেও শিশুপাল প্রভৃতির জন্মের সময় অমঙ্গল চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

ব্যাবিলোনিয়ার লিপিসকল ( Coneiform writings ) হইতে জানা যায় যে, যদি কোনও কুক্কুর রাজপ্রাসাদে গিয়া সিংহাসনে উপবেশন করে, তাহা হইলে সে প্রাসাদ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। বাইবেলে তীর নাড়াচাড়া করিয়া প্রাণীবিশেষের অন্ত্রস্থল দেখিয়া রাজা ভবিষ্যত জানিলেন বর্ণিত হইয়াছে। ( Ezekiel xxi. 21 ) তীর নাড়াচাড়া করিয়া বা প্রাণীর অন্ত্রস্থল দেখিয়া ভবিষ্যৎ জানার কথা ক্যালডিয়ার পুরোহিতগণও জানিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ব্যাবিলন দেশের প্রাচীন পঞ্জিকায় দেখা যায় যে, তাহাতে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সহিত জলপ্লাবন শস্যহানি প্রভৃতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। মিসরে দুঃস্বপ্ন, ভূমিকম্প, গ্রহণ, ধূমকেতু প্রভৃতি অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রাচীন রোমে এই দুর্নিমিত্তের রীতিমত অনুসন্ধান হইত। সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ সকল জানিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। ইহারা Angur ও Auspex নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে Auspexগণ কেবল পক্ষীদের গতি, শব্দ প্রভৃতি দ্বারা সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতেন। Angurগণ বজ্রধ্বনি বিদ্যুদ্বিকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে ঐরূপ নিমিত্ত উদ্ভাবন করিতেন। অগারগণ এক বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন ও তাঁহাদের হস্তে বক্রাকার যষ্টি থাকিত। রোমবাসীদের বিশ্বাস ছিল, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করিলে দেবতারা মঙ্গল অমঙ্গল চিহ্ন দ্বারা উত্তর দেন। কখনও কখনও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও মনুষ্যদিগকে মঙ্গল বা অমঙ্গলের আভাস দেন। রোমে পাঁচ প্রকার নিমিত্ত দেখা হইত। ( ১ ) আকাশের উৎপাত সমস্ত নিরীক্ষণ বা বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ, উল্কাপাত প্রভৃতির মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা। বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ শুভসূচক ও তদ্বিপরীত ভাবে স্ফুরণ অশুভসূচক বলিয়া গণ্য হইত। ( ২ ) পক্ষীদের গতি ও শব্দ পর্য্যালোচনা। ( ৩ ) পক্ষিগণকে খাওয়াইয়া শুভাশুভ নির্দ্ধারণ। একটি মুরগীর সম্মুখে শস্যকণা ছড়াইয়া দেওয়া হইত। যদি তাহার মুখ হইতে শস্য পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে শুভ হইবে বলিয়া অনুমাণ করা হইত। (৪) চতুষ্পদ বা সর্পাদির গতি ও শব্দ হইতেও শুভাশুভ নির্দ্ধারণ। ( ৫ ) অসাধারণ ঘটনা সকলকে

দুর্নিমিত্ত বলিয়া গণনা ভূমিকম্প, ধূমকেতুর আবির্ভাব প্রভৃতি অমঙ্গলের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিবার সহায়তা করিবার জন্য বহু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল।

ইউরোপে মধ্যযুগেও এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। সেক্ষপীয়রের বিভিন্ন নাটকে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। জুলিয়স্ সীজার ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে দুর্লক্ষণের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে :—

"কিন্তু কভু দেখি নাই　　দেখিনু যে আজ রাতে
ঝটিকা অনলপিণ্ড করিছে বর্ষণ ;
পৃথিবী নাশিতে যেন　　হইয়াছে সমুদ্যত,
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিনু তোমারে।
সামান্য গোলাম এক　　( দেখিলেই গোলাম বলি
চেনা যায় তারে )
উঠাইল বাম হস্ত　　জ্বলে যেন একত্তরে
কুড়িটা মশাল।
তবু সে হাতটি তার　　পোড়ে নাই একটুকু
রয়েছে অক্ষত।……
মন্ত্র-ভবনের কাছে,　　সিংহ এক তাকাইয়া
কটমট করি'
আমা পানে, চলি' গেল　　রোষভরে, না করিয়া
কিছুমাত্র হানি।
এক শত নারী সেথা　　অতীব বিবর্ণ মুখ
স্তম্ভিত তরাসে,
বলিল শপথ করি',　　"দেখিয়াছি রাজপথে
করে বিচরণ
অগ্নিময় নর সবে ;　　তা ছাড়া পেচক এক
—নিশাচর পাখী—
মধ্যাহ্নেও আছে বসি'　　নগর চত্বরে, আর
ডাকে তীক্ষ্ণ-স্বরে।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ম্যাক্‌বেথ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে আছে ঃ—

"স্বর্গ যেন মানবের কার্য্যে কুপিত হয়ে রুধিরাক্ত রঙ্গভূমির প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন কচ্ছে। সময়-নিরূপণে প্রক্ষণে দিনমান, কিন্তু রজনী আলোকময় এক চক্র রথকে আবরণ করেছে।······গত মঙ্গলবারে একটি বাজপক্ষী, অতি দূর আকাশে ভ্রমণ কচ্ছিল, সহসা একটি পেচক তার প্রতি ধাবমান হয়ে সংহার কল্লে। বেগবান্ সুন্দর রাজঅশ্বসকল······অকস্মাৎ উন্মত্ত হয়ে মন্দুরা ভগ্ন করে পলায়ন কর্‌লে, কোনরূপ বাধা মান্‌লে না,যেন তারা মনুষ্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল।······শুন্‌লেম নাকি তারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করে মাংস ভক্ষণ করলে।"

—৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত অনুবাদ।

'কিং জন্' নাটকে আছে—

"They say five moons were seen tonight :
Four fixed ; and the fifth did whirl about
The other four in wondrous motion."

—King John, Act IV. Sc 2.

বাহুল্য ভয়ে আমরা আর অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না। আমরা এতক্ষণে সংক্ষেপে অন্যান্য দেশের দুর্নিমিত্তের ইতিহাসের আলোচনা করিলাম! এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা, তাহার অনুসরণ করিব। সে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ দুর্নিমিত্তের কিরূপ আলোচনা হইত তাহা নির্দ্ধারণ।

ভারতবর্ষে এই সকল দুর্নিমিত্ত, রীতিমত পর্য্যালোচনা করিবার জন্য পৃথক্ শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। তাহার নাম, শকুন-শাস্ত্র। এই সকল লক্ষণগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম বিষম প্রাকৃতিক বিকৃতি, যাহা সাধারণতঃ রাজ্যের রাজার বা সমস্ত দেশবাসীর অমঙ্গল সূচনা করে। দ্বিতীয় যাহা ব্যক্তিবিশেষের বা কর্ম্মবিশেষের শুভাশুভ সূচিত করে। প্রথম এই গুলির নাম—উৎপাত। অমরকোষে 'উৎপাতে'র পর্য্যায়বাচক দুইটি শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে 'অজন্য' ও 'উপসর্গ'। *

এই উৎপাত সকল তিন প্রকার দিব্য, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌম। যদুবংশ ধ্বংসের পূর্ব্বে এই তিন প্রকার উৎপাত দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

* "অজন্যং ক্লীবমুৎপাত উপসর্গঃ সমং ত্রয়ং"

—ইত্যমরঃ।

"অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ দিবারাত্রি দ্বারকাবাসিগণের বিনাশনিমিত্তীভূত দিব্য ভৌম ও অন্তরীক্ষজ উৎপাত সমুদায় দর্শন করিয়া যাদবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে যদুবীরগণ, ঐ দেখ, অতি দারুণ দুর্নিমিত্তসমুদায় লক্ষিত হইতেছে।"

—বিষ্ণুপুরাণ, বঙ্গানুবাদ, পঞ্চম অংশ সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অসময়ে গ্রহণ প্রভৃতি দিব্য উৎপাত, উল্কাপাত প্রভৃতি আন্তরীক্ষ উৎপাত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি ভৌম উৎপাত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থে এই সকল উৎপাতের বিশদ বর্ণনা আছে। প্রায় সকল স্থলেই একই প্রকার বর্ণনা কাজেই আমরা কতকগুলি মাত্র স্থল হইতে উৎপাতগুলির তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখাইব। বহু গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা যেথানেই আসন্ন অশুভের কথা, সেইখানেই কি বাল্মীকি, কি ব্যাস, কি অন্য কবিগণ একই ভাবের কতকগুলি উৎপাত বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা প্রথমে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে কয়েকস্থল উদ্ধৃত করিব।

"খরবিক্রম খর জয়াভিলাষে যাত্রা করিতেছে এমন সময় সহসা আকাশে মহামেঘ আবির্ভূত হইয়া অমঙ্গলসূচক শোণিতোদক ও শিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বগণ সমতল ক্ষেত্রে সুপরিস্কৃত প্রশান্ত পথেও বারংবার জঘন স্খলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সময় এক মহাকায় গৃধ্র তাহার অত্যুন্নত হিরণ্ময় ধ্বজদণ্ডের উপরি পতাকা আক্রমণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া শোণিত বমন করিতে লাগিল। দিবাকরের চতুর্দ্দিকে অলাতচক্র প্রতিম রক্তপ্রান্ত শ্যামবর্ণ পরিবেশ আবির্ভূত হইল। মাংসভোজী ঘোররাবী বিবিধপ্রকার পশুপক্ষিসকল জনস্থানের সন্নিকটে আগমন করিয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দক্ষিণ দিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ দিকে মহাঘোর শিবা-সকলও অগ্নি বমনপূর্ব্বক ভীষণ রব করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ মেঘসকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভগ্ন ভেরীর ন্যায় শব্দ এবং মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সহসোত্থিত ঘোর অন্ধকারে সমন্তাৎ সমাচ্ছন্ন হইয়া জনস্থান স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল না। সন্ধ্যা ব্যতীত আকাশ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। আকাশে কর্কশরাবী পক্ষিসকল খরের দিকে মুখ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। ভূতলে যুদ্ধে নিরত অমঙ্গল

সূচক ঘোরদর্শন অশিব শিবা সকল মুখ দ্বারা জ্বালা উদ্গীরণ করিতে করিতে পালে পালে সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্যের সন্নিকটে পরিঘ সদৃশাকার ধূমকেতু সকল অবির্ভূত হইল। মহাগ্রহ রাহু অমাবস্যা ব্যতীতও সূর্য্যকে গ্রাস করিল। পবন প্রচণ্ড বেগে বহিতে লাগিল। দিবাকর প্রভাহীন হইলেন, দিবাভাগে খদ্যোত প্রভ-তারা সমূহ সমন্বিত চন্দ্রোদয় হইল। পদ্মাকর সরোবরের পদ্মিনী সকল শুষ্ক হইয়া গেল এবং মীন ও জলচর বিহঙ্গম সকল একান্ত নিলীন হইয়া থাকিল। পাদপগণ ফলপুষ্প বিহীন হইয়া শোভা শূন্য হইয়া পড়িল। বায়ু বিনা জলধরসদৃশ ধূসরবর্ণ ধূলিপটল উড্ডীন হইল। সারিকা সকল 'চীচীকূচী' শব্দ করিতে লাগিল। উল্কা সকল ঘোর গর্জ্জন করিয়া নির্ঘাতের সহিত পতিত হইতে থাকিল। পৃথিবী পর্ব্বত ও কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। সেনাপতি রথারূঢ় খর বিজয়লিপ্সু হইয়া গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার বামবাহু অকস্মাৎ কম্পিত হইতে লাগিল। স্বর ভঙ্গ হইল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও কাতর হইয়া পড়িল। মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং ললাট ব্যথিত হইতে লাগিল।"

—অরণ্যকাণ্ড উনত্রিংশ সর্গ। কৃষ্ণগোপাল ভক্তকৃত অনুবাদ।

এই সময় রামচন্দ্রের বিজয় ও রাবণের বিনাশের নিমিত্ত, ঘোর দারুণ লোমহর্ষণ উৎপাত সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাবণের রথের উপরি দেবগণ রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণের রথে উপস্থিত হইল। রাবণের রথ যেস্থানে গমন করে, সেই স্থানেই সেই রথের উপর আকাশতলে গৃধ্র সমূহ মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। জবাকুসুম-সঙ্কাশ সন্ধ্যারাগ লঙ্কাপুরী আবরণ করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন দিবারাত্রই সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইয়া লঙ্কাপুরী সমুজ্জ্বল করিতেছে। মহোল্কা সমুদায় বজ্রপাতের সহিত মহাশব্দে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ডবেগে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। রাবণ ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। যে সমুদায় রাক্ষস অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের বোধ হইতে লাগিল যেন, কে তাহাদের হস্ত ধরিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে তাম্রবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও নানা বর্ণ সূর্য্যরশ্মি সমুদায় রাবণের সম্মুখে প্রকাশমান হইল। রাবণের শরীরে পার্ব্বতীয় ধাতুর ন্যায় নানাবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শিবাগণ রাবণের মুখ লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে অগ্নিশিখা বমন করিতে করিতে অমঙ্গল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। গৃধ্রগণ শিবাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিল। গৃধ্রগণ, বলাকাগণ ও কঙ্কগণ রথের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রাবণের দৃষ্টি-পথ রোধপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বিকৃতস্বরে ভীষণ অমঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। প্রতিকূল বায়ু প্রভূত ধূলি উড্ডীন করিয়া রাবণসৈন্যের দৃষ্টিরোধ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। তৎকালে মেঘ ব্যতিরেকে বজ্র সমুদায় দুর্ব্বিসহ ঘোরতর শব্দপূর্ব্বক রাবণ সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। সমুদায় দিগ্বিদিক অন্ধকারাবৃত হইল। চতুর্দ্দিকে পাংশুবৃষ্টি হওয়াতে নভোমণ্ডল দুর্দ্দিনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। শত শত দারুণ পক্ষিগণ রাবণরথের সম্মুখে দারুণ শব্দে ঘোরতর কলহ করিয়া নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজের তুরঙ্গগণের জঘনদেশ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জঘনদেশ হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল।"

—লঙ্কাকাণ্ড, নবতিতম সর্গ; কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কৃত অনুবাদ।

রামায়ণে আমরা দুর্নিমিত্ত সমূহের এইরূপ বর্ণনা পাইলাম। কংশবধের পূর্ব্বে ইহার মত দুর্নিমিত্তসকল দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া হরিবংশে বর্ণিত আছে—

"ক্রূরগ্রহ রাহু স্বাতিনক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া গগনমণ্ডলে কিরণ-মালা বিস্তার করিতেছে। ঘোরদর্শন কুজগ্রহ চিত্রার সহিত সমবেত হইয়াছেন। বুধ গ্রহের ঘোরতর তেজঃপ্রভাবে পশ্চিম সন্ধ্যা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। শুক্র সূর্য্যকে অতিক্রমপূর্ব্বক অগ্নির পথে বিচরণ করিতে-ছেন। ধূমকেতুর পুচ্ছে ভরণী প্রভৃতি ত্রয়োদশ নক্ষত্রের গতিরোধ হইয়াছে। আর তাঁহারা চন্দ্রমার অনুগমনে সমর্থ হইতেছেন না। পূর্ব্বসন্ধ্যা সূর্য্যমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সূর্য্য সুপ্রকাশিত হইতেছেন না। মৃগ ও পক্ষিকুল বিকৃতস্বরে প্রতিকূলদিকে ধাবিত হইতেছে। ভয়ঙ্কর শিবাসমূহ শ্মশান হইতে নির্গত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে কর্কশ চীৎকার করতঃ পুরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগের নিশ্বাসে অঙ্গার বর্ষণ হইতেছে। ঘন ঘন বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত হইতেছে। অকারণে অকস্মাৎ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গসকল কম্পিত হইতেছে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হওয়াতে দিবাভাগ রাত্রিতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। বিনামেঘে বজ্রধ্বনি হইতেছে, দিক্ সকল ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মেঘ সকল ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া রুধিরধারা বর্ষণ করিতেছে। দেবগণ নির্দ্দিষ্টস্থান হইতে বিচলিত

হইয়াছেন। পক্ষিকুল পর্ব্বতনিবাস পরিত্যাগ করিতেছে। দৈবজ্ঞেরা রাজ-বিনাশের যে সকল দুর্নিমিত্ত নির্দ্দেশ করেন, সেই সমস্তই পরিদৃষ্ট হইতেছে।”
[ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ঊনাশীতিতম অধ্যায়; কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ। ]

উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের অংশটির মধ্যে গ্রহ নক্ষত্রাদির সম্মিলন গতিরোধ প্রভৃতি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রামায়ণ ও হরিবংশ হইতে যেরূপ দুর্নিমিত্তের তালিকা উদ্ধৃত হইল মহাভারতে ও প্রাচীন পুরাণাদিতে তাহার অনুরূপ বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

পরবর্ত্তী কালেও কবিগণ নিজ রচিত কাব্যে এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ও হর্ষচরিত-প্রণেতা নিজ নিজ গ্রন্থে এই-রূপ উৎপাত বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। তখনও পর্য্যন্ত এ সকল উৎপাতে জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কেবল তখন কেন, আজিও এ সকলে বিশ্বাসী জনগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

আমরা ভট্টিকাব্যের কতিপয় শ্লোকে এই সকল উৎপাতের যে বর্ণনা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিতেছি। রাবণ রামের সহিত যুদ্ধোদ্যত হইলে বিভীষণ রাবণকে উৎপাত সকল দেখাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছেন।

“অকারণ ধূলিজাল ও প্রবল বায়ু দশদিকে দেখা দিয়াছে। পশুপক্ষীরা বিকৃত রব করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে মুখাকৃতি এক ছিদ্র দেখা দিয়াছে। শুক্র দক্ষিণ দিগ্‌গামী হইয়াছে। দিবসে বৃহস্পতি নক্ষত্র দৃষ্ট হইতেছে। পৃথিবী কাঁপাইয়া উল্কাপাত হইতেছে। মাংসভোজী জন্তুসকল মুখব্যাদান করিয়া অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে করিতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। গোপ সকল গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া দেখিতেছে দুগ্ধ বিবর্ণ ও বিরস। হব্য কীট ও কেশ দ্বারা দূষিত হইয়া যাইতেছে। ইন্ধন পাইলেও অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে না।” *

[ ভট্টিকাব্য দ্বাদশ সর্গ ৬৯-৭৩ শ্লোক।

* “নিমিত্তশূন্যৈঃ স্থিতা রজোভির্দিশো মরুদ্ভির্বিকৃতৈর্বিলোলৈঃ।
স্বভাবহীনৈর্মৃগপক্ষিঘোষৈঃ ক্রন্দন্তি ভর্ত্তারমিবাভিপন্নম্॥
উৎপাতজং ছিদ্রমসৌ বিবস্বান্ ব্যাদায় বক্ত্রাকৃতি লোক ভীষ্মন্।
অত্তুং জনান্ ধূসররশ্মিরাশিঃ সিংহো যথা কীর্ণসটোঽভ্যুদেতি॥

বাণভট্ট হর্ষচরিতে প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পূর্ব্বে নিম্নলিখিত উৎপাত সকল দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভাকরবর্দ্ধন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের পিতা। বাণভট্ট লিখিয়াছেন

"প্রথমে সকল পর্ব্বত সঞ্চালন করিয়া পৃথিবী কম্পিত হইল। সমুদ্রে তরঙ্গাঘাতে জলরাশি বিঘুর্ণিত হইতে লাগিল। বিকট কুটিল শিক্ষা বিস্তার করিয়া দিকে দিকে ধূমকেতু উত্থিত হইল। সূর্য্যের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইল, তপ্ত লৌহ কুম্ভের ন্যায় সূর্য্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধ মূর্ত্তি দেখা দিল। চন্দ্রের চারিদিকে উজ্জ্বল মণ্ডল দৃষ্ট হইল। দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। অকাল মেঘোদয়ে দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘোর গর্জ্জনে নির্ঘাত বায়ু বহিতে লাগিল। উষ্ট্রকেশের ন্যায় কপিলবর্ণ পাংশু বৃষ্টিদ্বারা আকাশ ধূসর বর্ণ হইয়া গেল।

উল্কা পতিত হইতে লাগিল। শিবাগণের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদে মুক্তকুন্তলা কুলদেবতামূর্ত্তি দেখা যাইতে লাগিল। সিংহাসনের উপর ভ্রমর শ্রেণী উড়িতে লাগিল। অন্তঃপুরের উপর অনবরত বায়সের রব শ্রুত হইতে লাগিল। একটা বৃদ্ধ গৃধ্র আসিয়া শোণিত-লিপ্ত মাংসভ্রমে রাজছত্রে বিলম্বিত রক্তবর্ণ মণি চঞ্চুপুটে ছিঁড়িয়া দিয়া গেল।"†

—হর্ষ-চরিত। পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

মার্গংগতো গোত্রগুরুর্ভৃগূনামগস্তিনাধ্যাসিতবিন্ধ্যশৃঙ্গম।
সংদৃশ্যতে শক্রপুরোহিতোঽহ্নিষ্কাং কম্পয়ন্ত্যো নিপতন্তি চোল্কাঃ॥
মাংসং হতানামিব রাক্ষসানামাশংসবঃ ক্রূরগিরো রুবন্তঃ
ক্রব্যাশিনো দীপ্তকৃশানুবক্ত্রা ভ্রাম্যন্ত্যভীতাঃ পরিতঃ পুরং নঃ॥
পয়ো ঘটোধ্নীরপি গা দুহন্তি মন্দং বিবর্ণং বিরসঞ্চ গোপাঃ।
হবেষ্যু কীটোপজনঃ সকেশো ন দীপ্যতেঽগ্নি সুসমিদ্ধনোঽপি॥"

† "দোলায়মান সকল কুলাচল চক্রবালা...প্রথমমচলৎ ধরিত্রী।...পরস্পরাস্ফালন-বাচালবীচয়ো বিজুঘূর্ণিরেঽর্ণবাঃ।...বিততশিখা কলাপবিকটকুটিলাঃ...উর্দ্ধীবভূবুঃ ধূমকেতবঃ ককুভাম্।...ভ্রষ্টভাসি তপ্তকালায়সকুম্ভবক্রনি ভানুমণ্ডলে ভয়ঙ্কর কবন্ধকায়ব্যাজেন...। জ্বলিতপরিবেশমণ্ডলাভোগভাস্বরো...প্রত্যাদৃশ্যত শ্বেতভানুঃ।...অদহ্যন্ত...দিশঃ। স্রুত-শোণিত শীকরাসারারুণিততনু...অদৃশ্যত বসুধাবধূঃ। ...অকালকালমেঘপটলৈঃ অরুধ্যন্ত দিগ্‌দ্বারাণি।...পস্ফারিরে নির্ঘাতানাং ঘোরা নির্ঘোষাঃ।...দ্যুমণিধাম ধূসরীচক্রুঃ ক্রমেলক-কচকপিলাঃ পাংশুবৃষ্টয়ঃ। বিরস-বিরাবিনীনাম্ উন্মুখীনো জ্বালাং প্রতীচ্ছন্ত্য ইব পতন্তীঃ উল্কা নভসো ববাশিরে শিবানাং রাজয়ঃ। রাজধামনি...প্রকীর্ণকেশপাশপ্রকাশিতশোকা...প্রাকা-

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যখন জনসাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ ছিল তখন কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিলেই তাহা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। ভূমিকম্প বা ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নহে। কাজেই সেগুলি ঘটিলে লোকে মনে করিত কোনও অশুভ ঘটনা ঘটিবে। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমে বজ্রধ্বনিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা ঘোষিত হয় বলিয়া বিশ্বাস ছিল। জুপিটারের বাহন ঈগল পক্ষী উড্ডীন হইলে শুভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিত। আমাদের দেশে বিজয়ার দিন 'নীলকণ্ঠ' পাখী খাঁচা খুলিয়া উড়াইয়া দিয়া শুভ দর্শন বলিয়া সকলে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে।

এক্ষণে দ্বিতীয় বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে ব্যক্তিগত শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিতে শকুন শাস্ত্রের আর এক বিভাগের উদ্ভব। আমরা এতক্ষণ যে সমস্ত দুর্লক্ষণের তালিকা দিলাম তাহা রাজা, রাজ্য বা সকল জনমণ্ডলীর অশুভসূচক। দ্বিতীয় বিভাগে ব্যক্তিবিশেষ ও কার্য্যবিশেষের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ অতি বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহার সকল ভেদগুলির এক একটি উদাহরণ মাত্র দিয়া নিরস্ত হইব।

সময় সময় ভবিষ্যৎ ঘটনা সকলের আভাস মানব মনে উদিত হয়, ইহা অনেকের বিশ্বাস। আসন্ন মঙ্গল বা অমঙ্গলসূচক অনেকগুলি শকুন মানা হইত। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এই :—

(১) স্বপ্ন দ্বারা লোকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারে বলিয়া অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। বেশী দূরে যাইতে হইবে না আজ-কালকার উপন্যাসেও স্বপ্নদর্শনে ভবিষ্যৎ সূচনা একটা সাধারণ ঘটনা। কোন্ কোন্ দ্রব্য বা প্রাণী স্বপ্নে দেখিলে অশুভ সূচিত হয়, কি কি দ্রব্যই বা শুভ সূচনা করে শকুন শাস্ত্রে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা এখানে রামায়ণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্নের এক একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি

ভরত দশরথের মৃত্যুসূচক নিম্নলিখিত দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন—

"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে নভোমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল ভূমণ্ডলে নিপতিত

---

শুস্ক প্রতিমাঃ কুলদেবতানাম্। উপসিংহাসনমাকুলং...বভ্রাম ভ্রামরং পটলম। অটত্তামস্তঃ-পুরস্ত উপরি ক্ষণমপি ন শশাম ব্যাক্রোশীবায়সানাম্। শ্বেতাতপত্রমণ্ডলমধ্যাৎ...সরস-পিশিতপিণ্ডলোহিতং চঞ্চচঞ্চুঃ উচ্চৈঃ উচ্চখান খণ্ডং মাণিক্যস্য কূজন্ জরদ্‌গৃধ্রঃ।"

[ হর্ষ-চরিতম্। পঞ্চমঃ উচ্ছ্বাসঃ। ]

হইতেছে। মহাসাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জগতীতল গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে। মহারাজের বাহন প্রধান হস্তীর বিশাল বিষাণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বার দেখিলাম, প্রজ্জ্বলিত হুতাশন-শিখা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইল। বৃক্ষ সমুদায় শুষ্ক হইয়া উঠিল। পর্ব্বতে প্রথমতঃ ধূম উত্থিত হইয়া পশ্চাৎ ঐ পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাকর রাহুগ্রস্থ হইল। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম আমার পিতা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। কতকগুলি পুরুষ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতেছে। পুনর্ব্বার দেখিলাম আমার পিতা মুক্তকেশ ও তৈলাক্ত শরীর হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে অগাধ গোময় হ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তিনি গোময় হ্রদে একবার নিমগ্ন একবার উন্মগ্ন হইতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন। এইরূপে তিনি তৈল পান করিয়া অধোবদনে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া তৈল-হ্রদেই অবগাহন করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ বসন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ লৌহ পীঠে উপবেশন করিলে প্রমদাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। পরে দেখিলাম আমার পিতা রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রাসভযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রক্তবসনা বিকৃতাননা বিকটাকারা রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরে দেখিলাম মহাগজ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হইতেছে। প্রদীপ্ত অগ্নি জলসেক দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে। পরে পুনর্ব্বার দেখিলাম মহামহীধর বিশীর্ণ হইল। চৈত্যবৃক্ষ ভগ্ন হইয়া পড়িল। মহাধ্বজ নিপতিত হইয়া গেল।

[ অযোধ্যাকাণ্ড, একসপ্ততিতম সর্গ, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কৃত অনুবাদ। ]

হর্ষচরিতেও হর্ষবর্দ্ধন দাবানলে সিংহ দগ্ধ হইতেছে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। পরে দেখিলেন সিংহী শাবক পরিত্যাগ করিয়া সেই অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই স্বপ্ন দর্শনের পর হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন দাহজ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের মাতা যশোবতী পুত্রদ্বয়কে ফেলিয়া জ্বলন্ত চিতায় আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

[ হর্ষচরিত পঞ্চম উচ্ছ্বাস দ্রষ্টব্য ]

এইরূপ বহুবিধ দর্শন অশুভ সূচক বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহার সমগ্র তালিকা প্রদত্ত হইল না। সুস্বপ্নের একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে—ইহা অক্রুরদৃষ্ট স্বপ্ন।

"স্বপ্নের প্রথমে দেখিলেন কিশোর বয়স্ক মুরলীধর শ্যামকলেবর কমল লোচন এক দ্বিজ শিশু তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তাঁহার কটিতটে পীতবসন ও গলদেশ বনমালা ও মালতীমালায় সুশোভিত, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনোক্ষিত ও অঙ্গসমুদায় উৎকৃষ্ট রত্ন ও মণিভূষণে বিভূষিত হইতেছে এবং তাহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে।"

"এইরূপ দর্শনের পর তিনি দেখিলেন এক পীতবস্ত্রপরিধানা রত্নভূষণ-ভূষিতা শরচ্চন্দ্রনিভাননা পতিপুত্রবতী শুভদায়িনী বরপ্রদা রুচিরা সাধ্বী রমণী এক হস্তে শুক্লধান্য ও এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ গ্রহণপূর্ব্বক সহাস্য বদনে তাহার সম্মুখে উপনীতা হইয়াছেন। তৎপরে তিনি স্বপ্নযোগে এক আশীর্ব্বাদকারী ব্রাহ্মণ, শ্বেতপদ্ম, রাজহংস তুরঙ্গম ও সরোবর দর্শন করিলেন। পরে তিনি দেখিলেন আম্র নিম্ব নারিকেল গুবাক ও কদলীতরু ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে। অতঃপর দংশনপ্রবৃত্ত শ্বেতসর্প তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, আর দেখিলেন তিনি স্বয়ং কখন পর্ব্বতে কখন বৃক্ষোপরি কখন গজ-পৃষ্ঠে কখন অশ্বপৃষ্ঠে ও কখনও বা নৌকাযানে অবস্থান করিতেছেন। তৎপরে দৃষ্ট হইল তিনি কখন বীণাবাদন, কখন পায়স ভোজন ও কখন বাঞ্ছিত পদ্মপত্রস্থ দধি ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতেছেন এবং কখন তাঁহার করে শুক্ল ধান্য কখন পুষ্প ও কখন বা চন্দন বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ দর্শনের পর তিনি রজতশুভ্র মণিকাঞ্চন-মুক্তা, মাণিক্য, রত্ন, পূর্ণকুম্ভ, মেঘ, সলিল দর্শন করিলেন। পরক্ষণে সবৎসা সুরভি উৎকৃষ্ট বৃষ, ময়ূর, শুক্ল সারস, শঙ্খচিল ও খঞ্জন পক্ষী তাহার দৃষ্টি গোচর হইল। পরে তিনি তাম্বুল, পুষ্পমাল্য, তেজঃপুঞ্জ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, পার্ব্বতী প্রতিমা, কৃষ্ণপ্রতিমা ও শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। এই সমস্ত দর্শনের পর তিনি বিপ্রকন্যা, বিপ্রবালক, সুস্বপ্ন ফল পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র, দেবস্থলী, রাজেন্দ্র, গুরু ও দেবগণকে দর্শন করিলেন।"

[ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, সপ্ততিতম অধ্যায়—৭—১৭ শ্লোক। ]

ইহা হইতেই সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্নের সাধারণ প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। বিস্তৃত তালিকা জানিতে হইলে কৌতূহলী পাঠক শকুনদীপিকা, দেবী-পুরাণ ৪২ অধ্যায়, কালিকাপুরাণ ৮৭ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২১৬ অধ্যায় ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৬৩ অধ্যায় অনুসন্ধান করিবেন।

(২) শরীরের অঙ্গবিশেষ স্পন্দনে ভবিষ্যতে কি কি শুভাশুভ হইবে তাহারও

বিস্তৃত তালিকা শাকুনশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই অঙ্গস্পন্দনের সাধারণ নিয়ম এই —পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ ও রমণীর বামাঙ্গ স্পন্দন শুভ ও পুরুষের বামাঙ্গ ও রমণীর দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন অশুভসূচক। বিশেষ বিশেষ অঙ্গ স্পন্দনে বিশেষ বিশেষ ফল লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণবাহু স্পন্দনে স্ত্রীলোভের সূচনা সংস্কৃত বহু নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মস্তক-স্পন্দনে ভূমিলাভ, নাসিকা-স্পন্দনে প্রণয় ও বন্ধুতার-সূচনা প্রভৃতি শাকুনদীপিকা হইতে অবগন্তব্য।

(৩) ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভ পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন দর্শন ও অঙ্গ স্পন্দনে বর্ণিত হইল। এক্ষণে কার্য্যবিশেষের শুভাশুভ সূচনার কিছু আলোচনা আবশ্যক। কোনও কার্য্য করিতে যাত্রা করিবার সময়, বা কোনও বিশেষ শুভ অনুষ্ঠানের সময় (নবগৃহ প্রবেশ, বিবাহ প্রভৃতি) কতকগুলি দ্রব্যের কীর্ত্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শ শুভ ও কতকগুলির অশুভ বলিয়া শকুনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

শুভসূচক দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি এই—দধি, ঘৃত, দুর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, পূর্ণ ঘট, চন্দন, শঙ্খ, দেবমূর্ত্তি, বীণা, ফুল, ফল, ধ্বজ, ছত্র, অগ্নি, হস্তী, ছাগ, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও নবপল্লব। অশুভসূচক দ্রব্য—অঙ্গার, ভস্ম, কাষ্ঠ, রজ্জু, শৃঙ্খল, অস্থি, বসা, চর্ম্ম, ও কর্দ্দম প্রভৃতি। বিস্তৃত তালিকা বসন্তরাজশাকুন গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দ্রব্য ব্যতীত নরনারী দর্শন শুভাশুভের নির্দ্দেশক বলিয়া বিবেচিত হইত। সুন্দর, শুক্লবস্ত্র, মাল্য বা চন্দনভূষিত স্ত্রী বা পুরুষ, রাজা, বারাঙ্গনা, ব্রাহ্মণ, অশ্বারূঢ় বা গজারূঢ় ব্যক্তি শুভদর্শন। আবার নগ্ন, অঙ্গহীন, উন্মত্ত, দীন পুরুষ, কৃষ্ণবসনধারিণী রমণী প্রভৃতি অশুভ দর্শন।

বাণভট্ট হর্ষচরিতে এইরূপ দুর্লক্ষণ সকল বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন যখন পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে নিম্ন-লিখিত দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইলঃ—

"হর্ষবর্দ্ধনের বামভাগে হরিণ সকল বিচরণ করিতে লাগিল। * দাবানলদগ্ধ তরুর উপর বসিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া কর্কশস্বরে বায়স ডাকিতে লাগিল। † বহুদিবসে সঞ্চিত মললিপ্তদেহ ময়ূরপুচ্ছধারী নগ্ন ভিক্ষুক তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল।"—[ হর্ষচরিত, পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

* হরিণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দর্শন দক্ষিণদিকেই শুভ। যথা "বামে শবশিবাকুম্ভা দক্ষিণে গোমৃগদ্বিজাঃ।"

† শুষ্কতরুস্থিত কাকের ডাক অশুভ। যথা—"ছিন্নাগ্রেহঙ্গচ্ছেদঃ কলহঃ শুষ্কদ্রুমস্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে।"—বরাহমিহির।

আবার প্রাচীনকালে ভারতে সামান্য সামান্য ঘটনা হইতে কিরূপে ভবিষ্যৎ জানিবার প্রয়াস করা হইত তাহা হর্ষচরিত হইতেই আর এক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে একস্থলে গ্রামাক্ষপটলিক তাঁহাকে বৃষচিহ্নাঙ্কিত এক স্বুবর্ণমুদ্রা আনিয়া দিল। তিনি গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এমন সময় তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কয়েকবার মৃত্তিকার উপর ঘুরিয়া অধোমুখে পতিত রহিল। সে স্থানের মৃত্তিকা কোমল ছিল, মুদ্রাটির স্পষ্ট একটি ছাপা ভূমিতলে দেখা গেল। তাহা হইতে হর্ষবর্দ্ধন অনুমান করিলেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার একশাসনমুদ্রাঙ্কিত হইবে এই ঘটনায় সেই শুভের সূচনা হইল :—হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস।

এই সকল বিশ্বাস কালসহকারে লোকের মনে এত প্রভাব বিস্তার করিল যে ক্রমে তাহা গ্রাম্যবচনে, প্রবাদবাক্যে পরিণত হইল। খনার বচনে এই শুভাশুভের নির্দ্দেশ আছে। আমরা দুই একটি মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

যাত্রা করিবার সময় দ্রব্য বিশেষ বা নরনারী দর্শনে শুভাশুভ নিম্নলিখিতরূপে খনার বচনে কথিত হইয়াছে—

"ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥
মরা হতে জেন্ত ভাল যদি মরতে যায়।
বাঁয়ে হতে ডানে ভাল যদি ফিরে যায়॥
বাঁধা হতে খোলা ভাল মাথা তুলে যায়।
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়॥"

"শূন্য কলসী শুকনো না।
শুকনো ডালে ডাকে কা॥
যদি দেখ মাকন্দ চোপা।
এক পা না যেও বাপা॥" ইত্যাদি—।

(৪) এই সকল হইতে ক্রমশঃ হাঁচি ও টিক্‌টিকির শব্দ পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানিবার উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। টিক্‌টিকির এই ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতার ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত (নিম্নলিখিত অদ্ভুদ্ গল্পে) করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। খনা জিহ্বা কর্ত্তন করিলে টিক্‌টিকিতে উহা ভক্ষণ করে। সেই অবধি টিক্‌টিকির ভবিষ্যৎ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা জন্মাইয়াছে।

টিক্‌টিকি বা হাঁচির শব্দ উর্দ্ধদিকে হইলে অর্থলাভ, পূর্ব্বদিকে অসীম কার্য্য-সিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈঋতে কলহ পশ্চিমে লাভ, বায়ুকোণে শ্রেষ্ঠবস্ত্র গন্ধ জল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা লাভ ও ঈশানকোণে মৃত্যু হয়।*

মানবের দেহের দক্ষিণভাগে টিক্‌টিকি পড়িলে স্বজন ও ধনহানি, বাম-ভাগে লাভ, বক্ষে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কণ্ঠে রাজ্য-লাভ, হস্ত, চরণ ও হৃদয়ে সুখ হয়। †

শকুনশাস্ত্রের বিবিধ বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই খানে শেষ হইল।

সকল দেশে প্রাচীনকালে এইরূপ শকুনসমূহে বিশ্বাস প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের আদিম অবস্থায়, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা মানবচক্ষে অজ্ঞেয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হইত। কি কারণে এই সকল ঘটিতেছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। তাই তাহারা এই সকল অবিদিতরহস্য ঘটনাগুলিকে উৎপাত, দুর্লক্ষণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ যাত্রাকালে দ্রব্যবিশেষ দর্শনে মন প্রফুল্ল বা বিমর্ষ হয় তাহা স্বাভাবিক। পুষ্প, মাল্য, পূর্ণঘট, সুন্দর পুরুষ প্রভৃতি দর্শনে মন প্রসন্ন হয়। প্রসন্ন মনে, শুভ হইবে এই বিশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সেই কার্য্যে শুভ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ কুৎসিত পদার্থ দর্শনে মন অপ্রসন্ন হয়, তাহাতে কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদিত হইতে পারে। প্রথমে এই সকল হেতুতে শকুন সকল নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে। কালক্রমে ইহা এতদূর বাড়াবাড়িতে পরিণত হয় যে, হাঁচি টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত শকুনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে।

কালক্রমে মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শকুনের প্রতি বিশ্বাস কমিতে থাকে। ভূমিকম্প, গ্রহণ, উল্কাপাত প্রভৃতির কারণ আবিষ্কৃত হওয়াতে সকলে উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছে, এখন আর কেহ ও-সকল দেখিয়া ভয় পায় না। ইংলণ্ডে এডিসন্ শকুনশাস্ত্রে বিশ্বাসীদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। [ ১৭১১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখের স্পেক্‌টেটর দ্রষ্টব্য ] রহস্যকবি বাট্‌লার

---

* "বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং
যাম্যামগ্নিভয়ং সুরদ্বিষি কলির্লাভঃসমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে
ঐশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং খঞ্জনে।
জ্যোষ্ঠীরুতে ক্ষুতেঽপ্যেবমূচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ॥"

† "যদি নিপততি বল্লী দক্ষিণাংশে নরাণাং
স্বজনধনবিয়োগো লাভদা বামভাগে।
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশে চ রাজ্যং
করচরণহৃদিস্থা সর্ব্বসৌখ্যং দদাতি॥"

নিজ Hudibras গ্রন্থেও এইরূপ বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ‡ প্রাচীন রোমে Ennius উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "এক কপর্দ্দকের জন্য যাহারা ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেয়, তাহাদের কথার মূল্য কি? পরকে তাহারা অজস্র মুদ্রা পাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু নিজে এক কপর্দ্দক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।" Cato রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন একজন শকুনশাস্ত্রবিদ্ আর একজন নিজব্যবসায়ীকে দেখিলে হাসিয়া আকুল হয়। Cicero বলিয়াছিলেন কাক ডান দিকে ডাকিলেই শুভ আর বাঁ দিকে ডাকিলেই অশুভ কেন? ডাক ত একই। প্লিনি Pliny নিজ গ্রন্থে (Natural History) বহু উপহাস করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ উপহাস বিদ্রূপে শকুনশাস্ত্রে বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ উন্মূলিত হইয়া যাইতেছে। আশা করা যায় ভারতেও এইরূপ বিশ্বাস ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

# প্রেমের স্মৃতি

কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, হৃদি করি খান্ খান্
জনমের মত যারে
গিয়াছিনু ভু'লে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে?

সেই মুখ সেই হাসি, সে অতুল রূপরাশি
প্রাণের অধিক ভাল
বে'সেছিনু যারে!—
—কেমনে ভুলিব আমি তারে?

সে মোর হৃদয় মণি, সে মোর প্রেমের খনি
সে বিনে কেমনে আমি
র'ব ধরাতলে!

---

‡ "Augustus, having by oversight
Put on the left shoe before the right,
Was like to have been slain next day,
By troops who mutinied for pay. —Hudibras.

সে বা কোথা, আমি কোথা, এ জনম গেল বৃথা,
ব'সে ব'সে কাঁদি আজি
তটিনীর কূলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে?

যেই ভালবাসে যারে, সে যদি না পায় তারে,
বৃথা সে জনম তার
ধিক্ নরকুলে!
এমন বিধান যার, ধিক্ তারে শতবার
চাইনে এমন জন্ম
পাপ ধরাতলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে?

পাপিয়সী দেশাচার কে'ড়ে মোর কণ্ঠ-হার
তু'লে দিল হায় হায়,
অপরের গলে!
তা'রি স্মৃতি বুকে ধরি,' দিনরাত কেঁদে মরি;
আর কি পাইব তারে
জীবনের কূলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে?

এ প্রাণের কত কথা, এ প্রাণের কত ব্যথা,
চাপিয়া রেখেছি আমি
হৃদয়ের মূলে!
বুকভরা ভালবাসা, প্রাণভরা কত আশা,
নারিনু জানাতে তারে,
এ হৃদয় খুলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে?

জগৎ ভরিয়া তায়, দেখি আমি হায় হায়,
তাহারি মুখের জ্যোতিঃ
গগনে ভূতলে !
সে বিনে আঁধার সব, পিক-কণ্ঠে তা'রি রব,
বিধাতা গ'ড়েছে তারে
না জানি কি ভুলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে ?

সমীরে তাহারি শ্বাস, গোলাপে তাহারি বাস,
দেহের বরণ তার
চম্পকের ফুলে !
অধরে পীযূষ ভরা, আঁখি তার মনোহরা,
প্রেমের প্রতিমা সে যে,
অবনীমণ্ডলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে ?

মনে করি ভুলে যাই, ভুলিলেও সুখ নাই,
অশান্ত হৃদয় মোর,
ভাসে আঁখি-জলে !
নক্ষত্রে তাহারই হাসি, চাঁদে তার রূপরাশি
তারই মুখ দেখি আমি,
ফুলে ও মুকুলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তু'লে ?

কায়কোবাদ

# কৌতুক।

( ১ )

অনেককাল পরে আজ ছোট ভগ্নিপতি হেম আসিয়াছে। শরীরটা গতকল্য হইতে একটু খারাপ ছিল, আজ যেন আরও খারাপ মনে হইতে লাগিল। সুতরাং স্থির করিলাম, আজ আর কলেজ যাইব না।

বেলা নয়টা বাজিতেই মেজদাদা বই হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই, তুই আজ যাবিনে নাকি?"

একবার গা ভাঙ্গিয়া, হাই তুলিয়া বিমর্ষভাবে উত্তর করিলাম—"না, আজ আর যাচ্ছিনে। শরীরটে ভাল নেই। তুমি সকালে সকালে ফিরো।"

মেজদাদা ঘড়ীটা একবার দেখিয়া 'আচ্ছা' বলিয়াই ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন।

কাছারি যাইবার সময় বড়দাদা বলিলেন—"ধীরুর বুঝি আজ হেমের অনারে ছুটী?"

আমি।—না তা ঠিক নয়, তবে কতকটা বটে।

"হেম, তোমার উপর ধীরুর একটু 'পার্শিয়ালিটি' আছে"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে বড়দাদা গাড়ীতে উঠিলেন। বাবা পূর্ব্বেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন।

বাবা শ্রীরামপুরে ওকালতী করেন। তিন বৎসর হইতে বড়দাদাও বাবার সঙ্গে বাহির হইতেছেন। মেজদাদা ও আমি এম্, এ, পড়ি। মেজদাদা ইংরাজি লইয়াছেন, আমি লইয়াছি সংস্কৃত। মেজদার ইচ্ছা পরেরবারে ফিলজফিতে এম্ এ, পাশ করিয়া প্রফেসারি করিবেন। আমি কি করিব, এখনও স্থির করি নাই। সংস্কৃতটা ভাল করিয়া শিখিয়া খানকতক নাটক লিখিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের যাত্রার দল খুলিব ইচ্ছা আছে।

মেজদাদা ও আমি বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে পড়িতেছি। মেজদাদা আমার চেয়ে দেড় বৎসরের মাত্র বড়, দেখিতে দুজনের একই বয়স দেখায়। ছেলেবেলায় উভয়ের মধ্যে ভাব ও ঝগড়াঝাঁটি দিনে দশবার হইত। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে "তুই" সম্বোধন করিয়াছি—এবং দাদা বলিতাম না। কলেজে প্রবেশ করিয়া অবধি কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছি।

সম্প্রতি হঠাৎ শোনা গেল, মেজদাদার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আমাদের মা নাই, বউদিদিই বাড়ীর গৃহিণী। বউদিদিকে গিয়া বলিলাম—মেজদাদা তখন সেখানে উপস্থিত—"বলি হ্যাঁ গা, মেজদার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে?"

বউদিদি বলিলেন,—"হ্যাঁ।"

কৃত্রিম অভিমানে বলিলাম—"আর আমার ?"

"তোমার কি ?"

"আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে না ?"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন—"তোমার হবে বৈ কি ভাই। জিতুর বিয়েটা আগে হয়ে যাক্।"

আমি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলাম—"সে হবে না। ওর বিয়ে হবে, আর আমি বুঝি ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাকব ? ওর বিয়ে আমার বিয়ে এক দিনেই হওয়া চাই।"

বউদিদি বলিলেন—"সে কি হয় ?—সে যে ভারি অসুবিধে হবে।"

মেজদাদা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি রাগিয়া বলিলাম —"হেস না মেজদা।—আমাকে ফেলে তুমি যদি বিয়ে কর্‌তে যাও—আমি ঢিল ছুড়ে তোমার বিয়ের ঝাড়লণ্ঠন ভেঙ্গে দেব।"

বউদিদি বলিলেন—"বোকারাম—এক দিনেই যদি দুজনের বিয়ে হয়—জিতুর বিয়েতে তুমি বরযাত্র যাবে কেমন করে ?"

তৎক্ষণাৎ আমি মুখভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিলাম—"ঠিক বলেছ বউদিদি—ঠিক বলেছ। ওটা আমার মনেই আসে নি। তবে ওর বিয়েই আগে হয়ে যাক্।"—বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

কয়েক স্থান হইতেই মেজদার সম্বন্ধ আসিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়াও গিয়াছেন। কলিকাতার এক উকীল শীঘ্রই তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন, চিঠি আসিয়াছে।

( ২ )

কলেজ ফাঁকি দিয়া আহারাদির পরে হেম ও আমি বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছি। মেজদাদার বিবাহ লইয়া বউদিদির সঙ্গে যে রহস্য-অভিনয় করিয়াছিলাম, তাহাও হেমকে বলিলাম। বেলা যখন প্রায় একটা, একজন ভিখারী আসিয়া বলিল,—"বাবু অতিথি বৈষ্ণব, চারটী অন্ন পাওয়া যাবে ?"

ভিখারি বৈষ্ণবের স্কন্ধে একটী ঝুলি, পরণে একখান ময়লা থান, ও আধ্-ময়লা একখানি উড়ানি কোমরে বাঁধা।

"এস, পাওয়া যাবে"—বলিতেই বৈষ্ণব ঠাকুর বৈঠকখানায় আসিয়া

বসিলেন। আমি বাড়ীর ভিতর বলিয়া পাঠাইলাম। বাবাজী একবার চারি-দিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, তামাকের যোগাড় আছে?"

পাশের ঘরেই তামাকের সরঞ্জাম ছিল, দেখাইয়া দিলাম। বৈষ্ণবঠাকুর তামাক সাজিয়া ঝুলি হইতে একটী ছোট হুঁকা বাহির করিয়া বেশ তৃপ্তির সহিত ধূমপান করিলেন।

"একটু তেল পেলে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসতাম" বলিয়া বাবাজি কলিকাটা যথাস্থানে রাখিয়া হুঁকাটী আবার ঝুলির ভিতর পুরিলেন।

তেল আসিলে মর্দ্দণান্তে হুঁকাতে কিঞ্চিৎ মাখাইয়া বাবাজী স্নানে গমন করিলেন।

হেমচন্দ্র বলিল—"দেখ ধীরু, ভারি একটা সুন্দর মৎলব মাথায় এসেছে।"

আমি।—কি শুনি?

হেম।—আচ্ছা আগে বল, বড়দা ও বাবা কাছারি থেকে কখন ফিরবেন?

আমি।—পাঁচটার এদিকে নয়।

হেম।—"তাহলে ঠিক হবে। জিতুকে ত আজকাল দেখতে আসার কথা আছে। এক মজা করা যাক্; এই বৈষ্ণব ঠাকুরকে মেয়ের বাপ সাজান যাক্। জিতু এলে এর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে কথা কওয়া যাবে। পরে বড়দার আস্‌বার আগেই বাবাজীকে বিদায় করে দেব।"

আমি।—কিন্তু বাবাজী রাজী হবে?

হেম।—কেন হবে না? কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করলেই রাজি হবে।

আমি।—পারবে ত?

হেম।—লোকটিকে ত বেশ চালাক্ চতুর বলেই মনে হয়। খুব পারবে। আর, না পারে,—তাতেই বা ক্ষতি কি? মজাটি ত হবে!

আমি ইহাতে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিলাম। বলিলাম—"বেশ বেশ, তাই করা যাক্। কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুরের বেশভূষা দেখে যে মেজদা সন্দেহ করবেন।"

হেম।—তা বটে। তোমার জামা টামাও ত ওর গায়ে হবে না। বাবাজীর দেহ আবার একটু হৃষ্টপুষ্ট আছে।

আমি খানিক ভাবিয়া বলিলাম—"আচ্ছা মৎলবটা তুমি বার করেছ, সাজানর ভারটা আমার। দাঁড়াও দেখে আসি"—বলিয়া তাড়াতাড়ি বউদিদির ঘরে ছুটিলাম।

বউদিদি খোকাকে তখন দুধ খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন—"দস্যি ছেলের দুধ খেতে হলেই যত কান্না। এখন বুঝি আমার পেটটা ভর্‌ল ?"

আমি গিয়া বলিলাম—"পেট যারই ভরুক বউদিদি, এখন একটা কাজ করতো।"

বউদিদি।—কি কাজ শুনি ?

আমি।—বড়দার বাক্স থেকে একটা ভাল জামা বার করে দাও।

বউদিদি।—কেন, কোথাও যাবে নাকি ?

আমি। না, অন্য একটা দরকার।

বউদিদি। কি দরকার শুন্‌তে পাইনে ?

দেখিলাম বউদিদির কাছে লুকানোর চেয়ে বলা ভাল। বলিলাম—"মেজ দার শ্বশুরের জন্যে।"

বউদিদি কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি তখন ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলাম। "বটে! তোমাদের এতও আসে!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বউদিদি দাদার একটা নূতন গরদের কোট বাহির করিয়া দিলেন।

আমার বাক্স হইতে একখানি মিহি ধুতি ও উড়ানি লইয়া আমি বৈঠকখানায় ফিরিলাম।

বাবাজী তখন স্নানান্তে তিলকাদি ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন।

হেম বলিল—"ধীরু বাবাজী স্বীকার—বিনা দক্ষিণাতেই। তবে ইনি আমায় তোমাদের সম্বন্ধে এত বেশী জেরা করেছেন যে, সত্যিকারের পাত্র দেখতে এলেও লোকে এত কথা জিজ্ঞাসা করে না।"

বাবাজী। বাবা, ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝে কি কোন কাজে হাত দিতে আছে ? শেষটা আবার কি বলতে কি বলে ধরা পড়ে যাব ?

আমি।—হ্যাঁ সে কথা ঠিক বটে। এখন সব বুঝেছ ত ?

বাবাজী।—খুব বুঝেছি ; তবে আপনাদের একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই, আমি যা বলি বা করি আপনারা যেন কিছুতেই হেসে ফেলবেন না।

তার পর বাবাজীর বেশ-পরিবর্ত্তন করাইয়া তাহার ঝুলি ও পুরাতন বেশ বাহিরের এক নিভৃত স্থানে লুকাইলাম।

আমি বলিলাম—"হেম, জুতোর কি হবে ? আমার জুতো ত বাবাজীর

পায়ে হবে না। আচ্ছা, দেখ ত বাবাজী, এ জোড়াটা হয় কি না।” বলিয়া হেমের জুতা দেখাইয়া দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে জুতা জোড়াটি পায়ে ঠিক হইল।

এত করিয়াও কিন্তু একটু ত্রুটি রহিয়া গেল। বাবাজীর দাড়ি গোঁফ দুই কামান্। কিন্তু সপ্তাহ খানেক তাহাতে ক্ষুর না পড়ায় মুখমণ্ডল একটু কুদর্শন হইয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম—“হেম, বাবাজীর দাড়ী গোঁফের উপর কি করা যায় বল দেখি?”

হেম বলিল, “তা হোক্, এতে কোন ক্ষতি হবে না। তবে যদি ক্ষুর পাওয়া যায়, আমি কামিয়ে দিতে পারি।”

“ওঃ, তা হলে আর ভাবনা কি?” বলিয়া আমি দেরাজ হইতে বড়দার ক্ষুর ও কামাইবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া দিলাম।

নির্ব্বিঘ্নে বাবাজীর ক্ষৌর-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

অতঃপর বাবাজী ভোজনে বসিলেন।

(৩)

বাবাজী বেশ ধীরে ধীরে আহার করিতে লাগিলেন। আমি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছি। হেম তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—“ধীরু, পাত্র হাজির।”

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম—“আমি এখানে আছি, মেজদাকে ঠিক করগে।”

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বাবাজী বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমি বিনীতভাবে তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় হেম মেজদাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বাবাজী স্নেহস্বরে বলিলেন—“এস বাবা বস। তোমার নামটী কি?”

মেজদা।—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবাজী।—কোন্ কলেজে পড়া হয় বাবা?

মেজদা।—প্রেসিডেন্সিতে।

বাবাজী।—এবার বুঝি এম্ এ পড়ছ?

মেজদা।—আজ্ঞা হাঁ।

বাবাজী।—বেশ বাবা, বেশ, বেশ!

পরে বাবাজী আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“আমাকে এখনই যেতে হবে, কাজেই রাম বাবুর সঙ্গে আজ দেখা করতে পারলাম না। আমি বাড়ী

গিয়েই পত্র লিখবো, পত্র পেয়ে তাঁরা মেয়ে দেখতে গেলে সেখানে সব কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে যাবে। আস্‌ছে অগ্রাণ মাসে শুভকাজটা সম্পন্ন করাই আমার ইচ্ছা।

হেমচন্দ্র আমার কাণে কাণে বলিল—"এবার যখন তোমাদের থিয়েটার হবে বাবাজীকে একটা পার্ট দিও। বাবাজী খলিফা লোক।"

আর এক ছিলিম তামাক খাইয়া বাবাজী উঠিলেন। বলিলেন—"বাবা, আজ তবে আসি, ঈশ্বর করেন ত আবার কত আসবো।" সেই জামা কাপড়, সেই জুতা পরিয়া ধীরে ধীরে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি চুপি চুপি হেমকে বলিলাম—"হেম, এ যে যায়।" হেম বলিল—"এখনি ফিরে আসবে। ঝুলি ফেলে যাবে কোথা?"

মিনিট পনেরো কাটিয়া গেল, তবু বাবাজীর ফিরিবার নাম নাই। আমি একটু উৎকণ্ঠার সহিত বাহিরে আসিয়া এধার ওধার ঘুরিয়া দেখি, বাবাজী কোথাও নাই।

তখন ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম,—"হেম, বাবাজী পলাতক।"

হেম।—বল কি? আমার জুতা যোড়াটা যে সবে পনর দিন কিনেছি। দেখ দেখ, বাবাজীর ঝুলিটা আছে কি না!

যেখানে ঝুলি রাখিয়াছিলাম, গিয়া দেখি ঝুলি যেমন তেমনই রহিয়াছে। মেজদাদা ব্যাপারটা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে ধীরু, বাবাজী কে?"

"কে আবার? তোমার শ্বশুর! ছি ছি, এমন জুয়াচোর!"—বলিয়া মেজদাদার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলাম।

মেজদাদা হাসিয়া বলিল—"তোমাদের বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কোন কাজ ছিল না! তা বেশ হয়েছে, বেশ ঠকিয়েছে তোমাদের। তবে মাঝে পড়ে বড়দার জামাটা না গিয়ে তোমাদের কারুর গেলেই আরো ভাল হত।"

বাড়ীর ভিতর ঘটনাটা প্রকাশ পাইলে খুব হাসির রোল পড়িয়া গেল।

হেম মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল—"বেটা নূতন জুতা যোড়াটা এমন করেও ফাঁকি দিয়ে গেল!"

( ৪ )

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। শনিবার সন্ধ্যার সময় পড়িবার ঘরে মেজদাদা ও আমি বসিয়া আছি। হেম প্রফুল্ল মুখে আসিয়া বলিল—"ভাই, এবার সত্য সত্যই বাঘ আসিয়াছে।"

আমি।—সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বার্থটা করে দাও।

হেম।—এটা আর বুঝলে না? এক ভদ্রলোক জিতুকে দেখ্‌তে এসেছেন। দোহাই জিতু ভাই, আমার ওপর কোন আক্রোশ করো না। এবার আসল।

আমি।—যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরাই ত?

হেম।—না তাঁরা নয়, এঁরা দেওঘরে থাকেন।

হেম মেজদাদার সহিত কথা কহিতে লাগিল, আমি বৈঠকখানায় ভদ্রলোকটীকে দেখিতে গেলাম।

রাত্রে দেওঘরের বাবুটী মেজদাদাকে দেখিলেন। পরদিন সকালে বাবাকে ও বড়দাদাকে সঙ্গে করিয়া মেয়ে দেখাইতে লইয়া গেলেন।

সোমবার প্রাতের ট্রেণে দুজনে প্রসন্নচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। পাত্রী মনোমত সুন্দরী। বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে। একপক্ষ পরে বিবাহ। মেজদাদার শ্বশুর সপরিবারে কলিকাতায় আসিবেন, সেইখানেই বিবাহ হইবে।

আশায় আনন্দে বিবাহের দিন আসিল। পূর্ব্ব রাত্রে শয়ন করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। তাহার উপর আনন্দের উদ্বেগে ভাল করিয়া ঘুম হইল না। খুব ভোরেই উঠিয়া পড়িলাম। দেখি মেজদাদার তখনও ঘুম। এমন সময়ে হেম আসিয়া মেজদাদাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল—"জিতু, ওঠ আজ তোমার শুভবিবাহ, সেটা মনে আছে ত?

মেজদাদাকে উঠিতে হইল। তিন জনে বাহিরে আসিলাম।

অল্পক্ষণ পরে বড়দাদা বাহিরে আসিয়া আমাদের দেখিয়া বলিলেন—"ওঃ, তোমরা ত খুব ভোরে উঠেছ!"

হেম। জিতুর জন্যে কি আর ঘুমোবার জো আছে?

মেজদা। বাঃ হেম, তুমি ত খুব মজার লোক? সত্যি বড়দা, আমি ঘুমচ্ছিলাম, এরা দুজনে আমাকে তুলে আন্‌লে।

কাজেকর্ম্মে দুপুর কাটিয়া গেল। বিকালের গাড়ীতে কলিকাতা যাওয়া স্থির হইয়াছে। বউদিদি ও ছোটদিদি দুজনে চন্দনাদি দিয়া মেজদাকে সাজাইতেছেন; হেম আসিয়া বলিল—"এখনও গ্রীণরুম থেকে বার হওনি জিতু? তবেই হয়েছে।"

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্যসমাধা করিয়া বউদিদি নিম্নস্বরে বলিলেন—"মেজ ঠাকুরপো, বাসরে যেন বোবাটি হয়ে থেকোনা—তা হলে সবাই ঠাট্টা করবে।"

মেজদাদা পাল্কীতে উঠিলে কনকাঞ্জলি দেওয়া হইল। বাহকেরা পাল্কী উঠাইল।

হেম পাশেই দাঁড়াইয়াছিল বলিল—"শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।"

( ৫ )

সন্ধ্যার সময় বিবাহ-বাটী পৌছিলাম। ৮৷৷০ টার সময় বিবাহ আরম্ভ হইল। হেম বলিল—"চল বিবাহ দেখে আসি।" ভিতরে আসিয়া দেখিলাম সম্প্রদান হইতেছে, কিন্তু এক অভাবনীয় ব্যাপার—সম্প্রদানকর্ত্তা, আমাদের পুরাতন পরিচিত সেই বাবাজী!

আমরা উভয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক!

বিস্ময়ের আবেগ একটু কমিলে বাহিরে বড়দাদাকে একধারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বড়দা, ও কি?" বড়দাদা হাসিয়া বলিলেন—"কি কিরে?"

আমি।—যিনি কন্যা সম্প্রদান কচ্ছেন, উনি যে সেদিনকার সেই বাবাজী!

বড়দা।—বটে!

বড়দার নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া বুঝিলাম তিনি পূর্ব্ব হইতেই এসব কথা জানেন। তখন মনে পড়িল কনে দেখিয়া আসা অবধি বড়দাদা আমাদিগের পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে এইরূপ হাসিয়াছিলেন। এখন বুঝিলাম—সে হাসি নিরর্থক নয়। বলিলাম—"তুমি তা হলে সব জান? সত্যি ব্যাপারটা কি, আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও।"

বড়দাদা বলিলেন, "এঁর নাম মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেওঘরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টার। এঁর হাতে একটা খুনের মোকদ্দমা পড়ে। আসামী সন্দেহে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার শ্রীরামপুরে যাওয়া-আসা ছিল। সে লোক বাস্তবিক দোষী কি না, সে সমস্ত ভাল করে জান্‌বার জন্যে ইনি ছদ্মবেশে শ্রীরামপুর যান। তারপর তোমরা সেই কাণ্ড কর। এদিকে এঁর এক মেয়ে ছিল বিবাহযোগ্যা। পাত্রও দেখা হল, পছন্দও অবশ্য হয়েছিল। বাড়ী এসে ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন; ক্রমে কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেল। আমরা মেয়ে দেখ্‌তে এলে মাধব বাবুই সব বলেছিলেন। তবে উনি বল্‌তে বারণ করেছিলেন বলে তোমাদের তখন বলিনি।"

এতক্ষণে হেমচন্দ্রের বিস্ময় প্রশমিত হইল। সে বলিল—"তা হলে আমাদের জন্যেই এ বিয়েটা হল, এটা নিশ্চয় বল্‌তে হবে।"

বড়দাদা হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—এ গৌরবটা তোমরা করতে পার। কিন্তু জিতুকে ঠকাতে গিয়ে তোমরাই ঠক্‌লে, আর সে জিতে গেল।"

হেম বলিল,—"এটাও আমাদের জয়। দেখুন না, আমরা ঠাট্টা করে যেটা কর্ত্তে যাই, সেটা সত্য হয়ে যায়। আর সত্যি ভেবে কর্ত্তে গেলে তো কথাই নেই।"

এমন সময় আহারের আহ্বান হইল। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া যথা-স্থানে গিয়া বসিলাম। আহার আরম্ভ হইল। পনর খানা লুচি উঠিয়া গেলে যখন হেমের পাতে আবার লুচি পড়িল, বড়দাদা বলিলেন "হেম কি লুচি দিয়ে জুতোর দাম তুলে নিচ্ছ?"

হেম পূর্ণমুখে বলিল "দাদা, এখন ব্যস্ত আছি।"

আহারের পর বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময় মেজদার শ্বশুর আমাদের কাছে আসিলেন। হেমের ও আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"দেখেছ তো বাবা, খেলায় যা আরম্ভ করেছিলে, সত্যিই তা হয়ে গেল।"

হেম বলিল—"ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র।"

তিনি বলিলেন—"ঠিক ঠিক। আমার সেই সজ্জাগুলো কিন্তু আর ফেরৎ দেবোনা বাবা; সেগুলো আমার ঘটক-বিদায়।"

আমরা তাঁকে প্রণাম করিলাম। হেম বলিল—"খেতে বসে আমরা তার ডবল দাম তুলে নিয়েছি।"

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

# শিবরূপ।

রজতের গিরি-নিভ—
শুভ্র কলেবর শিব,
ভালে চারু চন্দ্রলেখা—রতন-উজ্জ্বল—
অঙ্গে অঙ্গে কিবা দ্যুতি,
সুরগণ করে স্তুতি,
পঞ্চমুখে পঞ্চতত্ত্ব—ওঙ্কার-মঙ্গল!
নিষ্ঠুরতা—করুণায়
কি বিচিত্র সমাহার,—
নৃশংস পরশু করে—নেত্রে কামানল,
বরাভয় হস্তে মৃগ—করুণা-বিহ্বল।

নীল কণ্ঠে যায় দেখা—
সিন্ধুর সুনীল-লেখা,
তাহারি বিষাণ-গর্জ্জ,—ভৈরব হুঙ্কার ;
অমঙ্গল-আশীবিষ—
সেত না উগরে বিষ,
প্রকোষ্ঠে জগন তাই,—তারি কণ্ঠহার !
সদসৎ লীলা তাঁরি,
লীলায় শ্মশানচারী,
ব্যাঘ্রকৃত্তি কটিবাস, অঙ্গে ভস্মভার,
ত্যাগের মহিমামূর্ত্তি—ত্যাগ-অবতার।

সেই ত্যাগ-অঙ্কে কিবা,
ভস্ম কান !—শোভে শিবা,
হরগৌরী অভেদাঙ্গ—অভেদ মিলন !
ত্যাগ ভোগ একঠাঁই,
বিশ্বের বিভূতি তাই,
বিশ্ব সে শিবের রূপ—মূর্ত্ত প্রকটন !
শোক, তাপ, মৃত্যু-জরা,
মঙ্গলের রূপধরা,—
বুঝিবে মানব কবে,—দেখিবে কখন্—
বিশ্বের মঙ্গল মূর্ত্তি মেলিয়া নয়ন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

# দুইটি কথা।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় গত বৈশাখের মানসীতে 'তিনের মাহাত্ম্য' বর্ণনা করিয়া একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, কৌতুকপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। উহার উপসংহারটুকু বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; যেন ভক্ত-হৃদয়ের অমৃতধারা! পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম।

সত্যের নানা দিক্ আছে; মানুষের চিন্তাও ভিন্নপথগামী। ভিন্ন মত ও চিন্তার প্রকাশেই মানবীয় জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করে। তাহা মনে করিয়াই উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইল। বাদ প্রতিবাদ আমার অভিপ্রেত নহে; সে শক্তিও আমার নাই। বিশেষতঃ, পঞ্চানন বাবুর ন্যায় বিজ্ঞানবলসম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তির সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার ন্যায় মরণপথগামী দুর্ব্বল জনের পক্ষে একান্ত দুঃসাহস! তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী বালকদিগের মুখে ত কত কথাই শুনিয়া থাকেন, একথা দুটিও না হয় সেইরূপই মনে করিবেন। কেন না, বৃদ্ধ ও বালকে বড় একটা প্রভেদ নাই।

১। পঞ্চানন বাবু প্রসঙ্গক্রমে বলেন "হিন্দু এক ঈশ্বরের পূজা করেন কি না? অনেকে বলেন হিন্দু পাথরপূজা করে, মূর্ত্তিপূজা করে। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেন। পাথরকে কি পূজা করা যায়? মূর্ত্তির খড় কাঠ চুণ মাটি কি কেহ সজ্ঞানে পূজা করিতে পারে? × × × নিরাকার পরম-ব্রহ্মের পূজা হিন্দুশাস্ত্রমতে ত নিষেধ নাই। হিন্দুর শ্রেষ্ঠশাস্ত্র উপনিষদ এই পূজারই প্রচারক। কিন্তু নিরাকার পরমব্রহ্মের আকারই যিনি কল্পনা করিতে অক্ষম, তিনি যদি কোনও কল্পিত মূর্ত্তিতে পরমব্রহ্মের পূজা করেন তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে কেন?" ইত্যাদি।

আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রসঙ্গক্রমে বা অপ্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত লোকাচার সমর্থন করিয়া এইরূপ দুই একটি কথা বলিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, তাঁহারা যে কার্য্যে মনে সায় পান না, অথচ করিতে হয়, তাহার একটু সমর্থনের সুযোগ যেন কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। সে যাহাহউক, উদ্ধৃত কথার উত্তরে বলা যায়, "হিন্দু পাথর পূজা করে, মূর্ত্তি পূজা করে অর্থাৎ খড় কাঠের পূজা করে" কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু হিন্দু মূর্ত্তিপূজা করে সত্য। কাহার মূর্ত্তি। নিশ্চয়ই নিরাকার ব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি নহে! তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যেমন এলোকে

বিশাল মানব-পরিবার, তেমনি স্বর্গলোকে বিশালতর দেবপরিবার বর্ত্তমান। সেই দেবদেবিগণও আমাদের ন্যায় সুখদুঃখের অধীন এবং স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা ও সখা-সখী লইয়া কেহ বিষ্ণুলোকে, কেহ ইন্দ্রালয়ে, কেহ বা কৈলাসশিখরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহারাই মানবের হিতাহিত বিধান করেন এবং সময়ে সময়ে মর্ত্তে আগমন করিয়া ভক্তের পূজাগ্রহণ ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লীলাজ্ঞাপক মূর্ত্তির পূজাই প্রচলিত ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম। এই যে আশ্বিনে অম্বিকার আগমনী শুনিয়া হিন্দুর অশ্রুধারা বহিয়াছিল, বৎসরান্তে মায়ের মুখ দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা কি নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করিতে অক্ষম বলিয়া "কল্পিত মূর্ত্তিতে পরমব্রহ্মের পূজা" করিবার ফল? এখন আশ্বিনে যদি তুমি বিশ্বাসী হিন্দুর ঘরে যাইয়া বল "ওগো, আমরা নিরাকার পরমব্রহ্মের ধারণা করিতে পারি না বলিয়া ঐ মাটির মূর্ত্তিতে ব্রহ্মেরই পূজা করিতেছি।" তবে সেই ভক্ত বজ্রাহত হইয়া রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবেন "মা, তুমি আমার মা নও?"

শিক্ষার গুণেই হউক বা জগতের ক্রমোন্নতির গুণেই হউক নব্যহিন্দুর মনে এই দেবতত্ত্বে বিশ্বাস আর টিকিতেছে না। এই প্রবন্ধেই দেখিলাম, পঞ্চানন বাবুও ইন্দ্রের অমরপুরী লাভ করিতে একান্ত নারাজ! শিক্ষিত জনের উপযুক্ত স্বর্গলাভের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ আমাদের শিক্ষিতগণের জীবনে মহাসঙ্কট উপস্থিত। তাঁহারা পৌরাণিক দেবতত্ত্বে আর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অথচ উন্নত হিন্দুধর্ম্ম—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের পন্থাও ধরিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তাঁহারা "সাকার হউক নিরাকার হউক—উভয়ই ব্রহ্মের পূজা" এইরূপ কথা বলিয়া রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণের দোহাই দিয়া কোনরূপে আপনাকে প্রবোধ দিতে যত্ন করিতেছেন। কিন্তু তাহা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

২। পঞ্চাননবাবু খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের প্রসঙ্গে বলেন, "পিতার নিকট সন্তান একটু দূরত্ব অনুভব করে, পিতা যেন বড় গম্ভীর, বড় উচ্চে, বড় ছাড়া-ছাড়া। কিন্তু মা যে বড়ই পরিচিতা, মার কাছে সন্তান যেমন সহজে প্রাণ খুলিয়া শত আব্দার করিতে পারে, পিতার কাছে কিছুতেই সেরূপ পারে না। * * * এই দূরত্বের বাধা যাহাতে না থাকে, সেইজন্য হিন্দু চির-

কাল ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে।* * কিন্তু আধুনিক অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতে অনুসন্ধান করিয়াও সে তৃপ্তি পাই না। × × খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণে ভগবান্‌কে পিতৃরূপে কল্পনা করার জন্যই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি তত মধুর হয় নাই।" ইত্যাদি।

আমিও মা-নামের একান্ত ভক্ত। ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া, মা বলিয়া কাছে পাইয়া, আমি শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়াছি। দুঃখে শোকে রোগে বার্দ্ধক্যে দুঃখহরা মা-নামে তাপিত প্রাণ জুড়াইতেছি। এমন কি, এই মা-নামের গুণেই একদিন সেই অমৃতক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিব বলিয়া আশা করিতেছি। তথাপি মা-নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আমি এই বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। পিতার কাছে পুত্র একটু দূরত্ব অনুভব করিতে পারে, কিন্তু কন্যা কদাপি সেরূপ করে না। অনেক স্থলেই কন্যাগণ পিতার কাছে অতি সহজে প্রাণ খুলিয়া শত আব্দার করিয়া থাকে; সুতরাং সকল সন্তানই পিতাকে দূর দূর, ছাড়াছাড়া মনে করে, একথা সত্য নহে; অনেক সন্তান, বিশেষতঃ কন্যাগণ পিতৃভক্তিতে তন্ময়! আমার বিশ্বাস পঞ্চাননবাবু মা-নামে যেমন তৃপ্তি পান, অনেক উপাসক বিশেষতঃ উপাসিকা ভগবানকে পিতা বলিয়া তেমনি তৃপ্তি পান। লেখক বলেন "হিন্দু চিরকাল ভগবান্‌কে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছেন।" পঞ্চানন বাবুর "হিন্দু"র অর্থ যদি বাঙ্গালী হয়, অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এক চতুর্থাংশ শাক্তগণ যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে আমার বলিবার কিছু নাই। আর তাঁহার "চিরকাল" যে কতদিন, তাহা নির্ণয় করিবার ভার 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির' হস্তে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাস ও সাধনতত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণে ঈশ্বরকে পিতৃরূপে কল্পনা করা হয় নাই। যদিও এরূপ অনুকরণ আমি নিন্দনীয় মনে করি না—কেন না ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব যাহা খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তিভূমি, তাহা মানব মাত্রেরই সাধারণ-সম্পত্তি। কিন্তু উপনিষদই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ (অবশ্য তাহার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মবিধান বিনিঃসৃত সত্যধারা মিলিত হইয়াও এই মহাপ্রবাহের কলেবর বর্দ্ধিত করিতেছে) সেই উপনিষদের "ওঁ পিতা নোঽসি" প্রভৃতি মন্ত্র হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বরের পিতৃভাব মূলতঃ গৃহীত হইয়াছে।

পঞ্চানন বাবু ব্রহ্মসঙ্গীতের "প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম" গানেও প্রাণে আরাম পান নাই ; "হে জীবনস্বামী" শুনিয়া জীবনের স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ শব্দ মৃতধ্বনি মাত্র ; উহার পশ্চাতে যে রসময় পুরুষ বর্ত্তমান, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় না হইলে নামের দাম কি আছে? জীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলন না হইলে "হে জীবনস্বামী" কথায় তৃপ্তি হইবে কেন? যে 'রণছোড়' নামে মিরাবাই সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন, আমাদের কাছে উহা কর্কশ ধ্বনি মাত্র। যে "বাবা বেলা গেল" কথায় লালাবাবু ফকির হইয়া গেলেন, সেইরূপ কত কথাই ত আমরা অহরহঃ শুনিতেছি ; কিন্তু আমাদের বিষয়ের নেশা ত কিছুতেই ছোটে না! ফলতঃ কোন্ নামে কাহার প্রাণ ডুবিবে, কোন্ কথায় কাহার বাঁধন ছিঁড়িবে, তাহা কেহই বলিয়া দিতে পারে না। বিশ্ববাসী আমরা সকলেই ত সেই এক পথের পথিক, একই আনন্দধামের যাত্রী ; কেহ কাহাকেও পিছে ফেলিয়া যাইতে পারিব না ; সেই প্রেমসাগরের মহাটানে আমাদের সকলকেই "অনন্তের পানে" কেবলই ছুটিতে হইবে। পঞ্চানন বাবু সত্যই বলিয়াছেন, "ত্যাগ, সেবা ও বিনয়ই স্বর্গের সোপান!" যে দৈন্যে ধর্ম্মের আরম্ভ, যে তৃণাদপি সুনীচের মস্তকে ভক্তিধারা বর্ষিত হয়, আমরাও সেই অমূল্য সম্পদ লাভের জন্য কবি-কণ্ঠে প্রার্থনা করি :—

"আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিও হে আমায় তুমি সবার নীচে।
সবার শেষে যা বাকী রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ

# খেদা

১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে একদিন প্রাতঃকালে বাগানে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় আমার একটী বন্ধু আসিয়া সংবাদ দিলেন যে,—এবার জগৎমহারাজ খেদা করিবেন। উল্লাসে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম,—"ভাই, তবে বোধ হয় এতদিনে আমার বহুকালের সাধ পূর্ণ হইবে।"

অতি শৈশব হইতেই "খেদার" কথা শুনিয়া আসিতেছি। যূথবদ্ধ হস্তী-সমূহকে এক স্থানে এক সময়ে আবদ্ধ করার প্রথাকে "খেদা" বলে।

সুসঙ্গের মহারাজাগণ গারোপাহাড়ে প্রতি বৎসর খেদা করিয়া বহু হস্তী ধরিতেন, এবং সেই হস্তী বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতেন। দুর্ভগ্যবশতঃ এখন আর গারোপাহাড়ে খেদা করিবার তাঁহাদের সে অধিকার নাই। তখন গারোপাহাড় সুসঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ছিল। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া গারো-পাহাড় আসাম-রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন। এই আইন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২ আইন নামে খ্যাত। (Act xxii of 1869,—the Garo Hills Act.) কতিপয় বৎসর পর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ আইন অনুসারে আসাম প্রদেশে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্যের হস্তীধরা নিষিদ্ধ হইয়াছে। (Act VI of 1849 Elephant Preservation Act) ১৮৮৪ সনের ১৯শে মে তারিখের বিজ্ঞাপনী দ্বারা সুসঙ্গের মহারাজাদিগের হস্ত হইতে খেদার ক্ষমতা তুলিয়া লন। গভর্ণ-মেণ্ট বাহাদুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সুসঙ্গরাজকে অতি সামান্য অর্থ প্রদান করেন। সেই অর্থ গ্রহণের পর হইতেই তাঁহাদের গারোপাহাড়ে খেদা করিবার অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই অবধি বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট নিজেই ঐ পাহাড়ে খেদা করিতেন। প্রসিদ্ধ খেদাকারী সেণ্ডার্সন সাহেবের অধীনে এই খেদা হইত।

শৈশবে দেখিতাম, গারোপাহাড়ে খেদায় ধরা গভর্ণমেণ্টের হস্তীগুলি আমাদেরই বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া প্রতিবৎসর ঢাকায় লইয়া যাইত। তখন গভর্ণমেণ্টের খেদা আফিস ঢাকাতে ছিল। গত ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের পর খেদা-আফিস ঢাকা হইতে উঠিয়া ব্রহ্মদেশে স্থাপিত হইয়া-ছিল এবং সেই প্রদেশেই খেদা হইত। গারো-পাহাড়ে হস্তীর সংখ্যা

কমিয়া যাওয়াই খেদা আফিস স্থানান্তরিত হওয়ার প্রধান কারণ। পুনরায় গারোপাহাড়ে খেদা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশে কয়েক বৎসর খেদা করিয়া হাতীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সেখানে খেদা করা খুব ব্যয়সাধ্য এবং দুরূহ, তজ্জন্য আবার গারোপাহাড়ে খেদা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই পাহাড়ে হস্তীর সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। *

ময়মনসিংহের গৌরবরবি স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর এবং দেশবিখ্যাত দাতা রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুর মহোদয়গণও বহুবার গাড়োপাহাড়ে এবং স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যে খেদা করিয়াছেন। তাঁহাদের খেদায় ধৃত বহু হস্তী এখনো তাঁহাদের পিলখানায় বর্ত্তমান। তাঁহাদের নিকট যখন খেদার গল্প শুনিতাম, তখন আনন্দে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম—খেদা দেখিবার প্রবল বাসনা প্রাণে জাগিয়া উঠিত।

এবার আমাদের খেদা হইবে শুনিয়া হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল,—ভাবিলাম, খেদা দেখিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতি শৈশব হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, ভগবানের কৃপায় বোধ হয় এবার তাহা পূর্ণ হইবে।

খেদা হওয়ার সংবাদটা সত্য কি না নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্য রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের নিকট গেলাম,—শুনিলাম, সংবাদ সত্য; তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত ধলাই মনু ও দেওগাং নামক তিনটী দোয়াল,—অর্থাৎ উপত্যকা ভূমিতে দলবাঁধা হাতী সচরাচর পাওয়া যায়,—ত্রিপুরেশ্বরের নিকট হইতে সয়া পাঁচ আনা খাজনাতে বন্দোবস্ত লইয়াছেন। সয়া পাঁচ আনা খাজনার মানে,—খেদায় যত হাতী ধরা পড়িবে, তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তাহার সয়া পাঁচ আনা অংশ ত্রিপুরার মহারাজা পাইবেন। সময়—অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত। ইহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে আর খেদা করা যাইবে না। ইহাই ত্রিপুরা রাজ্যের নিয়ম।

---

* ময়মনসিংহ হইতে একটী প্রশস্ত রাস্তা দক্ষিণদিকে ঢাকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাদসাহী আমল হইতে এই রাস্তা বর্ত্তমান। কোন্ সময়ে এবং কে এই রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পশ্চিম দিকে এই রাস্তা মুক্তাগাছা হইয়া মধুপুরের গড়ের ভিতর দিয়া টাঙ্গাইল গিয়াছে। ইহার অন্য একটী শাখা বেগুনবাড়ী হইয়া জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেল হইবার পূর্ব্বে লোকে এই রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করিত। ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিমের তীর্থ প্রভৃতি স্থানে যাইবার ইহাই সোজা এবং প্রচলিত রাস্তা ছিল।

কিন্তু বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিয়ম ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক দোয়াল "ডাক" হয়। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিতে স্বীকৃত হন, তিনিই গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেই দোয়াল বা দোয়ালগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খেদা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন! টাকা অগ্রিম দিতে হয়। ইহাকে "রাজস্ব" বলে। তদতিরিক্ত প্রত্যেক ধৃত হস্তীর জন্য একশত টাকা রয়েলটি দিতে হয়।

এই বন্দোবস্তে লাভের সম্ভাবনা যত বেশী, লোকসানের আশঙ্কাও ততোধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে যে, যদি কেহ দশ হাজার টাকায় গভর্ণমেণ্টের দোয়াল বা দোয়ালগুলি ডাকিয়া রাখেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি একশত হস্তী ধরিতে পারেন, তবে তাঁহার যথেষ্ট লাভ। অন্যপক্ষে যদি দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি একটী হস্তীও ধরিতে না পারেন, তবে তাঁহার ক্ষতিও যথেষ্ট। কারণ, "রাজস্বের" টাকা তিনি আর ফেরত পাইবেন না।

কিন্তু স্বাধীন ত্রিপুরার নিয়মে বন্দোবস্ত লইলে পূর্ব্বের তুলনায় লাভও খুব বেশী নয়, লোকসানও তদ্রুপ। কারণ, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত হস্তীই ধৃত হউক না কেন, প্রত্যেক হস্তী নিলাম অথবা বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তাহার সয়া পাঁচ আনা অংশ ত্রিপুরেশ্বরকে দিতেই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের তুলনায় লাভ কম। পক্ষান্তরে, যদি একটী হস্তীও ধরা না পড়ে, তবে আর খাজনা দিতে হইবে না। সুতরাং তুলনায় লোক্সানও কম।

আমাদের এই খেদার অংশী তিনজন—রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের—আট আনা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর—চার আনা। ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর চার আনা।

এই খেদার সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য চট্টগ্রাম নিবাসী আহাম্মদ মিঞা জমাদার নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়।

খেদা করিতে হইলে এইরূপ জমাদারগণের সহায়তা গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই জমাদারগণ খেদাকার্য্যে খুব দক্ষ। ইহাদিগকে বহু বৎসরাবধি রীতিমত খেদার কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। বহু বৎসর খেদার কার্য্য করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিলে ইহারা 'জমাদার' পদবী প্রাপ্ত হয়। ইহাদের নিপুনতার উপরেই খেদার সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

জমাদার যদি বিশেষ দক্ষ না হয়, তবে প্রায়ই খেদায় অকৃতকার্য্য হইতে হয়। কোন্ দোয়ালে কোথায় কি পরিমাণ হস্তী থাকে; সেই সব দোয়ালের কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে হস্তী সকল দল বাঁধিয়া নামিয়া আসে; সেই সব স্থানে যাতায়াতের রাস্তার সুবিধা অসুবিধা, কি প্রকারে কোন্ রাস্তায় খেদায় ধৃত হস্তীগুলি নামাইয়া আনা সুবিধাজনক, ইত্যাদি বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের, এমন কি সিংহলেরও যে সকল প্রদেশে হস্তী পাওয়া যায় এবং খেদা হইয়া থাকে, তাহার প্রায় সকল প্রদেশেরই খেদাকার্য্যে ইহারা যোগদান করিয়া রীতিমত শিক্ষালাভ করে।

আহাম্মদ মিঞা জমাদারের সহিত চুক্তি হয় যে,—ধলাই, মনু ও দেওগাং নামক তিনি দোয়ালে ১৩১৩ সনের অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্রমাস মধ্যে, অন্ততঃ যাট্‌টী হস্তী তাহাকে ধরিয়া দিতে হইবে। চারফুট পর্য্যন্ত উচ্চ বাচ্ছাহাতী গণনায় ধরা হয় না। অন্ততঃ আঠার জন পাঙ্গালী ও চারশত কুলী এই খেদা কার্য্যের জন্য তাহাকে লইতে হইবে। তজ্জন্য তাহাকে আঠার হাজার টাকা দেওয়া যাইবে। যদি উপরিউক্ত সংখ্যক হস্তী সে ধরিয়া দিতে না পারে, তবে তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। আর, যদি যাট্‌টী হস্তী অপেক্ষা বেশী ধরিয়া দিতে পারে, তবে সেই অতিরিক্ত সংখ্যক প্রত্যেক হস্তীর জন্য তাহাকে দুইশত টাকা বেশী দিতে হইবে। উপরিউক্ত সর্ত্ত অনুসারে একটী চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয়। আহম্মদ মিঞার দেশস্থ কয়েকজন অর্থ-শালী লোক তাহার জামীনস্বরূপ থাকিতে স্বীকার করিয়া চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করে। চুক্তিপত্র রেজেষ্টারী করা হয়।

খেদা দেখিতে যাইব বলিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইয়াছিলাম; কিন্তু হায়! যখন শুনিলাম যে খেদা দেখিতে যাইবার দিন ২৬শে অগ্রহায়ণ স্থির হইয়াছে এবং সম্ভবত এক মাস মধ্যেই অর্থাৎ পৌষমাসের মধ্যেই তাঁহারা খেদা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন,—তখন যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্টে একেবারে দমিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন ব্যক্ত করা অসম্ভব।

২৬শে অগ্রহায়ণই সকলে খেদা দেখিতে রওনা হইবেন স্থির হইয়া গিয়াছে। সূচনা হইতেই খেদা দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে;—কত টাকা ব্যয় হইবে, তাহার হিসাব করা, ফর্দ্দ ধরা, কতজন লোক সঙ্গে যাইবে, কে কে সঙ্গে যাইবে, কি কি জিনিষ নিজেদের সঙ্গে যাইবে, কোন্ কোন্ জিনিষ পূর্ব্বেই পাঠাইতে হইবে, কখন কোন্

ট্রেণে যাওয়া সুবিধাজনক ইত্যাদি বিষয় লইয়া দিন রাত্রি পরামর্শ, তর্ক মীমাংসা চলিয়াছে।

দশ বার দিন পূর্ব্ব হইতেই যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। সে এক বৃহৎ ব্যাপার! আবশ্যক দ্রব্যাদি বাঁধা, প্যাক করা, তাহার লিষ্ট করা; কর্ম্মচারী, বরকন্দাজ, পাচক, চাকর নাপিত, ধোবা প্রভৃতি যাহারা সঙ্গে যাইবে তাহাদের নামের তালিকা করা।

বহু লোকের পরিশ্রম ও চেষ্টায় ক্রমে উদ্যোগ-পর্ব্ব শেষ হইল। ২৬শে অগ্রহায়ণ রাত্রির ট্রেণে ময়মনসিংহ ষ্টেশন হইতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের আলিনগর ষ্টেশন পর্য্যন্ত একখানা প্রথম শ্রেণীর, দুখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর ও একখানা তৃতীয় শ্রেণীর দুই কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া বহু লোকজন সহ রাজা জগৎকিশোর, কুমার জিতেন্দ্রকিশোর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চিকিৎসক গেলেন—ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন।

পূর্ব্বেই কতক লোকজন ও আসবাবপত্র এবং হস্তীগুলি রওনা হইয়া গিয়াছিল। হস্তীগুলি সব হাঁটিয়া যাইবে,—রেল বা ষ্টীমারে পাঠান সুবিধা হইবে না বুঝিয়া বহুপূর্ব্বেই হস্তীগুলি রওনা করা হইয়াছিল। লোকজন প্রভৃতি কমলপুর নানক স্থানে ছাউনী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, যাহাতে সেখানে যাইয়া নিজেদের থাকিবার ও খাইবার কোনও অসুবিধা না হয়।

আলিনগর ষ্টেশন হইতে কমলপুর বার মাইল; ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া কিম্বা হাতীতে যাইতে হয়।

আহাম্মদ মিঞা জমাদার তাহার পাঞ্জালী ও কুলীগণ সহ কমলপুরেই আড্ডা করিয়াছে। তাহারই নির্দ্দেশমত কমলপুরে প্রথম ছাউনী হইয়াছে। কমলপুর হইতেই আহাম্মদ মিঞা তাহার পাঞ্জালীদিগকে হাতীর খোঁজ করিবার জন্য নানা দিকে পাঠাইয়াছে।

আরণ্য-হস্তীযূথের অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত লোকদিগকে "পাঞ্জালী" কহে। খুব সাহসী, পরিশ্রমী, সহিষ্ণু ও বিচক্ষণ না হইলে পাঞ্জালীর কার্য্য করা অসম্ভব। গভীর পার্ব্বত্য-অরণ্যে হস্তীযূথের অনুসন্ধান করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। পাঞ্জালীগণ নানা উপায়ে হস্তীযূথের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তাহারা পার্ব্বত্য-লোকদিগের নিকট হইতে অথবা "বন-কামলা"দের প্রমুখাৎ কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে হস্তীযুথ অবস্থান করিতেছে তাহা জানিয়া লয়।

যাহারা কাঠ কাটিতে পর্ব্বত প্রদেশে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তাহাদিগকে “বন-কামলা” বলে।

পাঙ্গালীগণ হস্তীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কিম্বা হস্তীযূথদ্বারা ভগ্ন বন-জঙ্গলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া হস্তীসমূহের গমনপথ অনুমান করিয়া লয়। যে স্থানে পদচিহ্ন প্রভৃতি কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই, সেখানে পার্ব্বত্য নদী কিম্বা ঝরণার ধার দিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহারা অগ্রসর হয়। কারণ, নদী বা ঝরণাতে হস্তীসকল নিশ্চয়ই জলপান করিতে আসে। নদী বা প্রস্রবণে নামিয়া জলপান করাতে কিম্বা তাহা পার হইয়া অন্যত্র যাওয়াতে জল ঘোলা হইয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া এবং সে স্থানে যে পদচিহ্ন থাকে, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া পাঙ্গালীরা কল্পনা করিয়া লয় যে, কোন্ দিকে হস্তীগুলি গমন করিয়াছে।

পর্ব্বত বা উপত্যকার অনেক স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকা থাকে; তাহাকে লোণা কহে। হস্তীগণ এই লোণা খাইয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের পক্ষে জোলাপের কার্য্য করিয়া থাকে (purgative)। পাঙ্গালীগণ লোণার সন্ধান করিয়া তথায় গমন করে। নিকটে হস্তীসকল থাকিলে লোণাতে তাহাদের খাওয়ার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবে, অথবা হস্তীযূথকে সেখানে লোণা খাইবার নিমিত্ত আসিতেই হইবে।

এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বন করিয়া পাঙ্গালীগণ হস্তীযূথের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যখন তাহারা হস্তী-সমূহ দ্বারা বৃক্ষাদি ভগ্ন-জনিত ও তাহাদের কর্ণ-সঞ্চালন-জাত শব্দ শ্রবণ করে, তখন তাহারা হস্তীযূথ নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিয়া হস্তীসমূহের অবস্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়। ঐ সময় তাহারা সেই যূথে কতগুলি হস্তী থাকিতে পারে, তাহারও একটা অনুমান করিয়া লয়। অনুমান প্রায়ই অনেক পরিমাণে ঠিক হয়।

বন্যহস্তীর, বিশেষতঃ হস্তীযূথের নিকটবর্ত্তী হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। দৈবাৎ যদি কেহ বন্যহস্তীর দৃষ্টি পথে পতিত হয় তবে তাহার মৃত্যু ধ্রুব। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে কোনও সময়ে হয় ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা হঠাৎ কোনও কৌশল উদ্ভাবন করিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাহা খুবই বিরল।

পাঙ্গালীগণ সকলে মিলিয়া একসঙ্গে একদিক গমন করে না। তাহারা

নানা দলে বিভক্ত হইয়া নানা দিকে হস্তী অনুসন্ধানার্থ অরণ্যে প্রবেশ করে। এক এক দলে এক জন কি দুইজন পাঙ্গালী ও বহুসংখ্যক কুলী থাকে। ইহাদের পরিধানে পাজামা বা লঙ্গী, গায়ে কোট, মাথায় পাগড়ী বা টুপি, পায়ে জুতা। প্রত্যেকের সঙ্গেই কম্বল বা মোটা গরম চাদর থাকে,—তাহা পথ চলিবার সময় পিঠে বাঁধিয়া লয়।

আত্মরক্ষার্থ অতি সাধারণ দোনলা গাদা বন্দুক (muzzle loader), দা ও ছোরামাত্র সঙ্গে লইয়া পাঙ্গালীগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করে;—সেখানে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক, বিষধর সর্প প্রভৃতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে! প্রতি মুহূর্ত্তে এই সব বন্য হিংস্র-প্রাণীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইহাদের জীবন নাশের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহারা সে সব কথা নিমেষের তরেও চিন্তা করে না। ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত-প্রাণালীতে প্রস্তুত ও বহু সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রে ও লোকজনে সজ্জিত হইয়া অত্যন্ত সাহসী স্বদেশী কিম্বা বিদেশী শিকারীদেরও এইরূপ বিপদ-সঙ্কুল গভীর বনে প্রদেশ করিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

ইহারা সকলেই খাঁটী বাঙ্গালী,—তবু বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ!!

আহারের জন্য পাঁচ ছয় দিনের উপযুক্ত চিড়া, গুড়, পাউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতি, যাহা বিনা রন্ধনে খাওয়া যাইতে পারে, মাত্র তাহাই পকেটে ও পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া লইয়া যায়। পিপাসা লাগিলে অঞ্জলি পূরিয়া ঝরণা বা পার্ব্বত্য নদীর জল পান করে।

পাঙ্গালীগণ যত দিন জঙ্গলে হাতীর খোঁজ করিতে থাকিবে, ততদিন বনের মধ্যে রন্ধন করা নিষিদ্ধ। কারণ, হস্তীর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। ইহারা দেড় মাইল, দু মাইল দূর হইতেও গন্ধ পাইয়া থাকে। যে গন্ধে ইহারা অভ্যস্ত নয়, সেই গন্ধ ইহাদের নাসিকায় প্রবেশ করিলেই ইহারা ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং সেস্থান হইতে প্রায়ই পলায়ন করে!

যদি নিকটে কোনও পার্ব্বত্য-জাতির বাসস্থান থাকে তবে পাঙ্গালীগণ সমস্ত দিন হস্তী অন্বেষণ করিয়া রাত্রিতে সেই "বস্তিতে" ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করে এবং রন্ধন করিয়া আহার করে। কিন্তু সে সুযোগ প্রায়ই তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। কারণ, অরণ্য-হস্তীগণ লোকালয় হইতে বহুদূরবর্ত্তী গভীর অরণ্যে বিচরণ করে। যদিও সময় সময় রাত্রিকালে আহার করিতে করিতে হস্তীযূথ লোকালয়ের

নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু সেখানে তাহারা অবস্থান করে না; রাত্রির মধ্যেই লোকালয় হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া অবস্থান করে।

যেখানে পার্ব্বত্য-জাতির কোনও "বস্তি" নাই, তথায় রাত্রিতে উচ্চ বৃক্ষ-শাখাই পাঙ্গালীদের একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্রামস্থল। এক শাখায় উপবেশন করিয়া অন্য শাখায় পৃষ্ঠদেশ স্থাপন পূর্ব্বক হেলান দিয়া স্বীয় গামোছা বা কাপড় দ্বারা সেই শাখা বেষ্টন করিয়া দুই হস্তের নিম্ন দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া বক্ষদেশে গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া লয়, যাহাতে তন্দ্রার ঘোরে বৃক্ষশাখা হইতে পড়িয়া না যায়।

ইহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিপদ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

পাঙ্গালীগণ হস্তীযূথের সন্ধান করিতে পারিলেই অতি দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া জমাদারকে সংবাদ দেয়। জমাদার তৎক্ষণাৎ সমগ্র কুলীগণ সহ হস্তীযূথ "বেড়" দিবার জন্য যাত্রা করে।

কখনও কানেও জমাদার পাঙ্গালীদের কোনও দলের সহিত স্বয়ং হস্তীযূথ অনুসন্ধানার্থ গমন করে। জমাদার যে দলে থাকে যদি সেই দল হস্তীর সন্ধান পায়, তবে জমাদার সঙ্গী লোকদের সেই স্থানেই রাখিয়া, স্বয়ং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুলীদের লইয়া অতি সত্বর পুনঃ তথায় গমন করে। কিন্তু, যদি জমাদার যে দলে থাকে সে দল ছাড়া অন্য পাঙ্গালীর দল হস্তীযূথ অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয় এবং ফিরিয়া আসিয়া জমাদারের খোঁজ করিতে বিলম্ব হয়, তবে অনেক সময় হস্তী-যূথকে পুনঃ সে স্থানে না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য জমাদার বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে পাঙ্গালীদের সহিত গমন করে না। কুলীদের লইয়া নির্দ্দিষ্ট আড্ডাতে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

রাজা জগৎকিশোর ও শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকিশোরের পত্রে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই নির্ব্বিঘ্নে কমলপুরে পৌছিয়াছেন, এবং তখনও পর্য্যন্ত পাঙ্গালীগণ হাতীর খোঁজ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

২রা পৌষ আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। কংগ্রেস অবসানেও আমাকে কয়েকদিন বিশেষ দরকারী কার্য্যের জন্য কলিকাতায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রায়ই শ্রীমান জিতেন্দ্রকিশোরের পত্র পাইতাম, এবং প্রত্যেক পত্রেই সংবাদ পাইতাম যে, তৎকাল পর্য্যন্তও পাঙ্গালীগণ হস্তীযূথের সন্ধানলাভে সমর্থ হয় নাই। প্রত্যেক পত্রই আমাকে আশা ও আনন্দ প্রদান করিত।

হস্তীযূথের সন্ধান প্রাপ্তিতে যতই বিলম্ব হইতেছিল, আমার খেদা দেখিবার আগ্রহও ততই প্রবল হইতেছিল।

২৪ শে পৌষ খেদা দেখিতে রওনা হইব স্থির করিয়া শ্রীমান জিতেন্দ্রকিশোরকে টেলিগ্রাম করিলাম। আলিনগর ষ্টেশনে হাতী পাঠাইবার জন্যও সংবাদ দিলাম।

২৪শে পৌষ যাত্রার দিন শুভ নয়; সেই জন্য আমার কলিকাতার আত্মীয়গণ অশুভ দিনে কিছুতেই আমাকে যাত্রা করিতে দিলেন না। বাধ্য হইয়া আমাকে ২৫শে পৌষ প্রাতে চাটগাঁ মেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে হইল।

খুব ভোরে উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, চা খাইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার পরিধানে শিকারীর পোষাক—নিকার স্যুট; পায়ে মোটা হোস্ ও বুট জুতা; গলায় হ্যাণ্ড-ক্যামেরা ঝুলান; হাতে—আত্মরক্ষা ও বাবুসজ্জা-শোভনকারী আমার চিরসঙ্গী বিন্ধ্যাচলী বাঁশের লাঠী। রৌপ্য-মণ্ডিত-মস্তক আমার অতিপ্রিয় এই লাঠীখানি দেখিলেই আমার মনে হয়,—সে যেন নিয়তই হাসিতেছে। তাহার দেহ লাল, মস্তক—রজতশুভ্র। যেন রজগুণের উপর সত্ত্বগুণ প্রতিষ্ঠিত। সে খোষামোদ করিতে জানে না;—লোকে তাহাকেই তৈল মাখাইতে ব্যস্ত!

ষ্টেশনে পৌছিয়া টিকিট কিনিয়া আমি ট্রেণে দ্বিতীয়শ্রেণীর একটি কামরায় উঠিলে, আমার সঙ্গী চাকর রামপ্রসাদ আমার জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিয়া চাকরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে চড়িবার জন্য প্রস্থান করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রার বাঁশী বাজিয়া উঠিল,—ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। কুয়াসায় চারিদিক আবৃত,—স্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তথাপি জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া, সেই ঝাপ্‌সা গাছপালা, প্রান্তরে পশুপক্ষীগুলির আহার অন্বেষণের ব্যগ্রতা, লোকজনের কর্ম্মারম্ভের ব্যস্ততা; ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোকের ভিড়, নদী, পুকুর, খাল, রাস্তা-ঘাট, কুটীর অট্টালিকা, বাজার প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

এক কামরায় আমরা দুজন যাত্রী,—একটী সাহেব ও আমি। সুতরাং উভয়েই নীরব। আমার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল, তাই আমারও সে সময় কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। অন্য সময় হইলে সাহেব কথা না বলিলেও আমিই অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিতাম।

গাড়ী গুড় গুড় করিয়া হেলিয়া দুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলিতেছিল, আমার হৃদয় ও যেন দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া আনন্দে নাচিতেছিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় গোয়ালন্দে পৌছিয়া চাঁদপুর এক্‌স্‌প্রেস্ ষ্টীমারে উঠিয়া ক্যাবিনের একটী আসন দখল করিয়া রাখিলাম। রামপ্রসাদ কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া কিছু পরে আসিয়া যথাস্থানে জিনিসগুলি রক্ষা করিল। তাহাকে এখানেই কিছু জলযোগ করিয়া লইবার জন্য উপদেশ দিয়া, চারিদিকের দৃশ্য ও লোকজনের ভিড় দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এমন সময় চাঁদনী হইতে সদ্য ক্রীত হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-জুতা পরিহিত একটী বাঙ্গালী যুবক আমার পশ্চাত দিক হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমারই দখলীয় ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া; প্রকাণ্ড একটী ট্রাঙ্ক ও প্রকাণ্ড একটী বিছানা কুলীর মাথা হইতে নামাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। ছোট-খাট একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর কুলী মজুরী লইয়া প্রস্থান করিল।

ভদ্রলোকটীর পোষাক পরিবার কায়দা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, তিনি সাহেবী পোষাক পরিতে একেবারেই অভ্যস্ত নন। হঠাৎ একটী জিনিসের প্রতি নজর পড়ায় লোকটীর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল।—সেই যুবকের অর্দ্ধোন্মুক্ত কোটের ঠিক ঊর্দ্ধে কংগ্রেস ডেলিগেটদের "ব্যাজ"—নীলাভ রেশমী ফুলপিন দ্বারা আঁটা। বোধ হয় ডেলিগেট স্বরূপে তিনি কংগ্রেসে গিয়াছিলেন। বুঝিলাম—যুবকটী মোটেই সহুরে-সপ্রতিভ লোক নয়।

সেই ব্যাজটীর দিকে যুবকের সঘন গর্ব্বোৎফুল্ল-দৃষ্টি আমাকে তাহার সহিত পরিচিত হইবার ও তাহাকে লইয়া একটু আমোদ করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম-সুখ-উপভোগ করিয়া যুবকটী ক্যাবিন হইতে বাহিরে আসিয়া বাট্‌লারকে খানার অর্ডার দিলেন। তখন ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। খানা প্রস্তুতই ছিল; আদেশমাত্রেই খানসামা ক্যাবিনের টেবিলে, টেবিল-ক্লথ বিছাইয়া তদুপরি কাঁটা, চামচ, ছুরী, ছোট একটী প্লেটে দু স্লাইস রুটী, সস্, লবণ প্রভৃতি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া গেল। অল্পক্ষণ পর ভিন্ন একটী প্লেটে দুটুক্‌রা মাছের ফ্রাই ( ভাজা ) আনিয়া টেবিলে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমিও ভদ্রলোকটীর সহিত আলাপ করিবার মানসে ক্যাবিনে যাইয়া আমার আসনে উপবেশন করিলাম। দেখি, ভদ্রলোকটী দক্ষিণ হস্তে কাঁটা ও বাম হস্তে ছুরী ধরিয়া অতি কষ্টে সেই ভর্জ্জিত মৎস্য হইতে এক টুক্‌রা কাটিয়া মুখে দিবার

চেষ্টা করিতেছেন। দেখিয়া আমার হাসিও পাইল, রাগও হইল। ব্যর্থ অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদিগকে কতই না নাকাল হইতে হয়।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম। খানসামা প্লেট্ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন প্রকারের কিছু আনিবার জন্য পুনঃ প্রবেশ করিয়া বাবুটীর খাওয়ার ভঙ্গি দেখিয়া সকৌতুকে মুচ্‌কি হাসিল। সম্ভবতঃ খান্‌সামাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ভাজা মাছটুকু নিঃশেষ করিবার মানসে তাড়াতাড়ি যেমন তিনি কাঁটা দ্বারা এক টুক্‌রা ফ্রাই মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট করাইতে যাইবেন, অমনি কাঁটার খোঁচা তালুতে লাগিয়া তথা হইতে রক্ত বাহির হইয়া গেল। বাবুটি তখন বিকট মুখভঙ্গী করিয়া, রুমাল দ্বারা মুখ মুছিবার ছলে মুখ ঢাকিলেন; বোধ হইল যেন যে রক্ত বাহির হইতেছিল তাহা জিভ দিয়া চুষিয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং প্লেট্ পরিবর্ত্তন করিতে খান্‌সামাকে ইঙ্গিত করিলেন। খান্‌সামা অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া ভুক্তাবশিষ্ট ফ্রাই সহ সেই প্লেট্ ও ব্যবহৃত কাঁটা, ছুরি টেবিল হইতে অপসারিত করিল। আহা! বেচারী ভাজা মাছটুকুর অর্দ্ধেকও খাইতে পারে নাই!

আমি বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মশাইর খুব লেগেছে কি? রক্ত বেরিয়েছে বোধ হয়?" তিনি অপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, বিশেষ কিছুই না।"

খান্‌সামা পুনরায় অন্য এক প্লেটে সঝোল মোগলাই রোষ্ট ও সদ্য পরিস্কৃত কাঁটা, ছুরী আনিয়া তাহার সম্মুখে রক্ষা করিল। ভদ্রলোক আবার ঠিক সেই উল্টা নিয়মে ছুরী কাঁটা ধরিয়া অতি কষ্টে একটুকরা কাটিয়া বদনবিবরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্বিতীয়বার মাংস কাটিতে চেষ্টা করা মাত্র হঠাৎ কেমন করিয়া সঝোল মাংস ও প্লেট্ একেবারে উল্টাইয়া গিয়া তাঁহার নূতন পোষাকের উপর আসিয়া পড়িল। ভদ্রলোক একেবারে বেকুব হইয়া গেল! ভাগ্যে প্লেট্‌খানা হাঁটুর উপরেই ছিল, তাহা না হইলে ডেকের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহাকে তাহারও মূল্য দিতে হইত। তাড়াতাড়ি ছুরী, কাঁটা রাখিয়া প্লেট্‌টী উঠাইয়া টেবিলে স্থাপন পূর্ব্বক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাপড়ের দাগগুলি মুছিতে লাগিলেন। সে দাগ কি সহজে উঠিবার!

এবার আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। খানসামাও হাসিতে লাগিল। বেচারা বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

তখন আমি তাঁহাকে ছুরী, কাটা ছাড়িয়া হাত দিয়া খাইতে বলিলাম,

তিনিও কথাটা রাখিলেন ; এবং বেশ পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক আহার সমাপ্ত করিলেন। পরে, আমি তাঁহাকে ধুতি চাদর পরিতে বলায় তাহাতেও স্বীকৃত হইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিলেন।

আমি ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া তাহার বিশালত্বের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম—বিপুল, ভীষণ নদী—এই পদ্মা। বর্ষায় তাহার মূর্ত্তি প্রলয়ঙ্করী! যদিও শীতের সময় পদ্মার স্থানে স্থানে চর পড়ে, তথাপি তাহাতে তাহার বিশালত্বের কিছুই খর্ব্ব করিতে পারে না।

আমাদের ষ্টীমার পদ্মার একদিকের তীরের খুব নিকট দিয়া যাইতেছিল। দূরে বহুদূরে "পরপার দেখি আঁকা তরুছায়া মসী-মাথা গ্রামখানি" একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখার মত দেখাইতেছিল।

"মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ" আসিতে লাগিল। আমাদের ষ্টীমারও পদ্মা ছাড়িয়া মেঘনা বা মেঘনাদে পড়িল। মেঘনাও পদ্মার মতই বিস্তৃত, পদ্মার মতই ভয়ঙ্কর। মেঘনা—নদ, পদ্মা—নদী। উভয়ের মিলন কি অপূর্ব্ব!

দিবা প্রায় অবসান। লাজ-নম্র সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবে শান্তির ছায়া বিস্তার করিতেছে। দিন রাত্রির এই মধুর সন্ধিক্ষণে আমাদের ষ্টীমারও পদ্মা এবং মেঘনার মিলনস্থানে উপস্থিত!

কি পুণ্যময় এই মিলনক্ষণ! আমার দেহ মন পবিত্র হইয়া গেল। আমার ক্ষুদ্র আত্মাকে বিশ্বাত্মার সহিত মিশাইয়া দিবার জন্য প্রাণের ভিতর হইতে যেন একটা খুব জোর তাগিদ্ অনুভব করিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে সাদা জলে সোণা ঢালিয়া, আকাশে বর্ণবৈচিত্র্য ছড়াইয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশ প্রান্তে ডুবিয়া গেলেন।

আমাদের ষ্টীমার যখন চাঁদপুর পৌছিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। মেল ট্রেণ আলিনগর থামে না, সুতরাং মিক্স্‌ট ট্রেণে রওনা হইলাম।

সেই ভদ্রলোকটী এবং আমি ট্রেণেও একই কামরায় উঠিয়াছিলাম। সে দিন যাত্রীর ভিড় ছিল না। আমাদের কামরায় মাত্র আমরা দুজনেই ছিলাম। ভদ্রলোকটীর সহিত পরে আমার বেশ একটু সদ্ভাব হইয়াছিল। লোকটী নেহাৎ ভালমানুষ এবং খুব সরল।

"একে কৃষ্ণপক্ষনিশি ঘোর অন্ধকার," তায় চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন, সুতরাং ট্রেণ ছাড়া মাত্রই শুইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখি রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইলাম।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটী সমসেরনগর ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন—নিকটেই তাঁর বাড়ী। তখন আমি একা, তাই বাহিরের প্রকৃতি আমার মন আকৃষ্ট করিল। কি বিরাট সৌন্দর্য্যে ভূষিত এই প্রদেশ! ট্রেণ চলিয়াছে—কোথাও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, কোথাও পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া, পাহাড়ে উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তুলিয়া, কভু দ্রুত, কভু মন্থরগমনে সে চলিয়াছে।

সেই জনহীন অরণ্যের মাঝে মাঝে চা-বাগানগুলিকে দেখিয়া দৈত্যরাজের মায়া-পুরীর কথা মনে হইতেছিল। কিন্তু, আবার যখন সেই "কুলি-কাহিনী"র কথা স্মরণপথে উদিত হইল, তখন ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এত গরল!!

বেলা প্রায় নয়টার সময় ট্রেণ আলিনগর ষ্টেশনে পৌছিল। ষ্টেশনেই দুটী হাতী এবং লোকজন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি একদিন বিলম্বে আসাতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। কারণ, তাহারা ষ্টেশনে পূর্ব্বের দিনই আসিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়াই জিনিষগুলি ও রামপ্রসাদকে এক হাতীতে তুলিয়া দিয়া নিজে দ্বিতীয় হাতীতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ কমলপুরাভিমুখে রওনা হইলাম।

ষ্টেশনেই শুনিলাম যে ২৫শে পৌষ, অর্থাৎ আমি যেদিন কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি, ঠিক সেইদিন সংবাদ আসিয়াছে যে "ভাত খাউরীর" হাওড়ে একদল হাতীর "বেড়" দেওয়া হইয়াছে। সেই স্থানে যাইবার দিন ২৭শে ঠিক হইয়াছে। উপযুক্ত সময়েই আমি রওনা হইয়াছিলাম। ভগবানকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

বৈকালে প্রায় ৪টার সময় কমলপুর পৌছিলাম। তিন চার মাইল বিস্তৃত কমলপুর গ্রামখানির চারিদিক বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতশ্রেণী প্রাকারের ন্যায় অবস্থিত। ধলাই নদী কমলপুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া কুলু কুলু রবে নিয়ত প্রবাহিত। নদীর ঠিক উপরেই প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দূর হইতে তাম্বুগুলি খুব সুন্দর দেখাইতেছিল।

নদীর যে পারে আমাদের শিবির, সেস্থান স্বাধীনত্রিপুরা-রাজ্যভুক্ত, অন্য পারে ব্রিটিশরাজ্য। ধলাই নদীই এখানে উভয়রাজ্যের প্রাকৃতিক সীমারেখা।

আমি শিবিরে পৌছামাত্র সকলেই আসিয়া হাতীর "বেড়" পড়ার সংবাদ দিলেন; তাঁহারা জানিতেন না যে, আমি পূর্ব্বে রাস্তাতেই সে সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি। একটু আমোদ করিবার উদ্দেশ্যে সমবয়সীদিগকে লক্ষ্য করিয়া

বলিলাম—"তোমরা কতকগুলি অলক্ষুণে লোক এখানে আসিয়াছ, হাতী পাওয়া যাইবে কেন? দেখ আমার যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই "বেড়ের" খবর আসিয়াছে। তোমরা মনে করিয়াছিলে যে, আমাকে বাদ দিয়াই নিজেরা খেদা দেখিয়া যাইবে। আমার অদৃষ্টে এবার খেদা দেখা লেখা আছে, তোমরা বাদী হইলে কি হয়! আমার কংগ্রেস্ দেখাও হইল, খেদা দেখাও হইবে। তোমরা এতদিন এখানে বসিয়া নদীর ঢেউ গণিতেছিলে, আর আমার কথা মনে করিয়া আপশোষ করিতেছিল।" এই সব কথা বলিয়া তাহাদিগকে বেশ একটু চাপান দিলাম। সকলই হাসিতে লাগিলেন।

কালীপুরের জমিদার প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ও "ভারত-ভ্রমণ"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকান্ত এবং জ্ঞাতি ভ্রাতুস্পুত্র ও কালীপুরের অন্য হিস্যার জমিদার সুকবি, সৌম্যকান্তি শ্রীমান্ বিজয়াকান্ত ১৯শে পৌষ খেদা দেখিবার উদ্দেশ্যে কমলপুর আসিয়াছেন। নরেন্দ্র ও বিজয়কে পাইয়া খুব আনন্দ হইল।

শুনিলাম গোবরডাঙ্গার জমিদার বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়গণ হস্তীর সন্ধানে অযথাবিলম্বহেতু উদ্বিগ্ন হইয়া যে অরণ্যে আহাম্মদ মিঞা পাঞ্জালীসহ হস্তী অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, তদভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন। আহাম্মদ মিঞার কার্য্যে সন্দিগ্ধ হইয়া সকলের পরামর্শানুসারেই তাঁহারা তথায় যাত্রা করিয়াছিলেন,—সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা অর্দ্ধপথেই হাতী "বেড়" দেওয়ার সংবাদ পাইয়াছেন। এই সংবাদ সহ একটী লোককে কমলপুর শিবিরে প্রেরণ করিয়া তাঁহারা দ্রুতগতিতে বেড়ের স্থানে গমন করিয়াছেন।

শুনিলাম কমলপুরে পৌছার পর হইতেই তাঁহারা নিজেদের হাতীগুলিকে প্রতিদিন "দলিলি" করাইয়াছেন। কোটে আবদ্ধ হস্তীগুলিকে বাঁধিয়া বাহির করিবার সময় ও পরে পালিত হস্তীগুলি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য করাইতে হইবে তাহার রিহার্শেল দেওয়ার নাম "দলিলি" করা। আমাদের হাতীগুলি শিকারের কার্য্যেই শিক্ষিত, খেদার কার্য্যে ইহারা মোটেই অভ্যস্ত নয়। এইজন্য ইহাদিগকে খেদার কার্য্যে কতকটা শিক্ষিত করিবার নিমিত্তই এই কয়েকদিন "দলিলি" করা হইয়াছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিলাম। কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর গল্প, কালু করিমের কুস্তীর গল্প, আরও কত কি কথা।

রাত্রি অধিক হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সে রাত্রিতে তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

# অনুদ্দিষ্ট

নিতি সন্ধ্যাবেলা বাতায়নে বসি,
নিরখি প্রান্তরে শিশুর খেলা;
সে সেথা একেলা সদা সঙ্কুচিত,
তার তরে নাই আনন্দমেলা!

সকলে খেলিছে পুলকে ছুটি
সে যে একপাশে দাঁড়ায়ে একা,
কি দীনতামাখা কচি মুখখানি,
অধরে ফোটেনি হাসির রেখা।

সঙ্কোচ-সরমে অজানা বেদনে
আনত সজল কমল আঁখি,
কমলে গঠিত নশ্বর শরীর
জীর্ণ বাসে মরি! রেখেছে ঢাকি।

বুঝি কেহ নাহি তার—দিবা অবসানে
খুঁজিবে, ডাকিবে আদর ক'রে,
মু'খানি মুছিয়ে, হাত পা' ধুইয়ে,
খেতে দিবে কিছু, স্নেহের ভরে।

এরা ওরা সবে করি কোলাহল,
ছুটিয়া যাইবে সাধের ঘরে,
তাহার চরণ চলে না চলিতে—
মমতা নাহি কি তাহারি তরে?

যবে সে সেদিন সরসীর তীরে,
যেতেছিল যেন পিছ্‌লে প'ড়ে,
অমনি ধরিয়া বাহুখানি তার,
টেনে নিয়েছিনু বুকের প'রে।

বলিলাম "বাবা! যেও সাবধানে,
অবনী গিয়েছে আঁধারে ছেয়ে"
অবাক বালক, পড়ে না পলক,
মোর মুখ পানে রহিল চেয়ে!

"কেন দাঁড়াইলে?" সুধিনু যখন,
কহিল নৈরাশ্য-জড়িত ভাষে,
"মা আমার ছিল তোমারি মতন—
স্বরগে গেছে সে বাবার পাশে।"

দুজনেরি চোখে অশ্রু উথলিল,
প্রবোধিতে তারে ভাষা না মিলে,
ওর কচি হিয়া জুড়া'ব কি দিয়া,
বেদনা ভুলিবে কি ধন দিলে?—

—ফিরিয়া দেখিনু গিয়েছে চলিয়া,
তখন মুছিনু নয়নধারা,
তদবধি তারে খুঁজি অনুদিন,
কোথা গেল মোর সে মাতৃহারা?

( শ্রীমানকুমারী )
বীরকুমারবধ রচয়িত্রী।

## ( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

### ( ৭ )

এমন গ্রহেও মানুষে পড়ে! যা করা উচিত নয়, যে ভাবনা মনে আনাও অন্যায়, মন কি না আগেভাগে সেই কাজ করিতে ছুটিয়া যাইবে, সেই অনুচিত ভাবনাটিই বেশিবেশি ভাবিতে বসিবে? মধ্যে আজকাল বোধ করি এবাড়ীর মনে সংক্রামকতার হাওয়া লাগিয়া থাকিবে; নহিলে সে,—আমার সেই অরুণ-কিরণ-মণ্ডিত, নির্ম্মল-নিহারবিন্দুপ্রতিম, অতি পবিত্র, অতি শুভ্র, কৌমারচিত্ত, যে কোনদিন ধরণীর ধূলিস্পর্শ, মলিনতার সংস্পর্শভয়ে মর্ত্তপানে চাহিয়াও দেখিতে সাহসী হয় নাই, সেই আমার ঊর্দ্ধচারী, উন্নত চিত্ত আজ যেন কিসের লোভে সঘন-স্পন্দিত সঙ্কুচিত, গোপন-লালসে অতিধীরে সেই চির-অবহেলিত পৃথিবীর বক্ষেই চাহিয়া থাকিতে চায়! আমি চিরদিনই জানি এবং মানি, এখানকার দুঃখসুখের মত এমন অবজ্ঞের বস্তু আর কিছুই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃজিত হয় নাই; তাই, না ইহার সুখে আমার এতটুকু স্পৃহা আছে, না ইহার দুঃখে আমার হৃদয়কে কোন প্রকারে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। এই একই কারণেই আমি মায়ের এমন মাথাকোটাকুটি সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত নিজেকে সংসারী করিতে সম্মত হইতে পারি নাই। সংসারের সুখ আমার আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। লোকে, দেখি, এই কল্পিত নশ্বর সুখের পশ্চাতেই মরীচিকাভ্রান্ত মরুস্থলীর পথিকবৎ ছুটিয়া বেড়ায়! যা নাই, যাহার অস্তিত্ব গগন-কুসুমবৎ অবাস্তব, সেই জিনিষ আমার আবদারেই তো আর তাহার মিথ্যারূপ পরিত্যাগ করিয়া যথার্থতা লাভ করিতে পারে না, তা আমি হাজারও ও মাথামুড় খুঁড়িয়াই মরি না কেন। তবে বুড়া-বয়সে অনর্থক খোকা সাজিয়া আকাশের চাঁদ ধরা, মেঘের বিদ্যুৎ আহরণ করা, অথবা শূন্যের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে লইয়া মাল্য-রচনা করার বায়না করিয়া হাত পা আপসাইতে বসিয়া একটা বীভৎস-হাস্যরসের সৃষ্টি করিব কি? নারীর অধরে একটুখানি মিষ্টহাসি ফুটাইবার জন্য যে সকল অতি অর্ব্বাচীন নিজের দুর্লভ মানব-জীবনটাশুদ্ধ হাসিমুখে উৎসর্গ করিয়া দিতেও পিছপা হয় না, তাহারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে অহোরাত্র সেই মধু-স্রোতেই ডুবিয়া থাকুক; আমার নিকট সে হাসির সুধা এবং তাঁদের অভিমানের গরল, দুই-ই এক রকম। ওরমধ্যে

আমি কোন প্রভেদ কোনদিন খুঁজিয়া পাই নাই। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে, তাহা এই। না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম যে, যে শ্রেণীর জীবকে (এক গর্ভধারিণী ভিন্ন) আমি তৃণাদপি সুনীচ মনে করি, যাঁদের বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যদান ব্যতীত অপর কোন উচ্চ উদ্দেশ্য আমার কল্পনা গ্রহণ করিতে অপারগ, যাঁদের শোভনীয় তনুলতাগুলি এই সংসার-উদ্যানবাটিকায় এক একটি তরুলতা বা ঝুম্কালতার চাইতে বড় বেশি প্রয়োজনীয় বোধ হয় না; সেই তাঁহাদের সঙ্গ সাহচর্য্য আমাদের মত সৃষ্টির প্রধান ঐশ্বর্য্য, ভগবানের সৃজন-শক্তির সর্ব্বনৈপুণ্যের প্রকাশস্থল এই পুরুষদিগের পক্ষে সবিশেষ লোভনীয়ই। কিন্তু বলিতে পার কি যে, সে সঙ্গসুখ, সেই সাহচর্য্য চিরদিনই তোমায় এই এক প্রকারই শান্তি দিতে পারগ? সে সুখ কি অবিনশ্বর? সে শান্তি কি চিরস্থায়ী? হায়রে! চিরস্থায়ী! আমি জানি, খুব জানি—এই নরনারীঘটিত প্রেমের মত এমন ভঙ্গুর পদার্থ—অতবড় ঠুন্কো জিনিষ যে কাচ,—সেও নয়; তা ইহাকে সমাজকার ও শাস্ত্রকারগণ যতই কেন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গণ্ডী দিয়া কঠিন নাগপাশে বাঁধিয়াই রাখুন না; সে সব বাঁধনেই ফস্কাগেরো পড়িতে থাকে। কোন্ বিবাহিত-দম্পতি উচুঁগলায় স্বীকার করিতে সমর্থ যে, তাঁহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কেবলমাত্র অবিচ্ছিন্ন শান্তিসুখে অতিবাহিত হইয়াছে? যদি একথা কেউ বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন; তাহইলেও আমি কখনও সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না; নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে দু-পাঁচ আনাও অতিরঞ্জন-দোষে দূষিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে, সে যে আমি দিব্যচক্ষেই দেখিতে পাইতেছি।

মাপ করিবেন, আমি অবশ্য 'অলীকপ্রকাশ' নাম দিয়া কাহারও সম্মানের লাঘব করিতে চাহিতেছি না। কিন্তু ও কর্ম্মের ওইটিই প্রধান মজা; এই যে, যাঁহারা যে জিনিষের নেশায় মস্গুল থাকেন, তাহার দোষ বিচার করিবার শক্তি তাঁহাদের ভিতর আর বর্ত্তমান থাকে না। তখন কেবল সেই নির্গুণের গুণ-গুলিই চোখে পড়ে। আচ্ছা, বলুন দেখি, কোন আফিম্খোরকে কোনদিন আফিমখাওয়ার নিন্দা করিতে, মাতালকে মদের নেশার দোষকীর্ত্তন করিতে কেহ কি শুনিয়াছেন? দুবেলা যাঁহাদের কলহের কচকচিতে পাড়ার লোকের কর্ণপটহে তালা লাগার উপক্রম করিল, তাঁহারাও আবশ্যকমত পরম গম্ভীর-মুখে কোন বিবাহ-বিতৃষ্ণকে উপদেশ দিবার বেলায়, দেখিতে পাও না, বিবাহিত-জীবনের কতই না সুখচিত্র ফুটাইয়া তুলিবেন! বোধ করি প্রকৃত সুখের একটা আদর্শ সম্মুখে না দেখিতে পাওয়াতেই মানবরাজ্যে এই বিকল্পের সৃষ্টি হইয়া

থাকিবে। আমি চাই যে, আমিই সে ক্রটিটা সারিয়া লইব। আমিই আমাদের দেশের অন্ধোপম মোহবদ্ধ যুবকসমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব যে, একটি নশ্বর প্রেয়সীর ভঙ্গুর-সৌন্দর্য্যের উপাসনা ব্যতীতও এই জীবশ্রেষ্ঠ মানব-জীবনে অনেক বড় বড় কাজ করা যায়। কতকগুলি কাচ্চাবাচ্চার বাবা হওয়াতেই এই উন্নত মহান নরজন্মের পরিপূর্ণ সার্থকতা নহে! আমার মনের এই মহৎ আদর্শ লোকে অবশ্য একেবারেই অকস্মাৎ কিছু বুঝিয়া উঠিবে না; তা একথাও আমি জানি; কিন্তু লোকে দেখিল, কি চোক বুজিয়া রহিল, তাই ভাবিয়া তো আর নিজের উচ্চ আদর্শকে কেহ খর্ব্ব করিতে পারে না। তা ভিন্ন আমি জানি নিরবধি কাল; আজ যা কেহ বুঝিল না, তাই যে কালস্রোতে ভাসিয়াই যাইবে, তাও নয়; সে ভবিষ্যতের অদৃশ্য অঞ্চলে সযত্নে আবৃত রহিল; অদূর হোক, সু-দূর হোক, কোন না কোন একদিন এ অক্ষয় বীজ অঙ্কুরোদ্গম করিয়া বৃক্ষে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে।

ইউরোপে অবশ্য যে এ রকম আদর্শ নাই, তা অবশ্য বলি না; তবে কি না সেখানেও ঠিক এই আমার মনের মত এমন আদর্শটা বোধ করি নাই, বা থাকিলেও খুবই কম আছে। আমি শুধুই যে অন্যের দায়িত্ব ঘাড়ে লওয়ার ক্লেশ হইতে মুক্ত থাকিবার আশায় বিবাহ-বিতৃষ্ণ, তা নয়; নিজের জীবনটাকে আমি আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা এমন অভিনবভাবে গঠিত ও এমন এক মহোচ্চলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই যে, সেখানকার কোন ধারণা কথঞ্চিৎ কল্পনাও আমাদের এই অধুনাতন বঙ্গবাসী, ভারতবাসী, এমন কি এই বিংশ শতাব্দীর নাস্তিক-ভাবাপন্ন জড়বাদী জগৎবাসীরই পক্ষে অসম্ভব। পুরাতন ঋষিগণ যে জ্ঞান-সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে তাঁহাদের শাসনদণ্ড অপ্রতিহত প্রভাবে পরিচালিত করিয়া আজও সেই মহাসাম্রাজ্যের ধ্বংসচিহ্ন দিকে দিকে সুবিস্তৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, মহাকালের সর্ব্বগ্রাসী করে জগতের যে অমূল্য ঐশ্বর্য্যসম্ভার দিনে-দিনে ধূলি-সমাচ্ছন্ন অতীতের তিমির-গহ্বর-শয়নে শায়িত হইয়া যাইতেছে, আমি সেই রুদ্ধ-মন্দিরের প্রত্নতত্ত্বদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত মনুজমণ্ডলে অতীতের সেই মহাগরিমা প্রদর্শন করিব! দেশের এই সর্ব্বনাশের দিনে কি জীবন শান্তিসুখে অপব্যয় করিবার? না, এখনকার ও চিন্তা নয়; এখন সমাহিত হইতে হইবে; ক্ষণিক সুখসকলের আপাত-মনোহারী প্রলোভন হইতে চিত্তকে বজ্র-কঠোর হস্তে টানিয়া ফিরাইতে হইবে। যদি প্রয়োজন দেখা যায়, তবে তার জন্য অতি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করাও আবশ্যক। কষাঘাতে মনরূপী দুষ্ট ঘোড়া

যদি ঠাণ্ডা না হয়, তবে তার চেয়েও আর কিছু তীব্র সাজার অযোগ্য, তাহা মনে করিবার কোন কারণই পাওয়া যায় না, বোধ করি গরম গরম লোহার ডাঙ্গস দিয়া মারিলে সে দুদিনেই ঢিট হইয়া যাইতে পথ পাইবে না।

তারপর এ ত গেল আমার নিজের কথা। যার মনে প্রচুর বল এবং আত্ম-শক্তিতে অভ্রান্ত বিশ্বাস আছে, আমি কেবল এই স্থলে তাঁদেরই সম্বন্ধে আভাষ দিয়াছি। তাই বলিয়া কিন্তু এমন বিশ্বাস আমার নয় এবং একথা আমি কখন বলিনা যে, সৃষ্টিশুদ্ধ লোকেই এই আমার আদর্শের অনুকরণ করুক! আমি তো আর ক্ষেপিয়া যাই নাই যে, এরকম একটা অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা করিতে যাইব! সত্যসত্যই এ কিছু আর সম্ভব হইতে পারে না যে, সংসারশুদ্ধ সবাই একাধারে ভীষ্মদেব হইয়া যাইবেন! তা যদি হইতে পারিত, তাহইলে আর উক্ত ব্যক্তিটির মহত্বগান সেই কোন্ সুদূর অতীত-ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ ঠেলিয়া আজও এই বর্ত্তমানে বিচিত্র শব্দজালের উর্দ্ধশ্রেয়ী হইয়া থাকিত না। আমি জানি, সাধারণতঃ মানুষের মন নিতান্তই ভঙ্গপ্রবণ, জর্ম্মান-আমদানী কাঁচের ঠুন্‌কো বাসনের মত। তা, সেইজন্য এই সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষদের জন্য কঠিন সামাজিক নিয়ম সকলের সৃষ্টি এবং তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন হওয়া যে আমার খুব মত, একথাটা বোধ করি আমি ইতঃপূর্ব্বেই জানাইয়া থাকিব। এজন্য মেয়েদের দশের মধ্যে এবং ছেলেদেরও কুড়ির ভিতর বিবাহই আমার মতে সুপ্রশস্ত। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আমার যা মত, তাতো অনেকবার বলা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলিবার নাই। তাহারা আবার ভগ্নপ্রবণতাগুণে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন; যেন অতি সূক্ষ্ম কাচের বিয়ার গ্লাশ। একটু কোথাও ঠেকিয়াছে, তো অমনি গিয়াছে। অন্তঃপুরই তাহাদের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ স্থান। সেখানে অবশ্য তাহাদের সমুদয় রাজ্যপাট ছাড়িয়া দিতে আমার কোন রকম আপত্তি নাই। মাসমাহিনার টাকা, ইনকমট্যাক্স, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, বা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স, আর কিছু বা সেভিঙ্‌স্‌ব্যাঙ্কের খাতাখানায় ফেলা বাবদ, বাকি টাকাটা তাদের হাতে ষোলআনাই পূর্ণ বিশ্বাসে দিতে পার। তবে হাঁ, একটা কথা এর মধ্যে আছে; দিবার সময় নিজের মাসখরচের মত কাগজ পত্র, টিকিট, সাবান, সেন্ট, ছাতা, কাপড়, যদি অভ্যাস থাকে চুরোট দেশলাই, যদি বাকি থাকে তাহইলে সেগুলি একে একে হিসাব করিয়া কাটিয়া রাখিয়া তবে দিও। তা না হইলে খোকাখুকির হর্‌লিক্‌স মিল্ক ও মেলিন্সফুড এবং অ্যারারুট-বিস্কুট, তারপর ডাক্তারের ফি দেওয়া, তস্য বিল শোধ, কাপড়ওয়ালার হিসাব-

চুক্তি, সেকরা, ধোবা, নাপিত, তাঁতিনী প্রভৃতির তাগিদে কোন সময় যে সেগুলি কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে, তাহার ঠিকানাও থাকিবে না। তারপর সংসার সম্বন্ধে—হ্যাঁ তা আমি এখানে তাঁহাদিগের অপ্রতিহত একচ্ছত্র অধিকারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। মেয়েদের রান্না, ভাঁড়ারের খবরদারীর কথা তো সবাই শুনিয়া আসিতেছেন। সে আর নূতন কি? সে তো সেই আদি সৃষ্টিতেই বিধাতা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তা শুধু এইটুকু লইয়া থাকিলেই তো আর যথার্থ সংসার করা হইল না, সবদিক তো দেখা দরকার। গৃহিণী নাম হইয়াছে যখন, গৃহের যাবতীয় সহৃদয় দেখা শোনা এবং বেচাকেনা সবই তাহারা করিতে বাধ্য। পুরুষ মানুষ এ বিষয়ে তাদের সহায়তা কেবলমাত্র টাকা দিয়াই করিবে, আর কোন রকমেই নয়। তা সেটার সংখ্যাটা যদিই কিছু বা কম হয়, তথাপি তাহাদের সেজন্য অসহিষ্ণুতা প্রকাশ অন্যায় ও অনুচিত, কারণ সুগৃহিণীর লক্ষণই এই যে, তাঁহারা যেমন তেমন আয় হইতেও সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া তাহা হইতে বাঁচাইয়া দু-একখান পাইন বিহীন নিরেট সোণার গহনা গড়াইয়া রাখেন; অথবা তারচেয়েও ভাল বলি, যদি দু-একখানা কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিতে পারেন। তা আমার তো আর স্বতন্ত্র কোন গৃহ নাই, কাজেই গৃহিণীর গোলও ছিল না। যে সংসারে একদিন অতিথিরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মায়ের ঘরে এই বাসিন্দা আমি, এ গৃহে আমার অপর কোন ভাগীদারও যখন নাই, তখন আর আমার নূতন কোন গৃহস্থালীর তো আবশ্যকই করে না। কাজেই এই সংসার-তরণীর কর্ণ ধারিনী? এটিও আমার পক্ষে অচিন্তনীয়া।

কিন্তু আজকাল কেমন যেন মাঝে মাঝে আমার মনের কাণে কোন দূরশ্রুত বাঁশরীর অতি মধুর ললিত রাগিনীর মতই কাহার মুখের একটি বাণী অকস্মাৎ এক এক সময় অত্যন্ত অতর্কিতে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। কেন জানি না, যে জাতিকে ঘৃণা করি, সেই ছার-জাতীয়া কাহারও অরুণরাগরক্ত সরস-অধর-পেলব স্বচ্ছ-সরসী-সলিল-সন্নিভ স্নিগ্ধসলিল নেত্রের পরিবেষ্টনকারী দীর্ঘ নয়ন-পল্লব অকস্মাৎ স্মৃতিমুখে কণ্টকিত হইয়া মানস-দর্পনে বিম্বরেখা ফুটাইয়া তুলে। তাই না বলিতেছিলাম যে, বুঝি এ বাড়ীর হাওয়া গায়ে লাগিতে বসিল। এই জন্যই উচ্চাঙ্গের সাধকের প্রতি আহারবিহার সম্বন্ধে অতখানি সাবধানতা লইবার নির্দ্দেশ আছে। আহার তো শুধু মুখেই গ্রহণ করিলে হয় না; ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব দ্বার দিয়া যে কিছুই ভিতরে আহরণ করে, সে সকলই তো আহার।

যে জন্য সংক্রামক রোগের এবং রোগ বীজানুদুষ্ট মলিনতার সংস্পর্শ হইতে সরিয়া থাকা উচিত; ঠিক সেই কারণেই মন্দ-সংসর্গ হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখাও কর্ত্তব্য! আমি যে এতটা উপরে উঠিয়াও হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশে বন্ধু-প্রেমের মোহবিমুক্ত হইতে না পারিয়া এই আচারনিষ্ঠাবিবর্জ্জিত গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেজন্য ফলভোগী হইতে হইবে না? শৈলেনের মন কিন্তু এ সব খুঁটি-নাটি লক্ষ্য করে নাই। সে বোধ করি পূর্ব্বের সেই তীক্ষ্ণ-বিশ্লেষণ-শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ছাত্র শৈলেন্দ্র আর নাই, পাঁচ রকমে জড়াইয়া বোধশক্তি একটু ভোঁতা হইয়া পড়িয়া থাকিবে। দু একদিন সে আক্ষেপ করিয়া স্ত্রীর কাছে বলি বলি করিল যে, লক্ষ্মীর বিবাহের ভার সে তো লইয়াছে, কিন্তু মনের মত বর জুটাইতে পারিতেছে না। কি যে হইবে! আর একদিন একটি বন্ধুকে বলিল "কেশব শিরোমণির মেয়ের জন্য একটি পাত্র দেখিয়াছি, ওখানে হইলে মন্দ হয় না।"

আমার এ কথাটা তেমন ভাল বোধ হইল না। আচ্ছা, আপনারা পাঁচ-জনেই বিচার করিয়া বলুন দেখি যে, এই যে একটি সতের বছরের কুমারী-কন্যা অমনি হুট করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, তাহাতে মেয়েটির তরফ হইতে না গণপণ না কোন আশা ভরসা! তা এ রকম বরকে কি খুবই সুপাত্র বিবেচনা করিতে পারা যায়? নিশ্চয়ই, হয় তাঁর নিজস্ব না হয় তাঁর বংশাবলীতে বিশেষ কোন দোষ খোঁটা আছেই; তা নহিলে আর—হুঁ বুঝিলেন তো, এমন নিঃস্বার্থ আর আজকালকার দিনে কাহাকেও হইতে হয় না। আর যদি তাহার অপর কোনই খুঁৎ নাও থাকে, তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত লোভী। লক্ষ্মীর যে নারায়ণী লক্ষ্মীসদৃশ অনন্যসাধারণ রূপ আছে, সেই লোভেই সে অপর সকল লাভ লোকসান বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। দেখুন, আমি কিন্তু সে লোভও জয় করিয়াছি। এমন মনও নয় মতিও নয় যে, বড় রসগোল্লাটা হাতের কাছাকাছি পাইয়াই অমনি সংযমের কথা ভুলিয়া টপ করিয়া সেটি গালে ফেলিয়া দিব।

(৮)

প্রতিজ্ঞা তো রক্ষা হইল না! কেশব শিরোমণি মহাশয়ের নিমন্ত্রণে আবার একদিন মাণিকতলাও আসিতে হইল। আমার অবশ্য আসিবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। আপত্তিও যে আমি না করিয়াছিলাম, তাও নয়; কিন্তু শৈলেন আমার ভিতরকার অটল সংযমের গভীরতা না জানিয়াই সাধারণ, সল্পদৃষ্টি

মানবোচিত একটা লঘু উপহাসে আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে একেবারে এই অনিচ্ছার বিরুদ্ধেই উত্তেজনায় উন্মুখ করিয়া তুলিল। সেই আহত হৃদয়বলের পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ আমার মন প্রাণ যেন আমার সহিত লড়াই করিয়া আমায় সেই দিকে টানিয়া সগর্জ্জনে কহিয়া উঠিল, একবার দেখাইয়া দাও; 'চুম্বকের গতির' জ্ঞানটা উহার ভাল করিয়াই হউক। রাগ করিয়া বলিলাম "তোমার বিশ্বাস, 'মাণিকতালাও এর তীরবাসিনী পাছে তাঁর কটাক্ষ-তীরসন্ধানে এই হৃদয়-মৃগটি শিকার করে ফেলেন, সেই ভয়েই আমি তাঁর সান্নিধ্যকে পরিহার করিতে চেষ্টিত। আচ্ছা বেশ, তবে চলো, দেখ আমি মোটেই সেখানে কোন বিপদাশঙ্কা করি কি না। কিছুমাত্র না। আমার মত ঋষি-তপস্বীগোছ অরসিকের সে ভয় নাই; ভয় তোমার মত নারীবিমোহন, রমণীমোহনেরই। তুমিই বরং একটু সাবধানে যাওয়াটাওয়াগুলো করো। (মনে যে একটু কাঁটার খিচ ছিল, তাহাই একটু খোঁচা দিয়া ফেলিলাম। এখনও সেদিনের সেই প্রহেলিকা মনের মধ্যে সু-মীমাংসিত হয় নাই, সে যে এক গোলকধাঁধা!)

শৈলেন এক রকমেরই লোক। সে এত বড় সন্দিগ্ধ শ্লেষে কিছুমাত্র বিচলিতভাব প্রকাশ করিল না। বরং হাহা করিয়া হাসিয়া আমার বাহুমূলে হাত দিয়া কহিয়া উঠিল "আমার কি আর সে সুযোগ আছে রে দাদা! থাকলে আর সে খবর কাউকে নিতে দিতে ত্বরা সইতো না, সে তো আমি স্বীকারই করে আসচি। তোমার কাছে যেটা জগতের সবচেয়ে কঠিন অংশ, আমার কাছে যে সেইটাই তার সর্ব্বাপেক্ষা মধুরতম দিক! এ জীবনের মধ্যে যদি স্নেহ-সুকুমার, সেবা সুকুশল নারী-জীবনের সম্মিলন না ঘটিত, তবে আমাদের তো কেবলমাত্র এই আমাদের জাতির সঙ্গে টিকে থাকা এক বিড়ম্বনা বলেই বোধ হইত। এই ধরো যেন, তুমি ও আমি এই দুটি প্রাণীতে ঘরকন্না পাতিয়ে বাস করচি! আচ্ছা, তাহলে কি সুখটা হতো, সেটা একবারে মনে করে দেখ দেখি। ক্রমাগত দুজনে বসে তর্কের পর তর্কই করে যাচ্চি। কেউ বাধা দেবার, থামাবার লোকই নাই; চীৎকারের চোটে এদিকে হয় ত পাড়ার লোকে কোনদিন পুলিষই ডেকে আনলে!"

আমি মুখ গম্ভীর করিয়া উঠিয়া আসিলাম, শুধু বলিলাম "অবুঝে বুঝাবে কত বোধ নাহি মানে, ঢেঁকিকে থামাবে কেবা নিত্য ধান ভানে। ভাল বাবু, তবে ধানই ভান।" সাজপোষাকেও আমার তেমন সখ নাই। আমি অমনি একখানা ফরেসডাঙ্গার ধুতির উপর ছিটের একটা সার্ট, কাল কাশ্মিরার একটা কোট, সাদা

হাসিয়াদার একটা অমৃতসরি শাল, ফুলমোজা, এমনি সব সোজাসুজি, কাপড় চোপড় পরিয়া ফেলিলাম। শৈলেনের সে সব নয়। সে এই দুরন্ত শীতেও কবিজনোচিত ধপধপে সাদা ধুতি, আদ্ধির পাঞ্জাবীটি ও ফুরফুরে সাদা উড়ানি-খানির বাহার দিয়া বাহির হইল। মনের মধ্যে কবিত্বের গরম থাকিলে কি শরীরে শীতগ্রীষ্ম বোধটাও থাকে না নাকি? না নারীনেত্রের প্রশংসাদৃষ্টি টুকুই এদের পক্ষে সর্ব্বরোগহর হিলিংবাম্? আমরা একদিন ওই রকম করি দেখি, অমনি সর্দ্দি বলিবে কোথা আছি, জ্বর নিউমোনিয়া সবাই সড় করিয়া বলিবে আর কোথা আছি!

সেদিন রবিবার। তখন দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম-অবসর। শেষ মাঘের স্নিগ্ধরৌদ্রে শীতক্লিষ্ট দেহ মেলিয়া দিয়া পথের উপর কুকুরগুলা শুইয়া পড়িয়াছে; পথের ধারে খোলারঘরে দোকানী প্রচুর পরিমাণে মুড়ি ছোলার চাক্তি ও মকাই ভাজা সাজাইয়া বসিয়া ঢুলিতেছে; কোথাও জাঁতায় গম পিষিতে পিষিতে লজ্জাশীলা কুটিরবাসিনীগণ ঘোমটার মধ্য হইতে সমস্বরে "বাসিয়া ভাত কাঠাঁলকে কোয়া; খালেও বউয়াকে বাবা, হাম যায়েব্ তামাসা দেখে, কে পাকাতৌ তাজা ভাত?" ইত্যাদি পতিভক্তি-সূচক সঙ্গীতে গলা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম "মূর্ত্তিমান বিংশ শতাব্দী।" শৈলেন কিছু বলিল না; বলিবার আছেই বা কি যে বলিবে?

সহর ছাড়াইতেই প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি আমাদের চোখ জুড়াইয়া দিল। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হলুদ ফুলে অড়হর সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য উজ্জ্বল হইয়া আছে! কড়াইসুঁটি মূলা প্রভৃতি এখনও প্রচুর পরিমাণে ফুলের বাহার খুলিয়াছিল। চারিদিকেই তাল তমালের সারি। তালগাছের গলায় কলসী বাঁধা, সেখানে যুবা বৃদ্ধ বালক মৌমাছি এবং শুধু মাছি উপরে নীচে প্রায় সম পরিমাণে জমা হইয়াছে। অদূরে ছোট পল্লীখানি দেখা গেল। সেই তালের সারি, বাঁশের ঝোঁপ, আমের ঘনায়িতশ্যাম-পল্লবদল। রাস্তায় গাড়ি হইতে নামিয়া বেড়ার মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বুকটা হঠাৎ ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল কেন? না, বোধ করি এতটা পথ একভাবে টম্‌টমে বসিয়া আসার জন্য—আর কিছুই না। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখিলাম মন্দিরের দরজা খোলা। শৈলেন দ্বারসমীপবর্ত্তী হইয়া ডাকিল "লক্ষ্মী!" আবার আমার বুকের ভিতর রক্ত-চলাচলে যেন কি গোলমাল ঘটিয়া গেল। প্রথম মুহূর্ত্তে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভিতর হইতে ধীর-

পদে বাহির হইয়া আসিয়া লক্ষ্মী ধীরে ধীরে কপালে দুটি হাত ঠেকাইয়া আমাদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অদূরে দাঁড়াইল। আমার মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল চোক দুটাকে কোথায় ঠেকাইয়া রাখি, ঠিক না পাইয়া অমনি একবার সেই দিকপানটাতেই চাহিয়া দেখিলাম। হঠাৎ মনে হইল, এ যেন সেই 'গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং। রৌক্মপদ্ম ব্যগ্রকরাং, বরদাং।' জানিতাম নামটা মানুষ নিজের সখে রাখে; ইহার অপর কোন সুসঙ্গত অর্থ নাই। এই যে আমার নাম মন্মথ, তা নিজের আরসিতে কোনদিন নিজেকে আমার খুব কুৎসিত বলিয়া বোধ হয় নাই বটে; তবু একথা কি আর জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমার নামটা সার্থক রাখা হইয়াছে? কিন্তু এই যে আমার সাম্‌নে ওই শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তিটি দেখিতেছি, উহার সঙ্গে বোধ করি লক্ষ্মী-প্রতিমার কোনখানে অমিল থাকা সম্ভব নয়। চারিচক্ষু হইয়া বুঝি বেহায়ার মতন খানিকক্ষণ চাহিয়া ছিলাম; কেননা শৈলেনের দিকে চোখ পড়িতেই দেখি তাহার অধরপ্রান্তে একটু টেপাহাসি; আমার সহিত চোখে চোখে মিলিতেই প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিয়া চোক ফিরাইয়া লইল। লক্ষ্মী নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার গালের রং, এবং দাড়িমের বীজ গুলা চোখের সাম্‌নে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিতেছিল। একখানি ময়লা তসরপরা, গলায় আঁচলখানি লম্বিত আঁচলের শেষে একদিকে একটি রিংয়ে গুটিদুই তিন চাবি ঝুলিতেছে; বাক্স দেরাজের নয়, তালা-চাবির মোটা মোটা চাবি। আমার হঠাৎ কেমন একটু রাগ হইতে লাগিল। কেন, (শৈলেনের স্ত্রী তড়িতা, সে কিছুই সুন্দরী নয়, কিছু না; তবু তাহার অত সুখ; আর এই লক্ষ্মী দারিদ্র্য-দুঃখে চিরদিনই হাবুডুবু খাইয়া পরাশ্রয়ে কালযাপন করিতেছে। এ রকম হয় কেন? তখনি মনকে বুঝাইয়া দিলাম, তা কি হইবে, যার যেমন কর্ম্ম।

শৈল ইতিমধ্যে তাহাকে কোন সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহার বাবা কোথায় আছেন, সেটা আমার কাণে ঢোকা দরকার বোধ করি নাই। উত্তরটা শুনিতে পাইলাম 'ঘরে।' শৈল আবার হাসিতে হাসিতে বলিল "নূতন অতিথ সঙ্গে দেখতে পাচ্চো, সেবার বন্দবস্ত ভাল করে করে রাখো, এ'তো আর আমি নই যে, বাঁধা পড়ে আছি, দাও না দাও, চাও না চাও, নড়বার যো'টি নেই। এ সব বিশ্বামিত্রদের তপস্যা হে উর্ব্বশি! অনেক চেষ্টায় ভাঙ্গতে হয়।"

লক্ষ্মী তড়িৎবেগে ত্বরিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই দাড়িম্ব বীজগুলি এ নির্লজ্জ পরিহাসে যেন দাড়িম্বকুসুম সদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল। না,

মেয়ে তো সে খুব মন্দ না! লজ্জা, সরম, শীলতা, নম্রতা, তাহার আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। দোষ কিন্তু শৈলর। তাহার একফোঁটাও কাণ্ডজ্ঞান বা ভদ্রতাবোধ নাই, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। মেয়েমানুষ আগুনের ফুল্‌কি। আগুন লইয়া খেলা কত নিরাপদ, তা খুব কচি খোকারাই শুধু জানে না। আর না জানে কে? সে কিন্তু লক্ষ্মীর লজ্জা দেখিয়া লজ্জিত হইল না। দিব্য হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল "চলো, বিদ্যুৎ মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে।"

আমি একটু বিরক্তিবোধ করিতেছিলাম; বলিলাম "তা পড়ুক, আমার তা'তেও খুব দুঃখ নাই কিন্তু।"

"কিন্তু বিদ্যুৎকে ঢাকা দেওয়া আমার অন্যায় হয়েচে?"

শিরোমণি আমাদের পাইয়া যেন কি নিধিই কুড়াইয়া পাইয়াছেন, এমনি করিয়া—কোথায় রাখি, কি করি, করিয়া যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুভদ্র ভাবে কিছুক্ষণ সৌজন্য প্রকাশ চলিলে তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া কাজকর্ম্মের কথাবার্ত্তা চলিল। এই দীঘির দখলিসত্ত্ব লইয়া কোন মুসলমানের সহিত মামলা চলিতেছিল। শৈল আমাকে সে সব কাহিনী ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছিল, কিন্তু সে সংবাদে নিবৃত্ত না হইয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘচ্ছন্দে অনেকবার বুঝিয়াছি কি না, প্রশ্ন করিয়া করিয়া আবার আদ্যোপান্ত সমুদয়, সেই এক-গাদা খবর আমায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তেমন মুখরোচক হইতে-ছিল না, তবুও ঔষধগেলা করিয়া চোক কাণ বুজিয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া বেলাটা কাটিয়া আসিল।

এক সময় শৈল উঠিয়া বলিল "তোমরা বসো, আমি এখুনি আস্‌চি"—বলিয়া সে চলিয়া গেল। কোথায় গেল, বুঝিতে বিশেষ বুদ্ধির আবশ্যক ছিল না। আবার আমার মনটা কেমন যেন হইয়া গেল। শৈলর এ কেমনধারা ব্যবহার! যুবতী মেয়ে! সে যখন তখন তাহার সঙ্গে কথা কহিতে যায় কেন? এ ত ভাল না! বেশ তো গেলই যখন, তখন আমাদের সঙ্গে ডাকিলেই হইত! লক্ষ্মীর সেই বা এমন কি আপন, আর আমিই বা কোন্ এত পর? বরং ধরিতে গেলে, আজ যদি ইচ্ছা করি আমি এখনি তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে পারি। সে তা পারে? আচ্ছা, এক কাজ করিলে তো হয়! শৈল নিশ্চয় তাহার চিররুগ্না মোমেরপুতুল স্ত্রীতে ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে; হয় ত বেশিদিন এই রকম ঘনিষ্ঠতায় লক্ষ্মীর প্রতি তাহার এই টানটা তাহার দিক হইতে নিজের দিকেই গিয়া পড়িবে। তাহা হইলে তাহাকে রক্ষা

করিবার একটা উপায় আমার তো করা উচিত! যতই হোক চিরদিনের বন্ধু ত, তা সে উপায় আর কি? ওদের সংসারের—ওর, ওর স্ত্রীর, ওর পুত্রের, এসবার কল্যাণের জন্যই না হয় আমি নিজেকে বলিদানই দিই? পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনই দিই? পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। আমি না হয় তাই করিব। আমার তো একটুও দরকার নাই, বরং আমার পক্ষে সে খুবই কষ্টকর হইবে। তবু কি করি? যখন ওই বই আর উপায় দেখা যায় না, তখন কাজেই লক্ষ্মীকে আমার বিবাহ করিতেই হইবে। করিতেই যখন হইবে, তখন নিরুপায়েই করিব। শিরোমণিকে বলিলাম "মেয়েটির বিয়ে কবে দেবেন?"

পণ্ডিত-মূর্খ ইহাকেই বলে আর কি! চাষার মত হাঁ করিয়া আমার দিকে রুইমাছের মত চোক দুইটা মেলিয়া তিনি ভাসাভাসা কথায় সারিয়া দিলেন "কি জানি সে সব ঐ বাবুই জানেন। আমি তো ওঁরি হাতে হাতে ওকে সঁপে দিইছি।"

খুব করিয়াছ! এমন কীর্ত্তি এ ভুভারতে খুব কম লোকেই অবশ্য করিতে পারে, তা স্বীকার করি। বুঝিলাম দোষ সুধু শৈলেনেরও নয়, সব দোষ এই কুচক্রী বৃদ্ধের। সে ঐ মতলবেই তাহাকে অতটা তোষামোদ করিয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছা ছিল, এ অবস্থায় যা বলা উচিত, এ ব্যক্তি তাহাই বলিবে, অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তরে আমারই জানু ধরিয়া কন্যাগ্রহণে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমায় নিগৃহীত করিবে। আর আমি শৈলকে বলিব "বড় মুস্কিলেই ফেল্লে বাবু, বাপেরবয়সী বুড়ো বামুন পায়ে ধরিতে যান। কি করিব —তাই ত—।" না, সে কিছুই হইল না। নাই হোক, আমার এমন কিছু গরজ নয়, শুধু পরের জন্যই যেটুকু। "শৈল কোথায় গেল" বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। পাছে কোন সৌজন্যের আপত্তি উঠিয়া পড়ে। কিন্তু তা উঠিল না, শিরোমণি সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন না, শুধু বলিলেন—"তা যান্ না বেশ তো, আপনারা ত আমার ঘরের ছেলে।" সকল বিষয়ে তাহাকে ঠিক আহাম্মক বলাও যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

# মিলন-স্মৃতি

দক্ষিণ পবন
সে দিন জাগায়েছিল চঞ্চল পরশে
মোর কুঞ্জবন ;
মুখরিত করি' দিক্
গেয়ে উঠেছিল পিক,
নবীন মুকুল ঘিরি' ছিল অনিবার
মধুপ-ঝঙ্কার,
হে প্রিয় আমার !

উদার গগন
সে দিন মোদের' পরে দিয়েছিল ঢালি'
বিমল কিরণ।
অপূর্ব্ব পুলকভরে
সেদিন তোমার করে
উঠেছিল এ বীণার যতগুলি তার
বাজি' শতবার ;
হে প্রিয় আমার !

না ফুটিতে—বৃন্ত হ'তে ধরার অঞ্চলে
পড়িয়াছে ঝরি'।
আজি তুমি হেথা নাই,
শূন্য এ নিকুঞ্জে তাই
সে সৌরভ, সে সঙ্গীত—কিছু নাহি আর
দিতে উপহার ;
হে প্রিয় আমার !

অসীম অম্বরে
একটিও তারা নাহি বিকাশে কিরণ
আজি মোর তরে।
দূরে তুমি—তাই মোর
হৃদয়ে আঁধার ঘোর,
নিঃশেষিত নিখিলের বিচিত্র শোভার
উন্মুক্ত ভাণ্ডার;
হে প্রিয় আমার!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

# ডাকঘরের আত্ম-কাহিনী

নগদ একটা পয়সা খরচ করিয়া একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া রাস্তার ধারে একটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলে যদি উহা ঠিক সময়ের দুই ঘণ্টা পরে পঁহুছায়, তাহা হইলে আপনারা আমার পিতৃ-অন্ত করিতে বড় একটা ছাড়েন না, কিন্তু যদি একটু ভাবিয়া দেখিতেন আমার কর্ম্মক্ষেত্র কত বিশাল, আমার দায়িত্ব কত গুরু, ছোট খাট বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার আমার সময় কত অল্প, তাহা হইলে একটুতেই পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের কাছে বা সংবাদপত্রে আমার অকর্ম্মণ্যতার উল্লেখ করিয়া অবিরত নালিশ করিতে বোধ হয় একটু দ্বিধাবোধ করিতেন। আমি ডাকঘর—মনে করিবেন না যে, আমি সামান্য ব্যক্তি। নিজের গুণের কথা নিজ মুখে বলিলে অহঙ্কার করা হয়, এই ভয়ে এতদিন চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু আজকালকার দিনে নিজের ঢাক নিজে পিটিবার প্রথা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি—ছোট বড় সকলেই "জীবনস্মৃতি" "আত্ম-জীবনী" লিখিবার জন্য (বা অপরকে দিয়া লেখাইবার জন্য) সদাই ব্যস্ত—সেই ভরসায় "মহাজনো যেনগতো স পন্থা" এই সূত্রানুযায়ী নিজের আত্মকাহিনী নিজমুখেই বিবৃত করিতে সাহসী হইলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হইলে লেখাপড়ার পরিচয় আগে দিতে হয়। আমার বিদ্যাবত্তার পরিচয় আবার আপনাদিগকে কি দিব?—আপনাদের মধ্যে ভাষাবিৎ (linguist) যদি কেহ থাকেন তবে তাঁহাকে ডাকুন। শুনিয়াছি বাঙ্গালীদের মধ্যে হরিনাথ দে নামক এক ব্যক্তি নাকি এককুড়ি

ভাষা জানিতেন; তিনি অকালে মারা গিয়াছেন, জীবিত থাকিলে না হয় আরও পাঁচটা ভাষা শিখিতে পারিতেন। কিন্তু কুড়ি বা পাঁচটা ভাষা আমার কাছে "সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ"-এর মত কিছুই নহে। মনে রাখিবেন যে, আমি একা ভারতবর্ষে প্রচলিত বাঙ্গালা, মার্হাটী, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, উর্দ্দু প্রভৃতি শতাধিক ভাষা ত অবগত আছিই, ইউরোপে প্রচলিত ইংরাজি, ফরাসি, জার্ম্মান, ইতালিয় প্রভৃতি তাবৎ ভাষাই শিখিয়াছি। আমি আফ্রিকার অসভ্য আদিম নিবাসীদের বন্য ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছি, এমন কি সুদূর ল্যাপল্যাণ্ড দেশে—যে দেশের কথা স্মরণমাত্রে কবি শিহরিয়া উঠিয়া লিখিয়াছেন "এমন সুলভ রোদ দুর্ল্লভ তথায়"—গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানকার ভাষাও শিখিয়াছি। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে কোন ভাষা এখনও প্রচলিত হয় নাই, হইলেই সেখানে গিয়া সেখানকার ভাষা শিক্ষা করিবার একাগ্র বাসনা আছে। বাস্তবিক ভাষাশিক্ষা করিবার আমার আকাঙ্ক্ষা অনন্ত। তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে—মৃত ভাষায় আমার দখল আদৌ নাই। সংস্কৃতের বড় ধার ধারি না; প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্শিতে আমার কারবার নাই। বলি, এই সব মৃত প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়া লাভ কি মশাই? আপনি বলিবেন—কেন সংস্কৃত জানিলে কবি কালিদাসের অমৃতনিস্যন্দিনী কবিতার আস্বাদ পাইবেন, ভবভূতি, মাঘ, ভারবীর নানা রসপূর্ণ কাব্যমধুচক্রের বিচিত্র রস উপভোগ করিবেন; গ্রীক লাটিন জানিলে হোমর ড্যাণ্টের মধুর কাব্য পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার কবিতা পাঠ করিবার অবসর কই? আপনারা বাবু মানুষ, আপনাদের সময় কাটানই দায়, কাজই নাই, নিষ্কর্ম্মা-লোক—আপনাদের "কাব্যামৃত রসাস্বাদ" করা পোষায়। কিন্তু আমার মত কর্ম্মী যারা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাদের কর্ম্মক্ষেত্র, দিবারাত্রের মধ্যে যাহাদের বিশ্রাম করিবার অবসর নাই—তাহাদের কবিতা পড়িয়া হ'বে কি বলুন? তাই প্রাচীন ভাষা বিসর্জ্জন দিয়া যাহা নূতন, যাহা কাজের, তাহাতেই মন দিয়াছি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী অর্থাৎ যাঁহারা অর্থ উপার্জ্জনে দিবারাত্র ব্যস্ত, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন—তাঁহারাও আমার মত কবিতা পড়িয়া আদৌ সময় নষ্ট করেন না।

আমার বয়সের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমার বয়স যে কত, তাহা বলিতে পারিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার বয়সের গাছপাথর নাই। মানুষ যখন প্রথম দেশ বিদেশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে,

তখন হইতেই আমি কোনও না কোনও রূপ ধারণ করিয়া আছি। আমি মেঘরূপে বিরহী যক্ষের বিরহ-বেদনা তাহার প্রিয়তমার নিকট বহন করিয়া দিয়া আসিয়াছি। আমিই আবার রাজহংসরূপে রাজা নলের অনুরাগ-কাহিনী দময়ন্তীর কর্ণগোচর করিয়াছি। দুষ্মন্ত-পরিত্যক্ত্যা শকুন্তলা যদি স্মারক-অঙ্গুরীয়টি লইয়া আমার শরণাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে আমি ঠিক উহা রাজা দুষ্মন্তের হাতে পঁহুছিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু আবাল্য-আশ্রম-পালিতা, সংসারজ্ঞান-বিরহিতা সরলা কণ্বদুহিতা অঞ্চলপ্রান্তে অঙ্গুরীয়টি বাঁধিয়া লইয়া স্বয়ং স্বামী-সন্দর্শনে চলিলেন—আমার উপর দৌত্যকার্য্যের ভার দিলে তাঁহার অমূল্য অঙ্গুরীয়টি আর হারাইত না। তিনিও স্বামী অনুরাগে বঞ্চিত হইতেন না। আমিই অপ্সরীকুলোত্তমা উর্ব্বশীর পত্র রাজা পুরুরবাকে ও কর্পূরমঞ্জরীর প্রণয়লিপি রাজা কেতকীপত্রকে স্বহস্তে দিয়া আসিয়াছিলাম। আমিই আবার শ্রীকৃষ্ণবেশে ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষ হইতে রাজা দুর্য্যোধনের নিকট পাঁচখানি মাত্র গ্রামের জন্য দৌত্য করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি রাজা বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া আমার অপমান করাতে ভারতমহাসমরে সে নিহত হইল। এইরূপে সত্য, ত্রেতা দ্বাপরে ছোট বড় যত ঘটনা ঘটিয়াছে, সকলগুলিতেই আমি দৌত্য করিয়াছি—কখনও সফল হইয়াছি, কখনও নিষ্ফল হইয়াছি।

ক্রমে আমার কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িতেই চলিল—আপামর সাধারণ আমার উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল। আগে আগে পায়ে হাঁটিয়া, রথে চড়িয়া বা অশ্বারোহণে আমি যাতায়াত করিতাম; কলিযুগে এখন যাতায়াতের ভারি সুবিধা হইয়াছে। এখন রেল গাড়ীতে, ষ্টীমারে, মোটরে চড়িয়া "ছয় ঘণ্টায় ছয় দিনের পথ" চলিয়া যাইতেছি। সমস্ত পৃথিবী এখন আমার কর্ম্মক্ষেত্র। পৃথিবীর যাবতীয় সহরে, মহকুমায়, এমন কি পল্লীগ্রামে আমার সহস্র সহস্র আফিস খুলিতে হইয়াছে। এই সব আফিসে দিবারাত্র কাজকর্ম্ম চলিতেছে। মানবের সেবায় আমার মত অক্লান্ত কর্ম্ম করিতে কাহাকেও দেখিয়াছেন কি? যুগযুগান্তর ধরিয়া আমি কতকাল যে এই সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমি নিজেই জানি না।

তার পর দেখুন আমার মত স্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জগতে কেহই নাই। ডিরেক্টরিতে না হয় কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের মত বড় বড় কয়েকটা সহরের গলির পরিচয় থাকে; কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও সহর, জিলা, গ্রাম,

গণ্ডগ্রাম নাই, যেখানে আমার গতিবিধি নাই। আমি শুধু যে পাঁচুধোপানির গলির ৫ নম্বর বা গুলু ওস্তাগরের গলির ১৩।২।১।৪ নম্বর বাড়ী কোথায় বলিয়া দিতে পারি তাহা নহে; সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার "পায়রা মারিবো" বা "মেরে খাইবে" সহরের ক্ষুদ্রতম রাস্তাঘাটও আমার অজানা নাই—আমি "হনলুলু" বা "কামচাট্কা" দেশের সমস্ত গণ্ডগ্রামের নামধাম বলিয়া দিতে পারি। আমি রাজরাজেশ্বরের হর্ম্ম্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার বিপুল সাজসজ্জা দেখিয়াছি, আবার পল্লীগ্রামের দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরের ভিতরে তাহার ছেঁড়া কেঁথাও আমার চক্ষে বাদ পড়ে নাই। মনে করিবেন না যে এই রাস্তাঘাট চেনার ক্ষমতা একটা কম কোয়ালিফিকেশন (Qualification)। পল্লীগ্রামের একজন লোক প্রথমে কলিকাতায় আসিলেই সহরের জাঁকজমক, গাড়ীঘোড়া, দোকানপসারি দেখিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা কম্পমান হয়—সে যদি চোরবাগানে বা হাতিবাগানে তাহার আত্মীয়ের বাসা খুজিয়া লইতে না পারে—তাহা হইলে তাহাকে আপনারা "পাড়াগেঁয়ে ভূত" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। আপনারা ত সহুরে লোক, কলিকাতার আঁটিঘাঁটি সব জানেন—ডিরেক্টারি খুলিয়া বড়বাজারের পগেয়াপটিতে করমচাঁদ মতিচাঁদের বাইলেনে ১৩।২।৩ নম্বর বাটীতে তিম্বকরাম পাঁড়ের দোকান খুঁজিয়া বাহির করুন ত দেখি। সত্যই বলিতেছি—আপনাদের সাধ্যে কুলাইবে না। প্রথমেই দেখিবেন যে কাপড়ের বড় বড় গাঁট পড়িয়া রাস্তাই হয় ত বন্ধ। তার পর গলির পর তস্য গলির ভিতর যে সকল বাটী আছে, সেগুলি বঙ্গ-রমণীর ন্যায়ই "অসূর্য্যম্পশ্যা"-- সেগুলিতে রৌদ্র আজ কত বৎসর যে প্রবেশ করে নাই কে বলিবে? সে অন্ধকারের মধ্যে বাটীর নম্বর ত খুঁজিয়াই পাইবেন না। যদিই বা পান, গিয়া দেখিবেন যে সে বাটীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন পাগ্ড়ী মাথায়, কোর্ত্তা গায়ে মাড়োয়ারি দোকানদার পসরা লইয়া বসিয়া আছে। স্বয়ম্বর সভায় পঞ্চনলের মধ্যে প্রকৃত নলকে বাছিয়া লইতে দময়ন্তীকে যেমন আকুল হইতে হইয়াছিল, আপনিও সেইরূপ এই পঞ্চাশৎ মাড়োয়ারদেশ-বাসীর মধ্যে তিম্বকরাম পাঁড়ে মহাশয়কে বাহির করিতে হয়রাণ হইয়া পড়িবেন। গুমর করিতেছি না, সত্যই বলিতেছি যে, আমি ভিন্ন এ হেন বাটীতে পত্রের মালিককে খুঁজিয়া বাহির করা আর কাহারও সাধ্য নাই। শুধু কি তাহাই—হয় ত সুদূর মাড়োয়ার বা বিকানীর প্রদেশের মরুময় একখানি গণ্ডগ্রাম হইতে কেহ নাগ্রী অক্ষরে লেখা একখানা পত্র

এই তিম্বকরাম পাঁড়ে মহাশয়ের নামে "বড়বাজার, কলিকাতা" ঠিকানায় ভেজিয়াছেন (যেন কলিকাতাটা সেই মাড়োয়ার প্রদেশের অনুর্ব্বর গণ্ডগ্রামের মতই ক্ষুদ্র স্থান), আমাকে চিঠির মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে রাখিবেন আমার প্রাপ্য একটা বা দুইটা পয়সার টিকিট পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই—চিঠিখানা "বেয়ারিং"ই আসিয়াছে। অনেক সময়ে ইহার মালিককে বাহির করার মত অসাধ্য-সাধনা আমার পক্ষেও সম্ভবপর হয় না; তবুও আমি সেই অমূল্য বেয়ারিং পত্রখানি রাগ করিয়া ফেলিয়া দিই না। সেখানি সযত্নে আবার সেই সুদূর মাড়োয়ার প্রদেশের সেই গণ্ডগ্রামে লেখক বা লেখিকার হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া দিই "এবার ঠিকানাটা পুরা করিয়া লিখিয়া তবে চিঠি খানা ভেজিবেন।"

পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। দিনে দুপুরবেলায় অধিকাংশ পল্লীগ্রামে রাস্তায় লোক দেখিতে পাইবেন না। গ্রাম ম্যালেরিয়া কলেরায় বিরলবসতি হইয়া যাইতেছে। যে কয় ঘর আছে, তাহাদের মধ্যে পুরুষমানুষেরা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে আছেন, ছুটিছাটায় বাটী আসেন। গ্রামে আছে কয়েক-ঘর কৃষক আর অনেকগুলি স্ত্রীলোক। কৃষকেরা মাঠে কায করিতেছে, আর মেয়েরা ঘরে রাঁধিতেছে। রাস্তায় এমন একজন লোক দেখিতে পাইবেন না যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারেন। আপনি ত দিনদুপুরে জমিদার-বাড়ীতেই যাইতে পারিলেন না—আমি কিন্তু সেই গ্রামের পচাই সেখ বা নকুড় মণ্ডলের বাটী রাত্রিতেও যাইতে পারি, গদাধরের পিসির কুঁড়েঘর গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে কোন্ বাঁশঝাড়ের নিকট বা পচাপুকুরের ধারে, তাহাও বলিয়া দিতে পারি। তার পর রাজ-রাজড়ার বাড়ীর কথা। আপনি পূর্ব্বে engagement না করিলে বা intro-duction পত্র না লইয়া গেলে ফটক হইতেই শাস্ত্রীপাহারা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু সেখানে আমার গতি দিবারাত্র অপ্রতিহত। আমার বাহনটি ব্যাগ স্কন্ধে উপস্থিত হইলেই শাস্ত্রীপাহারা সসম্ভ্রমে সিংহদ্বার মুক্ত করিয়া দিবে, কর্ম্মচারীমহলে হাঁকডাক পড়িয়া যাইবে; এমন কি অন্দরমহলেও ছুটাছুটির ধূম পড়িয়া যাইবে।

শুধু যে আমার গতি ও আদর সর্ব্বত্র তাহা নহে, আমার মত হাতের লেখা পড়িতে কয়জনে পারে? এখন টাইপরাইটারের দিনে সহরে হাতের লেখা পড়িবার আর বড় কদর নাই; কিন্তু মনে রাখিবেন পল্লীগ্রামে এখনও

হাতের লেখা ভাল পড়িতে জানা লোকের কম খাতির নাই। কাহারও কোন চিঠিপত্র আসিলেই অনেকে তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ পারদর্শী ব্যক্তি কেবল বাঙ্গালা বা বড় জোর বাঙ্গালা ও ইংরাজি এই দুইটি ভাষায় লিখিত পত্রাদিই পড়িতে সক্ষম; কিন্তু স্মরণ রাখিবেন আমায় পৃথিবীতে প্রচলিত শত শত ভাষায় লিখিত পত্রাদির ঠিকানা পড়িয়া দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ চিঠিপত্র বিলি করিতে হয়। তাহার উপর মনে রাখিবেন প্রত্যেক লোকের লেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র প্রকারের (তাই হাতের সহি দেখিয়া আদালতে লোক সনাক্ত করিবার পদ্ধতি প্রচলিত)। কেহ লেখেন সোজা অক্ষরে, কেহ লেখেন বাঁকা অক্ষরে। কাহারও লেখা ডাইনে হেলান, কাহারও বা বাঁয়ে। কোনও নববধূ মুখরা ননদিনীর গঞ্জনার ভয়ে গোপনে বসিয়া ভাঙ্গাভাঙ্গা অক্ষরে দূরস্থিত স্বামীকে নিজের গোপন বিরহ-বেদনা জানাইয়া তাড়াতাড়ি ঠিকানাটা লিখিয়া দিয়াছেন (পাছে কেহ আসিয়া পড়ে), আমাকে সেই অশুদ্ধ ভাষা ও ভাঙ্গা অক্ষরে লেখা চিঠিখানির ঠিকানা পড়িয়া ঠিক জায়গায় উহা পঁহুছিয়া দিতে হইবে, নহিলে সতীর মনস্তাপ কুড়াইতে হইবে। জমিদারি সেরেস্তার মুহুরিদের হাতের লেখা দেখিয়াছেন ত? তাহাদের লেখার মধ্য হইতে আস্ত অক্ষর খুঁজিয়া পাওয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা আহরণ করা অপেক্ষা আদৌ সহজ কর্ম্ম নহে। দেখিবেন টানের চোটে সব অক্ষরই একেবারে নিরাকার না হইলেও গোলাকার হইয়া গিয়াছে। এ হেন লেখা পড়িয়াও ঠিক ঠিকানায় পত্রাদি পঁহুছাইতে না পারিলে জমিদার মহাশয়ের রিমাইণ্ডারের চোটে পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের আর সোয়াস্তি থাকিবে না। ডাক্তারদের হাতের লেখা পড়ায় বিপদ বড় কম নয়। যিনি যত বড় ডাক্তার, তাঁর হাতের লেখা তত খারাপ—অন্ততঃ বড় হইবার জন্য অনেক ডাক্তার নিজের লেখা ইচ্ছা করিয়া খারাপ করিয়া থাকেন। অন্ততঃ চিঠি লিখিবার সময়ও যদি তাঁহারা স্মরণ রাখেন যে, তাঁহারা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিতেছেন না, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের দেবাক্ষর পড়িয়া হায়রাণ হইতে নিষ্কৃতি পাই। সে যাহা হউক, এই শত শত ভাষায় হরেক রকমের হাতের লেখা পড়া আমার মত পাকা handwriting expert ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভবপর কি না, তাহা আপনারাই বিচার করুন—আমি আর নিজমুখে নিজের প্রশংসা করি কেন?

দেবতাদের মত আমারও একটি বাহন আছে। আপনারা জানেন এক এক দেবতার এক একটি বাহন আছে। ব্রহ্মার বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন

গরুড়, লক্ষ্মীর বাহন পেচকরাজ, আর শক্তির বাহন পশুরাজ। শীতলা ঠাকুরের বাহন নির্ব্বোধ গর্দ্দভ, আর পাগল মহেশ্বরের উপযুক্ত বাহন বৃষভ। ময়ূর বিকল্পে কখনও দেবসেনাপতির বাহন, কখনও সরস্বতীর বাহন। আচ্ছা ক্ষুদ্র মূষিক হস্তীমুখ লম্বোদর গণেশের বাহন কিরূপে হইতে পারে? লম্বোদরের ওজন ত বড় কম হইবে না। হে লম্বোদর! তোমায় ভারী বলাতে রাগ করিও না—তুমি সিদ্ধিদাতা, তোমার উদর আরও লম্বা হউক; তোমার বাহনটিকে একটু সংযত করিও, তাহার জ্বালায় আমার আফিসের কাগজপত্র আর থাকে না। তোমার সহোদর কার্ত্তিকেরও বাহন ত ভাল হয় নাই। তিনি দেবতাদের সেনাপতি—কোথায় তিনি বর্ম্ম, হেলমেট, জুট পরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সর্ব্বদা বিরাজ করিবেন, না, ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরের কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া কোঁচান উড়ানি গলায় দিয়া ভগ্নীর ময়ূরটির উপর চড়িয়া বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইতেছেন। এত এফিমিনেট সেনাপতি হইয়া দেবতারা রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কি করিয়া?

সে যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবতাদের মত আমারও বাহন আছে। আমার বাহন সকলেই দেখিয়াছেন। লোকে তাহাকে পিয়ন বলে। তাহার রূপ-বর্ণনা আমি আর কত করিব?—তাহার মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে থাকির কোট, পৃষ্ঠে চামড়ার ব্যাগ, কাণে একটা পেন্সিল, এক হাতে একতাড়া চিঠি, অপর হাতে পার্সেল ও বুকপোষ্টের থোলে। প্রতিদিন ডিলিভারীর সময় হইলেই সবাই সোৎসুক-নেত্রে আমার বাহনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বিশেষতঃ খবরের কাগজের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার "নিজস্ব" সংবাদদাতার সংবাদের জন্য, নবপরিণীত যুবক নবপ্রণয়িনীর "যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে" প্রভৃতি ললিতপদাবলীপূর্ণ প্রণয়লিপির আশায়, দুঃখিনী মাতা দূরস্থিত পুত্রের মঙ্গল-সংবাদ প্রাপ্তির আশায় এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী রাজসমীপে মার্জ্জনার আবেদনের উত্তর অপেক্ষায় আমার বাহনের আগমনের জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সে দিবস পিয়ন চিঠি না থাকার দরুণ ইঁহাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের মুখখানি কবির ভাষায় বলিতে হইলে "সঞ্চারিণী দীপশিখা"র অগ্রগমনে পশ্চাদ্বর্ত্তী গৃহরাজির ন্যায়ই মসীমলিন হইয়া যায়। তাঁহারা অকারণে আমার উপর রাগ করেন; তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের চিঠিপত্র সে দিন না থাকিলে শুধু তাঁহাদের উৎকণ্ঠার শান্তির জন্য চিঠিপত্র আমি ত তৈয়ারি করিয়া দিতে পারি না।

এইত গেল বাহনের কথা। এখন গাড়ী ঘোড়ার পরিচয় দিব কি? মনে রাখিবেন, রেল গাড়ীতে যাইতে হইলে আমি ডাকগাড়ী ভিন্ন অন্য গাড়ীতে চড়ি না। প্যাসেঞ্জার গাড়ি যেরূপ আস্তে আস্তে চলে, তাহাতে কি আমার মত সম্ভ্রান্ত ও কর্ম্মী ব্যক্তি যাইতে পারে? তার পর সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্য সকলকার সঙ্গেও এক কামরায় যাইতে পারি না; সেই জন্য দেখিবেন আপনি পয়সা দিয়া গাড়ীতে স্থান পান আর নাই পান, মেলট্রেনে আমার জন্য কামরা রিজার্ভ থাকিবেই। তাহা ছাড়া ষ্টীমার, মোটর, ঘোড়ার-গাড়ী, বাইসাইকেল, নৌকা প্রভৃতি যত:প্রকারের স্থলযান বা জলযান আছে, তাহার সকলটিতেই আমায় নিয়ত যাতায়াত করিতে হয়। আপনার একখানি টমটম বা আফিসযান থাকিলে পাড়ার সকলে মনে করেন যে, আপনি কত বড় লোক; কিন্তু আমার যে কত গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লঞ্চ, ষ্টীমার প্রভৃতি আছে, তাহা যদি একবার তাঁহারা দেখেন তাহা হইলে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাইবেন। ব্যোমযানে যাতায়াতটা এখনও নিরুপদ্রব হয় নাই; হইলেই তাহাতেও যাতায়াত করিবার বাসনা আছে। তখন বাঁচিয়া থাকিলে একবার দেখিয়া যাইবেন আমার আফিসে আফিসে কতগুলো এয়ারোপ্লেন এয়ারসিপ গিস্‌পিস্‌ করিতেছে।

এত গাড়ীঘোড়া যার, সে যে কত বড় মানুষ তা'তো বুঝিতেই পারেন—বেশী করিয়া আমার আয়ের খবর দিয়া কেন কষ্ট পাই। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার বার্ষিক আয় কয় শত বা সহস্র মুদ্রা? ও মশাই! আমার আয় শত বা সহস্রে কুলাইবে না, লক্ষেও কুলাইবে না, কোটীতে যদি কুলায়। তা ছাড়া আমার আয় প্রতি বৎসর হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। আমি এত বড় লোক হইলাম কি করিয়া জানেন? "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এই মন্ত্র উপাসনা করিয়া। চাকরি করিয়া কি কেহ বড়-লোক হইয়াছে? তাহাতে বড় জোর পেটভাতা মিলে। দেখুন ব্যবসা করিয়া লোটাকম্বলসম্বল মাড়োয়ারি লক্ষপতি হয়, বাণিজ্যের কৃপায় ইংরাজ, জার্ম্মাণ, আমেরিকান্ প্রভৃতি জাতির কাছে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ব্যবসা পৃথিবীর যাবতীয় চিঠিপত্র বিলি করা। তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রত্যেকের কাছ থেকে যে দুই একটি করিয়া পয়সা পাই, তাহাতেই রাই কুড়িয়ে বেল হয়। তাহার উপর আমার প্রকাণ্ড মহাজনী কারবারও আছে। বাস্তবিকই আমার মত বড় মহাজন আপনাদের

মধ্যে কেহ নাই। আমার ব্যাঙ্কে যত টাকা খাটে, তত টাকা রথচাইল্ডের ব্যাঙ্কে নাই, আমেরিকার ক্রোড়পতিদের নাই, যক্ষেরও ছিল না, এক কুবেরের যদি থাকে। আমার সেভিংস্ ব্যাঙ্ক বিভাগে কত কোটি কোটি ব্যক্তি টাকা জমা রাখিয়া নির্ভয়ে রাত্রে ঘুমাইতেছে—তাহাদের এক পয়সাও আমার দ্বারা তস্রুপাতের ভয় নাই। এক দেশ হইতে সুদূর অপর দেশে টাকা পাঠাইবার যদি আপনার দরকার থাকে, আমার কাছে আসুন—আমার মহাজনী কারবারের মনি অর্ডার ইন্‌সিয়োরেন্স বিভাগে এক আনা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছি। আরও সুবিধা, ঘরে বসিয়া বিদেশ হইতে যত ইচ্ছা জিনিষপত্র আমদানি করিতে ও কিনিতে পারিবেন। আমার ভ্যালুপেয়েবল বিভাগ আপনাদের এই সুবিধার জন্য খুলিয়াছি। ফল কথা যত রকম মহাজনী কারবারের দস্তুর আছে, তাহা আমার নিকট পাইবেন। এই কারবারই আমার লক্ষ্মী।

সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করি, আমার মত বিশ্বস্ত বন্ধু জগতে কি কাহারও আছে? শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধব"। বাস্তবিক কিবা রাজদ্বারে কিবা শ্মশানে, আমিই মানবের একমাত্র বান্ধব, একমাত্র অবলম্বন। পৃথিবীশুদ্ধ সকল লোকেরই গুপ্তকথা আমার সঙ্গে হয়। প্রিয়জনবিধুরা নববধূ তাহার বিরহবেদনা আমাকে জানাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; কুটিল রাজমন্ত্রী তাঁহার গুপ্তমন্ত্রণা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে ও কুণ্ঠিত হয় না; আমি শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা প্রেরণ করি; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী সৈনিকের বিজয়বারতা আমিই তাহার দেশবাসীকে জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের আনন্দ ও সন্তোষ প্রদান করি; বিদেশী তাহার প্রাণের আকুল আবেগ বহুদূরস্থিত প্রিয়জনের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়। আমি প্রকৃত খৃষ্টানের মত পাপীতাপীকেও ত্যাগ করি না। নরহত্যা বা নারীহত্যায় দণ্ডপ্রাপ্ত চিরনির্ব্বাসিত বন্দীর শারীরিক কুশলবার্ত্তা তাহার হতভাগ্য মাতা, পিতা, বনিতা, আত্মীয় স্বজনকে আমিই বহন করিয়া দিই। আমায় সকল রকমের সংবাদই বহন করিতে হয়। আমি যেমন সুখের সংবাদ দিই, তেমনই দুঃখের সংবাদও আমাকে দিতে হয়। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দিবসের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সুখদুঃখের সংবাদ সর্ব্বত্র বহন করিতে করিতে আমার হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য কাহারও সুখে আনন্দ প্রকাশ করিতে

পারি না, দুঃখেও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার আমার অবসর নাই। কিন্তু জানিয়া রাখিবেন আমিই মানবের সুখদুঃখে একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু।

আমার আত্মকাহিনী এইখানেই শেষ করিলাম। দোহাই আপনাদের, আমার এতটুকু ত্রুটি দেখিলেই আর পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের কাছে নালিশ করিবেন না। আজ আসি, প্রণাম।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

# প্রভাতে।

ভ'রে দিলে মোরে ভ'রে দিলে
ওগো, হ'রে নিলে মোর প্রাণ ;
তুমি পরশে কাঁপালে হৃদয় আমার
ধ্বনিয়া তোমার গান!
ঠেলিয়া আঁধার-দুয়ার আমার
ডাকিলে মধুর রবে ;
নবীন উষার সোণার কিরণে
জাগালে আবার ভবে।
চাহিল করুণ নয়ানে আমায়
ধরণীর রাঙা আভা,
মুগ্ধ করিল নদীপ্রান্তের
ধন্য তোমার শোভা!
মরিল আমার অলস-বিলাস
পরশে পুণ্যপানি,
আবরণ মোর নিশার আঁধার
আপনি ফেলিলে টানি'!
গাঁথিল ভক্ত আপনার মনে
তোমার বিজয়-মালা,
ধরিল শরৎ উষার চরণে
বরণ-রক্ত-ডালা!
হাসিল পরাণ ত্রাসিল মরণ,
বহিল জীবনধারা ;
আলোর উজ্জ্বল তরবারী-ঘাতে
ভাঙ্গিলে তামসকারা!

শ্রীতরুলতা দেবী।

# শ্রুতি-স্মৃতি

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

শ্রীনাথ বাবুর শিক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থাকিয়া বৎসরগুলি নিরুদ্বেগে যাইতে লাগিল; এই সময়টায় বিশেষ কোন ব্যাধি পীড়া আমায় গুরুতর দুঃখ দিতে পারে নাই; তবে বাল্যকাল হইতেই আমার শূলব্যথা ছিল, সময়ে সময়ে কাঁচা আম, কুল প্রভৃতির অসংযত ও অপর্য্যাপ্ত ব্যবহারে আমার সেই শূলব্যথা ধরিত। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য্য মহাশয়ের ঔষধে তাৎকালিক উপকার হইলেই ব্যথার কথা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম এবং উহার পুনরাবির্ভাবের সাময়িক কারণ যে পুনরায় ঘটিত না, সত্যের খাতিরে এমন কথা বলিতে পারিব না। রোগের সময়ে এই পুরুষ অভিভাবকের নিকট মাতার স্নেহ ও শুশ্রূষা লাভ করিয়াছি, এবং বালকোচিত চাপল্যের মাত্রা অধিক হইলে এই শিক্ষাগুরুর নিকটে কঠোর বাক্যের কঠিন শাসন পাইয়া দোষের নিরাকরণ হইয়াছে। ফলতঃ আমার অভিজ্ঞতায় শ্রীনাথ বাবু অপেক্ষা বালকের যোগ্যতর অভিভাবক ও গুরু আমি দেখি নাই। এই শান্ত, ধীর, জ্ঞানী, আদর্শচরিত্র পুরুষের অধীনস্থ বিদ্যার্থীগণ ইঁহার নিকট হইতে একাধারে নারীসুলভ স্নেহ এবং যত্ন ও পুরুষোচিত শাসন পাইয়া যথার্থই মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। যাহারা মানুষ হইয়া নিজের সুখ সৌভাগ্য আহরণ করিতে পারে নাই, তাহারা নিজেই সে জন্য দায়ী। এই শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ দিয়া কেহ অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস করিলে তিনি মিথ্যা আবরণের দোষে দোষী হইবেন।

প্রতিবারে বাৎসরিক পরীক্ষার ফল আমার নিতান্ত মন্দ হইত না। ইংরাজী, ইতিহাস, সংস্কৃত বাঙ্গালা প্রভৃতি বিষয়ে অধিক নম্বর পাইয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি; কেবল অঙ্কশাস্ত্রে পরীক্ষার ফল আমার তাদৃশ ভাল হইত না। অনেক সময়ে আবশ্যকীয় নম্বর রাখা আমার পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িত। তাহার জন্য প্রমোশন বন্ধ হয় নাই। যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিলাম, তখন আমাকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার অঙ্কের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন, এবং এই শিক্ষক-নিযুক্ত ব্যাপারও শ্রীনাথ বাবুরই চেষ্টার ফল।

তিনি আমার মাতাকে জানাইয়া বালকের উপকারার্থ এই ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন, এবং ইহাতে আশানুরূপ ফলও হইয়াছিল। আমার অবস্থাপন্ন ছাত্রও পরীক্ষায় পাশ হইয়া সকলের সঙ্গে আনন্দ করিবার সুযোগ পাইয়াছে; শিক্ষাজগতে ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নহে; এ কথা কেন বলিলাম, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি!

অর্থশালী ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের চারিদিকে স্বার্থসিদ্ধির মানসে একপ্রকার লোকের সমাগম হয়, যাহারা বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতির প্রতি নিতান্ত উদাসীন; কেবল যাহাতে তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত হইতে পারে, সেইরূপ পরামর্শ ও মন্ত্র বালকের কাণে সময় পাইলেই দিয়া থাকে। আমার চারিপার্শ্বে এরূপ লোকের সমাগম হইয়াছিল ঠিক এমন কথা বলিতে পারি না, কারণ আমার গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক শ্রীনাথ বাবুর তৎপ্রতি প্রখর ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বিদ্যালয় বন্ধ হইলে যখন বাড়ী যাইতাম, তখন এই শ্রেণীর বিষকুম্ভপয়োমুখ আপাত-বন্ধুর মোহন-মূর্ত্তি আমার নয়নপথে পড়িত না, বা এই শ্রেণীর মধুমক্ষিকার মধুগুঞ্জন মধ্যে মধ্যে শুনিয়া আমার শ্রবণ তৃপ্ত হইত না, এমন কথা বলিতে পারিব না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল নিরক্ষর, হীনবংশসম্ভূত, স্বার্থান্বেষী জনেরই এই ব্যবসায়, তাহা নহে! ভদ্রবংশজাত, কথঞ্চিৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমি অসৎপরামর্শ দিয়া বালকের চিত্তচঞ্চল করিয়া দিবার মত লোকও দেখিয়াছি! আমার নিকট-সম্পর্কীয়, সম্বন্ধে ঠাকুরদাদা, বয়সেও তাই, একটি অর্থবান বৃদ্ধ জমীদারের মুখ হইতেও লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আনন্দে (!!!) দিনযাপন করিবার সৎপরামর্শ পাইয়াছি। দাদামহাশয় একদিন সহাস্যবদনে বলিলেন "দাদামণি, পড়াশুনা ত অনেক হইল, এখন দিনকত সুখভোগের ব্যবস্থা কর। সারাজীবন কি পুঁথির পোকা হইয়াই কাটাইবে?" আমার বয়স তখন ১৭, সবে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী আসিয়াছি। ইতিমধ্যে প্রাচীন ঠাকুরদাদার বিবেচনায় আমার সুখসম্ভোগের সময় যায় যায় হইয়াছে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই আমি পুঁথির পোকা হইলাম বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। যেখানে কোন স্বার্থের সম্বন্ধ থাকিবার কথা নহে, এরূপ ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত প্রাচীন আত্মীয়ের নিকট হইতে যখন এইরূপ উপদেশ আসিয়া থাকে, তখন আমার পাঠকপাঠিকাগণ অনুমান করিতে পারেন যে, বড়লোক বলিলে আমরা

বাঙ্গালায় যে শ্রেণীর লোক বুঝি, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির লেখাপড়া শিখিয়া চরিত্রগঠন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন যথাবিহিতরূপে যাপন করিবার কত বিঘ্ন সংসারে আছে। বিদ্যার্জ্জনের সময়ে অনেক দুঃখ কষ্টই করিতে হয়। প্রতিদিবস পাঠ অভ্যাস করিয়া শিক্ষকের নিকট বলাই এক কষ্টকর ব্যাপার। নির্দ্ধারিত সময়ে মাত্র খেলাধূলার অবকাশ, অন্য সময়ে সংযত অবস্থায় কাটাইতে হয়, তাহা বালকের নিকট এক শাস্তিই মনে হয়; তাহার উপর যদি কেহ আসিয়া কাণে মন্ত্র দেয়, "মহাশয়, আপনি রাজার ছেলে, এত কষ্ট করিয়া বিদ্যার্জ্জনের, প্রতিষ্ঠাপত্রের, অপনার আবশ্যক কি? নাম সহি করিতে পারিলেই আপনার যথেষ্ট! আপনাকে উদরান্নের জন্য ত আর চাকুরী করিতে হইবে না!" সে সুমিষ্ট বাক্যগুলি খুব ভাল লাগিবারই কথা; এবং এই প্রকার বিষপ্রয়োগে বালকের মন যে কি পরিমাণে পাঠের প্রতি অমনোযোগী এবং শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে যখন বাড়ী আসিতাম, তখন উপরিউক্ত রূপ মধুর পরামর্শ আমিও লাভ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে পড়াশুনার উপর সাময়িক বীতশ্রদ্ধা আইসা ছাড়া স্থায়ীভাবে পাঠ বন্ধ করিয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক "আনন্দ" (?) করিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। ইহাও বোধ করি শ্রীনাথ বাবুরই চেষ্টার ফল। তিনি যাহাকে বলে 'কুসঙ্গ' সেরূপ সঙ্গী আমার ধারে কাছে বড় ঘেঁসিতে দিতেন না। যাহা হউক প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া কালেজে ভর্ত্তি হইলাম। কিছুদিন মহানন্দে দিন কাটিতে লাগিল। আমার গৃহ-শিক্ষকতার জন্য যাঁহারা তখন নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা, কতদিন আমি রীতিমত পাঠ চালাইতে পারিব, অর্থাৎ কতদিন পর্য্যন্ত আমার মাতা আমাকে ছাত্রাবস্থায় থাকিতে দিবেন, সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন; কারণ সময়ে সময়ে আমার মাতা বলিতেন বিষয় কার্য্য পরিদর্শন জন্য আমার রাজধানীতে উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে কালেজের যে বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়িয়াছি, আমাকে তদপেক্ষা সংস্কৃত, ইংরাজী এবং দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাদি তাঁহারা অধিক করিয়া পড়াইয়া দিতেন, পাছে শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকা আমার অদৃষ্টে না ঘটে, এই আশঙ্কায়। ফলেও হইল তাহাই। শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকা আমার কপালে ঘটিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ প্রতিষ্ঠাপত্রখানি পাওয়া আমার ভাগ্যদেবতার অনভিমত হইল। শিক্ষাজীবনের সবগুলি

পরীক্ষায় যেমন প্রতিষ্ঠাপত্র মিলিল না, সংসারের পরীক্ষাক্ষেত্রেও প্রশংসাপত্র পাই নাই। সে দোষ আমার কি সংসারের, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, বোধ করি উভয় পক্ষেরই। এ কথা শুনিয়া সংসার হয় ত বা রোষপ্রদীপ্ত চক্ষে আমাকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইবেন; তথাপি যে সত্য মনোমধ্যে উদয় হইল, তাহা দ্বিধাহীন অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিয়া ফেলিলাম। ফল ইহাতে যাহাই হয় হউক, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলাম না, কারণ ফলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা, হিন্দুর শাস্ত্রে নিষিদ্ধ;—তাই নয় কি?

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল, সে কথা বলা হয় নাই। আমার ছাত্রাবস্থাতে একবার উত্তরবঙ্গে বিশাল ভূমিকম্প হয় এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ড তাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত টলমলায়মান থাকে, অর্থাৎ প্রথম বেগে কোঠাবাড়ী চালাঘর পর্য্যন্ত ভূপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াও বসুন্ধরা স্থিরা হইলেন না, তাঁহার বেপথুর বেগ থামিল না, মুহূর্ত্তে দশবার করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং সেই বেপমানা বসুন্ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপরিস্থিত সঞ্চরমান জীববৃন্দের সর্ব্বাঙ্গে রোমহর্ষ ও কম্পনের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। আমি তখন রাজসাহী সহরে পঠদ্দশায় বাস করি। জনশ্রুতিতে আমার মাতা আমার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি এক সপ্তাহের বিদায় লইয়া আমার জীবিতাবস্থার সন্দেহহীন প্রমাণ দিয়া মাতাকে সন্তুষ্ট করিতে গেলাম; কারণ মাতা শুনিয়াছিলেন, আমি বাড়ীচাপা পড়িয়া মারা গিয়াছি। চৌদ্দ-পোয়া মানুষটিকে দেখিলে সন্দেহ তাঁহার ভঞ্জন হইয়া যাইবে, এই অভিপ্রায়ে আমার সে যাত্রা বাড়ী যাওয়া। কিন্তু গিয়া শুনিলাম ধরিত্রী যখন কম্পান্বিত-কলেবরা, শ্রাবণের ধারায় যখন অজস্র দেশ রসাতলে যায় যায় বলিয়া জীবমাত্রেই তটস্থ, সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমার বিবাহ! দূরসম্পর্কীয়া দিদিমার মুখে যখন কথাটা শুনিলাম, তখন ঠাট্টা বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সত্যকে তামাসা জ্ঞান করিয়া কতক্ষণ চলে! অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম আমাকে সংসারী করিতে মাতা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং পরদিবসেই বিবাহের শুভদিন স্থির হইয়াছে। সে পরদিন আসিল এবং যথারীতি আমার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পরে যে কয়টা দিন শাস্ত্র এবং প্রথা অনুসারে বাড়ীতে থাকিতে হয়, সেই কয়দিন আমি বাড়ী থাকিয়া আমার পাঠস্থান রাজসাহীতে পুনরায়

ফিরিয়া গেলাম। ভূমিকম্পে মহারাজ রামজীবনের নির্ম্মিত রাজপুরী ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রাচীন কালের কীর্ত্তিস্বরূপবহুল দেবমন্দির মঠ মসজিদ যাহা কিছু নাটোরে বা আশে পাশে ছিল, তাহার চিহ্নও ভূমিকম্পে রাখিয়া যায় নাই। নাটোরের দোলমঞ্চের মত উচ্চ মন্দির আমি বঙ্গদেশে বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আর দেখি নাই। মন্দিরটি এমনিভাবে ভূতলশায়ী হইয়াছিল যে, একখানি ইটের উপর আর একখানি ইটও তাহার খাড়া ছিল না। রাজধানীর সদর ফটক উচ্চতায় এবং আয়তনে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য বলিয়া সকলে বলিত এবং বস্তুতঃ ও তাহাই ছিল; সে সদর দরজার চিহ্নমাত্র অবশেষ ছিল না। সে সদর দরজাটি কেবলমাত্র তোরণদ্বার ছিল না। তাহার সহিত সংলগ্ন উভয় পার্শ্বে দ্বিতল গৃহ ছিল, যেখানে রাজধানীর পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বাস করিতে আমি দেখিয়াছি। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের ৺চন্দ্রকান্ত চৌধুরী, যিনি রাজধানীর অন্যতম প্রধান অমাত্য ছিলেন, তাঁহার বাসা ঐ ঘড়ি-দরজার দ্বিতল প্রকোষ্ঠেই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে সে সকল প্রকোষ্ঠে মানুষ ছিল না, কারণ রাজধানীর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সকলে গুঞ্জাবাড়ীর দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়; সুতরাং যত লোকের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইতে পারে নাই। জলটৌঙ্গী নামক এক দীর্ঘায়তন সৌধ রাজধানীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ সুদীর্ঘ দীর্ঘিকার মধ্য হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল। এই জলটৌঙ্গীবাটীর রকছাড়া অন্য চিহ্ন দেখিয়া তাহার পূর্ব্বস্থান নিরূপণ করাও দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। এমনি নিঃসহায়ভাবে এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ মঠ মন্দির সৌধ ইমারত ভূতল-শায়ী করিয়া তবে ভূমিকম্প নিরস্ত হইয়াছিল।

উপরিউক্ত ইমারতগুলি কেবলমাত্র কীর্ত্তিস্তম্ভই নহে। উহাতে প্রধান অমাত্যগণের এবং আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতের বাসস্থান দেওয়া যাইত। সে উপায় আজ নাই। এই জলটৌঙ্গীর দ্বিতলে তদানীন্তন রাজধানীর প্রধান কার্য্যকারক এবং নিকট আত্মীয় হরিপুর নিবাসী ৺রামকৃষ্ণ চৌধুরী দাদা-মহাশয়ের বাসা ছিল। তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে যখন রাজধানীতে বাস করিতেন, তখন এই জলটৌঙ্গী ঘরেই থাকিতেন; এবং স্বনামধন্য উত্তরবঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী ন্যায়াধীশ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ৺দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় পাঠাবস্থায়, অবসরকালে এবং সরকারি (Government) কর্ম্মে

নিযুক্ত থাকা সময়েও যখন রাজধানীতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট গিয়াছেন, তখন এই জলটৌঙ্গীতেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। আজ সেরূপ আত্মীয় কিম্বা মান্য অতিথির সমাগম হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবার মত ঘর রাজবাড়ীতে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেই সকল প্রাচীন দোলমঞ্চ জল-টৌঙ্গী প্রভৃতি ইমারতের স্থানে আজও পর্য্যন্ত কোন কিছুই প্রস্তুত করা যায় নাই; কারণ বারোআনা বঙ্গের অধীশ্বর মহারাজ রামজীবনের সাধ্য যাহা ছিল, স্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ডের ক্ষুদ্র রাজা জগদিন্দ্রের তাহা সাধ্যাতীত, আমার পাঠক পাঠিকা ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

সমস্ত অন্দরবাড়ীতে একখানি ইষ্টকও খাড়া ছিল না এবং অন্দরে রাজ-ধানীর আত্মীয়া কুটুম্বিনীর দল বহু পরিমাণে তৎকালে বাস করিতেন। তাঁহা-দের মধ্যে কেহ কেহ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু দুই তিনটি ছাদ এবং দেওয়াল-চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে রাজধানীর গুরু শ্রীপাঠ শান্তি-পুরের শ্রীনৃসিংহ নারায়ণ গোস্বামীর শিশুপুত্রও মারা গেল। আমার মাতা এবং ভগিনী ঈশ্বর কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। যে ঘরে তাঁহারা ছিলেন, সেই স্বল্পপরিসর স্থানটুকুর আশ্রয় হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। ইহাকে ভগবৎকৃপা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? এই অবস্থা জানিতে পারিয়া আমার মাতুল ৺বনওয়ারীলাল লাহিড়ী এবং আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় মহাশয় বাঁশের সিঁড়ী লাগাইয়া সেই সঙ্কট স্থান হইতে তাঁহাদিগকে নিরাপদে সমতল ভূমিতে নামাইয়া আনেন। নয়শত নিরানব্বই বিঘা বাস্তুভিটার মধ্যে এমন একটি ঘরও ছিল না, যেখানে মাতা-ঠাকুরাণী এবং আমার ভগিনী আশ্রয় লইতে পারেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ এবং রাজকুমারীর তৃণস্তীর্ণ ভূমির সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ। যে ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, এবং যে ভূমিতেই শেষ শয়ন বিছাইতে হইবে, সহস্র চেষ্টায় সে ভূমির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চাহিলে কি হয়! কোন অজ্ঞাত লোক হইতে দুরন্ত আঘাত আইসে; সেই একটিমাত্র আঘাতের বেগে শাহানশাহা ও ভিখারী, রাজেন্দ্রাণী ও কাঙ্গালিনী সব এক হইয়া যায়!

যথারীতি কালেজে আমার পাঠ চলিতে লাগিল। দুইটি বৎসর সুখে দুঃখে একরূপ কাটিয়া গেল। পরীক্ষা আবার নিকটবর্ত্তী হইল, ফিস্ দাখিল করিলাম, পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে সহরে বসন্ত পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল। আমার মাতা বারম্বার স্থানত্যাগ করিতে আদেশ

পাঠাইতে লাগিলেন; কালেজের প্রিন্সিপাল আমাকে ছাড়িতে চাহেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আমি ভাল করিয়া পাশ করিয়া তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিব;—যদিও ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম সংস্কার। যাহা হউক পরীক্ষা আমার দিতে হইল না। প্রথমে সামান্ত জ্বর দেখা দিল, তাহার পরে হাম জলবসন্ত, সঙ্গে সঙ্গে জাতি-বসন্তও আসিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় বসন্ত-গুটিকার শয্যায় শুইয়া আমি চেতনাহীন অবস্থায় ছাত্রাবাসে গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাধীনে কতদিন কাটাইলাম, আজ তাহা মনে নাই। পরীক্ষা আসিয়াছিল, হইয়া গিয়াছে। আমি সে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। বিদ্যালয়ের সহিত আমার সেই সময় হইতে সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সংশ্রব, সব ঘুচিয়া গেল। বাড়ী আসিলাম—বাড়ী বলিতে ভিটায় আসিলাম, কারণ ঘরদ্বার সবই ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ততদিনেও থাকিবার মত কিছুই প্রস্তুত করা হয় নাই। আমি তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক, ২১ বৎসর বয়স আমার তখনও পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং কোন কথা বলিবার আমার কোন অধিকারই ছিল না, এবং আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কথাই বলিতাম না। থাকিবার—বসবাস করিবার মতন স্থানের অভাবে আমি দেশভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া পথে বাহির হইলাম। যে কুটীরে জন্মিয়াছিলাম, সেখান হইতে আমার জনক জননী আমাকে রাজপ্রসাদে পাঠাইয়া সে কুটীরের সহিত সম্পর্ক আমার জন্মের মত ঘুচাইয়াছিলেন। ভূমিকম্পে এবং আরও দুই একটি পরিবারিক কারণে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ হইতে পথে আমাকে বাহির হইতে হইল। তদবধি আজ পর্য্যন্ত পথে পথেই আছি, এবং যতদূর চক্ষু যায় পথ ভিন্ন আর ত কিছুই আজ চক্ষে পড়িতেছে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

## প্রবাসী, ভাদ্র ও আশ্বিন—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু রসায়ণশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দেশের প্রাচীন গৌরবের কথা ইহার মধ্যে অনেক আছে। এ সব বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে হার্ব্বাট স্পেন্সার যাহাকে the bias of patriotism বলেন,তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া উচিত, এ উপদেশ লেখক নিজেই দিয়াছেন, নিজে পালনও করিয়াছেন। রচনাটি সহজ, সকলেই পাঠ করিতে পারেন, পাঠ করাও উচিত। প্রবন্ধটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় অতীতে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি প্রয়োজনীয় এ কথাটা বুঝিবার জন্য আমাদের বিদেশের দিকে চাহিতে হইবে না, আমাদের পূর্ব্বস্থান পুনরায় লাভ করিতে পারিলে আমরা পৃথিবীতে নগণ্য বলিয়া পরিচিত হইব না।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা বলিয়াছেন। "যদি কোথাও স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা পাঠকবর্গ অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন।" লেখকের এই উক্তিটি না থাকিলেও চলিত; কেন না স্বসম্প্রদায়ের প্রতি একটুও পক্ষপাতিত্ব তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই, বরং শিক্ষকের পক্ষ হইয়া যে কথা অবাধে বলা যাইতে পারে তাহাও তিনি সংকোচের সহিত বলিয়াছেন। "যেমন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের স্ব স্ব বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও জগতকে সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিক্ষা দিবার অধিকার এবং দায়িত্ব আছে, তেমনই শিক্ষক সম্প্রদায়েরও এ বিষয়ে থাকিবার অধিকার ও দায়িত্ব আছে।" "ছাত্র-দিগের শিক্ষাবিধান করিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত হন, তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। ইহার অধিক যদি তিনি করিতে পারেন, খুব ভাল কথা; যদি না পারেন বা না চাহেন তাহা হইলেও তিনি যাহা করিলেন, সমাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে।" লেখকের এই কথাগুলি অনেক শিক্ষকের সাহিত্য রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতে পারে। আমাদের আশা আছে ললিতবাবুর নিকট হইতে তাঁহারা আরও অনেক কথা শুনিতে পাইবেন। তবে শিক্ষক শুধু সমাজের সন্তোষ বিধান করিয়াই নিবৃত্ত হইবেন না, কেননা সমাজের সন্তোষ বিধান করাই তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাকে তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, ললিতবাবু যাহা শিক্ষকের গৌণ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ মুখ্য কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাই।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "বিশ্বসাহিত্যে" আশার কথা আছে। তিনি লিখিতেছেন "আমাদের দেশের খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিকে আমরা ঘরে বসিয়া যথেষ্টই নিন্দা করিয়া থাকি। বাহিরে আসিয়া বুঝিতেছি আমরা সত্য

সত্যই বেশী নিন্দার পাত্র নহি। * * * কি বিষয় নির্ব্বাচন, কি তথ্যসংগ্রহ কি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ—কোন বিষয়েই বিলাতী ও ইংরাজী কাগজওয়ালারা ভারতীয় সহযোগীদিগকে বেশী পশ্চাতে ফেলিতে পারেন না। তবে সমগ্র পাশ্চাত্য-মণ্ডলে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও জীবনই উচ্চতর—এই জন্য স্বভাবতই এখানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা সাময়িক সাহিত্যের সুর কিছু উন্নত।" এই কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। যাহাতে সাময়িক সাহিত্যের সুর উন্নত হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। লেখক বলেন "এই সময়ে আমরা বিশ্বসাহিত্যের সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করিলে সবিশেষ উপকৃত হইব।" প্রসঙ্গক্রমে লেখক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সমালোচনা-রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। "এখানে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এবং আদান-প্রদান বাহির করা হয়, সাহিত্য মণ্ডলে বিনিময় এবং লেন-দেন ও পরস্পর প্রভাব বিস্তার কতটা সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদানই সাহিত্য সমালোচকগণের লক্ষ্য। ইহারা ইউরোপীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইয়াছেন। আমরাও এই প্রণালীতে ভারতীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইতে পারি। অথবা ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান বুঝিতে অগ্রসর হইতে পারি। এইরূপ সাহিত্য সমালোচনার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাস স্পষ্ট ও সজীব হইয়া উঠিবে।" এরূপ সমালোচনা "স্বয়ংই মৌলিক সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি বিজ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষনীয়।" প্রবন্ধটি বিবিধ চিন্তনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ সমালোচনার সুবিধা এখনও কম, তবে এরূপ সমালোচনা আরম্ভ করিবার দিন আসিয়াছে, এখন বিশ্বসাহিত্যের খবর রাখা অসম্ভব নয়। বিনয়বাবুর কথাগুলি বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে পালনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"দেওয়া নেওয়া" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। ভাবে ভাষায় মনোরম, সহজ স্বচ্ছ কবিতাটির উচ্ছল মাধুর্য্য পাঠকের অন্তর শান্তরসে ভরিয়া দেয়। কাঙাল মানুষ চাহিয়া চাহিয়া ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়াছে, তবুও তাহার চাওয়ার অন্ত নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে কাঙ্গালবৃত্তি ভাল লাগে না। তখন প্রিয়কে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা যায়। তাঁহার দানের প্রতি কোন লোভই থাকে না। যে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে চায় সে তাঁহাকে দাতার মত দেখিতে চায় না, তাঁহার রিক্ততাই তখন মনোরম হইয়া উঠে। কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া আসা
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে

পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।
লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে
এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে?
শূন্য পিপাসায় ভরা এ পেয়ালা খানি
ধুলায় ফেলিয়া টানি,—
সারা রাত্রি পথ চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে'
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্ম্মল আলোতে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় "বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত পুরাণ হইতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। "শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম" "কামাখ্যা ভ্রমণ" ও "মিবার-রহস্য" বিবিধ বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ। অজন্তা গুহার চিত্রাবলী চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "আমেরিকার কথা" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকাল আমাদের দেশের স্থান কোন্ খানে এবং তাহার সমস্যাগুলির সম্বন্ধে অন্যদেশীয় পণ্ডিতের মতই বা কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। এই প্রবন্ধে সে ইচ্ছা কতক পরিমাণে পূর্ণ হয়। এখন যে বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজনীয়, যাহা এখন প্রতি ভাবুকের চিন্তার বিষয়, বিনয় বাবু তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রবন্ধটি আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি।

জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সাধারণের পাঠোপযোগী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দ রায় তাঁহার স্বচ্ছ সুন্দর রচনারীতির পরিচয় দিয়াছেন।

## ভারতবর্ষ, ভাদ্র ও আশ্বিন—

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সাধের বীনা" কবিতাটিতে উৎসাহের চেয়ে নিরাশার সুরটিই অধিক ফুটিয়াছে। কবির হাস্য রসের সঙ্গে সঙ্গে যে গভীর করুণ রস সমতানে

প্রবাহিত হইত, তাহা এই কবিতাটিতে বেশ প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের জন্য একটা সরল গভীর ব্যাকুলতা এই কবিতার মধ্যে অনুভব করা যায়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী conceptual worldকে বাঙ্ময় জগত বলিয়াছেন। প্রবন্ধে লেখকের বিদ্যাবত্তা, সুন্দর রচনারীতি ও শক্ত জিনিষকে সহজভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাঙ্গালার দর্শন সাহিত্যে প্রবন্ধটি উচ্চস্থানই অধিকার করিবে। ইহা পুরাতন দর্শনের বিশদ ব্যাখ্যা নয়, বিদেশী দর্শনেরও অনুবাদ নয়। বিভিন্ন দার্শনিক মত যাঁহার আয়ত্ত এমন একজন চিন্তাশীল লেখকের সময়োপযোগী গবেষণা। প্রকৃত দার্শনিকের ধীরতা ও বিচার নৈপুণ্যের উদাহরণ এ রচনায় আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নূরজাহানের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক সর্ব্বত্র সংবাদদাতার আসনই গ্রহণ করিয়াছেন। কোথাও আপনার ভাব, মত বা sentiments প্রকাশ করেন নাই। কেতাবে যাহা আছে এবং যাহা প্রমাণসিদ্ধ তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক রচনায় অনেক সময় লেখকের ভাবপ্রবণতা সত্যকে অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেয় না। লেখক প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর মত সেই ভাবপ্রবণতা হইতে মুক্ত।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মা" শীর্ষক প্রবন্ধটির কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুর কলা কৌশলের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃচিত্র অঙ্কনে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহার কারণই বা কি, তাহার উদ্দেশ্যই বা কত মহৎ এ সব আলোচনা করিবার ভার অন্যের উপর নির্ভর করিয়া ললিতবাবু অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর "ইউরোপে তিন মাস" বহু মাস ধরিয়াই প্রকাশিত হইতেছে, আরও কতমাস লাগিবে এখনও ঠিক বলা যায় না।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "অভিষেক-সঙ্গীত" কবিতাটি আমরা বহু পূর্ব্বেই পড়িয়াছি। তাহাই আশ্বিনের ভারতবর্ষের প্রথম পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "ইয়াঙ্কী স্থানের জের" সুখপাঠ্য। 'সমস্যা'য় শ্রীবিপিনচন্দ্র গুপ্ত বলিতেছেন:—সকলেই ঘরের দিকে ফিরিয়াছে; আমরা কি কেবলই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িব? পর নহিলে কি আমাদের 'ঘর' চলিবে না? যাঁহারা ডাকিতেছেন—'আগে চল, আগে চল, ভাই, তাঁহাদের প্রতি পদক্ষেপের তাল করিয়া আমরা যদি চলিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহারা বলিতেছেন—'ওরা কাঁদবে, ওরা কাঁদবে? বাস্তবিকই কি ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র পাথেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? কেন কাঁদবে? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া? বাস্তবিকই কি আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোনও দিন লুপ্ত হইয়াছিল?" কথাটা সত্য; সত্য সত্যই আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণই আছে। কিন্তু কবে ঘৃত পান করিয়াছি তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া আজ হস্ত আঘ্রাণ করিলে চলিবে কেন? ঘরে শান্তির উপায় থাকিলে কেহই

বাহিরে যাইতে চায় না! ঘর যখন কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায় তখনই মানুষ বাহিরে আশ্রয় অনুসন্ধান করে। ঘরে বসিয়া যদি আমরা জীর্ণ অলসের মত দিন দিন অবনত হইতে থাকি, তাহা হইলে বাহিরেই যাইতে হইবে, তাহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না, বিপিন বাবু বুঝাইয়া দিন—ঘরে বসিয়া মুক্ত জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়ান সম্ভব। Individualism ছাড়িয়া family কে unit ধরিলেও আমাদের সমাজে প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে। সমাজে Individualism ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিতে চাই না। তবে বিপিন বাবুকে Individual হইতে বলি, আপনার বক্তব্য বা মত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে তিনি বিচলিত হইতেছেন কেন? Individualism ভাল কি মন্দ তাহার বিচার হইয়াছে, হইতেছে, কিন্তু আজ এই অচেতন জীর্ণ সমাজকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাহার বহু দিনের সুপ্তি-আবেশ ঘুচাইবার জন্য কতকগুলি individual লেখকের যে প্রয়োজন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ "অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মকাণ্ডে" বুঝাইয়াছেন যে অদ্বৈত ভাবনার সহিত কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধ থাকিতে পারে না। বিষয়টি সহজ ভাষায় বেশ নিপুণতার সহিত লিখিত হইয়াছে।

## সবুজপত্র, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘরে-বাইরে" বেশ জমিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বত্র লেখকের রচনা-চাতুর্য্য পরিস্ফুট হইতেছে একথা বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না। সন্দীপের চরিত্রের অনেকটা আভাষ আমরা পাইয়াছি। সে আইডিয়া জিনিষটাকে একেবারে বাদ দিতে চায়। সে বলে—"আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মৎলবে গড়চে, কিন্তু সেই মৎলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকচে, সেইটের সঙ্গে আমার মৎলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না এই জন্যে তাকে ঢেকে ঢুকে রাখ্‌তে চাই—নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়। * * ভারতবর্ষে আমার জন্ম, সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরুতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি, একথা মুখে যতই বলি, এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই।" এই জন্যই সে আপনার পথে স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হইতে অক্ষম। তবুও সে নিরাশ নয়—তাহার আশা আছে—সে এক সময়ে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে। নিখিল এখন আপনার অবস্থা বুঝিয়াছে। বিমল তাহার নিকট হইতে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে কাঁদিতে চায়—কিন্তু তাহার প্রাণ বলিতেছে "ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে, সে খানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। বিমল এখন ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায় সে উঠিবে এখনও তাহার কোন ঠিকানা নাই। আমরা এখন গল্পের উপসংহারভাগের আশায় আছি। রচনায় অনেক স্থলে লেখকের কবিত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় কবির চাতুর্য্য সমান ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।" ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টলমল করচে—কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের

লাবণ্য। * * সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্য্যাপ্ত হয়ে পড়েচে, নীল আকাশের ভালোবাসার মত।" বহিঃপ্রকৃতিকে মানবহৃদয়ের শোণিত দিয়া এমন করিয়া আঁকিতে খুব অল্প লোকেই সক্ষম হইয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী নব্য-দর্শন আলোচনা করিতেছেন। তিনি বলিতে চান "আমাদের দেশেও কিছু কিছু পুরাতন বর্জ্জন করিয়া কিছু কিছু নূতন সৃষ্টির সবিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সৃষ্টি—সমন্বয় নয়। আজ কাল সমন্বয় কথাটি আমাদের বড় মনে ধরিয়াছে। আমরা নূতন পুরাতন, পূর্ব্ব পশ্চিম, সাকার নিরাকার, হিন্দু ব্রাহ্ম, ইত্যাদি সকল বিষয়ের সকল পদার্থেরই যেন-তেন-প্রকারেণ সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমার বিশ্বাস ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমন্বয়ের ন্যায় গুপ্ত শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। যেখানে উভয় পক্ষেই সমবল, সেখানেই সমন্বয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে একজন অপর অপেক্ষা হীনবল, সে ক্ষেত্রে সমন্বয় হয় না—সেখানে একজন অপরকে গ্রাস করে। আগে নূতন সৃষ্টি করুন, নূতনকে নিজের চিন্তার ও জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া তুলুন, তারপর নূতনের সহিত পুরাতনের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সমন্বয় সাধন করিবেন।" কথাগুলি প্রনিধানযোগ্য। নব্যদর্শনের আলোচনা করিতে গেলে দার্শনিকের যে সাহস, নির্ভীকতা ও রচনায় যে স্বচ্ছতা ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় আশা করি তাহার অভাব হইবে না। ভাষা দু একস্থলে অস্পষ্ট, উক্তি অনেক স্থলে সংকোচপূর্ণ, সেই জন্যই এ কথা বলিলাম।

"ঐতিহাসিক" শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের রচনা। লেখক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের বিপক্ষে দু চারিকথা বলিতে চান্। তাঁহার বক্তব্য নিম্নে সংকলন করিলাম (১) প্রকৃত বিজ্ঞানের তত্ত্বের মত কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কোন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকই আজ পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারেন নাই (২) পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে চরিত্রনীতি বা রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসের শিক্ষার দ্বারা পাকা হইয়াছে এমন ত কোথাও দেখা গেল না। লেখক দুটি যুক্তি দেখাইয়াছেন, পাণ্ডিত্যের প্রকাশও দু একস্থলে আছে কিন্তু তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। উপরকার দুইটি কথা উল্লেখ করিয়াই তিনি আসল কথা পাড়িয়াছেন "আসল কথা ঐতিহাসিক কার্য্যকারণ স্থির করা বা রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া ঐতিহাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আমাদের অতীতকে আমাদের সামনে ধরাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।" আসল কথাটা বুঝিলাম কিন্তু 'অনাসল' কথাটা বড়ই অস্পষ্ট রহিয়া গেল। লেখক বলেন ঐতিহাসিক সাহিত্যকারের প্রয়োজন আছে, নিশ্চয়ই আছে। ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক কথাটা আমরা বুঝিতে পারি না। ইতিহাসের সবটুকু সাহিত্য নয় সাধারণের জন্য ঐতিহাসিক সাহিত্য প্রয়োজনীয়, তবে শুধু ঐতিহাসিক সাহিত্য চলিবে না, তাহার জন্য ন্যায়সম্মত ইতিহাসেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

"কৃপণতা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের দারিদ্র্য ও অভাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি আলোচনার যোগ্য মনে করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। "ইংলণ্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে

ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবার তন্ত্রের জন্য।

রেলে ষ্টীমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, বিধি ভাঙ্গে নাই।

সমাজের দাবী তখন ফলাও ছিল—পরিবারের ক্রিয়াকর্ম্মেও তাহার দাবী কম ছিল না। সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম পালপার্ব্বন আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিসপত্র সস্তা চালচলন সাদা।

এদিকে সময় বদলাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবী আজও খাটো হয় নাই।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্ব্বের মত সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কি? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না। দেশ কালের টান বিষম টান।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। ক্রিয়াকর্ম্ম বা যা কিছু করি না কেন, সেই সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে।

তার ফল হইয়াছে—জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণ যাত্রা হইয়াছে।

এমন এক সময় ছিল যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবার বৃদ্ধিকে লোকবল বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে।

যারা লুটপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায় দূর দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা নিয়মের মধ্যে আট্‌কা পড়ে না; এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আরও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে মানিয়া লওয়া।

ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন দেবতার পূজা যথাসর্ব্বস্ব দিয়া যোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলি নরবলি দিয়া আসিতেছি।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিসটা কোনো একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যেই। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না কতকগুলো নিয়মকে চোক বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয়, তারা কোনদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না।

এইকারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড় রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব।

কথাগুলি রবিবাবুর, সেই জন্য অনেকের দৃষ্টি ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, আকৃষ্ট হওয়াও উচিত কেননা লেখক এখানে একটা বড় রকমের সাময়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। তবে কতকগুলি কথা আমাদের বলিবার আছে। রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া একটা জিনিস আমাদের ভিতর একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য ব্যয় করি না বটে, তবে সেটা যে শুধু পরিবাতন্ত্রের জন্যই ব্যয় করিয়া থাকি,একথা সত্য নয়। যাঁহাদের অর্থ ছিল,তাঁহারা দেশের জন্য সাধারণের জন্য অনেক কাজ করিয়াছেন। আজও অনেকে হিতব্রত সত্যভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরিবার-তন্ত্রের বাঁধন মানিয়াই কি আমরা সেবাধর্ম্মে বিরত হইতে বাধ্য হইতেছি? গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে একথা কি আমাদের প্রতি প্রযোজ্য? গৃহের বন্ধন কেহই একেবারে ছেদন করেন নাই, করাও সামাজিক জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও অনেক দেশবিদেশের অনেক লোক স্বাধীন চিন্তার দ্বারা ধনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন অনেকে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লেখক ইউরোপের নজির দেখাইয়াছেন। ইউরোপের লেখকেরা কি পরিবার লইয়া বাস করে না? তারাও কি পরিবারের দাবী মিটাইতে অস্থির হয় না? ইউরোপে যাঁহারা স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে মহারথী তাঁহাদের সকলেই গৃহের বন্ধন ছিঁড়িয়াছেন এমন কথা কোথাও শুনি নাই। সর্ব্বপ্রকার tradition বা নিয়ম-বন্ধন হইতে মুক্ত ব্যক্তিকে আমরা কল্পনা করিতে পারি, চাক্ষুষ দেখিতে পাই না। সত্য বটে, আমাদের সমাজ বন্ধন এখন কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পবিত্র বাঁধন দেবতার পূজা যথা সর্ব্বস্ব দিয়া আমরা অনেক সময় যোগাইয়া থাকি। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের মূলও যে এইখানে একথাটা মানিতে সংকুচিত হইতে হয়। মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অনশনে অস্বাস্থ্যে ঘর বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে, না মানিয়া চলিলে যে তাহা হইত না, একথাই বা কে বুঝাইয়া দিবে? আশাকরি রবিবাবুর নিকট হইতে আমরা এসব প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিব। আমাদের দৈনিক জীবন যে সব সমস্যার মীমাংসা চাহিতেছে তাহার স্বচ্ছতা ও সম্পূর্ণতা প্রয়োজনীয়।

"শরৎ" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। পশ্চিমের শরৎ ও এদেশের শরতে প্রকৃতি-গত কি প্রভেদ তাহাই কবির ভাষায় সুন্দর সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত উদ্ধৃত করিলাম :—যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে মেয়েকেও জানিতে হইবে,—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে, তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলি ভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। * * মেয়েরা যদি বা কাণ্ট হেগেল ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূরছাই করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে—একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। * * স্ত্রী হওয়া মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব, দাসী নয়। * * পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার সঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।"

প্রতি শিক্ষিত বঙ্গবাসী এই মত লইয়া আজ বিদেশের অধিকারলোলুপ স্ত্রী সমাজের বীভৎস অভিনয়ের প্রতি চাহিয়া আছেন।

সবুজ পত্রের টীকাটিপ্পণী বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ।

## ভারতী, ভাদ্র ও আশ্বিন—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ককারের অহঙ্কার" হাস্যোদ্দীপক, পড়িলে আনন্দ পাওয়া যায়, তবে সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজরী পঞ্চাশৎ" বড়ই দীর্ঘ; তবে স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে; অনেকগুলি শ্লোক আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। লেখকের ভাষা অনেক স্থলে অস্পষ্ট—কবিতাটি পড়িতে পড়িতে বোধ হয় লেখক ছন্দটিকে যতটা আয়ত্ত করিয়াছেন ভাবপ্রকাশ করিবার উপযোগী ভষাটিকে তেমন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

"জীবন মরণ" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। কবি বলিতেছেন আমাদের জীবন, আমাদের চাওয়া সত্য; আমাদের মৃত্যু, আমাদের চলিয়া যাওয়াও সত্য। দুটিই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনখানে কোন মিল আছে।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনো খানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল

এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে কিছুকাল কিছুতে বহিতে পারিত না
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এত দিনে
হয়ে যেত কালো।

এই তত্ত্ব কথাটি রবিবাবু পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দেশেও কথাটা নূতন নয়। উদ্ধৃত কবিতায় রস নাই—শুষ্ক তত্ত্বটাই মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ভাসকবিপ্রণীত অবিমারকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। অবিমারকের আখ্যানবস্তু ভাসের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। লেখক বলিয়াছেন বাৎস্যায়নপ্রণীত কামসূত্রের একস্থলে অবিমারক নামের উল্লেখ আছে। জয়মঙ্গলটীকায় অবিমারকের কাহিনী যেরূপ লিখিত আছে তাহার সহিত ভাসের নাটকের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধে সমালোচনার অংশটি বড়ই অগভীর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চাষার বাড়ী" মোপাসাঁর ফরাসী হইতে গৃহীত। লেখক বাঙ্গালার অনুবাদ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। বিষয় নির্ব্বাচনেও তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য।

## নারায়ণ, ভাদ্র ও আশ্বিন—

"কবিতায় কষ্টিপাথর" শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের আলোচনা; লেখক বলিতেছেন "মুখে তিনিই যাহা বলুন না কেন, ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া সত্যাসত্যের সুন্দর কুৎসিতের এবং ভালমন্দের একটা সার্ব্বজনীন মাপকাঠি ও আদর্শ যে আছে, যেখানেই বিচার আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বাদী-প্রতিবাদী, অর্থী, প্রত্যর্থী পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ সেইখানেই কার্য্যতঃ ইহা মানিয়া লওয়া হয়।" সমাজের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে এ কথা ঠিক। তবে যাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individualism) পক্ষপাতী তাঁহাদের কবি বলিবেন "আমার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। কবি জানেন যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারও কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা;—যে লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা।" একথাও ঠিক, তবে এ কবিকে স্বীকার করিতে হইবে যে সেই আদর্শটা সকল কবির সকল সময়েই বিশুদ্ধ থাকে না, তাহা নানা কারণে কখনও আবৃত হয়, কখনও বিকৃত হয়। সেই জন্যই সমালোচকের প্রয়োজন, সেইজন্যই বিচার-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক। সমালোচকেরা একটা সার্ব্বজনীন মাপকাঠি গড়িয়া তুলুন, তাহার উপকারিতা আছে, যে কবির আদর্শ আবৃত বা বিকৃত, তাঁহার পক্ষে এ মাপকাঠিটা কাজে লাগিতে পারে। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে

অসংখ্য নিয়মে আবদ্ধ করিয়াও বলিয়াছেন কবির ভারতী আনন্দময়ী স্বতন্ত্র, কখনও পরতন্ত্র নয়। আমরাও তাঁহাদের মতই অবলম্বন করিয়া উক্ত দুই মতে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বৌদ্ধধর্ম্ম" চলিতেছে। সহজযানের কথা চিত্তাকর্ষক। সহজ ধর্ম্মের অনেক কথা বাঙ্গালায় লেখা। সেকালের বাঙ্গালা ভাষার নমুনাও লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপাতের বিবরণটিও সুখপাঠ্য। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও একটা ইতিহাস গড়িয়া তুলিতেছেন; দেশে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ভাব বা ধর্ম্মমতের উদয় হইয়াছে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া লেখক দেশের ভাব ও দর্শনের ইতিহাস রচনার সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল "ধর্ম্ম, নীতি ও আর্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্য-সমালোচনার মাপকাঠির কথা বলিয়াছেন তিনি বলেন "এ মাপকাঠি সরকারি মাপকাঠি হওয়া চাই; দশজন তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া জানিবে বা জানিতে বাধ্য হইবে এমন মাপকাঠি। একথা সত্য যে একটা সরকারি মাপকাঠি অনেক সময় গড়িয়া লইতে হয়। কিন্তু এই মাপকাঠিটাকে আজ দশজনে মানিলেও কাল যে বিশজনে ইহাকে ছোট না হয় বড় করিতে বলিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সেই জন্য মনে হয় সরকারি মাপকাঠির অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করিয়া নিজের অন্তরের মাপকাঠি বা অনুভূতির আনন্দ দিয়া বিচার করা সহজ ও সমীচীন। দশটা মতের সহিত মিলাইয়া যে মাপকাটি তৈয়ারী হয়, তাহা হয় খর্ব্ব না হয় অস্বাভাবিক। আদর্শ-গোলাপ দেখিতে পাওয়া যায় না, লেখক বলেন 'তবুও তাহাকে মানিয়া লইতে হয়। সাহিত্যের সঙ্গে গোলাপের উপমা চলে না। গোলাপ প্রকৃতির জিনিস, সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি, গোলাপ এক ভাবেই ফুটিয়া আসিতেছে, সাহিত্য বা মানুষ ক্রমোন্নতির পথে। গোলাপের সব কার্য্যকলাপই আমাদের জ্ঞাত, কিন্তু গোলাপের পরিণতি কোথায় তাহা গোলাপ জানুক আর নাই জানুক, মানুষ কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু আপনার পরিণতি কোন্‌খানে সে বিষয়ে মানুষ এখনও নিশ্চিত হইতে পারে নাই। সেই জন্য গোলাপের আদর্শ কল্পনা করা যতটা সোজাসাহিত্যের বা মনুষ্য জীবনের আদর্শ কল্পনা ততটা সহজ নয়। সেই জন্য সমালোচক আপনার অনুভূতির আনন্দ দিয়া সাহিত্যের বিচার করুন, পরকে সে আনন্দ দান করিবার চেষ্টা করুন। তিনি নিজে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইলে, অন্যে তাহা সত্য বলিয়া মানিবে না। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি তাহা ঠিক বুঝিলাম না। লেখক নারায়ণে প্রকাশিত অশ্লীল কথানাট্য সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিতেছেন—"একদিকে যেমন এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিকে অত্যন্ত হীন, হেয়, ভদ্রসমাজে অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি; অন্যদিকে সেইরূপ, যে কৃত্রিম, কল্পিত, গতানুগতিক ধর্ম্মের, নীতির ও শীলতার দোহাই দিয়া এগুলির এমন নিন্দাবাদ হইতেছে, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া তদপেক্ষা শতগুণে বেশী প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।" আমরা বলি যাহা সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার উপযুক্ত নয়, অথচ যাহা একটা নিছক অশ্লীলতা, শুধু ইতর সমাজেই পঠিত হইবার আশা রাখে, তাহা একখানি ভদ্র-

সমাজের মাসিকপত্রে মুদ্রিত হইলে সমালোচক যদি আপনার আসন ছাড়িয়া ভদ্রসমাজের একজন ব্যক্তির মত ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ বা শ্লীলতার দোহাই দিয়া আপনার মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে আমরা কোন আপত্তিই দেখিতে পাই না। সাহিত্যে খানিকটা অসার আবর্জ্জনা বা ঘৃণ্যবস্তু দেখিয়া ধীর ও শান্ত মনে দীর্ঘপ্রবন্ধে তাহার সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ বা নিপুণ সমালোচকের মত ধর্ম্ম, নীতি ও আর্টের সম্পর্ক বুঝাইবার ধৈর্য্য অনেকের নাই, তাঁহাদের আমরা অধীর বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহারা যে সমালোচক নন একথা বলিতে গেলে, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে।

# চাঁদের আলো

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো, আমার চাঁদের আলো!
এসেছ আজ ছাদের আঙ্গিনায়;
জনম দিয়ে, মরণ দিয়ে তোমায় বাসি ভালো—
হৃদয় আমার, তোমায় সুধু চায়!
পাতলা মেঘের চাদর খুলে',
নীলসায়রে দুলে'-দুলে,'
তারার পিদিম্ উষ্‌কে দিয়ে ঝিঁঝির ঝুমুর পায়—
ধরায় আন' ঘুম্-পাড়ানো মায়া;
ঢল-ঢল' রূপার স্বপন পরশ-অতীত্ গায়—
বনের তলায় পালিয়ে যে যায় ছায়া!

চীনে মাটীর ছোট্ট টবে সবুজ চারা গাছে
ফুটে ওঠে জুঁই চামেলীর কুঁড়ি,
হঠাৎ-জাগা এলমেল' বাতাস এসে কাছে
ফুলবাগানে কর্‌চে হুড়োহুড়ি।
প্রিয়া আমার ঘুমিয়ে আছে,
খোকা নিয়ে বুকের কাছে—
এলিয়ে-পড়া নরম খোঁপায় জড়িয়ে চাঁপার মালা—
ফরসা হাতে সিঁদুর-মাখা শাঁখা;
চাঁদের আলোয় আজ্‌কে তাহার রূপের শিখা জ্বালা,
চোখের পাতায় বুকের কথা আঁকা!

বিশ্বে মোরা দুঃখশোকে নিত্য মর-মর,'
উথ্‌লে ওঠে বৈতরণীর ঢেউ,
দগ্ধ মরুর শুষ্ক তৃষায় চিত্ত জর-জর'—
সাথের সাথী নেইক' বটে কেউ;
তবু যখন চাঁদের আলো—
ভালবেসে সোহাগ ঢালো,
তখন বুকের ভাঙ্গা ঘরে অতীত্‌কালের স্মৃতি,
মর্‌চে-ধরা মনের কুলুপ খুলে,
তন্দ্রালোকের ছন্দ দিয়া রচি' তোমার গীতি,
ভাসাই তরি কল্পনদীর কূলে।

চাতক হয়ে দূর নীলিমায় মিশিয়ে যাব বঁধু,
অজানা ঐ অসীম-সীমানায়,
সুধার মত পান করিব তোমার রূপের মধু—
টলমল' প্রাণের পিয়ালায়।
আমার আশা, আমার ভাষা,
আকাশ-নীড়ে বাঁধ্‌বে বাসা;
পায়ের নীচে থাক্‌বে জগৎ নিয়ে চিতার ধূম,
মাথার উপর আলোর শতদল;
জাগরণে, ফেল্‌বে ছেয়ে চিরকালের ঘুম,
থামিয়ে দিয়ে সকল কোলাহল।

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো, সোনার চাঁদের আলো,
এস আমার হৃদয়-কিনারায়,
প্রেমের মত, প্রিয়ার মত তোমায় বাসি ভালো,
মানস-শিশু, তোমায় আজি চায়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

# জীবনের মূল্য।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### পুরাতন প্রসঙ্গ।

সতীশ দত্তকে বিদায় দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্তঃপুরে গিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিলেন। তাহার পর নিয়মিত আফিমটুকু খাইয়া আবার বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। সেখানে বসিয়া উত্তমরূপে ধূমপান করিয়া, উড়ানি চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া, ছড়ি হাতে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলেন। দূরে কোথাও নহে বহির্ব্বাটীরই সন্নিহিত নিজ বাগানখানিতে প্রবেশ করিলেন।

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ কথিত সেই মিষ্ট সংবাদটি তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে—চৈত্র মাসের চক্‌চকে চাঁদ—আজ আবার ত্রয়োদশী। মিঠা মিঠা বাতাস বহিতেছে, ফুল ফুটিয়াছে,—পঁচিশ বছর আগেকার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম পক্ষে বিবাহ হইবার পর, চাঁদের আলোতে এই রকম বিহ্বল হইয়া এই বাগানেই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তখন ঘুরিতেন, সে নূতন হইয়া আবার আসিয়াছে। তিনি নিজে পুরাতন ও নড়্‌বড়ে হইয়া পড়িয়াছেন এই যা দুঃখ।

বাগানের প্রান্তভাগে একটি বকুল গাছ—গন্ধের দূত পাঠাইয়া সে যেন মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করিতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে সেই বকুল গাছের নিকট গেলেন। গাছের তলাটায় অন্ধকার, সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু শিষ দিয়া যৌবনকালের একটি গান গাহিতে লাগিলেন। গানটি—'সহেনা সহেনা বিচ্ছেদ বিরহ প্রাণসখি রে'। তাহার পর, ধীরে ধীরে গানের কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইল। মনে মনে বলিলেন "না—এ সকল বস্তু সেকেলে! ও প্রাণসখী ট্রাণসখী আজকাল আর চলে না। এ যেন গোপালে উড়ের যাত্রা হচ্ছে। এদানী থিয়েটারের যে সব গান টান হয়েছে সেইগুলিই ভাল।"

এই প্রকার মন্তব্য করিয়া মুখোপাধ্যায় বকুলমূল পরিত্যাগ করিলেন। বাগানের মাঝা মাঝি একটি পাকা চবুতারা গাঁথা ছিল, চাদরের প্রান্তদিয়া এক অংশের ধুলা ঝাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিলেন।

বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"পূর্ব্বজন্মের কথা কি মানুষের মনে থাকে ?—পটলির কি মনে আছে ? সম্ভব নয়, কলিকাল যে। তবু কিন্তু সে বলে বস্‌ল, "ওঁকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।" সেটা বোধ হয় পূর্ব্বজন্ম-গত সংস্কার। সতী স্ত্রী—নিজের স্বামী ছাড়া আর কি কাউকে বিয়ে করতে পারে ?"

বাগান হইতে কিছুদূরে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া কয়েকজন টোলের ছাত্র বাগ্‌-বিতণ্ডা করিতে করিতে যাইতেছে—সেই দিকে মুখোপাধ্যায়ের কাণ গেল। তাহাদের কোনও কথা বুঝা গেল না। তাহারা চলিয়া গেলে মুখোপাধ্যায় আবার ভাবিতে লাগিলেন—"কারু কারু নাকি পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে শুনছি। তা যেদি হয় তা হলেই ত মুস্কিল। সুরেন জন্মাবার পরে সে যখন আঁতুড় ঘরে ছিল, তখন সেই যে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেইটি মনে থাক্‌লেই চিত্তির আর কি ? বোধ হয় কোন কথাই পট্‌লির মনে নেই। তা যদি থাকত তাহলে এতদিন সে কি কোনও কথা আমায় বলত না ? বিয়ে হয়ে গেলে তাকে কিন্তু বল্‌তে হবে যে এই ব্যাপার। পূর্ব্বজন্মেও সে আমার স্ত্রী ছিল শুন্‌লে নিশ্চই আমার প্রতি তার ভালবাসা আরও বৃদ্ধি হবে। নরেন সুরেনের প্রতি মায়া মমতাও বেশী হবে। আসল কথাটা খুলে তাকে বলতে হবে বৈকি—নিশ্চয় বলতে হবে। চৈত্রমাস—বৈশাখ মাসে ত আমাদের বংশের কারু বিবাহ হবারই যো নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের সব প্রথম যে দিনটি আছে, সেই দিনই ধার্য্য করতে হবে। আমও পাক্‌বে তদ্দিন।"

ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল—"পিসিমা বল্‌ছেন, রাত হয়ে গেল, সন্ধেটা করে একটু জল টল খাবেন কখন ?"

মুখোপাধ্যায় রাগিয়া বলিলেন—"যা যা—এখন দিক্ করিস্‌নে।—"ভৃত্য চলিয়া গেলে তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন—"সে জন্মে তার রাগ অভি-মানটা বড়ই প্রবল ছিল। মনটাও একটু সন্দিগ্ধ গোছের ছিল। জানিনে এবার কি রকম ভাবটা দেখতে পাব। একদিন কথায় কথায় সে বলেছিল—আমি যদি মরে যাই, ছমাস পোয়াতে না পোয়াতেই তুমি আবার হাতে সূতো বাঁধো।—আমি বলেছিলাম—ছি ছি ও অমঙ্গলের কথা মুখেও এন না। আর, যদি তাই হয়, তোমায় ভুলে গিয়ে আবার একজনকে বিয়ে করব এমন বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম আমি নই।—এসে আবার, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলাম বলে রাগ অভিমান না করলে বাঁচি।—যদি খোঁটা দেয় তবে বলব। বলব, তুমি যে ফিরে

আসবে তাকি আমায় বলে গিয়েছিলে? বলে যেতে ত আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতাম।—পুঁটু বুচিকে বোধ হয় সে এসে দুচক্ষে দেখতে পারবে না। হাজার হোক্ সতীনের মেয়ে ত। সতীন বলে সতীন; সে জন্মের সতীন, আবার এ জন্মের সতীন—দুজন্মের সতীন।"

এমন সময় পুঁটু দূর হইতে ডাকিল—"বাবা।"

মুখোপাধ্যায় চমকিয়া সেইদিকে চাহিলেন। বলিলেন—"কি মা?"

কন্যা বলিল—"গোকুল কাকা এসেছে, বৈঠকখানায় বসে আছে।"

গোকুল ইঁহার খাতক। স্মরণ হইল, সুদের হিসাব করিবার জন্য আজ সন্ধ্যার পর গোকুলের আসিবার কথা ছিল বটে, কিছু টাকাও আজ দিবে বলিয়াছিল। সুতরাং প্রণয় চিন্তা আপাততঃ মুলতুবি রাখিয়া, মুখোপাধ্যায় উঠিয়া কন্যার সহিত বৈঠকখানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয্যায় বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে একটা কথা হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিবার পর, সে স্ত্রী নিজ পিত্রালয়ে থাকা কালীন অনেকগুলি চিঠি তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন। সেই পুরাতন চিঠিগুলি, ময়ূরকণ্ঠী চেলি ছেঁড়া খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া বড় যত্ন করিয়া সে নিজ তোরঙ্গের মধ্যে রাখিয়াছিল। পটুলি আসিয়া যদি সেই চিঠির বাণ্ডিল হাতে পায় তবে সেগুলি পড়িয়া যে কি কাণ্ড বাধাইবে কে বলিতে পারে? সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলা আবশ্যক।

ধূমপান শেষ করিয়া মুখোপাধ্যায় শয্যা হইতে নামিলেন। হুঁকাটি বৈঠকে রাখিয়া, চাবি লইয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীর তোরঙ্গটি খুলিয়া অনুসন্ধানের পর সেই পুঁটুলীটি বাহির করিলেন। ঘরে একটি হরিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। সেটি উঠাইয়া পালঙ্কের নিকট জানালায় রাখিয়া বিছানায় বসিয়া চশমা চোখে দিয়া চিঠিগুলি একখানি একখানি করিয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। চিঠিগুলি আবার বাণ্ডিলে বাঁধিয়া, বালিসের তলায় রাখিয়া, আলো নিবাইয়া মুখোপাধ্যায় শয়ন করিলেন।

অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—"মায়া—মায়া—এ সকলই মায়া—সকলই ভুল। দুবার ভুল যখন করা গেছে—আরও একবার করা যাক্। কথায় বলে বার বার তিন বার।"

———

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### নরাঙ্কিত ন্যায়।
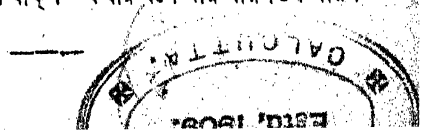
"বুকুয্যে বশাই—ও বুকুয্যে বশাই—শুলে যাল্—শুলে যাল্।

সেইমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিরিশ মুখোপাধ্যায় কাঁধে একখানি চাদর ফেলিয়া ছাতা হাতে হন্ হন্ করিয়া ভট্টাচার্য্যপাড়া অভিমুখে চলিয়াছিলেন। নিকটস্থ এক বৈঠকখানা হইতে উক্তরূপ গর্জ্জন শুনিয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া হুঁকা হাতে করিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী বসিয়াছিলেন। তিনি আবার হাঁকিলেন—"শুলে যাল্।"

রাস্তা হইতে বৈঠকখানা অবধি একটি সরু গলি পথ। উভয় পার্শ্বে বাখারির বেড়া দেওয়া বাগান। বেড়ার কোলে দশবাইচণ্ডীর গাছ, মাঝে মাঝে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাগানে আতা গোলাপ জাম ও নেবুর গাছ—নেবুফুলের উগ্র গন্ধ আসিতেছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধীর পাদবিক্ষেপে বৈঠকখানার নিকটে পৌঁছিয়া, কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন—"সকালবেলা শূলে যান শূলে যান বলে চেঁচাচ্ছ কেন? খুন করেছি না ডাকাতি করেছি? শূলে যাব কেন?"

চক্রবর্ত্তী হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"ওগো না না—শূলে যেতে বলি নি। বল্লাম শুলে যান। দন্ত্য ন কি আর উচ্চারন হয়? সর্দ্দিতে নাক যে একেবারে বন্দো। প্রলাপ। আসুন—উঠে বসুন। বলি এই প্রাতঃকালে হন্ হন্ করে চলেছিলেন্ কোথায়?"

মুখোপাধ্যায় মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"যাচ্ছিলাম একটু জরুরি কাজে এখন্ আর বস্‌ব না।"

"আহা, তৈরি তাবাক্—দুটান্ টেনে যান্। বসুন্, একটা কথা আছে।"

মুখোপাধ্যায় উপরে উঠিয়া চক্রবর্ত্তীর পাশে বসিলেন। হুঁকাটি হাতে লইয়া বলিলেন—"তোমার সর্দ্দিটে আবার যে বেড়েছে দেখ্‌ছি।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"আঃ—জ্বালাতন্—জ্বালাতন্। দিন্ কতক একটু কোবে গিয়েছিল। একজন বলেছিল যে আড়াই তোলা গাওয়া ঘি গরব্ করে তার সগ্‌গে আড়াইটে গোলমরিচের গুড়ো মিশিয়ে খেও—তাই খেয়ে দিন্ কতক বেশ ভালই ছিলাব্। কাল থেকে আবার বেড়েছে। আপনি ওষুধ বিষুধ কিছু জানেন?"

"আমি ত ওষুধ বিষুধ কিছু জানিনে ভাই"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় তামাক টানিতে লাগিলেন। পরে হুঁকাটি চক্রবর্ত্তীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা হে?"

চক্রবর্ত্তী এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—"বলি, একটা গুজব শুনছি—সত্যি দাদা?"

"কি গুজব শুন্‌লে?"

"আপনি নাকি আবার সংসার কচ্ছেন?"

মাধব যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে, মুখোপাধ্যায় তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। কথাটা প্রচার হওয়া অবধি গ্রামে একটা হাসি টিট্‌কারী চলিতেছে, তাহাও তিনি জানিতেন। বলিলেন—"তা করিই যদি—আমার কি বয়স গেছে?"

"বয়স গেছে বল্‌ছিনে। কিন্তু—আর কেন দাদা? অমন সোনার চাঁদ সোনার চাঁদ ছেলে দুটি রয়েছে, তাদের বিয়ে দিন, নাতি পুতি নিয়ে আনন্দে দিন কাটান্—আপনি আর ও ফাঁদে পা দেবেন না।"

"হুঁঃ"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"আপনাকে কে নাচাচ্ছে, তা যানিনে—যেই হোক্—সে বন্ধুর কায করছে না। এ কার্য্যটি করলে আপনার সংসারের শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে যাবে—আখেরে পস্তাতে হবে দাদা। বুড়ো বয়সে এ দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দিন্।"

মুখোপাধ্যায় ভিতরে ভিতরে রাগিতেছিলেন। বুড়ো বয়সের কথাটা শুনিয়াই সে রাগ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন—"হ্যাঁ দেখ, তোমাদের কেমন যে বদ অভ্যেস—পরের চর্চ্চা না করে কিছুতেই থাক্‌তে পার না। কিসে আমার ভাল কিসে আমার মন্দ তা আমি বিলক্ষণ বুঝি। আমি কচি খোকাটি নই। তোমার উপদেশ তুমি শিকেয় তুলে রেখে দাও গে। আমার তাতে কিছু প্রয়োজন নেই।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন, চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বারান্দার পৈঁঠা দিয়া নামিয়া গেলেন।

"দাদা, রাগ কর্‌লেন্? দাদা, রাগ কর্‌লেন্?"—বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও নামিলেন।

মুখোপাধ্যায় হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন। কয়েক পা গিয়া চক্রবর্ত্তী তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—

"রাগ কর্‌বেন্ না দাদা!"

মুখোপাধ্যায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"রাগ আবার কে করছে? ছাড়—হাত ছাড়—ভাল লাগে না।"

অগত্যা তখন হাত ছাড়িয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"এ কার্য্য যদি করেন্—তবে প্রথব্ আবার বুখ দিয়ে যা বেরিয়েছিল—শূলেই আপনাকে যেতে হবে দেখতে পাচ্ছি। এটা বোধ হচ্ছে নরাঙ্কিত হয়ে গেল। আবার বুখ দিয়ে দেবতারা আপনাকে সাবধান করে দিলেন্। নইলে এদ্দিন্ না তদ্দিন্—এই সময়টাই এবন্ সর্দ্দিটে হল কেন? এটা নরাঙ্কিত হয়ে গেল দাদা—নরাঙ্কিত হয়ে গেল।"

মুখোপাধ্যায় ঝাঁঝিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হে—তাই। চল্লাম এখন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"আসুন্ তবে—প্রনাপ।"

কোনও আশীর্ব্বাদ না করিয়া মুখোপাধ্যায় পথে নামিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী গিয়া পাঁজি দেখাইতে হইবে—জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বিবাহের উপযুক্ত কোনও শুভদিন আছে কি না। সেই জন্য তাড়াতাড়ি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

অভাগী। উপন্যাস। শ্রীজলধর সেন প্রণীত। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোলপেজি ৩১১ পৃষ্ঠা, একখানি ছবি আছে, কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ৷৷৹।

প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন, বিলাতে ছয়পেনি সংস্করণ, সাতপেনি সংস্করণ, শিলিং সংস্করণ প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশে সেরূপ কিছুই নাই—তাই তিনি আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। "অভাগী" সেই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। এত বড় অথচ ভাল কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই পুস্তক গুরুদাস বাবু আট আনায় কেমন করিয়া দিতেছেন আমরা ত ভাবিয়া পাই না।

"অভাগী" একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। গল্পটি করুণরসপূর্ণ—করুণরসের অঙ্কনেই জলধর বাবু সিদ্ধহস্ত। সুতরাং উপন্যাসখানি যে উপাদেয় হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। যখন পড়িলাম, দীনেশের জেল হইয়া গেল, তাহার স্ত্রী, অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা সুশীলাকে লইয়া স্বামীর বন্ধু হরিশবাবুর বাড়ীতে অন্দরের দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস

করিতে লাগিলেন, বাড়ীর বৈঠকখানায় হরিশবাবুর শ্যালক তিনকড়ি পাড়ার কনুসার্ট পার্টির মহলা বসায় এবং পাসের ঘরে বসিয়া সুশীলা উহাদের জন্য চা প্রস্তুত করে—তখন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। দিন সময় ভাল নয়—অবিধ প্রণয়ের কুৎসিৎ ও স্তম্ভকারজনক চিত্রই আজকাল "আর্ট" বলিয়া গণ্য জলধর বাবুও বুড়া বয়সে সেই পূতিগন্ধময় স্রোতে যদি গা ঢালিয়া দেন তাহা হইলে কি উপায় হইবে? কিন্তু পড়িতে পড়িতে দেখিলাম আমাদের সে আশঙ্কা অমূলক—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সুশীলা কুলত্যাগ করিয়াছিল—অথবা যাহা করিয়াছিল তাহা দূর হইতে ঐরূপই দেখায় বটে—কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহার অথবা তাহার কাহিনীর গায়ে কোথাও "আর্টিষ্টিক্" পচা পাঁকের দাগ লাগে নাই। গল্পের গতি কোথাও শিথিল হয় নাই, শেষ অবধি স্বচ্ছন্দ প্রবাহে, বহিয়া গিয়াছে। ঘটনা সংস্থানেও কলা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ পরিচ্ছেদে সে যখন অন্তিমকালে নিজ পিতা-মাতার সাক্ষাৎ পাইল, তখনকার যে চিত্রটি জলধর বাবু অঙ্কন করিয়াছেন সেরূপ চিত্র বঙ্গীয় কথা সাহিত্যে দুর্লভ। আমাদের বিশ্বাস, এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী একটি উৎকৃষ্ট জিনিসে পরিণত হইতে পারে।

**বিজ্ঞান সূত্র**—প্রথম ভাগ।—শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ঢাকা আশুতোষ যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ দাস দ্বারা মুদ্রিত। ডিমাই বারো পেজি ১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য /•

বিদ্যালয়স্থ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য রচিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্নোত্তর মালা। যে সকল ছাত্র প্রাথমিক বিজ্ঞান কিছু কিছু শিখিয়াছে, এ পুস্তকখানি তাহাদের উপকারে লাগিবে। কিন্তু যাহারা শিখে নাই, তাহারা এ পুস্তক হইতে বড় কিছু আদায় করিতে পারিবে না। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের প্রুফ দেখায় আরও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এ বই-খানিতে অনেকগুলি ছাপার ভুল রহিয়াছে।

**শ্রীমাতৃশ্লোকশতকম্।** শ্রীমোহিনীমোহন চট্টরাজ প্রণীত। হাওড়া কাদম্বিনী যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশকের নাম নাই, তবে মলাটে একস্থানে লেখা আছে "ঠিকানা—রাম-নগর, গনুটিয়া পোঃ, বীরভূম।" ডিমাই বারো পেজি ১০১ পৃষ্ঠা, মূল্য ।•

বিবিধ ছন্দে,সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মাতৃভক্তিমূলক একশতটি সংস্কৃত শ্লোক ইহাতে আছে। প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে বঙ্গানুবাদ এবং বাঙ্গালায় "রসোদ্দীপনী টিকা" আছে। বিষয়টি এমন যে পাঠকের মন স্বতঃই অনুকূল হইয়া উঠে—এ সম্বন্ধে যিনি যাহা যেমন ভাবেই বলুন তাহাই ভাল লাগে। তাহার উপর, সংস্কৃত ভাষার এমন একটা গুণ আছে যে ছন্দোবদ্ধ হইলে তাহা প্রায়ই শ্রুতি সুখকর হয়, ভিতরে যদি ভুষিমাল থাকে তবে তাহাও ভাষা ও ছন্দের সোণালি রাঙতা-মোড়া হইয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে লেখকের সুবিধা অনেক কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বড় সুবিধা করিতে পারেন নাই। ভাষা নির্ব্বাচন ছন্দ নির্ব্বাচন প্রভৃতিতে অনেক স্থলেই অক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। নবম শ্লোকটি এই—

যোঽরিষা রাত্রিং ক্ষপিহি সুত মে; দেহি মাতঃ সুধাংশুং
মারোদি—রন্ত্যুজ্জলতরশশী নিকলঙ্কো গৃহে মে

দেহেনঃ।মহং ; প্রিয়সুত করে দর্পণে সম্প্রদত্তে
ক্বায়ং ক্বায়ং কায়মিতিবচনৈর্মে দিতাং সর্ব্বগেহম্ ॥

ছেলে ঘুমাইতেছে না, মাকে বলিতেছে "ঐ চাঁদ আমায় দাও"—বলিয়া কাঁদিতেছে। মা বলিতেছেন, "চাঁদের জন্য কাঁদিও না বাবা, চাঁদ আমার ঘরেই আছে।" ছেলে বলিতেছে "কৈ মা, চাঁদ কৈ?—মা তাহার সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া বলিতেছেন, "এই যে, ইহার মধ্যে রহিয়াছে দেখ।"

ভাবটি, লেখকের নিজস্ব হউক আর না হউক, সুন্দর। কিন্তু ঐ ভাবের উপযুক্ত ভাষা কি এই? না উপযুক্ত ছন্দ এই? আকাশে চাঁদ রহিয়াছে, অথচ লেখক রজনীকে "ঘোরা" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। শ্লোকটি পড়িলে, হঠাৎ মনে হইবে বুঝি শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষ পাদে "ক্বায়ং ক্বায়ং" যেন দাঁড়কাক ডাকিতে আরম্ভ করিল! এই ত গেল ভাষার অনুপযোগিতা। ছন্দটিও অনুপযোগী। ছন্দ, প্রকৃত রসের উপযোগী না হইলে, অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে "হতবৃত্ততা" দোষ হয়, এখানে এবং এই পুস্তকের অন্য অনেক শ্লোকেই তাহা হইয়াছে।

এই গ্রন্থমধ্যে ভাল শ্লোক যে একবারেই নাই এমন কথা বলিতেছি না তবে সংখ্যায় সেগুলি অত্যল্প। যে শ্লোকটি সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে, সেটি এই—

১১। পূতং হি জাহ্নবীবারি সুপূতং জননীপদম্।
কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দং প্রাগুক্তমন্তিমং চিরম্ ॥

(গঙ্গাজল পবিত্র জননীর পদও সুপবিত্র; কিন্তু গঙ্গাজল কলির পঞ্চসহস্রাব্দ পর্য্যন্তই পবিত্র থাকে, জননীর পদ চিরদিনই পবিত্র)

**বিবাহ মঙ্গল** দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত, মালদহ হরিশ্চন্দ্রপুর হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোলপেজি ৪০ পৃষ্ঠা মূল্য •

পুস্তকখানির গঠন অতি মনোরম উৎকৃষ্ট কাগজে দুই রঙের কালীতে ছাপা। বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে বিবাহিগীধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি শ্লোক ও মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে—নিম্নে বঙ্গানুবাদও আছে। শ্লোকগুলি সুনির্ব্বাচিত, বঙ্গানুবাদও প্রাঞ্জল। পড়িলে মন পবিত্র ও আনন্দ রসাপ্লুত হয়।

**সরল প্রসূতি-দর্পণ ও শিশুপালন**।—মিসেস্ পি, দাস প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোলপেজি ৯৩ পৃষ্ঠা কাপড়েবাঁধাই মূল্য ১৲

পুস্তকখানি গৃহস্থ ও অল্পশিক্ষিত ধাত্রীদিগের জন্য রচিত। অনেকগুলি চিত্রের সাহায্যে বর্ণিত বিষয় বুঝান হইয়াছে। ভাষাটি সরল, বইখানি গৃহস্থের কাযে লাগিবার মত। গ্রন্থশেষে "শিশুবর্ণন" পদ্যটি না থাকিলেই ভাল হইত।

**রামধনু**।—সচিত্র সরল বিজ্ঞান। তৃতীয় সংস্করণ। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীদূর্ব্বানারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতার এজেন্ট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। রয়াল আটপেজি ৩১৬+১২৪ পৃষ্ঠা। বর্ত্তমান সুলভ মূল্য ২৲

ইংরাজি ১৮৮২ সনে ঢাকা হইতে এই "রামধনু" সাপ্তাহিক পত্রাকারে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বঙ্গভাষায় ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র। পরে বুঝি এখানি মাসিকপত্রে পরিণত হইয়াছিল। চারিবৎসর চলিয়া ইহা বন্ধ হইয়া যায়। সেই চারিবৎসরের "রামধনু" পুনর্মুদ্রিত করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি হইয়াছে। এই সাত শত পৃষ্ঠায় শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, ভাষাও সহজবোধ্য কিন্তু সুব্যবস্থার অভাবে ইহার উপকারিতা অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। যখন সাময়িক পত্র ছিল, যেখানে যাহা পাইয়াছেন সম্পাদক সেখানেই তাহা ছাপিয়া গিয়াছেন। পুনর্মুদ্রনকালে অবিকল সেই অনুসারে না ছাপিয়া, বিষয়ভাগ করিয়া প্রবন্ধগুলি সাজাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। সেরূপ করিলে শুধু যে গ্রন্থখানির উপকারিতা বাড়িত এমন নহে—অধিকতর চিত্তাকর্ষকও হইতে পারিত। "মোহনভোগের" সরস বর্ণনা পাঠ সমাপ্ত করিবামাত্র, "মসীপ্রস্তুত" বিদ্যা আয়ত্ত করিতে অনেকের আলস্য হইতে পারে এবং "সুবাসিত তৈল" প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার অব্যবহিত পরেই "মানবলীলা" প্রবন্ধে দেহের যাবতীয় যন্ত্রাদি কিরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিকৃত হইয়া "জীবনদীপ নির্ব্বাণ" হইয়া যায় সে তত্ত্ব কিঞ্চিৎ অসাময়িক। তথাপি বলিতেই হইবে এ পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং আমাদের দেশে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মঙ্গল ঘট—প্রথম ভাগ, ব্রহ্মচর্য্য। শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে মুদ্রিত। তিনখানি চিত্র সম্বলিত, ডবল ক্রাউন ষোলপেজি, ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক আনা।

দামোদর জলপ্লাবনের সময় স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রগণ কিরূপে বিপন্নের সেবা করিয়াছিলেন, চিত্র তিনখানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। মূলগ্রন্থখানি কবিতায় রচিত, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-ধারণ সম্বন্ধে ছাত্রগণকে উপদেশ। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল।

শব-সাধন উপন্যাস। শ্রীসূর্য্যকুমার সোম প্রণীত। কলিকাতা বাণীপ্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডিমাই বারোপেজি ৩৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

সূর্য্যকুমার বাবু প্রবীণ লেখক যে সময় "আনন্দমঠ" বাহির হয় সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরেই "মধুমালতী" নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনি বাহির করিয়াছিলেন এবং বহিখানির সুখ্যাতিও হইয়াছিল। সমালোচ্য পুস্তকখনি ঐতিহাসিক উপন্যাস কি না সন্দেহ—লেখক ইহার "ধর্ম্মমূলক উপন্যাস" নামকরণ করিয়াছেন—তবে ভারতেতিহাস প্রসিদ্ধ ঠগীদমন ব্যাপারের সহিত এই আখ্যায়িকার অনেকখানি অংশ জড়িত। পীণ্ডারী ঠগীগণের অত্যাচার কাহিনী এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে—সুতরাং উপন্যাসখানি Sensational জাতীয়। তারাকর্ত্তৃক বন্দীকৃত মোহিতলালের উদ্ধার-সাধনের বর্ণনাটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। ঠগী দলপতি চিতু সর্দ্দারের চিত্রে বেশ পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। মেজর সাহেব, শান্তশীল, চঞ্চলা, জয়া ও মঙ্গলার চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের বর্ণনাশক্তি আছে, ভাষাও ভাল। তবে স্থানে স্থানে তাঁহার অতিশয়োক্তি দোষ দেখা গেল। উপন্যাসখানির মধ্যে একটা কাকাতুয়া আছে—সেটা আবার কবি, ছড়া কাটে! সে বলে—

ছেড়ে দাও মা মঙ্গলে, উড়ে যাই ঘোর জঙ্গলে ;<br>
চঞ্চলাকে আনব ধরে, দুধকলা দিও দ্বিগুণ করে।

এই দোষটুকু সত্ত্বেও, উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য।

# সাহিত্য-সমাচার

কুমারখালী হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের অপূর্ব্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'চন্দন' যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের গৌরীশঙ্কর মালিকার প্রথম গ্রন্থ "শিবসীমন্তিনী" যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তিনি আবার "দশদিন" নামে একখানি নূতন ভ্রমণ কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

---

স্বর্গীয় ৺ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "অভয়ের কথা" যাহা 'মানসী'তে ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, বহুদিন পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ 'বেসুর বীণ' প্রকাশিত হইয়াছে।

---

## ভ্রম-সংশোধন।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মানসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্. এ মহাশয় লিখিত "প্রাচীন যৌধেয় জাতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে একটি ছাপা ভুল হওয়ায় এক স্থানে অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। ৩৮২ পৃষ্ঠা, ২১—২৪ লাইনে আছে—"কানিংহাম, কাপ্তেন কটলী প্রভৃতি......শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।" ইহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পাঠ হইবে—"কানিংহাম, কাপ্তেন কটলী প্রভৃতি মূলতান, ভাওয়ালপুর, কাংড়া প্রদেশ, দেপলপুর, সাতগড়া, অযুধান, ভাটনের, আভোর, সিরসা, হাঁসি, কায়োর, পাণিপথ, শোণপথ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন যৌধেয়গণের মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বিজয় গড় নামক স্থানে প্রাচীন যৌধেয়গণের শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

# মানসী

৭ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল | ২য় খণ্ড
২য় খণ্ড | | ৪র্থ সংখ্যা

## হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষা

বারাণসীর বিদ্যায়তনে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সে জন্য যে আইনের খসড়া হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, কেবলমাত্র হিন্দুছাত্রদিগের জন্যই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং হিন্দুছাত্র মাত্রেই ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য হইবে। যাঁহারা হিন্দুত্বকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর হৈ হৈ পড়িয়াছে, বুঝি বা ভারতে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিল! তাঁরা আনন্দে এতদূর অধীর হইয়াছেন যে, যে কেহ ইহার ফলাফল সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, তাহাকেই যা' নয় তা' বলিয়া গালি দিতেছেন—আর সে গালাগালির চরম কথা এই যে —তুমি হিন্দু নও।

আমি এমনি একটু গালি খাইয়াছি, যদিও কোনও হিসাবেই সে গালি আমার প্রাপ্য নয়। মেছোহাটার ভাষায় আমার হাড় পাকিয়া না গেলেও হয় তো দু'চারটে অপভাষা আমিও ব্যবহার করিতে পারি; কিন্তু খেউড় গাইয়া পাঠকসমাজকে অপমান করিবার স্পৃহা আমার মোটেই নাই। কাহাকেও অপমান করা বা নিজে প্রতিষ্ঠালাভ করার চেয়েও এ ব্যাপারে একটা বড় জিনিষ দেখিবার আছে; সেটা সমাজের হিতাহিত, আর ততোধিক, ধর্ম্মের হিতাহিত। আমি সেই কথাটা একটু তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিব। আমার বক্তব্যটা আগাগোড়া পাঠ করিবার ধৈর্য্য পাঠকের যদি থাকে, তবে বোধ করি, আমি হিন্দু কি অহিন্দু এটা আর খোলসা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমি বিশ্বাস করি যে, ধর্ম্মশিক্ষা শিক্ষার একটি অত্যজ্য অঙ্গ; এবং যদি কোন অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার পথ প্রসারিত হয়, তবে আমি তাহা আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিয়া লইব।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম একটা আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন, কেন না প্রত্যেক ধর্ম্মই দেশকালাদি উপাধিসমন্বিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কিন্তু দেশকাল সমাজ প্রভৃতি উপাধিবিবর্জ্জিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সাধনার শেষ সীমায় ব্যতীত আমি সম্ভব মনে করি না। সেরূপ Theology সম্ভব, কিন্তু Religion সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইলে সাম্প্রদায়িক ভাবেই দিতে হইবে। কারণ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তাহা আয়ত্ত হয় সাধনার শেষে। যে শিক্ষানবিশ, সে সার্ব্বজনীনতা লইয়া আরম্ভ করিলে ধর্ম্ম কখনও আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

সকল ধর্ম্মের যাহা সার, তাহা সব ধর্ম্ম হইতে তাহার বিশেষত্ব বাদ দিয়া কেবল যে যে বিষয় সকলের ঐক্য আছে, তাহা গ্রহণ করিলে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের সারসত্য নানা সমাজে নানা আকারে দেখা দিয়াছে। সেই আকারটুকু বাদ দিলে সেই সত্যের যে কূটস্থ অবস্থা, তাহা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না। ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার একটা সম্বন্ধ সকল ধর্ম্মে স্বীকার করে। সেই সম্বন্ধের উপাধিবর্জ্জিত প্রকৃতি আমরা হয়তো কল্পনাই করিতে পারি না। কিন্তু খৃষ্টানধর্ম্মে যখন ঈশ্বরকে মানবের পিতা ও জগতের রাজা বলিয়া কল্পনা করে, বা আমাদের শাস্ত্রে যখন উভয়ের একাত্মা প্রচার করে, তখন সেই নিত্যসত্য সম্বন্ধটাই আমরা আমাদের সংস্কার-বিকৃত বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত দেখি। দুইটার ভিতর কোনও একটা ধারণা সত্য, অপরটি মিথ্যা, বা কোনও একটাই যে সম্পূর্ণভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছে, এরূপ কল্পনা করিলে আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হইব। সাধনার শেষসীমায় উপস্থিত হইয়া মানবভাষায় প্রকাশের অযোগ্য সেই সম্বন্ধের স্বরূপ যে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার কাছে সেই নিত্য সম্বন্ধের এই উভয় প্রকাশের কোনটিই মিথ্যা নহে।

এইরূপে দেখা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণা বা অনুষ্ঠান হয় তো প্রত্যেকেই কোন এক গূঢ় সত্যের প্রকাশ মাত্র। সেই গূঢ় সত্যটা আবিষ্কার করাই সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সেই গূঢ় সত্যসমষ্টিমাত্র লইয়া একটা 'থিওলজী' সম্ভব হইলেও সর্ব্বসাধারণের একটা ধর্ম্ম হইতে পারে না।

বীণাবাদিনী

সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইলে সোপাধিক ধর্ম্মই শিখাইতে হইবে, নিরুপাধিক abstract ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের সাধারণ গোটাকয়েক তথ্য শিখাইলে চলিবে না। কারণ ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য তোতাপাখী শিখান নয়; বা ধর্ম্মের ভড়ং করা নয়; ইহার প্রকৃত লক্ষ্য চিত্তে প্রকৃত ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত করা ও সাধনার পথ প্রদর্শন করা। একটা creed জপাইলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না; কতকগুলি সাধারণ তথ্য শিক্ষা দিলেও ধর্ম্মের উদ্রেক করা হয় না।

প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে উপাধি-সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। সে উপাধি কি? কোন্ তত্ত্ব শিক্ষার্থীকে বুঝাইবে, তাহা কি আকারে তাহার চিত্তে প্রবেশ করাইবে, কি ভাব তাহার ভিতর জাগাইবে, কি অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা জাগাইবে, এই সমুদয় বিশেষ চিন্তার বিষয়। কিন্তু এ সব বিষয়ে কোনও সাধারণ-বিধি দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

শিক্ষার সম্বন্ধে একটা সত্য এখন সকলেরই স্বীকৃত। শিষ্যের মনের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সংযোগ না ঘটাইতে পারিলে শিক্ষা হয় না। তুমি যদি একটি বালককে কোনও বিষয় শিখাইতে চাও, তোমাকে সর্ব্বপ্রথম জানিতে হইবে সে বালক কি জানে। একজনকে শিখাইতে গেলে যেটা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, অপর একজনকে সেইটা বুঝাইয়া তবে তাহার পরবর্ত্তী শিক্ষায় অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তোমাকে দেখিতে হইবে, সে বালকের আকাঙ্ক্ষা কোন্ দিকে; এবং সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগ রাখিয়া তোমার শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না হইলে তুমি যত তত্ত্বই তাহার ভিতর ঢুকাও না কেন, তাহার মনের সহিত তাহার সংযোগ থাকিবে না, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার আয়ত্ত বা সমীকৃত হইবে না।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধেও এই দুইটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তোমার জ্ঞান কতটা আছে এবং কি কি বিষয় তুমি আয়ত্ত করিতে পারিবে, তাহা স্থির না করিয়া তোমাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান মোটেই নাই; আমি যদি তোমার কাছে অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি, তবে সে জিনিষটা যে তুমি প্রাণের ভিতর অনুভব করিবে না, ইহা নিশ্চিত। আর প্রাণের ভিতর অনুভূতি না থাকিলে কেবল বাঁধিগৎ আওড়াইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করা যাইতে পারিলেও ধর্ম্মলাভ হয় না। তার পর দেখিতে হইবে, তোমার আকাঙ্ক্ষা কোন্ দিকে।

তুমি যদি ঘোরতর অর্থলিপ্সু হও, তবে তোমার কাছে নিষ্কামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আদায় করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষক, যিনি শিষ্যের মানসিক অবস্থা ও অকাঙ্ক্ষার সহিত যোগ রাখিয়া শিক্ষাদান করিয়া ক্রমশঃ তাহার চিত্তকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেন।

এই যে মানসিক অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা বিচার করিয়া ধর্ম্মশিক্ষার উপাদান ও প্রণালী নির্ব্বাচন, ইহারই নাম অধিকারী-বিচার। আমাদের এ ধর্ম্মের দেশে একদিন এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মশিক্ষা অধিকারী-বিচার করিয়া দিতে হইবে। যুগযুগান্তের সামাজিক ব্যভিচার ও অজ্ঞানের অন্ধকারের ভিতর দিয়া এই সত্য আজ আমাদিগের কাছে যে আকারে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কদাকার; কিন্তু ইহার মূলে এই গভীর সত্য নিহিত আছে; এবং আজ যদি আমরা হিন্দুবালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে অগ্রসর হই, তবে হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার এই অত্যজ্য অঙ্গ—অধিকারী-বিচারের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অধিকারী-বিচার করিয়া শিষ্যকে তত্ত্বশিক্ষা দিতে হইবে, অধিকারী-বিচার করিয়া তাহার আচার-অনুষ্ঠান নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং নিরন্তর তাহার মানসিক অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিষ্যের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি সম্পাদন করিতে হইবে। মনের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে অধিকারের মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণী করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ভিতরও অল্পবিস্তর তারতম্য থাকিয়া যাইবেই। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দল বাঁধিয়া হয় না, প্রত্যেক শিষ্যের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাবিনিয়োগ আবশ্যক; এবং এমন একটি গুরুর আবশ্যক, যাঁহার সেই অধিকারী-বিচার করিবার উপযুক্ত অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে।

সুধু অন্তর্দ্দৃষ্টি নয়; শিষ্যের প্রতি গুরুর এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের একটা গভীর স্নেহ ও ভক্তির সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। যাহাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ আমি অনায়াসে দেখিতে পাইব এবং দেখিয়া সেই অনুসারে শিক্ষা দিতে পারিব। যাহার সে স্নেহ নাই, সে তাহা পারিবে না। পক্ষান্তরে যাহাকে আমি ভক্তি করি ও ভালবাসি, তাহার কথা যত অনায়াসে আমার অন্তরে প্রবেশ করিবে ও আত্মাকে আলোকিত করিবে, অপরের কথায় তত হইতেই পারে না। এই জন্যই বর্ত্তমান শিক্ষাবিজ্ঞানে পিতামাতাকেই শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া গণনা করা হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এই সমুদয় সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আর্য্য-শিশুগণের

ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অতি শৈশবে বালক গুরুগৃহে গমন করিত। সেখানে গুরুর পুত্রের মত সে প্রতিপালিত হইত, গুরুশিষ্যে পিতা পুত্রের ন্যায় প্রকৃত সহানুভূতি, প্রকৃত প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার অবকাশ ঘটিত। গুরু ক্লাশ বাঁধিয়া শিক্ষা দিতেন না; ধর্ম্মবিষয়ে, অনুষ্ঠান-বিষয়ে, সেবা-বিষয়ে অধিকারী বিচার করিয়া শিক্ষা দিতেন।

এই শিক্ষাপ্রণালীর যে সমুদয় বিবরণ এখন আমরা পাই, তাহা ঐতিহাসিক নহে। যে সমুদয় গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অধিকাংশ যে সময়ে লিখিত, তখন এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রায় লোপ পাইয়াছিল, অথবা অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। তাহা ছাড়া যে সমুদয় চিত্র রক্ষিত আছে, তাহা আদর্শচিত্র, বাস্তব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাতে সুফল বা কুফল ঘটিয়াছিল, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতির স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যে মতই হউক না কেন, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার অন্তর্নিহিত কয়েকটী সত্য ধর্ম্মশিক্ষার কোনও পদ্ধতিতে পরিত্যাগ করা যায় না। প্রথমতঃ, ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইলে সদ্গুরুর আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ, গুরু ও শিষ্যের ভিতর প্রীতি ও ভক্তির সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক শিষ্যের স্বতন্ত্র শিক্ষাবিধান আবশ্যক। ইহা যে হিন্দুশাস্ত্রের, হিন্দুসমাজের অনুনত শিক্ষাপদ্ধতির মূলসূত্র, একথা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। যে শিক্ষাপ্রণালীতে এই সমুদয় মূলসূত্রের অভাব আছে বা সদ্ভাবের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প, সে প্রণালী, যাঁহারা সনাতন-পদ্ধতি বিরুদ্ধ কোনও কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন অন্ততঃ তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না।

বারাণসী বিদ্যায়তনে এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার কি আয়োজন করা হইবে, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু মোটামুটি ইহা বুঝিতে পারি যে, এই প্রণালীর ধর্ম্ম-শিক্ষা কোন আধুনিক বিদ্যালয়ে সম্ভব নহে। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় গৃহের বাহিরে কোথাও সম্যক্‌রূপ ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রথম আপত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব Theology শিক্ষা* দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্রেরা সাংখ্য বেদান্তের তত্ত্ব বুদ্ধির সাহায্যে আলোচনা করিতে পারে; বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে; স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেই তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইল, একথা স্বীকার করা চলে না। খসড়া আইনে একথা

স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিবরণের ভিতর Hindu Theology and religion এর উল্লেখ আছে; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার স্থলে বলা হইয়াছে religious instruction. Religious instruction Hindu theology ও religion পাঠ হইতে ভিন্ন, একথা বোধ হয় সহজেই স্বীকৃত হইবে। সুতরাং বিবেচনা করা আবশ্যক যে Religious instruction বা ধর্ম্ম-শিক্ষা বলিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণ কি বুঝেন?

আমি ইহাদিগের উদ্দেশ্য যে প্রকার বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয় যে, ইঁহারা ধর্ম্মের মূলতত্ব শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে চাহেন না, ইঁহারা উপাসনা ও অপরাপর ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাত্রদিগের দ্বারা করাইতে চান। তাহা হইলে কথা উঠে যে, কোন্ উপাসনাপদ্ধতি ও কোন্ অনুষ্ঠান ইঁহারা ছাত্রদিগকে অনুসরণ করিতে বাধ্য করাইবেন। এ কথা বিচার না করিয়া আমরা বাধ্যতামূলক ধর্ম্ম-শিক্ষার বিধি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না।

খৃষ্টীয় কোন সম্প্রদায়ের কিম্বা মোসলমান সম্প্রদায়ের কোন বিদ্যালয়ে যদি এরূপ বিধান করা হইত, তবে সে সম্বন্ধে এরূপ কোন কথা উঠিতে পারিত না। Roman Catholic বা Anglican বা অন্য কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বালকগণকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। আর তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম যে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান যে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হওয়া আবশ্যক, এরূপ কোনও সংস্কার নাই। Congregational worship বা সভা করিয়া উপাসনা তাঁহাদের ভিতর প্রচলিত। সুতরাং তাঁহারা সমস্ত বালককে দৈনিক সমুদয় উপাসনায় যোগদান করিতে বাধ্য করিলেই তাঁহাদিগের অনুমত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু আমাদের ভিতর এমন কোনও একটা সাধারণ নিয়ম হইতে পারে, আমি তাহা স্বীকার করি না। প্রথমতঃ, হিন্দুর ভিতর অগণ্য সম্প্রদায় এবং তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদিগের সকলকে কোন একটা সাধারণ উপাসনাপদ্ধতির ভিতর ফেলা একেবারেই অসম্ভব। তাহা ছাড়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতরও অধিকারীভেদে উপাসনার নিয়ম স্বতন্ত্র। এই নানা সম্প্রদায়ের বালক লইয়া যে কিরূপে একটা সাধারণশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনায় আসে না।

তাহা ছাড়া হিন্দুসমাজে দীক্ষা ব্যতীত উপাসনা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়নের পর উপাসনা সম্ভব, কিন্তু হিন্দুসমাজের যে অগণিত ব্রাত্য,

বৃষল ও শূদ্রগণের সন্তান এই আয়তনে শিক্ষার জন্য যাইবে, তাহাদিগের পক্ষে এ উপাসনাপদ্ধতি প্রশস্ত নহে। তাহারা তান্ত্রিক, বৈষ্ণব বা অপর কোনরূপ দীক্ষা না পাইলে উপাসনার অধিকারী নহে। সে দীক্ষা কি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দেওয়া হইবে? বালকের পিতা মাতা যদি তাহাকে সে দীক্ষা না দেওয়ান, তবে কি বিদ্যায়তনের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জোর করিয়া দীক্ষা দেওয়াইবেন? আর যদি কোন ছাত্র কুলগুরুর নিকট এ রূপ দীক্ষা লইয়া আয়তনে আইসে, তবে কি সেই গুরুপদেশের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষার বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না?

হিন্দুর ধারণা অনুসারে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রের উপাসনা ও অনুষ্ঠান বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হইবে এবং সে সমুদয় বিষয়ে দীক্ষা-দাতা গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। গুরুর তত্ত্বাবধানে ও তাঁহার আদেশে শিষ্যের ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্পন্ন হইবে। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কি বারাণসীর বিদ্যায়তনে হইতে পারিবে?

প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া ছাত্রদিগের মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, সাম্প্রদায়িক ভাবে সাম্প্রদায়িক উপাসনাপদ্ধতি ও আচারের ভিতর দিয়া শিষ্যকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইবে। সেরূপ জটিল কার্য্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তাহা ছাড়া ধর্ম্ম শিক্ষা সম্ভব নয়। এ সব বাদ দিয়াও উপাসনা-ভাগের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াও একরকম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সেটাকে হিঁদুয়ানী শিক্ষা বলিতে পার, কিন্তু তাহা ধর্ম্মশিক্ষা নয়। এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমি মনে করি না। যে প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাহার আচার-অনুষ্ঠান যাহাই হউক, সে সমুদয় আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে বাধ্য; কিন্তু ধর্ম্মহীন হিঁদু-য়ানী, ও আচার অনুষ্ঠানের লম্বাই চওড়াইয়ের যন্ত্রণায় আমরা অস্থির আছি। তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য অর্থব্যয় করিয়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না।

আচার অনুষ্ঠান ধর্ম্মের বাহন। কিন্তু হিন্দুসমাজের দুষ্কৃতির ফলে উল্টা বুঝিল রাম;—হিন্দুধর্ম্মের অতিকায় বাহনটি ধর্ম্মের স্কন্ধে চড়িয়া বসিয়াছে, তাহার চাপে ধর্ম্ম ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। এখন আর বাহনটাকে ভোজ্য পেয়ে পরিতুষ্ট করিয়া সংসারের ভার বৃদ্ধি করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। হাতী ঘোড়া তো ছার-পায়ালা ইঁদুরটাকেও আমরা মাথায় তুলিয়া তাহার পায়ে

প্রাণ দিতে পারি, যদি তার উপর রাজাধিরাজ থাকেন। কিন্তু মুসভরাজ যদি মহাদেবকে পদতলে দলিত করিয়া পৃথিবী কাঁপাইয়া চলে, তবে তাঁহাকে পূজা না করিয়া দমন করিবার উপায় উদ্ভাবন করাই যে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না।

ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া কিরূপ কঠিন কাজ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বারোয়ারী জায়গায় সে ব্যাপার সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা অল্প। সেই বহুআয়াসসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইবার মত কৃতি ও সাধকেরও একান্ত অসদ্ভাব। এ অবস্থায় বাধ্যতামূলক ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে গেলে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া সহজসাধ্য ধর্ম্মবর্জ্জিত আচারাদির বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক বলিয়াই আমাদের মত পাপিষ্ঠ বারাণসীর বিদ্যায়তনের এই বিধানের বিরোধী।

আদর্শশিক্ষা হিসাবে আমার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেও অনেকে একথা বলিবেন যে, অবস্থা বিবেচনায় যতদূর সম্ভব ছাত্রদের ভিতর ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টার হানি কি? হানি আছে কি না সে কথা চট্ করিয়া বলা যায় না। তুমি যদি ছাত্রদের গীতা পাঠ করাও, মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করাও, বা তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করাও, তাহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহার ভিতর বাঁধাবাঁধির কথা আসিবে কেন? যেখানে বাঁধাবাঁধি, সেখানে মনে হয় আরও কিছু করিতে হইবে, আচার অনুষ্ঠান ও উপাসনা বিষয়ে কিছু বাঁধাবাঁধি হইবে। এইরূপ যদি কোন বাঁধাবাঁধি হয়, তবে তাহাতে ঘোরতর আপত্তি থাকিতে পারে। তোমার প্রবর্ত্তিত উপাসনা-পদ্ধতি বা আচার-অনুষ্ঠানে আমার গুরুতর আপত্তি থাকিতে পারে—হিন্দুসম্প্রদায়গুলির ভিতর বহুতর বিষয় লইয়া এরূপ বিবিধ গোলোযোগ কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং কিরূপ ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হইবে, সে বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অবিচারে বাধ্যতামূলক বিধান মানিয়া লইতে পারি না।

হিন্দুকে ধর্ম্ম-শিক্ষা যদি দিতে হয়, তবে সে শিক্ষার পরিচালক হইবে কে? শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় বা দ্বারবঙ্গাধিপতি যতই নিষ্ঠাবান হিন্দু হউন না কেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার অধিকার আমি স্বীকার করি না। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞান যাহার আছে, সে সাধনা ব্যতীত ধর্ম্ম বা সাধক ব্যতীত ধর্ম্ম-শিক্ষকের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারে না। সেরূপ সাধক কি বারাণসী বিদ্যায়তনে শিক্ষা দিতে আসিবেন? যদি আসেন, তবে অনেক ভাবিবার কথা

হইবে। কারণ, সাধক মাত্রেরই উপাসনাবিষয়ে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং প্রকৃত কোন সাধকের হাতে ধর্ম্ম-শিক্ষা পড়িলে তিনি তাঁহার বিশিষ্ট প্রণালীতে সাধনশিক্ষা দিতে অগ্রসর হইবেন। তাহা হইলেই কালে বারাণসীর বিদ্যায়তন একটা সম্প্রদায়ধর্ম্মের সৃষ্টি করিবে। সে সম্প্রদায় হয় তো সকল হিন্দুর প্রীতি আকর্ষণ না করিতে পারে। তখন যদি এই বাধ্যতামূলক বিধি প্রচলিত থাকে, তবে ফলে দাঁড়াইবে এই যে, সেই সম্প্রদায় যাহার অনুমোদিত সে ছাড়া অপর কোন হিন্দু এই শিক্ষালয়ে সন্তানকে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে পারিবে না।

ধর্ম্ম আমাদের দেশে "The blessed word 'Mesopotamia'র" ন্যায় কার্য্য করে। হিন্দুধর্ম্মের নাম করিয়া একটা কিছু করিলেই তাহাতে আর কাহার কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া নাচিয়া উঠিলে চলিবে না। একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা কি হইতেছে; যে ধর্ম্ম হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু অবাধে স্বীকার করিতে পারে কি না। যে পর্য্যন্ত আমরা সেকথা ঠিক বুঝিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আনন্দে নৃত্য করিবার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাই না। আইনের খসড়ায় ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে। তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিবেন, আমরা জানি না। সুতরাং আমরা শুধু এইটুকু চাই যে, যদি কোনও হিন্দুছাত্র বা তাহার পিতার বিশ্ববিদ্যালয় বিহিত ধর্ম্মপদ্ধতিতে ধর্ম্মবুদ্ধিমূলক আপত্তি conscientious objection থাকে, তবে তাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা লইতে বাধ্য করা না হয়। ইহাতে হিন্দুদের ধ্বজাধারীদিগের বিশেষ আক্রোশের কি কারণ হইতে পারে বুঝিতে পারি না।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

# পল্লী-চিত্র

ঘর ক'খানি খড়ে ছাওয়া
মাটির দেওয়াল চারিপাশে;
নাই বা হো'ল দালানকোঠা
তা'তে আমার কি যায় আসে?

পিঁড়ে আমার লেপাপোঁছা
সিঁদুর পলে যায় গো'তোলা ;
বাতায় গোঁজা ঢুলছে সেথা,
ছোট খোকার সোলার দোলা !
চড়কপূজোর বাজার হ'তে
গেল-বছর আনা ঘরে ;
খোকা তাহার তলায় শুয়ে
হাত পা নেড়ে খেলা করে !
দাওয়ার কোণে বাঁশের খুঁটী
তা'তে থানিক কোষ্টা বাঁধা
সকাল থেকে মোড়ায় বসে
পাকায় দড়ি নবীন দাদা।
গোলার কাছে বলদজোড়া
চোক্ বুঁজে ওই জাবর কাটায় ?
পাহাড়-প্রমাণ পলের গাদা
থামার-বাড়ী ওই দেখা যায়।
জমিদারের পাওনা দিয়ে
গোলা সোণার ধানে ভরা !
খন্দ-কুটো কেটে মেড়ে
মুগ মসূরের ডাউল করা।
উঠানভরা মাচান আছে,
লাউ কুম্‌ড়ো কত তা'তে ;
কণকা-রাঙ্গা শাক বুনেছে
ছেলে আমার আপন হাতে।
ক্ষেতে আছে উচ্ছে পটল
বেগুন আলু থরে থরে।
'থাউকো-দরে' বেচে সে সব
আনি কত 'সওদা' করে।
পুকুরজলে কোই মাগুর আর
রুই কাত্‌লা কত শত ;

নাইক মানা, যখন তখন
ধর্‌বে আপন ইচ্ছা মত !
গোয়ালেতে আছে 'মিনি'
'সাম্‌লা' 'ধলা' 'বুধি' গাই ;—
দুটী বেলা ক্ষীর যেন দুধ
খাবার কোনও কষ্ট নাই !
সাঁজের বেলা পাড়ার সবাই
নিমাই-খুড়োর বাড়ী আসে ;
'ভারত' 'পুরাণ' পড়েন খুড়ো,
নয়নজলে বয়ান ভাসে !
সাজসজ্জার নাহিক ঘটা,
চাদর ধুতীর আদর বেশী ;
সবাই বেড়ায় মিলে-মিশে
নাইক হেথায় রেশা রেষি !
'বাবু' 'বাবু' কেও বলে না,
'হুজুর' বুলি হেথায় নাই ;
'নিমাই খুড়ো' 'নবীন দাদা'
এই ত শুধু শুন্‌তে পাই ।
মান নিয়ে কেও হয় না বড়,
ধন নিয়ে কেও গরম নয় ;
হেথায় জমিদারের ছেলে
দুঃখীর সনে কথা কয় ।
হেথায় বধূ দিনযামিনী
হাড়-ভাঙ্গা-খাটুনী খাটে ;
তাদের সকল পুণ্যকর্ম্ম
ছড়িয়ে আছে ঘাটে বাটে ।
পর খাইয়ে নিজে খাওয়া,
পরের সুখে নিজের সুখ ;
পরের গর্ব্বে হৃদয় পূর্ণ,
পরের দুঃখে আপন দুখ ।

চায় না তারা বিলাস-বসন,
শাড়ী-শাঁকায় হাস্যমুখ ;
অক্ষয় হো'ক্ হাতের নোয়া,
থাকুক মাথার সিঁদুরটুক্ !
সুখে তারা, দুঃখে তারা,
দায় বিপদে সমান বল ;
তাদের হিয়ার ধৈর্য্য, স্নেহ,
চিরদিনই অচঞ্চল !
প্রতিবাসীর দুঃখে শোকে
বুক ভেসে যায় চোকের জলে ;
তা'দের শান্তি সুখে হেথায়
সুখ উপজে হৃদয়তলে।
চাষী ব'লে নাহিক ঘৃণা,
গরীব ব'লে নাইক হেলা ;—
ধূলায় ধূসর ছেলের সনে
ধনীর ছেলে কর্‌ছে খেলা।
পল্লী-মায়ের স্নেহের আঁচল
সারা গ্রামে আছে পাতা ;
ওমা, তোমার চরণতলে
ভক্তিভরে নোয়াই মাথা !

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

# রোগশয্যার প্রলাপ

( ১৪ )

একদিন মনে হইল,—আমরা ভারতবাসী এমন পতিত কেন ? [illegible] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সকল দিকে উন্নতি লাভের জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছে এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন দ্বারা জাতিবিশেষ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইতেছে, সে যুগে আমরা ভারতবাসী এত পতিত কেন ? আমরা কি মূর্খ ? কি করিয়া বলিব আমরা মূর্খ ? [illegible]

উপনিষদাদির অধিকারী আমরা, মানবের শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান অধ্যাত্ম-চিন্তায় আমরা এখনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠই হইয়া আছি। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ পৃথিবীর সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা ; তাহার ত্রৈধাতুক রোগজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম, তাহা অন্য জাতির কীটাণু বীজাণুঘটিত রোগজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা এখনও সকলে স্বীকার করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রই যখন আমাদের অধিকারে আছে, তখন আমরা কিসে মূর্খ? শিল্পশাস্ত্র আমাদের দেশের ন্যায় কোথায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও কোন দেশের ইতিহাস বলিয়া দিতে পারে না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে আবরোঁয়া বস্ত্রের সূত্র এদেশে নির্ম্মিত হইত, তেমন সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুতের কথা এখন কোনও দেশে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ধীমান বীতপালের ভাস্করশিল্প যে গ্রীক ভাস্কর্য্যের অপেক্ষাও ভাববিকাশে শ্রেষ্ঠ, তাহা এখন সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার যে দিকেই দেখ, আমাদের মূর্খতা পাইবে না ;—তবে আমরা এতটা পতিত কেন?—ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম, যে ঋষি-ঠাকুরদের কৃপায় আমরা এখনও সকল দিকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া বসিয়া আছি, সেই ঋষিঠাকুরদের অপরিণামদর্শিতার জন্যই, কালাকালের উপযুক্ত উপদেশ দিবার ক্ষমতার অভাবেই আমরা এই অধঃপতিত দশায় উপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা বলিবেন, তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাঁহারা তপস্যালব্ধ জ্ঞানে সার সত্যেরই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।—পণ্ডিতগণের, তথা শাস্ত্রের, এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া আমিও বলিতেছি—তা' ঠিক্, তাঁহারা ত্রিকালদর্শীই ছিলেন,—চতুষ্কালদর্শী ছিলেন না,—তাঁহারা সত্যত্রেতা-দ্বাপরের ব্যাপারই দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। এই সর্ব্ববিধ উন্নতির যুগ কলিকালের সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই দেখিতে পান নাই, তাহার উন্নতি-বিধায়ক স্পষ্ট কোন নিয়ম করিতে পারেন নাই, বা অন্য কিছুই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ত্রিকালদর্শী অর্থে ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানদর্শী বলিয়া তাঁহাদের শক্তির ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভুল করেন। বর্ত্তমান বলিয়া কোন কালচ্ছেদ করা যায় না। তাহা অবাঙ্-মনসোগোচর ব্রহ্মের ধ্যানধারণার অতীত। কাল সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করিবে, তাহাই হয় অতীতের,নয় ভবিষ্যতের বিষয়। বর্ত্তমান বলিয়া নিমেষ কলা কাষ্ঠা কোন নাম দিয়া কালের এক অণুপরমাণুকেও যখন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না, তখন বর্ত্তমান কাহাকে বলিব? ঋষিরাও বর্ত্তমান কালের

কোন কথা কোথাও বলেন নাই। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে যে সকল কথা, যে সকল বিধিব্যবস্থা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অতীত-চিন্তার ফলমাত্র। অতীতকে স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতে গিয়া তাহার জন্য বিধি-নিষেধ নির্দ্দেশ করায় তাঁহারা যে ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে গিয়া আজ আমরা এই সর্ব্বনাশের সমুদ্রগর্ভে আসিয়া পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অন্যদেশের বিজ্ঞব্যক্তিরা এরূপ ভবিষ্যদ্দর্শনের স্পর্দ্ধা রাখেন নাই; তাই তাঁহারা আমাদের ঋষিঠাকুরদের ন্যায় সর্ব্বউন্নতির মূল স্বার্থকে ততটা তুচ্ছীকৃত করিয়া যান নাই। এই কলিকালে আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব প্রভৃতি অহমত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠবৃত্তিগুলির অনুশীলনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, শ্রেষ্ঠত্বের লাভ হইতে পারে। অন্যদেশের বিজ্ঞব্যক্তিরা এসম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন, তাহা প্রতিদিন এ সংসারে সারসত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। অন্যদেশের চেষ্টাপরায়ণ উন্নতিকামী জাতি-সমুদায় ঐ সকল অহমত্বপূর্ণ জ্ঞানের অনুশীলনে এবং স্বার্থের প্রতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই এযুগে যে শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিয়াছে, আর তাহা না করিয়া পুরাতন প্রথায় চলিতে গিয়া, সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবান হইয়াও ভারতবাসী যে কতদূরে, কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহা ত আর হাতের শাঁখা আলো দিয়া দেখিতে হইবে না। আমাদের ঋষিঠাকুরেরা কেবল উপদেশ দিয়াছেন, "অহঙ্কার ত্যাগ কর, স্বার্থ ত্যাগ কর।" তাহার ফলে আমরা যুগের পর যুগ কেবল অধঃপতিত হইয়াই আসিতেছি। যাঁহারা বলেন, কেবল পরাধীনতাই আমাদের এ অধঃপতনের কারণ, তাঁহারাও বিষম ভুল করিয়া থাকেন। তাঁহারাও দেশের ভূতকথা—অতীতাবস্থা স্মরণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কথা কহেন না। যখন আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম, যখন স্বাধীনতার পূর্ণ মূর্ত্তি এদেশে সর্ব্বত্র বিশিষ্ট আকারে বিরাজ করিত, অর্থাৎ যখন বিশাল ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন-রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এমন কি নগর, গ্রাম, পল্লী পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, আরও ছোট করিয়া ধরিলে প্রত্যেকের গোত্র (গোচারণ ভূমি) পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল অর্থাৎ এখনকার সভ্যসমাজের একান্ত অভীপ্সিত স্বায়ত্তশাসনের পরাকাষ্ঠা ছিল,—তখনকার সেই সত্যযুগের কাল হইতে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী শকহূণযবন আক্রমণেরও পূর্ব্ববর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত যতদিন আমা-দের হিন্দুশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই সত্যত্রেতাদ্বাপরেও আমরা ক্রমোন্নতির পথ না ধরিয়া, ঋষিঠাকুরদের ঐ সকল উপদেশের অনুসরণ দ্বারা কেবল অবনতির পথেই

নামিয়া আসিয়াছি। কেবল কি আমরা নামিয়া আসিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু, শিব, ভগবতী প্রভৃতি দেবদেবীকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। তাঁহাদেরও ধর্ম্মের গ্লানি ও পৃথিবীর ভারহরণার্থ অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছি। ঋষি-ঠাকুরদের ঐ অহমত্ব-বর্জ্জনের, স্বার্থত্যাগের উপদেশগুলির অনুসরণে আমরা ক্রমশঃ সত্যযুগের ধর্ম্মের চতুষ্পাদ হারাইয়া, ত্রেতায় ধর্ম্মের ত্রিপাদ, দ্বাপরে ধর্ম্মের দ্বিপাদ এবং এই কলিতে ধর্ম্মের একপদ মাত্র অবশেষ করিয়া তুলিয়াছি। আর অন্যদিকের কথা কি? যে ধর্ম্মের নামে আমরা দোহাই দিই, ঋষিঠাকুরদের উপদেশে সেই ধর্ম্মেরই মাথা এমনি করিয়া খাইয়া বসিয়াছি। অবতারেরাও আসিয়া আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। ঋষিঠাকুরদের উপদেশ অবহেলা করিয়াই যে আমরা এমন অধঃপাতে গিয়াছি, তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারাই তথা-কথিত যুগধর্ম্মের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ অর্থাৎ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, অবতার-গণের চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কিছুরই যখন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তখন ঋষিঠাকুরদের উপদেশ আমরা মানি নাই বলা যায় না; বরং কড়ায় ক্রান্তিতে পালনই করিয়াছি, দৃঢ়রূপে বলিতে পারা যায়; নতুবা তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলা সফল হইত না। এই কলিকালের লক্ষণও তাঁহারা যাহা হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে, ইহাই ত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা যদি ঋষিঠাকুরদের নির্দ্দেশিত পথে না হাঁটিতাম, তবে কি এমনটা হইতে পারিত? কলির ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত হইবে, ইহা ঋষিঠাকুরদের একটি ব্যবস্থা। এই কথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। সেই কাশ্মীরের উপাধ্যায় মিশির হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুস্থানের পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, ত্রিপাঠী তেওয়ারীদের লইয়া মিথিলার শাস্ত্রী, বাঙ্গালার চাটুয্যে মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে, সান্যাল, মৈত্র, লাহিড়ী, ভাদুড়ী চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য, উড়িষ্যার শাস্ত্রী ওঝা প্রভৃতি আর্য্যা-বর্ত্তের পঞ্চগৌড়ান্তর্গত এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চদ্রাবিড়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই যে আজকালকার দিনে ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জন করিয়া সময়ের কতকটা অপব্যবহার বাঁচাইয়া বিষয়চিন্তায় লাগাইয়াছে, তাহা ত আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহপার্শ্বে খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন। এইরূপ কত আছে। ঋষিঠাকুরেরা উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া এবং এদেশের আপামর সাধারণের হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, বিলাসকে ব্যসন মনে

করিয়া, আহার বিহারের সুখকে তুচ্ছ করিবে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, দগ্ধোদর কচুঘেঁচু দিয়া ভরাইতে হইতেছে, ঘৃত তৈল দুগ্ধ প্রভৃতির ভেজাল নিবারণ করিবার কোন চেষ্টাও করি না। তবে তাঁহাদের কথা এই যে, দগ্ধোদর ভরাইবার জন্য ঘৃত তৈলাদি যে একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে; সুতরাং ঘৃত তৈল যখন অপবিত্র হইতেছে, তখন উহা খাইব না, অলবণ হবিষ্য ত কেহ ঘুচাইবে না; বরং ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সেই সাত্ত্বিক আহারে দিন দিন মনুষ্যের পরম শত্রু রজঃ ও তমোগুণ ক্ষয়িত হইতে থাকিবে। দেশের অন্ন বিদেশে বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া, ভবিষ্যতে দেশে তণ্ডুলাভাব হইলেই বা ক্ষতি কি? ঋষি-ঠাকুরদের উপদেশে আমরা শিখিয়াছি, ক্রমশঃ ফলাহার, বাতাহার, উপবাস এবং সর্ব্বশেষ প্রায়োপবেশনে তপস্যায় বসিয়া গেলে শ্রীহরির সাক্ষাৎ যখন পাওয়া যাইবে, তখন চমৎকার অন্নচিন্তায় সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক কি? শ্রীহরি-দর্শনলাভের অপেক্ষা পুরুষার্থ আর কি আছে? প্রার্থনীয়ই বা কি হইতে পারে? এতটা যখন সুবিধা ঋষিঠাকুরদের ব্যবস্থায় আমাদের হইতে পারে, তখন আবার আমরা পতিত বলিয়া চিন্তিত হই কেন। চিন্তিত হইবার কারণ আছে বৈকি! চারিযুগ ধরিয়া ঋষিঠাকুরদের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমরা পতনের অভিজ্ঞতাই লাভ করিলাম, উন্নতির বাষ্পও ত দেখিলাম না। একদিন আমরা বেদবেদান্ত আয়ুর্ব্বেদ গণিত লইয়া জগতের শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম; আর আজ অন্যদেশের এমন সকল জাতি আসিয়া আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতেছে যে, যাহারা দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বন্যপশুর ন্যায় বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সিদ্ধান্ন, বস্ত্র বা গৃহের পরিচয়ও জানিত না। ইহা কি আমাদের অধঃপতন নহে? তবে একটা আশার কথা আছে, সেটা ম্লেচ্ছাচার ও একাকার। এটাও সেই ঋষিঠাকুরদের ব্যবস্থার মধ্যেই দেখা যায়। এইটাই আমাদের এখন ভরসাস্থল। এই দুটা অবলম্বন করিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি, আমাদের উন্নতি, আমাদের চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হইবে। কেন না, দেখিতে পাইতেছি, এযুগে যে কোন জাতি উন্নতি করিয়াছে, করিতেছে বা করিবে বলিয়া লক্ষণ দেখাইতেছে, তাহারাই আমাদের ঋষিঠাকুরদের কথিত ম্লেচ্ছাচার ও একাকার অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। কথাটা খুব সত্য; কারণ, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঋষি বঙ্কিম তাঁহার আনন্দ-মঠ নাম পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যদি সত্যে কার্য্য না হয়, তবে মিথ্যায় হইবে?" অথচ তিনি আনন্দ-মঠের সন্তান-সেনা গঠনে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ নিরাকৃত করিয়া সব

একাকার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যদি একাকারে সত্য না থাকিত, উন্নতিলাভ না ঘটিত, শ্রেয়োলাভ না হইত, তবে এ যুগের সাহিত্যিক-ঋষি বঙ্কিম এমনটা করিতেন না। যদি এক ভারতবর্ষ ব্যতীত খোদার তুনিয়ায় তামাম রাজ্যে এই (ম্লেচ্ছাচার ও একাকার) দুটা অবলম্বনে উন্নতিলাভ করিতে পারে, তবে আমরা ত আর ভগবানের ত্যাজ্যপুত্র নহি যে, আমরা উহাদ্বারা উন্নতিলাভ করিতে পারিব না। আর সদয়হৃদয় ঋষিঠাকুররা আমাদের জন্যও কলিকালে সেই একাকার ও ম্লেচ্ছাচারের ব্যবস্থা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে আমাদের তদবলম্বনেই উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে যাঁহারা কৃতবিদ্য, মনস্বী, লোকহিত, তথা দেশ-হিতে ব্রতী, তাঁহারাও ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাই উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা স্থির করিয়াছেন। সুখের বিষয়, আজকাল দেশেও তাহার বহুবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ফলও ফলিতেছে। তবে এখনও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে না। তাহাও সেই ঋষিঠাকুরদের দোষে, উপদেশের কার্পণ্যে। তাঁহারা বলিয়াছেন, এদেশে ম্লেচ্ছাচার ও একাকারের পূর্ণমাত্রা ঘটিবে অন্তিম কলিতে। সেই অন্তিম কলিও তাঁহাদের হিসাবে উপস্থিত হইতে এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর বাকী আছে। তাঁহাদের হিসাবে কলির পূর্ব্ব সন্ধ্যা (অর্থাৎ দ্বাপর ও কলির মধ্যবর্ত্তী দ্বিভাবাত্মক কাল—transitory period) অতীত হইতেই ৬ হাজার বছর লাগিবে,—তাহাই এখনও শেষ হয় নাই; সুতরাং এখনও এদেশের অনেকে ঋষিঠাকুরদের সেই অহমত্ববর্জ্জিত, আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানহীন, স্বার্থজ্ঞানশূন্য শিক্ষারই অনুবর্ত্তন করিতেছেন! তবে শুভসূচনা হইয়াছে। ম্লেচ্ছাচারও দেখা দিয়াছে, আর একাকারও হইতেছে। এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন ম্লেচ্ছাচার পূর্ণ হইলে উচ্চবর্ণ শূদ্রাচার অবলম্বন করিবে এবং বর্ণাশ্রমাচার তুলিয়া দিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। কেবল শূদ্রাচার থাকিবে কিরূপে? উচ্চবর্ণ না থাকিলে শূদ্রাচারের কোন অর্থ থাকে না। একাকার অর্থে সকলের শূদ্রত্ব গ্রহণও নহে। ও সকল নাম মনে করিলে বা থাকিলে কিছু হইবে না, সেই পুরাতন গণ্ডীর ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়াই বেড়াইতে হইবে। অতএব আমি যে শুভ-লক্ষণের সূত্রপাত দেখিতেছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমরা (ঋষিঠাকুরদের উপদেশমত) যাহাদিগকে এখন ম্লেচ্ছ বলি, আচারে ব্যবহারে এবং প্রাণে প্রাণে ঠিক তাহাদের মত হইবার জন্ত আমরা দিন দিন তাহাদের আহার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ,

রীতিনীতি, বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত বিষয়ের অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি এবং কতক কতক (দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহা এখনও নগণ্য সংখ্যা হইলেও তাহার) ফল হইয়াছে দেখিতেছি। আমরা এই চারিযুগ চেষ্টা করিয়া ঋষির উপদেশে চলিয়াও ঋষির আদর্শ লাভ করিতে পারি নাই; বরং সে আদর্শ হইতে দূরে পড়িতেছি; কিন্তু অল্প দিনের অনুকরণে যে নবীনাদর্শের, উন্নতিকর আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে যাইতেছি, ইহাতে আশার সঞ্চার হয় না কি? এখনকার উন্নত জাতির বিদ্যা ও শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আমাদের এই উন্নতিমুখী গতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও সেই ঋষিঠাকুরদের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মানিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা কলির ব্যবস্থা এমন না করিয়া যদি অন্যবিধ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই অন্যপথে চলিতে বাধ্য হইতাম। ভাব দেখি, তাহা হইলে, আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ না হইত! একাকারেরও সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, ভারতে শ্রেষ্ঠজাতিরা অন্ত্যজ জাতিতে নামিয়া একাকার করিবে, তাঁহারা ভুল বুঝিয়া রাখিয়াছেন। কলি-কালে এক এদেশের ঋষিশাস্ত্র ব্যতীত অন্য দেশের শাস্ত্রে উন্নতির যুগ বলিয়া অভিহিত! ক্রমোন্নতি, অভিব্যক্তি, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি উন্নতির বহুলক্ষণ একালে সপ্রমাণ দেখা দিয়াছে। সকল জাতির মধ্যে শ্রেয়োলাভের জন্য,—উন্নতির জন্য স্পৃহা জাগিয়াছে। বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট ভারতেও তাহার ঢেউ লাগিয়াছে। বর্ণাশ্রমাচারী হিন্দুর বিবিধ বর্ণ ও উপবর্ণ এখনিই (কলিকালের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলেও, এখনিই) ঋষিঠাকুরদের বর্ণব্যবস্থারই দোহাই দিয়া স্ব স্ব বর্ণের উন্নতিতে মন নিবিষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে তাহার আরও বিস্তৃতি হইয়াছে। সকলেই উচ্চবর্ণের সম্মান পাইবার আশায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এখানকার কায়স্থেরা আপনাদের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব প্রমাণ করিয়া আপনা-দের দ্বিজাতীয়ত্বের লক্ষণ সূত্র ধারণ করিতেছে। যুগীরা যোগী বংশাবতংস বলিয়া সূত্রধারণ করিয়াছে। বৈদ্য ও শঙ্খবণিকের (শাঁখারীর) পৈতা পূর্ব্বহইতেই বর্ত্তমান আছে। এখন গন্ধবেণে, সোণারবেণে কাঁশারী, সেকরা, কামার, তাঁতি, বারুই, ছুতার, তিলি ও তেলী (মায় কলু) গোয়ালা, নাপিত, কৈবর্ত্ত (চাষা ও জেলে) শুঁড়ী প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবসায়ী জাতি আপনাদের পূর্ব্ব বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া যদি সূত্রধারণ করিতে পারে, তবে ভাবিয়া দেখুন গোটা ভারতবর্ষটার গলায় দড়ি দিয়া একাকারের রাজত্ব কেমন দৃঢ়তর হইয়া যাইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ন এবং কন্যা গ্রহণে তখন আর

ব্রাহ্মণের মৌখিক আপত্তিও থাকিবে না। এইরূপ সকলেই উন্নতির দিক দিয়াই একাকাম্ম করিবে, আর সেইটাই বিজ্ঞানসম্মত। উন্নতিই এ যুগের লক্ষণ; উন্নত হওয়াই সাধনার সাফল্য সুতরাং অবনত হইয়া শূদ্রত্ব লইয়া কেহ একাকার করিতে রাজি হইবে, এটা মনে করাই অর্ব্বাচীনতা। তারপর শূদ্রত্বের কথা। আজকাল উপেক্ষিত জাতির উন্নতিবিধানকল্পে উচ্চবর্ণীয়েরাই আড়হাতে লাগিয়া গিয়াছেন। চামার, চণ্ডাল, ধোপা, হাড়ী, মেথর ইত্যাদি খাঁটি শূদ্রেরা যদি ইঁহাদের চেষ্টায় ম্লেচ্ছাচার ও একাকারের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়া একবার আধুনিক বিদ্যামন্দিরের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে, তবে সূত্রধারী বৈশ্য-পদবী লাভের পরদিন আর কেহই তাহাদের বাধা দিতে পারিবে না; বিশেষতঃ ইহারা যেরূপ অধ্যবসায়শীল, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলিয়া এখনও পরিচয় দিতেছে, এই অন্ন-বিভ্রাটের দিনে আপনাদের বৃত্তি বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরুপদ্রবে স্ত্রীর হাতে রূপার পৈঁছা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে, তাহাতে ইহারা আধুনিক উন্নতিকর বিদ্যা লাভ করিতে পারিলে আর ইহাদের জন্য ভাবিতে হইবে না। ইহারা তখন তর্‌তর করিয়া উন্নতির সোপান কয়টা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। এইরূপে একদিন এতকালের শূদ্রবর্ণ উন্নত হইয়া দ্বিজবর্ণে মিশিয়া যাইবে। তাহার পর কথা হইবে,—"সবাই যদি হবে দে ( দেব ) এঁটোপাত কুড়াবে কে ?"—যদি সবাই শিখা-সূত্রধারী হইয়া বিদ্যালাভ করিয়া একাকারের রাজত্বে সমানাসনে আসীন হয়, তবে ইহাদের ব্যবসায়গুলা চালাইবে কে ? কর্ম্মগুলা নির্ব্বাহ করিবে কে ? আমাদের ভারতবর্ষে লোকের অভাব নাই। সভ্যতাভিমানী জাতিরা এদেশে আসিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহার মধ্যেই তাহাদের দ্বারা ড্রেণ পরিষ্কার করাইয়া লইতেছেন। এই দল অর্থাৎ ভারতের এই বন্য অসভ্য জাতিরা ভবিষ্যতের উন্নতিশীল উচ্চবর্ণের সংশ্রবে পড়িয়া তাহাদের প্রয়োজন-সাধনার্থ নূতন দাস বা শূদ্রবর্ণের স্থান পূর্ণ করিবে। এই মীমাংসায়, ভারতের এই ভবিষ্যৎ-মঙ্গলময় ছবির কল্পনায় মন বড় খুসী হইল। তবে কেবল মনে পড়িল যে, এই উন্নতির যুগে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এমন নিশ্চল বসিয়া কেন ? তাহারা কোন উন্নতির চেষ্টা করিতেছে না কেন?—তখনই মনে হইল,—তাহারা আর কি উন্নতি চাহিবে ?—সকল উন্নতিই তাহাদের জন্য সমাজে, দেশে, দেশের বাহিরে বর্ত্তমান। বর্ণগুরুরূপে তাহারা সমগ্র ভারতবাসীর সম্মানভাজন; উপনিষদাদি জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া তাহারা সমস্ত পৃথিবীর সম্মানভাজন;

তাহাদের আহার বিহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত দেশটা খাটিতেছে ; গাভীর নূতন দুগ্ধ, চাষের নূতন ফসল, গাছের প্রথম ফল ব্রাহ্মণকে না দিয়া এখনও কেহ খায় না। পিতৃকৃত্যে, ব্রতপূজায়, দানধর্ম্মে ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি সর্ব্বাগ্রে; তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশের লোকের মুক্তির ভাণ্ডারের চাবি তাহাদের হাতে; অতএব তাহারা আর কেন উন্নতির লালসায় কিছু করিতে যাইবে ?—অনেক ভাবিলাম ; কিন্তু দেখিলাম যে, সত্যসত্যই তাহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। সমস্ত পৃথিবীটাই যখন এযুগে উন্নতির গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণেরাই যে কেবল নিশ্চেষ্ট থাকিবে, তাহার আর সম্ভাবনা কোথায় ? কালস্রোতে বাধা তাহারা দিতে পারে, এমন সাধ্য তাহাদের নাই; পূর্ব্বেও কোন দিন তাহার চেষ্টাও করে নাই, আর এখনও করিতেছে না। তাহারাও উন্নতিস্রোতে পড়িয়া অপর সকলের সহিত মিলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তবে তাহাদের গতিটা দেখিতে আপাততঃ বিপরীতমুখে হইতেছে, কেননা তাহাদের উন্নতি স্বার্থের দিক হইতে যখন অবশিষ্ট কিছু নাই, দুনিয়ার যাহা কিছুই প্রার্থনীয় তাহা সমস্তই যখন তাহাদের আছে, তখন তাহাদের গতি অন্যদিকেই দেখা যাইবে না ত কি হইবে ? তাহারা শিখা সূত্র, সন্ধ্যা আহ্নিক, অধ্যাপন অধ্যয়ন, যজন যাজন ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া দেশের বিরাট লোকসঙ্ঘে মিশিয়া যাইতেছে। ঋষিঠাকুরদের নির্দ্দিষ্ট কলির ব্রাহ্মণের লক্ষণগুলা তাহারা দিন দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে এযুগের ব্যবস্থামত স্পৃহনীয় উন্নতির চরম সীমায় ভারতবাসী যখন পৌছিবে, তখন আবার সত্যযুগ আসিবে, তখন আবার নবীন সমাজ গড়িবার জন্য গোড়ায় দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় সভ্যতার ও অসভ্যতার যুদ্ধ বাধিবে ; আর সেই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অসভ্য বন্যজাতি হইতে আবার শূদ্রবর্ণের ন্যায় দাসবর্ণ গঠিত হইতে থাকিবে। ভাবিতে ভাবিতে এইরূপে সেই ঋষিকল্পিত বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্পের অন্তর্গত বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগের কলিযুগ অতিক্রম করিয়া অষ্টাবিংশতি মহাযুগের আরম্ভে সত্যযুগের দ্বারে গিয়া উঠিলাম।—আনন্দে মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আজকার প্রলাপটায় বড় বেশী রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছে। একটু বেদানার রস খাইয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়ুন।" আমিও সম্মত হইয়া বলিলাম—তথাস্তু।

শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা।

# মৌনী

( ১ )

আলয় এবং বিদ্যালয় উভয় স্থান হইতেই বিফলমনোরথ হইয়া আমি একেবারে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথের একটি অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য আছে। সে কাহাকেও ঘৃণা করিয়া তাড়ায় না। যাহার কোথাও স্থান নাই, তাহারও স্থান পথে হয়। ধূলি তৃণ হইতে সংসারের বড় বড় যাহা কিছু সকলকেই পথ আত্মীয়ভাবে বুকের উপর একদিন না একদিন টানিয়া লয়। কেবল তাহাই নহে, পথ কাহাকেও এক স্থানে পিন্ মারিয়া রাখে না, নিজে আগে আগে যায়, আর ডাকিয়া বলে "আয় আয় আয়!"

আমি যখন পথের বাহির হইলাম, তখন ঠিক পথে বাহির হইবার মত সময় নয়; তবে বোধ করি তার একটা নির্দ্ধারিত সময় নাই, অর্থাৎ দিন ক্ষণ দেখিয়া শুভ মুহূর্ত্তে পা বাড়াইবার মত স্থান পথ নহে। যখন বাহির হইতে হইবে. তখন পথই ডাকাডাকি সুরু করিয়া দেয়; অশ্লেষা, মঘা, ভরণী কিছুই সে মানে না। আমি অমাবস্থার ঘোর অন্ধকারে, পূরা ভরণী-নক্ষত্রের শুভক্ষণে পথের অধিষ্ঠাত্রী অলক্ষ্মী-দেবীর চরণ-বন্দনা করিয়া দক্ষিণ পদ আগে বাড়াইয়া দিলাম। সে দিন অগস্ত্য-যাত্রার দিনও বটে; সে দিন সম্মুখের দিকে পা বাড়াইলে আর পশ্চাতের দিকে পা দিতে হয় না। প্রবাদ-বচনটা সত্য কি না, দেখিবার জন্য ঐ নানা শুভযোগের সম্মিলন মুহূর্ত্তে পথের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। পথের রেণু আর আমার শরীরের অণু পরমাণুর সঙ্গে কি যেন একটা যোগাযোগ আছে; আমায় পাইয়া পথের সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দ-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। সে চাঞ্চল্যের বেগ আমার দুইখানি চরণ দিয়া হৃদয়ের মধ্যে পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিল। পথের অন্তরের আনন্দরস বাষ্প-আকারে আমার চক্ষুর দ্বারে দেখা দিল, কিন্তু তাহাতে সম্মুখের পথ দেখিতে কোন বাধা হয় নাই। বক্র, বিসর্পিত, দূর-দূরান্তবাহী পথ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, ধূর্জ্জটির প্রলয়-পিনাকরবে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"আয় আয়, তোকেই আমি চাই।" আমি উত্তর দিলাম "চল, চল, যাই।" পথ আমায় কত স্থানেই পথ দেখাইয়া লইয়া গেল; আমার মত কত জনের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করাইয়া দিল; তাহার

কি অন্ত আছে?—তবে কোথাও আমাকে স্থির হইতে দিল না। কত রাম জানকীর অযোধ্যা, কত বাসুদেব রুক্মিনীর দ্বারকা, কত ভদ্রার্জ্জুনের রেবতাচল, কত ভীম-হিড়িম্বার বন জঙ্গল, কত যুক্তবেণীর ত্রিধারা, কত জরাসন্ধের অন্ধকারা, কত হৈমনিবাসের গৌরীশঙ্কর, কত সাগর-সেতুর রামেশ্বর দেখাইয়া নানা সোজা বাঁকা পথ দিয়া, অবশেষে আমাকে শরতের সুপ্রভাতে একদিন চিরদিনের সেই রাধাকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে নিয়া হাজির করিল। এইখানে আসিয়া পথকে বলিলাম "দিনকতক হেথায় থাকি"। সে বলিল "ইচ্ছা নয় তোমায় কোথাও রাখি।" আমি কহিলাম, "ফাঁকি দিব না. বাকিটুকু একদিন শোধ করিব; আজ বড় শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম দিবে না কি?" সে বলিল "আমার সঙ্গ ছাড়িতেছ বলিয়া আমি রাগ করিব না; আমার রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, মান, অভিমান কিছুই নাই। আবার যখন ইচ্ছা আসিও, আমি এমনি করিয়াই তোমায় বুকে করিয়া বহিয়া একদিন পার-ঘাটায় পহুঁছাইয়া দিব। আমি চিরদিন তোমার পায়ের তলায় পড়িয়াই আছি। ভয় নাই, দুঃসময়ে স্মরণমাত্র হাজির হইব।"

( ২ )

আমি বৃন্দাবনে একখানি পাতার ঘরে আশ্রয় লইলাম। নামে মাত্র পাতার ঘরের আশ্রয়, কিন্তু আমায় পথ ছাড়িল না। প্রথম দিনকতক কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; কি জানি কোন্ সংক্রমণ বা প্রব্রজ্যার যোগে আমার জন্ম, তা গণৎকারে বলিতে পারে; এ পর্য্যন্ত কোথাও "ঠাই পিঁড়ি" "হাতা বেড়ি" আমার অদৃষ্টে জুটিল না; এই বিশ্বের গ্রহনক্ষত্রগুলা যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে, আমি তাহাদেরই একটার মধ্যে থাকি, তাই স্থির হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও ঘোরা আমার অনিবার্য্য। কত ধীর-সমীরে, কত বংশীবটে, কত যমুনা-পুলিনে, কত নিধু-নিকুঞ্জ-ভাণ্ডির বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, তাহার অন্ত নাই—'ব্রজ চৌরাশি ক্রোশ' আমার নখদর্পন হইয়া গেল। কোন্ ডালে শালগ্রাম ফলে তাহা দেখিলাম, ভক্তি-ভরে বৃক্ষতলে প্রণত হইলাম। কোন্ গাছে দ্বাপরের মদনমোহন তাঁহার চূড়াপাঁচনী এবং বাঁশীটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম, প্রেমভরে স্পর্শ করিলাম, প্রদক্ষিণ করিলাম, প্রণত হইলাম। কোন্ কুঞ্জে মান ভাঙ্গিতে চির-আরাধনার রাধার রাতুল-চরণ ব্রজনাথ মাথায় তুলিয়া নিয়াছিলেন, সে

কুঞ্জদ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম ;—মানের নিকট নহে, যে প্রেমে বৈকুণ্ঠ-নাথকে অকুণ্ঠিতভাবে ব্রজনাথ সাজাইয়া প্রেমের ধনের পায়ে ধরাইয়াছেন, সেই প্রেমের পদতল উদ্দেশে কোটি বন্দনা, অর্চ্চনা ও স্তুতি জানাইলাম। রাসমণ্ডপের দ্বারদেশে বৃদ্ধ রাসেশ্বর মহাদেবকে দেখিলাম—মহারাসের সেই একমাত্র সাক্ষী আজি আছেন! আমার কাণে সে দিনের সেই "গীতং তদনঙ্গ বৰ্দ্ধনং" আর এই মধুর-লীলার স্মৃতি-শ্মশানে ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় মূর্চ্ছণায় বারম্বার বাজিয়া উঠিতে লাগিল। আমি মোহাবিষ্টের মত কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম, জানি না। সেই দিন হইতে সে বংশীরব আমার কাণের কাছে বাজিতেই লাগিল। জানি, ইহা গোবিন্দাপ-হৃতমন গোপিকাকে আকর্ষণ করিবার জন্য বনের মাঝে বাজিতেছে না, উহা আমার মনের মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে। কেন সে পাগল বাঁশী আমার মনে আজ বাজে, কেমন করিয়া বলিব? কেবল জানি যে বাজে, অবিরাম বাজে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া আমার কাঁদায়, কোথায় যেন আমায় ডাকে ;—সে কোথায় তাহা বলিতে পারি না ; আমার এ পাতার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া অন্ধকার নিশীথে নীলনিচোলে অঙ্গ ঢাকিয়া অভিসারে যাইতে সমস্ত দেহ মন অন্তর পাগল হইয়া ওঠে। কোথায় যাব, কাহার কাছে যাব, কে আমায় বলিয়া দিবে? বৃন্দাবনে পাতার ঘরের অভাব নাই ; আমার মত উটজ-প্রাঙ্গণে বসিয়া বসিয়া দিন কাটায় এমন দীন দুঃখী বৃন্দাবনে প্রচুর আছে ; মাধুকরীর অন্নে একসন্ধ্যা ক্ষুন্নিবারণ করাও কঠিন নয়। অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল ; কিন্তু দীর্ঘকাল পরিচয় রাখার মত তাহাদের প্রতি মনোভাব হয় নাই। কেবল একজনকে দেখিয়া-ছিলাম, যাহার সঙ্গ ছাড়িতে মন চাহিত না। তবে যম যে দিন তাঁহাকে ছিনাইয়া নিয়া গেল, আমিও সেইদিনই আমার মলিন উত্তরীয়প্রান্তে নয়নের দরবিগলিত ধারা মুছিতে মুছিতে ব্রজরাণীর আনন্দধাম ছাড়িয়া আবার পথের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই দুদিনের পরিচিত অথচ চির-পরিচিতেরও বাড়া মানুষটির সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা বলি।

( ৩ )

গৈরিকধারী গৌরকান্তি বলিষ্ঠ পুরুষ, চিন্তারেখাঙ্কিত প্রশস্ত ভস্ম-চর্চ্চিত ললাট দেখিলে এই মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিন কেমন করিয়া কাটি-

য়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবাট-বক্ষের আয়তনে মনে হয় বুঝি অনেক দুঃখ তাঁহার ঐ গোপন বক্ষতলে বাস করিতেছে; কৃষ্ণতার, আয়ত লোচন হইতে কি করুণাই অনুদিন অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে এবং সময়ে অসময়ে সে বিশাল নয়ন কতবার যে জলে ভরিয়া যাইতে দেখিয়াছি, তাহা আর কি বলিব! সম্বলের মধ্যে দুই তিন খানি গেরুয়া ধুতি ও উত্তরীয়, ভিক্ষার একটি ঝুলি, শীত নিবারণের একখানি কম্বল, বসিবার এবং শয়ন করিবার একখানি মৃগচর্ম্ম এবং অনেকগুলি ছাপা ও হাতেলেখা পুস্তক। তাহার মধ্যে অধিকাংশ সংস্কৃত; কতকগুলি ইংরাজি পুস্তকও আছে। সেগুলি কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক। ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে সে সকল পুস্তকের মধ্যে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য হয় না। আমি ভাবিলাম, এ উজ্জ্বল গৌরকান্তি, প্রিয়দর্শন, অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন পুরুষটী কোন্ দুঃখে ঘর ছাড়িয়া এ অজ্ঞাতবাসে জীবন দিতে বসিয়াছে। প্রশ্ন আমার মনে বহুবার আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আমার এক-দিনের তরেও সুযোগ হয় নাই; সুযোগ হইলেও সাহস পাইতাম কি না জানি না। লোকটির মধ্যে এমনই অনন্যসাধারণ একটা গাম্ভীর্য্য ও সংযম ছিল যে, তাঁহার সম্মুখে গেলেই অভিভূত হইয়া পড়িতাম; কিন্তু সে সংযম ও গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে সর্ব্বদা বিষণ্ণ বা ভয়ঙ্কর করিয়া রাখিত না; কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সহাস্যমুখে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। সে প্রশান্ত নির্ম্মল হাসির মধ্যে অন্তরের কি একটা বেদনার সুর বাজিয়া উঠিত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু আগন্তুক সেই হাসিতে মুগ্ধ হইত, তাঁহাকে ভালবাসিত এবং সেই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি একটি অক্ষুণ্ণ সম্ভ্রমের ভাবও জাগিয়া উঠিত;—এ সম্ভ্রম তাঁহার জন্য, কিম্বা তাঁহার হাসির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন নিদারুণ বেদনার ধ্বনি বাজিত, সেই অজ্ঞাত বেদনার প্রতি সমধর্ম্মী বেদনার এ সম্মান-প্রদর্শন, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার আত্মবিবরণ জানিবার দুর্নিবার ইচ্ছা হইলেও তাহা যে দমন করিয়াছি, সঙ্কল্প করিয়া গিয়াও যে সে সঙ্কল্প রাখিতে পারি নাই, তাহার কারণ বোধ করি তাঁহার নিজের আত্মবিলোপ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা। নিজকে তিনি এমন সম্পূর্ণভাবে এবং সহজে অথচ সর্ব্বদার জন্য একান্তরূপে বিলোপ করিয়া রাখিতেন যে, আগন্তুক তাঁহার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন হইয়া যাইত। তাঁহার স্বাগত কুশল-

প্রশ্নে, সহাস্য নির্ম্মল রহস্যালাপে, তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায়, নানা দেশবিদেশের অভিজ্ঞতার জীবন্ত বর্ণনার মধ্যে মন এমন বিমোহিত হইয়া যাইত যে, তাঁহার বর্ত্তমানই আমার নিকট প্রচুর ছিল, তাঁহার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দিবার সময় তিনি দিতেন না। তাঁহার দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে তিনসন্ধ্যা স্নান এবং দ্বিপ্রহরে একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া এক সন্ধ্যার মত আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আনা। অবসর সময় সমস্তই সংস্কৃত ও ইংরাজি নানা প্রকার পুস্তকের মধ্যে তাঁহার অতিবাহিত হইত। দেবালয়ে ঠাকুর দেখিতে তাঁহাকে কথনই যাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; সন্ধ্যায় যে স্নানার্থ বাহির হইতেন, উহাই তাঁহার সান্ধ্যভ্রমণ, ব্যায়াম প্রভৃতির স্থান পূরণ করিত। তাঁহার এই পর্ণকুটীরের সংসারে কোন দিন একটি তামার পয়সাও দেখি নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "এমন নিঃসম্বল হইয়া থাকেন, হঠাৎ কোন প্রয়োজন্ ত হইতে পারে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "প্রয়োজন হইলেই সংগ্রহও হইবে ভাই, আগে হইতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে গেলে ভার বৃদ্ধিই হয়, ফল যে বিশেষ কিছু হয় তাহা ত বুঝিতে পারি নাই।" এই বিষয়ে আর কোন দিন তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটি, মারাঠী, বাঙ্গালা, ইংরাজি নানা ভাষায় তাঁহাকে কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিয়াছি। যথন যে ভাষায় কথা কহিতেন, মনে হইত তিনি বুঝি জন্মাবধি সেই ভাষাতেই কথা কহিয়া আসিতেছেন। হঠাৎ তিনি কোন্ দেশবাসী, তাহা স্থির করা কঠিন হইত; তবে তাঁহার গৈরিক ধুতিখানি পরিবার রকম দেখিয়া বুঝা যাইত তিনি বাঙ্গালী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সেই উত্তর পাইয়াছি— তিনি হাসিয়া বলিলেন "তোমার অনুমান যথার্থ, আমি বাঙ্গালার কলঙ্কই বটে।" কথাটা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছে; মনে ভাবিয়াছি "তুমি বাঙ্গলার কলঙ্ক নও; কলঙ্ক এই যে, অত বড় দেশটার মধ্যে এমন একটি লোকও ছিল না যে, তোমায় আটক করিয়া রাখিতে পারে!" সন্ধ্যা-স্নানের জন্য অপরাহ্নে বাহির হইয়া তিনি সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষায় নির্জ্জন যমুনার তীরে বসিয়া আপনমনে পূরবীর সুরে গান গাহিতেন, আর তাঁহার বিশাল, বিষণ্ণ বেদনাব্যঞ্জক চক্ষু হইতে অবিরলধারে অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার ব্যথাভরা বুক ভাসাইয়া দিত। নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া সমাগতপ্রায় সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তাঁহার বেদনাময় রক্তারুণ হৃদয়-পুষ্পে এবং অবিরল অশ্রুর মন্দাকিনীধারায় কোন্ দেবতার পাদ্য এবং অর্ঘ্য

রচনা হইত, তাহা সেই প্রৌঢ় সন্ন্যাসীই জানিতেন; আমি দূর হইতে তদবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া উত্তরীয়ে চক্ষু মুছিয়া পলাইয়া আসিতাম; মনে হইত এ ব্যথাভরা পৃথিবীটা একদিন মহাপ্রলয়ে লোপ হইয়া যায় না কেন? সৃষ্টির মধ্যে অনর্থক এত বেদনা কোন্ দানবের সৃজন?

যে পর্ণকুটীরখানিতে তিনি বাস করিতেন, তাহাতে অর্গলবদ্ধ করিবার কোন উপায় ছিল না। তাহার তিন দিকে বেড়া দিয়া ঘেরা—তাহাও সামান্য বাঁশের দরমার বেড়া; সম্মুখভাগে প্রবেশপথ। কুটীরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইলে অভ্যন্তরের সমস্তই দেখা যাইত, দ্বার রুদ্ধ করিবার, অর্গলবদ্ধ করিবার কোন উপায় যে তিনি রাখেন নাই, তাহার কারণ হয়ত কোন প্রকারের বন্ধন রাখিবার আর বুঝি তাঁহার ইচ্ছা ছিল না! বুঝি কোথাও কোন নিগূঢ় গ্রন্থিবন্ধন ছিল; নিদারুণ কোন আঘাতে হয়ত সে বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে; তাই আর তাঁহার আশে পাশে আর কোন প্রকারের কোন বন্ধনের চিহ্ন রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃন্দাবনের কাক কোকিল ময়ূরও তাঁহার পূর্ব্বে কোন দিন জাগিয়াছে কি না জানি না। অতি প্রত্যূষে তিনি উঠিয়া স্নানার্থ যমুনায় যাইতেন; স্নানান্তে সিক্তকেশেই পাঠে মনোনিবেশ করিতেন এবং এক একবার প্রাঙ্গণের একটা চিহ্নিত স্থানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রৌদ্র কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই দেখিতেন। এই পরমনিশ্চিন্ত অধ্যয়ননিরত, বিকারহীন মহাপুরুষের সূর্য্যের সঞ্চরণের প্রতি উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কেন, প্রথম প্রথম তাহা বুঝিতে পারিতাম না; পরে জানিলাম ঐটি তাঁহার ভিক্ষাটনের নির্দ্ধারিত সময়। চিহ্নিত স্থানে রৌদ্র আসিলেই তিনি তাঁহার ঝুলীটি লইয়া মাধুকরীর উদ্দেশে বাহির হইতেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইত না; কারণ নিয়মানুযায়ী তিনি পঞ্চ স্থানে ভিক্ষা আহরণ করিতেন না, একখানি কুটীর হইতে যাহা পাইতেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে প্রচুর, দ্বিতীয় স্থানে যাত্রার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী স্বভাবতই মিতভাষী; যখন ভিক্ষার্থ লোকালয়ের দিকে যাইতেন, তখন নীরবে নতনেত্র মাটির দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া পথ অতিবাহিত করিতেন। একখানি নির্দ্দিষ্ট কুটীরদ্বারে ভিক্ষার্থ তাঁহার ঝুলীটি খুলিয়া ধরিতেন; কুটীরাধিকারিণী প্রৌঢ় রমণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত আহারীয় সামগ্রীতে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝুলী ভরিয়া যাইত। মৌনী ঠাকুর তাঁহার কৃতজ্ঞ নয়নের অর্থভরা করুণ দৃষ্টি এই অন্নপূর্ণার মুখের দিকে নিমিষের জন্য স্থাপিত

করিয়া নীরবে বিদায় লইতেন। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিয়া এই প্রৌঢ়া সুন্দরীর অন্তরের আনন্দ তাঁহার মুখে চক্ষে যেমন করিয়া উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিত, বুঝি বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া কেহ তাহার শতাংশ আনন্দও পায় নাই। এমনই করিয়াই দিন যাইতে লাগিল। শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বরষা এমনই করিয়াই কাটিল। মেঘাচ্ছন্ন বরষার রৌদ্রহীন দিনে সন্ন্যাসীর কথনও যদি ভিক্ষায় বাহির হইতে বিলম্ব হইত, কুটীরবাসিনী প্রৌঢ়া রমণীর সে দিনের উৎকণ্ঠা না দেখিলে উপলব্ধি করা কঠিন; গৃহের অভ্যন্তর, অলিন্দ ও প্রাঙ্গণে প্রৌঢ়া যে কতবার করিয়া গমনাগমন করিত, যে পথে সন্ন্যাসী আসিবেন, সে দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে কতবার কতক্ষণ যে চাহিয়া থাকিত, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সামগ্রী নহে। যথন দূরে উজ্জ্বল গৈরিকের রক্তাভা দিক আলো করিত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়া সুন্দরীর উজ্জ্বল চক্ষুতারকায় আনন্দের কি দীপ্তিই যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তাহা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। মৌনী ব্রহ্মচারীর আগমন-বিলম্বে তাহার অন্তর যে অত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শোভন সরমের রক্তিমরাগ তাহাকে সলজ্জ নববধূর অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিয়া তুলিত।

ভিক্ষান্ন সংগ্রহের সময় যত নিকটবর্ত্তী হইত, এই ধীর শান্ত সন্ন্যাসীর বদনে কি এক আনন্দচাঞ্চল্য দেখিতে পাইতাম। প্রাঙ্গণের নির্দ্দিষ্ট রেখাঙ্কিত স্থানটির নিকট সূর্য্যকর পড়িবার কিছু পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী তাঁহার গ্রন্থপাঠ বন্ধ করিয়া উত্তরীয় ও ভিক্ষার ঝুলীটি হাতে লইতেন; নিমেষের দৃষ্টিতেই বুঝা যাইত যে, এই ক্ষণিক দর্শনের প্রত্যাশায়, দিনান্তের এই চারি চক্ষুর সম্মিলন-প্রতীক্ষায় বলিষ্ঠ প্রৌঢ়ের সর্ব্বশরীর আনন্দবেগে কম্পিত হইতেছে। ভিখারী ব্রহ্মচারীর দিনান্তের ক্ষুধার আহারীয় সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া নিয়া কি আনন্দময় আগ্রহে এই প্রৌঢ়া রমণী বাক্য-হীন মৌন সন্ন্যাসীর পথ নিরীক্ষণ করিত, তাহা যাহার চক্ষু আছে সেই দেখিতে পাইত। সন্ন্যাসীর প্রসারিত ঝুলীটির মধ্যে রমণী যথন ভোজ্য-সামগ্রী-গুলি সযত্নে সাজাইয়া দিত, তথন তাহার অন্তরের মধ্যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে, এমন কি তাহার অঙ্গুলিগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত যেন আনন্দসঙ্গীত বাজিতে থাকিত। এই সামান্য খাদ্যদ্রব্যটুকু রাঁধিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ভিখারীর ভিক্ষার ঝুলীর মধ্যে দেওয়া যে তাহার সমস্ত ঘরকন্নার সর্ব্বসার কর্ম্ম, তাহার নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা, তাহা যে দেথিয়াছে সে এক নজরেই বুঝিতে পারিয়াছে।

[illegible] ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহার কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ সস্নেহ নয়ন তুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য এই প্রৌঢ়ার মুখের উপর স্থাপিত করিতেন, তখন এই পরমাসুন্দরী রমণীর ব্রীড়াসঙ্কুচিত দেহলতিকা সলজ্জ সরমাকুল বেপথুর বেগে বেতসপত্রের মত কাঁপিয়া কেমন করিয়া নীরবে তাহার অন্তরের গোপন কথাটি নিবেদন করিত, তাহা যাহার সে কথা শুনিবার মত কাণ অন্তরের মধ্যে আছে, সেই শুনিতে পাইত।

মেঘমন্থর আষাঢ়ের সুদীর্ঘ দিনে যক্ষবেদনার অমর শ্লোকের মন্দাক্রান্তার উপর সন্ন্যাসীর দরবিগলিত অশ্রুধারার অবিরাম বর্ষণ লক্ষ্য করিয়া রতিবিলাপের বিয়োগিনীর আবৃত্তিকালে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইতে দেখিয়া এ সন্ন্যাস কিসের জন্য, কোন্ যজ্ঞানলে এ আত্মাহুতি প্রদান, সে কথা বুঝিতে আমার একটুও বাকি রহিল না; ভাবিলাম রাজপ্রাসাদ হইতে সন্ন্যাসীর সাধন-কুটীর পর্য্যন্ত মনসিজের অখণ্ড প্রতাপ যদি এমনই অপ্রতিহত, তবে উহার সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া ধরণীতে বেদনার অশ্রুর এমন প্লাবন সৃজন করে কেন?

দেখিতে পাই প্রজাপতির সহিত মনসিজের নিত্য বিরোধ চলিতেছে। যেখানে প্রজাপতি দেবতা কৃপা করেন, মনসিজ তাঁহার দলবল নিয়া দূরে পলাইয়া যান; আর যেখানে মনসিজের করুণাকটাক্ষপাত হয়, প্রজাপতি তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র, কুলশাস্ত্র, আরও কত কি শাস্ত্রের অশাস্ত্রের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করতঃ কন্দর্পের সর্ব্ব চেষ্টা অকারণে অকালে ব্যর্থ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প ও কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। দেবতার পক্ষে ইহা ক্রীড়া হইতে পারে, কিন্তু অসহায় মানব মানবী যে এই দেববিরোধের মধ্যে পড়িয়া কি বেদনায় তাহাদের জীবনের দিন কাটায়, সে সংবাদ স্বর্গে দিয়া দিবার লোক কেহ আছেন কি?

মনের মানুষটি হৃদয়ঘরে যখন আসিয়া আঘাত করে, তখন দ্বার খুলিয়া দিতে আমাদের প্রায়ই বিলম্ব হয়; যখন বিলম্বে দ্বার খুলিয়া দেখি, তখন সে অনেক দূরে গিয়াছে, দীর্ঘশ্বাস সেখানে পৌছিলেও ডাক সেখানে পৌছে না। রতি ইন্দ্রাণী উর্ব্বশীর কণ্ঠের মন্দারমালিকা কদাচিৎ স্থানচ্যুত হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, সেই দেবপ্রসাদী পুষ্পহার সময়ে আমরা মাথায় তুলিয়া আদরে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করি। মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত বহিয়া যায়, তার পরে অসময়ে তাহার অনুসন্ধানে প্রাণপাত করিয়াও ফল পাই না।

তখন সার হয় পথ, সম্বল হয় অশ্রুজল, দৈনিক কার্য্য হয় শেষের দিনের প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হইয়া বসিয়া থাকা। ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে করিতে পারিলে অনেক অশ্রু, অনেক দীর্ঘশ্বাস ধরণী হইতে বিদায় লইত; অনেক দুর্লভ জীবন তাহার আনন্দালোক দানে পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিত। কোন্ দেবতার অভিশাপে তাহা হয় না, কেমন করিয়া বলিব? কেবল জানি যে হয় না, জানি যে নির্ভরের মত স্থান না পাইয়া অনেক অমূল্য জীবন পথে পড়িয়া অকালে পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর অবস্থা কি তাই! কে জানে?

( ৪ )

এমনই করিয়া কতকাল কাটিয়া যাইতে পারিত তাহা কে জানে? কিন্তু এ সংসারে কাছের ধন বুকের নিধিকে ছিনাইয়া নিবার জন্য ভুবন ভরিয়া ষড়যন্ত্র চলিতেছে! সংসারের অন্য সমস্ত ব্যাপারে জলাঞ্জলি দিয়া মুমুক্ষুর নির্ব্বাণ আনন্দের আশার অধিক যত্নে যে স্নেহের আনন্দটুকু অবলম্বন করিয়া এই হতভাগা ও হতভাগিনীর গতপ্রায় জীবনের দিন কোনমতে বহনীয় হইয়াছিল, এজগতের সকল বিধিবিধানের যিনি কর্ত্তা তিনি এই দুইটি প্রাণীর ক্ষণিকের নীরব দর্শনের সেই সুখটুকুও কাড়িয়া লইলেন।

আজ কার্ত্তিক পূর্ণিমা। দৈনিক আহার প্রস্তুত করিয়া নিয়া কুটীর-বাসিনী প্রৌঢ়া রমণী তাহার নিত্য-অতিথির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার অন্তরাত্মা বলিতেছে "এই আসিলেন, এই তাঁর আসিবার নির্দ্ধারিত সময় হইল প্রায়।" নির্দ্দিষ্ট সময় আসিল, রমণী সুযত্নে প্রস্তুত আহার্য্য হাতে নিয়া অলিন্দের উপর দাঁড়াইয়া উগ্র উৎকণ্ঠার সহিত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। সময় অতিবাহিত হয় হয়, তথাপি সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ নাই! রমণীর শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহে, কত আশঙ্কাই তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। একবার মনে হইল পীড়া হয় নাই ত? তৎক্ষণাৎ আবার মনে আসিল পীড়া হইলে আসিতে পারিবেন না, একথা কোন উপায়ে তিনি জানাইতেন। পরক্ষণে ভাবিল সামান্য অসুখ হইলে তিনি ভিক্ষাটনে ক্ষান্ত থাকিতেন না। তবে কি এমন কিছু হইয়াছে যাহাতে তাঁহার পথ চলিবার শক্তিটুকুও নাই? শক্তি সত্বে তিনি আসিবেন না, এমন কথা রমণীর মনে একবারও উদয় হয় নাই, হইতে পারে না। যখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, আর সেদিন তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা নাই

মনে হইল, তখন ভোজ্য সামগ্রী মাটিতে রাখিয়া রমণী ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি তখন আর দেহে মনে নাই। তাহার দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে অবিরলধারায় অশ্রু গড়াইয়া বক্ষতল প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল। দিনান্তের এই ক্ষণদর্শনের জন্য রমণীর সর্ব্বাঙ্গের অণু পরমাণুগুলি যেন নিয়ত উৎসুখ হইয়া থাকিত—এই ক্ষণিকের নীরব দর্শনের জন্যই যেন দুইজনে বাঁচিয়া আছে; নতুবা এমন নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া ত মনে হয় না। বহুক্ষণ হইল সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর আসিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি রমণীর মন হইতে আশা যেন যায় না; বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সে পথপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল যদি এখনও আসেন। হায় মানবের আশা! যাহার কোন অবলম্বনই নাই, আশাটুকুও যদি সে সকল অন্তরাত্মা দিয়া আঁকড়াইয়া না ধরিবে, তবে প্রাণ বাঁচে কেমন করিয়া?

কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাস মহোৎসব। বৃন্দাবনে মহাসমারোহে রাস উৎসব সম্পন্ন হয়। বৃন্দাবনবাসী নরনারী আজ রাসযাত্রার আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছে, কেবল এই একটিমাত্র রমণীর নানা আশঙ্কা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে এই গতপ্রায় শরতের স্বল্পপরিসর দিন শেষ হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রমণীর চিন্তাকুল উৎকন্ঠিত মন আর ধৈর্য্য মানিল না। পূর্ব্বাহ্ণের প্রস্তুত আহারীয় সমস্ত দিনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই জলযোগের উপযোগী সামান্য ফলমূল এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সযত্নে একটি থালায় সাজাইয়া নিয়া সে সন্ন্যাসীর পর্ণকুটীরের অভিমুখে দ্রুতপদক্ষেপে চলিল। প্রতিদিন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিয়া তাঁহার ভোজন সমাপ্ত হইবার আনুমানিক কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তার পরে রমণী যৎকিঞ্চিৎ আহার করিত; আজ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় নাই, সুতরাং রমণী নিজেও আজ কিছুই আহার করে নাই। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সন্ন্যাসীর কুটীর দেখা গেল, আর একটু পরেই দেখা হইবে। সে আগ্রহে রমণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, আবার আশঙ্কাও আছে না জানি গিয়া তাঁহাকে কেমন দেখিব। যদি অসুস্থই হইয়া থাকেন, তবে বন্ধুবান্ধবহীন সঙ্গীবিহীন একক অবস্থায় কে তাঁহার সেবা করিবে, কে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়া দিবে? এ চিন্তায় তাহার হৃদয়স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইতে চাহে। তখন "হে ঠাকুর, গিয়া যেন তাঁহাকে ভাল দেখি," এই বলিয়া রমণী তাহার স্নেহ-

প্রবণ নারী-মনের একান্ত প্রার্থনা আকাশের সকলগুলি দেবতার উদ্দেশে যুক্তকরে পরম আগ্রহে জানাইতে লাগিল। ক্রমে কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইল আপাদমস্তক গৈরিকে আবৃত করিয়া পর্ণশালার মেজের উপরে একব্যক্তি নিস্পন্দভাবে শয়ন করিয়া আছে। রমণীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সন্ন্যাসীকে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাতলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পীড়া কঠিন না হইলে, তাঁহার উত্থান-শক্তি একান্তই তিরোহিত না হইলে তিনি ভিক্ষার্থ একবার বাহির হইতেনই এবং নিতান্ত পীড়িত না হইলে শরতের শুক্ল সন্ধ্যার নৈসর্গিক অপূর্ব্ব শোভার প্রতি এমন একান্ত উদাসীন হইয়া তিনি অকারণে শয়ন করিয়া থাকিতেন না।

যাঁহার পীড়ার কল্পনামাত্রে হৃদয়যন্ত্রের শোণিতপ্রবাহ অচল হইয়া আসিতে চাহে, যথার্থই তাঁহাকে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী দেখিলে একান্ত স্নেহশীলা রমণীর মন কেমন করিয়া আকুল হয় এবং স্নেহাস্পদের সর্ব্ব-ব্যাধি নিজ দেহে টানিয়া নিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়া দিবার জন্য প্রাণ কেমন করিয়া আকুলি-বিকুলি করে, তাহা এই দুঃখদৈন্যময় আধিব্যাধি-পীড়িত সংসারের অমৃতনির্ঝরসদৃশ :স্নেহপ্রবণ রমণী-হৃদয়ই জানে। সন্ন্যাসীর উটজপ্রাঙ্গণে রমণী চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল; স্পন্দহীন পাষাণ-প্রতিমার মত যেন তাহার পদদ্বয় আর চলিতে চাহে না; তাহার হৃদয়যন্ত্র যেন কেহ সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে; তাহার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া যাইতেছে। কতক্ষণ এরূপভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার কোন জ্ঞানই রমণীর নাই। হঠাৎ একসময়ে দেখিল সন্ন্যাসীর গাত্রাবরণ গৈরিকখানি যেন ঈষৎ কম্পিত হইল এবং ব্যাধিক্লিষ্ট কণ্ঠে তিনি যেন একবার কি একটা কাতর-ধ্বনি করিলেন—মনে হইল যেন কিছু চাহিতেছেন। সেই শব্দে রমণী সুপ্তোত্থিতার মত চমকিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ হইতে সন্ন্যাসীর শয্যাসন্নিধানে গিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ; কেবল অফুরন্ত নীলিমাময় দিগন্তস্পর্শী শারদগগন হইতে অজস্রধারায় রাসরজনীর পরিপূর্ণ চন্দ্রমার অবিরল সুধাধারা ঝরিয়া পড়িয়া এই বেদনার পৃথিবীকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিতেছে। চন্দ্রিকাধৌত আকাশে আজ বহুনক্ষত্রের সমাগম নাই। চন্দ্রমণ্ডল হইতে কিয়দ্দূরে একটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্যাধিক্লিষ্ট নিঃসঙ্গ ভূতলশায়ী সন্ন্যাসী এবং এই

হৃদয়-বেদনায় অভিভূতা স্নেহশীলা রমণীকে নির্ণিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে। চন্দ্রকিরণের উন্মাদনায় থাকিয়া থাকিয়া দূরে একটি পাপিয়া তাহার মধুকণ্ঠে কাহাকে ডাকিতেছে কে জানে। কিন্তু এই দুইটি নরনারীর মধ্যে কাহারই আজ এই মনোহর নিসর্গ-শোভার দিকে মন দিবার অবস্থা নহে। একজন মৃত্যু পীড়ায় ভূপর্য্যস্ত, আর একজন নিষ্ফল স্নেহ ও সমবেদনার দুঃসহ ব্যথায় মৃতপ্রায়। হায়! পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর স্নেহের সমুদ্র, এমন পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে উদ্দাম, কিন্তু উপায়হীন মানবমানবী চিরদিন চিরপিপাসিতই রহিয়া গেল! সূর্য্যকরোদ্ভাসিত চন্দ্রিকাস্নিগ্ধ মলয়সম্পৃক্ত বিহঙ্গগীতিঝঙ্কৃত ধরাতলে এত নিষ্ঠুর অকরুণা কোন্ নাগলোক হইতে সুড়ঙ্গপথে উঠিয়া আসিয়াছে তাহা কে জানে?

হঠাৎ একবার পশ্চিমদিক হইতে একটা উচ্ছৃঙ্খল বাতাস কুটীর-সন্নিহিত মালতী-বিতান হইতে সদ্যবিকশিত পুষ্পমঞ্জরীর গন্ধ বহিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। সেই বাতাসে মুখের গৈরিক একটু সরিয়া মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় সন্ন্যাসী তাঁহার জ্বরকাতর আরক্ত নয়ন উন্মীলিত করিয়া রমণীর মুখের উপর স্থাপিত করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন বহুক্ষণের প্রত্যাশিত জনের সাক্ষাৎ পাইলেন। রমণীর বুঝিতে বাকি রহিল না, জ্বর রোগের অধীরতার সঙ্গে সঙ্গে কাহাকে দেখিবার অধীরতা সন্ন্যাসীকে অধিকতর কাতর করিয়াছিল। ব্যাধির গুরুতা দেখিয়া এই পরম স্নেহ-শীলা সেবাপরায়ণা নারীর ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর রোগকাতর মস্তক কোলে নিয়া রমণী পীড়িতের অবিন্যস্ত কেশরাশির মধ্যে তাহার স্নেহহস্তের অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং স্নেহব্যাকুল প্রেমার্দ্রকণ্ঠে বারম্বার ডাকিতে লাগিল "ওগো বন্ধু, ওগো আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রাণাধিক প্রিয়দয়িত আমার, তোমার সর্ব্ব-ব্যাধি আমায় দিয়া তুমি আরোগ্য লাভ করিয়া ওঠ। ওগো স্নেহের মাণিক আমার—তুমি বাঁচ বাঁচ বাঁচ।"

সন্ন্যাসী কি যেন বলিতে চাহিতেছেন মনে হইল, তাঁহার অধরোষ্ঠ বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু কোন শব্দ বাহির হইল না। যে অস্ফুট শব্দ বহুকষ্টে বাহির হইল, তাহার অর্থবোধ অসম্ভব। এই নিষ্ফল চেষ্টায় মুমূর্ষু সন্ন্যাসী আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া অবিরলধারায় অশ্রু গড়াইয়া রমণীর পরিধেয় বাস ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

মুমূর্ষুর জীবনবন্ধ যেন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। প্রদীপ নিবিয়া যাইবার আর মুহূর্ত্তও বাকি নাই।

দ্বাপরের চিরজীবি প্রেমের লীলা-নিকেতন বৃন্দাবনে আজ রাস উৎসব। অনন্ত নীল আকাশ হইতে অবারিত অজস্র সুধাধারা ঝরিয়া ঝরিয়া শ্রীধামের অসংখ্য কুঞ্জতল প্লাবিত করিয়া দিতেছে। সুমন্দ পবনহিল্লোলে শারদ মল্লিকার অনিন্দ্যগন্ধ চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাতবিক্ষুব্ধ কালিন্দী-বক্ষে প্রতিধ্বনিত সহস্র সুধাংশুর মনোহর ছবি কি মধুর তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। জলস্থল অন্তরীক্ষ যখন পরম মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, আনন্দময় ব্রজধামের নরনারী যখন রাসোৎসবের সুখশ্রান্তিতে শয্যাতলে নিলীন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আজন্ম-সঞ্চিত ক্ষুধাতুর অতৃপ্ত উচ্ছ্বসিত স্নেহের সমুদ্র বুকে করিয়া এই একটি মাত্র রমণী তাহার পরম স্নেহের প্রিয়তম ধনের মরণাহত মস্তক কোলে করিয়া তাহাকে চিরবিদায় দিতে বসিয়াছে। আর এক মুহূর্ত্ত, সন্ন্যাসীর অধরোষ্ঠ আর একবার কম্পিত হইল। তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন নিষ্প্রভ নয়ন আর একবার তৃষাতুর কাতরভাবে রমণীর ইন্দীবরতুল্য, বিশাল পক্ষ্মচ্ছায়া সুগভীর অশ্রু-আকুল নয়নের উপর স্থাপিত হইল! কম্পিত হস্তের শিথিল মুষ্টির মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমার স্থলকমল সদৃশ করতল তিনি একবার প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন—তাহার পরেই সব শেষ হইয়া গেল!

ঋষি-কোপানলে মানবী অহল্যার পাষাণী হইবার কথা পুরাণে পড়িয়াছি—দেখি নাই, একান্ত প্রেমাশ্রিতা স্নেহপরায়ণা রমণীকে নিতান্ত নীরবতার মধ্যে চিরবিদায় দিয়া স্নেহের মানুষটি অনির্দ্দেশ যাত্রায় বাহির হইলে অনিন্দ্য সুন্দর নারীমূর্ত্তি যে পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত হয় তাহা আজ এই প্রথম দেখিলাম। এ সৃষ্টি কেন! সৃষ্টির মধ্যে এত প্রেম কেন, এবং এত প্রেমের মধ্যে এত নিদারুণ বেদনা কেন, তাহা কে বলিয়া দেয়?

# তটিনী-তটে

পূর্ণিমার নিশানাথ কৌমুদী-বিস্তারে
করিয়াছে ধরাতল ধৌত জ্যোৎস্নালোকে,
নক্ষত্রমণ্ডলী রচি' হীরকের হারে,
হাসিতেছে আলিঙ্গিয়া যেন স্বর্গলোকে।
অনিল মৃদুল রাগে যাচে উপহার,
মল্লিকা গোলাপ বেলা কেতকী বকুলে,
কুসুম ঢালিয়া দিয়া সুরভি-ভাণ্ডার
হাসিয়া লুটায়ে পড়ে চরণের মূলে।
তটিনী লহর তুলি' কল্লোলিত রব,
বহে যায় মৃদু-ধীর সমীর পরশে,
বেলাভূমি বৃক্ষশ্রেণী লতিকা পল্লব
প্রতিবিম্ব নিয়ে তার কাঁপায় হরষে।
তীরে তার একাকিনী নীরবে বসিয়া
হেরি সেই দৃশ্য, কিবা মধুর-দর্শন,
প্রকৃতির রূপরাশি উলসিত হিয়া
চন্দ্রালোকে সুসজ্জিত তারকা-গগন।
শান্ত তটিনীর বক্ষে তরঙ্গ-চঞ্চল
জাগাইয়া তোলে তায় আবর্ত্ত বিষম,
সুখের পশ্চাতে জাগে দুঃখ অশ্রুজল
এমনি নিয়তিপূর্ণ মানব-জনম।
কভু হাসি, কভু অশ্রু, সুখ আর দুখ
মানব-জীবন পূর্ণ জয়-পরাজয়,
সুখেতে উছলে প্রাণ, দুখে ভাঙ্গে বুক,
অচির চঞ্চল সব কিছু স্থায়ী নয়॥

শ্রীবিভাবতী সেন

# আধুনিক দর্শনের গতি *

[ বৰ্দ্ধমানে অষ্টমবঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের দর্শনশাখায় পঠিত ]

দর্শনের গতি সম্বন্ধে বলিতে গেলেই প্রথমে আমাদের দেশের আধুনিক দর্শনই মনে পড়ে। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে গত দুই বৎসর দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে খুব উজ্জ্বল বলিতে হইবে; কারণ এই দুইবৎসরের মধ্যে "কর্ম্মকথা" ও "বিচিত্র প্রসঙ্গ" নামক উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয় ও ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "অভয়ের কথা" ও তৎপরে "ঠাকুরাণীর কথা" 'মানসী'তে ধারাবাহিকরূপে বাহির হয়। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আমরা অকালে ক্ষেত্রবাবুকে হারাইয়াছি। তিনি সমস্ত জীবন নিজেকে ধরা দেন নাই। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তিনি স্বীয় প্রগাঢ় জ্ঞানের ফল তাঁহার দেশবাসীকে দিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এই এক বৎসর মধ্যেই তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা বহুমূল্য, "অভয়ের কথা" একটি আশ্চর্য্য জিনিষ। এই প্রবন্ধটি যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ইহাতে ক্ষেত্রবাবু যে কি পরিমাণ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। "ঠাকুরাণীর কথা" ক্ষেত্রবাবু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার যেটুকু বাহির হইয়াছে তাহা হইতেই ক্ষেত্র-বাবুর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। "অভয়ের কথা"য় বেদান্ত-মত ব্যক্ত হইয়াছে। বেদান্তের ব্যাখ্যায় ক্ষেত্রবাবু তাঁহার মৌলিকতা যথেষ্ট দেখাইয়া-ছেন। সকল বিষয়ের উল্লেখ এখানে সম্ভব নহে। তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সচরাচর বেদান্তের ব্যাখ্যায় বলা হইয়া থাকে যে ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ আর জগৎটা অসৎ বা মিথ্যা; কিন্তু ইহাতে যে অদ্বয়-বাদের হানি ঘটে এবং dualism of Being and Non-Being আসিয়া পড়ে, তাহা লোকে তত উপলব্ধি করে না, কিন্তু ক্ষেত্রবাবু এ বিষয় অতি সুন্দররূপে বুঝেন এবং অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, সৎ-এর বিপরীত কোন অসৎ-এর কল্পনা করা যাইতে পারে না। "কেহই সৎএর প্রতিদ্বন্দ্বী কোন অসৎ বস্তুর চিন্তা করিতে পারিবে না। যদি পারে, তবে অসৎ বস্তু তৎক্ষণাৎ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়া পড়িবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া চরম সৎকে নমস্কার করিয়া চরম সৎ ভুক্ত

অনুবাদঃ কি আশ্চর্য্য অভিনয়, কিন্তু অভিনয় মাত্র

হইয়া যাইবে" ( মানসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ) ভাদ্র মাসের সংখ্যায় তিনি পুনরায় এই কথা পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন "সৎ যেমন, অসৎ কিছু না থাকায়, অদ্বন্দ্বিত, তথা চিৎ ও অচিৎ কিছু না থাকায় অদ্বন্দ্বিত, absolut" এইরূপে ক্ষেত্রবাবু সৎএর সত্ত্বা নির্ণয় করেন। কিন্তু তিনি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ সৎকে লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। সৎকে আন্দোলিত, উত্তেজিত, ক্রিয়ান্বিত না দেখিয়া তিনি সুখী নহেন। এই জন্য "অভয়ের কথা"র পর "ঠাকুরাণীর কথা" লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা হয়। সৎকে আন্দোলিত, উত্তেজিত করিলে রসের সৃষ্টি হয়। এই রসই প্রেম ইত্যাদি নানা নামে নিজকে জগতে প্রকাশ করিয়াছে। ইহাই ক্ষেত্রবাবুর "ঠাকুরাণীর কথা"য় উল্লিখিত ঠাকুরাণী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও শান্ত, নির্ব্বিকার চৈতন্য লইয়া আর তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। নির্ব্বিকার চৈতন্য কিরূপে বিকারগ্রস্ত হইয়া জগতে নিজকে প্রকাশ করে, ইহা লইয়াই এখন তিনি বেশী ব্যস্ত আছেন। এই জন্য তিনি "মুক্তি"তে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া "কর্ম্ম-কথায়" চৈতন্যের জগতে বিকৃতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কর্ম্মের ব্যাপারে বাস্তবিক চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। কর্ম্মে reason নাই। কর্ম্মে আছে ঋত—যে ঋত অভীদ্ধ তপস্যা হইতে উৎপন্ন, যে ঋতকে দেখিয়া Faustএর হৃৎকম্প হইয়াছিল এবং তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল, welch Schauspiel, uber ach ein schauspiel nur" কর্ম্মে কেবল cosmic process দেখিতে পাওয়া যায়। একথা "কর্ম্মকথা"র অন্তর্গত 'ধর্ম্মের জয়'-শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে যাহা ঘটা উচিত, কর্ম্মজীবনে তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। রামায়ণ ও মহাভারত ইহাই শিখাইয়াছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের জয় কিংবা মহাভারতে পাণ্ডবদিগের জয় দেখান হয় নাই। এই জন্যই "জীবন-সমস্যা"র সহজে মীমাংসা হয় না। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ সে গুহা এত অন্ধকার যে সেখানে কি যে ধর্ম্ম আর কি যে অধর্ম্ম তাহা বিচার-দ্বারা, বিতর্কদ্বারা নিরূপণ করা কঠিন। কিসেই বা জয়, কিসেই বা পরাজয় তাহা বুঝা কঠিন।"

Historical synthesis এর দিক্ হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা রামেন্দ্রবাবু "বিচিত্র প্রসঙ্গে"করিয়াছেন; এগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। আমাদের Kulturgeschichte এ পর্য্যন্ত কেহ লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। "বিচিত্র প্রসঙ্গে" বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম এ চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের আচার

বিচার, ক্রিয়াকর্ম্ম কিরূপে ধীরে ধীরে কতকগুলি মূল তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া পরে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি হইতে দর্শনশাস্ত্র কি নূতন তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে, ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনেক প্রসঙ্গ এই "বিচিত্র-প্রসঙ্গে" রামেন্দ্রবাবু উত্থাপন করিয়াছেন। উহার মধ্যে দুইটি প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম হইতেছে যজ্ঞ এবং দ্বিতীয় গোসম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা; যজ্ঞের উৎপত্তি বেদে। সেই আদিপুরুষ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া নিজকে জগতে প্রসারিত করিয়াছেন। "তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্রতঃ"—সেই অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞরূপে যজ্ঞীয় পশুরূপে—কল্পনা করিয়া প্রোক্ষিত করা হইয়াছিল, এই পুরুষযজ্ঞই আদি যজ্ঞ; এবং ইহা হইতেই যজ্ঞের অর্থ পরিস্ফুট হয়। ত্যাগের নাম যজ্ঞ। পশুরূপে আত্মাকে ত্যাগ যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সোমযজ্ঞে পশুর স্থান ইড়া অধিকার করে। এই ইড়াভক্ষণ আর খৃষ্টানদের Euchaust ভক্ষণ একই জিনিষ। গো-জাতির প্রতি সম্মানও বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গো অর্থে বাক্ বুঝিতে হইবে; এই বাক্ ব্রহ্ম। কৃষ্ণকে গোপাল বলিবার এবং গোপ ও গোপীর উপাখ্যানের তাৎপর্য্যও ইহাই; সুতরাং একদিকে যজ্ঞ এবং অপর দিকে গো—এই দুইটি হইতেই হিন্দুদের সর্ব্ব-প্রধান ক্রিয়াকর্ম্মের উৎপত্তি। শেষে ত্রিবেদী মহাশয় এই দুইটির একত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইড়া = বাক্ = গো। অতএব সেই শব্দব্রহ্ম হইতেই যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে কর্ম্মকথার analytical ব্যাখ্যার সহিত "বিচিত্র প্রসঙ্গে" historical ব্যাখ্যা যোগ করা হইয়াছে। ফলে কর্ম্মকথায় যে জাগতিক ব্যাপারের (cosmic processএর) উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি খুব দৃঢ় হইয়া পড়ে ও reason এর অধিকার কমিয়া যায়।

পাশ্চাত্য জগতেও দর্শনের গতি এইরূপই হইয়া পড়িতেছে। Rationalism Fichte ও Hegel এতে চরম সীমায় উপনীত হইয়া ক্রমশঃ তাহার প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছে। Schopenhauerএর blind will ও Hartmann এর unconscious rationalism এর বিরুদ্ধে প্রথম মাথা তুলে। Lotze কতকটা জোড়াতাড়া দিয়া rationalism এর কিয়ৎপরিমাণে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভাঙ্গা ঘর আর জোড়া গেল না। Unconscious will এর হস্ত হইতে যদিও বা rationalism কে রক্ষা করা গেল, কিন্তু histori

cism এর হাত হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইল না। Bodin borsuet montesquien, Turgot, condorcet এবং ইটালিয়ান Vi o পূর্ব্বে এই পন্থা অধিকার করেন। সম্প্রতি Dilthey বিশেষ আগ্রহের সহিত rationalism এর বিরুদ্ধে historicism খাড়া করিয়াছেন। Dilth·y Eduard Tellar এর পরে দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস হইতে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। Diltheyর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি মনোবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান যেমন সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন, সেইরূপ সমাজনীতি ধর্ম্ম ও কাব্যতত্ত্বেরও চর্চ্চা করিয়াছেন। Eduard Teller'ও এই পথের পথিক। তাঁহার গ্রীকদর্শনের ইতিহাস একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, ইহাতে যে কেবল গ্রীক দর্শনের ইতিহাস বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে, দর্শনের ইতিহাস কি জিনিষ এবং তাহা হইতে দর্শনের প্রণালী কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

Historical school এর চেষ্টাতে যে কেবল Rationalisn বাধা পাইয়াছে তাহা নহে। রোমান্টিসিজমও নানা রূপে পুনরায় মাথা তুলিয়াছে। রোমান্টিজমের অভিযোগ এই যে সকল ব্যাপারেই আত্মা বা চৈতন্যকে আনিতে চেষ্টা করিলে জাগতিক ব্যাপারের অনেক রহস্য কখনও উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না। জগতের খুব অল্প অংশই চৈতন্যের অধিগম্য। বাকী অংশে প্রবেশ করিতে হইলে অন্য কোন বস্তুর আশ্রয় লইতে হয়। চৈতন্য কাটছাট রসশূন্য নির্ব্বিকার সৎপদার্থ; উহা দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল রসপূর্ণ বিকারশীল জাগতিক ব্যাপার বুঝা সম্ভব নহে।

রোমান্টিসিজম্ অনেক মূর্ত্তি ধারণ করে। আপাততঃ চেম্বারলেনের race-romanticism কাইজারলিঙ্গের organioc-vitalisti: romanticism Dilthey র dichtungsromantik আর নিটসের ( Nietzscheর ) individualistic romanticism সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। Chemberlain তাঁহার grundlagendes Neunzehnten Jahrhunderts উনবিংশ শতাব্দীর মূলতত্ত্ব নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জাতিই একমাত্র সত্য। জগতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে কেবল জাতির ক্রিয়াই তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতির উৎকর্ষই জগতের উৎকর্ষ এবং যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা "জাতি"-গুণসমন্বিত সে জাতি হইতেছে জর্ম্মান-জাতি। জাতি কিরূপে চরম সত্য হইতে পারে ইহা বুঝা কঠিন। প্রফেসর

ষ্টাইন তাঁহার "আধুনিক দর্শনের গতি-শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে জাতির মত অশাশ্বত সর্ব্বদাপরিবর্ত্তনশীল জিনিষ কিরূপে মূল সত্য হইতে পারে তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। Reyserling এর রোমান্টিসিজম্ গোড়ায় Organico-vitalis'ic ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা ইহার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। তাঁহার Gefuge der W.lt (জগতের গঠন) নামক পুস্তকে mathematical rhythmকে মূল সত্য সাব্যস্ত করিয়া তিনি একটা Weltm.thematik খাড়া করিয়াছেন। ইহা organic vi-wএর চরম সীমা। Vitalismও এখানে শেষ-টার rhythmic viewএ পরিণত হইয়াছে। তিনি তাঁহার Unsterblichkei (অবিনাশিতা) নামক গ্রন্থে আরও গভীর চিন্তা আনিয়াছেন। কারণ, গণিতশাস্ত্রের রাশিগুলির মত জগৎটা ঠিক তালে তালে চলে, ইহা বলিলেও জগৎকে সম্পূর্ণ বুঝা যায় না—এই সত্য এই গ্রন্থে তিনি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্রকে উপলব্ধি করিবার কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং Totalitactsd.n-kenএর দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। Dilthey কবিতা ও ধর্ম্মের দিক্ হইতে দর্শনশাস্ত্রকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে এক প্রকার Dichtunguomantikএর সৃষ্টি হইয়াছে।

এক দিকে Keyserling ও Dilthey যেমন সমগ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, অপর দিকে ব্যক্তির দিকে টানিয়া Nietzsche দর্শনশাস্ত্রে এক ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যক্তিই চরম সত্য, সমাজের উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা। যে সমাজ ইহা না পারে, সে সমাজের লোপ পাওয়াই উচিত। আধুনিক সমাজ ইহা মোটেই পারিতেছে না, সুতরাং ইহার ধ্বংস হওয়া উচিত। ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতে যদি একটিও su.ermanএর উৎপত্তি হয়, তাহা হইলেও জগতের উন্নতি হইল বলিতে হইবে। Alsosprach Zarathustra (যারাথুষ্ট্র এইরূপ বলিয়াছিলেন) নামক গ্রন্থে তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা একটা সেতু,—যাহার উপর দিয়া মানুষ superman-এর অবস্থায় চলিয়া যাইতে পারে।

. ফরাসী দেশেও ationalism এর বিরুদ্ধে একটা স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সম্প্রতি প্রধানতঃ দুইটি লোক এই স্রোতের গতিকে চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Alfred Fouillee ও Bergson Alfred Fouillee এক প্রকার নূতন voluntarism খাড়া করিয়াছেন। ইহার মূলতত্ত্ব হইতেছে 'idées forces' চিন্তা-শক্তি। চিন্তাগুলিরই শক্তি আছে এবং will এর মতন কাজ

করিতে পারে, মনোজগতের সকল ব্যাপারেই এইরূপ চিন্তা-শক্তি ( idées-forces )র ক্রিয়া দেখা যায়, এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি Psychologie des Idees-Forces, Morale des Idees-Forces, L' Evolutisonisme des Forces নামক কয়খানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

Bergsonর দর্শনশাস্ত্রে স্থান Alfred Fouilleeর অনেক উর্দ্ধে। ইনিও rationalism ত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে দর্শনশাস্ত্র গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে কাল জিনিসটা আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইয়াছেন যে, rationalism এই কালের ব্যাপার একেবারে বুঝিতে পারে না। কাল লইয়া ইহা যখনই আলোচনা করিতে যায়, তখনই উহাকে দেশে পরিণত করিয়া ফেলে। কাল মাপা যায় না, যখনই উহাকে আমরা মাপিতে যাই, তখনই উহার কালত্ব নষ্ট হয়। কালের স্রোত বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ইহা কখনই থামে না। সুতরাং কালের খানিক অংশকে অপর অংশ হইতে পৃথক্ করা যায় না; এবং কালব্যাপী জীবের পূর্ব্ব অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থাকে পৃথক্ করিয়া একই জীবের দুই অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। L' Evolution Creativeএর চতুর্থ পৃষ্ঠায় ইহা পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে। কালের সহিত আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছি, এবং আমাদের পূর্ব্বের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেকে সৃষ্টি করিতেছি, এবং চিত্রকরের প্রতিভা যেমন তাহার চিত্রের দ্বারা বিকাশ পায় ও পরিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ আমাদের প্রতি-মুহূর্ত্তের অবস্থা আমাদিগ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিবর্ত্তন করে। এইরূপে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে, ক্রমাগত নিজকে সৃষ্টি করিতে করিতে আমরা চলি। ফলে জাগতিক ব্যাপার অতীব জটিল হইয়া পড়ে, এবং সহজে উহার মীমাংসার চেষ্টা বৃথা হইয়া যায়। Rationalism এইরূপে সহজে মীমাংসার চেষ্টা করিতে গিয়া ভ্রমে পড়ে। Bregson একটি সুন্দর উদাহরণ-দ্বারা জাগতিক ব্যাপারের জটিলতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনে করুন, একটা গোলা কামান হইতে নিক্ষেপ করা গেল। এই গোলা মনে করুন, প্রতিমুহূর্ত্তে ফাটিতেছে এবং ইহার ভগ্ন অংশগুলি খণ্ডখণ্ড হইয়া বিভক্ত হইতেছে; এই ভগ্ন অংশ হইতে উৎপন্ন আরও ক্ষুদ্র অংশগুলিও ফাটিতেছে, এবং এইরূপে বরাবর চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে ক্রমাগত ফাটিলে গোলার গতি নির্ণয় করা যেরূপ কঠিন ব্যাপার হয়, জগতের গতি নির্ণয় করাও সেইরূপ কঠিন ব্যাপার।

Bergsonএর চিন্তা:দর্শনের রাজ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের দিক্ হইতে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা Bergson এখনও করেন নাই। একমাত্র Husserl (যিনি Logische Grundlage ও Ideen zur Phænomeno logicn এই গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।) ছাড়া logicএর দিক্ হইতে দর্শন-শাস্ত্রকে পুষ্ট করিতে কেহই বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এ চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এ চেষ্টা না করিলে, দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির আশা অতি অল্প। কেন না, কতদূর reason এর দৌড়, এবং কোন্‌খানে তাহাকে আসিতে হয়, তাহা কেবল তর্কশাস্ত্রই নির্ণয় করিতে পারে।

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র।

# শিশুর হাসি

কুন্দধবল দন্তরাশির বেড়া
টুটে হাসি ছুট্‌চে অধর-বেলাতে,
আলোকে তার ভেবে জ্যোৎস্না সেরা
খঞ্জনেরা বিভল আঁখে খেলাতে।
হাসি তোমার রাখ্‌ব ধরে' বলে'
অধর দু'টি করে' আছে মন্ত্রণা,—
পারবে কেন রাখ্‌তে তারে ছলে?
রক্তরাগে তাই ও তাহার যন্ত্রণা।
জন্ম যাহার একটি প্রাণের তলে
বিলয়ও যার চির-প্রাণের মেলাতে,
সে যে সবায় আপন করে বলে'
তারে আপন কর্‌বে কে রে ধূলাতে?
হাসি সে যে প্রাণের লতার ফুল
ঠোঁটের বোঁটায় ফোটার তাহার ঠাঁই যে,
বুদ্বুদ্ সে—আনন্দ তার মূল,
তুলনা এ ফুলের হেথা নাই রে।
বিশ্বমাঝে ঠাকুর যে এক আছে
নিত্য রসধারার উৎস মুখেতে,
এ ফুল ছুটে তাঁরই পায়ের কাছে—
সবুজ তুলি বুলিয়ে মানব বুকেতে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ৯ )

না আসিলেই ভাল হইত। শিরোমণি যে বাধা দেয় নাই, সে তাহার অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধি অথবা দুর্ব্বুদ্ধি। শনিই বোধ হয় তাহাকে বাধা দিতে দেয় নাই। সে শনি শুধু তাদের নয়, বুঝি আমারও। তা মন্দিরে না হইলে এ সব কথা কহিবার অমন পবিত্র স্থান আর কোথায় মিলিবে? শৈল ছিল চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া, সে ছিল বোধ করি ভিতরে। পাশের দিক দিয়া আসিতে আসিতে কথাটা শুনিলাম। কথা বিশ্বাসের নয়, কিন্তু নিজের কাণকে অবিশ্বাস করি কেমন করিয়া? চোখে না হয় চাল্‌শে ধরে, ন্যাবা হয়; কিন্তু কাণে কি হয়? কাণে তালা ধরে, নয় কালা হয়; তাহাতে শোনাই যায় না, উল্টা-পাল্টা শোনায় কি? আসিয়া যা শুনিলাম, তা এই।

"তোমার পুরুতকাকা বড় মুখ-আল্‌গা মানুষ তাঁকে একটু ভয় করে। তিনি যদি হঠাৎ বিয়ের কথাটা ওর সাম্‌নে বলে বসেন, তা হলে এ বিয়ে হওয়া দায় হবে। যাই, তাঁকে একটু পাহারা দিই গে।··· তড়িতের শরীর কিছু জানি কেন ভাল থাকবে না; তার উপর হঠাৎ একটা। তুমি চুপ করে লজ্জা ক'রে থাকলে হবে না, তোমারই এখন সব ভার। আমার কথা ভেবে দেখ দেখি, কারুকে এখন কিছু জানাতে পারবে না এমন কি তড়িৎকেও লুকিয়ে রাখতে হবে। তোমায় আমি কত ভালবাসি জানো তো লক্ষ্মি, তাই এমন স্বাধীন ভাবে ··।" মধ্যে মধ্যে সব কথা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল না। না যাক্ বোঝা; এর চেয়ে আবার কোন্ কথা কবে স্পষ্ট হইয়াছে! সমস্ত সিঁড়িগুলা অতিক্রম করিয়া একেবারে জলের কিনারায় আসিয়া নামা বন্ধ করিলাম। সমস্ত সংসারটাই যেন সে সময় ওই দীঘির তলাটার মতই অন্ধকার, অদৃশ্য বোধ হইল। আপনার মনকে বারংবার প্রশ্ন করিলাম;—যা শুনিলাম তা ঠিক শোনা তো বটে? স্বপ্ন তো নয়? স্বর শৈলেনের। যে শৈল বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার, নৈতিক-জীবনের গৌরব, দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ, তাহার আজ এই অধঃপতন। তাহার স্ত্রী, মানিলাম, চিররুগ্না, শাস্ত্রমতে পরিবর্জ্জনীয়া কিন্তু সে যে নজীরে, সে নজীর শৈল দেখাইতে পারে না। তাহার পত্নী বন্ধ্যা নহে, পুত্রের জননী; পুত্রের জন্যই অন্য স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আছে। তাহার

তাও নাই। তার উপর এত বড় জুয়াচুরি করিয়া? ধিক্ তাহার বিদ্যা-বুদ্ধিতে! এই জন্যই তো শুধু ব্যবহারিক বিদ্যায় মানুষকে বিদ্বান করিতে পারে না। ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত যে শিক্ষা, তাহা কুশিক্ষা! স্ত্রীলোককে অগ্নি-হবির মত দূরে না রাখিয়া, স্পর্দ্ধাভরে যে আমায় এতদিন উপহাস করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই এ পরিণাম! আগুনের শিখা লইয়া খেলা করিলে যে কাপড়ে, কাপড় হইতে ঘরের খুঁটিতে, চালে আগুন ধরিবে, সে আর বিচিত্র কি?

কতক্ষণ জানি না, মনের আগুনে জলের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বাড়বাগ্নির মত জ্বলিতেছিলাম। কখন জানি না, বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া শীত আরম্ভ করিয়াছিল। গাছে গাছে পাখীরা কোলাহল-শব্দে অভিযান করিয়া দখল লইতেছিল! দীঘির কালো জলে শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রের ছায়া আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে মুখ দেখিতে দেখিতে হাসিতেছিল; বুঝি আমার মুখটাও দেখিতে পাইয়াছিল! পিছন হইতে কাঁধে হাত দিয়া শৈলেন আমায় চেতাইয়া তুলিল, "তুমি বুঝি এখানে যোগ যাগ আরম্ভ করে দিয়েছ? আমার যে এদিকে খিদেয় নাড়িশুদ্ধ হজম হয়ে যেতে বসেচে, তার খবর রাখো? এসো, এসো—"

তাহার এই ভণ্ডামীতে আমার তখন এমন রাগ হইয়াছিল যে, আমার মন সরস না হইয়া দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। একবার এমনও মনে হইল, ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিই। সামলাইয়া লইয়া তবুও অনেকখানি উদ্ধত-স্বরেই কহিলাম "তোমার এত পেটের জ্বালা ধরে থাকে, তুমি খাওগে। আমার ধরে নি। যাবার সময় ডেকো, যাবো; এখন আমায় বিরক্ত করো না—যাও।"—শৈলেন কতকটা আশ্চর্য্য হইয়াই আমার কাঁধ হইতে হাতটা সরাইয়া লইল, কিন্তু তারপরই সে নিজের স্বভাবমত একটুখানি মিষ্ট মধুর হাসি হাসিল। সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু তার চিরদিনের! কিন্তু আজ আমার নিকট তাহার আর সে দর ছিল। না, ইহার সব মধুটুকু ঈর্ষ্যা—না না ঈর্ষ্যা কেন ঈর্ষ্যা কেন? উচিত-জ্ঞানের, কর্ত্তব্য-বোধের তাপে শুখাইয়া গিয়াছিল, এই কথাই বলিতেছিলাম। ঈর্ষ্যা কিসের? শৈলেন সেই হাসি হাসিয়া তাহারই সেই প্রোজ্জ্বল দৃষ্টির আলোটুকু আমার মুখে যেন উজাড় করিয়া দিয়াই বলিয়া গেল "ওঃ, এমন শোচনীয় অবস্থা!"

যাহারা পরের বিদ্রূপের পাত্র, তাহারাই অপরকে ব্যঙ্গ করিতে যায়। আমার ও ব্যবসাও নয়, আমি পারিও না, তাই চুরি না করিয়াই চোর হই।

নিস্তার নাই! শৈল চলিয়া গেলে শিরোমণি মশাই আসিয়া বলিলেন "কেন বাবা, একটু মিষ্টমুখ করে যেতে দোষ কি? বাবু তো আমরা গরীব ব'লে কখন ঘৃণা করেন না।" হাজারো হোক, তবু বুড়োমানুষ! মাথার সব চুল শোনের মতই সাদা। একটু লজ্জা বোধ করিয়া বলিলাম "আপনি যখন এমন কথা বল্‌চেন, তখন অগত্যাই খাবো।"

মন্দিরের সাম্‌নে সেই শানবাঁধা রকটুকুতে দুখানি পিতল থালে কিছু কিছু কাটাকুচানো ফল ও ক্ষিরের ছাঁচ দিয়া জলখাবার সাজান। দুখানি কম্বলের আসন পাতা। তার একখানিতে ইতিমধ্যেই শৈলেন বসিয়া গিয়াছে, আমি আসিতেই সে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল "আমরা তো ভাই চাঁদের হাসি, ফুলের মধু খাই না! মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পার্থিব আহার না হলে ভাই, আমাদের পৃথিবী আঁধার দেখ্‌তে হয়—" বলিয়াই পুনরাহারে প্রবৃত্ত হইল।

আমি আসনে বসিয়া এটাসেটা নাড়িয়া-চাড়িয়া একটু আধটু খুঁটিয়া ভাঙ্গিয়া মুখে দিলাম। যে হাতের দান এ, তাহার স্পৃষ্ট বস্তু আজ আমার মুখের কাছে লইয়া যাইতেই যেন ভিতরকার বিবেক গালে চড় মারিতেছিল;—সে হাত পাপিষ্ঠার, দেবীর নয়। শৈলেন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "অনাহারে, বাতাহারে যে থাকতে পারে, সে থাক, আমি তা মোটেই পারিনে, লক্ষ্মি, ভাণ্ডার শূন্য নাকি?"

শিরোমণি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "দে' রে, বাবুকে কিছু দিয়ে যা, আহা বাবু আমাদের, বুঝেছ তো মা লক্ষ্মী! হ্যাঁ, একেবারে সদানন্দ! মন তো নয়, যেন গঙ্গার জলটুকু"

তা আর বুঝে নাই, খুব বুঝিয়াছে! তুমিই দেখিতেছি বুঝানর ভারটা জানিয়া-শুনিয়া ঘাড়ে লইয়াছ! না হইলে কোথাকার অপরিচিত পুরুষ ডাকিয়া আনিয়া এই অগ্নিশিখার মত যুবতী মেয়েকে দিয়া পরিচর্য্যা করাও বেশ্‌ বেশ, দেশের উন্নতি হইতেছে বটে, শুভ লক্ষণ! আমি এখন একটা প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের সব চেয়ে বড় একটা কাগজে ছাপিতে দিব যে, সেটা বাহির হইলে এই নব-সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ধর্ম্মধ্বজদের একেবারে দুইচক্ষু কপালে উঠিয়া যাইবে। মেয়েমানুষ নিজের বাপ এবং স্বামী, এই দুজন ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সাম্‌নে বাহির হইবে, কথা কহিবে তাহাকে খাওয়াইবে, তাহার মুখে ভালবাসার কথাও শুনিবে? তবে আর তাহাতে রহিল কি?

মন্থরগামিনী লক্ষ্মী আসিয়া শৈলর পাতে কতকগুলা কাটা ফল ও একখানা ক্ষিরের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল ; আমার পাতের দিকে অপাঙ্গেও লক্ষ্য করিল না। মোহিনী যখন সমানভাগে দেবাসুরকে সুধা বাঁটিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তখন কে জানিত যে, অমৃত দেবতা পাইল, অসুরের ভাগ্যে তাহাই হইল গরল !

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুরূপা মূর্ত্তিকে আর বরদা বোধ হইল না। তাহা মারীচের সুবর্ণময় মৃগরূপ ধারণ করিয়াছিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম ; শৈল কিন্তু যেন কখন এমন শশা, কলার চাকা, এমন সরবতি লেবুর অম্লরস জন্মেও চোখে দেখে নাই, এমনি করিয়া তাহাদের প্রত্যেক টুকরাটি নিঃশেষ করিয়া তবে উঠিল।

পথে দুই বন্ধুতে একটিও কথা হইল না। আমি বেশ অনুভব করিতে-ছিলাম, আমাদের আবাল্য বন্ধুত্বের মাঝখানে ইতিমধ্যেই যেন একটা বিচ্ছেদের পর্দ্দা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

( ১০ )

ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সব রোগে ধরিলে সে রোগীর জ্ঞানগোচর দিন দিনই লোপ পায়। শৈলর রোগও যে কঠিন হইয়া উঠিতেছে, আমি ইহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছি। সে যেন তাহার স্ত্রীকে আজকাল একটা বাড়াবাড়ি রকম আদর দেখাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যেটার অভাব যতই বাড়িতে থাকে, লোক-দেখানোর ইচ্ছা ততই প্রবল হয়। এত বাড়াবাড়ি যে, শৈল আমার অস্তিত্বটা-শুদ্ধ বিস্মৃত হইয়া গিয়াই যেন তড়িতাকে উঠিতে-বসিতে হাজারবার 'ডিয়ার' বলিয়া ইংরেজি ধরণে ডাকিয়া, বসিলে অমনি তাহার পিছনে বালিশটি ঠিক করিয়া দিয়া, বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে গায়ের শালখানি ঈষৎ সরিয়া গেলে টানিয়া দিয়া, তাহাকে ও আমাকেও অনেক সময় যেন অপ্রতিভ করিয়া তোলে। বরাবরই অবশ্য এ সব ছিল ; আজকাল যেন আরো বেশি বেশি হইয়াছে। রাত্রে তাহারা স্বতন্ত্র ঘরে শোয়। আমার ঘর হইতে শুনিতে পাই, কেন না এটা আমারি পাশের ঘর বৈতো না। শুনিতে পাই কেন, দুএক দিন দৈবাৎ ঘরের সামনে দিয়া আচম্‌কা যাইবার সময় হয়তো পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিয়াছি শৈল স্ত্রীকে তার শয়নগৃহে শোয়াইয়া দিয়া তাহার গায়ে লেপটি টানিয়া দিয়া কত সন্তর্পণে একটু আদর করিয়া নিজে

শুইতে যায়। কতবার দেখিয়াছি, ভোরের বেলা উঠিয়া স্ত্রীর ঘরের দোর-গোড়ায় চুপ করিয়া উৎকর্ণভাবে দাঁড়াইয়া যেন কি শুনিতেছে। বোধ করি নিশ্বাসের শব্দ! মুখ সে সময় তাহার যেন কালি হইয়া যায়; কি যেন একটা ভবিষ্যৎ আতঙ্কে তাহাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে! এই শৈল তবে এত ভালবাসার স্ত্রীকে ছাড়িয়া কেন বিবাহ করিতে যাইতেছে? এ যেন কি একটা রহস্য! যেন এটা যথার্থ সত্য নয়! যেন শুধু এ আমারি কল্পনা! কিন্তু তাই বা বলি কেমন করিয়া? একটা প্রমাণ দিই শোন। একদিন বাড়ীতে পাঁচটি বন্ধু খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, অমন প্রায়ই অবশ্য খাওয়ান-দাওয়ান হইত। শৈল্‌ তো স্ত্রীকে কাচে বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিতে ইচ্ছুক। সেদিন কিছুতেই সে তড়িতাকে আগুন-তাতে যাইতে দিবে না। দুদিন আগে নাকি কবে তাহার মাথা ধরিয়াছিল, আমি একবাড়ীতে পাশের ঘরে থাকিয়াও তো কিছু জানিতে পারি নাই। যাই হোক, তবু সে তো ধরিয়াছিল। আবার যদি ধরে, সে কোনমতেই হইবে না। বামুন-ঠাকুর 'মহারাজ' যা পারে, তাই করুক। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন "তবে অমন ব্যাগারে নেমন্তন্ন তাদের করতে গিয়েছিলে কেন? তারা কি ঘরে মহারাজের রান্না খেতে পায় না।"

শৈল বলিল "তোমার হাতের সাজা পান খাবে, ফল-সাজান খাবে, ক্যাওড়া-দেওয়া জল খাবে, আর কিছু নাই বা খেলে।"

"না গো তুমি জান না, মহারাজ কমলালেবুর পায়েসের ক্ষীরটা ধরিয়ে ফেলে এখনি সব মাটি করবে; ওটা আমায় হাতা দিতে দাও; কি আর তাতে আঁচ লাগ্‌বে।"

"আচ্ছা দাও না আমি হাতা দিয়ে দিচ্চি; তুমি না।"

আমি রহিয়াছি; বৌদি লজ্জাভরে কহিয়া উঠিলেন "কি যে বলো, তুমি আবার কি করবে? বাড়াবাড়ি করো না, সরো।"

শৈলেন্দ্র হাসিতে লাগিল "ঠাকুরপোর কাছে মান রাখা হচ্চে! কেন আমি যেন তোমার কখন সাহায্যই করি নে? কে তোমার সংসার চালিয়ে দেয়, বলতো মশাই? আচারের সব তো আমিই তৈরি করি, ভাপাদইয়ের ঢাকনা খুলে কে কেটে বার করে? আজ আমি বুঝি এম্‌নি অকর্ম্মা হয়ে গেলুম। সেদিন ছানার চপ্‌ কতোগুলো আমি ভেজেছিলাম, অস্বীকার করো।"

বৌদিদি হাসি মুখ রাঙা করিয়া কহিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি খুব কাজের লোক,

কিন্তু সেকাজে এতগুলি বাইরের লোকের খাওয়া হবে না। তাহলে না হয় এক কাজ করি, একখানা চিঠি দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিই ; লক্ষ্মী না হয় একবার এসে সব করে দিয়ে যাক্। সে তো আজকাল আর আসেই না, তোমায় কতবার বল্‌চি, একদিন তাকে আনাও, তুমি তো গ্রাহ্যই কর না।"

শৈলেন যেন কেমন অসুস্থ হইয়া উঠিল। সে যেন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়াই জেদের স্বরেই বলিয়া উঠিল "না না, যাক্ আবার অতদূর থেকে এনে কি হবে? ও মহারাজই পারবে এখন, দেখ্ না পারে কি না"

বৌদিদি বলিলেন "ওগো, অনেক দেখা আমার হয়ে গেছে, ও পারবে না। লক্ষ্মী আসুকই না। তাকে দেখ্‌তে এত ইচ্ছে হয়; কতদিন হলো আসেনি, সে সব শিখেচে করে-কর্ম্মে দিয়ে খেয়ে-দেয়ে যাবে তখন।"

শৈলকে স্ত্রীর উপর এ রকম হুকুমের সুরে কথা কহিতে কোনদিন শুনি নাই। সে একটু জিদ করার মত করিয়াই বলিল "আচ্ছা, তবে না হয় তুমি ক্ষীরটা জ্বালই দাও, অতদূর থেকে শুধু শুধু অবেলায় মানুষকে আনে না। অন্য একদিন সে আসবে এখন।"

তড়িতার মনে কোন সংশয় ছিল না ; কিন্তু আমি তো বুঝিলাম, কেন লক্ষ্মীকে এখানে আনিতে শৈলর আপত্তি! পূর্ব্বে সে এ বাড়ীতে সর্ব্বদা নাকি আসা-যাওয়া করিত, আর এখন একটা দরকারি কাজেও একবার আসিতে পারে না। এর অর্থটা কি?

কিছু যেন বোঝাও যায় না। তড়িতার প্রতি এর যে ভাব, সেটাকে ত কোনমতেই ইংরেজিতে যেটাকে passion বলে এবং আমরা বলি মোহ, সেই জিনিষটার সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না! আমি সত্য কথাই বলিব, রচনা করিয়া একটা মিথ্যা-গল্প ফাঁদিতে ত বসি নাই। শৈলেন্দ্রের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাটাকে আমার বরং অতিরিক্ত রকমই pas·ionless বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়াই অনেক সময় আশ্চর্য্যানুভব হইয়াছে। যেন অভিন্নহৃদয় দুটি বন্ধু তাহারা, ঘরকন্না করিতেছিল। স্ত্রীকে চোক ভরিয়া দেখিতেও যদি তাহার গায়ে দৃষ্টির আঁচ লাগে, তাই যেন সে তাহার দিকে হাসির প্রলেপ না মাখাইয়া সাহস করিয়া চাহিয়াও দেখে না। কিসে সে ভাল থাকে, কিসে তাকে ভাল দেখায়, এই তাহার একমাত্র ভয় ভাবনা। তার মাঝখানে কি এমন একটা সর্ব্বনেশে দাগা সে তাহার বুকে দিতে পারিবে? আমার বোধ হয় না। ভগবান করুন, তাই যেন হয়। কিন্তু

তা হইতেছে কই? এই যে আবার সকালবেলা ইন্‌সিওরড্ পার্শ্বেলে কি একটা আসিল; আমায় এবং বৌদিকে গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও ত সেটায় যা ছিল, তা আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। কি ছিল বলিব? বলিতে আমার গলা চাপিয়া আসিলেও আমি না হয় তবু কোনমতে বলিলাম, আপনাদের শুনিতে ইচ্ছা হইবে কি? ছিল ছাই; একখানা গোলাপি বেনারসী শাড়ি, একটা ঐরকম রংএর রেশমী জোড়, একটা লকেট-দেওয়া সরু সোণার হার; লকেটে মুক্তাখচিত দুইটি অক্ষরে একটি শব্দ খোদিত। সে একটি নাম; নামটি লক্ষ্মী। আর কিছু, আর কিছু প্রমাণ আপনারা চান? তা দিতে পারিতাম; কিন্তু আর যেন প্রবৃত্তি হয় না; একজোড়া রাঙ্গা শাঁখা, একটি কাগজমোড়া লালসূতা। আর কি কি? বিবাহের সময় মেয়েদের হাতে এসকল গাছগাছড়া, শিকড়মাকড় দেখিয়াছি মনে পড়ে।

ট্রাঙ্ক সাজাইয়া বন্ধুকে বলিলাম "আজ আমায় বাড়ী ফিরিতেই হইবে। না গেলেই নয়।" আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। আমায় কে যেন অলক্ষিতে ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার মত ছুটাইয়া দিবার জন্য চাবুক দিয়া মারিতেছিল। তিষ্ঠান আমার দায় হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধু যেন অবাক্ হইয়া গেল। একটু অবাক্ ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর কি যেন বুঝিয়া লইয়াছে, এম্‌নি করিয়া তখন আবার একটু হাসি তাহার বিস্মিত নেত্রে দেখা দিল, অতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গমিশ্র জয়ের হাসি। বলিল "আজ যাবে, না আরো কিছু—খেয়াল দেখছিলে নাকি?"

বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল, চেঁচামেচি না করিয়া শান্তভাবেই কহিলাম "না না আমায় যেতেই হবে। দাদার চিঠি এসেছে তাঁর শরীর—"

"বাঃ তোমার দাদার শরীরে আবার কখন কি হলো? কিছু হয়নি। আমি আজি তাঁর—যাক্ যাক্, তাঁর—হ্যাঁ তাঁর চিঠি তুমি ত আজকে পাওনি? চালাকি হচ্চে যাও যাও খোকামি করতে হবে না, ওরে মুনুয়া তোর কাকাবাবু তোকে ফেলে চলে যেতে চাইবে শুনচিস্‌রে গাধা!"

সেই গাধার সহিত মূর্ত্তিতে এবং বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিশু কন্দর্পটি ছুটিয়া আসিয়া আমারই হাতটা দৃঢ় করিয়া ধরিবার অভিনয় করিল। আস্ফালন করিয়া বলিল "ছাল্‌বোনাতো আম্‌নাকে!"

তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চুমা খাইয়া লুফিয়া নামাইয়া দিলাম। যাওয়া আর

ঘটিল না। দুষ্ট স্বরস্বতী যে, দুজনকার কাঁধেই দুদিক দিয়া ভর করিতেছেন! তিনি ত কাহাকেও দিয়া যেটা ভাল সেটা ঘটিতে দিবেন না।

রহিলাম, কিন্তু মন পুড়িতে লাগিল। মেয়েমানুষ নই, কান্নার বেগে বুক ফুলিলেও কাঁদিবার উপায় ভগবান হাতে রাখেন নাই। রাগ করিয়া পিটাইবার জন্য নিজের ছোট ভাই ছেলে বা চাকর কেহই কাছে ছিল না, ঝালঝাড়িবার জন্য স্ত্রী, বোন কিংবা মা থাকিলে সেও এক রকম হইত, তাও না। সবটাই তাই ভিতরে ভরা রহিয়া গেল। রুদ্ধ বাষ্পের তাপে কত অসাধ্য সাধন হয়; আমার মনটাও সেই গনগনে তাতে তাতিয়া ভিতরটাকে ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় করিয়া তুলিল; মন বলিতে লাগিল একি ওর উপদ্রব! তুই আইবুড় ছেলে, তুই আইবুড় মেয়ে পাবি তাহা না হইয়া একজন বিবাহিত ব্যক্তি কেন কাড়িয়া লয়! তা আমিও ত জানি যে লওয়া ওর উচিত নয়; কিন্তু দেশের আইন—সে অন্য রকম, এখানের জজসাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন ইংরেজ কিংবা একজন ব্রাহ্মকেও যে দুবার বিবাহের পাপে অন্ততঃ সাতবৎসর জেল দিবে; কিন্তু হিন্দু বলিয়া ওকে কিছুই বলিবে না। সমাজেও বড় জোর ছি-ছি বলিতে পারে, একঘরে করা কি গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া সেরকম কিছু; না কিছু না। বুকটা আমার ধড়ফড় করিতে লাগিল, আমিই না হয় লক্ষ্মীকে বিবাহ করি, হাঁ৷ তাই করি, কেন করিব না? আমি বিবাহ করিলে সবদিকই বজায় থাকে, তাই ভাল, তাই করি। কিন্তু কেমন করিয়া বলিব? কে কথাটা পাড়িবে? সে কি হয়, যে মুখে শত বার অস্বীকার করিয়া আসিতেছি আজ আপনা হইতে মানমর্য্যাদা খোয়াইয়া বলিতে যাইব 'ওগো, আমায় তোমার মুখের গ্রাসটি মুখের কাছ হইতে নামাইয়া দাও, আমার এতক্ষণে অক্ষুধা রোগের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে! ধেৎ তার চেয়ে ওদের কপালে যা আছে তাই হোক, আমি কি করিব? ধরো, আমি যদি বিবাহিতই হইতাম নিজে আমি কিছু বলিতে পারিব না। শৈল কিছুদিন হইতেই যে আর ঠাট্টাস্থলেও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, এবং বৌদি করিলেও কথা চাপা দেয় তা' আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াই দেখিয়াছি। সে সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। এমনি করিতে করিতে কোন দিন আমার লক্ষ্মী তাহার হইয়া যাইবে। আমার লক্ষ্মী! হাঁ৷ আমার বই কি! আমি লক্ষ্মীকে ভালবাসি, তাকে চাই, তাকে না পাইলে আমার জীবন

অন্ধকার হইয়া যাইবে। কেন সে আমার হইবে না, কেন আমি কি তার অযোগ্য। না শৈলেন্দ্রই সহস্রবার তার অনুপযুক্ত, যোগ্য আমিই।

একদিন, সেদিন রবিবার। আহারের পর নিজের ঘরে বিষ্ণুপুরাণখানা নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। সৌভরী ঋষির দুর্দ্দশা পড়িয়া অনেক হাসিই আমি হাসিয়াছি, আজ যখন সে হাসি আমার অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তখন মনকে ঠেকা দিবার জন্য ভাঙ্গা বাঁশের খুঁটির মতই সেই-খানটাকে টানিয়া বাহির করিলাম; যেখানে আশপাশবদ্ধ ঋষি মৎস-পরিবারের গার্হস্থ্য দৃষ্টান্তে লুব্ধ হইয়া পঞ্চাশৎ রাজকন্যা পত্নী লইয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার শেষে ভ্রান্তি-মরীচিকার অপনোদনে অনুতপ্ত বিলাপ কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন।

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দ লক্ষৈঃ
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্, উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্॥

হায় হায় এই রক্তবীজের ন্যায় উৎপত্তিশীল মনোরথই আজ শৈলেন্দ্রের সেই অকলঙ্ক চরিত্র এমন রাহুগ্রস্ত করিতে বসিয়াছে। ভগবান্! আমায় সময় থাকিতে তবু সাবধান করিয়াছেন। রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা ছাড়িয়া কেশব শিরোমণির একটিমাত্র পালিতাও আমার গলায় বরমালা দিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিল না। তা নাই করুক। আমিও মালা পরিবার জন্য কাঁদিতে বসি নাই। এই জন্য একটু দুঃখ হয় যে, অমন মেয়েটা যে একজনের হৃদয়-মন্দিরের লক্ষ্মী হইতে পারিত সে এক বিবাহিতের শুধু মোহের মোহন বস্তু মাত্রই হইল। ভোগের বিলাসিনী আর পূজার দেবীতে যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের ভেদ।

বাহিরে আলোকলহরলীলায়িত রৌদ্রজ্জ্বলাপৃথিবী। তালগাছে তাড়ির গন্ধে মৌমাছি গুলার মাতলামির যেন শেষ নাই—বাগানের সরু সরু পথগুলি বকুলফুলে ভরিয়া গিয়াছে। এই দিগ্ধক্লিষ্ট প্রাণ লইয়া জানলার মধ্যদিয়া চাহিতে যেন মন সরে না। মনে যা'র সুখ নাই, অপরের আনন্দ তাহার নিকট মর্ম্মান্তিক। পেচক যে কেন দিনের আলোর বিরোধী আমি এখন তা বেশ বুঝিতে পারি। ঐ জীবটির মনে একান্তই আনন্দের অভাবে অমন একটা গোলালো বিচিত্র জীবকে নিশাচরে পরিণত করিয়া দিয়াছে। তুমি যখন কাঁদিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছ, তখন কাহারও হাসির প্রতিঘাত তোমার সেই

ক্রন্দন-স্রোতকে কি রকম নিষ্ঠুরভাবে আহত করিয়া তোলে, ভেবে দেখো-দেখি? তোমার হাসির সময় বরং কোন রকমে চোককাণ মুদিয়া তুমি অন্যের কান্না সহিলেও সহিতে পারে, এটা পার না। মানুষ এখানে আমার মনে হয় সবাই এক রকম। যা পারে না, তা সবাই পারে না। কিন্তু যা পারে তা সকলেই যে পারে তা নয়। এই দেখই না কেন, শৈলেন ত বিদ্যায় আমার চেয়ে খাটো নয়; কিন্তু আমি ত এই ষোড়শী সুন্দরী লক্ষ্মীর দাবী অনায়াসে ছাড়িয়া দিলাম, সে তবে কেন এক স্ত্রী বর্ত্তমানে চোরের মত লুকাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতেছে। এইজন্যই মানুষের ভিতরটা আধ্যাত্মিক জলে ধুইয়া পবিত্র রাখা প্রয়োজন। আমি শীঘ্রই এই সব বিষয় লইয়া খুব জোর দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিব ইচ্ছা আছে।

শৈল ছেলে কোলে করিয়া ঘরে ঢুকিল। সাধারণতঃ পোষাকের পারিপাট্যে তাহার ত্রুটি বড় একটা থাকেই না, আজ যেন মাত্রাটা আরও একটু ছাপাইয়া গিয়াছিল। নজর নাপড়ে কেন? চোক দুইটা ত একমাত্র এই কার্য্যের জন্যই তৈরি হইয়াছে। বুঝিতে বাকি রহিল না, তবু না বোঝার ভান করিয়াই সহজ ভাবে প্রশ্ন করিলাম, কোথায়?

শৈল কোন রকম অপ্রতিভ হইল না, কিছু না, হাস্যোৎফুল্ল চক্ষে আমার মুখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর করিল "ডাক্তারখানায় মনু বলিল বাবা আমি ওতু থাবো।"

"ডাক্তারখানার সাজই বটে, আমিও যাবো চলো; আমার একটা দাঁত কন্‌কন্‌ করচে।"

শৈল যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল, না হাসিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল "তোমায় যদি সঙ্গে নিই, তাহলে প্রথমে যে একবার পাগ্‌লা গারদ হয়ে যাবার কথা আছে, সেটা তো প্রথমতঃই বন্ধ করতে হয়; না হলে হয়তো তোমায় ছাড়িয়ে আনা মুস্কিল হবে। আজ তুমি বিষ্ণুপুরাণই পড়ো আজ আর যায় না, আজ আমায় অনেক ঘুরতে হবে।"

আমি সংক্ষেপে বলিলাম "তা আমি জানি।"

শৈলেন আবার আমার মুখে চকিত কটাক্ষ করিয়া কহিয়া উঠিল "কি জানো? ফুলবেড়ে যাবো, তাই জানো?"—মণ্টু বাপের পারিপাট্য-সজ্জিত চুলের মধ্যে ছোটহাতের আঙুলগুলি প্রবেশ করাইয়া তাহাদের বিপর্য্যস্ত করিয়া

তুলিয়া আব্দার ধরিল, "ও বাবা, আমায় ফুল পেলে,—আমায় ফুল পেলে!"

শৈলেন ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল—"যা, তোর কাকা ফুল পেড়ে দেবে এখন, দুষ্টু, চুলটা ঘেঁটে দিলি।"

আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটাকে কোলে লইয়া কহিয়া উঠিলাম "ও আর কিসের মর্ম্ম বোঝে? বুঝলে এতক্ষণ সাত হাত দূরে সরে পালাতো।"

শৈল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। ওর যদি লজ্জাই থাকবে, তাহা হইলে আর আমার দুঃখই বা কি? দিব্য হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল। একটু পরেই জানালা দিয়া দেখিলাম, তাহার গাড়ী উদ্যানপথ বাহিয়া গেটের বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে। গাড়ীর উপর সেদিনের সেই কাপড়ের পার্শেলটাও রহিয়াছে। সে যখন ছেলেকে কোল হইতে নামাইবার জন্য হেঁট হয়, তখন তাহার বুক-পকেটে সেদিনের সেই হারের বাক্সটাও দেখিতে পাইয়াছিলাম। তখনি সে কথাটা মনে পড়িয়া গেল। আমার মাথার মধ্যে যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব তীব্র-যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। যথার্থই তবে লক্ষ্মী,—যে লক্ষ্মী আমার একেবারে নিজস্ব হইতে পারিত, সেই লক্ষ্মী আজ হোক কাল হোক, খুব শীঘ্রই শৈলেনের হইবে। সময় যে আর অধিক নাই, তা উদ্যোগ দেখিয়াই বোঝা যাইতেছে। সত্যই তবে শৈলেন এত বড় অন্যায় কাজটা করিয়া ফেলিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইল? আর লক্ষ্মীই বা কি? স্ত্রীজাতির উপর শ্রদ্ধা তো ছিলই না; এবার সে যেন ঘৃণা ধরাইয়া দিল।

মণ্টু কত কি আবোল-তাবোল বকিতেছে। হুঁস হইলে শুনিলাম সে আমায় ঠেলাঠেলি করিয়া বলিতেছে "মেম তারকা পাত্ দায়েদ্দে"। তার ধাত্রির দেখাদেখি সে মাকে 'মেম সাহেব' বলিয়াই ডাকিত। বাপকে 'সাহেব' না বলিয়া কি ভাগ্য সে বাবা ডাকই মঞ্জুর রাখিয়াছিল। এই লইয়া বৌদিদিকে কত তামাসাই করিয়াছি; তিনিও ছেলে শাসন করিয়াছেন; কিন্তু ছেলে তার অভ্যাস বদলায় নাই; সে আবার উল্টাইয়া আমার কাছেই নালিস করিতে আসে "কাকা, মেমতাব আবাল বকে!" আমিই আবার তার হইয়া তার মার কাছে ওকালতি করি; বলি "তা তুমি মেমসাহেব তো আছই; তোমাকে ও মেম সাহেব না বলে কি বলবে? ওরে মণ্টু তুই মেমসাহেবই বলিস্।"

মণ্টুর ওড়নি-ঘাগরপরা মান্দ্রাজি আয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। আমি মনকে জোর করিয়া একটু অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিলাম,—যা না ভাবিয়া

একদণ্ডও আর নিস্তার নাই,—সেই সর্ব্বনেশে ভাবনার হাত হইতে যদি একটু মুক্তি পাই—এই মনে করিয়া, নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া, বড় হল পার হইয়া ওদিকে শৈলেনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। এ ঘরে অনেক বই, খবরের কাগজ ছিল। দুএকটা নাড়িয়া-ঘাঁটিয়াও একটু সময় খরচ হইতে পারিবে, উদ্দেশুটা এই। তাই করিলাম। 'বেঙ্গলী' খুলিয়া এ সপ্তাহে কয়জন প্লেগে, কয়জন কলেরায়, কয় সহস্র ম্যালেরিয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ বঙ্গদেশে কত মৃত্যু হইয়াছে, তাহার তালিকা দেখিলাম। তা নেহাৎ মন্দ না। এই হারে লোকক্ষয় হইতে থাকিলে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের ভয়টা একটু কমিবে, এমন ভরসা করা যায়। ডাকাতি খুন, চুরি জুয়াচুরি, পুলিসের সদ্ব্যবহার এবং দেশের লোকের অসদ্ব্যবহার, ইত্যাদি দেশের সুখশান্তি সম্বন্ধে খবরাখবর লওয়ার পর সেখানা ফেলিয়া দিয়া, এটাওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে একখানা বাঙ্গালা-লেখা চিঠি পড়িয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। হাতের লেখাটা সেই শ্রেণীর লোকের মত, যাহারা সেকালের সেই 'শিশুবোধক' পুস্তক দেখিয়া লিখিতে শিখিত। এখনও স্বর্ণকার, মুদি প্রভৃতির মধ্যে বাংলা-লেখার এই ছাঁদ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। কে লিখিয়াছে? এখানে মুদি প্রভৃতি বাংলায় তো লেখে না; এবং চাপরাশি ছাড়িয়া খোদ সাহেবের সহিতই বা তাহাদের সম্বন্ধ কি? চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম।" তাহাতে লেখা ছিল—

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ,

বিশেষ পরে, বাবা অত্র পত্রে আপনার গুণরাশিতে মুগ্ধ, আপনার কৃপাশ্রিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেশব শিরোমণির অসংখ্য অসংখ্য আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

পরে বাবা বিবাহের দিন তো ২৬শে মাঘই স্থির করা হইয়াছে এবং আপনার ইচ্ছাক্রমেই উক্ত দিবসেই গাত্র-হরিদ্রারও ব্যবস্থা করা হইল। বিবাহ সম্বন্ধে এখন সকল কথাই গোপন রাখা যখন আপনার অভিপ্রায়, তখন তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই। আমি আপনার অনুগত মূর্খ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমায় আপনি যেই মত আদেশ দিবেন, আমি নির্ব্বিচারে তাহাই পালন করিব। অধিক আর কি লিখিব। জন্মদুঃখিনী লক্ষ্মী যে কত তপস্যাতেই আপনার সুদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল তাহা আর কি বলিব, তা নহিলে আজ তাহার এ সৌভাগ্যের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। একবার আসিয়া আমার এখানে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে করিয়া দিয়া যাইবেন। আশীর্ব্বাদক শ্রীকেশবচন্দ্র শিরোমণি।"

আমার গা দিয়া বাঁকিপুরের এই শীতেও দরদর করিয়া ঘাম ছুটিয়া বাহির হইল দাঁতে দাঁত যেন আপনা আপনি চাপিয়া আসিল। সাপে কামড়ানর বিষ ধরিতেও বোধ করি এর চেয়ে খানিক সময় লাগে। এই চিঠিতে যে বিষ মাখান ছিল সে যেন কেউটে সাপের বিষের চেয়েও বেশী তীব্র। সে বিষ যেন রোমের পোপের মেয়ে লুক্রজা বর্জ্জিয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই তীব্র বিষ, যা স্পর্শমাত্র মানুষের মানবলীলা শেষ হইয়া যাইত। আর তো ইহা সন্দেহমাত্র নয়। আমার আন্দাজ যে এমন করিয়া সপ্রমাণ হইয়া যাইতে পারে, একথা আমি পূর্ব্বেও ভাবিতে পারি নাই। এটাকে ভ্রান্তি বলিয়া আর আমার একটুও বিশ্বাস রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

# "ল"কারের লালিত্য।

তন্ত্রী ভিন্ন যেমন বাদ্য রসাল হয় না, তেমনই "ল"কার ভিন্ন সৌন্দর্য্যের লালিত্য পূর্ণতালাভে সমর্থ হয় না। এমন কি "ল"কারকে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রাণ বলা যাইতে পারে। ললিতকলা যেমন বিবিধ শিল্পের সাহচর্য্যে লাবণ্য লাভ করে, তেমনই শব্দের বিভিন্ন স্থানে "ল"কার আপন দেহের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ঢালিয়া তাহাকে রসাল, ললিত করিয়া তুলে।

প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে "ল"কার কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া যে "ল"কারের এত সুখ্যাতি কীর্ত্তন করা হইতেছে, তাহা কেহ মনে করিবেন না; কারণ, ক্রমে দেখা যাইবে যে "ল"কারের কবল হইতে কেহই অব্যাহতি পান নাই। লেখকের ন্যায় পাঠকগণও "ল"কারের আলিঙ্গনে আবৃত রহিয়াছে।

প্রথমে আমাদের মাথা হইতেই ধরা যাক্। মাথার ঘি"লু"ই প্রধান জিনিষ। ঘি"লু"বিহীন মনুষ্যের কোনও মূল্যই নাই। কাজেই মূল্য দান করিবার জন্য 'ল' সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চুলশূন্য টাকপড়া মাথার আদর নাই বলিয়া সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিতে 'ল' যাইয়া পাশে দাঁড়াইয়াছেন। তারপর ললাটে শ্রীমান 'ল' যুগলমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন; তাহার কারণ,

আমার এই মনে হয় যে, বিশ্ব-বিধাতা ললাটে কি লিপি লিখিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্যই 'ল'কার যুগলরূপে সেখানে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

লোচন মানব-অঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ; তাই 'ল' ওকারের র‍্যাপার গায় দিয়া প্রথমেই সেখানে দেখা দিয়াছেন; কিন্তু আবার অনেকের নাসিকায় কদর্য্য কফ নিঃসারিত হয় বলিয়া তিনি ভয়ে নাক ছাড়িয়া গা'লে' আসিয়া সৌন্দর্য্য-লালিমায় লাল হইয়া উঠিয়াছেন।

দশনের পেষণ এড়াইয়া দূরে বসিয়া বসিয়া ভোজ্যদ্রব্যের স্বাদ লইবার জন্য 'ল'কে আমরা তা'লু'তে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত 'ল' আমাদের গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। বিপদে অনেক বন্ধুই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন বটে, কিন্তু মৃত্যুকালেও 'ল' আমাদের গ'ল'ায় গ'ল'ায় বিরাজ করিতে থাকেন।

বাহুর বগ'লে' এবং হস্তের অঙ্গু"লি"তেও 'ল' শোভা পাইতেছে। এই ভাবে সকল লোকের উত্তমাঙ্গে 'ল' ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। 'ল'কে অবহেলা করিলে চলিবে না। সকল ললিত-পদাবলীতে এবং কোমলতা-ব্যঞ্জক শব্দে আমরা "ল"র প্রাধান্য দেখিতে পাই। যেন লকারের নূপুর-সিঞ্জন শব্দের অঙ্গে অঙ্গে বাজিয়া না উঠিলে কবিতার মধুঝঙ্কার ফুটিয়া উঠে না।

যথা—"ললিত-লবঙ্গ-লতা-
পরিশীলন কোমল-মলয়-সমীরে।"

"ল"কারের ললিত-লাবণ্য যেন এখানে লহরীলীলায় উছলিয়া পড়িতেছে।

আবার দেখুন—

"নলিনী-দলগত-জলমতি তরলম্
তদ্বজ্জীবনম্ অতিশয় চপলম্।"

সলিল যেমন স্বচ্ছ ও তরল, এবং যেরূপ কলউচ্ছ্বাসে ঘাট মাঠ প্লাবিত করিয়া দেশবাসীকে স্নিগ্ধতা দান করিয়া থাকে, তেমনি "ল"কার এই সকল কবিতাকে তরল ও মোলায়েম করিয়া পাঠকের প্রাণে মনে কেমন একটা করুণ স্নিগ্ধভাব ঢালিয়া দিতেছে।

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই; তাই সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, মাতৃ-জাতির হৃদয় শুধু স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, দয়া ও মমতায় ভরা। যেখানে

কোমলতা ও মধুরতা, সেখানেই "ল" যাইয়া আপনার আসন দখল করিয়া বসেন। বোধ হয় তজ্জন্যই স্ত্রীজাতির 'ললনা' নামে আমরা লকারের এত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই।

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে,
ইতি বিধির্বিদধে ললনা মুখং।"

বিধাতা সুন্দর বস্তু সৃষ্টির কল্পনা করিয়া প্রথমে কমলিনীকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু দেখিলেন দিবাবসানে কমল মলিন হইয়া যায়। তখন তিনি আরও সুন্দর করিয়া শশিকলার সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু দেখিলেন যে রাত্রি শেষ হইলে চন্দ্রের কিরণও ম্লান হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া ভগবান ললিত-লাবণ্যের লীলা-নিকেতন ললনামুখের সৃষ্টি করিলেন। তাই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে "ল"কার নানারূপে ললনার গায় মিশিয়া রহিয়াছে। অবলার রূপবর্ণনায়ও আমরা "ল"কারকে দেখিতে পাই। যথা—কাল কুন্তল, নীলোৎপললোচনা, নাসিকা-জিনি তিলফুল, অঙ্গুলী চম্পককলিকা, কপোলের শোভা যেন গোলাপের আভা, হেলিয়া দুলিয়া চলিছে ওই মরালগামিনীরে ইত্যাদি ইত্যাদি—

এমন কি ললনার দেহের ভূষণে পর্য্যন্ত "ল" আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। এই দেখুন—নাকে—নোলক, কাণে দোল, গলায় মালা, হাতে বালা, কটিতে মেখলা, পায়ে মল; ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি পদকে কোমল ও মধুর করিবার জন্য লিখিয়াছেন—

"সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-ভবনে।"

আবার দেখিতে পাই, কবি "ল"কারের সাহায্যে সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়া প্রাণের কথা বলিতেছেন—

"এই যে অলস বেলা
অলস মেঘের খেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারা দিন মান;
এরি মাঝে চারিপাশে কোথা হতে ভেসে আসে
ওই মুখ ওই হাসি ওই দুনয়ান।"

এবং

"যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো

কি সুন্দর তরল সরল উক্তি!

কবি "ল"কারের দুন্দুভিনিনাদে বিশ্ববিধাতার নাম কীর্ত্তন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

"আলোকে পুলকে দ্যুলোকে ভূলোকে ঝলকে তাঁহার নাম।"

কবি মাতৃবন্দনায় "ল"কারের মধু-নিক্কণ তুলিয়া গাহিয়াছেন—

"নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল।" ইত্যাদি—

অমরকবি রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরিণীর জলপ্রপাতের ন্যায় "ল"কারের সাহায্যে আবার অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলু কুলু নদীর স্রোতের মত
চকিত পলকে অলক এলায়ে পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও,
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।"

দোললীলার পুলক-লহরে যখন অন্তর-বাহির সব লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে তখন কবি "ল"কারের ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—

"লাল তমালতল,
লাল কুসুমদল,
লাল যমুনাজল
লীলায় চলিয়ে যায়।" ইত্যাদি।

কবি কেমন সুন্দর আহ্বান করিতেছেন—

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ
এসো ওগো, এসো মোর হৃদয়নীরে,
তল তল ছল ছল
কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটী সুকোমল চরণ ঘিরে।"

কবিতার কথায় কথায় কি মধুর ঝঙ্কার এবং সেই ঝঙ্কারের অন্তরালে শুধু "ল"কারের নূপুরে যেন রিনিকি ঝিনিকি বাজিতেছে।

কবি বলিতেছেন—

"কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল্ কুল্,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।"

কল্লোলিনীর কলস্বরে "ল"কারের ঝঙ্কার এত মধুর হইয়াছে যে, বংশীধ্বনি সেখানে হার মানিয়াছে।

কবি মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছেন—

"বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন গাহিছে—
মৃদু বায়ু হিলোল-বিলোল বিভোল-বিশাল
সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।

করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,—
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল
তমাল বিতানে,
উঠে রব ভৈরবতানে।"

কবি বিশ্ববীণায় যে বিশ্ববিমোহন তান তুলিয়াছেন, তাহা শুধু "ল"কারের সাহায্যেই বিশ্বের কর্ণকুহর পুলকিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আরও সহস্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে "ল"কার কথায় কথায় অবলীলাক্রমে কেমন কোমলতা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তাহাতে নিবৃত্ত হইলাম।

এখন দেখাইব যে সুগন্ধ পুষ্পের মধ্যেও কেমন করিয়া "ল" সৌরভমত্ত আকুল অলির মত ডুবিয়া রহিয়াছে।

প্রথমেই দেখুন "গোলাপে" "ল"কারের অবস্থা;—সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া রসপান করিবার জন্য 'ল" যেন একবারে ফুলটার বক্ষে ঢুকিয়া রহিয়াছে! তারপর—পারুল, বকুল, বেলা, মালতী, মল্লিকা, শেফালী, শতদল প্রভৃতির সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া রসধারা পান করিবার জন্য "ল" ফুলগুলির অঙ্গে-অঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।

সকল সুরসাল ফলের মধ্যেও আমরা "ল"কে আসন পাতিয়া রসপানে বিভোর দেখিতে পাই। যথা—কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, বেল, ডালিম, তেঁতুল, লেবু, আমরুল, জলপাই, আমলকী, লিচু, আপেল, কলা, কমলা, প্রভৃতি

রসেভরা টল্‌টলে ফলগুলির মধ্যে "ল"কারের লেহী রসনা বিস্তৃত দেখিলে সত্য সত্যই লোভের উদ্রেক হয়; কিন্তু "ল"কারের উচ্ছিষ্ট বলিয়া "ল"-যুক্ত ফল পরিত্যাগ করিলে অধিকাংশ রসাল ফলের স্বাদ হইতেই বঞ্চিত হইতে হইবে। অতএব "ল"কারের ভক্ত আমি, কখনই তাহাতে রাজি হইব না।

"ল"কারের এত প্রাধান্য ও বিশেষত্ব যে, আমরা আমাদের নামের প্রধান অঙ্গ শ্রীযুক্ত শব্দেরও পূর্ব্বে "শ্রীল" বসাইয়া নামের গৌরব এবং মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিয়া থাকি। যথা—"শ্রীল শ্রীযুক্ত" ইত্যাদি।

যে "ল"কারের এত গুণ এবং সকল বিষয়েই যাহার এত প্রাধান্য, সেই "ল"কারের জয়ঘোষণা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ

# ভাগ্যবিপর্য্যয়

(১)

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের নূতনবাজারে আমার দোকান। সব রকম কারবারই আমি করিয়া থাকি। ঈশ্বরেচ্ছায় দোকানটির হীনাবস্থা হইতে এখন যে অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে শত্রু ছাড়া সকলেই, বিশেষতঃ মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, বলিত যে, বাজারের মধ্যে আমার দোকানখানিই নম্বর ওয়ান অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাক্, নিজের কথা ঢোল বাজাইয়া, পাঠকবর্গের কাণে তালা লাগান আমার অভিপ্রায় নহে।

যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন ২৪শে অগ্রহায়ণ। শীতটা বেশ পড়িয়াছিল। শয্যাত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক দোকান খুলিতেই প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। দোকানে ধুনা-গঙ্গাজল ছিটাইয়া বালাপোষখানি মুড়িয়া দিয়া যেইমাত্র তক্তপোষের উপর বসিয়াছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স বড় বেশী নয়, জোর চব্বিশ কি পঁচিশ। পায়ে ফুল ইষ্টকিনের উপর বাদামী রঙের একজোড়া জুতা, গায়ে কাল কোট, মাথায় একখানি শাল ভাঁজ করিয়া জড়ানো। মুখের বর্ণ ঘনশ্যাম, গাল দুটি কামানো, কেবল চিবুক ঢাকিয়া ত্রিকোণাকার দাড়ী।—মজুমদার মহাশয়ের পুত্র বলে, তাহাকে নাকি, ফ্রেঞ্চ দাড়ী বলে। লোকটার হাতে একটি ব্যাগ ঝুলিতেছে।

খাতায় তখনও দশবার দুর্গা নাম লেখা হয় নাই, এরূপ সময়ে সহসা এমন এক ভদ্রলোকের আবির্ভাবে একটু ব্যতিব্যস্ত হইলাম বৈ কি। তাড়াতাড়ি তক্তপোষের উপর হইতে আমার খাতাপত্র বাক্স প্রভৃতি সরাইয়া, বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে ?"

ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন—"মশায়, আপনারা এতবড় বাজারের সম্ভ্রান্ত দোকানদার। সম্প্রতি আমরা একটা সোসাইটী স্থাপন করেছি, তাহার নাম—"

এই কথা বলিয়া ভদ্রলোকটি খুব লম্বাচওড়া একটা ইংরাজি নাম বলিলেন। নামটি ভুলিয়া গিয়াছি।

যাহা হউক, এই সোসাইটী বা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে অনাথা বিধবাগণ দারিদ্র্যে কালযাপন করিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করা, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিবর্গকে আহার্য্য প্রদান, ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই সমস্ত বক্তৃতা শুনিয়া আমি বলিলাম, মশায়, আপনারা যে এত সৎকার্য্য করেন, টাকা দেয় কে ?"

তিনি বলিলেন "এই যে. সেই কথাই হচ্ছে।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ব্যাগ খুলিয়া একখানি ছাপান কাগজ আমাকে দিলেন। তাহার বাঙ্গালার অংশের নকল নিম্নে দিলাম।

"ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মাহেন্দ্রযোগ !

এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না !!!

বিনামূল্যে হাজার মণ চাউল !!!!

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমরা কতিপয় শিক্ষিত যুবক সমবেত হইয়া কুষ্টিয়ায় একটি সমিতি খুলিয়াছি, তাহার নাম ( ইংরাজিতে কতকগুলা কি লেখা আছে, পড়িতে পারিলাম না )

উক্ত সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য এই যে, যেখানে অনাথ, আতুর, পঙ্গু, অন্ধ, জরাগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত সাহায্যাভাবে করাল কালকবলিত হইতেছে, সেইস্থানে যথোপযুক্ত সাহায্যদ্বারা তাহাদের কষ্ট দূর করা। এবম্প্রকারের কত শতসহস্র সদনুষ্ঠান এই সমিতি কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাহুল্যভয়ে রাজামহারাজাগণের প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত করা হইল না।

"এক্ষণে জনসাধারণের হিতকল্পে আমরা এক অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অনন্থমেয় বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠানকল্পে যত্নবান হইয়াছি। বলা আবশ্যক, এ সুযোগ একমাসের অধিক স্থায়ী হইবে না।

"আমাদের সৎকার্য্যের বহুলপ্রচারকল্পে আমরা একপ্রকার কুপন বাহির করিয়াছি। প্রত্যেক কুপনের মূল্য অতিসামান্য—চারিআনা মাত্র। আগামী ৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার সেই কুপনের লটারি হইবে। পাঁচজন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।—

পুরস্কারের তালিকা—

১ম পুরস্কার—হাজার মণ চাউল।

২য় " —পাঁচশত " "

৩য় " —তিনশত " "

৪র্থ " —দুইশত " "

৫ম " —একশত " "

কুপন বিক্রয়লব্ধ অবশিষ্ট টাকা উল্লিখিত সৎকার্য্যে ব্যয় করা হইবে। বলুন দেখি, ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মাহেন্দ্রযোগ কি না! ইতি

কুষ্টিয়া ওয়াই, সি, রায়,

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। অনারারী সেক্রেটারী।

পুঃ—লটারিতে যাঁহাদের নাম উঠিবে তাঁহারা শীঘ্র যাহাতে পুরস্কারলব্ধ চাউল পাইতে পারেন, তজ্জন্য অত্রস্থ কোন বিখ্যাত চাউল-ব্যবসায়ীর সহিত সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইতি সেক্রেটারী"

* * *

কাগজখানা পড়িয়াই আমি তো অবাক্। ভাবিলাম, যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে সে ব্যক্তি চারি আনায় হাজার মণ চাউল লইবে। ইহাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ যে, পৃথিবীতে হইতে পারে, ইহা অসম্ভব মনে হয়। ভগবান সোসাইটীকে দীর্ঘজীবী করুন। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন "দেখুন মশায় আপনাদের মত লোকের ভরসাতেই এরূপ স্থলে আসা। এতবড় একটা জনহিতকর কার্য্যে যদি আপনাদের মত লোকে আমাদের উৎসাহ না দেন, তা হলে আমাদের এ সভা কতদিন টিকৃবে। এক রাণাঘাটেই কাল প্রায় ৫০০ টিকিট বিক্রী হয়েছে। সর্ব্বত্রই আমাদের কাজের প্রশংসা হচ্ছে। গত সপ্তাহে 'বেঙ্গলীতে' আমাদের

সোসাইটীর যে কত প্রশংসা বেরিয়েছে, তা আর কি বলব, এই যে দেখুন না।"

এই বলিয়া বাবুটি কিয়ৎকাল ব্যাগটির মধ্যে খুঁজিলেন, কিন্তু উভয়েরই দুর্ভাগ্যবশতঃ 'বেঙ্গলী' মিলিল না। তিনি তখন বলিলেন "এহে ফেলে এসেছি বোধ হয়। মশাই, সে দুটি কলম একেবারে ভর্ত্তি। তা যাক্ এখন আমাদের কাজের তত্ত্বটা বুঝেছেন তো? আপনাকে একখানি টিকিট কিনতেই হবে।"

আমি ভাবিলাম মন্দ কি? চারি আনার টিকিট কিনিলে, যদি অদৃষ্টে থাকে তাহা হইলে বড়মানুষ হইব, আর না হয় ।০ আনা ক্ষতিই হইবে। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণও তেমন বেশী নয়। সাতপাঁচ ভাবিয়া আমার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র শ্যামাপদর নামে একখানি টিকিট কিনিলাম।

দেখা-দেখি মতি ময়রা, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি আরও সাত আট জন লোক একখানি করিয়া টিকিট কিনিল ভদ্রলোকটি ব্যাগ লইয়া চলিয়া গেলেন।

( ২ )

দুই মাস আর কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। ভাবিলাম, লোকটা ।০ আনা লইয়া পলাইল না ত? রামু ঘোষ ময়দা কিনিতে আসিয়া বলিল কিহে কালীপদ, হাজার মণ চালের কি হচ্চে?" রামসর্ব্বস্ব মিত্র আসিয়া বলিল "কালীপদ, গুদাম ভাড়া করলে কই, চাল রাখবে কোথা;" এইরূপে অনেকেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আমি কথা কহিলাম না। ভাবিতাম কি বিপদেই পড়িয়াছি।

ক্রমে আরও একমাস গেল। অবশেষে ২২শে ফাল্গুন (তারিখ বেশ মনে আছে) বৃহস্পতিবার বেলা ৮টার সময় এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। মজুমদার মহাশয়ের পুত্র সেইখানে বসিয়া ছিল। তাহাকে দিয়া টেলিগ্রাম পড়াইলাম।

টেলিগ্রাম পড়িয়া সে বলিল—"কি খাওয়াচ্ছ বল?"

আমি বলিলাম—"কেন? ব্যাপার কি? কোথাকার তার?"

সে বলিল—"কুষ্টিয়া থেকে। শ্যামাপদর নামে এসেছে। লিখেছে, তুমি ফার্ষ্ট-প্রাইজ পেয়েছ চিঠি যাচ্ছে।"

আমি বসিয়া ছিলাম, এক লম্ফে তক্তপোষ হইতে নীচে নামিলাম।

তখনকার সে আনন্দ লিখিয়া বুঝাইবার নহে। পাশের দোকানদারদিগকে সংবাদটা দিলাম। কেহ বা আহ্লাদ প্রকাশ করিল, কেহ বা বিদ্রূপ করিল। যে পিয়ন টেলিগ্রাম আনিয়াছিল, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নগদ ১৲ টাকা দিয়া বিদায় করিলাম।

আমার অন্তঃপুরেও হুলাহুলি পড়িয়া গেল। আমার কন্যা ইতিপূর্ব্বে একছড়া সোনার নেকলেস গড়াইতে বলিয়াছিল, সে এখন সোণা ছাড়িয়া জড়োয়ার বায়না ধরিল। আমার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র শ্যামাপদ, তাহারই নামে টিকিট কিনিয়াছিলাম, সে নূতন ধুতি, নূতন জামা, নূতন জুতা পরিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেল। ৺আনন্দময়ীর মন্দিরে মহাসমারোহে ছাগ-বলি হইল। রাত্রে ৺সত্যনারায়ণের সিন্নী হইল। সমগ্র গোয়াড়ীতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই কাণাকাণি করিতে লাগিল যে, কালীপদ শেষে বড়মানুষ হইয়াছে। হাজার মণ চাউলের মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও ৫০০০৲ টাকা। রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া আর কাহাকে বলে?

মতি ময়রা, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি আর আর যাহারা টিকিট কিনিয়াছিল, শুষ্কমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আর ভাই তোমারই বরাত খুল্‌লো; আমরাও তো টিকিট কিনেছিলাম, কৈ কিছুই তো হোল না। বরাত ভাই, সবই বরাত! তা একদিন আমাদের বাজারশুদ্ধ একটি মস্ত ভোজ দিতে হবে কিন্তু।" আমি সানন্দে বলিলাম—"তা দেবো বৈ কি। তা আর দেবো না?"

পরদিন প্রাতে পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"নমস্কার নিবেদন

এতদ্বারা মহাশয়কে আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার নামে হাজার মণ চাউল লটারিতে উঠিয়াছে। তাহা ৫০০ বস্তায় প্যাকবন্দী করিয়া মালগাড়ীতে এখান হইতে পাঠান হইল। রসিদ ভিঃ পিতে পাঠাইলাম। পত্র-পাঠমাত্র নিম্নলিখিত সরঞ্জামী খরচ পোষ্টাফিসে জমা দিয়া ভিঃ পি লইবেন। তাহাতে রেলের রসিদ আছে। পরে ষ্টেশনে মাল পৌঁছিলে উক্ত রসিদ দাখিল করিয়া ডেলিভারি লইবেন। বেশী দেরী করিবেন না, কারণ তাহা হইলে ডিমারেজ লাগিবে। জ্ঞাতার্থে নিবেদন ইতি, তারিখ ২২শে ফাল্গুন ১৩১৯—

ওয়াই, সি রায়।

অনারারী সেক্রেটারী—

খরচের তালিকা যথা—

| | |
|---|---|
| ৫০০ খানি থলিয়ার মূল্য, ।০ হিসাবে— | ১২৫৲ |
| প্যাকিং খরচ ৴১০ হিসাবে— | ১৫৸৵০ |
| কুলীভাড়া ৴১০ হিসাবে— | ১৫৸৵০ |
| ছুঁচ, দড়ি, কালী ইত্যাদি বাবদে— | ১৲ |
| আফিস হইতে ষ্টেশনে মাল লইয়া যাইবার জন্য গরুরগাড়ী ভাড়া ।০ হিসাবে ৫০ খানি গরুর গাড়ী | ১২৷০ |
| রেলের ভাড়া— | ৯৩৸০ |
| ভিঃ পিঃ খরচা— | ৩৲ |
| বাজেখরচ— | ৩৸০ |

একুন ২৭০৲ টাকা

মঃ দুই শত সত্তর টাকা মাত্র—"

চিঠিখানি খুলিবার সময় যতটা আনন্দে অধীর হইয়া খুলিয়াছিলাম, এখন কিন্তু আর সে আনন্দ রহিল না। ভাবিলাম তাই তো! ২৭০৲ টাকা আবার এখনি দিতে হইবে। ভিঃ পি লইব কি ফিরাইয়া দিব ভাবিতে লাগিলাম। রামসর্ব্বস্ব মিত্র আসিলেন। তাঁহাকে চিঠিখানি দেখাইলাম, তিনি বলিলেন—"সত্যি কথাই তো! হাজার মণ চাউল তোমার নামে উঠেছে, ।০ আনায় হাজার মণ চাউল পাচ্ছ, তাই তারা দিচ্ছে, সেই তোমার ভাগ্যি বলতে হবে। তার উপর রেলের খরচ, মোটের দাম, এ সব তারা আর ধরবে না? তারা তো আর দানছত্র খুলে বসেনি যে রেলের খরচা ঘর থেকে দিয়ে তোমার দোকানে চালের বস্তা সাজিয়ে ভাত রেঁধে খাইয়ে যাবে। অন্যায় কথা বল্লে হবে কেন বাপু?"

আমিও তাহাই বুঝিলাম। তারপর বলিলাম "আচ্ছা আমাকে তো লিখ্‌লেই আমি নিজে গিয়ে চাউল আনার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পার্ত্তাম। তার রের কড়ি খরচ করে পাঠাতে যায় কেন?"

"ভারি অন্যায় কাজ করেছে তারা! ছাঁপোষা দোকানদার মানুষ মি, তোমার এই শীতে কুষ্টে পর্য্যন্ত না ছুটিয়ে তারা নিজেরা সব বন্দোবস্ত রে কেবল নায্য খরচাটি তোমার কাছে চেয়েছে এই তাদের অন্যায়। তুমি লে রেলকোম্পানী তো তোমার চেহারা দেখে অমনি মাল বয়ে দিত না?"

এ কথায় উপর আর কি তর্ক করিব, কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মিত্র মহাশয় নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে ভিঃ পি লওয়াই স্থির করিলাম।

পরদিন ভিঃ পি আসিল। হাতে কেবল ১০০৲ টাকা তখন ছিল। ঋণ করিয়া বাকী ১৭০৲ টাকা সংগ্রহ করিলাম। শ্রীদুর্গা বলিয়া ২৭০৲ টাকা পোষ্টাফিসে দিয়া ভিঃ পি লইলাম। খুলিয়া দেখিলাম যে যথার্থই তাহার মধ্যে রেলের রসিদ আছে বটে। পোষ্টমাষ্টার বাবুকে দেখাইলাম; তিনি বলিলেন "পাঁচশ বোরা চাউল, ওজন ১০০০ মণ।" তখন আশ্বস্ত হইলাম। মনের আনন্দ ও চাঞ্চল্য আবার ফিরিয়া আসিল।

ষ্টেশনে খবর লইয়া জানিলাম, তখনও মাল আসে নাই। বুকিংক্লার্ক বাবু বলিলেন—"মালগাড়ীর জিনিষ প্রায়ই দেরীতে এসে পৌঁছোয়। হাজার মণ চাউল, সে তো দুখানা ওয়াগন্ বোঝাই হয়ে আসবে। সে কি আর চাপা থাক্‌বে? এলেই টের পাবেন এখন। কোথা থেকে আস্‌চে বল্লেন—কুষ্টে থেকে বুঝি?"

পরদিন ষ্টেশনের একজন কুলী আসিয়া আমাকে খবর দিল "বাবু, আপ্‌কো মাল আ গিয়া।"

আমার তখন আনন্দ দেখে কে? তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ছুটিলাম। বুকিংক্লার্ক বাবুকে বলিলাম "কি মশাই, এসেচে নাকি?"

তিনি বলিলেন "হ্যাঁ, কিন্তু সে তো চা'ল নয়।"

বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল; বাক্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে বলিলাম "তবে কি?"

"একমোট সুপারি, কুষ্টিয়া থেকে এসেছে।"

"সুপারি—কুষ্টিয়া থেকে? সুপারি কে পাঠাবে মশাই? আপনার ভুল হয়নি তো?"

"ভুল কি রকম? এই দেখুন না কেন, চালানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'বিটিল নাট', আপনি বলিতে চান যে বিটিল-নাট মানে চাল?"

আমি বলিলাম—"বিটিল-নাট মানে চা'ল কি ডাল, তা ত আমি জানিনে মশাই—মালটা কৈ দেখ্‌লেই ত বোঝা যাবে।"

সঙ্গে করিয়া বাবুটী আমাকে গুদামে লইয়া গিয়া মুখবন্ধ থলি দেখাইয়া দিলেন। টিপিয়া, নাড়িয়া দেখিলাম—সুপারি বলিয়াই বোধ হইল।

আমি বলিলাম "কিন্তু আমার রসিদে যে লেখা, চাউল ৫০০ খানা বস্তা।"

"দেখি আপনার রসিদটা।"

আমি দেখাইলাম। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "এ কি মশাই, এ যে একই নম্বর। কি রকম হল? একই রসিদ, একই সই, সব সমান; কেবল আমাদের রসিদে লেখা এক বোরা সুপারি, আপনার রসিদে লেখা ৫০০ বোরা চাউল। এ মশাই, এর মধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগের ব্যাপার আছে। আপনি এই বেলা পুলিসে খবর দিন। আজ তো রবিবার, ডেলিভারি হবে না।"

শুনিয়া, চোখে সর্ষেফুল দেখিলাম। পৃথিবী যে ঘোরে, এ কথা ইংরাজী ওয়ালাদের মুখে অনেকদিন শুনিয়াছি; পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না; তাহাও বিশ্বাস করিলাম।

(৩)

ষ্টেশন হইতে থানা প্রায় এক মাইল দূরে। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানে চলিলাম। থানার একজন সবইনেস্‌পেক্টার বাবু আমার পরিচিত ছিলেন; ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন "তাই তো কালীপদ বাবু, শেষটা এমনি করে সব গুলিয়ে ফেল্লেন। আচ্ছা, আমি সব ডায়ারি করে নিচ্ছি; আপনি বরং এক কাজ করুন না কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি?"

তিনি বলিলেন "এক কাজ করুন। আজ তো রবিবার। আপনি কা'ল ভিঃ পি নিয়েছেন, সুতরাং টাকা কিছু আজ আর সেখানে ডেলিভারি হবে না। আপনি এখনই কুষ্টিয়ায় চলে যান। গিয়ে ভাল করে সন্ধানটা নিন। খুব গোপনে সন্ধান নেবেন, বুঝলেন? যদি তেমন সন্ধান কিছু পান, তখনিই আমায় একখানি আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করে দেবেন। আর সব যা করতে হয়, আমি করব এখন। মোট কথা, আর দেরী করবেন না, বুঝলেন?"

বুদ্ধিভ্রংশ হইলে লোকে যেমন বুঝিয়া থাকে, আমিও সেইরূপই বুঝিলাম। সেই রৌদ্রে আবার বাড়ী ফিরিলাম। সমস্ত দিন স্নান-আহার হয় নাই। নিতান্ত বিষণ্নমনে সে কার্য্য সমাধা করিলাম। কোথায় চারি আনায় হাজার মণ চাউল পাইবার আশা, আর কোথায় ২৭০৲ শত টাকা জলে দিয়া

তাহার উদ্ধারের চেষ্টা! কোথায় আশার সুবর্ণসৌধ নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, আর কোথায় অনন্ত এক নিরাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি!

সেদিন অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছিল। ভাবিলাম কুষ্টিয়ায় পৌছিতে রাত্রি প্রায় ৯টা হইবে। সেই অপরিচিত স্থানে রাত্রে কোথায় থাকিব, অনুসন্ধানই বা কি করিব? সুতরাং সে দিন আর গেলাম না।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই ৬৷৹টার ট্রেণে কুষ্টিয়ার টিকিট কিনিয়া ইষ্টদেবতার নাম করিয়া যাত্রা করিলাম। রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিয়া চাঁদপুর-মেল ধরিলাম। যখন কুষ্টিয়ায় পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়েদশটা।

প্রথমেই সেখানকার বুকিংক্লার্ক বাবুর নিকট গেলাম। তিনি তখন কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। দুই একবার ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলাম না। তারপর তাঁহার নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিয়া আমার সেই রসিদ-খানি দেখাইলাম। তিনি বলিলেন "তাই তো মশাই, এ তো জালিয়াতি কারখানা দেখ্‌চি। এ তো আমারই সই বটে। আমাদের বহি দেখুন। ঐ নম্বরে কালীপদ ঘোষের নামে এক মোট সুপারি ঐ দিনে বুক করা হয়েছে। চাউল তো নয়। সুপারি বুক করিয়া ঠিকঠিক রসিদ আমি দিয়াছি। আমাদের রেকর্ড ও কৃষ্ণনগর দুযায়গায় ঠিক সুপারি আছে; কেবল আপনার রসিদে এক বোরা সুপারি কথাটার স্থানে ৫০০ বোরা চাউল লেখা আছে। এ তো আমাদের ভুল বল্‌তে পারবেন না। তিনখানা কার্ব্বন-কপির দুখানা একরকম, আর একখানা অন্য রকম হয় না।" বলিয়া বাবুটি রসিদখানি আলোকের দিকে ধরিলেন। বলিলেন—"হ্যাঁ, এই দেখুন। ঐখানটা দিব্যি চাঁচা রয়েছে! চেঁচে জাল করেছে। উঃ, কি সর্ব্বনেশে লোক!"

আমি বলিলাম "এখন উপায়?"

তিনি বলিলেন "সে আর আমি কি জানি বলুন। দেখুন সন্ধান করে, পুলিসে খবর দিন। আমি তো আর আপনার সুপুরি কেটে চা'ল কর্ত্তে যাই নি। আমাদেরও ফাইলে ঠিক আছে, কৃষ্ণনগরের চালানেও তাই আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লোকটার চেহারা কি রকম বলতে পারেন?"

তিনি মেজাজটা একটু গম্ভীর করিয়াই বলিলেন "অত চেহারা মুখস্থ করতে গেলে রেলে চাকরী করা চলে না।" এই বলিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু সমস্ত দিন খুঁজিয়াও আমি ওয়াই, সি, রায়ের কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। নাম শুনিয়া কেহ বা হাসিল, কেহ বা কথা কহিল না, কেহ বা বিদ্রূপ করিল।

সন্ধ্যার ট্রেণে আবার গোয়াড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতে সবইনেস্‌পেক্টার সতীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সবই বলিলাম। তিনি বলিলেন "কালীপদ বাবু, আপনি যাবার পরই আমি পোষ্টাফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিবারণ বাবুর সঙ্গে দেখা করে সব বলেছিলাম। তারপর তাঁর মত নিয়ে কুষ্টিয়ার পোষ্টাফিসে প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছিলাম। তারা কি উত্তর দিয়েছে, জানেন? তারা বলেছে যে ওয়াই, সি, রায় এলাহাবাদে চলে গিয়েছে। তার টাকাকড়ি, চিঠিপত্র যা কিছু, সব সেইখানে রিডাইরেক্ট করবার জন্য পোষ্টাফিসে চিঠি দিয়ে গিয়েছে। আমার টেলিগ্রাম পাবার আগেই তারা এলাহাবাদে টাকা রিডাইরেক্ট করে দিয়েছে। আপনি যদি রবিবারেই রওনা হয়ে গিয়ে পোষ্টাফিসটায় সন্ধান নিতেন, তা' হলেও অনেকটা সুবিধে হ'ত। আলিস্যিতেই যে বাঙ্গালী জাতটাকে খেয়ে রেখেছে। তা ভাবনা নেই; আমি এলাহাবাদে পুলিসে ও পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, টাকা আপনার মারা যাবে না। তবে পেতে কিছু দেরী ও খরচ হবে। এখন আপাততঃ গোটাদশেক টাকা আমাকে দিন দেখি; এই সব খরচপত্র আছে তো?"

জামাতার দোলের তত্ত্ব করিতে হইবে বলিয়া কাপড়-চোপড় কিনিবার জন্য ১৫৲ টাকা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। কি করি, তাহা হইতেই দশটী টাকা সতীশ বাবুকে দিলাম। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

(৪)

প্রায় ছয়মাস কোন সংবাদাদি পাইলাম না। টাকার আশা একরকম ছাড়িয়াই দিলাম। গ্রহের ফের ছিল, কি করা যাইবে? সতীশ বাবুকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "মশাই, একদিনেই কি কিছু হয়?" কি আশ্চর্য্য, ছয়মাস কাটিয়া গেল, তবুও লোকটা বলে একদিন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি!

প্রায় আটমাস পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, টাকা আসিয়াছে। সোসাইটীর টেলিগ্রাম পাইয়া যে আনন্দ হইয়াছিল, আবার বহুদিন পরে সেই আনন্দ অনুভব করিলাম। বক্ষের স্পন্দন আমার একটু দ্রুত হইল।

তাড়াতাড়ি থানায় ছুটিয়া গেলাম। দারোগা সতীশবাবু বলিলেন "সে রায়ের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি, সে পালিয়েছে। আপনার ২৭০৲ টাকার মধ্যে ২৩৫৲ টাকা ফিরেছে। বাকী খরচখরচায় গিয়াছে।"

যদিও খরচখরচা বাবদে আমি ১০৲ টাকা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছিলাম, তথাপি আর তর্ক করিলাম না। ২৩৫৲ টাকা লইয়া ভগবান্ এবং সতীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ৺আনন্দময়ীর মন্দিরে আবার ছাগবলি পাঠাইলাম, রাত্রে আবার ৺সত্যনারায়ণের সিন্নী হইল। কিন্তু সেই একদিন, আর আজ একদিন।

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

# শ্রুতি-স্মৃতি

বিদ্যার্থীরূপে যখন পাঠ-নিরত ছিলাম, সে দিনের কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দুই চারিটি কথা বলিয়া সে অধ্যায় শেষ করিব। আমি কোন কালেই বড় শান্ত শিষ্ট ছিলাম না; আজও আমি শান্ত শিষ্ট কি না, তাহা আমার বন্ধু-বান্ধবেরা বলিতে পারেন। বাল্য-জীবনে আমি অশান্ত অস্থির বালক বলিয়াই সকলের নিকট পরিচিত ছিলাম; স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ প্রায় সহস্র বিদ্যার্থীর মধ্যে এই একটিমাত্র বালকের উপরই তাঁহাদের বিশেষ সতর্কদৃষ্টি রাখিতেন। কলেজের বাগানের ফুল ছেঁড়া, চারাগাছের টব ভাঙ্গা, জলখাবার-ঘরের মাটীর কলস ভাঙ্গিয়া তাহার খোলা খাপ্‌রা কলেজ কম্পাউণ্ডে ছড়াইয়া রাখা, প্রভৃতি যে কিছু উপদ্রব যে কোন ছাত্রে করুক না কেন, সর্ব্বাগ্রে হেডমাষ্টার বা প্রিন্সিপালের দৃষ্টি এই জগদিন্দ্রের উপরই পড়িত;—জগদিন্দ্রও অসঙ্কোচে সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া নিজদোষ স্বীকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হয় নাই। কেবল-মাত্র স্কুলে নহে, কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িবার সময়েও এই জগদিন্দ্র দুষ্ট বালকগণের সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং জগদিন্দ্রও বিজয়ী বীরের ন্যায় তাহার গর্ব্বোদ্ধত মস্তক ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। এইখানে বলিয়া রাখি, সে সকল দুষ্টামি বালকোচিত চাপল্যমাত্র, দূষণীয় কিছু নহে। সত্য কথা কহিয়া দোষ স্বীকার করিতাম বলিয়া শাস্তি

কিছু কম পাইতাম, এবং সত্যবাদী বলিয়া শিক্ষকদের প্রীতি ও স্নেহও যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। সংসারে সেরূপ সত্যবাদিতা চলে কি না, আজ জোর করিয়া বলিতে পারি না। আমার পাঠক পাঠিকা সকলেই সংসারী, সুতরাং এ কথার মীমাংসা তাঁহারা নিজ নিজ মনে করিয়া লইবেন।

ছাত্রাবাসের যে বাড়ীটিতে আমরা বহু ছাত্র একত্রে বাস করিতাম, ঠিক তাহার পশ্চাতে রাজসাহীর ধনকুবের মৃত দেবীদাস বাবু মাড়োয়ারীর এক কলমের বাগান ছিল। সেই বাগানে মালদহী নানাপ্রকার আমের গাছ, মজাফঃরপুরী লিচুর চারা, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তিনি লাগাইয়াছিলেন। নব-বসন্ত-সমাগমে যখন সেই সমস্ত বৃক্ষে নবোদ্ভিন্ন আম্র-মঞ্জরীর প্রচুর আবির্ভাব হইত, তখন কেবল মধুকরবৃন্দই যে বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মত্ত-গুঞ্জনে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা নহে; ছাত্রাবাসের অধিবাসিবৃন্দও তাহাদের লেলিহান রসনাদ্বারা সৃক্কনীদ্বয় লেহন করিতেন না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি না। মঞ্জরী যখন গুটিকায় পরিণত হইত, তখন ছাত্রবৃন্দ তাহাদের হৃদয়-নিরুদ্ধ দুর্নিবার লোভকে আর সুসংযত করিয়া রাখিতে পারিত না। লোভ ষোল আনাই আছে; কিন্তু গাছে উঠিতে অনেকেই অপটু। তখন পল্লীপালিত এই জগদিন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। নিদাঘের খর-রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে উৎকলবাসী উদ্যানপালক যখন মাধ্যাহ্নিক সুখনিদ্রায় অভিভূত, তখন "পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়ার নাম চুরি" এই সকল প্রাচীন নীতিবাক্য পশ্চাতে রাখিয়া জগদিন্দ্রনাথ রবিবার মধ্যাহ্নে নিঃশব্দ-পাদবিক্ষেপে গিয়া নীরবে বৃক্ষারূঢ় হইত এবং বহু-ছাত্রের আশা পরিপূর্ণ করিবার উপযোগী প্রচুর আম ও লিচু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। রাজপুত্রের মত দধিদুগ্ধ-পরিপুষ্ট নবনীত-কোমল গুরুভার দেহ আমার ছিল না; ম্যালেরিয়া-জ্বরের কায়েমী আসামী আমি, আমার দেহভার বড় লঘু ছিল, এবং পল্লী-পালিত বলিয়া কাঠবিড়ালের মতই গাছে চড়িবার দক্ষতাও আমার জন্মিয়াছিল। নৌকা বাওয়া, জলে সাঁতার কাটা, উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে নূতন নূতন খেলার আবিষ্কার করা, এই সকল নানা গুণ আমাতে বিদ্যমান ছিল বলিয়াই অভিলষিত "সর্দ্দার" পদবী লাভ করিতে আমি পারিয়া-ছিলাম। কাঁচা আম কেবলমাত্র লবণ সংযোগে প্রচুর পরিমাণে গলাধঃকরণ করা কঠিন কথা; ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে কাসুন্দির জন্য বড় ব্যগ্র হইত। আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে ছাত্র-জীবনে বিবিধ স্থলের উপঢৌকন-সৌভাগ্য

কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? আমাদের অদৃষ্টে ঘটিত না, অথচ লোভও কম নহে। তাহারও উপায় এই জগদিন্দ্রনাথকেই করিতে হইত। যে বাড়ীতে ছাত্রাবাস ছিল, তাহারই সংলগ্ন আর দুইটি বাড়ীতে একটি ডাক্তার এবং একটি কবিরাজ ছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয় এখনও আছেন; কবিরাজ ৺শ্যামচন্দ্র রায় মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের গৃহে কাসুন্দি প্রস্তুত হইত, তাহা জানিতাম; চাহিলে মা-ঠাকুরাণীদের নিকট হইতে না পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি স্বীয় শক্তিতে আহরণ করিবার দুর্নিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে পাইয়া বসিত; সুতরাং beg, borrow or steal এই কয়টার মধ্যে প্রথম দুইটা বাদ দিয়া শেষের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া ছাত্রমণ্ডলীর অভিমত হইত। উপায় স্থিরীকৃত হইয়া গেলেই সেই উপায় অবলম্বনে কার্য্যোদ্ধারের ভার কর্ম্মকুশল জগদিন্দ্র ব্যতীত আর কে গ্রহণ করে? অশরণের শরণ এই জগদিন্দ্র পরোপকারার্থে (!) চৌর্য্য পর্য্যন্ত তখন স্বীকার করিত। এ চৌর্য্য সাধারণ চৌর্য্য নহে। সমস্ত সহরে প্রচার ছিল যে, অক্ষয় ডাক্তার বাবুর গৃহে চুরি করিতে পারে, এমন চোর ভারতে আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। দুঃসাহসিক কার্য্যে পশ্চাতপদ হইবার মত বালক জগদিন্দ্র নহে। ডাক্তারবাবুর গৃহে যখন পাশাক্রীড়ার মজলিস বসিয়াছে, অন্তঃপুরচারিণীগণ দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া নিদাঘ-মধ্যাহ্নের তন্দ্রালসে যখন শয্যায় নিলীন, সাবধান পাদবিক্ষেপে জগদিন্দ্র তখন কাসুন্দির মৃদ্ভাণ্ডের সন্নিহিত হইতেছে। কতদিন বিনা ব্যাঘাতে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া মাতৃগণের নিকট লাঞ্ছনা গঞ্জনা পাই নাই, এমন কথা বলিব না; কিন্তু তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া সেদিকে না গেলে মাতাঠাকুরাণীরা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে এই চোর বালকটির সংবাদ লইতেন। অনেকদিন তাঁহাদের ভাণ্ডারে চুরি হয় নাই, সেটাও বুঝি তাঁহাদের ভাল লাগিত না। রমণী-হৃদয়ের এই অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝর সংসার-সাহারায় শষ্পাচ্ছাদিত, বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ, প্রচ্ছায়মরুমালঞ্চ; ইহাই জীবনকে বহনীয় করিয়া রাখে। যাহাকে স্নেহ করিবার, যাহার সন্ধান সংবাদ নিবার ইহ-পৃথিবীতে কেহই নাই; রোগশয্যায় সেবা করিবার, পীড়ার সময় পিপাসার জলটুকু মুখে তুলিয়া দিবার জন্য একখানি স্নেহ-হস্তও যাহার নিমিত্ত প্রসারিত হয় না, সে নিঃসঙ্গ দুর্ভাগার দিন কত বেদনায় কেমন করিয়া যায়, তাহা সেই জানে, এবং তাহার অন্তর্য্যামী যিনি, বুঝি তিনিও সে কথা জানেন।

নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বাল্যের অবসান-কাল হইতে কৈশোরের অন্ত পর্য্যন্ত একটা সময় আইসে, যখন মানবের স্নেহ-মমতার প্রয়োজন বড় অধিক বলিয়া মনে হয়। সদ্যোদ্ভিন্ন লতিকা যেমন আশ্রয়ের জন্য, সূর্য্যকরের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; তেমনি বয়ঃসন্ধিকে সমাগত বালকের সদ্য-জাগরিত হৃদয়-লতিকা ব্যাকুল হইয়া স্নেহের আশ্রয় খুঁজিতে থাকে। যে পায়, সে কৃতার্থ হইয়া যায়; যাহার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে না, আশ্রয়হীনা লতার মত তাহার হৃদয়কে ধূলিতলেই লুণ্ঠিত হইতে হয়। স্বজনবর্গের স্নেহ পরিবেষ্টনের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যে বাল্য-কৈশোর কাটাইতে পায়, আকাঙ্ক্ষিত স্নেহ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অবসর হয়ত বা তাহার ঘটে; নানাপ্রকারের বিড়ম্বনায়, ব্যাধি পীড়ার নিদারুণ উৎপাতে বাল্যেই যাহাকে স্নেহবেষ্টন হইতে সুদূরে সরিয়া যাইতে হইয়াছে, তাহাকে ভিক্ষুকের মত নানা দ্বারে হাত পাতিতে হয়; দয়া করিয়া কেহ যদি মুষ্টি ভিক্ষা দিলেন, তবে সেদিনের মত তাহার দিন কাটিল; পর দিনে আবার হাত পাতিবার জন্য দ্বারান্তরে গিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে দাবী আছে, যেখানে জোর করিয়া চাহিয়া নিবার অধিকার আছে, সেখানেও যে বিধি-বিড়ম্বনায় বঞ্চিত, উঞ্ছবৃত্তি করিয়া তাহার জীবনযাপন হয় কি না, এ কথার মীমাংসা বড় কঠিন। হউক বা নাই হউক, যে স্নেহের কাঙ্গাল, সে হাত না পাতিয়া পারে না। তাহার ভাবাহীন করুণ-দৃষ্টির ভিক্ষাপাত্রটি সে বাড়াইয়া ধরে; স্নেহশীলা মাতৃকল্পা প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাদের অফুরন্ত স্নেহ-ভাণ্ডার হইতে উদ্বৃত্তটুকু দিয়া ভিখারী বালকের একান্ত অভাব কখনও কখনও পূরণ করিয়া থাকেন; নতুবা এ সংসারে আমরা কয়জন বাল্য-কৈশোর কাটাইয়া যৌবনে বা প্রৌঢ়-সীমায় আসিয়া পৌছিতে পারিতাম, জানি না।

শিক্ষাজীবনের সংশ্রবে দুই একটি কথা আরও না বলিয়া পারিলাম না। আমাদের পঠদ্দশা আজ প্রায় ২৫।২৬ বৎসর শেষ হইয়াছে। সে দিনের চালচলন, বিদ্যার্থী বালকের বিনয় সৌজন্য নম্রতার তুলনায় আজকার ছাত্রমণ্ডলীকে একটু অধিকমাত্রায় স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। সেকালে ছাত্রগণ শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণের প্রতি এমন একটি বিনয়-নম্র ভক্তিভাব পোষণ করিত, যাহা, মনে হয়, আজকারদিনে ছাত্রজীবনে সুদুর্লভ পদার্থ। আগেকার দিনে ছাত্রবৃন্দ কেবল শিক্ষকগণের প্রতি ভক্তিমান ছিল, তাহাই নহে; বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশী বা

প্রতিবেশিনীগণের প্রতিও তাহারা যে ভক্তিমিশ্রিত সৌজন্য এবং বিনয় প্রদর্শন করিত, তাহা আজ আর নাই। আজকাল সহরের ছাত্রাবাসবাসী বিদ্যার্থী তাহার গৃহসংলগ্ন প্রতিবেশীর সহিত পরিচিতও নহে, পরিচিত থাকিলেও বয়সের প্রাপ্য সম্মান তাঁহাদিগকে দিতে যেন সর্ব্বদা তেমন প্রস্তুত নহে। সেকালের দিনে শিক্ষক এবং ছাত্র পিতাপুত্রের ন্যায় স্নেহভক্তির একটা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষকদিগের কুলাঙ্গনাগণের প্রতিও ছাত্রবর্গের মাতৃভাব সমস্ত কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত; আজকার দিনে সে মধুর সম্বন্ধের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। সেকালে দেখিয়াছি প্রতিছাত্রের বিদ্যাভ্যাস এবং আচার-ব্যবহারের প্রতি শিক্ষকগণের একান্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ছিল। ঘণ্টাহিসাবে বেতনের অনুপাতে period-মাফিক লেকচার দিয়াই শিক্ষকের কর্ত্তব্য শেষ হইত না, এবং মুখস্থ পড়া দিতে পারিলেই ছাত্রের সর্ব্ব-দায়িত্বের অবসান হইত না। রাস্তায় পথে শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ছাত্র সেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত, এবং জাতিহিসাবে শিক্ষক প্রণম্য না হইলে অন্য প্রকারে যথেষ্ট ভক্তি-প্রদর্শন করা ছাত্র তাহার কর্ত্তব্য মনে করিত। আজ বোধ করি স্থলবিশেষে সিগারেট চাহিয়া নিয়া শিক্ষকের মুখ-চক্ষু-নাসিকা লক্ষ্য করতঃ কুণ্ডলায়িত ধূমোদ্গীরণ করিতে ছাত্রের মনে অণুমাত্র দ্বিধার সঞ্চারও হয় না। একদিকে স্নেহ এবং অপরদিকে ভক্তিশ্রদ্ধার মাধুর্য্যময় সম্বন্ধ থাকায় সে দিনের ছাত্রগণের জীবনযাত্রা যেমন সুখে, নিরুদ্বেগে এবং অবলীলায় নির্ব্বাহ হইত, আজ তাহা হয় কি না, সে কথার মীমাংসা আজকার দিনের ছাত্র এবং শিক্ষক সম্প্রদায় করিতে পারেন। আমার মনে হইল যে, সে দিনের কল্যাণকর মঙ্গলময় নিগূঢ় স্নেহভক্তির সম্বন্ধ আজ নাই এবং না থাকার জন্য অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে; তাই কথাটা বলিলাম। দোষ করিয়া থাকি, তবে ছাত্র এবং শিক্ষকগণ আমায় দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আগেকার দিনে সমপাঠীগণের সঙ্গে মধুর সখ্যভাব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত এবং স্থলবিশেষে সে সৌখ্য সহোদর ভ্রাতৃত্বের গৌরব অপেক্ষা হীনগৌরবের ছিল না। সে নিবিড় বান্ধবতা আজীবন-স্থায়ী হইত, সুখে দুঃখে আমরণ সে সম্বন্ধ জীবন্ত থাকিয়া উভয়ের পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যেও তাহা সংক্রামিত হইত। আজ আর সে দিন নাই। আজ অনেকে তাহাদের সমপাঠী সকলের নাম পর্য্যন্ত জানেন কিনা সন্দেহ। ইহা আজকার দিনের নব-সভ্যতার পরি-চায়ক কি না জানি না, তবে ইহা যে হৃদয়ক্ষেত্রের অনুর্ব্বরতার পরিচায়ক,

তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ আমার নাই। এ সংসারে সকলেই আকাঙ্ক্ষিত লাভ করিয়া সার্থক-জীবন যাপন করিবার সৌভাগ্য পায় না। একান্ত বাঞ্ছিত প্রিয় পদার্থ লাভ করিয়া সুখী হওয়া ভাগ্যবিধাতার কৃপাসাপেক্ষ; সকলের অদৃষ্টে তাহা ঘটিলে এ সংসারে এত দীর্ঘশ্বাস, এত বেদনা, এত অশ্রুর প্লাবন ঘটিতে পারিত না। তথাপি জীবন-প্রারম্ভের বসন্ত-প্রভাতে যে সখ্য বান্ধবতা প্রভৃতির ফুল হৃদয়-লতিকায় ফুটিয়া ওঠে, সেই মুঞ্জরিত পুষ্পিত গন্ধামোদিত বল্লরীকে সজীব রাখিতে পারিলে প্রখর রৌদ্রকরতপ্ত জীবনপথে সময়ে সময়ে বিশ্রামের উপযোগী ছায়াটুকুর অভাব বুঝি হয় না। আজ এই লৌহ লোষ্ট্র-কাষ্ঠ-প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মহানগরীগুলি হইতে প্রকৃতির হরিৎ বর্ণটুকু যেমন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া এক ধূলি-ধূসরতার সৃজন করিয়াছে, তেমনি মানবের হৃদয় হইতে মমতার হরিত-দ্যুতিও বুঝি মুছিয়া গিয়াছে। আজ আর সখ্য, বান্ধবতা, হৃদ্যতা, প্রণয় প্রভৃতি তেমন প্রশ্রয় পায় না। বাল্যে কৈশোরে যদি বা কদাচিৎ কোথাও তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে দেখা যায়, সে দুর্ব্বল লতিকা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণবর্দ্ধক রসধারার সিঞ্চনাভাবে অকালেই শুকাইয়া গিয়া "সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং পরিপালনম্" মহাকবির এই বাক্যের যাথার্থ্যই প্রমাণিত করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন

পৃথিবীর প্রান্ত থেকে, কত পথ এঁকে বেঁকে,
ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে দূর নীলিমায়,
একটা উদাস গান যেন ভেসে যায়।
একটা উদাস পাখী থেকে থেকে উঠে ডাকি,
বনে বায়ু শ্বসি' উঠে, করে হায় হায়।
সন্তর্পণে শীর্ণ নদী, অতি শ্রান্ত মৃদুগতি,
গ্রামপ্রান্তে যায় ব'য়ে আম্র-বনচ্ছায়।
জলে নাই ছলরব, কূলে নাই কলরব;
পল্লীখানি আঁকা যেন আকাশের গায়।
শুষ্ক-শীর্ণ-দীর্ণ প্রাণ পান্থহীন পথ-যান
শূন্যে চেয়ে শুয়ে আছে অতি শ্রান্ত-কায়।

ক্লান্ত-গ্রাম কান্ত কম    কাহিনীর পুরীসম
কোন্ মায়া-মন্ত্র-বলে নিস্পন্দ ঘুমায়।
দগ্ধ মাঠ করে ধূ ধূ    ছায়াস্তব্ধ বন শুধু
মন্থর-মর্ম্মরে কাঁপে তপ্ত মৃদু বায়।
দীপ্ত দুপুরের এক স্বপ্ন ভেসে যায়।
কত পরী-রাজ্য'পরে    অতি দূর দূরান্তরে,
সে কোন্ অজানা দেশ, নিরালা-কানন ;
কে সেথায় কার তরে,    তরুচ্ছায়ে তৃণ'পরে
একেলা কাটায় বেলা আকুল আনন ?
আমি যদি এ নিমেষে,    গিয়ে পড়ি সেই দেশে,
চমকিয়া চাবে কি সে চকিত-নয়ন ?
আমাদের পরিচয়    সে ত আজিকার নয়,
যুগ হ'তে যুগান্তের অনন্ত স্বপন।
কে জানে কেমন করি'    যদি সেথা গিয়ে পড়ি,
তার ক্রোড়ে মাথা রেখে, আবেশে মগন,
শুধু আমি শুয়ে রব,    হাতখানি হাতে লব,
কথাতো কব না কিছু ; কেবল তখন
চেয়ে আকাশের পানে,    স্বপ্ন-স্রোতে শূন্য-পানে,
ভেসে যাব দিগ্‌ভ্রান্ত ভেলার মতন,
যতক্ষণ শ্রান্ত নাহি হ'য়ে পড়ে মন।
কোথায় গিয়েছি, দূর    মনোহর মায়াপুর
মনে ভাসে স্মৃতি তার বিস্মৃতির প্রায়।
আলোভরা অলসতা    অলিদের কলকথা
শ্রান্ত বুকে মূর্চ্ছি' পড়ে শান্ত-মূর্চ্ছনায়।
উপরে আকাশ নীল ;    সঙ্গহীন অনাবিল
একখানি শুভ্র মেঘ ঘুরিয়া বেড়ায়।
কে যেন পাড়ায় ঘুম ;    চারিধার কি নিঝুম !
মায়াভরা তন্দ্রা গাহে আয় চ'লে আয়।
কোন দূর থেকে দূর-স্বপ্ন ভেসে যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

# খেদা

## ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

রাত্রি প্রভাত না হইতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

মাঠের মধ্যে প্রায় নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া শীত যেন তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছিল। আমরাও চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া তাহার প্রতাপকে কতকটা খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ঘন কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া অস্তগমনোন্মুখ কৃষ্ণাদ্বাদশীর ম্লান চন্দ্র একটা প্রহেলিকাময় মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল।

অদূরস্থিত অস্পষ্ট তাম্বুগুলি ও চতুর্দ্দিকস্থ অস্পষ্ট বৃক্ষ প্রান্তর ও গিরিরাজ যেন একটা স্বপ্নময় রাজ্য সৃজন করিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কে যেন ধীরে ধীরে একখানা অতিসূক্ষ্ম জড়োয়া ওড়না সমস্ত জগতের উপর বিছাইয়া দিল।

পূর্ব্বরাত্রিতে সকলেরই কাপড় বিছানা প্রভৃতি গুছাইয়া ঠিক্ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যতদূর সম্ভব কম আসবাবপত্র ও লোকজন সঙ্গে যাইবে; বাকী সব কমলপুর ছাউনীতেই থাকিবে। খেদার স্থানে অযথা বহুলোকের ভিড় ও গণ্ডগোল বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ, সেই দুরধিগম্য স্থানে এত লোকের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা একপ্রকার অসম্ভব। যাহারা প্রথম খেদা দেখিতে যাইতে পারিবে না তাহারা মহুতে দ্বিতীয় খেদা দেখিতে যাইবে।

মাত্র একটা গ্লাডষ্টোন্ ব্যাগে আমাদের তিনজনের—কুমার জিতেন্দ্র-কিশোরের, কুমারের নিজস্ব কর্ম্মচারী শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর ও আমার—অত্যাবশ্যকীয় কাপড় পোষাক প্রভৃতি পুরিয়া লওয়া হইয়াছে। কেবল মাত্র "বসন্ত" চাকরকে সঙ্গে লওয়া হইল। আমাদের তিনজনের থাকিবার জন্য মাত্র একটি "কিন্‌লক্" তাম্বু সঙ্গে লইলাম। "কিন্‌লক্" তাম্বুগুলি খুব ছোট; কোনওরকমে মাত্র একজন লোক থাকিবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত।" "কিন্-লক্" অন্যান্য তাম্বু অপেক্ষা ওজনেও কম। "কিন্‌লক্" তাম্বু লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে উহাকে নিজদের হাতীর উপরেই লওয়া যাইবে, এবং তাড়াতাড়িও খুব

অল্প লোকের সাহায্যে সকলের পূর্ব্বে সুবিধামত স্থান অধিকার করিয়া উহাকে খাটান যাইবে ;—এমন কি, আবশ্যক হইলে নিজেরাই খাটাইয়া লইতে পারিব।

খেদা, শিকার প্রভৃতি ব্যাপারে কষ্ট সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে এসব সখ করা চলে না। সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বিবর্জ্জিত নিবিড় অরণ্যের ভিতর গৃহের ন্যায় আরাম অন্বেষণ করা বিড়ম্বনা মাত্র!

রাজা জগৎকিশোর বহুপূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি রওনা হইবার জন্য সকলকে তাগাদা করিতেছিলেন।

তিনিও যথাসম্ভব কম আস্‌বাব্‌পত্র সঙ্গে লইয়াছেন। মাত্র একটি ব্যাগ ও দুইজন চাকর তাঁহার সঙ্গে যাইবে। তাঁহার সঙ্গে তাম্বু গেল "কাশ্মীরী টেণ্ট।" বড় তাম্বু লওয়ার উদ্দেশ্য,—যদি কাহারও অসুবিধা হয় তবে সে তাঁহার তাম্বুতে আশ্রয় লইতে পারিবে। ডাক্তার বাবুর জন্য "শীকারী পাল" ও চাকরদের জন্য একটা "বেল্ টেণ্ট্" লওয়া হইল।

ডাক্তার বিপিনবাবু ও শ্রীমান্ যোগেন্দ্র রায় তাঁহাদের সঙ্গীয় জিনিষ হাতীতে তুলিয়া দিয়া হাঁটিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হাঁটিয়া যাওয়া তাঁহাদের সখ।

শ্রীযুক্ত ধরণীবাবু, নরেন্দ্র, ও বিজয়, লোকজন ও জিনিষপত্র তাঁহাদের ভাড়াটিয়া হাতীতে তুলিয়া নিজেরাও হাতীতে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত ধরণীবাবু সুবিধার জন্য পাঁচটি হাতী ভাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের হাতী সঙ্গে আনেন নাই।

আমরা যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক তাম্বুর বাহিরে আসিলেন। শুনিলাম তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত। ত্রিপুরা রাজসরকার হইতে, আমাদের খেদার কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত ইনি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনিও আমাদের সঙ্গে যাইবেন। তাঁহার সহিত দুইটি পুলিস্ ও একজন চাকর আসিয়াছে—তাহারাও যাইবে। ভদ্রলোকটির দৃঢ়, বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ এবং কুটীলতা বর্জ্জিত হাস্যদীপ্ত মুখমণ্ডল বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছিল। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন তাঁহার সহিত কতকালের পরিচয়।

মুক্তাগাছা হইতে আমাদের পঁয়ত্রিশটি হাতী আসিয়াছিল। এবং কমলপুর

আসিয়া আরও বারটা হাতী ভাড়া করা হইয়াছিল। কয়েকটা মাসিক সোয়া শত টাকা ও কয়েকটা দেড়শত টাকা হারে ভাড়া হইয়াছিল। আমাদের সাতচল্লিশটা ও শ্রীযুক্ত ধরণীবাবুর পাঁচটি,—মোট বায়ান্নটা হাতী হইল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ৮টা হাতী পূর্ব্বেই অরণ্যে গিয়াছিল। বাকী চুয়াল্লিশটা আমাদের সঙ্গে চলিল।

এ প্রদেশে বহু হস্তী ভাড়া পাওয়া যায়। এইদেশের অর্থশালী লোকের এমন কি অনেক সাধারণ গৃহস্থেরও হাতী আছে। জঙ্গল হইতে কাঠ টানাইবার নিমিত্ত খেদা, ও সওয়ারির কাজের জন্য হস্তী ভাড়া দিয়া হস্তিস্বামী যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যে সব গৃহস্থের একা একটি হস্তী কিনিবার মত অবস্থা নয়, তাহাদের অনেকেই দুতিন জনে মিলিয়া একটি হস্তী ক্রয় করিয়া ব্যবসা করে। এক একটি হস্তীদ্বারা সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় হাজার দেড় হাজার টাকা লাভ হয়।

ইহাদের একটি হস্তী পুষিবার খরচ বৎসরে আশী, নব্বই, কিম্বা খুব বেশী হইলে একশত টাকার অতিরিক্ত পড়ে না। একটা হস্তীর জন্য একজন মাহুত (হস্তীচালক) রাখিলেই চলে। মাহুত সারাদিন হস্তীকে কাজে খাটাইয়া রাত্রিতে পায়ে "বাণ্ডা ভরিয়া" (যে রজ্জু দ্বারা পশ্চাতের পদদ্বয় বন্ধন করা হয়) জঙ্গলে ছাড়িয়া দেয়। হস্তীও ইচ্ছামত চরিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করে! ইহাতে হস্তীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সুতরাং হস্তীর জন্য খোরাকী খরচ মোটেই লাগে না।

হস্তীর মাহুতও বারমাস নিযুক্ত থাকে না। কার্ত্তিকমাস হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে সময়ে হস্তী খেদা ও কাঠটানার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, মাত্র সেই সময়ের জন্যই মাহুত নিযুক্ত করা হয়। বৎসরের বাকী কয়েক মাস হস্তীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে হস্তিস্বামী স্বয়ং অথবা অন্য কোনও লোক দ্বারা কোন্ জঙ্গলে হস্তী অবস্থান করিতেছে তাহা জানিয়া রাখে। এই প্রকার ব্যবস্থাতে অনেক সময় বিপদও হয়। হস্তী প্রায়ই চুরি হইবার কিম্বা বন্যহস্তীর সহিত মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এ প্রদেশে হাতীচুরির মোকদ্দমাও খুব বেশী। খেদাতেও মাঝে মাঝে দুএকটা পোষা হস্তী বন্যহস্তীর সহিত ধরা পড়ে! তথাপি ইহাই সেস্থানের সাধারণ নিয়ম। তবে, যাঁহারা সখের জন্য হস্তী পুষিয়া থাকেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র!

আমাদের সওয়ারির জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি হাতী বাছিয়া রাখিয়া

বাকী সমস্ত হাতীতে ধৃত-নূতন হস্তী বাঁধিবার দড়াদড়ি, আমাদের রসদাদি ও মাহুতকাম্‌লাদের সরঞ্জাম প্রভৃতিতেই বোঝাই হইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও আস্‌বাব্‌গুলি হাতীতে উঠান শেষ হইলে, রাজা বাহাদুর ও ধরণীবাবু প্রত্যেকে পৃথক পৃথক হস্তীতে উঠিলেন। নরেন্দ্র ও বিজয় এক হস্তীতে এবং আমরা তিনজন এক হস্তীতে উঠিলাম। যোগেশবাবুর জন্য একটি হস্তী পৃথক রাখা হইয়াছিল, তিনি তাঁহার লোকজনসহ সেই হস্তীতে চড়িলেন। অন্যান্য সঙ্গীয় লোকজন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে সেই বিপুলবাহিনী চলিতে আরম্ভ করিল।

আমরা হাসি ঠাট্টা গল্পে গুজবে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই যাইতেছিলাম। প্রায় এক-মাইল আসিবার পর কোন্ হস্তী কত দ্রুত চলিতে পারে প্রতিযোগিতায় একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আমাদের মাথায় এক খেয়াল আসিল। তখন হস্তীগুলিকে খুব দ্রুত চালাইবার আদেশ দেওয়া হইল। মাহুতগণও স্ব স্ব হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া সাধ্যমত দ্রুত চালাইতে লাগিল। এক মাইল কি দেড় মাইল এই ভাবে দ্রুত গতিতে চলিয়া আসিবার পর দেখা গেল—রাজা বাহাদুরের হস্তী সর্ব্বাগ্রে ও তৎপশ্চাৎ আমাদের হস্তী অন্যান্য হস্তী অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত ধরণীবাবু এবং নরেন্দ্র ও বিজয়ের হস্তী বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে;—কারণ সেগুলি ভাড়াটিয়া হাতী। ডাক্তারবাবু ও যোগেন্দ্র কতকদূর প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়াও সকল হস্তীর পশ্চাতে পড়িয়াছেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অন্য হস্তীগুলি আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইল। তখন উহারা আবার পূর্ব্ববৎ সাধারণ চালে চলিতে আরম্ভ করিল।

সদ্য কর্ত্তিত ধান্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রায় চারি মাইল চলিয়া আসিবার পর আমরা পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। অতঃপর ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। পাহাড়গুলি খুব বেশী উচ্চ নয়, তিন চারিশত ফিট্ হইতে আরম্ভ করিয়া দুহাজার তিনহাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ পাহাড়ও আছে। এই পাহাড়গুলি প্রায়ই মাটীর, কদাচিৎ কোথাও পাহাড়ের কতক অংশ প্রস্তরময়।

ঘনসন্নিবিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ বাঁশ ও বেতের ঝোপ দ্বারা সবগুলি পাহাড়ই আচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি যেন পাহাড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের গর্ব্বোন্নত মস্তক পর্ব্বতোপরি উত্তোলিত করিয়া স্থির নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান।

এই অরণ্যের বাঁশগুলি নানা জাতির। তন্মধ্যে কতকগুলি এত স্থূল যে তাহার এক একটি চোঙ্গায় দেড় কলসি দু কলসি জল ধরে। এ প্রদেশের বেতগাছগুলিও দুইশত আড়াইশত ফিট্ উচ্চ হয়। উদ্ভিদ জাতির মধ্যে বোধ হয় বেতসী লতা অপেক্ষা অধিক কণ্টকাকীর্ণ উদ্ভিদ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার সমগ্র গাত্র—ডগা পাতা পর্য্যন্ত—তীক্ষ্ণ, বক্র, দৃঢ়, কণ্টকে আবৃত। প্রায় দুইশত ফিট্ উচ্চ শীর্ষদেশ হইতে সরু ইস্পাতের করাতের মত ইহার এক একটি লক্‌লকে কণ্টকময় শীষ ঝুলিতেছে। কোনটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে, কোনটা ভূমি হইতে দু তিন হাত ঊর্দ্ধে ঝুলিতেছে।

বেতের মূল ও কচি অগ্রভাগ সিদ্ধ করিয়া তৈল-লবণ সংযোগে দেহের পক্ষে উপকারী ও উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়; ইহার ছোট ছোট ফলগুলি ও পাকিলে খাইতে মন্দ লাগে না।

এতাদৃশ ভয়াবহ গভীর অরণ্যানী জীবনে আর কখনও দেখি নাই। বাস্তবিক স্বচক্ষে না দেখিলে সেই বর্ণনাতীত ভীষণ অরণ্য সমাচ্ছাদিত দুর্ভেদ্য, দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বতগুলির কল্পনা করা অসম্ভব। পার্ব্বত্য জনগণের গমনাগমন জনিত একটি অতি অপ্রশস্ত পথরেখা ব্যতীত তথায় দ্বিতীয় রাস্তার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই;—তাহাই অনুসরণ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

হস্তিগুলি অতিকষ্টে বড় বড় বাঁশগুলি কখনও পদদলিত করিয়া, কখনও শুঁড় দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পদতলে চাপিয়া রাখিয়া কখনও শুঁড় গুটাইয়া কপালের সাহায্যে জোর করিয়া ঠেলিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট গাছগুলি ভাঙ্গিয়া বড়গাছগুলি—যাহা ভাঙ্গা অসম্ভব—তাহার পাশদিয়া জঙ্গলগুলি দলিত মথিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। মাহুতদের অনবরত "মাইল্ মাইল্" (সাবধানে চল্), "দেরে দেরে" (ধর্ ধর্) "মার্ মার্" (ভাঙ্গ ভাঙ্গ বা আঘাত কর্) "ধৎ ধৎ" (থাম থাম) "পিছু পিছু, (পিছনে সর্), প্রভৃতি চীৎকার, বাঁশ ও গাছগুলি ভাঙ্গার মট মট মড় মড় শব্দ ক্রমাগত অঙ্কুশাঘাতে বেদনাকাতর হস্তিগুলির মর্ম্মভেদী অদ্ভুত গর্জ্জন, তৎসঙ্গে এতগুলি হস্তীর ঘণ্টাধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন প্রলয়কালীন সৃষ্টিবিধ্বংসী মহাগর্জ্জনের মত শুনাইতেছিল।

এমন শান্তিময় নির্জ্জন স্থানে এ প্রকার বীভৎস কোলাহল শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্ত্রাসিত বন্যজন্তুগুলি প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইয়া

বনান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ভয়চকিত পক্ষীগুলি মাথার উপর উড়িয়া উড়িয়া ডাকিয়া ডাকিয়া, অন্য পাহাড়ে পলাইয়া গেল।

আমরা অতিকষ্টে হস্তীপৃষ্ঠে একহস্তে গদির দড়ি ধরিয়া অন্য হস্ত দ্বারা গাছের ডাল, হেলান বাঁশ ও কঞ্চি এবং বেতকাঁটাগুলি সরাইয়া কিংবা দা'র সাহায্যে কাটিয়া কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা ভয় ঐ বেতের শীষগুলির। শীষগুলি শরীরে স্পর্শ করামাত্রই টান লাগিয়া করাতের ন্যায় দেহের মাংস কাটিয়া যাইবে।

হস্তিগুলি ক্রমাগত "উৎরাই" ও "চড়াই" পার হইয়া চলিতে লাগিল। যে সব পাহাড় খুব সরলভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—যাহাদের দেখিয়া মনে হয় না যে কোনও জানোয়ার বা মানুষ সেই পাহাড়ে উঠিতে পারিবে—তাহাও ইহারা অনায়াসে আশ্চর্য্য কৌশলে অতি দ্রুত আরোহণ ও অবরোহণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময় আমাদিগকে গদির দড়ী ধরিয়া এক প্রকার ঝুলিয়া বসিয়া থাকিয়া গাছের ডাল, বাঁশ ও বেতের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছিল।

অবরোহণ করিবার সময় বিপদ আরও বেশী। হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

হস্তী পর্ব্বত হইতে নামিবার সময় সম্মুখের দুপায়ে শরীরের সমস্ত ভার রাখিয়া পশ্চাতের দুই পা গুটাইয়া (হামাগুড়ি দিবার সময় যে ভাবে পা গুটান হয়) ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পশ্চাতের পা দুটা অনেক সময় হেঁচ্ড়াইয়া টানিয়া আনে।

কয়েকটা পাহাড় অতিক্রম করিবার পর আমরা একটা পাহাড়িয়া "বস্তি"তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই "বস্তি"র অধিবাসিগণ জাতিতে "হালাম।" অন্যান্য পার্ব্বত্য-অসভ্যজাতির মতই ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও বেশভূষা।

বেলা প্রায় বারটার সময় আমরা একটী টিপ্‌রা বস্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আমরা আরও কয়েকটি "হালাম্" বস্তি পার হইয়া আসিয়াছি।

এই বস্তিতে আসিয়া আমরা হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া টিফিন্ খাইয়া—প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম; তৎপর পুনরায় চলিতে লাগিলাম। সম্মুখস্থ পাহাড়গুলি আরও উচ্চ এবং খাড়া; পথ আরও দুর্গম। মধ্যে

মধ্যে কোনও ক্ষীণকায়া, খরস্রোতা, অগভীর পার্ব্বত্য-নদীর মধ্য দিয়া কিংবা কোনও প্রস্রবনের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় অনেকটা নিরাপদ ও আরাম বোধ করিতেছিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা খুব উঁচু ও খাড়া পাহাড়ে উঠিবার সময় বড়ই ভীষণ এক কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই বিশেষ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিল না।

নরেন্দ্র ও বিজয়ের হস্তী পাহাড়ে উঠিবার সময় পা-পিছলাইয়া প্রায় সাত আট হাত নীচে সরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ কেমন করিয়া আবার নিজেকে সামলাইয়া লইল। যদি আর দুইতিন হাত নীচে পিছলাইয়া আসিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না ;—গড়াইতে গড়াইতে একেবারে প্রায় হাজার ফিট্ নীচে পড়িয়া যাইত। তখন তাহাদের কি যে ভয়ানক পরিণাম হইত, তাহা কল্পনা করিতেও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হস্তীর দেহের চাপে এক একটী মাংসপিণ্ড ব্যতীত বোধ হয় তাহাদের আর কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান থাকিত না।

এত কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া জীবন-মৃত্যুর সূক্ষ্মতম পথরেখার উপর দিয়া আমাদিগকে খেদা দেখিতে যাইতেই হইবে !—সখ এমনি জিনিস !

বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা 'সিপাই-বস্তি' নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। এস্থানের অধিবাসিগণ জাতিতে টিপ্‌রা। এই বস্তিতেই রাত্রি-যাপন করিবার পরামর্শ হইল।

আমরা হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলে হস্তীগুলির পৃষ্ঠদেশ হইতে সাজ-সরঞ্জাম নামাইয়া বিশ্রাম ও আহারের জন্য তাহাদিগকে পাহাড়ে ছাড়িয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইল। আদেশমাত্রই মাহুত ও কাম্‌লাগণ অতি অল্প সময়ের ভিতর সমস্ত জিনিস নামাইয়া হস্তীগুলিকে পাহাড়ে ছাড়িয়া দিল।

আমাদের এই বস্তিতে রাত্রিযাপন করিবার মানস করিলে কি হয় !—সেই বস্তির অধিবাসিরা আমাদিগকে কিছুতেই তথায় অবস্থান করিতে দিতে রাজী নয়। বিদেশী-পরিচ্ছদে ভূষিত দেখিয়া তাহারা আমাদিগকে অহিন্দু মনে করিতেছিল। অহিন্দুর অবস্থিতিতে তাহাদের বস্তি অপবিত্র হইয়া যাইবে ও তাহাদিগকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে, ভয়ে তাহারা কিছুতেই আমাদিগকে তথায় বাস করিতে দিতে স্বীকৃত হইতেছিল না। আমাদেরও তখন অন্য উপায় ছিল না। এই বস্তির পাদমূল স্পর্শ করিয়া একটী শীর্ণা নদী প্রবাহিতা। তাহার পরপারে অন্য একটি টিলার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় তাম্বু খাটাইয়া রাত্রি-

যাপনের ব্যবস্থা করিতে গেলে বহু সময়ের প্রয়োজন; এমন কি রাত্রি বারটা-একটার পূর্ব্বে কিছুতেই রাত্রি-যাপন করিবার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং যে রকমেই হউক, এই বস্তিতেই থাকিতে হইবে।

বহুপ্রকারে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারা গেল না। তখন যোগেশবাবু তাঁহার পুলিশদ্বারা তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে,—রাজার (ত্রিপুরেশ্বরের) আদেশে এই ভদ্রলোকদের এখানে থাকিতে দিতেই হইবে। রাজাদেশ অমান্য করিলে তাহাদিগকে রাজকোপে পড়িতে হইবে। তাহাতেও তাহারা দমিল না। ধর্ম্মের জন্য ভারতবাসী না করিতে পারে কি!

ইতিমধ্যে রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত ধরণীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বেয়াই, তুমি পোষাক খুলে কাপড় পরে তোমার গোছা পৈতে ও টিকি খুলে এইখানে এসে দাঁড়াও। এরা দেখুক যে আমরা হিন্দু—ব্রাহ্মণ। তাহলে বোধ হয় এদের আপত্তি থাক্‌বে না।" শ্রীযুক্ত ধরণীবাবুও তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুত সাহেবি-পোষাক উন্মোচন করিয়া ধুতিচাদর পরিধান পূর্ব্বক শুভ্র-যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া, শিখার অগ্রভাগে ফুল বাঁধিয়া সকলের মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও টিপ্‌রাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন। তখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের টিপ্‌রাভাষায় একটা পরামর্শ চলিল; এবং শেষে কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাহাদের গৃহের খোলা-বারান্দায় থাকিতে দিতে স্বীকৃত হইল। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ-নিষেধ।

সেই বস্তিতে তাম্বু খাটাইবার স্থান না থাকায় বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বারান্দাতেই বিশ্রাম ও রাত্রিযাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। রান্নার তাম্বুটা কোনও প্রকারে খাটাইয়া তাহার ভিতর রান্না চড়াইয়া দেওয়া হইল।

টিপ্‌রাদের কেহ কেহ বাংলাভাষা সামান্য বলিতে ও বুঝিতে পারে। তাহারাই এতক্ষণ দোভাষীর কাজ করিতেছিল।

টিপ্‌রাগণ হালামজাতি অপেক্ষা কিছু সভ্য। দৈহিক সৌন্দর্য্যেও ইহারা তাহাদের অপেক্ষা সুশ্রী। হালামগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করে; এই নিমিত্ত টিপ্‌রারা উঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করে। টিপ্‌রারা গর্ব্ব করিয়া বলে যে, তাহারা রাজার (ত্রিপুরার মহারাজার) জ্ঞাতি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। ত্রিপুরেশ্বর—ক্ষত্রিয়। তবে, স্মরণাতীতকাল হইতে পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার

রাজত্ব করার জন্য টিপ্‌রাদের সহিত বিবাহবন্ধনাদি দ্বারা অনেকটা মিশিয়া পড়িয়াছেন। টিপ্‌রা, হালাম্‌, কুকি প্রভৃতি এই প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য-জাতির গৃহগুলি বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও একটু নূতন ধরণের।

তিন চার হাত উচ্চ বংশমঞ্চোপরি সাত আট হাত উচ্চ ও পঁচিশ ত্রিশ হাত লম্বা দোচালা-ঘরগুলির নির্ম্মাণকৌশল প্রশংসনীয়, দেখিতেও মনোরম। সবই বাঁশ ও বেতের কাজ। ঘর দুভাগে বিভক্ত,—স্বল্পপরিসর উন্মুক্ত বারান্দা ও কুঠ্‌রী। ভিত্তি মাটির না হওয়ায় ও খোলা থাকাতে ঘরগুলি বেশ স্বাস্থ্যকর। প্রত্যেক গৃহের পশ্চাদ্ভাগে গৃহসংলগ্ন বাঁশের রেলিংঘেরা চার পাঁচ হাত প্রশস্ত খোলা মঞ্চ। উহা পায়খানাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কতকগুলি পালিত শূকর মেথরের কার্য্যটা সম্পন্ন করে।

এক এক পরিবার—স্বামী, স্ত্রী, ও পুত্রকন্যা—এক এক গৃহে বাস করে। পুত্রকন্যার বিবাহ হওয়ামাত্রই তাহারা ভিন্ন ঘর তৈরি করিয়া বাস করে; এবং নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জ্জন করিয়া লয়।

ইহাদের মনোনয়ন প্রথানুসারে বিবাহই প্রশস্ত। কখনও কখনও পিতা-মাতা বরকন্যা নির্ব্বাচন করিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকে।

ইহাদের নৈতিক-চরিত্র অন্যান্য পার্ব্বত্য অসভ্যজাতির মতই শিথিল। তবে বিবাহের পর ইহারা অনেকটা সংযত হয়। কারণ, বিবাহের পর চরিত্র কলুষিত হইলে যদি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে অতিশয় গুরুতর শাস্তি পাইতে হয়।

কাহারও চরিত্র কলুষিত হইলে দোষীকে ধরিয়া আনিয়া বস্তির প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী স্থূল স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া, তাহার সহিত দৃঢ়ভাবে রজ্জু দ্বারা উহার হস্তপদ বাঁধিয়া পল্লীর সমগ্র পুরুষ একত্র হইয়া, প্রত্যেকে তাহার ইচ্ছামত দোষীকে প্রহার করিয়া থাকে। সময় সময় এরূপ নির্ম্মমভাবে প্রহার করে যে, তাহাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। বস্তির সমস্ত স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত থাকিয়া সেই শাস্তিপ্রদান ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য।

এক-একটা পর্ব্বতের উপরে এক একটা বস্তি বা পল্লী। এক পাহাড়ে দুই বস্তি দেখি নাই। পর্ব্বতের উপর সমতল স্থান বাছিয়া ইহারা বস্তি নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ রাখিয়া চতুর্দ্দিকে গৃহগুলি তৈরি করে।

ইহাদের পুরুষগুলি আলস্যপরায়ণ ও বিলাসী,—স্ত্রীলোকেরা খুব পরিশ্রমী,

—সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা। ধানভানা, তৈল প্রস্তুত করা, বস্ত্রবয়ন, মদ তৈরি প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাদি স্ত্রীলোকেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। গৃহনির্ম্মাণেও স্ত্রীলোকেরা সাহায্য করিয়া থাকে।

পুরুষেরা "জুম্" তৈরি করে ও ফসল কাটিয়া আনে। অন্য সময় মাছ ধরিয়া, বাঁশী বাজাইয়া, মদ খাইয়া আমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া দেয়; স্ত্রীপুরুষ একত্র বসিয়া মদ খায় ও নৃত্যগীত করে।

পল্লীর নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের কতকটা স্থানের জঙ্গল কাটিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়। তৎপর, একপ্রকার তিনদিকে তীক্ষ্ণ-ধারবিশিষ্ট ত্রিকোণ "দা"র মত অস্ত্রদ্বারা মাটী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ধান, পাট ও তুলা প্রভৃতির বীজ একত্রে পুঁতিয়া যায়। ইহাকেই "জুম্" করা বলে। সময় ও ঋতু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফসল কাটিয়া আনে। বেশীরভাগ ফসল স্ত্রীলোকেরাই বহন করিয়া গৃহে লইয়া আসে।

প্রকৃতিদেবী সে প্রদেশের মৃত্তিকাতে এত উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, বিশেষ পরিশ্রম করিয়া "জুম্" প্রস্তুত না করিলেও প্রচুর ফসল ফলিয়া থাকে।

তিন চার বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা একটা "জুমে" ফসল উৎপাদন করিয়া সেই জুম ও তৎসঙ্গে সেই বস্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পর্ব্বতে চলিয়া যায় ও পুনরায় নূতন বস্তি ও জুম নির্ম্মাণ করে।

স্বাধীন-ত্রিপুরার অধীন হালাম, টিপ্‌রা, কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য-জাতিরা ত্রিপুরার মহারাজাকে কোনও প্রকার কর প্রদান করিত না। ত্রিপুরার মহারাজার সহিত অন্যের যুদ্ধ বাধিলে ইহারা নিজেদের রসদাদি সহ উপস্থিত হইয়া মহারাজার পক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য। বর্ত্তমানসময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি মাত্রও নাই; এই জন্য ত্রিপুরার মহারাজা এই সব পার্ব্বত্য, অধীন জাতির নিকট হইতে নামমাত্র কর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন; তাহাতে উহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইয়া সেই বিদ্রোহ দমন করিবার পর উহাদের উপর অতি সামান্য কর ধার্য্য করিতে ত্রিপুরা-রাজসরকার সমর্থ হইয়াছিলেন।

টিপ্‌রাদের অনুমতি পাইয়াই আমরা তাহাদের ঘরের বারান্দাতেই আমাদের বিছানাগুলি বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গী লোকজনে সেই বস্তির সব ঘরগুলির বারান্দাই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক এক বারান্দার চারপাঁচজনের বিছানা পাতা হইয়াছিল।

সেদিন গল্প, আমোদ, স্ফুর্ত্তি খুবই চলিয়াছিল।

রাত্রিতে খাওয়ার পর ডাক্তারবাবু আমাদিগকে কিছু কিছু ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন; যাহাতে হিম লাগিয়া আমাদের অসুখ না করিতে পারে।

পরদিন আমরা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে বেলা হইয়া গেল। আমি উঠিয়া দেখি, প্রায় সকলেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া চা-পান করিতে সুরু করিয়াছেন। আমি যথাসম্ভব দ্রুত হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া চা-পান শেষ করিলাম।

আমাদের সকলের শরীরই সুস্থ আছে। এত অনিয়মেও কাহারও অসুখ করে নাই, ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

প্রভাতেই একটী লোককে পত্রসহ যে স্থানে হাতী বেড় দেওয়া হইয়াছে, তথায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণের নিকট প্রেরণ করা হইল। এই পত্রের উত্তর আসিলে আমরা তথায় রওনা হইব। সুতরাং আজ এই বস্তিতেই থাকিতে হইবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রাতের প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ আমাদিগকে কল্য প্রভাতেই তথায় রওনা হইতে লিখিয়াছেন।

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেই বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। প্রায় এগারটার সময় আমরা রওনা হইলাম। এবার হাতীর গলার ঘণ্টাগুলি খুলিয়া লওয়া হইল, যেন চলিবার সময় বেশী শব্দ না হয়।

সিপাই-বস্তি হইতে যেখানে হাতী বেড় দেওয়া হইয়াছে, সেস্থান প্রায় দশ বার মাইল।

কয়েক মাইল আসিয়া আমরা আর একটী বস্তি পাইলাম। ইহাই শেষ মনুষ্যবসতি। তারপর—সীমাশূন্য মহারণ্য। এ অরণ্য আরও গভীর, আরও

বেলা প্রায় ৩টার সময় আমরা "ভাতখাউরীর হাওড়ে" পৌছিলাম। যে স্থানে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন তাঁহাদের তাম্বু ফেলিয়াছেন, সেস্থান হইতে যেখানে হাতী "বেড়" দেওয়া হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধ মাইলেরও কিছু অতিরিক্ত। ইহা অপেক্ষা "বেড়ে"র অধিক নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করা নানাকারণে সঙ্গত নয়।

আমাদিগকে নামাইয়া দিয়াই মাহুতগণ সমস্ত হস্তীগুলিসহ তিন চার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া আড্ডা করিল।

নিকটে থাকিলে পালিত হস্তীর গন্ধ পাইয়া "বেড়ে"র মধ্যস্থিত বন্য-

হস্তীগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া "বেড়" হইতে জোর করিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা, সুতরাং সাবধান থাকা ভাল।

বন্য-হস্তীগণ পালিত হস্তীর গন্ধ বহুদূর হইতেই প্রাপ্ত হয়। পালিত হস্তী-গুলিও সেইরূপ বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বন্যহস্তীর গন্ধ পাইয়া ভীত হইয়া পড়ে।

বন্যহস্তী সহসা পালিতহস্তীর সহিত মিলিত হয় না। দেখিতে পাইলে দল বাঁধিয়া কিংবা সুবিধা বুঝিলে একাই পালিতহস্তীকে তাড়া করিয়া মারিতে আসে। পালিতহস্তীও বন্যহস্তীকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বন্যনরহস্তী পালিত হস্তিনীর সহিত ভিড়িয়া পড়ে। এই আকর্ষণ ও প্রলোভনের জন্য অনেক সময় বন্য "গুণ্ডা" হস্তী আপনা-দিগের স্বাধীনতা চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়া মানবের ক্ষমতাধীন থাকিয়া, মানুষের ইঙ্গিত ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া, তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধন করে ও চিরদিন দুঃখে বা তথাকথিত সুখে জীবন অতিবাহিত করে; কিংবা অনেক সময় "কুন্‌কী"র সহিত ভিড়িবামাত্রই হস্তীলীলা সংবরণ করিতে বাধ্য হয়।

আমরা হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া শুনিলাম যে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা বাবু, মহেশ বাবু (৺মহেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী) ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ "কোট্" তৈরি পরিদর্শন করিবার জন্য "পাতবেড়ের" নিকট গিয়াছেন। আমরাও তখন বেগে তথায় রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

# গুণরাজখাঁর একখানি পুঁথি

বহুদিন পূর্ব্বে আমি একখানি অতি প্রাচীন বাঙ্গালা হাতেরলেখা পুঁথি পাইয়াছিলাম। পুঁথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া উহার নাম জানিতে পারা যায় নাই। আজ পর্য্যন্ত উহার আর একখানি প্রতিলিপি আমার হস্তগত হয় নাই। উহা কঠিন যোগশাস্ত্রীয় পুঁথি। যোগশাস্ত্রের অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা,—যেমন মুদ্রাসাধন, আসন, লক্ষণ, ঈড়াপিঙ্গলাদি নাড়ীর বিচার, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি, দুরূহ বিষয়সমূহ উহাতে সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি এক হিসাবে সুন্দর ও মূল্যবান;

কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উভয়দিকেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুঁথিখানি আকারে ক্ষুদ্র এবং দেখিতে খুবই প্রাচীন বোধ হয়। উহার হস্তলিপি এতই সুন্দর যে, তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়। শেষ পর্য্যন্ত না থাকায় উহার প্রতিলিপি-কাল জানিবার উপায় নাই।

গুণরাজ খাঁ নামধেয় জনৈক জ্ঞানীলোক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইঁহাকে লইয়া বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচজন "গুণরাজ" পাওয়া গেল; যথা:—মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র, ষষ্ঠীবর সেন, "লক্ষ্মীচরিত্র" প্রণেতা গুণরাজ খাঁ, আর এই পুঁথির রচয়িতা গুণরাজ খাঁ। প্রথম তিনজনের পক্ষে গুণরাজ খাঁ রাজদত্ত উপাধি, আর পরবর্ত্তী দুইজনের পক্ষে গুণরাজখাঁ নাম বলিয়াই বোধ হয়। নিম্নে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" লেখক মালাধর বসু বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্যে একজন বিশেষ পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি কুলীনগ্রামের বিখ্যাত বসুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুপরিবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মালাধরের পৌত্র বসু রামানন্দও বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু আদিশূর আনীত দশরথ বসুর বংশীয়। তাঁহার বংশাবলী এইরূপ:—দশরথবংশীয় কৃষ্ণ বসু ( বল্লাল সেনের সমসাময়িক ), ২। ভবনাথ ৩। হংস, ৪। মুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর ৮। , ৯। যজ্ঞেশ্বর, ১০। ভগীরথ ১১। মালাধর বসু। মালাধর বসু হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ। তাহার পিতার নাম ভগীরথ বসু তার নাম ইন্দুবতী দাসী।

ৌড়েশ্বর হোসেন সাহ বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। সভায় রূপ, সনাতন ও পুরন্দর খাঁ সভাসদ ছিলেন; এবং হিন্দু ন একত্র হইয়া হিন্দু শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতেন। এই উদার-সম্রাটের প্রসাদ লাভ করিয়া মালাধর বসু তাঁহা হইতে গুণরাজ পাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ও তদীয় জ্ঞাতিভ্রাতা হোসেন সাহের গোপীনাথ বসু এক সময়ের লোক ছিলেন। এই গোপীনাথ বসুই ন সাহ হইতে "পুরন্দর খাঁ" উপাধি লাভ করিয়া তন্নামে পরিচিত গিয়াছেন।

হৃদয় মিশ্র নামক কবিরও 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি ছিল বলিয়া জানা যায়; কিন্তু অদ্য তাঁহার আর কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না।

কবি ষষ্ঠীবর সেন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি প্রসিদ্ধ পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা কবি গঙ্গাদাস সেনের সুযোগ্য পিতা। পদ্মাপুরাণের অনেকাংশ তদীয় লেখনীপ্রসূত। তাঁহারও গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল; কিন্তু সে উপাধি কাহার প্রদত্ত, বলিতে পারি না। তিনি প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। 'গুণরাজ খাঁ' নামক আর এক কবিরচিত "লক্ষ্মী-চরিত্র" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে তাঁহার যে ভণিতা আছে, তাহা এই :—

"গুণরাজ খানে ভণে শুন সর্ব্বজন।
পুরাণের মতে আমি করিলাম রচন॥"

আমাদের সমালোচ্য পুঁথির রচয়িতা গুণরাজ খাঁ প্রাগুক্ত চারি "গুণরাজ" হইতে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। শচীপতি মজুমদার নামধেয় কোন মহাত্মার আদেশে তিনি এই পুঁথিখানি রচনা করিয়াছেন। গুরুনিষেধ-বশতঃ কবি যেখানে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, সেখানে পাঠকগণকে

"ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে॥"

বলিয়া তদীয় গুরু "প্রমদন" নামক কোন যোগীর শরণ লইতে বলিয়াছেন। মুসলমান-কবি সৈয়দ সুলতানও ঠিক এই কারণেই তাঁহার "জ্ঞান-প্রদীপের" পাঠকগণকে

"কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ॥"

বলিয়া প্রেমানন্দ নামক কোন কোন যোগীর শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

গুণরাজ খাঁ স্বীয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে এরূপ ভণিতা দিয়াছেন :—

১। "গুরু প্রমদনের পায় রহোক ভকতি।
যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রীতি॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু।
প্রতাপে কেবল সূর্য্য দানে কল্পতরু॥

হেন শচীপতির পাই সন্নিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান ॥"

২। "এসব রহস্য যথ অদ্ভুত লক্ষণ।
গুরু আজ্ঞা না করিলেন করিতে পূরণ ॥
এ ভূত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
ফথুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ ॥
শুদ্ধকে আছয় এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনাগরী সুসাধু প্রচুর ॥
তথা গেলে জানিবা জে এই স্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথায় পূরিব আরতি ॥
সেই প্রমদনের চরণে যেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয় ॥"

৩। "এহা বুঝিবারে মনে যদি হয় আশ।
ফথুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ ॥"

সমালোচ্য পুঁথিতে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপেও" ঠিক সেই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সৈয়দ সুলতানের নিবাস কোথায়, ঠিক জানা না গেলেও তিনি যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সৈয়দ সুলতানের উল্লিখিত প্রেমানন্দ ও গুণরাজ খাঁর গুরু প্রমদন যেন একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বা তাঁহারা কে? শচীপতি মজুমদার এবং হরিদাস রায়ই বা কে? ফথুয়া বাজার, শুদ্ধক এবং করিপুর গ্রামই বা কোথায়? এ সকল আমরা কিছুই অবগত নহি। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ অবগত থাকিলে আমাদিগকে জানাইলে একান্ত বাধিত ও উপকৃত হইব।

আগেই বলিয়াছি, ইহা কঠিন যোগশাস্ত্রীয় পুঁথি। ইহাতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা আছে, তাহা সকলই গুরুগম্য ও নিগূঢ় তত্ত্বকথা;—সাধারণ পাঠকের তাহাতে প্রবেশাধিকার দুঃসাধ্য। গ্রন্থখানি কিরূপ, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে কয়েকটি স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

১। আর অদ্ভুত কহি এক গুটি কথা।
ষড়ঋতু বসতি করয় যথা তথা ॥

আধার চক্রেতে গ্রীষ্ম ঋতুর উদয়।
স্বাধিষ্ঠান চক্রে হয় বরিষা নিশ্চয়॥*
অনাহত চক্রেতে শরত ঋতু বৈসে।
বিশুদ্ধ চক্রের মাঝে হেমন্ত প্রবেশে॥
মণিপুর চক্রে হিম ঋতুর প্রকাশ।
তালুতে বসন্ত ঋতু নিশ্চয় নিবাস॥
এহার মধ্যেতে কর্ম্ম আছয় অদ্ভুত।
হেমন্ত বসন্ত ঋতু যেমতে সংযুত॥
নাভিতে বসন্ত চাপি তুলি দঢ় বন্দে।
তালু মূলে বসন্ত যে মিলিব আনন্দে॥
হেমন্ত বসন্ত যদি মিলয়ে যে গাটি।
দুহার মিলনে বায়ু নহে উজান ভাটী॥
সিদ্ধা সবে বলে এহা অভয়া বসন্ত।
এহারে সাধিলে তবে গুণের নাহি অন্ত॥
যুবক বয়সে এহা সাধে নিরন্তর।
নিশ্চয় হইবে সেই অজর অমর॥
বৃদ্ধ হইয়া এই কর্ম্ম সাধিবারে বৈসে।
পাকা চুল কাঁচা হয় এহার অভ্যাসে॥

২। কহি আর এক কথা শুন দিয়া মন।
কোটী কোটী যোগী মধ্যে জানে কোন জন॥
জল কুম্ভ আকাশেতে রহিছে কি লক্ষ্যে।
শমনে আধার আছে বায়ু করি ভক্ষ্যে॥
দীপ নির্ব্বাণ জ্যোতি কথা ( কোথা ) গিয়া রয়।
পিণ্ড অভাবে প্রাণ কথায় ( কোথায় ) বঞ্চয়॥
শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোন ঠাই যায়।
এই কায়া বিনে দুঃখ কোন জনে পায়॥
সুগন্ধি দুর্গন্ধ কথায় ( কোথায় ) করয় গমন।
নিদ্রা হয় কোন হেতু জাগায় কোন জন॥
একশত বিংশতি বৎসর আয়ুর নির্ণয়।
কি কারণে পঞ্চাশেতে ধাইটেতে মরয়॥

পণ্ডিত সকলে বোলে অধর্ম্মে সংহারে।
এমত হইলে তবে শিশু কেন মরে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানে না জানে মত্ততা।
পাপপুণ্য করিবারে না জানে ব্যবস্থা।
আর এক অপূর্ব্ব কথা যোগী সবে কয়।
অমাবস্যা দিনে চন্দ্র পূর্ণ কেন হয়॥
এসব রহস্য যথ অদ্ভুত লক্ষণ।
গুরু আজ্ঞা না করিলেন করিতে পূরণ॥
এভুত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
ফথুয়া রাজারে জল প্রমদনের পাশ॥

৩। এক দেব সেবা জান করিবা নিশ্চয়।
তাহাতে দেখিবা সর্ব্ব চরাচর ময়॥
আপনারে দেখ যেন পরেরে দেখিবা।
কদাচিত জীবজন্তু হিংসা না করিবা॥
অবিচারে নানা বস্তু দেখ ভিন্ন ভাব।
বিচারিলে আপ্ত মত সকল স্বভাব॥
মোর পুত্র-ভাই বোলি সংসার মরএ।
জথেক সম্পদ দেখ কার কেহ নয়॥
কার স্ত্রী কার পুত্র কার ধন জন।
অনিত্য সংসার পুনি নহে ত আপন॥
এহা জানি সতত চিন্তন কর ধর্ম্ম।
অনিত্য সকল জান নিত্য সেই ব্রহ্ম॥
চক্ষু হস্ত পদে তোমা করিবেক ঝুটা।
ধূর্ত্তে কাঠাল খাএ বোবের মুখে আঠা॥
এহা বুঝি নিরবধি ভাব সেই ব্রহ্ম।
সংসারে যথেক দেখ সব মিথ্যা ভ্রম॥

আর বেশী উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

বলিতে ভুলিয়াছি, আলিরাজার "যোগ কালন্দর" নামক গ্রন্থেও ঠিক এই পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত (২) চিহ্নিত অংশের কথা সেখ ফয়জুল্লা-কৃত "গোরক্ষবিজয়" পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়।

আবদুল করিম।

# জীবনের মূল্য

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### গৌরী-সংবাদ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাহের দিন স্থির করিয়া দিলেন—৫ই জ্যৈষ্ঠ। কন্যার পিতা জগদীশ চট্টোপাধ্যায় ইহা শুনিয়া বলিলেন, সে ভালই হইবে, ততদিন গ্রীষ্মের বন্ধে হরিপদও বাড়ী আসিবে।—হরিপদ ইঁহার এক মাত্র পুত্র, কলিকাতায় থাকে, প্রাইভেট মাষ্টারী করিয়া কলেজে বি, এ পড়ে।

পূর্ব্বে পটলিকে গিরিশবাবু অনেকবারই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সে ছেলেমানুষ। এদিকে বৎসরখানেকের মধ্যে সেদিন সেই একবারমাত্র দেখিয়াছেন—যেদিন রাত্রে স্বপ্ন হইল। সেও দূর হইতে এক নজর মাত্র দেখা—সে দেখা কোনও কাযেরই নয়। একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার বাসনা মুখোপাধ্যায়ের মনে বড়ই প্রবল হইল।—আর কিছু নয়, সে-জন্মের চেহারাটির সঙ্গে এ-জন্মে কোথাও কিছু মিল আছে কি না—ইহাই তিনি না কি জানিতে চান। অন্ততঃ গত পরশ্ব সতীশ দত্তের নিকট এইরূপই তিনি বলিয়াছিলেন। সতীশ বলিয়াছিল, "মাঝেমাঝে আমার বৈঠকখানায় এসে যদি বসেন, তবে অনায়াসেই তাকে দেখ্‌তে পান। আমাদের বাড়ী প্রায়ই ত সে আসে।"—কিন্তু গিরিশ বাবু যাইতে পারিতেছেন না। কেহ যদি গোপন উদ্দেশ্যটি বুঝিতে পারে, কি মনে করিবে? ছি!

আজ বেলা নয়টার সময় বাজার করিয়া চাকরের মাথায় জিনিষ দিয়া মুখোপাধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথে সতীশ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সতীশ তাহার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরহরি মোদকের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। ইঁহাকে দেখিয়া বলিল—"মুখুয্যে মশায় যে, প্রাতঃপ্রণাম। বাজার করে ফিরছেন? আসুন আসুন, এক ছিলিম তামাক খেয়ে যান।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"না ভাই, এখন বসব না, তাহলে গঙ্গাস্নানে যেতে বেলা হয়ে যাবে। রোদ্দুরের তেজটা ভারি বেড়েছে।"

"কতই আর দেরী হবে?—এক ছিলিম তামাক খাবেন বৈ ত নয়।"—বলিয়া, নরহরিকে বিদায় দিয়া, বৈঠকখানায় আনিয়া সতীশ তক্তপোষের উপর

তাঁহাকে বসাইল। তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—"কাল, পরশু বিকেল থেকে সন্ধে পর্য্যন্ত হা পিত্যেশ্ করে বসে রয়েছি—আপনি এই আসেন, এই আসেন—"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হ্যাঁ—সময়ই পাইনে ভাই।" বলিয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়া রহিলেন।

বামহস্তে কলিকা, দক্ষিণহস্তে অগ্নিসংযুক্ত টিকাখানি সঘন আন্দোলন করিতে করিতে, মুখোপাধ্যায়ের কাণের কাছে মুখ আনিয়া সতীশ বলিল—"এসেছিল—কাল।"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সতীশ বলিল—"আপনার পটুলি। কাল বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি, আমাদের বাড়ীতে বসে রয়েছে! মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।"

"কি কথা হচ্ছিল?"

"বলি। শুনে ত মশাই, অবাক্।"—বলিয়া টিকা ভাঙ্গিয়া কলিকায় দিয়া, মেঝের উপর সেটি রাখিয়া সতীশ হাত ধুইয়া ফেলিল। পরে ব্রাহ্মণের হুঁকার উপর কলিকাটি বসাইয়া, ফুঁ দিয়া বেশ করিয়া ধরাইয়া, "খান" বলিয়া হুঁকাটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিল।

হুঁকা লইয়া মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা হে সতীশ?"

"বলি"।—বলিয়া সতীশ তক্তপোষের উপর বসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া, মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল—

"কাল চারটের পর ইস্কুল থেকে এসে, কাপড়-চোপড় ছাড়ছি, পাশের ঘরে কার গলার শব্দ শুনলাম—ছেলে মানুষের গলা—মার সঙ্গে কে কথা কইছে। বউকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কে গা?' বউ বল্লে—'ঐ ওদের পটুলি।' বউকে বল্লাম না, মনে মনেই ভাবলাম, ভালই হল। কাল ত মুখুয্যে মশাই এলেন না, আজ যদি আসেন, পটুলি বাড়ী ফেরবার সময় যখন দরজা দিয়ে বেরুবে, তখন বৈঠকখানা থেকে দেখাব তাঁকে। তারপর মুখহাত ধুয়ে, ঘরে এসে বসেছি, বউ জলখাবার আনতে গেছে, এমন সময় পায়ের আওয়াজে বুঝতে পারলাম, পাশের ঘর থেকে মা পটলিকে নিয়ে বেরুলেন। মাদুর পাতা হল, তারও শব্দ শুনলাম। কথায়বার্ত্তায় বুঝলাম, মার কাছে পটুলি চুল বাঁধতে এসেছে।"

মুখোপাধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত সতীশের কাহিনী শুনিতেছিলেন।

সতীশ দেখিল, কলিকাটা নিবিয়া যায়। "দিন, আমি ধরাই"—বলিয়া কলিকাটি লইয়া, নিজের হুঁকায় বসাইয়া, টানিতে টানিতে আবার আরম্ভ করিল—

"তারপর, বুঝেছেন, হটাৎ কাণে গেল, মা তাকে ঠাট্টা করে বলছেন—সম্পর্কে নাতনী হয় কি না—বলছেন, 'হাঁালা পটলি, বুড়োবরের সঙ্গে ত তোর বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছে। ৫ই জষ্টি বিয়ে হবে শুনলাম। তা, বুড়োবরকে তোর মনে ধরবে ত লো?' পটলি যা জবাব দিলে, শুনে ত মশাই আমি অবাক্।"—বলিয়া সতীশ ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্লে?"

সতীশ কলিকাটি মুখোপাধ্যায়ের হাতে দিয়া বলিল—"আপনি ত বিজ্ঞ হয়েছেন, লেখাপড়া জানেন, কত দেখেছেন, কত শুনেছেন—আপনি বলুন দেখি এ কথার কি উত্তর?"

কয়েক টান তামাক টানিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"তা কি করে বলব?"

সতীশ বলিল—"কি বল্লে জানেন?—বল্লে, 'ঠাকুমা, তোমার বরও ত বুড়ো হয়েছেন—তোমার বরকে কি তোমার মনে ধরে না?'—মা হেসে বল্লেন, 'আমার বর কি চিরকালই বুড়ো ছিলেন?' পটলি বল্লে—'আমার উনিই কি চিরকাল বুড়ো ছিলেন'?"

সতীশ কিয়ৎক্ষণ মুখোপাধ্যায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, তিনি বেশ খুসী হইয়াছেন। অবশেষে বলিল—"একবারে হুবহু কুমারসম্ভব মশাই, হুবহু কুমারসম্ভব।

ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাং
শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ॥

—কাব্যে পড়েছিলাম, স্বচক্ষে দেখ্‌লাম। আচ্ছা, পটলির ঐ কথার ভিতরকার গূঢ় রহস্যটি কি, তা বুঝতে পেরেছেন আপনি?"

"গূঢ় কথা আবার কি?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় হুঁকা নামাইলেন।

সতীশ গম্ভীর ভাবে বলিল—"হটাৎ বুঝতে পারা শক্ত। আমিও পারিনি। অনেক ভেবেচিন্তে তবে পেরেছি। তাও পেরেছি—ভিতরকার কথাটি জানি বলে—আপনি সেই স্বপ্নের ব্যাপারটি আমায় খুলে বলেছেন বলে—নইলে আমারও সাধ্য ছিল না বোঝবার।"

মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া সতীশের মুখপানে চাহিলেন। সতীশ বলিল—"আমার মার সঙ্গে ও যে নিজের উপমা দিলে,—কেন? আমার মার বয়স পঞ্চাশের উপর হয়েছে—বাবার বয়স যাট বছরের কাছাকাছি। তবে, মার সঙ্গে ও নিজের উপমা দেয় কেন? উপমান আর উপমেয়, দুটো জিনিষ আছে ত? আজকেই ত ক্লাসে ছেলেদের পড়াচ্ছিলাম। দণ্ডী বলেছেন—'যথা কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে উপমা নাম সা।'—উপমান আর উপমেয়ের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য থাকা চাই ত? - আমার মার সঙ্গে ওর নিজের সাদৃশ্য কোন্ খানে?"

কোন্ খানে তাহা মুখোপাধ্যায় কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং নিস্তব্ধ রহিলেন। সতীশ তখন স্মিতমুখে বলিল—"পটলি যে কথা আমার মাকে বল্লে, তার ভাবার্থ এই। তোমার স্বামী তোমার কাছে যেমন ভক্তি, ভালবাসার পাত্র—আমার স্বামীও আমার কাছে ঠিক সেই রকম। তোমার স্বামী যখন যুবাপুরুষ ছিলেন, তখন তুমি তাঁকে যেমন ভালবাসতে, ভক্তিশ্রদ্ধা করতে, এখন তিনি বুড়ো হয়েছেন এখনও তেমনি করছ। তেমনি আমিও, আমার স্বামী যখন যুবা ছিলেন, তখন তাঁর প্রতি আমার মনের ভাবটি যেমন ছিল, এখন তাঁর বয়স হয়েছে বলে কি সে ভাবের পরিবর্ত্তন হতে পারে?—সুতরাং পাকে-প্রকারে পটলি বল্লে—ইনি যখন যুবা ছিলেন, তখনও আমার স্বামী ছিলেন, এখন ত আমার স্বামী। ঠিক কুমারসম্ভবের গৌরী—কোনও তফাৎ নেই।—বলুন, পটলির জবাবটার—এ ছাড়া অন্য অর্থ হতে পারে কি না?—আমি বলি, পারে না। অন্য অর্থ হওয়া অসম্ভব।"

তামাক খাইতে খাইতে এই মিষ্ট কথাগুলা গিরিশ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"তোমার মা-ঠাকরুণের সঙ্গে নিজের যখন তুলনা ও দিয়েছে—তখন ঐ রকম অর্থই দাঁড়ায় বটে।"

গর্ব্ববিস্ফারিত চক্ষে সতীশ বলিল, "শুধু কি তাই? তারপর মা হেসে বল্লেন, 'না লো পটলি, গিরিশ বুড়ো হবেন কেন? আমি তোর মন বোঝবার জন্যে ঠাট্টা করে বলেছিলাম। সুশৃঙ্খলে বিয়েটি হয়ে যাক, তোরা বেঁচেবর্ত্তে থাক; নারায়ণ যদি দেন, তোরই দশটা ছেলে মেয়ে হবে এখন।'—একথায় পটলি কি উত্তর করলে জানেন?"

পাধ্যায় বলিলেন—"কি?"

।—'ঠাকুমা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমার নরেন সুরেন বেঁচে থাকুক—

আর আমার ছেলে মেয়ে চাইনে। নরেন সুরেনের জন্যে ছুটি ভাল মেয়ে সন্ধান কোরো ঠাকুমা—বছর খানেকের মধ্যেই আমি ওদের বিয়ে দেব'।"

শুনিবামাত্র সেই স্বপ্নদর্শন ব্যাপার মুখোপাধ্যায়ের মনে পড়িয়া গেল। নরেন সুরেনের বধূ লইয়া সেই স্বপ্নদৃষ্টা প্রথমাপত্নী ঘরকন্না করিবার বাসনা জানাইয়াছিলেন বটে।

সতীশ বলিতে লাগিল—"একবার জোর দেখুন। আমি নরেন সুরেনের বিয়ে দেব। কারু সঙ্গে পরামর্শ, কারুর অনুমতিরও অপেক্ষা নেই। পূর্ব্বজন্মের মা না হলে কি এমন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় মশাই?"

মুখোপাধ্যায় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঠিক কথাই ত। নরেন সুরেনের নাম করিল, পুঁটু বুচির কিন্তু নাম করিল না। করিবে কেন? সতীনের মেয়ের উপর কি স্নেহ হয়? মুখোপাধ্যায় স্থির করিলেন, আজ রাত্রে দ্বিতীয়া-পত্নীকে লিখিত সেই পত্রগুলি নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে হইবে।

ইহার পর দুইজনে বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য কথাও হইল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"বিবাহ করছি বলে গ্রামসুদ্ধ লোকের বুকে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে।"

সতীশ বলিল—"বলেন কেন? এ গ্রামে, কেউ কি কারু ভাল দেখ্‌তে পারে? কারু ভাল শুন্‌লে বুক ফেটে মরে। বিপদে আপদে, টাকা ধার দিয়ে উপকার না করেছেন, এমন লোক ত গ্রামে দেখ্‌তে পাইনে। আপনার প্রতি সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু উল্টো মশাই—উল্টো। কাল রাত্রে খুব শুনিয়ে দিয়েছি আমি।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কি রকম?"

"কাল ঐ আপনার অপেক্ষায় সন্ধে অবধি বসে রইলাম। পটলি ত চুল টুল বেঁধে বাড়ী চলে গেল। সন্ধের পর গেলাম ভট্‌চায্যিপাড়ায় বেড়াতে। সিধু ভট্‌চায্যির বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, অনেকেই রয়েছে। বস্‌লাম। একথা সেকথার পর, আপনার বিয়ের কথা তুলে তারা হাসি-মস্করা আরম্ভ করে দিলে। যাদব ভট্‌চায্যি বল্লে—বুড়োবয়সে গিরিশ মুখুয্যের এ কেলেঙ্কারি কেন? বলে এক সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালে।"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্লোকটা কি?"

"ঐ একটা উদ্ভট শ্লোক আছে—

পাণৌ গৃহীতাপি পুরস্কৃতাপি
স্নেহেন নিত্যং পরিবর্দ্ধিতাপি।
পরোপকারায় ভবেদবশ্যং
বৃদ্ধস্য ভার্য্যা করদীপিকেব॥

এর মানে হচ্ছে—"

মুখোপাধ্যায় বাধা দিয়া বলিলেন—"চুলোয় যাক্ ওর মানে। তুমি কি বল্লে ?"

"আমি বল্লাম, যাদব, যা বলছ তা ঠিক। কিন্তু গিরিশ মুখুয্যেকে বৃদ্ধ বলছ কোন্ হিসাবে ?" যাদব বল্লে, 'কেন ? পঞ্চাশ বছর বয়স হতে চল্ল, বৃদ্ধ হয়নি ?' —আমি বল্লাম, বৃদ্ধ কাকে বলে তা জান ? দুটো উদ্ভট শ্লোক মুখস্থ করে খালি উপর-চালাকি মেরে বেড়াও বৈ ত নয়। বৃদ্ধ কাকে বলে শোন—

আষোড়শাৎ ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্তস্তেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥

সত্তর বছরের উপর যার বয়স, তাকেই বৃদ্ধ বলে, নব্বই বছর বয়স হলে তাকে বর্ষীয়ান্ বলে। স্মৃতির বচন এ—খবর রাখ ?"

মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন—"খুব জব্দ করেছ ত যাদু ভট্‌চায্যিকে! কি বল্লে ?"

সতীশ সদর্পে বলিল—"বলবে আর কি ? জবাব আছে ? খোতা মুখ ভোঁতা হয়ে বসে রইল। তারপর আপনার গিয়ে ঐ চক্রবর্ত্তী—কি নামটা ভাল, যার বারোমাসই সর্দ্দি লেগে আছে—"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—মাধব, সেও

"ছিল বৈ কি! সে বল্লে—বেশত, সত্তর বছর পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যেতে হয় একথা আমাদের শাস্ত্রে ও পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে, বনে যাবার আয়োজন ন হয়েছেন, এ কি রকম ?—শুনে, মনে কর্‌লাম একটু তা আমি কায়েথের ছেলে, অত শাস্ত্রটাস্ত্র ত জানিনে বিজ্ঞ সব পণ্ডিত রয়েছেন—হ্যাঁ মশাই, সত্যিই কি বয়স হলে বনে যেতে বলে ?—সিধু ভট্‌চায্যি বল্লে বলেছে। আমি বল্লাম তবে গিরিশ মুখুয্যে মশায়ও

বনে যাচ্ছেন। সকলে বলে উঠল—'কি রকম, বনে যাচ্ছেন কি রকম?' আমি বল্লাম—ভট্‌চায্ মশায়গণ, আমি বেশী কিছু জানি শুনিনে। সামান্য একটু সংস্কৃত পড়েছি—তারই জোরে আর আপনাদের কৃপায় ইস্কুলে সেকেন্ পণ্ডিতী করছি—মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পাই। একটি শ্লোক আমি বলি—শুনে আপনারা বিচার করুন, মুখুয্যে মশাই বনেই যাচ্ছেন কিনা। শ্লোকটি হচ্ছে—

মারবাণভয়তো মনোমৃগঃ
সংবিবেশ নবযৌবনে বনে।
তত্র দৃষ্টিবিশিখেন হন্যতে
কাতরে তব কৃপা ন জায়তে॥

—শুনে ভট্‌চায্যিরে হো হো করে হেসে উঠল।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কি কি? শ্লোকটি কি? ওর মানে কি?"

সতীশ বলিল—"নায়ক, নায়িকাকে বলছেন, কন্দর্প-বাণের ভয়ে আমার মনরূপ মৃগ তোমার নবযৌবনরূপ বনের মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু সখি, তুমি এমনি নিষ্ঠুর যে, সে বেচারিকে নয়নবাণের দ্বারায় বিদ্ধ করছ?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"বাঃ বাঃ—বেশ শ্লোকটি ত হে—উটি আমায় লিখে দাও।"—বোধ হয় ভাবিলেন, সময়ে ইহা কাযে লাগিতে পারে।

সতীশ, কাগজ পেন্সিল লইয়া শ্লোকটি লিখিয়া মুখোপাধ্যায়কে দিল। মুখোপাধ্যায় হাসিতে হাসিতে সেটি পড়িতে লাগিলেন।

বাহিরের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল—"উঃ, পেয়ারা গাছের তলায় রোদ্দুর এসেছে যে, দশটা।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কেন? বাজলেই বা দশটা। আজত তোমাদের ইস্কুলবন্ধ। আজ থেকে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি না?"

"আজ্ঞে, একবার পোষ্ট আপিসে যেতে হবে—ভারী জরুরী একখানা চিঠি আসবার কথা। চিঠিখানার জন্যে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন আছে।"

"আচ্ছা—বেলা হল, আমিও তবে উঠি।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাড়ী গিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, তাঁহার গঙ্গাস্নানে বাহির হইতে বেলা এগারোটা বাজিল। এত বেলা তিনি একদিনও করেন না। চৈত্রশেষের এই যে চাঁদিফাটা রৌদ্র, তাহাও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আজ মিষ্ট লাগিতে লাগিল,

কারণ সারাপথ তিনি মনে মনে সতীশের কথিত সেই মিষ্ট সংবাদগুলি আলোচনা করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে বলিতেছিলেন—মারবাণভয়তো মনো-দ্রুগঃ ইত্যাদি।

বিকালে হঠাৎ সতীশ তাঁহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত। মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া বলিল—"মুখুয্যে মশাই– আমি বড় বিপন্ন।"

প্রকাশ পাইল, অদ্য ডাকের চিঠিতে সংবাদ আসিয়াছে, শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত জোৎজমাগুলি—সতীশই যাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী—একজনের ডিক্রীর দায়ে নীলামে উঠিয়াছে। ডিক্রীদারকে এখনি ৫০০৲ দিলে বিষয়গুলি রক্ষা পায়—অনেক টাকার বিষয়। সতীশ বলিল—তাহার হাতে কিছুই নাই—সারা দুপুর রৌদ্র মাথায় করিয়' নানা স্থানে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই ধার দিলনা। এখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদি রক্ষা করেন।

মুখোপাধ্যায় বাড়ীর ভিতর গিয়া লোহার সিন্দুক হইতে ০০৲ বাহির করিয়া আনিয়া সতীশের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

সতীশ বলিল—"এক আনার টিকিট আমি সঙ্গেই এনেছি। একখানা কাগজ দিন, হ্যাণ্ডনোট একখানা লিখে দিই। সুদটা কত হিসাবে—"

মুখোপাধ্যায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা পাগল তুমি ত হে! তোমার কাছে আমি হ্যাণ্ডনোট্ নেব? সুদ নেব?—নিয়ে যাও টাকা—যখন পার দিও।" —এতাদৃশ বন্ধুবাৎসল্য জীবনে আর কখনও কাহারও প্রতি তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

সতীশ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—"আমি কায়েথ, আপনি বামুন, তাতে বয়োজ্যেষ্ঠ—কি আর বলব—ভগবান করুন হর-গৌরীর পুনর্ম্মিলনটি যেন শীগ্‌গির হয়।"—বলিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি এবং তদপেক্ষা সারবান্ টাকার পুঁটুলি লইয়া সতীশ হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### রসগোল্লা ও ক্ষীরমোহন।

ওদিকে "গৌরী" কিন্তু "হরের" উদ্দেশে এমন সকল প্রণয়োক্তি করিতেছিল যাহা কুমারসম্ভবে নাই, শিবপুরাণেও নাই। প্রভাবতী ওরফে পটুলি তাহার প্রবীণ হৃতাকাঙ্ক্ষীর প্রতি "হতুম্ খুমো", "ঘাটে গমানে", "হতভাগা মিন্সে"

প্রভৃতি কর্ণরসায়ন উপনামগুলি সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিতে লাগিল। অবশ্য এ সকল তাহার বয়স্থা সখীদেরই সম্মুখে। কিন্তু তাহার পিতামাতাও ক্রমে জানিতে পারিলেন, এ বিবাহে মেয়ের বিষম আপত্তি। কিন্তু উপায় কি? প্রভা মুখখানি সর্ব্বদা বিরস করিয়া থাকে, তাহার খাওয়া অর্দ্ধেক কমিয়া গেল, চোখের কোলে কালী পড়িল। দেখিয়া তাহার মা গোপনে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিবৃত সতীশ দত্তের "গৌরীসংবাদ" সমস্তই তাহার স্বকপোলকল্পিত।

বাবুপাড়ায় জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের একতালা বাড়ীখানির এখন একেবারেই ভগ্নদশা। বাহিরে এবং ভিতরেও দেওয়াল হইতে সমস্ত চুণবালি অনেকদিন খসিয়া পড়িয়াছে। ইঁটের গায়ে নোনা লাগিয়া জোড়ের মুখগুলি ফাঁক হইয়া গিয়াছে। ভিতরে কোনও ঘরে বসিলে মনে হয় দেওয়ালগুলা দাঁত বাহির করিয়া যেন গিলিতে আসিতেছে। দরজা ও জানালার কবাটগুলার প্রায় সিকি ভাগ উইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। অঙ্গনের তিন দিকে যে প্রাচীর ছিল, তাহাও স্থানে স্থানে ভগ্ন। যেখানে যেখানে বন্ধ না করিলে বাড়ী নিতান্ত বে-আব্রু হইয়া যায়, সেখানে সেখানে ছিটাবেড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, অন্যত্র গোরু ছাগল আট্‌কাইবার জন্য কাঁটার ডাল পুঁতিয়া পুঁতিয়া দেওয়া আছে।

জগদীশের বয়ঃক্রম এখন পঞ্চাশৎ বর্ষ। পূর্ব্বে সুন্দরবনে কোনও জমিদারের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, দশটি টাকা বেতন ছিল। দুই পয়সা উপরিপাওনাও ছিল। প্রতি বৎসর পূজার সময় একবার বাড়ী আসিতেন, একমাস থাকিতেন। পৈত্রিক দশবিঘা মাত্র ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, আর দশ বিঘা খাজনার জমি জগদীশ ক্রয় করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে তাঁহার চাকরি নাই, বাড়ীতেই বসিয়া আছেন। এই কুড়ি বিঘা জমিই এখন তাঁহার একমাত্র জীবনোপায়। ষোল আনা ফসল পাওয়া গেলে বৎসরের খরচ চলিয়া যায়, জমিদারের খাজনাও সঙ্কুলান হয়। কিন্তু যে বৎসর অজন্মা হয়, সেই বৎসরই বিপদ—ঋণ করিতে হয়। ঋণের জন্য এই ভাঙ্গাচুরা বসত-বাটীখানি এবং ব্রহ্মোত্তর জমিগুলি গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের নিকটেই বন্ধক পড়িয়া আছে। প্রভার বিবাহ হইলে বন্ধকী দলিলগুলি ফেরৎ দিবেন, মুখোপাধ্যায় এ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে জগদীশের পুত্র হরিপদ আজ বাটী আসিয়াছে। সে প্রভার অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের বড়, গোঁফের রেখা উঠিয়াছে, বড় শান্ত ও সচ্চরিত্র। গ্রামের ইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশটাকা

বৃত্তি পায়, তাহাই সম্বল করিয়া কলিকাতায় গিয়া, প্রাইভেট্ মাষ্টারী যোগাড় করিয়া সে এফ্ এ পড়িতে থাকে। গত বৎসর পাস হইয়াছে কিন্তু বৃত্তি পায় নাই। অনেকে, এমন কি তাহার পিতা পর্য্যন্ত, পড়া ছাড়িয়া চাকরির অনুসন্ধান করিতে তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সে শোনে নাই। আবার কলিকাতায় গিয়া প্রাইভেট্ মাষ্টারী যোগাড় করিয়া সে বি এ পড়িতেছে।

এখন জগদীশ বাবুর এই এক ছেলে, এক মেয়ে। অপরাপর সন্তানসন্ততি যাহা হইয়াছিল, শিশুকালেই মারা গিয়াছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে ও পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া হরিপদ তাহার বোন্‌টিকে বড় যত্ন করিয়া লেখাপড়া শেখায়। প্রতিবারই বাড়ী আসিবার সময় প্রভার জন্য দুই একখানি ভাল বহি, দুই একটি সস্তা বডি ও শেমিজ প্রভৃতি দ্রব্য আনয়ন করে' বেশী পারে না, কোথায় পাইবে? প্রভাও দাদা বলিতে অজ্ঞান।

হরিপদ আসিয়াই ভগ্নীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। দেখিল তাহার সে আনন্দময় হাসি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই, দেহখানিও কৃশ হইয়া গিয়াছে। হরিপদ বলিল—"প্রভা, তুই এমন রোগা হয়ে গেলি কেন? অসুখ বিসুখ কিছু করেছিল না কি?"

প্রভা বলিল—"না, অসুখ করে নি।"

"তবে? তোর মুখ এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কেন?"

"কি জানি।"—বলিয়া প্রভা অন্যত্র গেল।

হরিপদ তখন জননীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল; তিনি বলিলেন—"কি জানি বাছা, বিয়ের কথা হয়ে অবধি প্রভার ঐ রকম চেহারা খারাপ হয়ে গেছে।"

হরিপদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"প্রভার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে না কি? কোথায়? কার সঙ্গে?"

"ঐ ও-পাড়ার গিরিশ মুখুয্যের সঙ্গে।"

"গিরিশ বাবু? নরেনের বাপ?"

"হ্যাঁ।"

হরিপদ উত্তেজিত হইয়া বলিল "বল কি মা?—গিরিশ মুখুয্যের সঙ্গে প্রভার বিয়ে? তুমি মত দিয়েছ? বাবা মত দিয়েছেন? গিরিশ বাবু যে বাবার বয়সী!"

মা বামহস্তের অঙ্গুলি দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন—"মতামত আর কি? ভাল পাত্তর পেলে কারু কি ইচ্ছে যে বুড়ো বরের সঙ্গে দেয়? উপায় কি, জাত যায় যে।"

হরিপদ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্তই ঠিকঠাক হয়ে গেছে নাকি?"

"তা—হয়েছে বৈকি। ৫ই জষ্টি বিয়ের দিন স্থির হয়েছে।"

"আশীর্ব্বাদ ত হয়নি এখনও?"

"না।"

হরিপদ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"মা, এমন কাযটি কোরো না; প্রভাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিওনা। আহা, ও বালিকা। পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিলে ওর কি সুখ হবে মা?"

মা বলিলেন—"কেন বাবা, অমন বড়লোক—কত টাকা, বিষয় সম্পত্তি—সুখ হবে না কেন?"

হরিপদ বলিল—"মা, তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্লে? টাকা বিষয় সম্পত্তিতেই কি স্ত্রীলোকের সুখ?"

মা বলিলেন—"তা বটে বাবা। আমি কি তা বুঝিনে? সবই বুঝি। কিন্তু উপায় কি? গিরিশ যখন প্রভার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন, তখন আমরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। শেষে, ওনার মত হল। গিরিশ বল্লেন তোমাদের বাড়ী জমি যা কিছু আমার কাছে বন্ধক আছে, সমস্তই ফিরে দেব, প্রভাকে দুহাজার টাকার অলঙ্কার দেব—বিয়েতে তোমাদের একটি পয়সাও খরচ হবে না—তোমাদের খরচের টাকাও আমি দেব। এই সব শুনেই উনি মত করলেন—শেষে আমাকেও মত দিতে হল। কি করি?"

হরিপদ বলিল—"মা কেবল টাকার লোভে মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেবে? তোমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ঐ একমেয়ে। এ বিয়ের কথা শুনে ওর কতদূর মনঃকষ্ট হয়েছে তা বুঝতে পারছ। এমন কাজ কোরো না মা।"

মা বলিলেন—"সাধে কি করছি বাছা? প্রভার যেঠের কোলে চৌদ্দ বছর বয়স হল, এত চেষ্টা করা গেল, মনের মত পাত্তর ত একটিও জুটল না। মনের মতন পাত্তর যা পাওয়া গেল, কেউ দুহাজার চায়, কেউ পাঁচ হাজার। পাঁচ কড়ার ক্ষ্যামতা নেই, কি করি বল্?"

হরিপদ বলিল—"মা, আমি যদি অন্য পাত্র যোটাতে পারি?"

"যোটাতে পারিস্ ত এতদিন যোটাস নি কেন বাবা? আজ দুবছর থেকে পাত্তর খুঁজে খুঁজে মরছি।"

"যদি এমন একটি পাত্র জোটাতে পারি, যে গরীব, কিন্তু লেখাপড়া জানে, সচ্চরিত্র, অল্প বয়স—তা হলে এ বিয়ে বন্ধ কর্‌বে?"

"তা করব বৈ কি। কিন্তু যোটা ত আগে। না যদি পারিস, তবে এটিও যাবে, তখন দশা হবে কি?"

হরিপদ বলিল—"৫ই জ্যৈষ্ঠ ত তোমাদের দিনস্থির হয়েছে। আমি যদি বৈশাখ মাসের মধ্যে যোটাতে পারি, তবে বৈশাখে বিয়ে দেবে ত?"

"তা দেব না কেন? এখনও আশীর্ব্বাদও হয় নি, কিছুই না। কিন্তু খরচ?"

"ধর, সে পাত্রকে যদি একপয়সাও না দিতে হয়।"

"নিজেদের খরচ আছে ত?"

"গাঁ-সুদ্ধ লোককে যে খাওয়াতেই হবে, এমন ত কোনও কথা নেই। আমরা কাউকেই যদি না খাওয়াই। পুরুতের দক্ষিণে, নাপিতের বখশিস্, কাপড়টা চোপড়টা—পনেরো কুড়ি টাকার মধ্যেই সব হয়ে যাবে। কেন হবে না মা?"

"আচ্ছা, ওনাকে বলি, উনি কি বলেন দেখি"—বলিয়া জননী কার্য্যান্তরে গেলেন।

হরিপদ পাঁজি আনিয়া দেখিল, বৈশাখে বিবাহের অনেকগুলি দিন আছে। ২৫শে বৈশাখ শেষ দিন। তারিখগুলি সে কাগজে টুকিয়া লইল।

বিকালে মস্ত এক চাঙারী মাথায় করিয়া এক ঝি আসিয়া চট্টোপাধ্যায়-গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল, কনের ভাই আসিয়াছেন শুনিয়া গিরিশবাবুর পিসিমাতা যৎসামান্য কিঞ্চিৎ উপহারদ্রব্য পাঠাইয়াছেন। একহাঁড়ি রসগোল্লা একহাঁড়ি ক্ষীরমোহন, এক এক জোড়া ধুতি ও শাড়ী, দুই বাক্স সাবান, দুইশিশি গন্ধতেল, দুইশিশি সুগন্ধি চাঙারী হইতে নামাইয়া ঝি বারান্দায় রাখিল।

এই সকল দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া হরিপদ তাহার মাতাকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া বলিল—"মা, ফিরে দাও ওসব।"

মা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরিপদ বলিল—"ভাবছ কি?"

মা বলিলেন—"ভাবছি, কোথায় কি তার ঠিকানা নেই, এখনই থেকে ভাঙ্গাভাঙ্গিটে করব? তুই বাছা এই বৈশাখের মধ্যে একটি ভাল পাত্তর আন্‌তে পারিস্‌, বিয়ে দেব বল্‌ছি ত।"

হরিপদ রাগে গস্‌ গস্‌ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় জলখাবারের রেকাবীতে সেই রসগোল্লা ও ক্ষীরমোহন দেখিয়া, ছুঁড়িয়া সেগুলি উঠানে ফেলিয়া দিল। মুড়ি চাহিয়া লইয়া জলযোগ সম্পন্ন করিয়া, ছুটির তিন দিন বাকী থাকিতেই, পরদিন প্রভাতে কলিকাতায় যাত্রা করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

# আমোদিনী

তেমনি কুসুমে ঢাকা
তেমনি প্রভাত মাখা
মধু আলো মধু ছায়াময়;
তেমনি অলস বায়
আলুথালু বহে যায়
বনলক্ষ্মী সুখে শিহরয়।
লতা হ'তে লতান্তরে
তেমনি ভ্রমরা উড়ে
স্বপ্ন-পাখা তেমনি বিস্তারি,
কোকিল তেমনি স্বরে
আনন্দ বেদনা ভরে
মর্ম্ম হাঁকে, চাপিতে না পারি'
দু'ধারে শ্যামল তরু
মাঝখানে পথ সরু
পূর্ব্বদিকে চলিছে অধীর,
পথ যেন গিয়াছেরে
কোথা আছে খুঁজিবারে
অরুণের কনক মন্দির;

যাই যদি এই পথে
পাইব কি মনোরথে
পথ শেষে বাসনার শেষ ?
কল্পনা-শোভন দেশে
ফিরিব কি স্বপ্নাবেশে
যে স্বপন—সত্যেরই আবেশ ?
সে স্বপ্নের প্রণোদনে
বিলাস-উদাসমনে
অগ্রসরি' অলস চরণে,
সৌরভ-গৌরবে ভরা,
শোভায় মায়ায় ঘেরা,
আসিনু কি কল্পনা-কাননে ?
আলো যথা প্রসারিয়া
প্রতি সীমা ছাড়াইয়া
দেয় ভরি' আকাশ মেদিনী ;
হাস্যে লাস্যে ছড়াইয়া,
যেন প্রভাতের হিয়া,
কুতূহলে খেলে আমোদিনী।
অরুণ আলোক লুটে
কুসুম-কোরক ফুটে
ফুটে উঠে মরমের বাণী।
আনন্দে উচ্ছল প্রাণ,
যেন বিহগের গান—
আমোদিনী—আমোদের রাণী।
আসি বসি' তোর পাশে,
ধরা ভরা সুখে হাসে
দূরে থাকে দুঃখের কাহিনী ;
দরশ পরশে তোর
টুটে ভাবনার ডোর
সুখ-পূর্ণ জীবনবাহিনী।

শূন্য হৃদয়ের ব্যথা
জগৎ কহেনা কথা,
মূঢ় প্রাণ অসাড়-বিলীন ;
তব হাসি তব গান
জাগায় মূর্চ্ছিত প্রাণ,
বাদকের স্পর্শে যথা বীণ !
পালাই তোমার পাশে,
নয়ন অরুণ নাশে
হৃদয়ের তামসী রজনী।
অধর বাঁধুলি টুটে'
রঙ্গের শোণিমা ছুটে,
জড়সড় ভাবনা-ডাকিনী।
লহরে লহরে উঠে
হাসির হিল্লোল ছুটে,
জীবন সুখের কেলিবন ;
শাখা হ'তে শাখান্তরে
বিহগ যেমন উড়ে
নব নব সাধে মাতে মন।
একতিল স্থির নাই
ধারণার ভার নাই
সদা ছোটে জীবন-পবন ;
ক্রমে হ'য়ে আসে শ্রান্ত
হাসিতে কবে যে ক্লান্ত
লক্ষ্যহীন ক্ষিপ্ত লঘুমন।
খেলাতে খেয়ালে মত্ত
দণ্ড পল করে নৃত্য
তাল দেয় চরণ অস্থির
আমোদের এক টান
বুঝিতে পারেনা প্রাণ
—প্রেম চাহে স্থির স্তব্ধ নীড়।

সাধ যায় ধরি করে,
দু'দণ্ডেরই ক্ষণ তরে
পাই প্রাণে প্রাণের পরশ
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি
হৃদয়-গহন দেখি
লভি' প্রেম-সমাধির রস।
কিন্তু হায় মর্ম্ম ফুটে
চুম্বন হাসিতে টুটে—
রঙ্গ-ভঙ্গে প্রেম অবসান,
পূজার নিথর হৃদি
কেন্দ্রচ্যুত নিরবধি
পথহারা' জপভ্রষ্ট ধ্যান।
প্রশান্ত জলধি কোলে
আকাশেরই ছায়া দোলে
ভেঙ্গে যায় বায়ু ক্ষিপ্ত যবে,
আমোদে উন্মত্ত উগ্র
ক্ষণিক তৃষায় ব্যগ্র,
হেন হৃদে প্রেম কিসে রবে?

# বিষাদিনী

সেই সন্ধ্যা আসিয়াছে
সেই তারা ফুটিয়াছে
বহে সেই উদাস পবন;
সেই শ্রান্ত স্রোতস্বিনী
চাপিয়া কণ্ঠের ধ্বনি
কাশবনে লীন-বিচেতন।
চৌদিকে ধূসর বন
শুষ্ক শিরোরুহ সম
তার শাখ গিয়াছে চিরিয়া,

যেন বিধবার সীঁথি
সরল সঙ্কীর্ণ বীথি
কোন দিক না ঘুরি' ফিরিয়া
অদূরে পথের আগে
ধূর্জ্জটি ত্রিশূল জাগে
নাতি উচ্চ শিরে দেউলের ;
তুঙ্গ শুভ্র সৌধভালে
সন্ধ্যা-তারা আলো ঢালে
স্মৃতি সম পূর্ব্বজনমের !
দিবা-নিশি সন্ধিক্ষণে
সন্ধ্যার কোমল প্রাণে
প্রাণ যবে স্বপন-অধীন,
আকাশে নক্ষত্র সম
স্মৃতি ফুটে এক ক্রম
দৃশ্য ছাড়ি' অদৃশ্যে বিলীন।
মনে আসে যাহা নাই
আঁখি' পরে দেখি তাই
সন্ধ্যার ছায়াতে ছায়া মিশি' ;
পূরবীর সুরে প্রাণ
গায় হারানোর গান
ছায়াময় আলো দিশি দিশি।
অমূর্ত্ত স্বপনপুর,
দূরতায় করি' দূর,
হঠাৎ সমুখে খোলে দ্বার—
নীরব সঙ্গীতে ভরা
গোধূলি মাথায় ধরা
আমন্ত্রণ করে বারবার।
মুক্ত নভ সৌধ'পরে
সন্ধ্যার আরতি ঘরে
মূর্ত্তিমতী পূজার হৃদয়,

বিষাদিনী এক প্রাণে
মুখ তুলি' নভ পানে
　　কার ধ্যানে চিত্ত তব লয় ?
আঁখিতারা তারা'পরে
কপোলেতে অশ্রু ঝরে
　　কি বিষাদ প্রাণে জাগি'রহে,
দৈব হ'তে কি বারতা
আশায় কি নিষ্ফলতা,
　　হৃত স্বর্গস্মৃতি মর্ম্ম দহে ?
তন্দ্রাহীন—শান্তিহীন,
অন্তরেতে চিরলীন,
　　দেখেছ কি অশ্রুভরা জ্ঞানে—
জীবন অতলে, হায়—
—জীবনেরই ছায়া প্রায়
　　কি অভাব সদা ব্যথা হানে ?
সৌন্দর্য্য প্রেমের ধ্যানে
প্রাণ নাহি তৃপ্তি জানে—
　　নয়ন "না তিরপিত ভেল" ;
নীরন্ধ্র মিলন মাঝে
অনন্ত বিরহ বাজে
　　এই এল—এই চলে গেল।
পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে
বুকে তুলি যেই জনে
　　পরিপূর্ণ তারে কই পাই ;
পলাতক-ফুলবাস
—ইন্দ্রধনু ক্ষণে নাশ,
　　সেই চলে যায়—যারে চাই।
জীবন যে দুখে ভরা
তাহা তব হৃদে ধরা
　　প্রচ্ছন্ন বাড়ব মর্ম্মমাঝে,

ফুল-মৃদু পরদুখে
লৌহ-কষ্ট নিতে বুকে
সাক্ষাৎ দেবতা হৃদে রাজে।
অয়ি বিষাদিনি, তুমি
করুণার পূতভূমি,
তীর্থে—যাই—যাই তব স্থানে;
বুকেতে রাখিয়া বুক
মুখপানে তুলে মুখ
দেখি কত ব্যথা তব প্রাণে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

# মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

## ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক—

এ সংখ্যা মহিলা-সংখ্যা অর্থাৎ এ সংখ্যায় কোন লেখক নাই, সকলেই লেখিকা। ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষের মাথায় একটা মহিলাসংখ্যা বাহির করিবার কল্পনা কেন আসিল তাহা ভাবিতে ইচ্ছা করে। লেখিকা লইয়া একখানা ভাল কাগজ চলিতে পারে না, এ ধারণা অনেকের থাকিতে পারে, কিন্তু একটি সংখ্যাও চলিতে পারে না এ ধারণা বোধ হয় কাহারও নাই। ভারতবর্ষ মহিলাসংখ্যা বাহির করিবেন এ সংবাদ যখন শুনিয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল বাংলার মহিলাগণ সাহিত্যক্ষেত্রে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহার কতকটা পরিচয় এই সংখ্যায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের মহিলা-সংখ্যায় যাহা আছে, তাহা নিকৃষ্ট রচনা। ভারতবর্ষ মহিলা-সংখ্যা বলিয়া যাহা পৃথকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বঙ্গীয় লেখিকার গৌরবের চেয়ে অগৌরবেরই পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। অনেক লেখিকার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে; সেই জন্ম যদি কেহ মহিলা-সংখ্যা বলিয়া নূতন ধরণের একটা বিশিষ্ট সংখ্যা বাহির করেন, তাহা হইলে তাহার মধ্যে বঙ্গ লেখিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন পাইতে ইচ্ছা করি। যে মাসিক পত্রের কর্ত্তৃপক্ষ একরূপ সংখ্যায় সে নিদর্শন দেখাইতে না পারেন, তাঁহাকে আমরা কতকগুলি নিকৃষ্ট রচনা একত্র করিয়া মহিলা-সংখ্যা নামে প্রকাশ করিতে নিষেধ করি। 'মহিলা-সংখ্যা' বলিয়া যাহা প্রকাশিত

হইতেছে, তাহার মধ্যে যদি শুধু অক্ষমতা ও ধৃষ্টতার উদাহরণ থাকে তাহা হইলে বাংলার লেখিকাগণের যে চিত্র বাহিরে প্রকাশ পাইবে তাহাকে আমরা কোন মতেই সত্য বলিতে পারিব না।

ভারতবর্ষ লেখিকাদের নিকট হইতে ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন, কোন লেখিকা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা কহিয়াছেন, কেহ বা রবিবাবুর 'খেয়া'র সমালোচনা করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। সব প্রবন্ধই ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে. সম্পাদকগণ সেগুলি প্রকাশযোগ্য কি না তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই।

বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার উপযুক্ত প্রবন্ধ একটিও পাইলাম না। ভারতবর্ষের মহিলা-সংখ্যা এত দৈন্য প্রকাশ করিবে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই।

## প্রবাসী, কার্ত্তিক—

প্রথমেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কবিতা 'নামভোলা' ও 'ডাক'—দুটি কবিতাই মনোজ্ঞ. কান্তিমতী।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল 'ভারতের অর্থসমস্যা'য় কতকগুলি কথা সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া বলিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিলেই বোধ হয়, কতকগুলি কথায় হইবে না, বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। আশা করি, লেখক তাহা হইতে বিরত হইবেন না।

"আর্য্য মতবাদে চীনের প্রভাব" শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচনা। লেখক বলেন সাংখ্যতত্ত্বে চীনের প্রভাব আছে। তবে কথাটা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"মহর্ষি কপিল যে স্বীয় প্রতিভার বলে চীন দেশের বিশ্বাসের অনুরূপ একটা মতবাদ নেপাল সীমান্তে বসিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশের চীন কিরাতেরা যখন প্রতিবেশী ছিল, তখন কপিলবাস্তু প্রভৃতি স্থানে মঙ্গোলদিগের জাতীয় বিশ্বাস কিছু পরিমাণে সংক্রামিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, চীনদেশের প্রাচীনকালের নিরীশ্বর জগৎ তত্ত্বই সাংখ্যতত্ত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় লেখক যাহা বলিতেছেন তাহা সন্দেহাত্মক। সন্দেহাত্মক অনুমানের শেষ নাই। বিজয়-বাবু আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করুন। নিশ্চয় করিয়া অথবা রীতিমত প্রমাণ দেখাইয়া যে কথা বলা যায় তাহারই কিছু মূল্য আছে, অন্য কথা যেমন করিয়াই বলা থাকু না কেন, কেহই বিশ্বাস করিবে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "খৃষ্টধর্ম্মের নববিধান" সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কিন্তু ইহার ভিতর ভাবিবার জিনিস অনেক আছে।

## ভারতী, কার্ত্তিক—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার "ভাষা-সংস্কার-বিচার" শীর্ষক আলোচনায় অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন, যাহা নূতন না হইলেও সাময়িক। ভাষা সংস্কারে কেহ একটা নূতন উচ্ছৃঙ্খলতা না আনেন ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। ভাষাসম্বন্ধে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর মত আলোচনা করিতে গিয়া লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতটি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে। যে সকল স্থানে সাহিত্য-সমাজ সুতন্ত্রিত অর্থাৎ যেখানে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন হইতে পারে না সেখানে কেহ নূতন মত-প্রচারের জন্য তাঁহার নূতন ব্যাকরণ অথবা বানান অথবা অন্যবিধ পরিবর্ত্তন দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া যে কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন; কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করিয়া যদি সাধারণ প্রবন্ধে নূতন বানান ব্যাকরণ প্রভৃতি চালাইয়া যান, তবে প্রবন্ধটি ভাষার হিসাবে কুরচিত বিবেচিত হইবে এবং কুত্রাপি মুদ্রিত হইবে না।"

আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছি বলিয়া যে অপবাদ রটিয়াছে, তাহার সবটা ঠিক নয়। সত্য সত্যই আমাদের দেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন, বিশেষতঃ আজকাল। যে দেশ বহুকাল হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য অবিরত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, এখনও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই, সে দেশও প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমাদের মত স্বাধীনতা দান করে নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা মত আছে এবং গবর্ণমেণ্টের আইনে না বাধা দিলে তাহা যেখানে সেখানে নিঃসংকোচে প্রকাশ করি। দেশের এই অবস্থায় লেখক চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার অবলম্বিত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারেন না। তবে কালে কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবেই। চৌধুরী মহাশয় প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলিবেন কেন? লেখক বলিবেন "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দেশেও তাহা মানে।" যদি বলা যায় "কেন মানে?" লেখক উত্তর দিবেন "সাহিত্যসমাজের শাসনে।" কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্য-সমাজের শাসন গালাগালি ও যুক্তিতর্ক,—চৌধুরী মহাশয় সে শাসন তুচ্ছ করিবার শক্তি রাখেন।

"বিনয়-পরিচয়" শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের রচনা। বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব সম্বন্ধে যে সব বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই 'বিনয়' নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রবন্ধে 'বিনয়ে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

বাংলা ভাষা বড়ই ইংরাজী ধরণের হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন। বাংলা ভাষা যদি আপনার স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে সত্য সত্যই এ আক্ষেপের কারণ আছে। তবে সেকালের আড়ষ্ট ভাষা যে আজকালকার ভাবের উপযোগী, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। অনেক স্থলে আমাদের ভাষা ইংরাজী ধরণের হইবেই, ইংরাজী কথাও ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিছু কাল

পূর্ব্বে একদল লেখক ছিলেন যাঁহারা বাংলা জানিতেন না, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের দখল ছিল। তাঁহাদের ভাব ছিল, কিন্তু যখন তাহা বাংলা ভাষায় তাঁহারা প্রকাশ করিতেন, ভাষা দুষ্ট হইয়ে অন্যের নিকট হইতে সংশোধন করাইয়া লইতেন। তাঁহারা যে বাংলা জানেন না, এ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। তাঁহাদের দল এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আর একদল উঠিয়াছেন, যাঁহারা বাংলা মোটেই জানেন না, ইংরাজিতেও দখল তাঁহাদের কমই আছে। বাংলা লিখিতে বসিলেই তাঁহাদের ভাষাটা ইংরাজীর প্রকৃত অনুবাদের মত হইয়া পড়ে। ইংরাজিতে যেখানে golden oppertunity বলা হয়, সেখানে বাংলায় তাঁহারা 'সুবর্ণ-সুযোগ' কথাটি ব্যবহার করেন। এরূপ ভাষাব্যবহার করিয়াও তাঁহারা লজ্জিত হন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু' একটা উপাধি পাইয়াই তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ভাষা নির্ভুল, বাংলা ভাষার প্রকৃত উন্নতি তাঁহারাই করিতেছেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। ভারতীর ভাষা দু একস্থলে এই কথাগুলি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। "কাজের ভিড়ে ও স্বাস্থ্যের আহ্বানে ডাক্তার আজ কয়দিন প্যারি পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এখানে 'স্বাস্থ্যের আহ্বান' কথাটা দুর্ব্বোধ্য। "এই স্নেহভরা দৃষ্টির অতি ক্ষীণ একটা রশ্মিও কোনদিন তাহার আঁধার বুকে মুহূর্ত্তের জন্য ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।" এখানে অলঙ্কার আছে, কিন্তু তাহা হিন্দুস্থানী রমণীর অলঙ্কারের মতই দুর্ব্বহ; না থাকিলেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইত। "অশ্রান্তভাবে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্যই যার প্রস্তুত হবার কথা, সেটা না হয়ে ওঠে কেন? সে চিত্রলেখার রেখা ও বর্ণের ছন্দ-বাঁধায় পরিপক্ক?" এরূপ শব্দের ক্রম ( o der ) কথোপকথনের ভাষাতেও ব্যবহৃত হয় না। তবুও তিনি এ ক্রম ব্যবহার করিলেন কেন, তাহা ভাবিতে গেলে তাঁহার খেয়াল ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্য খেয়ালের জিনিস নয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যে কাগজ এক সময়ে সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে খামখেয়ালি বা যথেচ্ছাচারিতার নিদর্শন অসহ্য হইয়া ওঠে।

## নারায়ণ, কার্ত্তিক—

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল "বাঙ্গালীর প্রতিমাপূজা ও দুর্গোৎসব-শীর্ষক আলোচনায় বলিতেছেন "প্রতিমাপূজা" বাঙ্গালার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের আর কোথাও এভাবের মূর্ত্তিপূজা নাই। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, কবির জাত বলিয়াই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম অমন মিষ্ট। এই জন্য বাঙ্গালার প্রতিমাপূজা বেদান্তের পুরাতন উপাসনার সকল শ্রেণীবিভাগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" লেখক আরও বলিয়াছেন "প্রতিমাপূজা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বকার কথা নয়, পরের কথা। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন নহে, ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভোগ। জ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ভাবের দ্বারা, রসের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা এই সকল গড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালী অভক্তের হাতে পড়িয়া এ সকল প্রতিমাপূজার অশেষ দুর্গতি হইয়াছে,

ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। সিদ্ধ পুরুষের অধিকারে যে বস্তুর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কেবল অসিদ্ধ নহে, কিন্তু অপ্রবর্ত্ত অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া তার অশেষ প্রকারের কদর্থলাভ হইয়াছে, ইহা সত্য। এইজন্য এগুলি ভক্তিসাধনের সহায় না হইয়া অনেক স্থানে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।" লেখক প্রতিমাপূজার একটা Psychological ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন যাহা আজকাল বিশেষ আলোচনার জিনিষ।

প্রবন্ধে অসঙ্গতিদোষ আছে। একস্থলে লেখক বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর প্রতিমাপূজা একটা স্বতন্ত্র বস্তু,ইহাকে বেদান্তের সম্পদুপাসনা বলা যায় না। প্রতীকোপাসনাও বলা যায় না। অন্য স্থলে উক্ত হইয়াছে এ গুলি খাঁটি প্রতিকোপাসনাও নহে, খাঁটি সম্পদুপাসনাও নহে। এগুলি একটা মিশ্রবস্তু। এখানে প্রতীকে সম্পদে অদ্ভুত রকমে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। শেষের কথাটাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। প্রতিমাপূজাকে ব্রহ্মজ্ঞানের পরের কাজ বলিয়া তাহাকে একটা স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া খাড়া করিতে গেলে প্রকৃত কথাটা আর বলা হয় না।

"নবদ্বীপে মাতৃমন্দির" শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ। লেখক বলিতেছেন "এই মাতৃ-মন্দিরের সেবকেরা দুর্লভ শ্রেণীর লোক। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠা, সুনাম ও লাভের আশা ত্যাগ করিয়া সেই হতভাগিনী সমাজ-উপেক্ষিতাদের সেবাতেই কায়মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে এ নূতন দৃশ্য—নূতন জীবনের সূচনা—আশার অরুণালোক।" দৃশ্যটা বাঙ্গালাদেশে নূতন নয়, তবে আজকালকার দিনে নূতন—ইহা যে নূতন জীবনের সূচনা—আশার অরুণালোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "যে সৃষ্টি সমাজের নিজেরই, সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিলে, দূরে রাখিতে চাহিলে ত চলিবে না! তাহার ভার সমাজকে নিজেই যে লইতে হইবে।" এই উক্তিতে লেখকের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের প্রতি লেখকের উক্তিটি বেশ হৃদয়গ্রাহী, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"এই যে সব পতিতা, সমাজ পরিত্যক্তা হতভাগিনী; কে ইহাদের জন্য দায়ী? কে ইহাদের এরূপ করিয়া তুলিয়াছে? তুমি সমাজ যতই চোখ রাঙ্গাও না কেন, আমি জোর করিয়া বলিব ইহা তোমারই সৃষ্টি; তোমার বিধি, তোমার ব্যবস্থা, তোমার প্রথা, অনুশাসন তোমরাই এই সকলের মূল। যে সমাজ মানবহৃদয় বোঝে না, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির পরিচয় রাখে না, তাহাকে কেবল যন্ত্রের মত পিষিয়া মারিতে চায়, তাহার ভিতর হইতে এ সকলের উদ্ভব হইবে, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নহে। তুমি সমাজ, তুমি ত শুধু পুরুষের সমাজ। পুরুষ সর্ব্ববিধ পাপ ও লালসাতে ডুবিয়া ভাসিয়াও তোমার মধ্যে মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারে। তোমার যত শাস্তি, যত নির্য্যাতন, দুর্ব্বল নারীর উপর। কিন্তু সে হতভাগিনীও অনেক স্থলে শুধু পুরুষের কামের ইন্ধন, বিলাসযজ্ঞের আহুতি—লালসাতৃপ্তির উপাদানমাত্র। অথচ তোমার বিচারে সেই সকলের জন্য দায়ী।" ভাবপ্রবণতা যে অতিশয়োক্তিকে প্রশ্রয় দেয়, সেইটুকু বাদ দিলে বুঝিতে পারা যায় উপরোক্ত অংশে অনেক সত্য আছে। আধুনিক সমাজ এ কথাগুলিকে অপ্রিয় বলিতে পারে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য অনেক স্থলেই প্রয়োজনীয়।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্রের "সঙ্গীতে বিজ্ঞান" শীর্ষক আলোচনাটি বড়ই ভাল লাগিল। হিন্দুসঙ্গীতের আলোচনা দেশে হইতেছে না এমন নয়; তবে তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও

সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ আবশ্যক। সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাংলায় একটা নূতন সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা এখনও দেশে হয় নাই। লেখক সেই বিপুল কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। তিনি পথদর্শকও হউন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

যাঁহারা দুর্গোৎসবের নানা অঙ্গের বিবিধ তত্ত্ব জানিতে চান তাঁহারা শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব" ও শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "দুর্গোৎসব" নবপত্রিকা পাঠ করুন। দুটি প্রবন্ধই সুপাঠ্য, সাধারণের উপযোগী।

# গ্রন্থসমালোচনা।

**মহাভারতীয় নীতিকথা।** ১ম খণ্ড, আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব। ২য় খণ্ড ভীষ্মপর্ব্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। প্রথম খণ্ড, কলিকাতা কালিকা যন্ত্রে ও দ্বিতীয় খণ্ড নববিভাকর প্রেসে মুদ্রিত। ডবলক্রাউন ১৬পেজি ২৩৩ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা প্রত্যেক খণ্ডের মূল ১০ আনা প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণের পুস্তক।

মহাভারতে বর্ণিত বিবিধ চরিত্র ও ঘটনা উপাদান স্বরূপ লইয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"মহাভারত মহাসমুদ্র বিশেষ। কত যুগ ব্যাপিয়া এই মহাসমুদ্র হইতে জ্ঞান ধর্ম্মের কথা সাগরোত্থিত মেঘমালার ন্যায় ভারতক্ষেত্রে কতভাবে বর্ষিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এই ভাণ্ডারের ক্ষয় নাই।"—গল্পের ধারাবাহিকতার উপর গ্রন্থকার ততটা মনোযোগ দেন নাই—গল্পটিমাত্র বলিয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। "অর্জ্জুনের একাগ্রতা," "একলব্যের গুরুভক্তি," "বিদুরের সৎসাহস" প্রভৃতি প্রবন্ধ-শিরোনাম হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যের আভাস পাওয়া যায়।

এই দুইখণ্ড পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে ফাঁকি দেন নাই, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। ভাষাটিও বড় সুন্দর হইয়াছে। ভূমিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন—"গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে আমরা মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট বিশেষভাবে ঋণী, কারণ মূলতঃ তৎকৃত মহাভারতের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।"—এই ঋণগ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান লেখক ভালই করিয়াছেন। ভাষাটি বেশ গম্ভীর, সংযত, বিশুদ্ধ ও বিষয়োপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া ছাত্রগণ নীতিশিক্ষার সঙ্গে ভাষাশিক্ষারও বিলক্ষণ সুযোগ পাইবে। শুধু ছাত্রগণ কেন, বয়স্ক পাঠকগণও ইহা পাঠে প্রচুর আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত কবিতা দুইটি বাদ দিলেই ভাল হইত। গীতার উপদেশাংশ ও নলোপাখ্যান গদ্যেই হওয়া উচিত ছিল।

সরল বাঙ্গলা-ব্যাকরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীনগেন্দ্রকুমার চন্দ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা। ঢাকা আলেক্‌জাণ্ড্রা ষ্টীম মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। ডবল-ফুলস্ক্যাপ ১৬পেজি ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য।০ আনা।

প্রথমে উদাহরণ এবং তৎপরে সেই উদাহরণ সমূহ হইতে নিয়মটি বুঝাইয়া দেওয়া, এই প্রণালী অনুসারে ব্যাকরণখানি রচিত হইয়াছে। এই প্রণালীই স্বাভাবিক ও সমধিক কার্য্যকরী। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের পক্ষে এই ব্যাকরণখানি বেশ উপযোগী হইয়াছে। বিষয় সন্নিবেশও ভাল, বুঝাইবার কৌশলটিও ভাল।

৩৭ পৃষ্ঠায় "স্ত্রীদিগের কুলোপাধি" সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"সাধারণতঃ বিবাহিতা স্ত্রীদিগের নামের পরে স্বামীর কুলোপাধি যোজিত হয়। যেমন—(১) স্নেহলতা বসু, (২) ইন্দিরাবালা চক্রবর্ত্তী" ইত্যাদি। "অবিবাহিতা বালিকাদের নামের পরে পিতার কুলোপাধি এবং নামের পূর্ব্বে কুমারী শব্দ যোজিত হয়। যেমন—(১) কুমারী বিধুমুখী দাস, (২) কুমারী শৈলজাবালা চৌধুরী"—ইত্যাদি।—বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে এ প্রথা কি এখনও প্রচলিত হইয়াছে? আমরা ত সেরূপ দেখিতে পাই না। ব্যাকরণের সূত্রমধ্যে স্থানলাভ করিবার যোগ্যতা এখনও এ প্রথা অর্জ্জন করে নাই।

CHILD'S SIMPLE GRAMMAR—শ্রীনগেন্দ্রকুমার চন্দ প্রণীত। "মানসী"তে আমরা ইংরাজি পুস্তকের সমালোচনা করি না, গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন।

ওডিসিয়ুস্। শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। কলিকাতা, ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সিটিবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়াল ১৬ পেজি ৭৯ পৃষ্ঠা, ৪খানি পুরা পৃষ্ঠা হাফ্‌টোন চিত্র যুক্ত। মূল্য।০ আনা।

গ্রীক পুরাণের অন্তর্গত ওডিসিউস্ বা ইউলিসিসের কাহিনী লইয়া এ পুস্তকখানি রচিত। কোথাও স্পষ্ট করিয়া লেখা না থাকিলেও, এখানি বালক-বালিকাদিগের রচিত ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বালক-বালিকা-পাঠ্য পুস্তকে এত বানান ভুল কেন? রাশী রাশী কয়েকবার চক্ষে পড়িল। "প্রতীজ্ঞা" ৪১ পৃষ্ঠায় দুইবার, ৬৪ পৃষ্ঠায় দুইবার এবং ৭০ পৃষ্ঠায় একবার দেখিলাম। 'সম্মুখে" ১৩, ২০, ২৫, ৩০, ৩২, ৬৫ এবং ৭০ পৃষ্ঠায় নজরে পড়িয়াছে। সুতরাং এ সকল বানান ভুলের জন্য ছাপাখানার গরীব কম্পোজিটারকে দোষী করা চলে না। রচনা-রীতিও অত্যন্ত শিথিল। গ্রন্থকার, দেখিতেছি, "দস্তর মতন" কথাটার বড় পক্ষপাতী—"টেলিমেকাস্ ততদিন দস্তর মতন বড় হইয়া উঠিলেন," "দুষ্ট বিবাহার্থীর দলও তখন আসিয়া দস্তর মতন উৎপাত গণ্ডগোল আরম্ভ করিল"—ইত্যাদি। গ্রন্থের ভাষাটি সরল হইলেও, বর্ণাশুদ্ধি ও রচনা-দোষের জন্য এখানি বালক বালিকাদের অনুপযোগী হইয়াছে।

পীযুষপ্লাবনী বা ইস্‌লাম গাথা, প্রথম খণ্ড। সেখ মোহাম্মদ ইদরিস্ আলী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা সুলভ প্রেসে মুদ্রিত। রয়াল ১৬পেজি ৫০পৃষ্ঠা, মূল্য।০ আনা।

এখানি খণ্ড কবিতার পুস্তক। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার "ত্রুটি স্বীকারে" লিখিতেছেন—"আশা করি সমাজ স্নেহের চক্ষে অধমের প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"—সুতরাং, অনুমান করি, গ্রন্থকার নবীন এবং এই পুস্তক তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া

বুঝিলাম, বাঙ্গালা ভাষা লেখকের অনেকটা দখল হইয়াছে। কয়েকটির মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও দেশভক্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোনও কাব্যসৌন্দর্য্যের সন্ধান কোনও কবিতার মধ্যে পাইলাম না।

কমলা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০, প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

এখানি একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। "আভাষে"ই লেখক জানাইয়াছেন যে, তাঁহার আখ্যানবস্তু সাধারণ গৃহস্থঘরের তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনার একত্র সমাবেশ। একটি উত্তেজক চমকপ্রদ কাহিনীর দ্বারা লোকের মন আকৃষ্ট করা অপেক্ষা সংসারের নিত্য ঘটনীর সামান্য ব্যাপার যে লেখক মনশ্চক্ষুর সমক্ষে সজীব মূর্ত্তির ন্যায় ধরিতে পারেন, তিনিই ধন্য।

কমলার "কমলা" ও "বিরাজ" চরিত্র এই রোগ-শোক-জরা-প্রপীড়িত মর্ত্ত্যধামে দুর্লভ। লেখক কমলাকে আদর্শ হিন্দু-রমণীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন; শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা অবমানিতা ও গৃহ-তাড়িতা হইয়া নিশাকালে জাহ্নবী-সলিলে জীবন-জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্যতা হয়েন, তখন তাঁহার বড় জা তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন এবং তথায় যাইয়া স্বামীকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি পিত্রালয় হইতে যে পত্র লেখেন, তাহাতে শ্বশুরকুলে গৃহ-বিচ্ছেদ হইবার ভয়ে শাশুড়ীর উৎপীড়নের কথা এবং শাশুড়ী কর্ত্তৃক স্বীয় মিথ্যা অপবাদ রটনা করার কথা বিন্দুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। তারপর মাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিরাজ যে সময়ে কমলার নিকট হইতে অলঙ্কার গ্রহণ করিতে আগমন করেন, সেই সময়ে শ্বশুর শাশুড়ীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও তাঁহাদিগের সুখের জন্য আত্মসুখ জলাঞ্জলী দিয়া ধৈর্য্যসহকারে সহাস্যবদনে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করা একমাত্র হিন্দু রমণীর পক্ষেই সম্ভব। স্বামী যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মাতাপিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিদেশে যাইয়া কমলার সহিত সংসার পাতাইবার জন্য সব ঠিক করিয়াছেন, এমন সময়ে শ্বশুরের আদেশে শ্বশুরকুলের মঙ্গল কামনায় নিজের সমস্ত জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন করিয়া অজ্ঞাতবাসে গমন করা হিন্দুরমণী ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্যাতীত এবং লেখক তাহা পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট কৃতীত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বিদেশে নির্ব্বান্ধব স্থানে একাকী অবস্থান করিয়া সমস্ত প্রলোভন ঠেলিয়া ফেলিয়া কমলা কিভাবে রমণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ রক্ষা করিয়াছেন, প্রায় পদে পদে কিরূপ স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, লেখক তাহার একটি সজীব চিত্র আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। পতি-পত্নীর এরূপ অনাবিল প্রেম এই জ্বালা-যন্ত্রণা পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যভূমিতে মন্দারের পারিজাতের ন্যায় দুর্লভ। এই পাপ পৃথিবীর সকল গৃহেই যদি উদারচেতা, পরোপকারী, স্নেহশীল, দেবচরিত্র বিরাজমোহন, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত শুধাংশু, সেবাপরায়ণা তরঙ্গিনী ও কমলা বিরাজ করিতেন, তাহা হইলে মর্ত্ত্যধাম স্বর্গে পরিণত হইত। যে গৃহে সূর্য্যনারায়ণ ও কৃষ্ণনাথের ন্যায় সন্তানবৎসল পিতা আছে, কমলা, তরঙ্গিনী ও করুণার ন্যায় পরদুঃখকাতরা স্নেহশীলা রমণীরত্ন আছে, দেবোপম

ভ্রাতৃদ্বয় আছে, সে সংসারে দুঃখ কষ্ট কখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে না। বিধাতার বিচার সমভাবেই সকলের উপর বর্ষিত হয়; তাহার প্রমাণস্বরূপ গ্রন্থকার কাত্যায়নীর আকস্মিক মৃত্যুর বর্ণনা হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা ও ভাব উৎকৃষ্ট—সরস হস্তের পরিচায়ক। যদিও লেখক একেবারে নূতন ও আমাদিগের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি লেখকের লেখনী কাঁচা হস্তের পরিচয় না দিয়া সর্ব্বত্র পাকা হস্তেরই পরিচয় দিতেছে।

অধুনা এই বাজে উপন্যাসপ্লাবিত বঙ্গদেশে এইরূপ গার্হস্থ্য উপন্যাসের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। আমরা গ্রন্থকারের ও গ্রন্থখানির বিশেষ উন্নতি কামনা করি।

# সাহিত্য সমাচার

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের "মধুমালতী" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

---

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রাচীন পুঁথি" প্রকাশিত হইয়াছে।

---

সুপ্রসিদ্ধা গল্প-লেখিকা শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর গল্পগুলি "স্তবক" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

সুপ্রসিদ্ধ গল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের "আমার বরে"র দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

---

"শ্রীমতী অনুরূপাদেবী প্রণীত "পোষ্যপুত্র" উপন্যাস খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত লেখিকার "জ্যোতিঃহারা" এবং "মন্ত্রশক্তি" নামে অপর দুইখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

"বিজ্ঞানাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, এফ, সি, এস, পি, আর, এস, মহাশয়ের রসাত্মক রচনাগুলি "তুফান" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মানসী'র পাঠক পাঠিকাদিগের এই প্রবন্ধগুলি সুবিদিত, কারণ ইঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই "মানসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের "সমসাময়িক ভারতে"র, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অষ্টমখণ্ড ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি চতুর্থ খণ্ড (পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকাসহ), পঞ্চম খণ্ড (অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা), নবম খণ্ড (মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা), একাদশ খণ্ড (শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির লিখিত ভূমিকা), উনবিংশ খণ্ড (অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত লিখিত ভূমিকা), ও একবিংশ খণ্ড (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা) যন্ত্রস্থ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয় উনবিংশ খণ্ডের বহু মূল্যবান পাদটীকা সংযোগ ও একবিংশ খণ্ড আদ্যোপান্ত পরিশোধিত করিয়া দিতেছেন। প্রতি খণ্ডেই অনেকগুলি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও মানচিত্র প্রদত্ত হইতেছে।
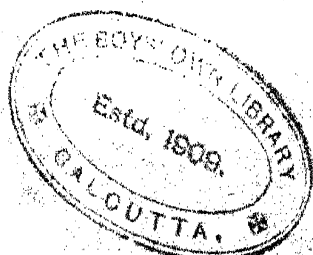
হউক বা না হউক, আমরা সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কেন না, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সমালোচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহার দুই একটির ঠিক মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আশা করি বিদ্বদ্মণ্ডলী আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

প্রকৃত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মুখবন্ধরূপে একটি কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা এই। বঙ্কিমবাবু মূল সংস্কৃত উত্তরচরিতের অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নৃসিংহবাবুর বাঙ্গলা অনুবাদ ও টনি সাহেবের ইংরাজি তর্জ্জমা দেখিয়া উহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার কারণস্বরূপ তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। "তিনি ( বঙ্কিমবাবু ) ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট যে সকল কাব্য পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে উত্তরচরিত ছিল না; তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, নৃসিংহ বাবুর বাঙ্গলা অনুবাদ ও টনি সাহেবের ইংরাজি তর্জ্জমা হওয়াতেই উত্তরচরিতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" ইহার পর বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার প্রাপ্য স্বরূপ কিছু প্রশংসা দিয়া, শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বলিতেছেন, "কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। উত্তরচরিতের মত কাব্য বুঝিয়া লইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় নাই। তথাপি তিনি বলিয়াছেন 'আমরা যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব এমত নহে। বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প।" অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বঙ্কিমবাবু সংস্কৃত উত্তরচরিতের সম্যক অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই যেন বলিতেছেন, "আমরা ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব এমত নহে।" ইহাই যদি হইল, তবে তিনি কেন বলেন "বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প।" স্থান অল্পই হউক আর বেশীই হউক তোমার তাহাতে কি? তুমি যখন কিছু বুঝিতে পার নাই তখন তোমার দুই পাতাতেই বা কি আর চারি পাতাতেই বা কি? অতএব আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমবাবু ঐ কথা মনে করিয়া এ ছত্র লিখেন নাই। তাঁহার চক্ষে দুই একটি কাব্যের দোষ ঠেকিয়াছিল বলিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। হয়ত সম্যক বিচারে সেই সকল দোষের খণ্ডন হইতেও পারিত কিন্তু তত বিচারের স্থান পত্রে ছিল না। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, 'বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প'।

নৃসিংহবাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর স্বহস্তলিখিত একটি ফুট্‌নোট আছে। নৃসিংহবাবুর অনুবাদ উদ্ধৃত করিতে যাইয়া তিনি ঐ ফুট্‌নোট দিয়াছেন। ফুট্‌নোটটি এইরূপ, "এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতএব সে অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে।" যদি তিনি নৃসিংহবাবুর অনুবাদ দেখিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে ঐ অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ কি না, সে বিচার কি করিয়া করিলেন? যদি কেহ বলেন টনি সাহেবের ইংরাজি তর্জ্জমা দেখিয়াই ঐ বিচার করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, তিনি টনি সাহেবের অনুবাদই যে সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ মনে করিতেন তাহারই বা প্রমাণ কি? তাঁহার প্রকৃতিতে ইহাই মনে হয় যে নৃসিংহবাবু ও টনি সাহেবের বিরোধস্থলে যদি তাঁহার নিজের আপত্তি না হইত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নৃসিংহবাবুর পক্ষ গ্রহণ করিতেন। নৃসিংহবাবুও মূর্খ লোক ছিলেন না।

ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট বঙ্কিমবাবু যে সকল কাব্য পড়িয়াছিলেন তাহার ভিতর উত্তরচরিত ছিল না। নাই থাকুক, তাহাতে কি? উত্তরচরিত ছিল না কিন্তু আর পাঁচখানা কাব্য ছিল ত! পাঁচখানা কাব্য কোনও অধ্যাপকের নিকট রীতিমত পড়িয়া বঙ্কিমবাবুর কি এটুকু সংস্কৃত জ্ঞান হয় নাই যে, তিনি অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকে আর একখানা কাব্য পড়িতে পারেন?

হয়ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিবেন—বলিবেন কি না জানি না—সংস্কৃত উত্তরচরিতের অর্থগ্রহণের কথা ত কোথাও হয় নাই। তাহার ভাব গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। তাই যদি, তবে বাঙ্গালা অনুবাদ, ইংরাজি তর্জ্জমা, শিরোমণি মহাশয়ের কাছে পড়া নাই—এসকল কথার প্রয়োজন কি? শিরোমণি মহাশয়ের কাছে পড়িলে উত্তরচরিতের ভাব গ্রহণপক্ষে বঙ্কিম বাবুর কি বিশেষ সাহায্য হইত? আমরা এমত মনে করি না যে, এসকল রচনার ফলে বঙ্কিমবাবুর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি আছে, বা এক জনেরও মনে আসিতে পারে যে, বঙ্কিমবাবু সংস্কৃত উত্তরচরিতের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন। সেজন্য আমরা উহার খণ্ডনে উদ্যত নহি। এবম্ভূত চেষ্টার তাৎপর্য্য কি, ইহার ফলই বা কি, তাহাই দেখিবার জন্য আমাদের এ প্রয়াস।

গ্রন্থ বিচার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। যে গ্রন্থ

যাঁহার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইবে সেই গ্রন্থকে তিনি সেইরূপই বলিবেন। তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। অবশ্য কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, বঙ্কিমবাবু স্বয়ং যে গ্রন্থ যে ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই গ্রন্থ সেই ভাবে ভিন্ন অপরভাবে দেখা কি করিয়া হইতে পারে? তাহা যে হইতেই পারে না;—আমরা সে কথার সমর্থন করি না। অতএব ঐ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই বলিব না। কেবল তন্মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিজের ও বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই একটু বিচার করিব। অন্যান্য বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। প্রথমে চিত্র দর্শন লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, যেটিকে বঙ্কিমবাবু চিত্রদর্শনের উদ্দেশ্য বলেন নাই, তিনি দেখিতেছেন সেইটিই উহার প্রধান উদ্দেশ্য। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "ইহার উদ্দেশ্য এমৎ নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্ব্ব-ঘটনা সকল বর্ণনা করেন। রাম-সীতার অলৌকিক, অসীম, ও প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য।" শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন সংক্ষেপে পূর্ব্ব-ঘটনা সকল বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। কারণ, ভবভূতি শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বজীবন লইয়া লিখিত তাঁহার মহাবীরচরিত নামক নাটকে বাল্মীকির গল্পটা অনেক জায়গায় ত্যাগ করিয়া নিজের মনগড়া করিয়া লইয়াছেন। তাই উত্তরচরিতের প্রারম্ভে চিত্রদর্শনচ্ছলে ঐসকল ঘটনাকে আবার বাল্মীকির মতেই বর্ণনা করিয়া যেন তাঁহার সঙ্গে কতকটা মিটমাট করিলেন। পূর্ব্ব-ঘটনা লইয়াত মিটমাট করিলেন; কিন্তু পর ঘটনা লইয়া যে আবার ঘোরতর বিবাদ করিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি কিরূপ এবং ভবভূতি সেগুলি কতদূর পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। বঙ্কিমবাবুই তাহা নিজ প্রবন্ধ মধ্যে বলিয়া গিয়াছেন। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠক দেখিবেন যে, সে বিবাদ পূর্ব্ববর্ত্তিঘটনা লইয়া বিবাদ অপেক্ষা বিষয়-গুরুত্ব হিসাবে অনেক বড়। ভবভূতি যখন জানেন যে, শেষে এতটা বিরোধ করিবেন তখন গোড়ায় একটা চিত্রদর্শনের ঢং করিয়া মিটমাটের প্রয়োজন কি? এ যে ঔরঙ্গজেবের মিটমাট হইল। বঙ্কিমবাবু যে উদ্দেশ্যটি বলিয়াছেন অর্থাৎ রাম-সীতার প্রণয় বর্ণনা করা, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তিনি "কথাটা ধরিয়াছিলেন কিন্তু বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ফুটাইতে পারেন নাই"। "অসীম, প্রগাঢ় ও অলৌকিক প্রণয় বর্ণনা" বলায় কথাটি ফুটে নাই। তাই শাস্ত্রী মহাশয় বিয়াল্লিশ

বৎসর পরে "রামের সত্তায় সীতার সত্তা ডুবিয়া যাওয়া" বলিয়া কতকটা ফুটাইলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ফুটানর সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর যে কি অসুবিধা ছিল, যাহা বিয়াল্লিশ বৎসর পরে তাঁহার সুবিধায় দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিলাম না।

তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র সমালোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিমবাবুর মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন বঙ্কিমবাবু উত্তরচরিতে রামচন্দ্রের কান্নাই দেখিয়াছেন কান্নার ভিতর যে একটা অমানুষ তেজ রহিয়াছে, তাহা তিনি ধরিতেই পারেন নাই। একথায় আমাদের কোনই বিবাদ নাই। বঙ্কিমবাবু কান্নায় তেজ দেখিতে পান নাই, উনি পাইয়াছেন, তখন উনি সে কথা কেন বলিবেন না? তবে এ প্রসঙ্গে আমরা শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাহি যে, কালিদাসও ঠিক এই স্থলে বঙ্কিমবাবুর মতেই গিয়াছেন। রঘুর চতুর্দ্দশ সর্গে এই সীতা-পরিত্যাগরূপ ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কালিদাসও শ্রীরামচন্দ্রকে ভবভূতির ন্যায় কাঁদাইতে পারেন নাই। শাস্ত্রীমহাশয় কথিত ভবভূতির রাম-কান্নার প্রধান সাফাই কালিদাসের রামের ও ছিল। তাঁহার রাম ও ঠিক সীতা গৃহ হইতে, সীতাকে আদর করিয়া, সীতার দোহদ পুরাইতে অঙ্গীকার করিয়া, শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় 'সীতাময়' হইয়া যাই গৃহ হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন অমনি চর তাঁহাকে সীতাপবাদ শুনাইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি বাল্মীকিকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ প্রকৃত শ্রীরাম চরিত্রেরই অনুবর্ত্তী হইলেন। আমরা রঘু হইতে সেই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

'তস্যৈ প্রতিশ্রুত্যরঘুপ্রবীরস্তদীপ্সিতং পার্শ্বচরানুযাতঃ।
আলোকয়িষ্যন্মুদিতামযোধ্যাং প্রাসাদমভ্রংলিহমারুরোহ॥
স কিম্বদন্তীং বদতাং পুরোগঃ স্ববৃত্তিংমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধবৃত্তঃ।
সর্পাধিরাজোরু ভুজোঽপসর্পং পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতারিভদ্রঃ॥
নির্ব্বন্ধপৃষ্টঃ সজগাদসর্ব্বং স্তবন্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ং।
অন্যত্র রক্ষো ভবনোষিতায়াঃ পরিগ্রহাৎ মানবদেব দেব্যাঃ॥'

রঘু।১৪।২৯,৩১,৩২।

অর্থাৎ, সীতার মনোরথ পুরাইতে অঙ্গীকার করিয়া, অনুচরগণকর্ত্তৃক পরিবৃত রঘুপ্রবীর শ্রীরামচন্দ্র উৎসবমণ্ডিতা অযোধ্যার শোভা দেখিবার নিমিত্ত অভ্রভেদী প্রাসাদশিখরে আরোহণ করতঃ ভদ্রনামক চরকে, স্বীয় কার্য্যকলাপ

সম্বন্ধে, লোকপ্রবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় সেই চর অবশেষে জানাইল যে, পুরবাসিগণ রাক্ষসভবনে কৃতবাসা সীতা-দেবীর গ্রহণ ভিন্ন আর সকল বিষয়েরই প্রশংসা করে। তাঁহারও কি কষ্ট হইল না? খুবই হইল। কিন্তু সে কষ্ট বীরের কষ্ট, বিষ্ণুর সপ্তমাবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কষ্ট।

'কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহীবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে॥'

রঘু।১৪।৩৩

অর্থাৎ, লৌহমুদ্গর যেমন উত্তপ্ত লৌহকে ভাঙ্গিয়া ফেলে সেইরূপ এই ভার্য্যাপবাদ স্বরূপ গুরু কলঙ্ক বৈদেহী-ভর্ত্তার স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু তথাপি তিনি কাঁদিলেন না, মূর্চ্ছাও গেলেন না। হা হতোঽস্মি করিলেন না। প্রকৃত শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় অনুজবর্গকে ডাকাইয়া স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক লক্ষণের প্রতি স্থির ভাবে রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "সীতাকে বনে দিয়া আইস।"

এইবার অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া, শাস্ত্রী মহাশয় নিজের ও বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে যে, অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের যেটুকু বক্তব্য আছে সেইটুকু বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অলঙ্কার প্রসঙ্গে প্রথমেই শাস্ত্রী মহাশয় আলঙ্কারিকগণ সম্বন্ধে, বঙ্কিমবাবুর কি মত তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "উত্তরচরিত পরীক্ষা করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু আলঙ্কারিকগণকে অত্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন উঁহারা যে ভাবে কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান সে ভাবে কাব্য বা নাটকের ভিতর প্রবেশ করা যায় না।" এসম্বন্ধে আমরা একটু যথাসাধ্য বিচার করিব। আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখাইব যে, অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ব্যঙ্গ আদৌ নাই, আছে ভক্তি। তিনি বলিয়াছেন যে, যে পারিভাষিক প্রথায়—ভাবে নয়—আলঙ্কারিকেরা কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান্ সেই পারিভাষিক প্রথায় কাব্য বা নাটকের ভিতর প্রবেশ করা যায় না। ভাবে তিনি বলিতেই পারেন না। কেন না, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ আলঙ্কারিকদিগের ভাবে উত্তরচরিত পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহা পরে আমরা স্পষ্ট দেখাইব।

প্রথমে দেখা যাউক বঙ্কিমবাবুর নিজের কথায় আলঙ্কারিকদিগের

সম্বন্ধে কি মন্তব্য আছে। উত্তরচরিত সমালোচনের শেষভাগে, ঐ গ্রন্থের সমগ্রভাবে দোষ গুণের বিচার করিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, "কবির আর একটি প্রধান গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে আমরা বুঝাইতে বাসনা করি। কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ব্যবহৃত শব্দ গুলি একালে পরিহার্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বই রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়িভাব, কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ, প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই, না স্থায়ী না ব্যভিচারী। কিন্তু একটি কাব্যানুপোযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকরস্বরূপ স্থায়িভাবে প্রথম স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি জ্ঞাপক, কোন রস নাই, কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি। আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি। মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমোচিত বর্ণন দ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে স্থায়িভাব নাম দিয়া এশব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজ আলঙ্কারিকেরা তাহাকে Passions বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম'।

ইহাই হইল বঙ্কিমবাবুর নিজের কথা। ইহা ছাড়া উপস্থিত আলঙ্কারিক দিগের সম্বন্ধে তাঁহার আর কোথাও কোন অভিমত প্রকাশিত নাই। এ প্রবন্ধেত নাই-ই, অন্য কোথাও আছে বলিয়াও ত মনে হয় না। ইহাতে ব্যঙ্গের ছায়াও নাই, থাকিতেও পারে না। এই কয় ছত্রের বিষয়ও যেরূপ, গুরু ভাষাও তদনুরূপ হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় কি এস্থলটি দেখিতে পান নাই? এই কয়ছত্রে বঙ্কিমবাবু তাঁহার স্বাভাবিক সরলতাপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় আলঙ্কারিকদিগের সহিত তাঁহার কোথায় বিরোধ, নব্য অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার পদ্ধতির কোন জায়গাটিতে ত্রুটী, তাহার মূল কথাটি স্বীয় পদোচিত মর্য্যাদার সহিত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের দেশীয় শাস্ত্রাধ্যয়নে অনেক স্থলে একটি প্রধান অন্তরায়, সেই শাস্ত্রীয় পরিভাষা প্রকরণ। সময় সময় পরিভাষা এত বেশী, এত জটিল হয় যে তাহা শাস্ত্রার্থকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ বুঝিতেই বিদ্যার্থীর সমস্ত মনোযোগ চলিয়া যায়, প্রকৃত শাস্ত্রার্থের দিকে বড়বেশী নজর থাকে না, এবং প্রকৃত শাস্ত্রার্থ ও পরিভাষার ভরে এরূপ বিকৃতভাবে অভিব্যক্ত হয় যে মনোযোগ দিলেও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া সুকঠিন হয়। নব্য ন্যায় ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নব্য ন্যায়ের যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই আমার স্থির ধারণা হইয়াছে যে, উহার পরিভাষা প্রকরণ যদি কাহারও ঠিক আয়ত্ত থাকে তাহা হইলে উহার বিচার বুঝিতে তাহার ততবেশী কষ্ট হয় না। তবে নব্য ন্যায়ে চিন্তার গতি এত সূক্ষ্ম ও এত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত যে, তাহার জন্য ঐরূপ পরিভাষা সমুদ্র সৃষ্টি না করিয়া উপায় নাই; এবং ঐরূপ পরিভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই পারিভাষিক প্রকরণ বুঝিলে বিচার বুঝিতে তত কষ্ট হয় না। শাস্ত্রের গতিও প্রসারের বৃদ্ধির সহিত পরিভাষারও বৃদ্ধি অনিবার্য্য। এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনও হয়। বহু বাক্য সম্বলিত একটি গুরু বিষয় বারংবার উল্লেখ না করিয়া যদি তাহারই সঙ্কেতরূপ একটি ছোট কথায় সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সময়েরও যথেষ্ট লাঘব হয়, এবং অনেকস্থলে বুঝিবারও সুবিধা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সেই পরিভাষা প্রকৃত বিষয়টিকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তদ্দ্বারা একটি স্বাভাবিকী সাধারণী বৃত্তিকে একটা কৃত্রিম বিষয়ে পরিণত করে, তাহা হইলে তাদৃশী পরিভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্যা। আমাদের নব্য অলঙ্কার শাস্ত্রে সেই দোষটি ঘটিয়াছে। সেই কথাটিই বঙ্কিমবাবু উপরি উদ্ধৃত পঙক্তিটিতে বুঝাইয়াছেন। মনের গতি অনন্ত, অতএব তদনুসারে নাটকে বর্ণনীয় ভাবও অসংখ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নব্য আলঙ্কারিকেরা বলিলেন ভাব মোট একচল্লিশটি। তন্মধ্যে রতি, শোক, ইত্যাদি আটটি স্থায়ী অর্থাৎ প্রধান এবং নির্ব্বেদ, গ্লানি ইত্যাদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী অর্থাৎ অপ্রধান। ইহারাই অপ্রধান ও পূর্ব্বোক্তরাই বা প্রধান কেন তাহারও কোন বিশেষ কারণ বলিলেন না। বড় জোর কেহ কেহ স্থায়িভাব দশটি বলিয়াছেন। তাহার অধিক আর কেহই কিছুই বলেন নাই। এই জন্যই বঙ্কিম বাবু বলিলেন "নয়টি বই রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য।

রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়িভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ, প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব ইত্যাদি। সুতরাং এবংবিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না।" এই পরিভাষা লইয়াই বিবাদ—প্রকৃত বস্তু লইয়া নহে। আলঙ্কারিক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রস এবং বঙ্কিম বাবু কবির একটি প্রাচীন গুণস্বরূপ যে রসোদ্ভাবনের কথা বলিলেন তদুভয়েই বস্তুতঃ এক। তত্ত্বগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে কিছুই নাই। পাছে সে বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ হয় তাই তিনি পরবর্ত্তী ছত্রেই নিজেকে সুস্পষ্ট করিলেন। "অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে স্থায়িভাব নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার।" তাঁহার মতে "ঐ সকল বেগবতী মনোবৃত্তিগণের কাব্যগত প্রতিকৃতিই" অর্থাৎ কাব্যাকারে পরিণত, সৌন্দর্য্যপূর্ণ সম্যক বিকাশপ্রদর্শনই রসোদ্ভাবন। সাহিত্য-দর্পণের ভাষায় :—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতা মেতি রত্যাদিঃ স্থায়ি ভাবঃ সচেতসাম্॥

অর্থাৎ রতি, শোক, প্রভৃতি স্থায়িভাব নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উদ্দীপক বস্তুদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়া এবং তদনুযায়ী হর্ষাদিব্যভিচারিভাব কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া, স্বহৃদয় ব্যক্তিগণের সমীপে রসরূপে পরিণত হয়। সোজা কথায়, রতি প্রভৃতি যে কোন একটি স্থায়িভাব প্রকাশক বস্তুর নায়ক নায়িকাদি কর্ত্তৃক অভিনয়োপন্ন সৌন্দর্য্যই রস। উভয়ের কথায় পারিভাষিক বিভিন্নতা ভিন্ন বস্তুতঃ প্রভেদ কিছু আছে কি ?

ভারত নাট্যাচার্য্য শ্রীমান্ মহর্ষি ভরত এই পারিভাষিক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই ভরত বাক্য উদ্ধৃত করিলাম :—

"নশক্যমস্য নাট্যস্য গন্তুমন্তং কথংচন।
কস্মাদ্বহুত্বাত্তাবানাং শিল্পানাং বাপ্যনন্ততঃ॥
একস্যাপি নবৈশক্য মন্তং জ্ঞানার্ণবস্য হি।
গন্তুং কিং পুনরন্তেষাং জ্ঞানানামর্থ তত্ত্বতঃ॥
কিং ত্বল্প সূত্রগ্রন্থার্থমনুমান প্রসাধকম্।
নাট্যস্য-স্য প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদি সংগ্রহম্॥"

অর্থাৎ, ভাব ও শিল্পের বহুত্ব প্রযুক্ত এই নাট্য শাস্ত্রের অন্তে কেহ যাইতে পারে না। ইহার এক বিষয়ের সম্যক তত্ত্ব নিরূপণ অসম্ভব সকলের ত দূরের

কথা। তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি অল্প কথায় রস ও ভাবের সংগ্রহ অর্থাৎ সার বলিতেছি। ঐ সময়েরই অন্যতম আলঙ্কারিক দণ্ডী ইহাও করেন নাই। তিনি রসের ভেদের দিক দিয়াও যান নাই। রস তাঁহার মতে কি? না, "যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তঃ মধুনেব মধুব্রতাঃ"। অর্থাৎ তাহাই রস যাহাতে ধীমান-গণ, মধুতে মধুব্রতের ন্যায়, উন্মত্ত হন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ভরত বা দণ্ডী নহেন। তাঁহার লক্ষ্য নব্য আলঙ্কারিকগণ। তাঁহারাও পাকতঃ বঙ্কিমবাবুর কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কারণ, যদিও তাঁহারা এই নয়টি অথবা দশটিকে রস বলেন কিন্তু তথাপি তদ্ভিন্ন অন্যান্য চিত্তবৃত্তিকেও একরূপ বাদ দেন নাই। এই নয়টিকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ও রসকল্প 'ভাব' শব্দ দিয়া তাহাদের গ্রহণ করিয়াছেন। যদি কোন রচনার স্থায়িভাব রতি, অর্থাৎ দুইজনের পরস্পরাশক্তি দম্পতী বিষয়ক হয় তাহা হইলে ঐ রচনাকে নব্যেরা আদি রসাশ্রিত বলেন। কিন্তু রতি যদি দম্পতী বিষয়ক না হইয়া রাজা প্রজাবিষয়ক, বা গুরুশিষ্য বিষয়ক, বা অন্য কোন বিষয়ক হয় তাহা হইলে সেই রচনাকে আদি রসাশ্রিত না বলিয়া বলিবেন রতিভাবাশ্রিত। উভয়ই কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্য। 'দয়া'র কোন ভিন্ন স্থান নাই। বীররসের মধ্যেই উহা গৃহীত হইয়াছে, ইত্যাদি। এইরূপে নব্যেরা রসের অভাব অনেকটা দূর করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করা নিতান্ত শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শের ন্যায়। অতএব তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ অনুযোগ সহিতে সম্পূর্ণ বাধ্য।

এই অলঙ্কার প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় একটু কৌশল করিয়াছেন। তিনি স্বীয় মন্তব্য পোষণার্থ বঙ্কিমবাবুর কয়েক ছত্র লেখা তুলিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে যখন এই উত্তরচরিত সমালোচনা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার মধ্যে ঐ কয় ছত্র লেখা ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে যখন ঐ সমালোচনা প্রবন্ধাকারে পুনঃ মুদ্রিত হয় তখন বঙ্কিমবাবু উহা তাহার ভিতর হইতে উঠাইয়া দেন। শাস্ত্রী মহাশয় সেই কয়ছত্র লেখা উঠাইয়া আলঙ্কারিকদিগের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ দেখাইয়াছেন। আজ যদি কোন সভ্যদেশে শাস্ত্রী মহাশয় এরূপ করিতেন, তাহা হইলে তদ্দেশীয় সুধী সমাজ তাঁহার কি শাস্তি বিধান করিতেন বলিতে পারি না। কিন্তু এ বঙ্গদেশ, এখানে সকলই শোভা পায়। বহুকাল স্বর্গগত গ্রন্থ কর্ত্তার লেখার ভিতরে তাঁহার পরিত্যক্ত অংশ হইতে স্বীয় অভিপ্রায়ানুযায়ী স্থল বাছিয়া লইয়া তাঁহারই নামে তাহার প্রচার করিতে

চেষ্টা করাকে ভাষায় কি বলিয়া অভিহিত করিতে হয় তাহা আমি জানি না। যাহা হউক, তিনি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ সফলকাম হইতে পারেন নাই। তিনি যাহা তুলিয়াছেন তাহা এইরূপ ;—"পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কি না, ইহা রূপক, কি উপরূপক, নাটক, কি প্রকরণ, ব্যায়োগ, কি ত্রোটক, ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি, এ সকল তত্ত্বের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত নহি। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র একেবারে বিস্মৃত হউন। নচেৎ নাটকের রস গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এ কবির সৃষ্টির মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন তবে আমাদের অনুবর্ত্তী হউন।"

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন যে এখানেও বিবাদ ঐ পারিভাষিক শব্দাড়ম্বরের উপর। তিনি সোজা কথায় বুঝাইতে চাহেন, ভাষার গোলমাল কিছুতেই রাখিতে চাহেন না। যে পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিটি আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি যদি সেই পঙ্‌ক্তি না থাকিত তাহা হইলে এই পঙ্‌ক্তি হইতে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের উপর বঙ্কিমবাবুর বিরাগ কতকটা দেখাইতে পারা যাইত। কিন্তু তাহাও নিতান্ত জোর করিয়া। ঐ পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তি পড়িয়াও যে কি করিয়া লোকে বলিতে পারে তিনি ঐ শাস্ত্রকে বা আলঙ্কারিকদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া তাহার গ্লানি দূর করিয়াছেন। অযথা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মর্ম্মে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিদ্বয়ের ইহাই স্পষ্ট অভিব্যক্তি। ইহাকেই স্পষ্টতর করিবার জন্য তিনি পরিশেষে তাঁহার প্রথমোক্তিটি পরিহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাহার আর কোনই কারণ হইতে পারে না। উত্তর চরিত সমালোচনা তিনি সম্পূর্ণ অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে করিয়াছেন। কেবল পরিভাষাকে বাদ দিয়াছেন। রামচন্দ্রের কান্নার সমালোচনায় বলিয়াছেন। "এত বাগাড়ম্বরে করুণ রসের হানি হয়"। কথাটি সাহিত্যদর্পণের প্রতিধ্বনি মাত্র।

"সম্ভোগে করুণে বিপ্রলম্ভে শান্তে অধিকংক্রমাৎ
অবৃত্তিরল্পবৃত্তিঃ মধুরারচনা তথা॥"—সাহিত্যদর্পণ। ৭।৬০৯ ও ৬১০

অর্থাৎ, ভাষার মাধুর্য্য গুণময়ী রচনায় সমাস থাকিবে না। যদি থাকে অল্প এবং ঐ গুণময়ী রচনা সম্ভোগ, করুণ, বিপ্রলম্ভ ও শান্ত এই কয় রসে উত্তরোত্তর অধিকভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উহার অভাবে ঐ ঐ রসের হানি হয়। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "এত বাগাড়ম্বরে করুণ রসের হানি হয়। ছায়াঙ্ক অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য বিসর্জ্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন তাহার সঙ্গে ইহার কোনও সংশ্রব নাই। সচরাচর এরূপ একটী সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া বিশেষ রস ভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকের প্রতিকৃত হইবে তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত।" এটি একটি সুনিপুণ আলঙ্কারিকের কথা। এমন কি ইহাতে আবশ্যক বিবেচনায় শাস্ত্রোক্ত দুইটি পারিভাষিক শব্দ 'কার্য্য' ও 'উপসংহৃতি' তাহাদের পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা ইহার সহিত পাঠক-বর্গকে 'সাহিত্যদর্পণে'র ষষ্ঠাধ্যায়ের দুইশত আটাত্তর কারিকার দ্বিতীয় শ্লোক, তিনশত ষোল কারিকার শেষার্দ্ধ, ও 'দশরূপে'র তৃতীয় পরিচ্ছেদের উনত্রিংশ কারিকা পড়িতে অনুরোধ করি। দেখিবেন কথায় কথায় মিলিবে। রসের বিচার ত পূর্ব্বেই হইয়াছে।

এইবার আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের কথা বলিব। প্রথমেই তিনি তাঁহার নিজেরই কল্পনা প্রসূত বঙ্কিমবাবুর অলঙ্কার বঙ্গের বিরুদ্ধে সাফাই দিতে গিয়া বলিতেছেন, "কিন্তু এই বিয়াল্লিশ বৎসরে সংস্কৃত অলঙ্কারের অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবু আধুনিক আলঙ্কারিককে যত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তত নিন্দার পাত্র নহে। "অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে"। উৎকৃষ্ট কাহারা? ঐ প্রাচীন গ্রন্থগুলিই? না তদ্ভিন্ন নব্য গ্রন্থ? শেষ পক্ষ নিশ্চয়ই। কেন না যখন ঐ সকল মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে বঙ্কিমবাবু আধুনিক আলঙ্কারিককে যত নিন্দা করিয়াছেন তাহারা তত নিন্দার পাত্র নহেন। তখন ঐ সকল গ্রন্থ নব্য অলঙ্কার সম্বন্ধীয় হইতেই বাধ্য। কেন না, প্রাচীন গ্রন্থে নবীন আলঙ্কারিকদিগের উল্লেখ থাকা অসম্ভব। আর শাস্ত্রী মহাশয় যখন নিজেই অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ করিয়া লইতেছেন তখন ঐ উৎকৃষ্ট কথাটির পর আমরা একটি আধুনিকতা

বাচী শব্দের জ্ঞান করিয়া লইতে বাধা। কিন্তু আমরা 'সাহিত্যদর্পণ'কে অলঙ্কার শাস্ত্রের নবীনতম গ্রন্থ বলিয়া জানি। * অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহা কিছু বিস্তার, যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তৎসমস্তই সম্বলিত করিয়া দর্পণকার শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এই 'সাহিত্যদর্পণে'র সহিত বঙ্কিমবাবুর যথেষ্ট পরিচয় ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তিনি স্বয়ংও ঐ প্রবন্ধে যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে সেইখানেই সাহিত্যদর্পণ হইতে বচন তুলিয়াছেন। অতএব এই বিয়াল্লিশ বৎসরে আর কি নবীনতর গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে যাহা দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিমবাবুর ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা উচিত ছিল।

প্রাচীনদের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আবার নবীনদের অপেক্ষা আরও ভাল ছিলেন। "নব্য আলঙ্কারিকেরা পিঁজিয়া পিঁজিয়া যেখানে যে ছোটবড় গুণটি, দোষটি, অলঙ্কারটুকু, রসটুকু থাকে তাহা দেখাইয়া দিতে খুব মজবুত। প্রাচীনেরা ইহা অপেক্ষা আরও কিছু পারিতেন। তাঁহারা গল্পটি কিরূপে সাজাইতে হয় সে সম্বন্ধেও পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিরূপে রস ও ভাব ধীরে ধীরে ফুটাইতে হয় তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন।" প্রাচীন বলিতে গেলে সর্ব্ব প্রথম মহর্ষি ভরতপ্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'; মহর্ষি ভরতই নাট্যজগতের প্রথম প্রবর্ত্তক। ঐ শাস্ত্রে শেষ গ্রন্থ 'সাহিত্য দর্পণ' বলা হইয়াছে। আমরা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আর একখানি গ্রন্থ লইব। এই তিনখানি গ্রন্থের কথিত বিষয়ের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিব যে অলঙ্কারশাস্ত্র ভরত হইতে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া কিরূপে শাস্ত্রী মহাশয়-কথিত অঙ্গহানি ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী গ্রন্থ হিসাবে আমরা ধনঞ্জয় প্রণীত 'দশরূপ'কে লইব। Macdonnelসাহেব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীকে নাট্য শাস্ত্রের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণের সময় বলিয়াছেন চতুর্দ্দশ শতাব্দী। আর ধনঞ্জয়ের বলিয়াছেন দশম শতাব্দী। অতএব তিনিই ভরত ও বিশ্বনাথের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইবেন।

গল্প সাজাইবার বিষয় প্রধানতঃ ভরতীয় নাট্যশাস্ত্রের ঊনবিংশ অধ্যায়ে আছে। ভরত গল্প সাজাইতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন যে ইতিবৃত্তকে

* "একাবলী"কেও আমরা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলি।

অর্থাৎ নাট্যের বর্ণিত বিষয়কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এবং সেই এক একটি ভাগের অনুযায়ী নাট্যের এক একটি অংশকে এক একটি সন্ধি বলিয়া জানিতে হইবে। এক্ষণে এই পাঁচ রকমের ভাগ বুঝিতে গেলে প্রথমে পাঁচটি জিনিষ বুঝিতে হয়। যাহাদের দ্বারাই এই পাঁচ রকম ভাগের সৃষ্টি হয় সেই ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ আগে এই পাঁচটি জিনিষ বুঝাইয়া পরে ভাগগুলিকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রকার তাহা করেন নাই। তিনি ভাগ কয়টি বুঝাইয়া পরে ঐ গুলিকে বুঝাইয়াছেন। যাউক্, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বিদ্যার্থীর বুঝিবার পক্ষে একটু তারতম্য হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত বস্তুর কিছু বৈপরীত্য হয় না। জিনিষগুলি সকলেই এক বলিয়াছেন। সেগুলি এই, বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, ও কার্য্য। নাট্যশাস্ত্রের ভাষায়,

"বীজং বিন্দুঃ পতাকাচ প্রকরী কার্য্যমেবচ।
অর্থ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি॥"

নাট্যশাস্ত্র।১৯।২০।

অর্থাৎ, বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, ও কার্য্য এই পাঁচটি হইল অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি-রূপ যে নাটকের বর্ণনীয় বিষয়, তাহার সিদ্ধিহেতু অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের সিদ্ধি এই পাঁচটির সম্যক সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। অতএব এই পাঁচটিকে সম্যকরূপে অবগত হইয়া যথাবিধি যোজনা করিবে। ধনঞ্জয় ইহারই প্রতিধ্বনি করিলেন,

"বীজবিন্দুপতাকাপ্রকরীকার্য্যলক্ষণাঃ।
অর্থ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ তা এতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

—দর্শরূপ।১।১৭।

বিশ্বনাথ ভরত বাক্যটিই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বীজ বলিতে গেলে নাট্যের মুখ্যফলের মূল বুঝিতে হইবে। নাট্যই হউক আর অন্য কোন রকমের কাব্যই হউক, কোন রকমের গল্প হইলেই তাহার একটি মুখ্যফল থাকে, নায়ক কর্ত্তৃক যাহার প্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে গল্পের শেষ হয়। আমাদের দেশে প্রাপ্তিই,—কেন না, অভীষ্টফলের অপ্রাপ্তিবিষয়ক গল্প লোক শিক্ষার বিরোধী হয় বলিয়া অস্মদ্দেশে তাহা পরিত্যাজ্য। ঐ মুখ্যফল প্রাপ্তির যাহা মূলীভূত কারণ, যাহা হইতেই ঐ মুখ্যফল উদ্ভূত হয় তাহাকে বীজ বলে। যেমন শকুন্তলায়, কণ্বের তপোবনে রাজার গমন। ঐ বীজ হইতেই পরিশেষে শকুন্তলার সহিত তাঁহার নিষ্কণ্টক মিলনরূপ মুখ্যফলের প্রাপ্তি

হইল। ঐ যে মুখ্যফলের প্রাপ্তি বলা হইল তাহাই হইল নাটকের 'কার্য্য', ইংরাজিতে যাহাকে 'The final catastrophe of the drama' বলে। 'প্রকরী' ও পতাকা এই দুইটি নাটকের প্রাসঙ্গিক বিষয়। মূল ঘটনার সিদ্ধার্থ ও তাহাকে সম্যক পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী করণার্থ, নায়ক-নায়িকা ভিন্ন অন্যান্য পাত্রপাত্রী কর্ত্তৃক মুখ্যফলের অনুকূল ও প্রতিকূল যে সমস্ত কার্য্যান্তর বর্ণিত হয়, তাহাকে প্রাসঙ্গিক বস্তু বলা যায়। যদি ঐরূপ কোন প্রাসঙ্গিক বস্তু দীর্ঘ অর্থাৎ দুই তিন সন্ধি স্থায়ী হয় তাহাকে 'পতাকা' বলে, আর যদি অল্প হয় তাহাকে 'প্রকরী' বলে। 'বিন্দু' হইল এই সকল প্রাসঙ্গিক কথার সহিত মূল ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপন। বিন্দু থাকিতেই হইবে, তবে কোথাও তাহা স্পষ্ট আর কোথাও অন্তর্নিহিত।

এইবার পাঁচটি ভাগ বুঝা যাউক। এই যে মুখ্যফল প্রাপ্তিরূপ কার্য্য বলা হইল শাস্ত্রকারেরা ইহার পাঁচটি ক্রমিক অবস্থার নির্দ্দেশ করেন। সেই এক একটী অবস্থার অনুযায়ী নাটকের এক একটি অংশকে এক একটি 'সন্ধি' বলা হয়। প্রথম হইল 'মুখসন্ধি' অর্থাৎ নাটকের প্রথম ভাগ, যে ভাগে 'কার্য্যে'র প্রথম অবস্থা 'আরম্ভ' বর্ণিত হয়, 'আরম্ভ' বলিলে বীজ নিধানানন্তর ফলপ্রাপ্ত্যর্থ শুদ্ধ ঔৎসুক্যের বিকাশ বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়ভাগ 'প্রতিমুখসন্ধি'। এই ভাগে বর্ণনীয় বিষয়, 'কার্য্যে'র দ্বিতীয় অবস্থা 'প্রযত্ন' অর্থাৎ ফল প্রাপ্ত্যর্থ চেষ্টা। তৃতীয় 'গর্ভসন্ধি'। এই ভাগে 'কার্য্যে'র তৃতীয় অবস্থা "প্রাপ্ত্যাশা।" "প্রাপ্ত্যাশা" বলিলে ফলপ্রাপ্তির আশা অথচ বিঘ্নাদির সম্ভাবনা বশতঃ নিরাশাও উভয়কেই লইতে হয়। চতুর্থ ভাগ 'বিমর্ষ সন্ধি'। ইহা 'কার্য্যের' চতুর্থ অবস্থা 'নিয়তাপ্তির' অংশ। এই ভাগে বিঘ্নাদির নিরাকরণের দ্বারা ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয় হয়। পঞ্চম ভাগ 'নির্ব্বহণ সন্ধি' এই ভাগে সমগ্র ফলপ্রাপ্তি অঙ্কের সহিত সন্ধির কোন সম্বন্ধ নাই। অঙ্ক ঘটনার উপর নির্ভর করে। একই সন্ধিতে দুই তিনটি অঙ্ক থাকিতে পারে। আবার একই অঙ্কেতে একটি সন্ধির শেষ হইয়া পর সন্ধির আরম্ভ হইতে পারে। বীজকে, মূল ঘটনার সহিত বিন্দুদ্বারা সংশ্লিষ্ট, প্রকরী ও পতাকার সহায়তায় এই পাঁচটি অবস্থার ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া শেষ অবস্থায় মুখ্যফল পাওয়াইতে হইবে। ইহাই হইল নাট্য লিখিবার মূল প্রথা। ইহার উপর আর কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। লিখিত বস্তুর ভিতর এমন কোন বস্তু না থাকে যাহা নায়কের প্রতি কোনরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিম্বা যে সকল বস্তু নীরস, অথচ আখ্যায়িকার জন্য প্রয়োজন সে সকল বস্তু, যেন সবিস্তারে অঙ্কের মধ্যে

বর্ণিত না হয়। তাহা অঙ্কের বাহিরে দুই একজন পাত্র বা পাত্রী দ্বারা বলাইয়া লইতে হইবে। ইত্যাদি।

রস ও ভাব ধীরে ধীরে ফুটাইবার সম্বন্ধে কোথাও আলাহিদা ব্যবস্থা দেখিতে পাই নাই। গল্পটিও যেমন ধীরে ধীরে ফুটিবে, রসও তেমনই ধীরে ধীরে ফুটিবে। ভাবও তাহার সহিত। এই গল্প সাজাইবার ও রস ও ভাব ধীরে ফুটাইবার কথা ভরতে যেমন আছে, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথে ঠিক তেমনই আছে। সন্ধি প্রভৃতির ঐক্য দেখাইবার জন্য আমরা আর অনর্থক কতকগুলা সংস্কৃত শ্লোক তুলিলাম না। যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ তিন গ্রন্থ দেখিয়া লইতে পারেন। বিশ্বনাথ ইহাকে আর একটু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'সাহিত্য-দর্পণের' সপ্তম পরিচ্ছেদে 'দোষের' বিচার আছে। গল্পটী কিরূপে সাজাইতে হয়, রস ও ভাব কিরূপে ধীরে ধীরে ফুটাইতে হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে গেলে কিরূপ ভাবে সাজাইলে তাহা হয় না, তাহারও উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। রসপোষক ও রসাপকর্ষক উভয় বস্তুই সমভাবে প্রদর্শনীয়। নচেৎ অলঙ্কার-শাস্ত্রের ত্রুটী হয়। কিন্তু প্রাচীন দুইজনের কেহই ঐরূপ ভাবে স্ব স্ব গ্রন্থের কোন অংশে বিশেষ করিয়া দোষের বিচার করেন নাই। বিশ্বনাথ করিয়াছেন।

তাঁহার উল্লিখিত দোষগুলির মধ্যে দুএকটীর বিশ্লেষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, তিনি গল্প ভাল করিয়া সাজাইবার, রস ও ভাব ধীরে ধীরে ফুটাইবার অন্তরায়গুলি দূর করিতে কতদূর ব্যগ্র। একটি দোষ তিনি দেখাইয়াছেন, "অকাণ্ডে প্রথন চ্ছেদৌ তথা দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।" কোন বস্তুর অসময়ে আরম্ভ করিতে নাই, কিংবা অসময়ে সমাপ্তি করিতে নাই। অথবা একই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে নাই। প্রথমটীর উদাহরণ স্বরূপ তিনি একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেণীসংহারের প্রথম অঙ্কে ঘোর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাপারের ভিতর দুর্য্যোধন ও ভানু-মতীর দাম্পত্যোচিত আদিরসাশ্রিত কথোপকথন বর্ণিত আছে। দর্পণকার ঐ স্থলটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন ঐ ঘোর বীর রসে অকস্মাৎ ঐরূপ আদিরসের অবতারণায় কতদূর রসভঙ্গ হইয়াছে। ঐরূপ [illegible] প্রত্যেকটীই একটী একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর [illegible] বলিয়াছেন, "প্রকৃতীনাং বিপর্য্যয়ঃ" অর্থাৎ কাব্যের পাত্রপাত্রিগণের চরিত্র প্রথমে একভাবে অঙ্কিত করিয়া পরিশেষে অন্যভাবে অঙ্কিত করা। ইহা যে কতদূর দোষ আশা করি তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এইরূপ আটটি দোষ তিনি দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়া ভাষার দোষ ত আছেই।

ভরতের কথা ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ উভয়ের কেহই কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। ভরত এই শাস্ত্রের ঋষি। আমাদের সকল শাস্ত্রই একজন না একজন ঋষি হইতে প্রসূত। নাট্যশাস্ত্র ভরত হইতে। সকল শাস্ত্রেরই পরবর্ত্তী লেখকগণ তত্তৎঋষিদর্শিত মার্গ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইতে পারেন না। ঋষিবাক্য বজায় রাখিয়া বেশীর ভাগ তাঁহাদের কথা বলিতে পারেন, কিন্তু ঋষিবাক্যের একটী বর্ণও বাদ দিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। ভরত যাহা বলিয়াছেন, ধনঞ্জয় তাহা একটু বাড়াইয়াছেন, বিশ্বনাথ আর একটু বাড়াইয়াছেন। বিশ্বনাথ, ভরত ও ধনঞ্জয় উভয়ের কাহারও কথার কোন অংশই বাদ দেন নাই। ভাব বিচার আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ভরত বলিলেন প্রধান ভাব আটটি।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ংতথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ভরত ।৬।১৭।

অর্থাৎ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই আটটিকে স্থায়িভাব বলা হয়। ধনঞ্জয় বলিলেন,

"রত্যুৎসাহ জুগুপ্সাঃ ক্রোধোহাসঃস্ময়ো ভয়ংশোকঃ
শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য।"

দশরূপ ৪।৩৩

অর্থাৎ রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা, ক্রোধ, হাস, বিস্ময়, ভয়, শোক, এই আটটি স্থায়িভাব। কেহ কেহ শমকেও বলেন কিন্তু তাহার সম্যক্ পুষ্টি নাট্যে হয় না।* বিশ্বনাথ ঐ শমকে মানিয়া লইলেন, এবং আর একটী বাড়াইলেন,

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধেৎসাহৌ ভয়ংতথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেথমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ॥"

সাহিত্যদর্শন ।৩।২১৬

অর্থাৎ ঐ আটটীই এবং শমও স্থায়িভাব, পরে মুনীন্দ্রের মতে বলিলেন,

"স্থায়ী বৎসলতা স্নেহ" বাৎসল্যও স্থায়িভাব। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় যে

*'কাব্যলী'তে বিচারের দ্বারা 'শম'কে স্থায়িরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বলিয়াছেন, "প্রাচীনেরা আরও কিছু জানিতেন ইত্যাদি" তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বঙ্কিমবাবু যে ধরণে উত্তর-চরিত পরীক্ষা করিয়াছেন, সেই ধরণ, অর্থাৎ ইউরোপীয় ধরণ, আমাদের দেশীয় ধরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি বলিতেছেন, "নূতন ধরণের যে পরীক্ষা অষ্টাদশশতকে জার্ম্মানীতে আবির্ভূত হইয়া এখন সমস্ত ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের দেশেও আসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত। ছোটখাট দোষগুণ অলঙ্কার রস তাঁহারা একেবারেই দেখিতে চাহেন না। তাঁহারা সমস্ত বইটা বেশ করিয়া হজম করিয়া তাহা হইতে রস আকর্ষণ করিতে চাহেন।" অর্থাৎ, দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সমগ্র বই হইতে রস আকর্ষণ করেন না, তাঁহাদের রস ছোট। আর সাহেবরা সমস্ত বই হইতে রস আকর্ষণ করেন, তাঁহাদের রস বড়। কথাটা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। দেশীয় পণ্ডিতেরাও সমগ্র বইটা বেশ করিয়া হজম করিয়া তবে তাহার রস আকর্ষণ করেন—তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইতে নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেরও ভিন্ন ভিন্ন রস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সেই সেই অংশের,—সমগ্র কাব্যটার নহে। সমগ্র কাব্যটার রস সমগ্র কাব্যটার পাঠ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার অংশের পাঠ হইতে নহে। বঙ্কিমবাবুর ভাষায়, "এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না।" সমস্ত বইটা পাঠ করিয়া যে তৃপ্তি অর্থাৎ মানসিক প্রসন্নতা জন্মায়, তাহাই যে দেশীয় আলঙ্কারিকদিগের রস, তাহা বঙ্কিমবাবুই বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

বোধ হয় আধুনিক অলঙ্কার-শাস্ত্রসমূহে বস্তু-বিবৃতির যে পন্থা আছে, তাহাই মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়কে এই ভ্রমে পাতিত করিয়াছে, সে পন্থা এইরূপ। প্রথমে ব্যাখ্যেয় বস্তুর নামতঃ উল্লেখ, তাহার পর তাহার ব্যাখ্যান ওপরে তাহার একটী উদাহরণ দিয়া সেইটী বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আধুনিক অলঙ্কার শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই পন্থা অনুসৃত হইয়াছে। রস বিচারেও। রসের প্রথমতঃ নামতঃ উল্লেখ করিয়া, পরে তাহাকে বুঝাইয়া, তন্নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটী শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে মনে হইতে পারে, রস ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকে—একখানি সম্পূর্ণ কাব্যে নহে।

সেটী ভুল। রস সম্পূর্ণ কাব্যেই। ক্ষুদ্র শ্লোকে নয়। একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক যেমন একখানি কাব্য। একটী ক্ষুদ্র শ্লোকও সেইরূপ একখানি কাব্য হইতে পারে। দর্পণকার প্রদত্ত কাব্যের লক্ষণটী দেখিলেই এ কথা বুঝা যায়। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" রসযুক্ত বাক্য হইলেই কাব্য হয়। বাক্য কাহাকে বলে? দর্পণকারেরই কথায়, "বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাঙ্খাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ," অর্থাৎ কোন একটী অর্থপ্রকাশক পরস্পর-সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহই বাক্য। সুতরাং একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটকও যেমন একখানি কাব্য, একটী সম্পূর্ণ সরস অর্থ প্রকাশক একটী ক্ষুদ্র শ্লোকও সেইরূপ একখানি কাব্য। সেই জন্যই রসের উদাহরণ দিতে গিয়া সুদীর্ঘ নাটকাদির উল্লেখ না করিয়া সুবিধার জন্য একটী ক্ষুদ্র শ্লোক দেওয়া হয়। বিভাবানুভাব প্রভৃতি রস সৃষ্টির যে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু,সে সকল একখানি নাটকেও যেরূপ থাকিতে পারে, একটী শ্লোকেও সেই রূপ থাকিতে পারে।

আমরা প্রবন্ধ শেষ করিলাম। আমাদের মনে যাহা সংশয় হইয়াছে, তাহাই বলিয়াছি। আশা করি সুধীজনমণ্ডলী আমাদের দোষ লইবেন না। সমস্ত বইটা পড়িয়া হজম করিয়া তাহা হইতে রস আকর্ষণ করিবার প্রথা আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে কত সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারি নাই। করিতে গেলে দোষ গুণ প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর সম্যক বিচার করিতে হয়। বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

## শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
## ও
## বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারবান পাঠক।

ঐ বৈশাখ মাসের নারায়ণেই শ্রীযুক্ত (প্রিন্স)* জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও "বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান পাঠক" শীর্ষক একটী গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটি সুখপাঠ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুইটী দোষ হইয়াছে। প্রথম দোষ নায়ক-বিভ্রাট, দ্বিতীয়, বিষয়-বিভ্রাট।

* এ গল্পে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, রাখাল তাঁহাদের বংশকে Royal family বলিত; অতএব আমরা তাঁহার পূর্ব্বকথিত আখ্যা হইতে বঞ্চিত করিতে সাহস করিলাম না।

গল্পটীর যে কে নায়ক, তিনি নিজে না দ্বারবান পাঠক, তাহা সহসা ঠিক করিতে পারা যায় না। বোধ হয় তিনি নিজেই। কেন না, তিনিই ফল-ভোগী। গল্পের মুখ্য ফল যিনি প্রাপ্ত হন, তিনিই নায়ক হন; তা সে ফল কেন যে হয় আনিয়া দিউক না। বিশাখ দত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকের নায়ক চন্দ্রগুপ্ত। কেন না রাক্ষসের পরাজয়ের ফল তিনিই ভোগ করিলেন। তাঁহারই সিংহাসন দৃঢ় হইল। যদিও চাণক্যই সেই ফল আনয়ন করিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় রাক্ষসের প্রয়াস বিফল হইল, তথাপি তিনি নায়ক নহেন। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। যদিও শ্রীযুক্ত (প্রিন্স্) জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীপতি" রাখাল বাঁড়ুয্যের কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন দ্বারবান পাঠক ও "তাঁহার কাকার" (বঙ্কিমবাবুর) কথার দ্বারা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের দুই জনের কাহাকেও নায়ক বলা যাইতে পারা যায় না। কারণ ঐ অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদনের মুখ্য ফল, তাঁহার রাজবংশোৎপত্তি সংস্থাপন, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতির খ্যাপন তিনিই পাইয়াছেন। অতএব তিনিই নায়ক। তাঁহারা নহেন।

যদিও এ বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ সন্দেহ হয়, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই উহা খোলসা হইয়া যায়। সুতরাং এ দোষটাকে আমরা তত গুরুতর দোষ বলিতে পারি না। দ্বিতীয় দোষটী কিন্তু সত্য সত্যই একটু গুরুতর হইয়াছে। কেন না, গল্পের যাহা বিষয় "তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীপতি" রাখালের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন যাহার ভিতর দিয়া তিনি নিজের মুখ্য ফল পাইয়াছেন, উহা প্রকৃত কথার একেবারে বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য মুখ্য ফলের কিছু হানি হইয়াছে। "রাখাল শুধু কথাই শিখিয়াছে" যদিও এ কথাটি তিনি তাঁহার কাকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, তথাপি কথাটা সত্য ঘটনার সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় তাহাতেও তাদৃশ জোর হয় নাই। আমরা সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিলাম। "শেষে তিনি (চন্দ্রনাথবাবু) বরফ চাহিলেন। তখন কিন্তু বরফের ঠিক সময় নহে। সেটা ফাল্গুনমাস বোধ হয়। কাজেই বরফের জোগার তেমন ছিল না। যাহা হউক তখনই আনান গেল, কিন্তু রাখাল ও আমি কাকা মহাশয়ের বিরক্তির হইলাম। কাকা বলিতেছিলেন, "এখনকার ছেলেগুলা মানুষ নয়ে, রাখ কেবল কথা শিখিয়াছে।" কিন্তু ইহাতেও শ্রীযুক্ত (প্রিন্স) জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টো

পাধ্যায় মহাশয় কিছুই সফল হইতে পারেন নাই। কেন না, রাখাল যে কথা ছাড়া সত্য সত্যই আরও অনেক জিনিষ জানিত, তাহা যে সকলেই জানে। কি রাজসরকারে, কি সাহিত্য-সংসারে তাঁহার কাজের যথেষ্ট পরিচয় আছে, এ কথা যাঁহারা প্রকৃত কাজের কোন খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন। শ্রীযুক্ত প্রিন্স জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাকা নিজেই যে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অনেক সাক্ষ্য দিয়াছেন।

যাহা হউক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বাবুর কল্পনা-শক্তিকে আমরা খুবই প্রশংসা করিতে পারি। এতাদৃশী উর্ব্বরা কল্পনা-শক্তি যথার্থই বিরল। তথাপি তাহাতেও কোথাও কোথাও একটু অসঙ্গতিদোষ ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীপতি রাখালকে তাহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত 'রিমার্কে'র জন্য দ্বারবান পাঠককে দিয়া তাঁহার (শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ বাবুর) কাকার উপর প্রতিশোধ লওয়াইয়াছেন। কিন্তু এটা যেন বড়ই far-fetched অর্থাৎ কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঐরূপ করিলে তাঁহার কাকা পাঠকের উপর রাগিবেন কি না, সেটা বিশেষ সন্দেহস্থল ছিল। ঐরূপ একটা জীবন্ত আহাম্মুকির উপর রাগটা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং তদনুরূপ আহাম্মকেরই সাজে! দেখিতেছি শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাকা আমাদের সে আশা পূর্ণ করিলেন। তাহার পর তিনি একবার ধমকাইলে পাঠকের চতুর্দ্দশ পুরুষের পুনরায় তাঁহার সম্মুখে ঐকথা লইয়া যাইবার সামর্থ্য হইত কি না, সেটা আরও সন্দেহস্থল। কিন্তু তাহাকেও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশবাবু তিনবার যাওয়াইয়াছেন। অতএব এসকল গুলি আমাদের একটু অসঙ্গত মনে হয়। গল্পের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আজকাল স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর সংক্রান্ত কিছু হইলেই মাসিকপত্র সম্পাদক ও অন্যান্য সাহিত্যিকেরা তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। ইহা অবশ্য তাঁহাদের অপরিসীম বঙ্কিমভক্তিরই ফল! কিন্তু সকল স্থলে ঐরূপ করিলে ঐ ভক্তি গুণ হইতে গুণাতিরেকে দাঁড়ায়। মূর্খতার প্রশ্রয় যে বিষয়েই হউক না কেন, কখনই শুভ ফলপ্রদ হয় না। অতএব তাঁহাদের নিকটে আমার যুক্তকরে নিবেদন যে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বিষয়ক রচনা ছাপিবার পূর্ব্বে একবার লেখক ও লিখিত বস্তুর বিষয়ে ভাল করিয়া বিবেচনা করেন। অযথা কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর বহু শোকসন্তপ্ত শীর্ণ পরিবারকে মনঃপীড়িত না করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

# স্মৃতি

সে যে গো নিতি নিতি
　　এমনি ভরা সাঁঝে,
জ্যোৎস্না নিরমল
　　স্বপন শোভা মাঝে,
দাঁড়াত আসি ধীরে
　　তমাল ছায়াতলে ;
গোপন কত কথা
　　জাগিত হৃদিতলে।
আনত আঁখি দুটি
　　সোহাগ লাজলীন,
হিয়াটি প্রেমভরা
　　অতল সীমাহীন ;
আননে মৃদুহাসি
　　কোমল মোহময়,
সুরভি ফুলহার
　　গলাটি ঘিরি রয়।
উপরে নভঃ নীল—
　　উদার মনোহর,
জেগেছে কোটি তারা,
　　শোভন শশধর।
আমরা দুটি জনে
　　তৃষিত দুটি প্রাণ,
বসেছি মুখোমুখি
　　গেয়েছি কত গান।
নদীটি উদাসিনী
　　সে গান গেয়ে চলে,
সে কথা ভেসে আসে
　　উর্ম্মি কলরোলে।
মরণে অমর সে,
　　বিশ্বে অতুলন,
উজল জ্যোতিময়ী,
　　কল্প সুশোভন !

শ্রীকেশবেশ্বর বসু

# উৎসবের এক রাত্রি !

( গল্প )

( ১ )

মেহেরপুরের প্রজারঞ্জক ধর্ম্মপ্রাণ জমীদার বৃদ্ধ মেহের আলীর মৃত্যুর দিন গ্রামের লোক শোকের আধিক্যে যেরূপ আকুল হইয়া পড়িয়াছিল, আজ বৎসরান্তে তাঁহার একমাত্র পুত্র লম্পট উচ্ছৃঙ্খল হাফেজ আলী অভিষিক্ত হইয়া জমিদারীর তক্তে উপবেশন করিবার দিন তাহারা ভবিষ্যৎ উৎপীড়নের আশঙ্কায় সেইরূপ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

জমিদারের সুরম্য অট্টালিকা ভবন আজ বিবিধ লতা-পুষ্পে সজ্জিত। তোরণ-মঞ্চ হইতে নহবতের সুমিষ্ট স্বরলহরী গ্রামখানিকে যেন পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। দলে দলে প্রফুল্ল বালক-বালিকা চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের লোক আন্তরিক ভীত হইলেও, নূতন প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য আপনাদের মধ্যে প্রফুল্লতাকে যেন জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া আজিকার এই অভিষেক উৎসবে যোগদান করিয়াছে।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে দুইজন নর্ত্তকী আসিয়াছে, প্রকাণ্ড হল-কামরায় রাত্রে তাহাদের গানের মুজ্‌রো হইবে। সেই হল্ সাজাইতে সকলে ব্যস্ত। এমন সময় নায়েব আসিয়া জমীদারকে সংবাদ দিল নওগাঁয়ে তাঁহার বন্ধু রস্তম মিঞার নিকট নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয় নাই; রহিম্‌কে তথায় যাইতে বলায় সে অস্বীকার করিয়াছে।

জমীদার মহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ ক্রোধমিশ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে যাবে না কেন ?"

নায়েব উত্তর করিল—"সে বলে আকাশে বড় মেঘ, এখুনি ঝড় উঠ্‌বে, এখন সে ও-পারে যেতে পার্‌বে না।"

জমীদার মহাশয় কহিলেন—"আচ্ছা তা'কে ধরে এনে আমার কাছে এখনি পাঠিয়ে দাও।"

( ২ )

রহিম সেখ দরিদ্র মুসলমান;—জমীদারের বেতনভোগী মাঝি। গ্রামের প্রান্তে পদ্মাতীরে তাহার ক্ষুদ্র কুটীরখানি।

রহিম তখন নিজ কুটীরের অঙ্গনে বসিয়া পত্নী ও একমাত্র পুত্রের সহিত কথোপকথন করিতেছিল। জমীদারের সর্দ্দার পাইক আসিয়া হাঁকিল—"রহিম।"

রহিম—"কেন সর্দ্দার ?"

সর্দ্দার—"বাবুজী তোকে তলব করেছেন, চল্ জল্‌দী যেতে হবে।"

রহিম ধীরে ধীরে উঠিয়া সর্দ্দারের সহিত চলিয়া গেল।

সুসজ্জিত কক্ষে মোসাহেব পরিবেষ্টিত মদিরাবিহ্বল নবীন জমীদার, হাফেজ আলী উপবিষ্ট। সেখানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হাসির ফোয়ারা উঠিতেছিল, আনন্দের লহর ছুটিতেছিল। দরিদ্র রহিম জীর্ণ, ছিন্ন, মলিন বেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শঙ্কিত হৃদয়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

হাফেজ আলী একবার রহিমের দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—"রহিম আজ তোকে ও-পারে—নওগাঁয়ে যেতে হবে।" রহিম করজোড়ে বিনীত স্বরে কহিল—"আজ আমার কসুর মাফ্ করুন কর্ত্তা,—বড় মেঘ উঠেছে, আর এখুনি ঝড়—"

হাফেজ তীব্রস্বরে কহিল—"তা উঠুক্ আজ তোকে আমার হুকুম তামিল কর্ত্তেই হবে।—না যদি করিস, তোর চাল কেটে, বে-ইজ্জৎ করে, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব।"

একজন মোসাহেব হাসিয়া কহিল—"যদি এত জানের ভয় তবে মাঝিগিরি কর্ত্তে এসেছিলি কেন ?"

সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া হাফেজ রুষ্ট স্বরে কহিল—"তুই এখনি যা, আমার হুকুমে আজ তোকে জান দিতে হবে।"

রহিম আর কোন কথা কহিল না ; আভূমি সেলাম করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যাইবার সময় সে একবার মনে মনে বলিল—"জান কবুল, তবু আজ মনিবের হুকুম তামিল কর্‌ব।"

কুটীরে প্রবেশ মাত্র তাহার স্ত্রী রোসেনা বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁরে ও কিসের চিঠি ?"

রহিম বলিল—"নেমন্তন্নর চিঠি, আজ আমার এখনি নওগাঁয়ে যেতে হবে।"

"এ্যাঁ! সে কিরে ? এমন আকাশ ভরা মেঘ, ঝড় ওঠে ওঠে, সন্ধ্যে হয়ে এল, এসময় তুই দরিয়ায় না' ভাসাবি ? এত ছাতী করিস্‌নেরে, এত ছাতী করিসনে।"

"তার কি করব' রোসেনা? আমরা হুকুমের চাকর, নিমকের গোলাম, তাই আজ এত ঝড় উঠ্‌তে দেখেও আমায় দরিয়ায় না' ভাসাতে হবে।"

রোসেনা স্থির দৃষ্টিতে পতির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রহিম তাহাদের কুটীর সন্নিকটে উচ্চ বৃক্ষের গায়ে যে স্থানে নৌকা খেয়াইবার বংশ দণ্ডটি রক্ষিত ছিল সেই দিকে অগ্রসর হইল।

রোসেনা বলিল—"তা'যেতে হয় তুই যা, নাজীর আজ যাবে না।"

রহিম বলিল—"সে না গেলে হাল ধর্‌বে কে?"—পূর্ব্বে হাল ধরিবার জন্য একজন ভৃত্য রহিমের ছিল। পুত্র বড় হইয়াছে, তাই কয়েক মাস হইতে সেই এ কার্য্য করিতেছে—ভৃত্যকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রোসেনা চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র নাজীর এই সময় কুটীরের বাহিরে আসিয়া কহিল—"কি বাবা?" রহিম বলিল—"জমীদারের হুকুম আজ এখনি নওগাঁয়ে যেতে হবে, আমরা তাঁর নিমকের গোলাম, সে হুকুম আজ কবুল করেও তামিল কর্ত্তে হবে বাপ জান।"

( ৪ )

সন্ধ্যা অতীত। আকাশের ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরও গাঢ়, আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। পুত্র হাল ধরিয়া উপবিষ্ট। পিতা প্রাণপণ শক্তিতে ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দে ক্ষেপনী নিক্ষেপ করিতেছে। এখনই ঝড় উঠিবে। পদ্মার তরঙ্গ হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে তরণী ভাসিয়া চলিয়াছে।

মাথার উপর দিগন্ত বিস্তৃত কাল মেঘ, পদ নিম্নে পদ্মার অবিশ্রান্ত কল্লোল, চতুর্দ্দিকে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার রাশি। দূরে—জমীদার ভবন হইতে সানাইয়ে ইমন কল্যাণ রাগিণীর ক্ষীণস্বর তখনও শ্রুতিগোচর হইতেছিল। সেই দূরাগত করুণধ্বনি শুনিতে শুনিতে পিতা পুত্র নৌকারোহণে পদ্মা বক্ষ ভেদ করিয়া চলিল।

অল্পক্ষণ পরেই ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। তাহাদের মাথার উপরে, যেন এই ক্ষুদ্র প্রাণী দুইটিকে উপহাস করিয়া করিয়া মেঘ মধ্যে মধ্যে ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অন্ধকারাবৃত উত্তাল তরঙ্গ-ময় পদ্মা বক্ষ থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। নাজীর ভয়ে উভয় হস্তে তাহার পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

রহিমের প্রাণটাও কাঁপিতেছিল। এরূপ দুর্য্যোগে অনেকবার সে নৌকা লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও ত এত ভীত হয় নাই। আজ, তাহাদের

নয়নের পুত্তলি একমাত্র পুত্র, নাজীরকে যে সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। সে একা থাকিলে এতটা ভীত হইত না। হায় কেন সে আজ না বুঝিয়া নাজীরকে এমন বিপদের মুখে আনিয়া ফেলিল?

রহিম পুত্রকে বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে ডাকিল—"নাজীর, নাজীর—আমার জান।" কিন্তু কোনই উত্তর পাইল না। সে তখন ভয়-বিহ্বল—কথা কহিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছে।

হঠাৎ একটা ঢেউ আসিয়া নৌকার গায়ে ধাক্কা মারিল। ক্ষুদ্র তরণী সে প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে পারিল না,—উল্টাইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে একটা দ্বিতীয় তরঙ্গ, পরস্বাপহারী ভয়ঙ্কর দস্যুর মত ছুটিয়া আসিয়া রহিমের বাহুবন্ধন হইতে নাজীরকে কোথায় ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল। রহিম চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "নাজীর নাজীর, বাপ্‌রে।" কিন্তু কোথায়, কেহই উত্তর দিল না। তাহার সে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি মেঘ ও ঝড়ের ভীষণ গর্জ্জনে কোথায় ডুবিয়া গেল। সন্ধ্যার গভীর অন্ধকার চুপি চুপি দুইটি প্রাণীকে আপন নিভৃত ক্রোড়ে লুকাইয়া ফেলিল।

( ৫ )

কুটীর দ্বারে রোসেনা উৎকণ্ঠিত ভাবে স্বামী ও পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। এত রাত্রি হইল, কই এখনও ত' তাহারা ফিরিয়া আসিল না। আজ নাজীর যাইবার পর হইতেই প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল। কতদিন নাজীর তাহার পিতার সহিত গিয়াছে, কই আর কোনদিন তাহার মনটাত এমন চঞ্চল হয় নাই। অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল "হায় কেন আজ আমার বাছাকে তা'র সঙ্গে যেতে দিলাম; হে আল্লা—দয়াময়, তাদের আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দাও।"

অনেক রাত্রে পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে রহিম আসিয়া ডাকিল—"রোসেন, রোসেনা, বড় তেষ্টা আমায় পানি দেরে।"

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে রোসেনা কহিল—"অ্যাঁ, শুধু তুই এলি, আমার নাজের কই? সে বুঝি বাবুদের বাড়ী নাচ্‌ দেখ্‌তে গেল?"

রহিমের পা টলিতে লাগিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"সে আর নাইরে রোসেনা, আর নাই, পদ্মার পানিতে তা'কে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি;—অনেক

চেষ্টা কর্‌লাম রোসেনা, তা'কে ফিরে আন্‌তে পার্‌লাম না রে, আন্‌তে পার্‌লাম না।"

ঘৃণা ভরে দুইপদ সরিয়া আসিয়া রোসেনা চীৎকার করিয়া কহিল—"আর তুই—"

রহিম বলিল—"খোদা আমার নসিবে মরন লেখেন নাই, তাই মরিনি, এই ফিরে এসেছি;—আমি তা'কে বুকে করে রেখেছিলাম রোসেনা, বুকে করে রেখেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।"

অতি কর্কশকণ্ঠে, সে স্বর যেন তাহার সমস্ত হৃদয় ছিন্ন করিয়া বাহির হইতেছিল, রোসেনা বলিল—"আর তুই, কোন মুখে সচ্ছন্দে ফিরে এলি? ওরে যারে যা, আবার যা, আমার জান, আমার কলিজা তা'কে খুঁজে নিয়ে আয়।"

একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রহিম বলিল,—"আচ্ছা, আবার যাই, যদি তাকে পাই তা'হলেই ফিরব, নইলে এই শেষ।"

রহিম চলিয়া গেল; রোসেনা স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জমীদার বাটীতে তখন নৃত্যগীত আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে সহস্র দীপ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, মর্ত্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি হইয়াছে। পরচিত্ত-বিমোহিনী সুন্দরী তরুণী নর্ত্তকীদ্বয় তখন বিবিধ হাবভাবে তরুণ জমীদারের চিত্ত হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

( ৬ )

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। রোসেনা তখনও দ্বার প্রান্তে বসিয়া ছিল। দুই একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট শৃগাল তাহাদের অঙ্গন দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। সে প্রতি মুহূর্ত্তে কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল। একবার মনে করিল নিজে গিয়া খুঁজিয়া আসে; কিন্তু যদি সেই অবসরে নাজীর ফিরিয়া আসে এই ভাবিয়া সে নড়িল না। আর তা'র বাছা নাই এ ধারণাটিকে সে কোন মতে মনে স্থান দিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া রোসেনা আর থাকিতে পারিল না। ঘুমে তাহার চোখের পাতাগুলি জড়াইয়া আসিতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে দ্বার-প্রান্তে মস্তক রক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রোসেনার যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন পূর্ব্ব গগন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। দুই একটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া

বসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কই? এখনও ত' তাহাদের কেহ ফিরিয়া আসে নাই। রোসেনা পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

নদীর তীরে তীরে রোসেনা ছুটিয়া চলিয়াছে। পথের কাঁটাগাছে তাহার পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। পরিধেয় বসন কর্দ্দমাক্ত। তথাপি তাহার বিশ্রাম নাই, অবিরাম গতিতে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাঁকের মাথায়, সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ছোট ছোট গাছগুলির তলায় ওকি! কি একটা শুভ্রবর্ণ পদার্থ পড়িয়া রহিয়াছে না! রোসেনা ছুটিয়া বড় তাড়াতাড়ি সেইস্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল তাহারই স্বামী, কর্দ্দমাক্ত কলেবরে পড়িয়া রহিয়াছে।

রোসেনা খুব জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া—কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিছুদূরে মাঠে কৃষাণেরা কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা দুই তিন জন ছুটিয়া আসিল। অনেক কষ্টে উভয়ের চেতনা সম্পাদন করিল।

স্ত্রীর স্কন্ধে ভরদিয়া কষ্টে রহিম যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে। জমীদার ভবনে তখন নহবৎ খানায় সানাইয়ে প্রভাতের প্রথম রাগিণী বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের বালক-বালিকারা নূতন বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া কোলাহল করিতে করিতে দলে দলে সেই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

# বঙ্গদেশের প্রজা

বঙ্গদেশের গরীব প্রজাদের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য সদাশয় গভর্ণমেণ্ট চিরকাল

দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে যত আইন-কানুন হইয়াছে, সবই সেই মর্ম্মে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভাল করিয়াছেন কি না, এক কথায় সে বিষয়ের মীমাংসা হয় না। তবে সে বন্দোবস্ত করিবার সময় গভর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহার অপব্যবহার হইতেছে দেখিয়া অথবা হইবে, এরূপ অনুমাণ হওয়ায় কারণ পাওয়ায় প্রজা-স্বত্ব-বিষয়ক

আইনের অবতারণা হয়। এবং পরে প্রজাদের স্বত্ব সঠিকরূপে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জেলায় জরীপ, সার্ভে ও সেট্‌ল্‌মেণ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে থাকবস্ত ম্যাপ ও রেভিনিউ সার্ভে হইয়াছিল। তাহার পরে জমি ও জমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া নূতন সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজ আরম্ভ হয়। সেট্‌ল্‌মেণ্ট ভাল কি মন্দ, সে কথা পরে বলিব। আইনের দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা ও শিক্ষা আমার নাই। তবে সেই সব আইনের 'হেপাজতে' পড়িয়া প্রজাদের কি যে দুর্দ্দশা হয়, তাহারই দু'চারিটি দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহারা গভর্ণরের বৈঠকে বসিয়া প্রজাদের স্বত্ব সম্বন্ধে আইনের সমালোচনা করেন, তাঁহারা অনেকেই জমীদার। প্রজাদের পক্ষ হইতে যাঁহারা দু'চার কথা বলিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা "আউটভোটেড্‌" হইয়া যান। প্রজাদের যে দৈন্যাবস্থা, তাহা সেই রকমই থাকে। আবার যাঁহারা আইনের পাণ্ডুলিপি অথবা খসড়া প্রস্তুত করেন, তাঁহারা শুধু কয়েকটী ভাল নিয়মের (principle) বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন। তাঁহারা অন্যান্য দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন সন্দেহ নাই। তবে অন্য দেশের প্রজাদের সঙ্গে এ দেশের চাষীদের যে কতখানি পার্থক্য আছে, শুধু অনুমানেই ধরিয়া ল'ন। কাজেই তাহাদের মর্ম্মবেদনা গবর্ণমেণ্টের কাণে পৌঁছিয়াও পৌঁছায় না। প্রজারা তাহাদের স্বত্ব-সংরক্ষণের জন্য জমীদারদের নিকট বেশী কিছু প্রত্যাশা করে না, কারণ উভয়ের স্বার্থ বিরোধী—তবে যে সব সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি নিঃসম্পর্কভাবে তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেন—তাঁহাদের দিকেই উহারা তাকাইয়া থাকে।

একদল লোকের বিশ্বাস—এবং সে বিশ্বাস একেবারেই অমূলক নয়;—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল এই হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট একদল "মেষ" রক্ষা করার জন্য কতকগুলি "ব্যাঘ্রের" উপর ভার দিয়াছেন। জমীদারের কাছে প্রজা চিরকালই "মেষ" আর প্রজাদের কাছে জমীদার "ব্যাঘ্র"। একথা বলি না যে, এমন জমীদার এদেশে নাই—যাহাদিগকে প্রজা বাস্তবিকই স্নেহের চক্ষে দেখে ও ভালবাসে। এরূপ সদাশয় ও উচ্চমনা জমীদার সৌভাগ্যবশতঃ একেবারে বিরল নহে।

জমীদারদের প্রজা-জব্দ করিবার উপায় বহুবিধ। সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে "ভিজা কম্বল ভারী" করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট যে সে সব কথা

জানেন না, তাহা নয়। তবে আইনের গণ্ডীর মধ্যে যতক্ষণ না পড়িতেছে, ততক্ষণ গভর্ণমেণ্ট নাচার।

প্রথমে জমা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। জমীদারের সেরেস্তায় অনেক দিন হইতে জমীর শ্রেণী-বিভাগ করিয়া "ডোল" নির্দ্দেশ করা আছে। জমী অবশ্য নানা শ্রেণীর আছে এবং তদনুসারে জমা ধার্য্য করাটা খুবই সঙ্গত। যে 'ডোল' স্থির করা হয়, ততখানি খাজনা প্রজা দিতে পারে কি না, তাহা কেহই দেখে না। অধিকাংশ স্থলেই সেটা জমীদারের মনগড়া হিসাব। নূতন প্রজা পত্তন করিবার সময় জমা অনুসারে 'ডোল'ও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। আবার এই 'ডোল' জমা বৃদ্ধি করিবার এক প্রকৃষ্ট উপায়। আইনে আছে জমীর কোন উন্নতি অথবা বৃদ্ধি না হইলে জমা বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু জমীদারের পক্ষ হইতে "চাহারম্" ( Forth Class ) জমিকে "আওয়াল" ( First Class ) বা "দয়ম্" ( Second Class ) বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ কিছুই কষ্ট করিতে হয় না। কারণ জমী শ্রেণী বিভক্ত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে বিভাগ করিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ( Standard ) কেহ জানে না। প্রজা পত্তন করিবার সময় প্রজার আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুসারে জমীদার "দাঁও" মারেন। অমুক বাড়ী করিবে, অতএব তাহাকে জমা বৃদ্ধি দিতে হইবে। ইন্দারা, ইমারত পুষ্করিণী, এসব ত "বিশেষ অনুমতি" ভিন্ন কেহ করিতেই পারিবে না।

জমা সম্বন্ধে আর একটা কৌতুককর ব্যাপার আছে। ডোল অনুসারে যে জমা ধার্য্য থাকে, :তাহা প্রায়ই অতিরিক্ত। প্রজা দিতে সক্ষম হয় না বলিয়া কিছু "হাজত মহকুপ" রাখিয়া জমীদার "প্রজার দৈন্যাবস্থা" দেখিয়া একটি জমা "কৃপা পরবশে" ধার্য্য করেন। (এ কথাগুলি সাধারণ পাট্টা-কবুলিয়ত পত্র হইতে উদ্ধৃত) প্রজা এই মর্ম্মে কবুলিয়ত লিখিয়া দেয় যে "পাঁচসনা" অথবা "আটসনা" ম্যাদে এই খাজনা সে দিতে থাকিবে, তবে ম্যাদ অন্তে জমিদার মহাশয় "পূর জমা" "মায় হাজত" আদায় করিয়া লইবেন। আদালতে খাজনা বাকী নালিশ করিয়া জমীদার মায় খরচ "পূর জমা" প্রজার কাছে আদায় করিয়া ল'ন। আদালত দেখেন, এটা একটা কবুল চুক্তি। সুতরাং চুক্তির বলে জমীদারকে ডিক্রী দেন। প্রজার যা দৈন্য, তা' এইভাবেই রহিয়া গেল। "পূর জমা" দিতে না পারিলে তাহার 'ভিটে মাটী' নিলাম। তাহাকে গাঁ ছাড়া করিয়া তবে আদালত নিশ্চন্ত হইবেন। ইহার জন্য আদালত,

আইন অথবা জমীদার কেহই দোষী নয়। দোষ গরীব প্রজার নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার।

জমা ধার্য্য করা সম্বন্ধে জমীদারদেরই বা দোষ কি দিব? সদাশয় গভর্ণমেণ্ট নিজেদের "খাশ মহাল" বন্দোবস্তের সময় কি করেন, তাহা অনেকেই জানেন। যখন 'জমাবন্দী' করা হয়, তখন গভর্ণমেণ্ট সব রকম হিসাব ও খরচ হিসাব করিয়া নেট মুনাফার একটা অংশ ধরিয়া জমা স্থির করেন। জমা ধার্য্য করিবার সময় প্রজার নিজের কায়িক পরিশ্রমের মূল্য গরু ও লাঙ্গল প্রতিপালনের খরচ প্রভৃতি ধরা হয় না—কারণ, তাহাতে যে মুনাফা কমিয়া যায়। আর গভর্ণমেণ্ট হইতে যিনি জমাবন্দী কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন, তিনি অনেক সময়ই দেখেন না, প্রজা জমা দিতে পারিবে কি না, তিনি দেখেন তাঁর চাকুরীর উন্নতি কিসে হয়। কার্য্যে সুফল লাভ করিতে হইলে, তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী অপেক্ষা জমা বেশী দেখাইতেই হইবে; তাহাতে গরীব প্রজা বাঁচুক, আর মরুক্। ফল এই হয়, জমীদারেরা বলেন 'খাশ মহাল' বন্দোবস্তে গভর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি যেরূপ সদাশয়তা দেখান, আমরা বরং তদপেক্ষাও অধিক সদাশয়তা দেখাইয়া থাকি। সে কথা একেবারে মিথ্যা নয়।

দ্বিতীয় কথা:—আদায়। প্রজার কাছে জমা সম্পর্কে যে যাহা পারে আদায় করিয়া লয়। পত্তন হইতে গেলে বিঘা প্রতি একটা কিছু দরে নজর দিতে হইবে। সে নজর জমীদারের একটা, নায়েবের একটা, অধস্তন কর্ম্মচারীর একটা—ইত্যাদি। ইহার উপর পার্ব্বণী শ্রাদ্ধ-খরচ, শরৎকাল আরও কত কি আছে। খাজনা আদায় করিতে পাইক যাইবে, তাহার খোরাকী। খাজনা দিতে আসিলে নজর একপত্তন, আমলার "তহুরী," পাইকের "পান খাওয়ার" পয়সা ইত্যাদি। অনেক সময় এরূপ হয় যে প্রজার জমা অপেক্ষা এ সব বাজে পাওনাই বেশী হইয়া যায়। ইহাতে কোনও প্রজা যদি অসন্তোষ প্রকাশ করিল, তবেই অনর্থ। নায়েব মহাশয় হয় ত দাখিলা দিলেন না, আমলা মহাশয় হয় ত প্রাপ্ত খাজনা "জমা ওয়াশীল বাকী"তে তুলিলেন না অথবা খস্ড়া কাগজে লিখিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতে প্রজাকে 'নাস্তা নাবুদ' করিবার উপায় করিয়া রাখিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আইনে অবশ্য এ সব বিষয়ের প্রতীকার আছে। তবে গরীব প্রজা যদি কথায় কথায় এইরূপ ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতীকারের জন্য আদালতে ছুটিতে পারিত, তবে সময়মত "মায় তহুরী"

জমীদারের খাজনাও পরিশোধ করিতে পারিত। আর আদালতে আসিলে যে "তহুরী" দিতে হয়, জমীদারের কাছারীতে অনেক সময় তদপেক্ষা কম দিতে হয়।

দুঃখের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট আইন ভালই করেন, তবে আইন-কর্ত্তার দোষেই হউক, অথবা জমীদারের আমলার কূটবুদ্ধির গুণেই হউক, কতকগুলি "ফাঁকড়া" তাহাতে থাকিয়া যায়—যাহার জন্য প্রজার প্রাণান্ত হয়। গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়া দিলেন যে খাজানা পোষ্টআফিসে মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে পারিবে, কিন্তু জমীদার যে মণিঅর্ডার গ্রহণ করিবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। জমীদারের নায়েব মহাশয় যদি দয়া করিয়া সেটী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তবে প্রজার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। আর একটা নিয়ম আছে যে, কিস্তির শেষ দিনে আদালতে প্রজা খাজানা জমা দিতে পারে। অথচ আইনে এমন বিধানও আছে যে কিস্তির শেষ দিন টাকা না পাইলে জমীদার মায় ক্ষতিপূরণ খাজানা বাকীর নালিশ রুজু করিতে পারেন। ফল এই হয় যেদিন প্রজা আদালতে টাকা আমানত করিল, জমিদারও সেইদিন নালিশ রুজু করিলেন। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে হয় ত একমাস গেল, সদর বা মহকুমার যাতায়াতের খরচ, সাক্ষীদের খরচ, কাছারীর আনুষঙ্গিক "পান খাওয়াইবার" খরচ গরীব প্রজাকে বহন করিতে হইল। শেষে জমীদার মায় খরচা ডিক্রী পাইলেন। প্রজার খাজানা আমানত করা না করা সমানই হইল। আইনের উদ্দেশ্য অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রজার কিছুতেই উদ্ধার নাই।

যে সব প্রজা কওলা খরিদ করিয়া নাম খারিজ না করিয়া লয়, তাহাদিগকে যে কি ভাবে কিস্তি শোধ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীই জানে। তাহাদের কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সব কথা সকলেই জানে, অথচ সকলেই চোখ বুজিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ—প্রজাদের স্বত্ব সম্বন্ধে বঙ্গদেশে কত রকম প্রজা আছে—এবং জমীদারের সঙ্গে তাহাদের কি সম্পর্ক, সে সব উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আর সে সকল নানারূপ স্থানীয় রীতি ও প্রথা অনুসারে বিভিন্ন। তবে একটা কথা ঠিক, ১২ বৎসর জমী ভোগ করিলে রায়তকে যে 'স্থিতিবান্' স্বত্বটী দেওয়া হয়, এইটী প্রজাদের পক্ষে যথেষ্ট সুখের কথা; কিন্তু জমীদারের এইজন্য রায়তকে স্থিতিবান্ ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট (Settled and occupancy

ryots ) হইতে না দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। তাহাদের সে সব উপায়ের উল্লেখ করিতে গেলে আইনের অনেক কূট তর্কের মধ্যে যাইতে হয়। সে সব বিষয়ে প্রবেশ করিতে আমি অক্ষম। তবে জমীদারেরা এই সব স্বত্ব বড় একটা মানিয়া চলেন না, সেই জন্য প্রজাদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। জমা বৃদ্ধি করিতে অথবা কোন কারণে জমী হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিতে আইন বাঁচাইয়া অনেক রকম উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি কোনও একটী বড় ষ্টেটে [ যাহা একপ্রকার গভর্ণমেণ্ট হইতেই পরিচালিত হয় ] প্রজাদিগকে "স্থিতিবান্" স্বত্ব না দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি জমাতে কবুলিয়ত করিয়া লওয়া হয় এবং কবুলিয়ত অন্তে সে গ্রামে আর জমী দেওয়া হয় না। প্রত্যেক ষ্টেটেই এরূপ স্বত্ববিরোধী অনেক কাজ করা হয়। আদালতে যেরূপ খরচ ও সময় নষ্ট হয়, তাহাতে অনেক প্রজাই এই সকল অত্যাচার বহন করিতে বাধ্য হয়। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা চালাইতে অতি কম লোকই সক্ষম। আদালত হইতে প্রজা জব্দ করিতে জমীদারকে বেশী বেগ পাইতে হয় না। চিরস্থায়ী মধ্য-স্বত্বাধিকারীদিগকেও যে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বেগ পাইতে হয় না, তাহা নয়। জমীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং জিনিষপত্রের মূল্যাধিক্য হওয়ার জন্য জমীদার সে উন্নতির লাভটুকু পাইতে অবশ্যই অধিকারী; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ত দেশের উন্নতি অথবা শস্য উৎপত্তির লাভের কোন অংশই লন না। গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অথচ জমীদারকে সে প্রতিজ্ঞা যে মানিতে হইবে, এমন কোন বিধানই নাই। স্বত্ব সম্বন্ধে বিরোধীর মামলা-মোকর্দ্দমারও অভাব নাই। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। "মিথ্যা দেনার খতে" বাপ-পিতামহদের আমলের 'ভিটা-মাটি' যে বিক্রী হইয়া যায়, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এ সবের কি কোন প্রতীকারই নাই? প্রজা ও জমীদারের যে সম্পর্ক, সেটা অনেকটা সামাজিক, কিন্তু সে সম্পর্কের দোহাই দিয়া কি তাহাদিগকে এতটাই বিপদগ্রস্ত করিতে হইবে?

শুনিয়াছি নূতন একটী আইনের আলোচনা চলিতেছে, যাহাতে জমীদারদের নজর ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে এবং খরিদ দখলকারকে পত্তন হইতে জমীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর হইতে হইবে না। আরও শুনিয়াছি যে দখলি স্বত্বশূন্য ( non-occupancy ryots ) প্রজাদিগকে কতকগুলি অধিকার দেওয়া হইবে। সে আইনের পাণ্ডুলিপি আমি পড়ি নাই। তবে সংবাদপত্রে প্রায়ই

দেখি, সে আইন সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া অনেকে টেলিগ্রাম করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাঁহারা অধিকাংশই জমিদার শ্রেণীর লোক। তাঁহারা আশঙ্কা করেন, বুঝি সব আধিপত্যই তাঁহাদের গেল। গভর্ণমেণ্ট দেখিতেছেন যেরূপ দিন দিন প্রজাদের দৈন্যাবস্থা হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে এরূপ কিছু অধিকার দেওয়া দেশ কাল অনুসারে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু জমীদারেরা সেরূপ ভাবিবেন কেন? নূতন আইন-প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহারা এত আপত্তি করেন কেন?

আমার এসব কথা শুনিয়া অনেকেই আমাকে গালাগালি করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা জমীদারের ষ্টেটে কাজ করিয়াছেন, তাঁদের নিরপেক্ষ মতামত জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই আমার কথা সমর্থন করিবেন। জমীদার শুধু দেখেন নিজের লাভ লোকসান। কিরূপে আদায় হয়, প্রজারা কোনরূপ কষ্টে থাকে কি না, সে সকল দেখিবার তাঁহাদের ত কোন প্রয়োজন নাই। কোন এক প্রসিদ্ধ জমীদারের নায়েব কলিকাতার সন্নিকটে একটী বেশ বড় বাড়ী তৈয়ারী করেন। খুব ধুমধামের সহিত গৃহপ্রবেশ হয় এবং নানারকম ক্রিয়াকর্ম্মাদি হইতে থাকে। দশজনে দশ কথা বলে—শেষে কোন ঈর্ষা-পরায়ণ আমলা জমীদারবাবুর কাছে এ কথা তুলেন। জমীদার নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। নায়েব অম্লান বদনে বলিল, "হুজুরের ন্যায্য পাওনা তদ্রূপ না করিয়া এবং ইষ্টেটের উন্নতি করিয়া যদি আমি দু'পয়সা করি, তবে সেটা ত হুজুরেরই গৌরব? লোকে বলিবে 'দেখেছ জমীদার বাবু কেমন সদাশয়, কেমন আশ্রিত প্রতিপালক।' এ সব কথা শুনিয়া জমীদারবাবু বোধ হয় মনে মনে নায়েবের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তবে ষ্টেটের উন্নতি করিয়া দু পয়সা করা যে কিরূপ, তাহা সে অঞ্চলের গরীব প্রজারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। সব জমীদারের ষ্টেটেই অল্পবিস্তর এইরূপ।

চতুর্থতঃ—সার্ভে ও সেট্‌ল্‌মেণ্টের কথা। সেট্‌ল্‌মেণ্ট্ কেহই পছন্দ করে না। প্রজারা দেখে জমীদারকে ফাঁকি দিয়া পতিত জমী প্রভৃতি খাইতে-ছিল, তাহাও জানাজানি হইয়া গেল—জমীদারও জমা বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পাইল। আবার জমীদার ভাবেন, আমার জমী-জমা, লাভ-লোকসান, আদায় সবই ত গভর্ণমেণ্টের লিপিবদ্ধ হইয়া গেল। নূতন প্রকারে ট্যাক্স আদায় কত কি হইবে, কে জানে? তারপর যতদিন সেট্‌ল্‌মেণ্ট চলিতে থাকে,

ততদিন তাঁহাকে কিরূপ মনোকষ্টে থাকিতে হয়, সে তাঁহারাই জানেন। সেটল্‌মেণ্টের কাজে যে সব লোক নিযুক্ত হ'ন,তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ পরে বলিব। সেটল্‌মেণ্ট অফিসার হইতে পেয়াদা পর্য্যন্ত সকলের ব্যবহারে প্রজা ও জমীদার ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। তবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইহার সমর্থনে অনেক কথা বলিবার আছে। প্রজাদের স্বত্ব লিপিবদ্ধ হইয়া যায়, প্রজারা হাতের কাছে বিচার পায়। আবার সে বিচার স্থানীয় মতামত ও আনুষঙ্গিক অবস্থানুসারে হইয়া থাকে। আইনের কূটতর্কে প্রজার স্বত্ব লোপ হয় না। তারপর জমী সংক্রান্ত মামলা মোকর্দ্দমা অনেক কমিয়া যায়। রাজায় প্রজায় সম্বন্ধটি অতি পরিষ্কার হয়। প্রজাও জমীদারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস পায়, আর জমীদারের খামখেয়ালী মতে প্রজা বাধ্য হয় না, উত্যক্তও হয় না—এ সব প্রজাদের কম সুবিধা নয়। সেটল্‌মেণ্টের কাজে অল্পবিস্তর ভুল যে থাকে না, তাহা নয়। মানুষের কোনও কাজই একেবারে নির্ভুল হয় না। তবে শতকরা ১০টা ভুল থাকিলেও যে রেকর্ড ভুল হইল, তাহা বলা অন্যায়; কারণ, বাকী ৯০ জনের যে সুবিধাটুকু হয়, তাহার অনুপাতে সে ভুল ততটা মারাত্মক নয় এবং সে ভুল সংশোধিত হইবার যথেষ্ট সময় ও অবসর দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতেও যদি প্রজা নিরুদ্বেগ থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেটল্‌মেণ্টের কি দোষ? প্রজারা আগ্রহ-সহকারে পর্চ্চা ও নক্সা করে। তবে সে আগ্রহের মধ্যে ভয়ের অংশও অনেকটুকু আছে। প্রজাদের মধ্যে এইটুকু শান্তি হইবে, আশা করিয়াই গভর্ণমেণ্ট এত বড় কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। তবে গভর্ণমেণ্টের অনেক কাজের মতই সুনিয়ম ভাল হইলেও কার্য্যকালে লোকে যেরূপ ব্যবহার পায়, তাহাতে সহজেই সেট্‌ল্‌মেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া ওঠে। প্রথমে আমিন মহাশয়দের কথা ধরা যাউক। তাঁহারা গ্রামে গিয়া যে সব অত্যাচার করেন ও দলাদলীর সৃষ্টি করেন, তাহা গ্রামের লোকেই জানে। রামের জমী শ্যামকে দিয়া, শ্যামের জমীতে হরির অংশ বসাইয়া একটী খতিয়ানের খাতা প্রস্তুত করেন,জমী মাপিতে গিয়া চেন লাইন টানা—গাছ বাড়ী এসব লইয়া টানাটানি করা,আরও কত রকম উৎপাত আছে। নিয়ম আছে,কাননগো সাহেব অথবা সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার আমিনগণকে শাসন করিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময়েই তাহা হয় না। কাননগো সাহেবের কাছে নালিশ করিলে তিনি বলেন বুঝারতের সময় ঠিক করিয়া দিব। বুঝারতের সময় বলেন অ্যাটেষ্টেশনের সময় ঠিক করিয়া লইও, এখন ত

এরকমই থাক্। একবৎসর পরে যখন অ্যাটেষ্টেশন অফিসার আসিলেন, তিনি বলিলেন খানাপুরী বুঝারতের সময় এসব গণ্ডগোল কেন মীমাংসা করিয়া লও নাই? এখন এসব সংশোধন করা অসাধ্য—যদি তিনি ভাললোক হ'ন, তবে না হয় সে গণ্ডগোলের মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। নচেৎ এমন অফিসারের কথাও শুনিয়াছি, যিনি একজন প্রজা অন্য একজনের জমীতে 'বর্গা' সত্ব দাবী করিতে আসিলে বলিয়াছিলেন "কিরে বেটা বর্গা কি? বর্গা কাহাকে বলে জানিস্? এই সোজা আদালতের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে মীমাংসা করে নেনা।" অবশ্য অ্যাটেষ্টেশন অফিসারের দোষ দেওয়া যায় না; কারণ তাঁহাদেরও রক্ত মাংসের শরীর। দৈনিক যেরূপ "রিটার্ণ" দেখাইতে হয়, তাহাতে আর সব খুঁটি নাটি দেখা চলে না। ফলে এই হয়, আমিন মহাশয় বুদ্ধি করিয়া যে ভুলটুকু করিয়া গিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই থাকিয়া যায়। জমীদারের লোকও নানা কারণে উত্যক্ত হয় বটে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে বিদেশে বিঘোরে যেরূপ দিন কাটাইতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের জমীদারদের নিকট একটু সুখস্বচ্ছন্দতা দাবী না করিলে চলে না। জমীদারেরা অনেকেই গবর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারিগণের উপর বিরক্ত হন। বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ঘুষ দিতে হয়, তাঁহাদের জন্য লিপ্টনের চা, ক্যাপষ্টানের সিগারেট, হণ্টলি পামারের বিস্কুট ইত্যাদি জিনিষ সরবরাহ করিতে হয়। এসব কথার সত্য মিথ্যা জানি না। যাঁহারা দিতে পারেন তাঁহারা দিবেন। ভাল মন্দ লোক চিরকালই আছে, সে দোষ গবর্ণমেণ্টের মহৎউদ্দেশ্যের নয়। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকের কাছে সমান দায়িত্ব-বোধ আশা করেন।

প্রজারা নানা কারণে বিরক্ত হয়, তাহা বিস্তারিতভাবে বলিয়া আর 'পুঁথি' বাড়াইতে চাই না। সেদিন গবর্ণরের বৈঠকে সেট্‌ল্‌মেণ্ট স্থগিত রাখার কথাতে জনৈক সদস্য বলিয়াছিলেন, "প্রজারা যেরূপ আগ্রহ সহকারে নক্‌সা ও পর্চ্চা লয় ও যত্নে রক্ষা করে তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় সেট্‌ল্‌মেণ্ট কত মঙ্গলকর।"

প্রজাদের অবস্থার উন্নতি হয়, ইহা সকলেই চাহেন। বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। গবর্ণমেণ্ট আইন-কানুন মহদুদ্দেশ্য ঘটিত। তবে প্রজাদের প্রার্থনা শুধু এইটুকু যে, সে সকল আইন-কানুন কার্য্যে পরিণত হইবার সময় তাহাদিগকে কিরূপ ভাবে নিষ্পেষিত করে, সেটুকু গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখেন।

শ্রীকালীদাস বাগচী।

# দান

রিক্ত হ'য়ে গেলাম যখন,—শাসন ভরা দান,
প্রশ্ন হ'ল জটিল—"তোমার কঠিন কিনা প্রাণ?"
নিঠুর বলে' অভিমানে ব্যথা যখন জাগায় প্রাণে,
চেয়ে দেখি দয়ার স্রোতে ভুবন ভাসমান!
প্রেমের আলোর রাঙ্গায় রেঙ্গে একুল ওকুল দুকূল ভেঙ্গে
ছুটে আসে স্নেহের নদী ডাকিয়ে দিয়ে বাণ!
হৃদয় নিয়ে সকাল বেলা খেল্লে কেন নিঠুর খেলা—
হ'ত নাকি যাবা'র বেলা ফিরিয়ে লওয়া দান—
ধূলো মাটি ঝেড়ে ফেলে ঘরে যখন যেতাম চলে'—
পারতে নাত রুধ্‌তে দুয়ার,—দিতেই হোত স্থান—
মিট্‌তো নাকি বোঝাপড়ার সেথায় সমাধান?

শ্রীইন্দিরা দেবী

# বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন

বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপক্ষরূপে অভ্যুদিত হইলেও হিন্দুধর্ম্মকে সমূলে উচ্ছিন্ন করা বা হিন্দুধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা ইহার লক্ষ্য ছিল না। তাহাতেই প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধনরপতিদিগের সময়েও হিন্দুদিগের প্রতি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক কোনরূপ নির্যাতনের ভাব প্রদর্শিত হওয়ার কথা যানা যায় না। প্রত্যুত বৌদ্ধ-শ্রমণগণের সহিত হিন্দু ব্রাহ্মণগণ যে তুল্য সম্মানেরই অধিকারী ছিলেন, তাহারই ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। *

বুদ্ধদেব বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই যোগমার্গ তান্ত্রিক-ধর্ম্মেরই সাধনমার্গ। বৌদ্ধধর্ম্মের বৈরাগ্য যে হিন্দুধর্ম্মের সন্ন্যাসেরই অনুরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ "ভিক্ষু" নামটী হিন্দুদিগের

* শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত "প্রাচীনভারত"—"মেগেস্থিনিস্" ও "হুয়েনসাংএর" লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ আশ্রমের "ভিক্ষু" * নাম হইতেই যে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

বুদ্ধদেব সাধনা দ্বারা যে সার সত্যগুলি লাভ করিয়াছিলেন,সে সকলের নাম "চতুরার্য্য সত্য" এবং তদুক্ত সাধনপন্থার নাম "আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ"। বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও সাধন-প্রণালীকে "আর্য্য" শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত যে ইহাদের যোগ-অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়রূপেই প্রতীয়মান হয়। মূলসত্য ও তৎসাধনপন্থার বিশুদ্ধ সংস্কৃত নাম হইতেও আর্য্য ধর্ম্মের সহিতই যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের মোক্ষার্থক "নির্ব্বাণ" শব্দ ও সংস্কৃতমূলক হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণের মূলভাবটী পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলে অন্য ধর্ম্মের জন্য ইহার নির্ব্বাচন হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম যে স্থলে এক মোক্ষার্থেই মাত্র "নির্ব্বাণ" শব্দের বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়— তৎস্থলে সংস্কৃত ভাষায় "নির্ব্বাণ" শব্দের মোক্ষার্থ ব্যতিরিক্ত আরও বহু অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে; যথা—"নির্ব্বাণং বিবৃতৌ মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনি॥" নির্ব্বাণ শব্দ—"পরম সুখ, মোক্ষ, বিনাশ, গজস্নান প্রভৃতি অর্থের প্রতিপাদক। বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা এক মোক্ষার্থেই "নির্ব্বাণ" শব্দ সংগঠিত হইয়া থাকিলে সংস্কৃত ভাষায় ইহার উল্লিখিত নানার্থের যোগ কখনও সম্ভবপর হইত না। বিশেষতঃ দুঃখের নিবৃত্তি ইহাই বৌদ্ধ "নির্ব্বাণের" প্রকৃত তাৎপর্য্য। সাংখ্যদর্শন মতেও দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বা মুক্তি। "নির্ব্বাণ" শব্দের নির্ব্বৃত্তি বা পরমসুখ অর্থ দুঃখের সেই একান্ত নিবৃত্তির ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। দুঃখের একান্ত নির্ব্বৃত্তি হইতেই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অবস্থা উৎপন্ন হয়। এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অবস্থা মুক্তির অবস্থা বলিয়া ইহাই দার্শনিকদিগের মতে প্রকৃত স্বর্গপদবাচ্য। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে—

"যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং নচগ্রস্তমনন্তরম্।
সর্ব্বাভিলাষোপেতঞ্চ ভবেৎ তৎস্বঃ পদাস্পদম্॥"

এইরূপে আমাদের অভিধান ও দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধনির্ব্বাণের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। বৌদ্ধ-নির্ব্বাণের যে কেহ কেহ নিরবশেষ ধ্বংস অর্থ করেন, তাহাও সংস্কৃত অভিধানের "বিনাশ" অর্থদ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে

* "ব্রহ্মচর্য্য গৃহী বানপ্রস্থ ভিক্ষুচতুষ্টয়ম্।"

পারে। গীতায় যে আমরা "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" শব্দের উল্লেখ প্রাপ্ত হই, তাহা "ব্রহ্মে লয়" অর্থই প্রকাশ করে বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতেও বিনাশের অর্থই অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ-নির্ব্বাণের অন্তর্নিহিত বিনাশ যদি আমরা দুঃখের নিরবশেষ ধ্বংস অর্থে বুঝি এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণের অন্তর্নিহিত বিনাশ যদি পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার ভেদের একান্ত নাশ অর্থে বুঝি, তবে উভয়স্থলেই অর্থসঙ্গতি সুন্দররূপে সাধিত হয়।

বুদ্ধদেব যোগমার্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবন-চরিত হইতে জানিতে পারা যায়। এই যোগমার্গ বিশেষরূপে তান্ত্রিক সাধন পন্থা। মহাদেবের সহিতই এই যোগমার্গের অন্য সর্ব্বদেবতা অপেক্ষা অধিক সম্পর্ক। বুদ্ধদেবের সহিত এই যোগের সম্পর্ক হইতে মহাদেবের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের এক প্রসিদ্ধ রূপ "অবলোকিতেশ্বর।" অভিধানে "অবলোকিত" নামও বুদ্ধের বাচক দেখা যায়। "অবলোকিতেশ্বর" তাহা হইলে "অবলোকিত এব ঈশ্বরঃ" এরূপ বাক্য হইয়া রূপক কর্ম্মধারয় হয়।" "ঈশ্বর" যে বিশেষরূপে মহাদেবের বাচক,তাহা আমরা অভিধান হইতেই জানিতে পারি।" * 'অবলোকিত' শব্দের অর্থও অভিধানে "লোকনাথ" প্রদত্ত হইয়াছে। "লোক-নাথ" শিবকেও বুঝায়। 'অবলোকিত' শব্দের 'লোক'শব্দ ও 'লোক'নাথ শব্দের 'লোক'শব্দ একই ধাতুমূলক শব্দ। 'নাথ' শব্দ ঈশ্বরশব্দেরই ন্যায় 'প্রভু' অর্থের বোধক। সুতরাং "অবলোকিতেশ্বর" নাম 'লোকনাথ' নামেরই একরূপ প্রতি-শব্দ বলা যায়।

"মঞ্জুশ্রী"—বৌদ্ধদিগের অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবতা। এই দেবতা হিন্দুশাস্ত্রে "মঞ্জুঘোষ" নামে খ্যাত। ইঁহার পূজা-প্রকরণ তন্ত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। অতএব তিনি যে তান্ত্রিক দেবতা সন্দেহ নাই। ইঁহার মন্ত্রাদির আলোচনা হইতে ইঁহাকে শিবপ্রকৃতিক বলিয়াই মনে হয়। আমরা নিম্নে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি:—

"জাড্যৌঘ তিমিরধ্বংসী সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীমঞ্জুঘোষো জয়তাং সার্থকানাং সুখাবহঃ॥"

(ধ্যানং) "শশধরমিব শুভ্রং খড়্গাযুক্তাঙ্গপাণিং।
সুরুচির মতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্॥

---

* শম্ভুরীশঃ পশুপতিঃ শিবঃ শূলী মহেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ইত্যমরঃ

পৃষ্ণুরবর মুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষম্।
কুমতিদহনক্ষমং মঞ্জুঘোষং নমামি॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃততন্ত্রসার।

মহাদেবের নমস্কার মন্ত্রে "নরকার্ণবতারণ" রূপে আমরা যে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই এস্থলে "সংসারার্ণবতারক" বিশেষণ তাহারই অনুরূপ। মহাদেবের ধ্যানে তাঁহাকে "রজতগিরিনিভ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—"শশধরমিবশুভ্রং" সেই শ্বেতরূপেরই চিত্র। "পঞ্চচূড়" মহাদেবের পঞ্চবক্ত্রের ভাবই প্রকাশ করে। "কুমার" শব্দ যৌবন সুষমারই বাচক। দুর্গার এক নাম যে "কুমারী" পাওয়া যায়, তাহা অনুপম যৌবন সৌন্দর্য্যেরই দ্যোতক। মঞ্জুঘোষের কুমার অভিধা হইতে "কুমারী" নামের সহিত কুমাররূপে মহাদেবের যোগের প্রকৃত রহস্য আমরা অনুমান করিতে পারি।

"তারা" অতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদেবতা। "তারা" আমাদের দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মহাবিদ্যা। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, চীন দেশেই প্রথম তারাসিদ্ধি হইয়াছিল। ইহাতে চীনদেশের সহিত তারার বিশেষ যোগই প্রমাণিত হয়। চীনদেশেই যে তারার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা :—

"সব্রহ্মজ্ঞ সবেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী সদীক্ষিতঃ।
চীনারক্রমাচারৈর্যোযজেৎ তারিণীং নরঃ॥" ইতি
শব্দকল্পদ্রুমধৃত চীনাচারপ্রয়োগবিধিঃ॥

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, চীনে কেবল তারার পূজা প্রচলিত ছিল তাহা নহে, চীনে সেই পূজার বিশেষবিধিও প্রণীত হইয়াছিল এবং তাহা চীনাচার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রে কেবল যে চীনাচারের নামই আছে তাহা নহে, কিন্তু "মহাচীন" নামক তন্ত্রের নামও পাওয়া যায়; যথা—

মমাচীনাদি তন্ত্রাণি অবিকল্পে মহেশ্বরি।
সুসিদ্ধানি বরারোহে রথক্রান্তাসুভূমিষু॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত
মহাসিদ্ধিসারতন্ত্রম্।

চীনদেশে যে একসময়ে দশমহাবিদ্যা পূজিতা হইতেন, ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। চীনে পূর্ব্বোক্তরূপে দশমহাবিদ্যার প্রভাব ও বিশেষ-রূপে "তারার" প্রভাব হইতে উপলব্ধি করা যায় যে তারা বৌদ্ধদেবতারূপে পরিগণিতা হইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দশমহাবিদ্যার প্রভাবের যেমন আভ্যন্তর প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত

হই—তেমনই বাহ্যপ্রমাণও বর্ত্তমান। তিব্বতে এখনও বৌদ্ধদেবমূর্ত্তির পার্শ্বেই যে দশমহাবিদ্যার কালী ও কমলা মূর্ত্তি বিরাজিত থাকিয়া পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা আধুনিক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায়। নিম্নে সেই বৃত্তান্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"ইহার পর আমরা মন্দিরের দ্বিতলে উঠিলাম। তথায় প্রথমেই এক কালিকা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এই ঘোর বৌদ্ধদেশে আমাদের এই রক্তপিপাসিনী দেবীটী কি প্রকারে প্রবেশ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম বৌদ্ধেরা সকলেই ইঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত পূজা করেন। * * * * ইহার ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে আর একটী দেবীমূর্ত্তি। ইঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর, অনেকটা আমাদের কমলা মূর্ত্তির ন্যায়। আমার অনুমান মিথ্যা হইল না। শুনিলাম ইনি সৌভাগ্য বা লক্ষ্মীদেবী।" *

এস্থলে কমলা মূর্ত্তির বিবরণ হইতে আমরা শাস্ত্রের একটী উক্তির আশ্চর্য্য পোষকতাই প্রাপ্ত হইতেছি। তন্ত্রশাস্ত্রে দশমহাবিদ্যার মধ্যে "কমলাকে" "বৌদ্ধরূপা" বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে যথা—

"কমলা বৌদ্ধরূপাস্যাৎ"। ( শব্দকল্পদ্রুমধৃতমুণ্ডমালাতন্ত্রম্ ) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের দ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হওয়াতেই যে কমলা বুদ্ধরূপিনী বলিয়া কল্পিতা হইয়াছেন—তাহা আমরা স্পষ্টরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

কেবল যে তিব্বতেই বৌদ্ধদেবতার পার্শ্বে হিন্দু তান্ত্রিক দেবতা প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত দেখা যায় তাহা নহে, ভারতবর্ষেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক আই তসিঙ্গ ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম সকলের দ্বারদেশে "মহাকাল" নামক মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত ও সেবিত হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যথা—

প্রাচীন প্রাচীন সঙ্ঘারামের প্রবেশদ্বারে একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত। তদঙ্গে প্রত্যহ তৈলনিষেক হইয়া থাকে। ইহা মহাকাল দেবের মূর্ত্তি। বৌদ্ধধর্ম্মের পঞ্চ পরিষদকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মহাকালমূর্ত্তি প্রহরীস্বরূপ প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের দ্বারে স্থাপিত হইয়াছে।" †

বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।" এই মন্ত্রটী হিন্দুদেবদেবীরই মন্ত্রের-

* 'সৌরভ' আষাঢ় ১৩২২ সাং "তিব্বত অভিযান" শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত লিখিত।

† "প্রাচীন ভারত" শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ গুপ্ত প্রণীত ৩৪২ পৃঃ

ন্যায় সংক্ষিপ্তাক্ষর ও সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। "হুঁ"শব্দটী তান্ত্রিক বীজ এবং ইহা চীনদেশে সিদ্ধতারা দেবীরই বীজ ; যথা—

"তারেহুঁ বিলিখেৎ সরোজকুহরে।
সার্ব্বাভিঠানান্বিতং মন্ত্রার্ণান্‌বহুসংখ্যকান্ বহুদলেষ্বালিখ্য তদ্বাহ্যতঃ॥
শক্ত্যা ত্রিঃপরিবেষ্টিতং ঘটগতং পদ্মস্থমজ্ঞাননং যন্ত্রম্
বশ্যকরং গ্রহাদিভয়হৃল্লক্ষ্মীপ্রদং কীর্ত্তিদম্॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, পদ্মমধ্যে "তারেহুঁ" মন্ত্র লিখিয়া তারার পূজা করা হইত। বৌদ্ধ মন্ত্র "মণিপদ্মেহুঁ" উল্লিখিত "তারেহুঁ" মন্ত্রেরই স্পষ্ট অনুকরণ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু "মণিপদ্ম" শব্দের অর্থ তেমন সুগম নহে। তান্ত্রিক তারামন্ত্রের মধ্যে যেমন বুদ্ধমূলমন্ত্রের আভাস আমরা প্রাপ্ত হই, তান্ত্রিক ষট্‌-চক্রের মধ্যেও তেমনই আমরা ইহার "মণিপদ্ম" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই। সংস্কৃতে আমরা পারিভাষিক "মণিপদ্ম" শব্দ প্রাপ্ত হই না বটে,কিন্তু এতদর্থক "মণিপুর" শব্দ প্রাপ্ত হই। "মণিপুর" ষট্‌চক্রের নাভিচক্র বা নাভি-পদ্মেরই নাম। মণির ন্যায় আকার হইতেই এই নাম হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় ; যথা :—

"তদূর্দ্ধে নাভিদেশেতু মণিপূরং মহাপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ংততঃ।
মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে॥
দশভিশ্চদলৈর্যুক্তং ডাদি কান্তাক্ষরান্বিতম্।
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকন কারণম্॥"
ইতি বিশ্বকোষধৃত ( নির্ব্বাণতন্ত্র ৬ পটল )

এই পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত ; ইহা মেঘ ও বিদ্যুতের ন্যায় আভাযুগ, মহা প্রভান্বিত ও তেজোময়। মণির ন্যায় এই পদ্ম ভিন্ন ( প্রস্ফুটিত ) বলিয়া ইহার নাম মণিপুর। এই পদ্মে দশটী দল এবং দশটী দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত অক্ষর সকল আছে, এই পদ্ম শিব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে।"

উপরের বর্ণনা হইতে মণিপুরই যে 'মণিপদ্ম' তাহা পরিষ্কাররূপেই বুঝা যায়। মণিপূরে যেমন শিবকে চিন্তা করিতে হয়, মণিপদ্মেও যে তদ্রূপ শিবরূপী বুদ্ধ-দেবকেই চিন্তা করিতে হয়, তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা

এই প্রকারে বৌদ্ধ মূলমন্ত্রের প্রকৃত রহস্য তন্ত্রশাস্ত্রের সাহায্যেই উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ হইতেছি।

তান্ত্রিক ষট্‌চক্রান্তর্গত মণিপূরের সহিত কেবল যে বৌদ্ধ "মণিপদ্ম" ও মূল-মন্ত্রেরই যোগ দেখা যায়, তাহা নহে; কিন্তু বৌদ্ধ চরম "নির্ব্বাণতত্ত্বের"ও যোগ দেখা যায়। তন্ত্রে মণিপূরচক্র বা পদ্মেই নির্ব্বাণতত্ত্বসাধনার প্রক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়; যথা—

অথ বক্ষ্যামি নির্ব্বাণং শৃণু সাবহিতনঘে।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ॥
মাতৃকার্ণাং সমস্তাঞ্চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ।
এবং পুটিতমূলস্ত প্রজপেন্মণিপূরকে॥
এবং নির্ব্বাণমীশানি যোনজানাতি পামরঃ।
কল্পকোটি সহস্রেষু তস্যসিদ্ধির্ণজায়তে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত আগমতত্ত্ববিলাসঃ।

ইহা হইতে মণিপূরই যে সাধনা ও সিদ্ধির আধার, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি এবং বৌদ্ধ মণিপদ্ম শব্দ এই মণিপূরেরই ভিন্ন রূপ মাত্র প্রমাণিত হওয়াতে, "মণিপদ্ম" কিপ্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলাধার হইয়াছে, তাহাও আমরা পরিষ্কার উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যোগই তন্ত্রের প্রধান সাধনোপায়; ষট্‌চক্র বা পদ্ম সহায়ই আবার এই যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ষট্‌চক্র "হরপদ্ম" বা "শিবচক্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রে ষট্‌চক্রপ্রকরণের উপসংহারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"এবঞ্চ শিবচক্রাণি প্রোক্তানি স্তবসুব্রত॥
সহস্রারাম্বুজং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসারঃ।

এখানে ষট্‌চক্রভেদই যে সর্ব্বোত্তম যোগমার্গ, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে যোগমার্গ ও ষটচক্রের সহিত শিবের একান্ত যোগ হইতে বৌদ্ধ মণিপদ্মে সাধনার সহিতও যে শিবেরই আদিতে যোগ ছিল, তাহা সহজেই উপপন্ন হয়।

আদিতে "নির্ব্বাণ" তন্ত্রেরই চরমসিদ্ধি ছিল, ইহা তন্ত্রে বিশদভাবে নির্ব্বাণ প্রতিপাদক "নির্ব্বাণতন্ত্র" ও "মহানির্ব্বাণতন্ত্র" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলিই প্রমাণ।

তান্ত্রিক উপাসনায় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল সাধকের যে স্বাধীন অধিকার

প্রথম স্বীকৃত হইয়াছে, বৌদ্ধ উপাসনায় আমরা সেই সার্ব্বজনীন স্বাধীন অধিকারের ভাবই সংক্রান্ত দেখিতে পাই।

উপরে প্রদর্শিত কারণপরম্পরা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি হিন্দুধর্ম্ম, বিশেষতঃ তান্ত্রিক-ধর্ম্মের দ্বারাই সম্যক্‌রূপে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# ব্রজের রাখাল

দিগন্ত-সীমন্ত রাঙ্গা সান্ধ্য-রবি-করে,
ধূসর গোধূলিজালে আবরে অম্বরে,
সারা-দিবসের ক্লান্ত অবসন্ন ধেনু
ফিরে ঘরে ল'য়ে চল বাজাইয়া বেণু!

খর-রবি-দাহে গোঠে আকুল তৃষায়
শান্তি-আশে তব পাশে যবে ছুটে যাই,
শ্যামল তরুর ছায়ে—তব কৃপা-ঝারি
স্নেহে ঢালে সুশীতল পিয়াসার বারি।

পথ-হারা হ'লে কভু কানন মাঝারে,
মুরলীর তানে যবে ডেকে লও তারে,
চকিত আকুল-নেত্রে চাহি তব মুখ
জুড়াই সকল জ্বালা, ভুলে যাই দুখ।

বাজাও বাঁশরী ওগো ব্রজের রাখাল,
পথ চিনে লই আমি ভাঙ্গিয়া আড়াল।
দেখাও গো কৃপাহস্তে পরম অভয়,
ভয় পেয়ে চাই সেই চরম-আশ্রয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সরকার।

# উল্কা

## ( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

( ১১ )

কি যে করিব, কিছুই যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন করিয়া বন্ধুর এই অধঃপতনের নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া নাট্যমন্দিরের আসন চাপিয়া বসিয়া থাকা বন্ধুর কর্ত্তব্যে কি আঘাত করিবে না? এই কি উচিত? এখনও তো সময় আছে; এখনও চেষ্টা করিলে হয় তো এই সুখের সংসারটা ছারখার হইয়া যায় না।

বৌদিদি এই সময়টায় কোনদিনই কই বাজান-টাজান না; আজ কিন্তু কেন, কি ভাবিয়া জানি না, তিনি তাঁর টেবিল-হার্ম্মোনিয়মটার কাছে এই অসময়ে গিয়া বসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম, তিনি গাহিতেছিলেন "যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে; তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে।" আমি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। না, আমার স্ত্রীলোকের মত এমন করিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলে চলিবে না। আজ ২৩শে মাঘ, ২৬শে মাঘের আর দেরি কি? আজই ত সমস্ত বন্দোবস্ত-ব্যবস্থা পাকা হইয়া যাইবে। মধ্যে আর মোটে দুটি দিন; তারপরই এই একান্ত পতিগতপ্রাণা সতীকে জন্মের মত ভাসাইয়া তাহার স্বামী লালসার বিজয়কেতন উড়াইয়া দিবে। না, আর না! এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কেহ কোন অপরাধের বিরুদ্ধেই পায় নাই। ইতঃস্তত করিবার আর আছে কি? বিষ যখন মাথায় চড়িয়া যাইবে, তখন পায়ে দড়ি বাঁধিয়া লাভ কি?

আমায় দেখিয়া বৌদিদি একটু লজ্জা পাইলেন দেখিলাম। তখনি গানবাজনা বন্ধ করিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "একি! তুমি যে আজ বেড়াতে যাওনি! আমি বলি তুমিও সঙ্গে গিয়েচ?" আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না; কথাটা কিরূপে পাড়িব সেই কথাই তখন ভাবিতেছিলাম। একবার মনে হইল, স্ত্রীর কাছে স্বামীর নিন্দা করাটা কি ভাল কাজ হইবে। কাজ নাই, না হয় চুপ করিয়া থাকিয়াই শেষ পর্য্যন্ত দেখি। কিন্তু না, এ কি পাগলের মত ভাবনা করিতেছি! জানিয়া শুনিয়া, শেষ মুহূর্ত্তের জন্য

অপেক্ষা করিয়া, শেষটা কি একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটাইব? এখন বরঞ্চ সময় থাকিতে মানে মানে সব মিটিয়া যাইতে পারে। বলিয়াই ফেলি।

'বলিয়া ফেলিব' ঠিক তো করিলাম, কিন্তু বলা বড় শক্ত! আরম্ভটা হঠাৎ কি ভাবে করি? তাই ভাবিতেছি, এমন সময় বৌদিদি নিজেই নিজের মৃত্যুবানের সন্ধান দেখাইয়া দিলেন। তিনি হঠাৎ বলিলেন "আচ্ছা ঠাকুরপো, বল্‌তে পার, এঁর শরীরটা কি কিছু খারাপ হচ্চে? বল্লে, হেসে উড়িয়ে দেন, কিন্তু আম ওঁর নাড়ি-নক্ষত্র সবি তো জানি। শরীর কিম্বা মন একটা কিছু ওঁর ঠিক সহজ নেই; কিন্তু মনে কিছু হ'লে আমায় তখনি তা জানাতেন। শরীর নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে কিছু অসুস্থ হচ্চে বোধ হয়। পাছে আমি ব্যস্ত হই, বলে কিছু হয় তো বলেন না। আমায় কি যে মনে করেন!"

আজ তাহার এই উদ্বেগব্যাকুল পূর্ণবিশ্বস্ত স্বামী-প্রেম আমার বেদনা-ব্যথিত হৃদয়কে যেন মুগুর তুলিয়া মারিতে আসিল। কি দুরূহ কাজের ভারই আমি নিজের ঘাড়ে লইয়াছি! কোথায় একটু শারীরিক অসুস্থতার সন্দেহ সে আমার কাছে মিটাইতে, তাহার আন্দাজের বিরুদ্ধে দুইটা সহানুভূতির প্রতিবাদ শুনিবে ভরসা করিয়া, আসিল। তা নয়, তার বদলে আমার জানাইতে হইবে,—ওগো, তোমার স্বামী তোমার প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তার মনের কথা সে তোমায় জানাইবে আর কোন্ কালামুখ নিয়া। সে মন কি আর তার আছে?—বলিব কি? না—হ্যাঁ বলিতে হইবে বৈ কি! বলিতে মুখ ফুটিতে চাহিতেছিল না। তাহার কিছুই দোষ নাই; সে আমায় বারেবারে বারণ করিয়া বাধাই দিয়াছিল। কিন্তু আমি কি তখন সে বাধা মানিতে পারি? আমার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর তখন সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। 'সর্ব্বনাশ সমুৎপন্নে' পণ্ডিতের প্রতি অৰ্দ্ধেক ত্যাগ করিবার উপদেশ আছে। আমিও মূর্খ নই। বিবেকটাকেই ত্যাগ করিলাম। শৈলেনের ফেরা পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করা দরকার ছিল, তা বোধ করিলাম না। চোক কাণ বুজিয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম "অসুখের কথা সে তোমায় কি বল্‌বে বৌদি! তার রোগ তো আর সোজা রোগ নয়!"

"অ্যাঁ! সে কি, সে কি ঠাকুরপো! কি, কি হয়েছে তাঁর?" আমি চাহিয়া দেখিলাম বৌদি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। চোক্ যেন তাঁহার নিজের জায়গা ছাড়িয়া অনেকখানি বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ভয় পাইয়া গেলাম। কি করি, কি কিছু বলি, যেন ঠিক পাই না। বলিয়া ফেলিলাম "তুমি বোলো,

অত ভয় করচ কেন? শরীরে তার কোন রোগই নেই। সে রকম অসুখের কথা আমি কিছুই ত বলিনি।"

শুনিয়া তখন যেন তাঁহার ধড়ে প্রাণটা ফিরিয়া আসিল, মনে হইল। কিন্তু একে মেয়েমানুষ, তার উপর একটু বেশী রকম স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই বল, অথবা বেশী আদরে যা হয় 'হিষ্টিরিক্‌ই' বল, সেটাও ওঁর মধ্যে বড় অল্প পরিমাণে নাই। বিশেষ, যে মানুষ সর্ব্বদা নিজেকে রোগী বলিয়া শুনিয়া শুনিয়া অত্যধিক সন্তর্পনে থাকিতে পায়, নিজের গায়ের চামড়া কাচ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এই রকমই ধারণাটাও জন্মাইয়া যায়। বৌদি কাছের কৌচখানায় এমনি অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন যে, তা দেখিয়া আমার দয়া হইলেও একটু হাসিও পাইল। মনে মনে ভাবিলাম 'এখনি এই, সবটা শুনিলে না জানি তুমি কি করিবে!'

ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েচে?" তাঁর স্বরটাও যেন কি এক রকমের, যেন আর কাহারও, তাঁহার গলার নয়—যেমনি কম্পিত, তেমনি অস্ফুট। আমি মানুষকে কখন এরূপ স্বরে কথা কহিতে শুনি নাই। তাই মনটা যেন কেমন চমকিয়া গেল। কি জানি, যা করিতে যাইতেছি, তা ভাল করিতেছি, কি ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলিতেছি, তাও তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। চিরদিন যে এত আদরে সোহাগে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে কি অকস্মাৎ এতবড় অবহেলার ভার সহিতে পারিবে! না হয় কোন রকম করিয়া এখনও কথাটা চাপিয়া যাই; কিন্তু তখনি সে ভাবটা মন হইতে চলিয়া গিয়া একটু বড় দুঃখের হাসি আসিল। আমি এখন না হয় দুদিন চাপা দিয়াই রাখিলাম; কিন্তু এই দুঃসহ দুর্দ্দশা যখন যথার্থ সত্য হইয়া তাঁহার জীবনে দেখা দিবে, তখন এ করুণা তাঁহার উপর কে করিবে? আজ তো এখনও উপায় আছে, সময় আছে, প্রতিবিধানও আছে।

দ্বিধা না মানিয়াই তাই বলিয়া ফেলিলাম "দেখ বৌদি, কথাটা বড়ই শক্ত, হঠাৎ শুনে বিশ্বাস করতেও হয় তো পারবে না। তুমি কি, আমিও তো এতদিন এত রকমে প্রমাণ পেয়েও তবু কিছুতেই নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। কিন্তু এখন এমন সব প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে যে, তাতে আর অবিশ্বাসকে কোনমতেই মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। তোমার কাছে এ কথা জানাতে বুক আমার ফেটে যাবে। এত বড় শত্রুতা হয় তো কেউ কারু করে না; কিন্তু মনকে কঠিন করো বৌদি, এ অপ্রিয় সত্য তোমায় যেমন করেই হোক শুন্‌তেই হবে; আর শুধু শোনা নয়, শুনে এর প্রতিবিধান করতেও বুক দিয়ে উঠে লাগ্‌তে হবে। ভগবান আমাদের

যখন সময় থাকৃতে সাবধান করে দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে, এর সকল বিষয়েই তাঁর ঈঙ্গিত রয়েছে। এখন শুধু পাষাণে প্রাণ বেঁধে সব শোন, আর শুনে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর যা ধর্ম্ম, তাই কর। অধর্ম্ম থেকে, অধঃপতন থেকে তোমার স্বামীকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে এস। এখন আর নিজেকে নিয়ে সোফায় শুয়ে থাকবার, পিয়ানোর চাবি টিপে দুঃখসঙ্গীত গাইবার সময় নাই। বজ্রের মত দুঃখ এখন সত্যসত্যই তোমাদের উপর উদ্যত হয়ে রয়েছে,—কখন পড়ে।"

এত কথা সব একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া যেন অনেকখানি হাঁফ ফেলিবার মত হাল্কা হইতে পারিলাম। যে ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকাইয়া ভিতরে ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্ধনটাকে ধরাইয়া তুলিতেছিল, সেটা যেন জ্বলিয়া উঠিতে পাইয়া জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাইতে পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিল।

কিন্তু তড়িতা যেন এক রকমের মেয়ে। এ কি অসঙ্গত বিশ্বাসী চিত্ত মেয়েমানুষের! আমার তো ঠিক উল্টা ধারণাই ছিল। সেই যে প্রথমকার ভয়ের আঘাত সে তার দুর্ব্বল বক্ষে পাইয়াছিল, তা হইতে এখনও সে যেন নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইতে পারে নাই। বাবারে, বাবা! এর নাম আবার মানুষের শরীর? শৈলেন সাধ করিয়া কি আর একটা বিবাহ করিতেছে? না করিয়া কি করিবে? বেশ করিতেছে। এই স্ত্রীকে মিউজিয়মে সাজাইয়া দ্রষ্টব্যের মত রাখিয়া আসাই ভাল; এ লইয়া কখন কি ঘরকর্‌না করা চলে? তিনি সেই কাঁপা-স্বরেই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কথা কহিলেন; বলিলেন "কি তুমি বল্‌চো ঠাকুর পো? তাঁর অধর্ম্ম! তাঁর অধঃপতন! আমায় পরীক্ষা করচো ভাই? তিনি যে ধর্ম্মের মূর্ত্তি, উচ্চতার আদর্শ। সে ভয় তুমি করো না, সে দুঃখ ভগবান আমায় দেবেন না।"

না, দেবেন না! ভগবান তোমার হাতধরা, তোমার হুকুমের চাকর তিনি। তুমি যখন দিতে বারণ কর্চ্ছ, তখন আর কি তিনি দিতে পারেন? ভগবানের পূজা করো না, মন্ত্র-জপ নাই; গীতা-পাঠের কথা তো একটা স্বপ্ন মাত্র। অম্‌নি অম্‌নি তিনি তোমার বশ হয়ে আছেন আর কি! হা'রে মূঢ় নারী! ভগবানকে তুই কি চিন্‌বি? মনের উষ্মাটায় আর এক ডিগ্রি তাপ বাড়িয়াছিল; তাই যেটুকু বাধোবাধো ছিল, সেটুকুও কাটিয়া গেল। তখন স্পষ্ট করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। কেন বলিব না? আমি তো নিজের জন্য, অপর কোন স্বার্থের খাতিরে কিছুই করি নাই। তাহারই উপকারের জন্য, তাহাকেই রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপরে নিষ্ঠুর হওয়া ভিন্ন আর আমার কি উপায় ছিল? রোগীকে বাঁচাইবার

জন্যই তো ডাক্তারে তাহাকে চিরিয়া 'অপারেসন' করে! তাঁদের তো এমন মৎলব থাকে না যে, ঐ লোকটার হাতটা কি পাটা, পেটটা কি পিঠ্‌টা থাকিলে আমার কিছু লোকসান হইতে পারে; অতএব ওর ঐ অঙ্গটা আমি বাদ দিয়া দিই। আমি বলিলাম "সে অবশ্য আমার স্কন্ধে লক্ষ্মীকে গছাইবার যথেষ্ট চেষ্টাই করেছিল। অধর্ম্ম কথা অবশ্য আমি একটিও বল্‌ব না। আমি যদি রাজী হই, তা'হলে আর এতবড় বিড়ম্বনার মধ্যে তোমাদের পড়তে হয় না। কিন্তু, তখন কে জানিত এরকম হয়ে দাঁড়াবে। যদি জান্‌তাম, তাহলে নিজের জন্য না হলেও তোমাদের সুখের জন্য আমি এ'ও করতে পারতাম। কিন্তু শৈলেন অমন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে সর্ব্বদা দেখাসাক্ষাতের ফলে নিজের সেই দেবচরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারলে না। তুমি চিররুগ্না, তোমায় ভালবেসে সে বোধ করি সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে নি। স্ত্রীর উচিত পাওনা তুমি তো তাঁকে কখন দাও না। সেই বরং উল্টে তোমার সেবা করে। লক্ষ্মী তাকে রেঁধে খাওয়ায়, পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট করতে পারে; তাই সে তাকে লুকিয়ে আপনার করে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু এখনও সময় আছে বৌদি, এখনও হাল ছাড়বার তোমার দরকার নাই। এ বিয়ে বন্ধ কর। তুমি জান্‌তে পেরেছ জান্‌লে, তোমার চোখে জল দেখলে, তুমি রাগদুঃখ করলে সে অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও আর এ কাজ করতে পারবে না। এই চিঠি পড়ি শোন, এই দেখ বেনারসী সাড়ি ও গহনার দামের রসিদ, দেখলে তো? আমি খুব বড় প্রমাণ না পেলে তোমায় জানাই নি।"

তড়িতার বিবর্ণ অধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল। সে আবার মেঘবিলীনমান ক্ষীণ বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় একপ্রকার সর্ব্বনাশ-প্রচ্ছন্ন কি রকমের কষ্ট-হাসি হাসিল। "আমি কি জানি না ঠাকুরপো, তুমি তাঁকে কত ভালবাস। কিন্তু ভুল সবারই হতে পারে। তুমি তাঁকে তেমন করে চেনো নি ভাই,—আমি আমার দেবতাকে যেমন করে চিনেছি। তিনি কি কখন তাঁর এ দাসীকে না জানিয়েই তাকে পায় ঠেল্‌তে পারেন? যদিই ধরো—যদিই গরীব বলে, অনাথা বলে লক্ষ্মীকে চরণে স্থান দিতে সাধই হয়ে থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সে ইচ্ছা তাঁর এ দাসীকে জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি জানেন নিশ্চিত জানেন, তাঁর একটুও সাধ পূর্ণ করতে তাঁর তড়িৎ নিজের বুক পেতে দেবে, সে তো না বল্‌বে না।"

সত্যকথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। আমি যথার্থ বলিব, আজ আমার এই

মেয়েটির উপর বড় শ্রদ্ধা হইল। সর্ব্বদা সেমিজ-জ্যাকেট-আঁটা, নভেল এবং তার চেয়ে উঁচুদরের ইংরেজি বই-ঘাঁটা, গান বাজনায় একান্ত লজ্জাহীনা এই একেলে নারী যে এমন সেকেলে-ধরণে সর্ব্বস্ব দিয়া তাহার পূরো বিংশ-শতাব্দীর স্বামীকে এত ভালবাসিতে পারে, এ ধারণা আমার যেন ছিল না। আমি জানিতাম, এখনকার মেয়েরা নিজেদের ফ্যাসনের ক্যাটালগখানাকে যেন স্বামীর চাইতে একটু বেশীই ভালবাসে। স্বামীর হাম-জ্বর হইলে, গায়ে বসন্ত দেখা দিলে, রং খারাপ হইবার, মুখে দাগ পড়িবার ভয়ে পতিব্রতারা কলেজ হইতে সুশ্রূষাকারিণী ভাড়া করিয়া আনিয়া দেন; তাঁহারা স্বামীর দাসী নহেন, সখী মাত্র। কিন্তু কই, এ তো তা নয়। এ যেন আমি সেই পুরাকালের হিন্দুর আদর্শযুগের সীতা দময়ন্তীর বাণী কাণে শুনিতেছি। শৈলেনের উপর যেন ঘৃণার মাত্রাটা বার গুণে বাড়িয়া গেল। মনে মনে লক্ষীর সহিত তাহার নিপাত কামনা করিয়া প্রকাশ্যে বড় দুঃখের সহিতই কহিলাম—"বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে তো হবে না বৌদি! তোমার স্বামীকে এখন কেবল একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পার। আজ শৈল বাড়ী এলেই তুমি তাকে এই চিঠি দেখিও। আমার সাম্নেই তুমি কথাটা তুলো, সাম্নাসাম্নি একটা মোকাবেলা হয়ে যায়, সেই ভাল, বুঝলে? তোমার কোন ভাবনা নেই, যখন জানা গেছে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমার সান্ত্বনা কেবল বেনাবনে মুক্তার অপব্যয়। তড়িতা সেই রকমই অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন অর্দ্ধ-সচেতনভাবেই থাকিয়া সেই সর্ব্বস্বান্তকারী ভীষণ মধুর হাসিটুকু আবার হাসিলেন; "ছিঃ ঠাকুরপো, তাঁকে আমি আমার নিজে জন্যে অন্যের কাছে লজ্জা পেতে দেব! তুমি জাননা ভাই, বিয়ে করনি, তাই হিন্দু স্ত্রী কি, তা জাননা।"

সত্যই একটা জিনিষ আমার জানা ছিল না। হিন্দু বলিতে এখন আমরা ঠিক যেটি বুঝি, তাহার একচুল এদিকে ওদিকেও যে কতখানি হিন্দুত্ব ছাইচাপা রহিয়াছে, তা আমার জানা ছিল না। আমার বিশ্বাস যা ছিল, তা পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি,—ইংরেজিজানা, গাওনাবাজনা-ওয়ালা মেয়েদের ঠিক যেন হিন্দু-মেয়ে বলা যায় না। কিন্তু এ কথা এখন স্বীকার করিয়া বাহবা দিবার সময় নয়। এই ব্যাপারটার রঙ্গভূমি থিয়েটারের বাঁধা-ষ্টেজ নহে; সেটা বাস্তব জগতের সত্যকার ঘর-দ্বার, গৃহস্থের গৃহ। কাজেই আমায় সোজা কথাটাই বলিয়া যাইতে হইল; বলিলাম, "আমায় ক্ষমা কর, প্রয়োজনের খাতিরে আমায় অপ্রিয় সত্যটাই

তোমায় জোর করে জানাতে, এবং মানাতে হচ্চে। তাহলে তুমি নিজের ঐ খেয়ালের মধ্যে থেকে তোমার স্বামীকে অন্যের হতে দেবে? জন্মের মত তার সব দাবীদাওয়া ছেড়ে দিতে পারবে?"

"ঠাকুরপো!" [ বাণবিদ্ধ কুরঙ্গী যেমন করিয়া বারেক আর্ত্তস্বরে মরণকান্না কাঁদিয়া উঠিয়া চিরনীরব হইয়া যায়, তেমনি শুধু ঐ একটিমাত্র আর্ত্তনাদে অন্তরের রাশিরাশি যন্ত্রণা যেন ঘরময় ছড়াইয়া দিয়া, সে সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়া পাশের খোলা-বাজনাটার গায়ে মাথা রাখিল। বুঝিলাম এইবার মর্ম্মে গিয়া আঘাতটা লাগিয়াছে। এইবার নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়া ত্যাগের খেলা ফুরাইয়া দিয়াছে। কি করি, কর্ত্তব্যের খাতির! অনেক রোগে রোগীর সাড় করিবার জন্য, ডাক্তার গরমজলের ঝাপ্‌টা মুখে দেয়, বৈদ্যুতিক যন্ত্র হাতে পায়ে দিয়া গা চিরিয়া যন্ত্র ফুটাইয়া শরীরে তড়িত ও বিষ প্রয়োগ করে, সাধ করিয়া করে না, দায়ে পড়িয়াই করিতে হয়।

মনে কিন্তু তবুও একটু কষ্ট হইতেছিল, একবার ভাবিলাম, না হয় বলি 'আমি তোমায় ঠাট্টা করিতেছিলাম, ও সব মিথ্যা কথা!' কিন্তু এত বড় মিথ্যা কথাই বা মুখ দিয়া বাহির করি কি করিয়া? সে হয় না। বিধাতার বিধানে যে দুঃখ পাইবে, তাহাকে কে রক্ষা করিতে পারে? পাউক, যদি এইটুকুতেই অনেকখানি কাটিয়া যায়।

বাহিরে কে ডাকিতেছিল "বে—রা, বে—রা।" বেয়ারাকে এ ডাকের সুর ইংরেজি।—ইংরেজেরই কি না তা জানি না,—সেই অনুকরণে আজকাল অনেক 'ময়ুর পুচ্ছ'ই এই সুর ভাঁজিয়া থাকেন, শুনিয়াছি। বেয়ারা কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন,—নিজেই দেখিতে গেলাম।

মিনিট সাতআট মাত্র দেরি হইয়াছিল, লোকটি বিদায় লইতেই ফিরিফিরি করিতেছি, এমন সময় ডাকের পিয়ন একখানা টেলিগ্রাম আনিয়া দিল। সই দিয়া লইলাম। 'অফিসিয়াল'নয়, প্রাইভেট। কৌতূহল হইল। টেলিগ্রামে কাহারও কোন গোপন কথা থাকে না, খুলিলেই বা দোষ কি? লেফাফাটা ছিঁড়িয়াই চোকে পড়িল, তলায় রহিয়াছে দাদার নাম। দাদা কি টেলিগ্রাম হঠাৎ দিলেন! কারু কিছু হয় নাই তো? বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল।

এর মানে কি? দাদা লিখিতেছেন, 'আজ যাইতে পারিলাম না, ২৫ শে—রওনা হইয়া ২৬ শে ভোরের আপ্‌মেলে বাঁকিপুরে পৌছিব।' দাদা কেন অতর্কিত আসিতেছেন? তবে—

মণ্টুর কান্নার উচ্চধ্বনি শ্রুত হইল। তাহাকে কোলে লইয়া ত্রস্তব্যস্ত মাদ্রাজী দাসী আসিয়াই বলিয়া উঠিল "সাব, মেমসাব'কা এ কেয়া হোগিয়া! আপ্ জল্‌দি চলিয়ে।"

"অ্যাঁ সে কি!" আমি প্রায় ছুটিয়াই ঘরে ঢুকিলাম "কি হয়েছে, কি! বৌদি! বৌদি!"

মণ্টুটা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কচিছেলের মন যে সর্ব্বজ্ঞ, সে নিজের সর্ব্বনাশ কেমন করিয়া যেন টের পাইয়াছিল। "মেমতাব, মেমতাব্!—মামা,—মা, মায়িজী!" যতরকম ভাষার যে কিছু মাতৃ-আহ্বানমন্ত্র সে এই তার জীবনের আড়াইটি বছরে শিখিয়াছিল, নিজের মধুমাখা কণ্ঠের সমস্ত মধু ঢালিয়া দিয়া সেই অমৃত-নিষিক্ত-মন্ত্রে যেন তাহার নিস্পন্দ নিঃসাড় মায়ের শরীরে পুনরায় জীবন আনিতে চাহিল। "আইয়া, মেমসাব্ কো গদি পর যায়েগা, হামতো থোড়দে আইয়া।"

আমি এখন কি করি? কি করিলাম! কি হইল! একি করিতে কি হইল? কেন এমন করিলাম? কেন একথা বলিলাম? এ মতিচ্ছন্ন আমায় কেন ধরিল রে, কেন ধরিল!

"বৌদি! বৌদি! তড়িতা! তড়িতা! ওঠো, ওঠো, কথা কও,—বৌদি, কি করচো! অমন করে রয়েছ কেন? মুখ তোল, চেয়ে দেখ, ও বৌদি! বৌদি!" হায় কে চাহিবে,—কে শুনিবে! সেই সোফার ধারেই বসা, সেই তাঁহার নূতন আমেরিকান অর্গানটায় উপর মাথা রাথা, যেমনটি আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, ঠিক কি সমস্তই তেম্‌নি রহিয়াছে! চোকছুটি পর্য্যন্ত সেই রকম চাওয়া, কেবল তাহাতে সেই আকস্মিক প্রচণ্ড-আঘাতের আর্ত্ত-ব্যাকুলতাটুকুই নাই; তাহা এখন শান্ত, ভাবশূন্য, পাথরের চোথের মত নিস্পলক!

সাহেব-ডাক্তার আসিয়া সেইথানেই সেই অবস্থায় পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুই বাকি ছিল না। পরীক্ষা না করিয়াও যা বোঝা গিয়াছিল, পরীক্ষা করিয়া সেই কথাই তিনি কেবল ডাক্তারি-ভাষাতে ব্যক্ত করিলেন মাত্র। রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গিয়া মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার শরীর-যন্ত্রের অবস্থা এথানের সকল ডাক্তারে জানাইয়াছিল। তাই ইহাতে ডা কিছুই বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "আমি অনেকবারই এসম্বন্ধে মিঃ সরকারকে আভাস দিয়া আসিয়াছি। তিনি কিন্তু এতথানি থারাপ

কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। এতটা যে মন্দ, আমিও অবশ্য তা ভাবি নাই, তা স্বীকার করি। আমার বিশ্বাস ছিল যে ভাবে তিনি এঁকে রেখেছিলেন, তাতে খুব শীঘ্র অনিষ্ট না করতেও পারে, যদি না মনে শোক দুঃখ ভয় ভাবনার আঘাত বাহির হতে না লাগে। কিন্তু আমরাও মানুষ; মানুষের জ্ঞানকে ঈশ্বর উপহাসাস্পদ করবার জন্যই মধ্যে মধ্যে তাদের ভ্রম দেখিয়ে দেন। আমরা যে কত অল্পই বুঝিতে পারি, তা এই সব হতে বোঝা যায়।"

ডাক্তার নিজের ভ্রান্তি সরলভাবেই স্বীকার করিতে পারিলেন; কিন্তু আমি পারিলাম না। একথা বলিতে পারিলাম না যে, তোমার ভুল হয় নাই, ভুল হইয়াছিল আমার। আমি ওর দুর্ব্বল-বক্ষে কতবড় বজ্রাঘাত সহ্য হইবে, তার কোন আন্দাজ না রাখিয়াই, প্রাণপণ শক্তিতে সেই শক্তিশেল সন্ধান করিয়াছিলাম। তারই এই ফল ফলিয়াছে। বলিলাম না কেন? কোন অপরাধীই নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া নিজেকে অপরাধী করে না। সে জানে অন্যের অপরাধের কালি গায়ে মাখিয়া তাহাকে কালো হইতে হইয়াছে, সে কালি তাহার নিজের তৈরি করা কলঙ্ক নয়।

আমিও তাই জানিতাম। আমি না বলিলেও যে, এ কাণ্ড না ঘটিত, এমন কথা আমার অতি বড় শত্রুতেও বোধ করি বলিতে পারে না! আমি আর কি করিয়াছি? যা সত্য হইয়া দুদিন পরে দেখা দিবে, তাই না হয় দুদিনমাত্র আগেভাগে জানাইয়া দিয়াছিলাম। এই বই ত না! যার এই সংবাদের আঘাতটুকুই সহিল না, তার প্রাণে সেই সত্যের সঙ্ঘাত কি সহ্য হইত? এ অনুমান কোন্ পাগলে করিবে? যাই হোক্ 'মরণের বাড়া ত আর গাল নাই'; যে মরিয়াই গেল, এ'র চেয়েও অসহ্য হইলে সে কি করিত, সে ভাবনা এখন আর ভাবিবার দরকার করে না। যা করিয়া গেল, চূড়ান্তই করিল। আমাকে একটুখানি আর তার স্বামীকে অনেকখানিই যন্ত্রণার অংশীদার করিয়া গেল!

ডাক্তার তাঁর মোটর-সাইকেলখানি দিলেন। শৈলেনকে সু-খবরটা দিয়া তাকে ফিরাইয়া আনিবার ভারটা অবশ্য আমার উপরেই পড়িল, কেননা আমি তাহার আবাল্য-যৌবনের বন্ধু কি না। বন্ধুর বিপদে বন্ধু ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে, সান্ত্বনা দিবে? আমি আজ কার মুখ দেখিয়া সকালে উঠিয়াছিলাম? দেখি, একবার তো এক খবর দিতে গিয়া এই কাণ্ড করিয়াছি, আবার কি হয়? এবার? না এবার কি হইবে? মন যা চাহিতেছিল, ঠিক তাই হইয়াছে। প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না, লুকোচুরির ক্লেশভোগ করিতে

হইল না। দশের চক্ষে অপরাধী হইয়া দাঁড়ানোর যে একটা লজ্জা-সঙ্কোচ, তাও আর বর্ত্তমান রহিল না। মানুষ কি সকল বাসনা পূর্ণ করিবার এমন সুযোগ সর্ব্বদা পায়? শৈলেনের কপালের জোরটা খুব দেখিতেছি! এই সেদিন তার উপরওয়ালার মৃত্যুতে অসময়েই তাহার পদ ও বেতন অনেক বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। আজ আবার রুগ্না স্ত্রীটা এমন দরকারের ঠিক সময়টিতে তাহার নবপ্রেমতৃষ্ণা মিটাইবার সুযোগ দিয়া, অকস্মাৎ সরিয়া গেল! খাটাইল না, খরচ করাইল না,—কিছু না; মনেও একটু ক্রোধ লইয়া গেল না; নিজের সমস্ত হৃদয়ের দলিত ভালবাসা দিয়া তাহার সমুদয় পাপের কলঙ্ককালি সে যেন ধুইয়া মুছিয়া লইয়া চলিয়া গেল। হাঁ, সতী বটে! (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

# লক্ষ্মীজননী

আজি ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ  
কর মঙ্গলময় বঙ্গের গৃহ-প্রাঙ্গনতল অঙ্ক।  
আজি বর্ষণ কর' হর্ষসরস কাঞ্চন চূর্ণ,  
তব কঙ্কণরব সঙ্গীতে কর' অন্তর পূর্ণ।  
ঐ জাগ্রত সব সুপ্ত  
আজি দুঃখের তম লুপ্ত,  
ঐ ইঙ্গিত নব দর্শনে তব উল্লাসে নিঃশঙ্ক—  
আজি ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ।

আহা স্তন্যের ধারা শুষ্ক কণ্ঠে সন্তান চায় গো;  
ডাক অন্নের মুঠি বন্টিয়া যারা লুণ্ঠিছে পায় গো  
হর' রক্ষের ক্ষুধা, চুম্বে  
আর বক্ষের সুধাকুম্ভে,  
মাগো অঞ্চলে তব মার্জ্জন কর' দুঃখের যত পঙ্ক—  
আজি ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ।

দেবি, দৈন্যজনিত দুর্দ্দিনজাত কল্মষহারিণী,  
মাগো ভগ্নহৃদয় রুগ্নের শত যন্ত্রণাবারিণী  
দিয়া সান্ত্বনা আর শান্তি,  
তুমি নির্ম্মল কর' কান্তি,  
দীন বঙ্গের প্রাণ-অঙ্গেরে কর' উজ্জ্বল অকলঙ্ক—  
আজি ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ।

শ্রীকালিদাস রায়

# শ্রুতি-স্মৃতি

## ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

আজ আর সে নিয়ম নাই, আমাদের বাল্যকালে "নাম শ্লোক" শিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীতে সকলগুলি বালককে পিতা পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির নাম, জাতি গোত্র গাঁই প্রভৃতি সব শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক, স্তোত্র প্রভৃতিও মুখস্থ করাইয়া দিবার পদ্ধতি ছিল। আমার বাল্যাবস্থায় আমাদের বাড়ীর প্রাচীন কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয়ের উপর আমাকে নাম-শ্লোক-স্তোত্রাদি শিখাইবার ভার আমার পিতামহী ঠাকুরাণী দিয়াছিলেন, কবিরাজ মহাশয় নিয়মিতরূপে প্রতিদিন প্রাতে এবং সন্ধ্যায় কিছুকাল করিয়া আমাকে ঐ সকল শিখাইতেন।

কবিরাজ মহাশয় নিজে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি যত্ন করিয়া নানারূপ ছন্দের শ্লোক, স্তোত্র আমায় বলিয়া দিতেন, এবং যতক্ষণ তাহার উচ্চারণ ইত্যাদি যথারীতি না শিখিতাম আমায় অব্যাহতি দিতেন না। সংস্কৃত ছন্দের অপরূপ মাধুর্য্য আমার শিশুকর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত, আমি উৎসাহের সহিত উচ্চারণগুলি আয়ত্ত করিয়া প্রতিদিন সেগুলি মুখস্থ করিতাম, এবং দিনে বহুবার সেগুলি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতাম। যাহা শিখিতাম তাহা পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট আবৃত্তি করিতে হইত, এইরূপে শিক্ষার সহিত পরীক্ষাও দিতে হইত বলিয়া শিক্ষিত শ্লোকাদি বিস্মৃত হইবার আমার উপায় ছিল না। শৈশবে যে সব শ্লোক শিখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে অনেকগুলি আমার আজও মনে আছে। চক্ষু রোগে দীর্ঘকাল যখন লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন আমার অভিভাবকগণ মুখে মুখে শিক্ষার বিধান করিয়া দিয়াছিলেন, অর্থাৎ মাষ্টার, পণ্ডিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ করিতেন, অর্থ বুঝাইয়া দিতেন এবং যে সকল বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে হইত তাহা বারবার আমার নিকট আবৃত্তি করিতেন, আমি শুনিয়া শুনিয়াই সে গুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিতাম। এ সময়েও পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অনেক শ্লোক শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়াছি এবং আজও তাহার সকলগুলি আমার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে শুনিতে ছন্দের মোহ আমায় অভিভূত করিয়াছিল এবং পরজীবনে যতটুকু সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়াছি আমার বালক-মনঃক্ষেত্রে তাহার বীজ সেই সময়েই বপন করা হইয়াছিল। শৈশবে যে সকল শ্লোক শুনিয়া মুখস্থ করিতাম তাহার সকলগুলির ভাবার্থ আমার শিশুমনে ধারণা করিতে পারিত না, তথাপি সংস্কৃত ছন্দের মোহ আমার মনকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিত যে, অর্থ না বুঝিয়াও সেই সকল শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতাম। কলেজে পড়িবার সময়ে শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি অনেক নাটক ও কাব্যগ্রন্থ পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু শৈশবেই ঐ সকল নাটকের অনেক শ্লোক, কাব্যের অনেক স্বর্গ, আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। সে সময়ে ঐ সকল অপূর্ব্ব শ্লোকের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় নহে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে যখন অর্থ বুঝিয়া ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলাম তখন অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আমার হৃদয় অভিসিঞ্চিত হইয়া যাইতে লাগিল। কি প্রগাঢ় একনিষ্ঠ প্রেমে রঘুবংশের সীতা নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা হইয়াও লক্ষ্মণের নিকট "ত্বমেব ভর্ত্তা নচ বিপ্রয়োগঃ" বলিয়া জন্মান্তরেও রামচন্দ্রকেই অবিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে স্বামীরূপে পাইবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন শৈশবে তাহা বুঝি নাই, শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছি মাত্র; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, যথোপযুক্ত সময়ে ভাবার্থ বুঝিয়া যখন রঘুবংশ পড়িয়াছি তখন কবি ও কাব্যের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা আমার নাই। বহু দুঃখ, শোক বিরহ, বিচ্ছেদের অবসানে অগ্নি পরীক্ষার অন্তে জানকীকে "ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ম্, ত্বং কৌমুদীর্নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে" বলিয়া রামচন্দ্র কত সুমধুর সোহাগবাণী শুনাইয়াছেন তাহার অন্ত নাই! এ হেন প্রাণাধিক—প্রিয়দয়িতা নির্ব্বাসিতা হইয়া লক্ষ্মণের দ্বারা স্বামীর নিকট অনুরোধ জানাইতেছেন "তপস্বীসামান্যমবেক্ষণীয়া", এ শ্লোকার্দ্ধের হৃদয়-বিদারণ করুণা হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় বাল্য বা শৈশব নহে; সে সময়ে কেবল ছন্দের মোহে মুখস্থ করিয়াছিলাম, যখন অর্থ বোধ হইল, মানবহৃদয়ের অন্তস্তলদর্শী কবির অপূর্ব্ব ক্ষমতা স্বীয় হৃদয়ে যখন অনুভব করিলাম, তখন এই সকল শ্লোকের উপর কত অশ্রুই যে বিসর্জ্জন করিয়াছি তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? যে প্রাণাধিক প্রিয় ছিল, যাহার সহিত নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইবার পক্ষে মণিময় হারকেও অন্তরায় বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, যাহাকে নিরপরাধে বনবাসিনী

করিয়াছি সেই নিরভিমানিনী আবার তপস্বী-সামান্যরূপে—কৃপাকণা যাচ্ঞা করিতেছেন, রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের দ্বারা জানাইতেছেন যেন তিনি নিতান্ত পক্ষে প্রজাসামান্যরূপে এই তপস্বিনীর সংবাদ সময়ে সময়ে লইতে পরাঙ্মুখ না হয়েন। মানবহৃদয়াভিজ্ঞ কবির বর্ণিত এই করুণা পাঠকের পঞ্জর-পিঞ্জর-স্থিত প্রাণবিহঙ্গকে কেমন করিয়া বেদনাতুর করিয়া তোলে তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" প্রভৃতি গীতগোবিন্দের অপূর্ব্ব শ্লোকাবলী গোবিন্দের প্রীত্যর্থে শৈশবে কণ্ঠস্থ করি নাই, মেঘনির্ঘোষবৎ মৃদঙ্গের ধ্বনির ন্যায় শ্লোকের অবাধলীলাময়গতি আমার শিশুকর্ণে অপরূপ মাধুর্য্যের সহিত বাজিয়া উঠিত, তাই অর্থজ্ঞানবিবর্জ্জিত আমি প্রাণপণে ঐ সকল শ্লোক মুখস্থ করিতাম এবং বারংবার আবৃত্তি করিতাম।

"চন্দনচর্চ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী" অথবা "মধুকরনিকর করম্বিত-কোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে" প্রভৃতি শ্লোকের অনুপ্রাসমাধুর্য্য বুঝিবার বা অর্থবোধজনিত আনন্দলাভের আমার তখন ক্ষমতা ছিল না, নৃত্যকুশলা নটীর চরণভঙ্গজনিত নূপুর-নিক্কনের মত ঐ সকল শব্দ আমার কর্ণে মধুর বর্ষণ করিত, তাই শৈশবেই ও সকল আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনীলতেব" শৈশবে দেখিবার বা দেখিয়া বুঝিবার সময় নহে, ছন্দ এবং শব্দবিন্যাসের মোহে মুগ্ধ হইয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বয়োবৃদ্ধি সহকারে কলেজে পড়িবার সময়ে যখন অর্থবোধ হইল তখন কবির বর্ণনক্ষমতাকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছি, এবং জীবনবসন্তের এক শুভসন্ধ্যায় দীপালোকিত সুসজ্জিত কক্ষে **পর্য্যাপ্ত-পুষ্প স্তবকে অবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার** যখন প্রথম সাক্ষাৎ পাইলাম তখন কালিদাসকে মিথ্যাবাদী বা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের পক্ষপাতী বলিয়া বোধ করিতে পারিলাম না। সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত-রস-সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার মত ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কূলে বসিয়া যে টুকু শীকর-কণার স্পর্শলাভ করিয়াছি তাহার জন্য বৃদ্ধ কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র, আমাদের পুরোহিত চন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণের পুত্র কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, কলেজের পূজ্যপাদ পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী এবং রাজধানীর দ্বার পণ্ডিত পীতাম্বর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ মনীষি-বৃন্দের নিকট আমি অচ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত, সে ঋণ এ জীবনে শোধ করিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই, আর হইবেও না। ইঁহারাই আমার বাল্যকালে

আমাকে সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই আমার মনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া গিয়াছিল।

শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, যাগ যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে বৎসরে বহুবার অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সমাগম হইত, এবং বার্ষিক লইবার জন্য দেশদেশান্তরের পণ্ডিতমণ্ডলীরও অসদ্ভাব ছিল না, আমি ঐ সকল অধ্যাপক পণ্ডিতগণের নিকট হইতেও অনেক উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া লইতাম, ব্যাখ্যা করিতে বলিতাম এবং নিজে ঐ সকল দুর্লভ শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতাম, তাহার ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ না করিয়াও কাব্যনাটকাদির অন্বয় বোধে ভাবার্থ উদ্ধারে কোন ক্লেশ আমার হইত না। গ্রন্থ পাঠ সময়ে যখন পূর্ব্বপরিচিত শ্লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত তখন পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু সমাগমের আনন্দের আভাস আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিত। কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রি পাইবার বড় ইচ্ছাই মনে ছিল কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হইতে পারিল না। পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে পীড়িত হইয়া পড়িলাম, মাতা ঠাকুরাণী পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ জানাইয়া আমায় বাড়ী লইয়া আসিলেন এবং জমিদারী কার্য্য শিক্ষা করিবার উপলক্ষ্য করিয়া আর কলেজে ফিরিয়া যাইতে দিলেন না।

দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ের জন্য সেরেস্তার প্রাচীন একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে জমা সুমার প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত কাগজ বুঝাইবার চেষ্টা করিত, বাকি সমস্ত দিন আমার সুপ্রশস্ত অবসর, নিজকে লইয়া কি করিব ভাবিয়া পাই না। জমিদারী কার্য্য শিক্ষা করিতে বিশেষ শ্রম করিতে হইবে এ ধারণা আমার ছিল না, ভাবিতাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া যে সকল লোক জমিদারী কার্য্যে ধুরন্ধর হইয়াছে, তাহাদের তুলনায় আমার শিক্ষাদীক্ষা অনেক বেশী, আমার আর ঐ সা ান্য কার্য্য শিখিবার জন্য সেরেস্তার আমলার নিকট শিক্ষানবিসি করিতে কেন হইবে? বিশেষ দুইদিন পরে যে আমার আদেশমত কার্য্য করিবার জন্য দিবারাত্র যোড়করে দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহার নিকট ছাত্রের মত শিক্ষা করা আমার পক্ষে হীনতা, সুতরাং নানাছলে শিক্ষার নির্দ্ধারিত সময়ে আমি নিজকে নানা অবান্তর কাজে ব্যাপৃত রাখিয়া, আমলা মহাশয়কে বিদায় করিতাম, তিনিও আনন্দ-মনে বিদায় গ্রহণ করিতেন, হয়ত বা ভাবিতেন যে তাঁহার ভবিষ্যৎ মুনিব জমিদারী কার্য্যে যত অপটু থাকেন সেই ভাল, ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই তাহাতে

সুবিধা হইবে, মুনিবকে ঠকাইয়া দুই পয়সা উপরি অঙ্ক পাইবার পথ প্রশস্তই হইতেছে। জমিদারী কার্য্য শিখিবার প্রতি আমার তাদৃশ অমনোযোগ হইবার আরও একটী কারণ ছিল; জানি না আমার অবস্থাপন্ন অন্যান্যের প্রতি ইহা প্রযোজ্য কিনা, তবে আমার মনে যাহা তৎকালে উদয় হইত, যে কারণে আমি শিক্ষানবিশী করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম তাহাই যথাযথভাবে বলিতেছি। জমিদারী কাগজপত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে, উহাতে বুদ্ধির প্রখরতা তাদৃশ প্রয়োজন হউক বা নাই হউক শ্রম স্বীকার করিতে হয় ইহাতে সন্দেহ নাই; শ্রমটুকু সমস্তই করিব অথচ হুকুম দিবার, আমার মতে কার্য্য হইবার সুখটুকু হইতে বঞ্চিত হইব, ইহা আমার নিকট নিতান্তই বিরক্তিকর বোধ হইত।

সকলেই জানেন যে ক্ষমতার উন্মাদনা অপরিসীম, মানবমাত্রেই ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারিলে, ইচ্ছামত দশজনকে চালাইতে পারিলে নিরতিশয় সুখী হয়। যৌবনের প্রারম্ভে আমার মনেও ক্ষমতার মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই এমন কথা বলিতে পারিব না; তখনও আমার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। আমার ইচ্ছায় কোন কার্য্যই হইতে পারিবে না, সুতরাং অনর্থক শ্রম করিয়া কেন মরি, এই অভিমান আমার মনে আসিত এবং সেইজন্য শিক্ষার্থীরূপে জমিদারী কার্য্য দেখিতে আমি নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলাম। বোধ করি আমার অবস্থাপন্ন অনেক রাজকুমারেরই মনে এই অভিমান উদয় হয় এবং আজ পর্য্যন্ত আমি আমার পরিচিত কোন জমিদারপুত্রকে প্রাপ্ত-বয়স হইবার পূর্ব্বে অভিনিবেশসহকারে বিষয়কর্ম্ম করিতে দেখি নাই। যে জমিদারীকার্য্য শিক্ষার জন্য মাতা আমার পাঠ বন্ধ করিয়াছিলেন তাহাত শিখিলাম না, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে যে দুর্দ্দমনীয় প্রাণ-শক্তি সর্ব্বদেহে মনে সঞ্চারিত হয় তাহা লইয়া অলসভাবে পল্লীনিকেতনে বৃথা সময় অতি-বাহিত করাও বিশেষ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল; শিক্ষিত সমবয়স্ক কেহ ছিল না যাহার সহিত আলাপে, যাহার সংসর্গে আমার দিন কাটিয়া যাইতে পারে—আমি নিজকে লইয়া মহা বিপদেই পড়িলাম, অতবড় রাজধানীটার মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুও কেহ ছিল না, কাজও আমার কিছু নাই, ভূমিকম্পে সমস্ত বাড়ীটা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ততদিনে থাকিবার মত একখানি ঘরও প্রস্তুত হয় নাই, অতবড় যায়গাটার মধ্যে নিজকে কোথায় রাখি ভাবিয়া পাই না, দিবারাত্র মনের মধ্যে কি যে এক

অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছি না, পারিলেও আমার তৎকালিক অবস্থা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

যৌবনারম্ভের স্বাস্থ্যে সমগ্র দেহ সারাদিনমান চঞ্চল হইয়া থাকিত, জীবনারম্ভের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ সাধে মন পরিপূর্ণ, কিন্তু সে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিবার কোন উপাদানই আমার সম্মুখে নাই, সমগ্র জন্মও জীবনটাই নিতান্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দিনারম্ভ হইতে দিনান্ত এবং প্রদোষ হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দৈনিক জীবনযাত্রার তুচ্ছ কাজগুলি আরও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত, অবলম্বনহীন ব্যর্থ জীবনের ভার বহন করিয়া চলা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। জীবন-বসন্তের দক্ষিণ-মারুত স্পর্শে হৃদয়-লতিকার বিচিত্র বর্ণগন্ধময় পুষ্প-মঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিত কিন্তু এ পুষ্পসম্ভার কেন, কোন্ কাজে ইহা লাগিবে তাহা ভাবিয়া পাইতাম না। বয়োধর্ম্মে এবং আধুনিক শিক্ষার ফলে একটী বিশেষভাবে জীবন যাপন করিবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত, কিন্তু আমার চতুর্দ্দিকের পরিপার্শ্বিক ঘটনাবলী ইচ্ছানুরূপ জীবনযাপনের অনুকূল নহে, সেইজন্য মনের উপরে বিষাদ-বিন্ধ্য-গিরির গুরুভার যেন দিবারাত্র চাপিয়াই রহিল; বিদ্যালয় হইতে সমাবর্ত্তনের সময়ে বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত দিগন্তের ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়াকাশে যে পরম রমণীয় ইন্দ্রজাল সৃজন করিয়াছিল প্রতিদিনের বৈচিত্র্যবিহীন, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, অলস জীবনযাত্রা তাহা এক নিমেষে মিটাইয়া দিল; অফুরন্ত নীলিমাময় বসন্তাকাশের অজস্র আলোক-সম্পাত অকাল-জলদোদয়ে যেমন মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া যায় আমার তরুণ হৃদয়ের আশার অরুণালোক বিষাদের অন্ধকারে এক নিমেষে তেমনি করিয়া ডুবিয়া গেল। আমি ব্যাকুল নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম ক্ষীণতম আলোকরেখার কোথাও কোন সন্ধান পাইলাম না, আমার কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্য-বিহীন, নিরালম্ব ও নিঃসঙ্গ দিনযামিনী কেমন করিয়া কাটিতে লাগিল তাহা আমিই জানি আর আমার অন্তর্য্যামী জানেন।

আমার অভিভাবিকা পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী সে কালের লোক, শিক্ষা-দীক্ষা আচার ব্যবহার, আশা আকাঙ্ক্ষা, দৈনিক জীবনযাপনের পদ্ধতি তাঁহার অন্যরূপ ছিল, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবকের মনোভাবের সহিত তাহার কোন সমতাই ছিল না। অল্প বয়সে আমার

স্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, বিংশতিবর্ষ বয়সে আমি কলেজ হইতে ফিরিলাম, ইতিমধ্যে আমার দেহ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষায় দশের দৃষ্টান্তে আমার মনোবৃত্তি যে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে এ কথা তিনি মানিতে চাহিতেন না, প্রতিদিবসের জীবনযাত্রা লইয়া তাঁহার সহিত আমার মতদ্বৈধ ঘটিত, আমি চাহিতাম দেশকালপাত্রোপযোগী স্বাধীন জীবনযাত্রা, তিনি আমাকে প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্কা, কুমারী কন্যার মত অঞ্চলতলে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন। যে সমস্ত ব্যাপারের ফলাফল কেবলমাত্র আমাকেই আজীবন ভোগ করিতে হইবে সে সকল বিষয়েও আমার মতামত, ইচ্ছা অনিচ্ছা তিনি গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিতেন না; বাল্যাবস্থায় শিক্ষার্থ আমাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, যখন ফিরিলাম তখনও আমার মাতাঠাকুরাণীর ধারণা আমি সেই বালকই আছি, এরূপ অবস্থায় আমার প্রতিদিনের জীবন কি ভাবে কাটিত তাহা আমার পাঠকপাঠিকাগণ অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন।

দীনদরিদ্রের সন্তান আমি, মাতাঠাকুরাণী আমাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া নাটোর রাজবংশের বংশধররূপে বিপুল বিষয়ের মালিক করিয়া দিয়াছেন, এরূপক্ষেত্রে আমার কোন ব্যবহারে তাঁহার মনঃপীড়া উপস্থিত হয় ইহা আমার কোন ক্রমেই ইচ্ছাই হইত না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়া যাইতে লাগিল যে সময়ে সময়ে আমার নিকট জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইত, মনে হইত কাহারও সহিত অবস্থার বিনিময় যদি করিতে পারিতাম তাহা হইলে যন্ত্রণার দায় এড়াইতে পারিতাম।

এরূপ মনোভাব লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দেশভ্রমণের উপলক্ষ্য করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা করিলাম, তাহাতেও বাধা উপস্থিত হইল, আমি একরূপ নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। দুশ্চিন্তায় রাত্রে নিদ্রা হইত না, সমস্ত দিন একাকী বসিয়া নিজের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতাম। সে কালে অবস্থাপন্ন লোকের সন্তানের পক্ষে ঘোড়ায় চড়িতে পারা একটা গুণের মধ্যে পরিগণিত হইত, আমিও বাল্যকাল হইতে ভাল, ঘোড়ায় চড়িতে পারিতাম, আমাকে বিশেষ ভাবে ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ী হাঁকিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের আস্তাবলে অনেকগুলি চড়িবার ঘোড়া ছিল, প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেগুলিকে Exercise ( ব্যায়াম ) দিবার উপলক্ষ্য করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতাম,

ঘোড়াকে Exercise (ব্যায়াম) দিতে নিজের অঙ্গ চালনা হইত, সেই সময় টুকুমাত্র দুশ্চিন্তার হাত হইতে আমার অব্যাহতি ছিল। এরূপ ভাবে দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য রক্ষা করাও কঠিন, নাটোর Malaria প্রধান স্থান, আমি জ্বরে ভুগিতে আরম্ভ করিলাম এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিরোরোগ উপস্থিত হইল, দাঁড়াইলে মনে হইত বুঝি পড়িয়া যাইব, কিছু আশ্রয় না করিয়া এক পাও চলিতে পারিতাম না, মনে মনে দারুণ আশঙ্কা হইল বুঝিবা বাকি জীবনের জন্যই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। তখন অভিভাবিকা মাতাঠাকুরাণীকে এবং প্রবীণ অমাত্য গণকে স্থান পরিবর্ত্তন এবং চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য একান্ত মিনতি করিয়া জানাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিলাম যে নিতান্ত তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন হইলে বাধ্য হইয়া সব কথা আমি জেলার Magistrate এবং Commissionerকে জানাইব, এবং তাঁহাদের সাহায্যে যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিয়া নিব। এইবার তাহারা ভীত হইলেন, আমার চক্ষু রোগের সময়ে আমার পূজ্যপাদ জনক যেরূপে Magistrate সাহেবের সহায়তায় আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন সে কথা তাঁহাদের স্মরণ ছিল, এবং ইহাও তাঁহাদিগকে জানাইলাম যে ইংরাজি চিঠি লিখিয়া সমুদয় অবস্থা সাহেবদিগকে বুঝাইবার মত ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা আমার জন্য তাঁহারাই করিয়াছিলেন, এবং ডাকঘর আপামর সাধারণের জন্য government কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণী আমার প্রতি অস্নেহবশতঃ এরূপ করিতেন একথার ইঙ্গিত করা আমার অভিপ্রায় নহে, ক্ষমতার পরিচালনা করিবার ইচ্ছা মানবমনের একান্ত প্রবল ইচ্ছা, আমার বলিতে যাহা কিছু সংসারে আছে সকলের উপর আমার একাধিপত্য থাকুক, আমার ইঙ্গিতে, ইচ্ছায়, অভিপ্রায়অনুসারে সব কাজ হইতে থাকুক, আমিই সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আমরণ কর্ত্তা হইয়া থাকি, মানুষ একান্তমনে ইহাই কামনা করে, এবং এই ইচ্ছার প্রতিকূল যাহা কিছু সে সমস্তই মানুষের বিষনয়নে পড়ে; নিজের মনের এই ইচ্ছা যে অন্যের প্রতি অত্যাচারের আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময়ে প্রাচীন প্রাচীনাদের ধারণায় আইসে না এবং বাণপ্রস্থের বয়স যখন আসিয়াছে তখন অধিকাংশ নরনারী স্বীয় কল্পনালোকের অনায়ত্ত কুহকিনী আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে যথাসাধ্য খর্ব্ব করিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে সেগুলিকে সংহত ও সংযত করিয়া আনেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বার্দ্ধক্যের হিম-সন্নিপাতে সঙ্কুচিত মনের কাশি প্রাপ্তির কামনার সহিত জীবন-বসন্তের কবোষ্ণ-মলয়ান্দোলিত মনো-মাধবী-

বিতানের অন্তরুল্লসিত স্ফুটনোন্মুখ আশামঞ্জরীগুলির কোন সাদৃশ্যই নাই, ভুলিয়া যান যে বৈরাগ্যশতক, শান্তিশতকের সহিত ভর্তৃহরি আরও একখানি শতক লিখিয়া গিয়াছেন, চাণক্যের হিতোপদেশ ও মনুর সংহিতা ছাড়া উজ্জয়িনীর রাজকবির মেঘদূত ও ঋতুসংহারও আছে, লক্ষ্মণের রাজসভায় বসিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দের ললিতকান্ত পদাবলীও লিখিয়াছেন এবং বাৎস্যায়নের সূত্রবিশেষ আজও খুজিলে পাওয়া যায়। কেবল হিন্দু-সমাজের বর্ণজ্ঞানবিবর্জ্জিত অভিভাবকগণের মধ্যেই এই ব্যাপার আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এমন নহে, আমি উন্নতিশীল সমাজস্থ পিতামাতা এবং আপনার আত্মীয়বর্গের অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি যে পুত্র কন্যা বধু জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীর নিকট হইতে প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা সমস্তই কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া নিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র, কিন্তু দেয় যে কিছু আছে তাহা তাঁহাদের মনের ধারে কাছেও আইসে কি না সন্দেহ। প্রাচীন প্রাচীনাদিগের নির্লজ্জ স্বার্থপরতার দারুণ নিষ্পেষণে কত অসংখ্য নরনারীর অপূর্ব্ব শোভাময় অমূল্য জীবন যে অকালে ব্যর্থতার মধ্যে মৃতপ্রায় হইয়া অন্তিম অবসানের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে তাহা মনে করিলে বেদনার অশ্রুপ্লাবনে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।

রাঁচি, "নিভৃত কুটীর" ক্রমশঃ

১০ই ডিসেম্বর ১৯১৫ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# কর্ণ-ধার

ক্লান্ত রবি নিত্য যেথা ডুবে যায় ধীরে,
তপ্ত-অঙ্গ স্নিগ্ধ করে নীল সিন্ধুনীরে ;
গাঢ় আলিঙ্গনে লুপ্ত করি' শূন্যতায়
আকাশ সাগরে যেথা মিশাইছে কায়,
ক্লান্তিহরা শান্তিভরা সেই তার পারে
মুগ্ধ আঁখি থেকে থেকে চায় বারে বারে।
মাঝখানে সুবিশাল জলধি অপার
উদ্দাম উত্তাল উর্ম্মি করেছে বিস্তার ;
নিরজন তটভূমি, কোথা কেহ নাই,
কে মোরে লইবে পারে কাহারে সুধাই ?
ঘনাচ্ছায়া নেমে আসে দিগন্ত ঘেরিয়া,
অশ্রুভারে আঁখি-পাতা আসে আবরিয়া।
নয়ন মুদিয়া হেরি পারের কাণ্ডারী

# বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে হীরেন্দ্র বাবুর অভিভাষণ।

( সমালোচনা )

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, পি, আর্, এস্, বেদান্তরত্ন মহাশয় দর্শন শাখার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছে। উহাতে প্রচুর অধ্যয়ন ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে ঐ অভিভাষণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

হীরেন্দ্রবাবু ইংরাজিতে সুপণ্ডিত। ইংরাজিবেত্তাদিগের দ্বারা সংস্কৃত দর্শনের আলোচনা হইতেছে ইহা বড় সুখের কথা। এ প্রকার আলোচনায় প্রবীণ ভট্টাচার্য্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগেরও যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ টোলে তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন। আজ পর্য্যন্ত খুব কম ইংরাজিবেত্তাই সংস্কৃত দর্শনে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। এই প্রবন্ধদ্বারা এই সকল টোলের প্রবীণ পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

একটি কথা বলিয়া আসল কথা বলিতে আরম্ভ করিব। কথাটি এই—হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি যেন একটু তাড়াতাড়ি লিখিত হইয়াছে। সব স্থানে, সব কথা খুব স্পষ্ট হয় নাই। আমি চেষ্টা করিয়াও সব কথা বুঝিতে পারি নাই। তাই, এই প্রবন্ধে হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণের কোন কোন অংশ যদি অযথা সমালোচিত হইয়া থাকে তবে, সজ্জনগণ ক্ষমা করিবেন, কেন না এ-অপরাধ জ্ঞানকৃত নহে।

১। "**দর্শন শব্দের নিরুক্ত**" এই নাম দিয়া হীরেন্দ্রবাবু সর্ব্বপ্রথমে দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত এবং প্রবৃত্তি-নিমিত্ত সর্ব্বদা এক হয় না। গোশব্দটির বুৎপত্তিলভ্য অর্থ গমনকারী, কিন্তু উহার প্রবৃত্তি হয় চতুষ্পদ-গল-কম্বলাদি বিশিষ্ট জীবে। দর্শন শব্দের প্রয়োগের ইতিহাস দিবার সময় এই কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বর্ত্তমান কালে যে সকল গ্রন্থ বা বিদ্যাদর্শন শব্দ বাচ্য, তাহাদের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিই ( প্রবৃত্তি নিমিত্ত বা

সক্যতাবচ্ছেক ধর্ম্ম) যে প্রাচীনতর এবং প্রাচীনতম দর্শন নাম বাহিনী বিদ্যার ধর্ম্ম ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। দর্শন শব্দের অর্থ, হয়ত, ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই (১) দর্শন শব্দের যখন প্রথম প্রয়োগ হইয়াছিল, তখন তাহার কি অর্থ ছিল, ইহা দেখান আবশ্যক। (২) বর্ত্তমান দর্শনগুলির সাধারণ ধর্ম্ম কি, তাহাও নির্ণয় করা আবশ্যক। (৩) কি কি হেতুতে, দর্শন শব্দের এই অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও দেখান আবশ্যক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে এই ভাবে দর্শন শব্দের আলোচনা হইলে ভাল হইত।

"দর্শন" শব্দের সম্বন্ধে, ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার "সাঙ্খ্যদর্শন" নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রারম্ভে, ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার "বেদান্তলেকচারের" প্রথম খণ্ডে, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যা-বারিধি বি,এ, মহাশয় তাঁহার "হিন্দু রিয়ালিজম্" নামক উপাদেয় বৈশেষিক গ্রন্থে এবং শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম্, এ মহাশয় ১৩১৮ সালের "প্রতিভা" পত্রিকায় প্রকাশিত "ভারতীয় দর্শন" নামক প্রবন্ধে, বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবু ও শ্রীযুক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয় উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, দর্শন শব্দের একটি অর্থ—মত (view)। শ্রীযুক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয় বলেন যে, এই "মত" অর্থ হইতেই বর্ত্তমান প্রচলিত ফিলজফি অর্থ আসিয়াছে। ব্যাকরণাদিতে ও বহু স্থলে, মত অর্থে, দর্শন শব্দ দৃষ্ট হয় (কৈয়ট ৮।৪।১ ; ন্যাস ১।২।২৪)। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু হয়ত বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধ বা জগদীশ বাবুর পুস্তক দেখেন নাই। কাজেই এই "মত" অর্থটা তাঁহার প্রবন্ধে একেবারে উল্লিখিত হয় নাই।

সংস্কৃত, পালি ও ইউরোপীয় দর্শনে অসাধারণ জ্ঞানশালী দার্শনিক চিন্তানিষ্ঠ, সুধী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, দর্শন শব্দের অর্থ বস্তু-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার। সংস্কৃতজ্ঞেরা জানেন যে, প্রাচীন মতও অনেকটা এইরূপই ছিল।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিব্যেঃ" এই শ্রুতিতে, আত্মার দর্শন বা সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্য বা উপেয়, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন তার উপায়।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ॥

বিদেশীয়েরাও কেহ কেহ বলেন যে,"দর্শন" বা "ভিশনই" (vision) ফিলসফির প্রাণ *। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু এই মতকে সংস্কৃত দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা অসমীচীন বা কেবল কল্পনায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার মতের অনুকূলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকায়, ভগবৎপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধরস্বামী উভয়েই তত্ত্ব "দেখা"র কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার মূল শ্লোকার্দ্ধ এই :—উপদেক্ষ্যন্তি-তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। এখানে জ্ঞানী=শাস্ত্রবেত্তা, যিনি শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় জানেন ; তত্ত্বদর্শী=যিনি বস্তুতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, যাঁহার "ভিশন্" ( vison ) হইয়াছে। শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞেরা বলেন, গুরুর ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ( direct vision of god ) না হইলে, তিনি শিষ্যে ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতির সংক্রমণ করিতে পারেন না, আবার তাঁহার শাস্ত্র জানা না থাকিলে, তিনি শিষ্যের সংশয় নিরাস করিতে পারগ হয়েন না। কাজেই গুরুর শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার উভয়ই চাই। এইখানে তত্ত্বদর্শিন্ কথাটা ঠিক্ হীরেন্দ্রবাবুর কথিত দর্শনকে লক্ষ্য করে। অতএব হীরেন্দ্রবাবুর "কল্পনা" নিরালম্ব নহে। 'দর্শন' শব্দের এক অর্থ তত্ত্বসাক্ষাৎকার বটে।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবারিধি মহাশয় স্বীয় "হিন্দু রিয়ালিজমে" এ সকল কথা অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

The Hindu preconceptions are :—

1. Man can know metaphysical truths, like any other truths, BY DIRECT EXPERIENCE, and not merely by speculation, by influence, or by faith.

2. There HAVE BEEN men in the past who have thus known the whole truth of our nature and existence, as well as of the universe as a whole.

These men are known as Rishis......'perfected seers.'

4. But the Rishis have taught the metaphysical truths......by rational demonstration.........They have demonstrated BY REASONING the truths, already realised by them to us matters of direct and positive experience.

And it is this RATIONAL demonstration of the metaphysical truths which constitutes philosophy according to the Hindu point of view.

* A man's vision is the great fact about him. Who cares for carlyle's reasons or schopenhauer's or spencer's ? James : A pluralistic Universe.

দর্শন শব্দ কোন শতাব্দীতে প্রথম ফিলসফি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং "দর্শন ছয়টী" এই প্রবাদই বা কবে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। মহাভারতে ফিলসফি অর্থে দর্শন শব্দ আছে। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ মহাশয় ( ১৩১৮ সালের "প্রতিভা" ) এবং পরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু ( ১৩২২ সালের "প্রবাসী" ও "বিজয়া" ), উভয়েই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩০০, ৩০৬ ও ৩০৭ তম অধ্যায়ের কতকগুলি শ্লোকে ফিলসফি অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ দর্শাইয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল মহাভারতীয় শ্লোকের দ্বারা দর্শন শব্দের প্রয়োগের সময় অবধারিত হয় না। শ্রীযুক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন :—"কিন্তু মহাভারতের তত্তদংশের রচনা কাল সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ঠিক্ হয় নাই বলিয়াই, এ বিষয়ে মহাভারতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিলাম না।" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"মহাভারতের এই অংশের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ করা দুরূহ, সেই জন্য দর্শন শব্দের এই প্রয়োগ দেখিয়া কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।" ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত সমাজে একথা গ্রাহ্য হইবে না। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে, তাঁহার মতেও শান্তিপর্ব্বের ঐ সকল অধ্যায় সুপ্রাচীন, তবে উহাদের বয়স সম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য নাই বলিয়াই, তিনি উহাদিগকে প্রমাণরূপে দাঁড় করান নাই, এই মাত্র।

২। **উপনিষৎ শব্দ**। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু জর্ম্মান পণ্ডিত ডয়সেনের ( deussen ) মত অনুসরণ করিয়া উপনিষৎ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন। ডয়সেনের "উপনিষদের দর্শন" গ্রন্থে, উপনিষদের 'রহস্য' অর্থ স্থাপিত হইয়াছে। ভগবৎপাদ শঙ্করের গ্রন্থে উপনিষৎ শব্দের অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া উপনিষদ্ শব্দের রহস্য-বাচিত্ব প্রাচীন টীকাকারদের অবিদিত বা অননুমোদিত নহে। হীরেন্দ্রবাবু যদি এ স্থলে টীকাকারদের সম্মতি দেখাইতেন, তবে তাঁহার প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি হইত। "প্রমাণ পঞ্জী" ইতিহাস ও দর্শন উভয়েই তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়।

হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, 'তদ্বল' 'তজ্জলান্' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে গ্রথিত বাক্যগুলিই সর্ব্বপ্রথমে উপনিষৎ আখ্যার অধিকারী ছিল। তিনি একথার কোনও প্রমাণ না দিয়াই লিখিয়াছেন যে, উপনিষৎ শব্দের এই নিরুক্তে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রমাণ দিলে প্রবন্ধ-পাঠকেরাও নিঃসন্দেহে হীরেন্দ্র বাবুর মত গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রমাণ দেন নাই। আশা

করি, এই বহুশ্রুতত্ত্বব্যঞ্জক প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রন কালে এই অত্যাবশ্যক প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ হইবে।

৩। 'দর্শন সর্ব্বতো-মুখ সত্যের একমুখ দর্শন'

এখানে ইংরাজি আস্‌পেক্‌ট্‌ বা ভিউ (aspect, view) কথাটা মুখ বলিয়া অনূদিত হইতেছে কি? বিশ্ব এক এক দিক্ হইতে এক এক রূপ দেখায়। মূল দার্শনিকেরা প্রত্যেকেই বিশ্বের এক এক দিক্ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেইটুকু তাঁহাদের দর্শনের সার কথা; বাকিটুকু, ঐ সার কথার অবিরোধে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে, একটা বিশ্ব-বিজ্ঞান গঠনের প্রয়াস। এই প্রয়াস অনেক সময় বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু মূল তত্ত্বটি, যাহা সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষলব্ধ, তাহা চির-কাল অটুট্ থাকিয়া যায়। আমেরিকার জেম্‌স্ সাহেব (James) একথা তাঁহার গ্রন্থে বেশ জোরের সহিত বলিয়াছেন। ইউরোপীয় নব্যদর্শন সম্বন্ধে একথা বেশ খাটেও বটে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু এই বিলাতিদর্শনোপযোগী সিদ্ধান্তটি ভারতীয় দর্শনে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলে আপাতত মনে হইতে পারে যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্তটি ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যদিগেরও সম্মত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রাচীন দার্শনিকেরা ও তাঁহাদের বর্ত্তমান ব্যাখ্যাতৃগণ অনেকেই হীরেন্দ্রবাবুর বিরোধী। অবশ্য ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর (অর্থাৎ জেম্‌সের) সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক। জেম্‌স ও তদীয় ব্যাখ্যাতা হীরেন্দ্রবাবুর মত সত্য, না বিজ্ঞান ভিক্ষু ও তাঁহার ব্যাখ্যাতা ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মত সত্য, তাহার নির্দ্ধারণ মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নহে। তবে ইহাঁদের মত অভিন্ন নহে, বলিয়াই আমার ধারণা।

নব্য ভারতীয় দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋষিরা অনুভবদ্বারা সর্ব্ব-পদার্থের নিখিল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সতের এক এক দিক্ মাত্র দেখেন নাই; সতের সমস্ত দিকই তাঁহারা দেখিয়াছেন। আপ্তো নামানু-ভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্নেন নিশ্চয়বান্। (আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের ৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।) ঋষিরা সতের সমস্ত দিক্ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অসংস্কৃতমতি প্রাকৃত জনগণ তাঁহাদের দৃষ্ট তত্ত্বের পূর্ণরূপ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না বলিয়া, তাঁহারা অধিকার ভেদে প্রস্থান ভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ নিম্ন অধিকারীর জন্য ন্যায় ভূমিকা, শ্রেষ্ঠতর অধিকারীর জন্য সাঙ্খ্যভূমিকা এবং শ্রেষ্ঠতম অধিকারীর জন্য বেদান্ত ভূমিকার বিধান করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের

কৃপার নিদর্শন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের একদিগ্দর্শিত্ব প্রমাণিত হয় না। অধিকারি-বিভেদেন শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যনেকশঃ—অর্থাৎ অধিকারিভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে ( ফেলোসিফ্ লেক্চার ৫ম বর্ষ ১০৫ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া দেখুন ) ৺প্রিয়নাথ সেন এম, এ, পি, আর, এস্, মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ বিচার" নামক গ্রন্থেও একথা আছে ( ৬-৮ পৃষ্ঠা দেখুন )। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "হিন্দুরিয়ালিজমে" লিখিয়াছেন ( ৭-৮ পৃ )

7. These [ metaphysical ] truths, being realised by the Rishis by direct experience that is not being concurred by them as matters of more SPECULATION, INFERENCE, or FAITH, all the Rishis have known them as the SAME.........

8. But, while the metaphysical truths as realised by them are the same in every case, the Rishis have taught this one and the same set of truths in what may be called three different STANDARDS or GRADES......And they have thus taught in order to suit different minds............

প্রস্থানভেদ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত এই যে, কণাদ সত্যের একদিক্ দেখিয়াছেন, কপিল সত্যের আর একদিক দেখিয়াছেন, এবং বাদরায়ণ সত্যের আর এক তৃতীয় দিক্ দেখিয়াছেন; অতএব, কাহারও মতই একেবারে সত্য না, কাহারও মতই একেবারে মিথ্যা না; হয়ত তিন একত্র করিলে, সত্যের স্বরূপ কথঞ্চিৎ অবধারিত হইতে পারে। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতির মত এই যে, কণাদ কপিল বাদরায়ণ প্রভৃতি সমস্ত ঋষিরাই সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলেই সত্যের পূর্ণরূপ দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু কণাদ নিম্নাধিকারীর জন্য, কপিল উচ্চতর অধিকারীর জন্য এবং বাদরায়ণ শ্রেষ্ঠতম অধিকারীর জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; এই জন্যই প্রস্থানভেদ হইয়াছে; বস্তুত তাঁহাদের নিজেদের বস্তুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার একরূপই ছিল।

এই ভেদটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। যাঁহারা যোগের অসীম ক্ষমতায় আস্থাবান্, তাঁহারা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর মত অগ্রাহ্য করিবেন; আর যাঁহারা ইংরাজি দর্শন পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত অগ্রাহ্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর সন্দর্ভের এই অংশে একটু স্ববিরোধ দোষও হইয়াছে।*

* "দর্শন সর্ব্বতোমুখ সত্যের একমুখ দর্শন", এখানে, সত্য=সৎ বা বিশ্ব। "প্রাচীনেরা সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন", এখানে সত্য=ট্রুথ্ বা যথার্থ জ্ঞান। "সত্য এক-

কেন না, তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, এক এক ঋষি সতের এক এক দিক্ দেখিয়াছেন; পরে বলিলেন "সত্য ও একরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই প্রজ্ঞান লভ্য"। আবার এর পরের বাক্য হইতেছে ঠিক্ বিপরীতার্থক, "বাদী বিবাদী দর্শনসমূহ সেই সত্যকে অনেকরূপে দর্শন করে।" তাহা হইলে "সত্য ও একরূপ" কথাটার মানে কি? তবে কি "সত্য"-রিয়ালিটি (reality)? তাহা সম্ভব নহে, কেন না রিয়ালিটিরূপ সত্য প্রজ্ঞানলব্ধ বলা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। মোট কথা এই যে, হীরেন্দ্রবাবু বিজ্ঞানভিক্ষুর ও জেম্‌সের মতকে এক করিতে গিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন। হিন্দু ও ইউরোপীয় দর্শনের ঐক্য প্রমাণ করিতে যাঁহারা ব্যস্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহাদের সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "প্রাচীনেরা সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন"। পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহার অর্থ করা দুরূহ। নিম্নলিখিত রূপে কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ন্যায় ভূমিকায় বিশ্ব বা সৎ যেরূপ প্রতিভাত হয়, সাঙ্খ্য ভূমিকায় সেইরূপ হয় না; আবার সাঙ্খ্য ভূমিকায় যেরূপ প্রতিভাত হয়, বেদান্ত ভূমিকায় সেই রূপ হয় না। কিন্তু প্রত্যেক ভূমিকার জ্ঞানেই কিছু না কিছু প্রমাণ বা সত্য আছে। যদি এইরূপ বুঝানই শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রেত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহার বাক্ সন্দর্ভ বিবক্ষিতার্থের সম্যক্ বাচক হয় নাই।

৪। **বোধি ও বুদ্ধির পার্থক্য** শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের নূতন কথা। বোধি ও বুদ্ধি এই দুইটি শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন, এবং উহাদের অবয়বার্থ একই। উহাদের শক্যার্থ ভিন্ন হইবার কোনও বাধা নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু উহাদের শক্যার্থের ভেদ করিতে ইচ্ছুক। তিনি লিখিয়াছেন—

"তত্ত্বদর্শনের করণ বুদ্ধি নহে—বোধি। মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না।" বার্গসঁ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, এখানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু ইন্‌টুইশন্ অর্থে বোধি এবং ইন্‌টেলেক্‌ট অর্থে বুদ্ধি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বোধি অর্থ বুদ্ধত্ব। ঐ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য জন্মে জন্মে তপস্যা, পরোপকার, ইন্দ্রিয়-সংযম, ক্ষমা প্রভৃতির অভ্যাস করিতে হয়। বোধি

রূপ", এখানে সত্য=ট্রুথ্ বা যথার্থ জ্ঞান। একই পৃষ্ঠায় একটি পারিভাষিক শব্দের এই রূপ দ্ব্যর্থ প্রয়োগ সমীচীন হয় নাই।—লেখক।

চর্য্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে বোধি বা সম্যক্ সংবোধি লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয় দর্শনের পরিচিত ইন্‌টুইশন্ লাভ করিবার জন্য প্রয়াস করিতে হয় না। এই জন্য আমাদের বিশ্বাস যে বোধি এবং ইন্‌টুইশন্ এক নহে।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিতেন যে, যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। ইহা ছাড়া 'হৃদয়' ও 'প্রতিভা'রও উল্লেখ শাস্ত্রে আছে। হয়ত উহারা তিন একই জিনিসের বিভিন্ন ভাবের নাম। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে" আছে "বহির্মুখীন্ চিত্তবৃত্তিকে যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যখন অন্তর্মুখীন করিতে পারিব......সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হইবে" (৪০ পৃ)। "সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইতে পারে যে, মানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পরিণাম করস্থিত আমলকফলবৎ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হ'ন। যোগাভ্যাসের গুণে মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন"। (৫৭ পৃষ্ঠা)। ইহার পনর বছর পরে, শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ মহাশয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে এবং মৎ-প্রকাশিত তদীয় "ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা" নামক গ্রন্থে প্রতিভা বা হৃদয়কে ইউরোপ-প্রসিদ্ধ ইন্‌টুইশনের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই যোগজ প্রত্যক্ষ প্রতিভা ও হৃদয়; এবং হীরেন্দ্রবাবুর বোধি ও প্রজ্ঞান কি অভিন্ন? ইহাদের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? বোধি কি সর্ব্বমনুষ্য সাধারণ, না কেবল কতগুলি অসাধারণ লোকনিষ্ঠ ঈশ্বরদত্ত বিশেষ ক্ষমতা? বোধি লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয় কি না? বোধি আর ইন্‌টুইশন্ এক হইলে, বলিতে হয় যে, প্রত্যেকেরই বোধি আছে। বস্তুতত্ত্বাবগাহিনী বোধি থাকুক বা না থাকুক, কর্ত্তব্যাবধারণী বোধি তো প্রত্যেকেরই থাকা চাই। অন্ততঃ ব্রাহ্মেরা তাহাই বলিবেন। ৺কেশবচন্দ্র সেনের বিবেক আর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর বোধিতে পার্থক্য কি?

হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মতে পরমার্থ সত্যের অবভাসক জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর কথিত বোধি, শম-দম-তিতিক্ষা-যোগ-সমাধি প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। বোধি লাভের উপায়ও কি ঐ রূপ? তাহা হইলে, এ নূতন নামের আবিষ্কারে কি ফল হইল?

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তত্ত্বদর্শনের করণ বুদ্ধি নহে"। কিন্তু কঠ উপনিষদে (৩।১২) আছে ঃ—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

এখানে টীকাকারেরা বলিয়াছেন যে, অসংস্কৃত বুদ্ধিতে সর্ব্বভূতে গূঢ় আত্মার প্রকাশ হয় না, অপি চ "নিদিধ্যাসন প্রচয় জন্য সংস্কারযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা" উহার দর্শন হইয়া থাকে। অতএব যোগ-সংস্কৃত বুদ্ধি দর্শনের করণ। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের মত। আবার বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে

বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বম্ ( বোধিচর্য্যাবতার ৯।২ )

অর্থাৎ বুদ্ধি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের করণ নহে। আমাদের মনে হয়, এখানে বুদ্ধি অর্থ অসংস্কৃত বুদ্ধি। অন্ততঃ এইরূপ অর্থ করিলে, হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের একবাক্যত্ব রক্ষিত হইবে। সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে। কাজেই, বোধিকে একটি স্বতন্ত্র করণ রূপে স্থাপনের চেষ্টা প্রাচীন দার্শনিকদিগের অনুমোদিত নহে।

প্রবন্ধের এই অংশ আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। বোধি ও বুদ্ধি যে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধারপূর্ব্বক না দেখাইলে,কে উহা গ্রহণ করিবে? আমরা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর নিকট বোধির বিশেষ আলোচনা প্রত্যাশা করি। বোধি ও বুদ্ধি এই শব্দযুগের কথিত নিয়তবিষয়ত্ব যদি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু নিজের দোহাই দিয়া চালাইতে চান, তবে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত। তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত হইলেই যে, বোধি ও বুদ্ধির ভেদ অগ্রহণীয় হইবে এমন কথা বলা যায় না। বস্তুত শব্দ দুইটি বেশ সুন্দর হইয়াছে।

৫। **দর্শনালোচনার প্রকার ও প্রণালী** সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বেশ সার কথা বলিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তাস্রোতের কোনও সংবাদ না রাখিয়া, কেবল ইউরোপীয় দর্শন পড়িলে তাহাতে বিশেষ ফল হইবে না। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের "ভারতের কালেজে দর্শন শিক্ষা" নামক ইংরাজি প্রবন্ধ ( ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩২০ ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য ), শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ,পি,আর,এস্, বেদান্তরত্ন এবং শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্ত্তী এম, এ, বেদান্ততীর্থ প্রভৃতিরা ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় দর্শনেরই খবর রাখেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই শ্রেণীর লোকের মত অগ্রাহ্য করেন কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি ভারতীয় দর্শন অধ্যাপনের বন্দোবস্ত থাকিবে। এটা সুসংবাদ বটে। যদি তাহা হয়, তবে বঙ্গদেশ তজ্জন্য মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

৬। **পরিভাষা সঙ্কলন**। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে কতগুলি অত্যাবশ্যক সর্ব্বজন স্বীকৃত কথা সবিস্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রধান কথা এই যে, "সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সংকলন করিতে হইবে"। এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সকলেই ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। কিন্তু বহুতর ইংরাজি দর্শনবেত্তারই সংস্কৃত দর্শন পড়া নাই এবং কাজ করিবার প্রবৃত্তিও নাই। কাজেই এই অত্যাবশ্যক সূচীনির্ম্মাণ হইয়া উঠিতেছে না। সাহিত্য পরিষদের সংস্রবে যে পরিভাষা সমিতি আছে, তাহার সভ্যেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা সকলে বিষয় ভাগ করিয়া নিয়া, কেহ ন্যায়ের কন্‌করডেন্স্‌ বা শব্দকোষ, কেহ সাংখ্যের শব্দকোষ, কেহ বেদান্তের শব্দকোষ ইত্যাদি প্রস্তুত করুন্‌। অথবা ইহাও যদি কঠিন হয়, তবে একজনে ন্যায় সূত্র ও ভাষ্য, আর একজনে বার্ত্তিক আর একজনে তাৎপর্য্য-টীকার পরিভাষক শব্দের সূচী ইত্যাদি করুন্‌। সবগুলি মিলাইলেই ন্যায়ের শব্দকোষ হইবে। বোম্বাই প্রদেশের ভাষাচার্য্য সংকলিত ন্যায়কোষে বহুতর শব্দ ধরা পড়ে নাই; কিন্তু উহার দ্বারাও প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। ইংরাজিতে যেমন দার্শনিক অভিধান ( Dictionary of philosophy ) আছে, সংস্কৃতেও তেমনি দার্শনিক শব্দকোষের আবশ্যক। উহার দ্বারা যে, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নের সুবিধা হইবে, তাহা নহে; উহা দ্বারা সংস্কৃত দর্শন-পাঠীরও বিশেষ আনুকূল্য হইবে। এখন যদি কেহ বৌদ্ধ দর্শন পড়িতে চান, তবে তাহার শব্দার্থ জ্ঞানের জন্যই কত না বেগ পাইতে হয়! চাইল্‌ডার্সের পালি অভিধান না থাকিলে, হয়ত পড়াই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শব্দকল্পদ্রুম, আপ্তের অভিধান, মনিয়র উইলিয়ম্‌সের অভিধান, অমর, মেদিনী এতগুলি একত্র করিয়াও বোধি-চর্য্যাবতারের মতন সটীক গ্রন্থ বুঝিতেও বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হয়! অতএব দার্শনিক অভিধান যে বিশেষ আবশ্যক সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উহার প্রণয়ন করিবে কে? যে যুগে "বাচস্পত্য" লিখিত হইয়াছিল, বাঙ্গালায় সে যুগ বুঝি অস্তমিত। অধুনাতন পণ্ডিতেরা অনেকেই মাসিক পত্রিকায় ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিতে চান। বৎসরের পর বৎসর পরিশ্রম করিয়া মহাগ্রন্থ লিখার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য অনেকেরই নাই। এখন সকলে মিলিয়া অভিধান লিখা উচিত। এ সামর্থ্য একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আছে। সাহিত্য পরিষৎ এই অত্যাবশ্যক কাজে হাত দিউন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত "রাসায়নিক পরিভাষা" ( পরিষৎ গ্রন্থাবলী নং ৪০, ১৩১৯ সাল ) এবং শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ সঙ্কলিত "তর্কের পরিভাষা" ( ১৩২০ সালের

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা), এই উভয় প্রবন্ধেই সংস্কৃত হইতে বহুতর শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থে ঐ সকল শব্দ আছে, তাহাও দেখান হইয়াছে। ৺কাশীধামের নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিকশব্দ-কোষের দার্শনিক পরিভাষাও যতদূর সম্ভব, সংস্কৃত হইতে গৃহীত। অতএব, হীরেন্দ্রবাবুর নিম্নলিখিত অভিযোগ অযথার্থ। "সংস্কৃতভাষা দর্শনপরিভাষা সম্পদে সাতিশয়-সমৃদ্ধ। অথচ আমরা সেই খনির রত্নরাজির সন্ধান না করিয়া মনগড়া কিম্ভূত কিমাকার শব্দ প্রয়োগ করিতেছি।" আমাদের দার্শনিক লেখকেরা সকলেই প্রায় সংস্কৃত দর্শন-খনির রত্নরাজির সন্ধান করিয়া, যাঁহার যতদূর সামর্থ্য, তিনি তত রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে সকলের বিদ্যাবত্তা তুল্য থাকে না। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু যেরূপ পরিভাষা-রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, পূর্ব্বতন লেখকেরা কেহই হয়ত সেইরূপ রত্নের সন্ধান পান নাই। তাই বলিয়া, তাহারা যে, সংস্কৃত দর্শনাদির সন্ধান না করিয়াই, মনগড়া কিম্ভূত কিমাকার শব্দ গড়িয়াছেন, একথা বলা সাহসিকের কাজ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত কয়েকটি পরিভাষা-রত্নের পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্রে তাঁহার একটু গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"জার্ম্মান দর্শন হইতে আমরা subject object, Noumeron Ph nomenon শব্দের প্রয়োগ শিখিয়াছি। কিন্তু জার্ম্মান দর্শনের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে দ্রষ্টা-দৃশ্য, বিষয়-বিষয়ী, বিবর্ত্ত-পরমার্থ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। সংপ্রতি বার্গসঁর আলোচনায় আমরা int llect ও intuitionএর প্রভেদ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধি ও বোধির প্রভেদ এদেশে সুপ্রাচীন। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আমাদিগকে motor n rves ও s nsory nervesএর ভেদের সূচনা করিতে হয়। কিন্তু আজ্ঞানাড়ী ও সংজ্ঞা-নাড়ীর প্রভেদ অবগত থাকিলে এজন্য পরিভাষা গঠনের ব্যর্থশ্রম আবশ্যক হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা অবরোহণ প্রণালীর ব্যাপ্তিগ্রহ সাধনের জন্য তিনটি শব্দের আশ্রয় লইতে বাধ্য হই observation, experiment ও inferenc ; কিন্তু ইহাদের প্রতিশব্দ গড়িবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রাচীন কাল হইতে এ দেশের দার্শনিকগণ সমীক্ষা পরীক্ষা ও অন্বীক্ষার সাহায্যে ব্যাপ্তি-গ্রহ করিতে আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। এইরূপ কত শব্দসম্ভারে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সজ্জিত। বাংলার দর্শন-সাহিত্যের জন্য ঐ সকল শব্দের আবিষ্কার অত্যাবশ্যক।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রদর্শিত পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে subject ও object

এর প্রতিশব্দ বিষয়ী ও বিষয় বাঙ্গালায় চল আছে। Noumenon Phenomenon অর্থে পরমার্থ ও বিবর্ত্ত ( হীরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় ঠিক বুঝিয়াছি কি ? ) চলে নাই চলিবেও না। Noumenal ও Phenomenal অর্থে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক শব্দ বাঙ্গালায় পাইয়াছি। ( "প্রতিভা" ১৩১৮ অগ্রহায়ণ )। "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে"র ১৮৯ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ বুঝান হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের "মায়াবাদ"গ্রন্থে এবং ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "বেদান্ত লেকচারে" বিবর্ত্তবাদের বিশেষ বিবরণ আছে। কিন্তু এ সকল স্থলে বিবর্ত্তকে Phenomenon বলিলে কি লাভ হইবে? বিশেষতঃ ইংরাজি Phenomenalism বিবর্ত্তবাদের বিপরীত। তর্ক বিদ্যায় phenomenon-এর কথা বলিতে হয়। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি এ, ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের তর্কবিজ্ঞানে 'ঘটনা' বলিয়া উহার বাঙ্গলা করা হইয়াছে। ঐ স্থলে 'বিবর্ত্ত' চলিবে কি? যেমন দাহবিবর্ত্ত, বৃষ্টিবিবর্ত্ত, ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গেও হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন "বোধি ও বুদ্ধির প্রভেদ এ দেশে সুপ্রাচীন"। প্রমাণ দিলে, লোকে কথাটার সত্যাসত্য সহজে পরীক্ষা করিতে পারিত। motor nerve ও sensory nerve অর্থে আজ্ঞানাড়ী ও সংজ্ঞানাড়ী কোথায় আছে? বৈদ্যাবতংশ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল্, এম, এস্, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ মহাশয় তদীয় প্রত্যক্ষ শরীরকে"সংজ্ঞাবহা নাড়ী"ও"চেষ্টাবহা নাড়ী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে" সংজ্ঞাবাহী ও সঞ্চালক শব্দ আছে। তবে 'আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে'র গ্রন্থকার কেন্দ্রাভিগ বা পরাচীন এবং কেন্দ্রাভিগ বা প্রতীচীন এই শব্দগুলিও গঠন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ব্যর্থ(?)-শ্রমের জন্য বিশেষ পরিতাপের কারণ দেখি না।

Observation এবং experiment অর্থে নাকি চিরকাল এদেশে সমীক্ষা ও পরীক্ষা শব্দ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমরা একথা নূতন শুনিলাম। বোম্বাইর ন্যায়কোষে এমন কথা নাই; এতদ্বারাই বুঝা যায় যে, অগত্যা সাধারণ পণ্ডিতেরা হীরেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত তত্ত্ব বিদিত নহেন। পরীক্ষা শব্দের ন্যায়-প্রসিদ্ধ অর্থবিচার। উদ্দেশ, লক্ষণ, পরীক্ষা, স্মরণ করুন। আশা করি, হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তব্যগুলি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত করিবেন! এই "পরিভাষা-সঙ্কলন" প্রকরণ পড়িলে মনে হয়, যেন হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-গিরির বোধিশৃঙ্গ-বিচারী শ্রেষ্ঠজাতীয় জীব; আর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক অন্যান্য

দার্শনিক লেখকেরা বহুনিম্নে বিতণ্ডারাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। তিনি কারণ না দেখাইয়া, প্রমাণ না দিয়া এঁর দোষ ধরিতেছেন, ওঁর ব্যর্থ-শ্রমের জন্য দুঃখিত হইতেছেন! এইরূপ লিখনভঙ্গী সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। যাঁহারা ভুল করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকেই সংস্কৃত ও ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন। তাঁহাদের উপর মুরব্বি-আনা সমালোচনা শোভন হয় নাই। অতি বড় পণ্ডিতে ভুল করিলেও, তাঁহার তীব্র সমালোচনা হইতে বাধা নাই। কিন্তু সে সমালোচনায় সম্যক্ আলোচনা থাকা চাই, বিচার থাকা চাই। প্রমাণ প্রয়োগ না দিয়া কেবল "ইহা ভাল," "ইহা মন্দ,""ইহা পণ্ডশ্রম" এরূপ লিখিলে কোনও পক্ষেরই লাভ হয় না।

৭। প্রাচীন শব্দের নবীন প্রয়োগ।

বহুতর প্রাচীন শব্দ অপূর্ব্ব অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। জীবিত ভাষায় ইহা না হইয়া পারে না। তবে পারিভাষিক শব্দের এইরূপ অন্তান্তর ঘটিলে, তাহাতে বিজ্ঞানের ক্ষতি আছে।

প্রতিভা শব্দ সংস্কৃত ভাষায় ও নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায়, Genius অর্থে উহার প্রয়োগ দোষাবহ নহে। বিশেষত, যাহারা Genius, তাঁহাদের একটি লক্ষণ এই যে, তাঁহারা সত্যের জন্য অনুমানাদির সাহায্যে অনুসন্ধান না করিয়াও, তাঁহাদের স্বকীয় আশ্চর্য্য ক্ষমতার বসে (অর্থাৎ প্রতিভার বলে) সত্য লাভ করিয়া থাকেন। বালকেরাও এইরূপ করে। মীমাংসা শ্লোক বার্ত্তিক ও তাহার টীকায় বালকের প্রতিভার উল্লেখ আছে। অতএব শাস্ত্রবর্ণিত প্রতিভা G niusদের সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য Genius অর্থে প্রতিভা শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত দূষনীয় হয় নাই। বেবার লিখিয়াছেন—

"that wonderful instinct of childhoo l and of genius which devines the truth without searching for it" (History of Philosophy, p. 3 ).

৮। অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, সবই সত্য। কিন্তু, একটি "কিন্তু" আছে। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীরা শ্রদ্ধার সহিত পড়েন না। যাঁহারা এম, এ, প্রভৃতি পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত স্বশ্রেণীর বা স্বদেশীয় গ্রন্থকারদের প্রতি এত প্রত্যয়হীন যে, তাঁহারা মনে করেন যে, আমার মত লোকে কি লিখিবে? অথবা আমার পড়ার উপযুক্ত কথা অন্য কোন্ বাঙ্গালী লিখিবে?

কাজেই বছরে যে দুই চারিখানি ভাল গ্রন্থ বাহির হয়, তাহাও বিক্রয় হয় না। বড় বড় লোকে উপহার পাইয়া উহাদিগকে আলমারিতে উঠাইয়া রাখেন। যাহারা তত বড় নন, তাঁহারাও কিনিয়া পড়েন না, এমন কি, সাধারণ লাইব্রেরীতে ঐ সকল থাকিলেও উহা দেখেন না। এ রোগের ঔষধ কি?

শ্রীউমাচরণ শাস্ত্রী।

# কবি।

[ GEIBEL ]

১

পথ দিয়া যবে যাই, লোকে মোরে
ডাকিয়া বলে—
"এস কবি, হেথা', মিশে যাও আসি'
মোদের দলে।
আমাদের সুরে বীণাখানি তব
উঠুক্ বাজি,'
সঙ্গীত-হারে উৎসবে তুমি
সাজাও আজি।"

২

আহ্বান শুনি' থাকি নতশিরে,
না কহি' বাণী,
এ ধরায় কভু আমি যে কাহারো
বশ না মানি।
হৃদয়ে আমার বিরাজে আসন
যে দেবতার
মানব-আদেশ বহি'—অপমান
করিব তা'র?

৩

সঙ্গী বিহীন　　　পথিকের মত
　　দিবসযামী
দূর তারকায়　　　করিয়া লক্ষ্য
　　চলেছি আমি।
অম্বরভেদী　　　পর্ব্বতমালা
　　ডাহিনে মোর,
বামে অশান্ত　　　সিন্ধু সদাই
　　গরজে ঘোর!

৪

সঙ্কটময়　　　পথের দু'ধার
　　পরশি' ধীরে
গান গেয়ে গেয়ে　　　চলে যাই আমি,
　　চাহিনা ফিরে'।
জানি শুধু মনে—　　　পথে হই যত
　　অগ্রসর,
স্বর্গ-দেবতা　　　লইছেন মোরে
　　ধরিয়া কর।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

# জীবনের মূল্য

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### কলিকাতায়

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে একদিন বৈকালে, হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঠিকা গাড়ী করিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চুনাপুকুর লেনে আসিয়া পৌছিলেন।  এখানে তাঁহার বাল্যবন্ধু রেলওয়ে অডিট আপিসের বড় বাবু হেমচন্দ্র ঘোষাল বাস করেন—ত্রিবেণীতেই বাড়ী। হাঁড়ি, পোঁটলা, তোরঙ্গ বোঝাই গাড়ীখানি

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র, ভিতর হইতে হেমবাবুর ছোট ছোট পুত্রকন্যারা ছুটিয়া আসিল এবং "গিরিশ কাকা এসেছেন" বলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। মুখোপাধ্যায় নামিয়া তাহাদিগকে আদর করিলেন, ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বাবু তখনও আপিস হইতে ফেরেন নাই—ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। সন্দেশের হাঁড়ি অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়া তোরঙ্গ পুঁটুলি প্রভৃতি বৈঠকখানায় রাখাইয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিয়া মুখোপাধ্যায় তামাক খাইতে বসিলেন—বালকবালিকাগণ তাঁহার কাছে বসিয়া জটলা করিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় আসিয়াছেন, নিজের কতকগুলি জিনিষপত্র কিনিতে এবং গহনা গড়াইতে দিতে। প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নীর অনেকগুলি অলঙ্কার গৃহে আছে বটে, কিন্তু সেগুলি "সেকেলে"- প্রভাবতীকে তিনি আগাগোড়া নূতন অলঙ্কারে সাজাইবেন। গ্রামের স্যাকরারাও গড়ে ভাল বটে, কিন্তু কলিকাতার স্যাকরাদের মত তেমন হাই-পালিশটি দিতে পারে না—ইহা তিনি অবগত ছিলেন—তাই কলিকাতায় আসা।

কিয়ংক্ষণ পরে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের জন্য তাঁহার আহ্বান হইল। হেম ঘোষাল গিরিশ অপেক্ষা বয়সে দুই এক বছরের বড়, তাঁহাকে ইনি "দাদা" সম্বোধন করিয়া থাকেন। হেমবাবুর স্ত্রী ইহাঁকে বধূকাল হইতেই ঠাকুরপো বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া আসিতেছেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গিরিশবাবু বউঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন। দেশে থাকিতে সায়ংসন্ধ্যা না করিয়া তিনি জলযোগ করিতেন না—কিন্তু আজ কি জানি কেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল।—বোধ হয় এ সকল প্রথা "সেকেলে" বলিয়া ক্রমে তাঁহার ধারণা জন্মিতেছিল। আসনের উপর বসিয়া, বউঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি গুটি দুই মিষ্টান্ন মাত্র গ্রহণ করিলেন।

গ্রামের সংবাদ, পাড়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে বউঠাকুরাণী বলিলেন—"বিয়ের দিনস্থির হয়েছে?"

গিরিশ নতমুখে বলিলেন—"হ্যাঁ ৫ই জ্যৈষ্ঠ। তোমরা শুনলে কার কাছে?"

বউঠাকুরাণী বলিলেন—"জনরবে শুনলাম।"

"নরেন সুরেন এসেছিল?"

"হ্যাঁ, তারা ত প্রায়ই আসে। গেল বুধবারে বুঝি—না, মঙ্গলবারে সুরেন এসেছিল।"

"তারাই বলেছে ?"

বউঠাকুরাণী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন—"তোমার নরেন সুরেন ছেলে দুটি বড় ভাল, ভাই। ভগবান করুন বেঁচে থাকুক। ওদের পিতৃভক্তিটিও খুব আছে।"

গিরিশ বুঝিলেন নরেন সুরেনই আসিয়া খবরটা দিয়াছে। তাহারা বোধ হয় এ সংবাদে প্রীত নহে—তাই ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্র দেখিতে যাইবার অছিলায় গুড্ফ্রাইডের ছুটিতে বাড়ীও যায় নাই। একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কি করি বউঠাকরুণ, এ বয়সে বিয়ে করা কি আমার সাধ ?—কিন্তু পিসিমা যে কিছুতেই ছাড়লেন না।"

গৃহিণীর ওষ্ঠযুগলের উভয় প্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তা, করছ বেশ করছ ভাই—তোমার এখন এমনই কি বয়স হয়েছে ? তোমার চেয়েও বেশী বয়স হয়েছে এমন কত লোক ত করছে। এই আমিই ধর যদি আজ মরে যাই—তোমার দাদা কি—"

গিরিশ বাধা দিয়া বলিলেন—"আর সে প্রার্থনায় কায নেই বউঠাকরুণ। পিসিমার কথা শুনেও আমি করতাম না। তবে সংসারে নিতান্ত লোকাভাব—"

ক্রমে অলঙ্কারের কথা উঠিল। এ প্রসঙ্গে বধূঠাকুরাণী খুব উৎসাহের সহিতই যোগ দিলেন। কোন্ কোন্ গহনা আজকাল ফেসান হইয়াছে, কোন্ কোন্ গুলি একবারে নহিলেই নয়, কত ভরির হইলে কোন খানি বেশ মানানসই হইবে—এ সমস্ত তিনি ঠাকুরপোকে বুঝাইতে লাগিলেন। গিরিশ বলিলেন গিনি তিনি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছেন। গৃহিণী বলিলেন—"তবে কাল সকাল বেলাই হীরেলালকে ডেকে পাঠাব—সেই আমাদের স্যাকরা কি না—আমার মেয়েদের বিয়ের যত গহনা সেই গড়েছে। বাণীটে একটু বেশী নেয়—কিন্তু লোকটা খুব বিশ্বাসী—গড়ন, পালিসও চমৎকার। সে সবই ঠিক হয়ে যাবে।"

হাত ধুইয়া আসন ছাড়িয়া ইতিমধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় চেয়ারে বসিয়া পাণ খাইতেছিলেন। ঝি তামাক দিল। তামাক খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন—"বিয়েতে তোমায় কিন্তু যেতে হবে বউঠাকরুণ। না গেলে ছাড়ছিনে।"

বউঠাকুরাণী বলিলেন—"যেতে ত ইচ্ছে করে ভাই—কিন্তু আমার যে

মুস্কিল। মেঝ মেয়েটি এই শীগ্‌গীর আসবে, প্রসব হবে। তাকে ফেলে যাই কি করে?—ভাল ভালয়ে বিয়েটি হয়ে যাক্, এখানে এসে বউ আমাদের দেখিয়ে নিয়ে যেও।"

"আচ্ছা বউঠাকরুণ পটলিকে তুমি দেখেছ ত?"—এই প্রসঙ্গ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবতারণা করিতেই পটলির রূপ গুণের আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। এই ভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল, ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল—সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল। তখন গিরিশ বাবু বৈঠকখানায় গিয়া, তোরঙ্গ হইতে আফিমের কৌটা বাহির করিয়া একটি গুলি সেবন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই গৃহস্বামী গৃহে ফিরিলেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বাল্যবন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন জন্য তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### পুত্র সম্ভাষণে।

"গিরিশ, চা খাবে ত?"

"না হেমদা, চা খাওয়া ত আমার অভ্যেস্ নেই।"

"বিলক্ষণ—চা ত আজ কাল সকলেই খাচ্ছে। সেকেলে বুড়োরা ছাড়া সবাইত খায়। অভ্যেস নেই অভ্যেস কর। গোবিন্দ—যা, দু পেয়ালাই নিয়ে আয়।"

পরদিন প্রাতে দুই বন্ধুতে বসিয়া উক্ত প্রকার কথোপকথন হইল। গোবিন্দ ভৃত্য দুই পেয়ালাই লইয়া আসিল। বহুকাল পরে আজ মুখোপাধ্যায়, স্নানাহ্নিক না করিয়াই (গরম) জলগ্রহণ করিলেন।

গতরাত্রে দুই বন্ধুতে বিবাহের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হেমবাবু এ কার্য্যে কোনও দোষ দেখিতে পান নাই—বরং তিনি একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"নরেন সুরেন বড় হয়েছে, ছমাস পরে হোক, এক বছর পরে হোক, ওদের বিয়ে দিতে হবে, বউমারা আসবেন, সবই যেন হল। কিন্তু ছেলে দুটি চিরদিন ত বাড়ীতে বসে থাকবে না। কেউ বা চাকরি নেবে, কেউ বা ওকালতী করবে বিদেশে থাকবে—কাযেই বউমা দুটিকেও ওদের কাছেই পাঠিয়ে দিতে হবে। তোমায় দেখবে শুনবে কে? সম্বলের মধ্যে

ত ঐ পিসিমা তিনি ত গঙ্গাপানে পা করেই রয়েছেন—গেলেই হয়। তখন তোমার উপায় কি হবে ভায়া? সেবা যত্ন ত দূরের কথা—হাঁড়ি তোমার গলায় পড়ে যাবে যে।—তারপর ধর, মানুষের যতই বয়স হয়, ততই শরীর অপটু হয়ে আসে। একটু সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক হয়ে পড়ে। অসুখ হয়ে যদি দুদিন পড়ে থাক—তোমার মুখে জল দেবে কে বল দেখি? না ভায়া, কারু কথা তুমি শুনো না—বিয়েটি করে ফেল।"

সুতরাং এরূপ বন্ধুর অনুরোধে স্নানাহ্নিক না করিয়া মুখোপাধ্যায় যে চা পান করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

চা পানান্তে হুঁকায় মুখ দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখখানি বিপন্নের মত দেখাইতে লাগিল। একটু পরে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"গোবিন্দ, বউঠাকুরুণ কি হীরে স্যাকরাকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন?"—গোবিন্দ বলিল—"না,—চায়ের বাসন কখানা ধুয়ে আমি বাজারে যাব, তাকে বলে যাব।"—মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"তবে আজ থাক—আজ আর দরকার নেই। কাল তখন তাকে ডাক্‌লেই হবে।"—"যে আজ্ঞে"—বলিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইহারা পটলডাঙ্গায় মেসের বাসায় থাকে। জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র সিটি কলেজে বি, এ পড়ে—কনিষ্ঠ সুরেন্দ্র গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। গত রাত্রেই মুখোপাধ্যায় বাসায় গিয়া ইহাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হেমবাবু বারণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"সে বাসায় ত্রিবেণীর অন্য ছোকরাও থাকে তোমার বিয়ের গুজব নিশ্চয়ই তারা শুনেছে। তুমি সেখানে গেলে, চলে আসবার পর তারা সবাই হয়ত হাসাহাসি করবে—তাতে নরেন সুরেন লজ্জিত হবে। তুমি যেওনা, কাল সকালে আমি মোনাকে তাদের বাসায় পাঠিয়ে তাদেরই এখানে আনাব এখন।"

নরেন বলিল—"বাবা, আপনি আসবেন আগে ত কিছুই জান্‌তে পারিনি।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হ্যাঁ—একটু হঠাৎই আসা হল। গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে তোমরা বাড়ী গেলে না—তোমাদের ঠাক্‌মা কত দুঃখ করতে লাগলেন।"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"ওরা সব ইয়ং বেঙ্গল, তোমার সেই পানা

পুকুর আর শেওড়া জঙ্গল কি ওদের ভাল লাগে? ছুটিতে ওরা একটু দেশ ভ্রমণ করতে চায়। সমুদ্র দেখলে?"

সুরেন বলিল—"হঁ্যা দেখলাম—কিন্তু সে তেমন সুবিধে হল না। সমুদ্র ত নয়, সেখানটা গঙ্গার মোহানা। আসল সমুদ্র, সে একটু দূরে।"

কলেজের পড়াশুনা, বাসার আহারাদি প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটি কবে থেকে সুরু হচ্চে?"

সুরেন বলিল—"আর উনিশ দিন পরে।"

"কতদিন বন্ধ থাকবে?"

"দু মাসের উপর। সেই জুন মাসের শেষে খুল্‌বে।"

অতঃপর দুই ভাইয়ে একটু ইসারা, একটু টেপাটেপি চলিল। নরেন্ চুপে চুপে বলিল—"তুই বল্‌না।"—সুরেন বলিল—"না দাদা, তুমি বল।"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"কি? তোমাদের দুই ভায়ে কিসের ঝগড়া হচ্ছে?"

সুরেন বলিল—"দাদা বল্‌ছেন, পুরী থেকে সমুদ্র খুব ভাল দেখা যায়। গ্রীষ্মের বন্ধে আমরা পুরীতে বেড়াতে যাব ভাবছিলাম।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে বাড়ী গেলে না, আবার গ্রীষ্মের ছুটিতেও বাইরে চলে যাবে?"

হেমবাবু বলিলেন—"তা যাক্ না, বেড়িয়ে আসুক। জল হাওয়া সেখানকার খুব ভাল, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।—হঁ্যাহে নরেন, দুমাস তোমাদের ছুটি ত? তা, একমাস পুরীতে থেকে, তারপর বাড়ী যেও এখন।"

নরেন সুরেন পিতার অভিমতের অপেক্ষায় তাঁহার মুখপানে সলজ্জভাবে চাহিয়া রহিল। মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে থাক্‌বে কোথায়?"

সুরেন বলিল—"আমাদের কলেজে পড়ে একটি ছেলে আছে, তার বাপ ওখানকার ডাক্তার, প্রথমে সেই ছেলেটির বাড়ীতে গিয়ে উঠব, তারপর একটা বাসা টাসা ঠিক করে নেব।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাদের বিশেষ ইচ্ছা হয়ে থাকে, যেও। টাকা কড়ি কি লাগবে হিসাব করে আমায় বোলো। একমাসের বেশী দেরী না হয় কিন্তু।"

উভয় ভ্রাতা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—"আজ্ঞে না, একমাসের বেশী দেরী হবে না।"

আবার আসিবে বলিয়া যুবকদ্বয় বিদায় লইল। তাহারা চলিয়া গেলে হেমবাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ভাবছিলে ভায়া, ছেলে দুটি তখন বাড়ীতে থাক্‌বে, তাদের সামনে দিয়ে কি করে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে বেরুবে—তা ওরা ত আপনারাই সরে দাঁড়াচ্ছে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হ্যাঁ। ও বিষয়ে আমার মনে একটা অশোয়াস্তি ছিল বটে। আর, তুমি যা বল্লে, কলকাতায় থেকে থেকে ওদের মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে—পাড়া গাঁয়ে গিয়ে থাক্‌তে ওদের ভালও লাগেনা।"

হেমবাবু বলিলেন—"তুমি শেষে এই সিদ্ধান্ত করলে বুঝি?"

"কেন—তুমিই ত বল্লে।"

"আমি ওদের সামনে ঐ কথা বল্লাম। আসল কথা কি বুঝতে পারছ না? সমুদ্র দেখার আগ্রহ, ওদের ছল মাত্র। আসল কথা, সে সময় ওরা বাড়ী থাকলে তুমি লজ্জিত হবে—সেই জন্যেই বাড়ী যাচ্ছে না। ছেলে দুটি তোমার বড় ভাল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষ হোক্‌, বেঁচে থাকুক। ওরা যে রকম বুদ্ধিমান, তুমি বিবাহ কর্‌লেও ওদের দ্বারা তোমার কোনও অশান্তির কারণ উপস্থিত হবে বলে বোধ হয় না।"

আপিসের বেলা হয় দেখিয়া হেমবাবু উঠিয়া স্নানাদির জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### মুখোপাধ্যায়ের বেসাতি।

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর বসিয়া হেমবাবু ও গিরিশবাবু চা পান করিতেছিলেন। হেমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ সারা দিন কি করলে হে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"খাওয়া দাওয়া করে দুপুর বেলা একটু ঘুমান গেল বেলা তিনটের সময় উঠে, মুখ হাত ধুয়ে, চাঁদনিতে গিয়েছিলাম—কিছু কাপড় চোপড় কিনে আনলাম।"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"শ্বশুরবাড়ী যাবার সজ্জা না কি?"

"যা বল।"

"কি কিনলে, বের কর, দেখি।"

চা টুকু শেষ করিয়া, পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া মুখোপাধ্যায় তোরঙ্গ খুলিলেন। খবরের কাগজ দড়ি দিয়া বাঁধা বাঁধা কয়েকটি পুলিন্দা বাহির করিয়া তক্তপোষের উপর রাখিলেন। দড়ি বাঁধা একটা মস্ত কাগজের বাক্সও বাহির করিলেন—দেখিয়াই বোঝা গেল তাহার মধ্যে জুতা আছে।

হেমবাবু বলিলেন—"তাই ত, অনেক বাজার করেছ যে হে। এ সব খোল, দেখি।"

মুখোপাধ্যায় প্রথম পুলিন্দাটির দড়ি খুলিলেন। তাহার মধ্যে হইতে বাহির হইল শাদা টুইল কাপড়ের চারিটি কামিজ এবং ছয়খানি রুমাল।

হেমবাবু সেগুলি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এই কামিজ গায়ে দিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হ্যাঃ—তোমার যেমন কথা! শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যেই কিনেছি কিনা? বাড়ীতে গায়ে দেব।"

একখানি রুমাল হাতে করিয়া হেমবাবু বলিলেন—"এ খেলো রুমাল। এখন নতুন বেলায় দেখ্‌তে চক্‌ চক্‌ করছে, ধোয়ালে নিজ মূর্ত্তি ধরবে। কত করে দাম নিয়েছে?"

"দশ পয়সা একো খানা।"

"পাঁচ ছয় আনার কম ভাল রুমাল হয় না। আর কি কিনেছ দেখি।"

মুখোপাধ্যায় আর একটি পুলিন্দা খুলিলেন, তাহার মধ্যে হইতে বাহির হইল, একটি গরদের কোট, একটি ধূসর আলপাকার কোট, চারিটি গেঞ্জি এবং তিন জোড়া মোজা। জিনিষগুলি পরীক্ষা করিয়া ব্যঙ্গস্বরে হেমবাবু বলিলেন—"তুমি এই কোট গায়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"যাই-ই যদি, কি হয়েছে?"

"পাগল! ধুতির উপর কোট পরা কি আর রেওয়াজ আছে? যারা আজকালকার ফেসানেবল্‌ লোক, তারা বলে বাঙ্গলা ধুতির উপর ইংরাজি কোট পরাও যা, মুর্গীর ডিম ভাতে দিয়ে হবিষ্যান্ন খাওয়াও তাই।"

"তবে তারা কি পরে?"

"পঞ্জাবী গায়ে দেয়। ধুতির উপর কোট দেখ্‌লে তারা বলে হয় এ রেলের বাবু নয় পাড়াগেঁয়ে ভুত। শোন বলি। কাল, কোনও একটা ভাল দর্জ্জির

দোকানে গোটা কতক পঞ্জাবী জামার মাপ দাও। ভাল আদ্ধির গোটা দুত্তিন, ভাল নয়ানসুকের গোটা দুত্তিন করাও। কোট গায়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যেওনা যেওনা। জুতো কি রকম কিন্‌লে দেখি ;”

জুতার বাক্স খুলিতে খুলিতে মুখোপাধ্যায় বলিলেন—“বিলাতী জুতা, ন’টাকা দাম নিয়েছে।”

জুতা দেখিয়া হেমবাবু বলিলেন—“মন্দ নয়, তবে মুখটা বড্ড সরু।”

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন—“মুখ সরুই ত তোমাদের আজকাল ফেসান শুন্‌তে পাই।”

“এককালে ছিল বটে, এখন চাঁদনীর ফ্যাসান, ভদ্রসমাজের ফ্যাসান নয়। ভদ্রসমাজের ফ্যাসান এখন মীডিয়ম্ টোজ্। মুখ সরু জুতো পরা, মাংস দেখা যায় এমন করে পিছনের চুল ছাঁটা—এসব এককালে ফ্যাসান ছিল বটে, এখন উঠে গেছে। আর এক জোড়া জুতো তোমায় কিন্‌তে হবে। একজোড়া ভাল দেখে পম্প শূ। কাল শনিবার আছে—দুটোর সময় আপিসের ছুটি হবে—তুমি বরং আমার আপিসে যেও, ফেরবার পথে তোমার জুতো, রুমাল, গেঞ্জি, আরও যা যা দরকার সব কিনে দেব এখন। পঞ্জাবীরও ফরমাস দেব।”

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—“তোমরাই আমায় মাটী করলে দেখছি।”

পরদিন স্বর্ণকার আসিল। গৃহিণী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশাদি দিলেন। বারম্বার করিয়া বলিলেন, “দেখো হীরেলাল, কোনও জিনিষে যেন একটুও খুঁৎ না থাকে, কুটুম্বস্থানে নিন্দে না হয়।”—“আজ্ঞে না, সে আর আমায় বলতে হবে না”—বলিয়া স্বর্ণকার অলঙ্কারের ফর্দ্দ ও একরাশি গিনি গণিয়া লইয়া গেল। বেলা দুইটার সময় গিরিশবাবু হেমবাবুর আপিসে গেলেন—আবশ্যকীয় জিনিষপত্র হেমবাবু সমস্তই কিনিয়া দিলেন অবশেষে একটা ঔষধের দোকানে প্রবেশ করিয়া হেমবাবু কি একটা শিশি কিনিলেন। গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি ওষুধ ?”

হেমবাবু বলিলেন—“আছে একটা।”

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর হেমবাবু গিরিশকে নিজ শয্যাগৃহে লইয়া গেলেন। টেবিলের উপর যেখানে বাতি জ্বলিতেছিল, সেইখানে চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া দ্বারটি ভেজাইয়া দিলেন।

গিরিশ বলিলেন—“ব্যাপার কি হে ?”

হেমবাবু একটু খানি হাসিলেন মাত্র, কোনও উত্তর দিলেন না। বিকা

ক্রীত সেই শিশিটি বাহির করিয়া, ছিপি খুলিয়া খানিকটা তরল পদার্থ একটা কাচের বাটিতে ঢালিলেন। একটি ছোট বুরুষ তাহাতে ডুবাইয়া মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গিরিশ বলিলেন—"এ কি?"

হেমবাবু বলিলেন—"একটা ওষুধ। তোমার গোঁফে লাগিয়ে দেব—যত-গুলো পাকা গোঁফ্ আছে সব কাঁচা হয়ে যাবে।"

মুখোপাধ্যায় শিহরিয়া বলিলেন—"কলপ?"

হেমবাবু বলিলেন—"দূর! কলপ কেন হবে, হেয়ার ডাই—একটা ওষুধ হে ওষুধ। এ বয়সে বিয়ে করছ, এখন কত ওষুধ বিষুধ দরকার হবে।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মুখোপাধ্যায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"না ভাই, রক্ষে কর। ও সব কলপ টলপ আমি মাখব না। বিয়ে করছি বলেই যে সঙ সাজতে হবে এমন কি কথা? কাল সকালে নরেন সুরেন আসবে, নেমন্তন্ন করেছ তাদের এখানে—আমায় দেখে কি ভাববে তারা? ছি ছি।"

এমন সময় হেমবাবুর স্ত্রী দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের ঝগড়া কিসের?"

গিরিশ বলিলেন—"দেখ দেখি বউঠাকরুণ, দাদা আমায় কলপ মাখিয়ে দিচ্ছেন।"

হেমবাবু অনেক বুঝাইলেন কিন্তু মুখোপাধ্যায় কিছুতেই কলপ মাখিতে রাজি হইলেন না। বলিলেন—"চা খেতে বল, খাব; পঞ্জাবী গায়ে দিতে বল, দেব; পম্প শূ পরতে বল, পরবো—কিন্তু ঐ কার্য্যটি করব না।"

গৃহিণী বলিলেন—"থাক্ থাক্—আর কলপ মেখে কায নেই। চুল দুগাছা পেকেছে বলেই লোকে বুড়ো বলবে না।" হেমবাবু ঔষধটুকু শিশিতে ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন—"পয়সা দিয়ে কিন্‌লাম, নষ্ট হবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"ও গো—ও কলপের শিশি তুমি তুলে রাখ—আমার যে রকম শরীর—বেশী দিন যে আর টিকি তা বোধ হয় না। তোমার নিজেরই এর পরে দরকার হতে পারে।" —বলিয়া তিনি মৃদুহাস্য করিলেন।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মুখোপাধ্যায় অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলেন না। অনভ্যাসের চা পানে এ কয়রাত্রিই তাঁহার নিদ্রা ভাল হইতেছিল না। কলি-কাতায় আসা অবধি কতগুলি টাকা ব্যয় হইল, মনে মনে তাহার হিসাব করিতে

লাগিলেন। অনেকগুলি টাকা। এখনও গায়ে হলুদের তত্ত্বের জিনিষ কেনা হয় নাই। দিন দশ বারো পরে আবার কলিকাতায় আসিতে হইবে—তখন গহনাও লইয়া যাইবেন, গায়ে হলুদের তত্ত্বের জিনিষও কিনিবেন। বউঠাকুরাণী ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন দুই শত টাকায় একরকম হইয়া যাইবে। উভয় বাড়ীর ভোজের খরচ আছে। খতাইয়া দেখিলেন, জগদীশের বন্দকী দলিল গুলির মূল্য সুদ্ধ ধরিলে, পাঁচ হাজার টাকার কমে এ বিবাহটি সম্পন্ন হইবে না। ভাবিলেন, ভট্টাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন সেটা যদি ফলিয়া যায়, তবেই না! অমন কত পাঁচ হাজার আসিবে। রাজা হইবার কথা।—কিন্তু কৈ? তাহার লক্ষণ ত কিছুই দেখিতেছি না।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া দুই বন্ধু চা পান ও কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় পাড়ার একজন যুবক প্রবেশ করিয়া বলিল— ডার্ব্বির টিকিটের বই আনিয়েছি—নেবেন?"—বলিয়া যুবক টিকিটের বহি বাহির করিল।

হেমবাবু বলিলেন—"দাও একখানা, ফি বছরই ত নিই। হয় না ত কিছু।"—বলিয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে দশটি টাকা আনিতে পাঠাইলেন।

মুখোপাধ্যায় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারটা কি?"

হেমবাবু বলিলেন—"ঘোড় দৌড়ের লটারি আর কি। বিলেতে ঘোড় দৌড় হয়, এখানে তারই লটারি হয়। যার অদৃষ্টে থাকে সে পায়।"

"কি পায়?"

"প্রথম প্রাইজ বুঝি ছয় লাখ—নয় হে?"

যুবক বলিল—"গত বৎসর ছয় লক্ষ বিশ হাজার প্রথম প্রাইজ হয়েছিল।"

মুখোপাধ্যায় সবিস্ময়ে বলিলেন—"ছ লাখ? দশ টাকার টিকিট কিনে ছ' লাখ বল কি হে!"

হেমবাবু বলিলেন—"দশটাকার টিকিট ত লক্ষ লক্ষ লোকেই কেনে। আমি ত আজ বিশ বছর ধরে কিন্‌ছি—কই পেলাম না ত কখনও। ও সব অদৃষ্টের কথা।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"আমিও একবার অদৃষ্টটা পরীক্ষা করে দেখব নাকি?"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দেখ না, নতুন বউয়ের পয়ে যদি হয়ে যায়।"

মুখোপাধ্যায় একটু ভাবিলেন, শেষে বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

যুবকটি গিরিশ বাবুর নাম ঠিকানা টিকিটে লিখিল। শেষে বলিল—"একটা ছদ্মনাম?"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে আবার কি?"

হেমবাবু বুঝাইয়া বলিলেন—"একটা কোনও কল্পিত নাম লিখে দিতে হয়, সেই নামে স্ফূর্ত্তি হয়। হিন্দু অনেকেই ঠাকুর দেবতার নাম লিখে দেয়। যা হয় একটা নাম বল।"

মুখোপাধ্যায় বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন—কোন্ ঠাকুরকে রাখিয়া কোন্ ঠাকুরের নাম লেখান? হেমবাবু বলিলেন—"আচ্ছা দাও, আমি তোমার হয়ে লিখে দিচ্ছি।"—বলিয়া তিনি কি লিখিয়া টিকিট খানি খাতা হইতে ছিঁড়িয়া লইলেন। যুবক টিকিটের বহি লইয়া চলিয়া গেল।

মুখোপাধ্যায় নিজের টিকিট খানি নাড়িতে চাড়িতে বলিলেন—"কোন্ ঠাকুরের নাম লিখ্‌লে?"

হেমবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ঠাকুরের নয়, ঠাকরুণের নাম লিখেছি।"

"কালী—না দুর্গা?"

"কালীও নয় দুর্গাও নয়। পটলি লিখে দিয়েছি।

"না—না—বল না। এ সব বিষয়ে ঠাট্টা করতে নেই।"

"সত্যিই বলছি পটলি লিখে দিয়েছি এই দেখ না P—o—"

মুখোপাধ্যায় ইংরাজি অক্ষর পড়িতে পারিতেন। দেখিলেন, বাস্তবিকই লেখা রহিয়াছে পটলি। মনটা একটু যেন খুসী হইল—কিন্তু তাহা গোপন করিয়া, "হুঁঃ—যত সব—"বলিয়া তিনি টিকিটখানি সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণের গাড়ীতে ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন। যখন সন্ধ্যা হইল, গাড়ী বৈদ্যবাটী ছাড়াইল, জানালার নিকট বসিয়া বাহিরের তরল অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া মুখোপাধ্যায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"দেখ একবার যোগাযোগ!—এত দিন ধরে ত কল্‌কাতায় যাতায়াত করছি—পূর্ব্বে ডার্ব্বি লটারির নামও কখনও শুনিনি। পটলির সঙ্গে বিয়ের কথাও হল—টিকিটও কিন্‌লাম। হেমদাদারও কাণ্ড দেখ, এত দেব দেবী থাক্‌তে টিকিটে নাম লিখলেন কি না পটলি!—এ সমস্ত ঘটনাই দৈবাধীন। সে

ছোকরাটি ঐ টিকিটের বই নিয়ে, আজ না এসে কালও আসতে পারত—আমি দেখতেও পেতাম না জানতেও পারতাম না। দেবতারা দেখ্‌লেন এ ব্যক্তি ত আজ চারটে বিশ মিনিটের গাড়ীতে চল্ল—তাই তাঁরা তাড়াতাড়ি সে ছোকরাটিকে পাঠালেন। আর হেমদাদা যে ঐ পট্‌লির নাম লিখ্‌লে, সে কি ও নিজে লিখেছে? দেবতারা ওকে দিয়ে লেখালেন। শাস্ত্র কি মিথ্যে হবার যো আছে? স্পষ্ট লেখা রয়েছে—স চ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্ নাঃ—হিন্দুধর্ম্ম আছে বৈ কি।—এ সকল মানাই উচিত। সন্ধ্যাহ্নিক না করে চা টা গুলো খাওয়া ভাল হয় নি।"

( ক্রমশঃ )

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

# গান

জানি, বুকের-পাঁজর-ভাঙ্গা-দুখের এমন দিনও যাবে,
আমার, মাঝ দরিয়ায় ভাঙ্গাতরী আবারও কূল পাবে।
　　আমার, নিখিল আঁধার যে জন বিনে,
　　আমি, ডাক্‌ছি তারে রাত্রি দিনে,
জানি, একদিন তার করুণ আঁখি আমার পানে চাবে।
　　এলে সে দিন, শাখীর শিরে,
　　ফুট্‌বে কুসুম আবার ফিরে,
ফাগুন দিনের বাহার-রাগে বিহগে গান গাবে;
ও তার, আপন হাতে বরণমালা কণ্ঠে মোর দুলাবে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

রাঁচি, "নিভৃত কুটীর"
১০ই ডিসেম্বর ১৯১৫

# গ্রন্থ-সমালোচনা

কিশোর। শ্রীজলধর সেন প্রণীত। কলিকাতা গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ছয়খানি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্র আছে, রেশমী বাঁধাই, ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ১৪২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

এখানি গল্পগ্রন্থ, কিশোরবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য উদ্দিষ্ট। "নিবেদনে" জলধর

বাবু লিখিয়াছেন—"আমি দেখিয়াছি, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এখন প্রথমে উপকথা, ঠাকুরমার ঝুলি প্রভৃতি পাঠ করে, তাহার পরই তাহারা একেবারে দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ বা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস চাপিয়া ধরে। এই দুই শ্রেণীর পুস্তকের মাঝখানে আর কোন রকম গল্প পুস্তক পায় না বলিয়াই তাহারা এই কার্য্য করিয়া থাকে। কিশোরকিশোরীদিগের এই অভাব পূরণের জন্য আমার এই প্রয়াস।"

উপরে জলধর বাবু যে কথা বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত সত্য। বালক-বালিকাদের পাঠযোগ্য উপন্যাস বাঙ্গালায় নাই—অথবা যদি থাকে, তবে সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। বঙ্গদেশের কিশোরকিশোরীগণের সৌভাগ্য যে, জলধর বাবুর মত একজন প্রধান যশস্বী সুলেখক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কথাগ্রন্থ কিরূপ হওয়া আবশ্যক? শুধু প্রেম ও রাজনীতি বাদ দিলেই যে গল্প বা উপন্যাস কিশোরপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা অবশ্যই নহে।—তাহা যদি হইত, তবে জলধর বাবুর পনরো আনা গল্পই ত কারণ যেগুলি প্রেমও নাই, রাজনীতিও নাই। শুধু ভাষার সরলতা ও সরসতাও তৎপক্ষে যথেষ্ট নয়—জলধর বাবুর সকল গল্পই ত সে গুণে ভূষিত। আসল কথা এই যে এক এক বয়সের আশা, আকাঙ্ক্ষা, মনের গতি বিভিন্ন। সমালোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি পড়িয়া মনে হইল, কিশোর বয়স্ক বালকবালিকাদের রুচি, মনের গতি প্রভৃতি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াই জলধর বাবু এগুলি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, "কিশোর" গ্রন্থখানি পাঠে বালক-বালিকাগণের শুধু যে নৈতিক উপকার সাধিত হইবে তাহা নহে—গল্পগুলি তাহাদের ভালও লাগিবে। গল্প পড়িবার আগ্রহ ও আনন্দেই তাহারা এগুলি পড়িবে—একথা তাহাদের মনে হইবে না যে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকই গল্পের ছদ্মবেশ ধরিয়া, ফাঁকি দিয়া আমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে আসিয়াছে।

পুস্তকখানিতে সর্ব্বসুদ্ধ তেরোটি গল্প আছে—তন্মধ্যে ছয়টি গল্প সচিত্র। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সমস্তই সুন্দর। আমাদের মনে হয়, জলধরবাবু এই একখানি মাত্র "ছেলেদের ভাল গ্রন্থ" লিখিয়াই নিষ্কৃতি পাইবেন না। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা, তাঁহার প্রকাশকের মারফৎ, আরও গল্পের জন্য জলধর বাবুর শান্তি ভঙ্গ করিবে।

**পূজা ও সমাজ।** শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শিলচর এরিয়ান প্রেসে মুদ্রিত চট্টগ্রাম, ফতেহাবাদ হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ৩২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০, কাপড়ে বাঁধা ১॥০।

পুস্তকখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার রচিত কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্র ও পদ্যে সেগুলির বঙ্গানুবাদ আছে। অপর তিন খণ্ডে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত, সুলিখিত এবং লেখকের বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। মতগুলি বেশ উদার, পণ্ডিতী গোঁড়ামি নাই। পুস্তকখানিতে শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। এখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। পুস্তকগুলি মফস্বলে মুদ্রিত হইলেও, কলিকাতায় মুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠবে কোনও অংশে হীন নহে।

বল্লাল সেন। নাটক। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। কলিকাতা লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২১ নং বেনেপুকুর রোড্‌ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১৭ পৃষ্ঠায় মূল্য ১৲।

নাটকখানি বাঙ্গালার বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকার বল্লালকে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর ও ধর্ম্মবুদ্ধিবিহীন রাজা অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, আনন্দ ভট্ট রচিত "বল্লাল চরিতম্‌" গ্রন্থ হইতে তাঁহার নাটকের উপকরণগুলি লইয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এই "বল্লাল চরিতম্‌" গ্রন্থখানি অকৃত্রিম।—কেহ কেহ কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করেন না। সে যাহাই হউক সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমরা নাটকের হিসাবেই দেখিব।

এই নাটকের ভাষা, কথোপকথন, রসিকতা ও গানগুলি লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইঁহার নাম আমরা কখনও শুনি নাই। এই নাটকই বোধহয় সাহিত্যক্ষেত্রে যোগেন্দ্রবাবুর প্রথমোদ্যম। তাহাই যদি হয়, তবে ইঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই নাটকখানি, অনেক তথা বিজ্ঞাপিত "সুপ্রসিদ্ধ" নাট্যকারের নাটক অপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

ইতিহাসের শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া এ নাটকে যোগেন্দ্র বাবু একটু অসুবিধায় পড়িয়া গিয়াছেন। বল্লাল চরিতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়া, স্থানে স্থানে নাট্যকলাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। পদ্মাক্ষী ও লক্ষ্মণসেন ঘটিত ব্যাপারটি ঐতিহাসিক কি না জানি না, ঐ বীভৎস ব্যাপারটি বর্জ্জন করিলেই ভাল হইত। আরও এমন ঘটনার অবতারণা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে, যাহা নাটকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

আমরা যোগেন্দ্রবাবুর রসিকতা শক্তির সুখ্যাতি করিয়াছি—কিন্তু কোথাও কোথাও তিনি অস্থানে অপাত্রে রসিকতা করিয়া সে শক্তির অপব্যবহার ও নাটকের সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছেন। নাটকের প্রথমেই, মন্ত্রণা সভায় পশুপতির বিদূষকোক্তিগুলি অসাময়িক হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে, পশুপতির স্ত্রী মায়া বাহির; হইতে পশুপতির ডাক শুনিয়া "কে, বাবাঠাকুর নাকি?" বলিতেছে, পরে পশুপতি যেখানে স্ত্রীকে বলিতেছে তাহাকে আদর করিয়া ডাকার অসুবিধা এই যে, নাম সংক্ষিপ্ত করিতে গেলে সম্পর্ক বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে—এ সকল অবশ্য গ্রন্থকার রসিকতার হিসাবেই লিখিয়াছেন—কিন্তু ইহা বদ্‌-রসিকতা। স্থানে স্থানে রসিকতা অশ্লীলতায় পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে; কোথাও ব বীভৎসতার কাণ ঘেঁসিয়া গিয়াছে (যেমন ৬৭ পৃষ্ঠায় ৭-১০ পংক্তিতে)। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, লক্ষ্মণসেন যেখানে তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—"প্রিয়তমে তুমিই আমার কবিতার উৎস,—তুমিই আমার একাধারে পিতা, মাতা, রাজ্য, সিংহাসন,—সমস্তই।"—সেখানে ঐ "মাতা" কথাটি নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর কাণে শূলের মত বিঁধিবে। সংস্কৃতে সাধ্বী স্ত্রীর বর্ণনায় "কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, ভোজ্যেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা" ইত্যাদি

আছে তাহা আমরা জানি কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক বর্ণনা এক, আর স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছে, "তুমি আমার মাতার মত" সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথা এবং নিতান্তই অমার্জ্জনীয়।

আর একটা দোষ লক্ষ্য করিলাম—স্থানে স্থানে লেখক থিয়েটারি ঢঙ্গের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। "থিয়েটারের নাটকওয়ালা"গণকে আদর্শ না করিয়া, বাঙ্গলা সংস্কৃত ইংরাজি উচ্চশ্রেণীর নাট্যসাহিত্যকে যোগেন্দ্রবাবু যদি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার হস্ত হইতে ক্রমে আমরা যথার্থ ভাল জিনিষ পাইতে পারিব।

দধীচি। দৃশ্যকাব্য। শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি, এস্-সি প্রণীত। কলিকাতা "লোকনাথ যন্ত্রে" মুদ্রিত, ( ঠিকানা নাই ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নীল কালিতে ছাপা, ডবলক্রাউন ১৬ পেজি, ১৬৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

৺ গিরিশ ঘোষ প্রবর্ত্তিত ভাঙ্গা লাইন অমিত্র ছন্দে এ নাটকখানি রচিত। "নিবেদন" পাঠে জানা গেল, ভূতপূর্ব্ব কোহিনূর থিয়েটারের সত্বাধিকারী মহাশয়ের "আদেশ অনুসারে" এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত মহাশয়ের "ভাগ্যবিপর্য্যয়" হওয়াতে ( অর্থাৎ কোহিনূর থিয়েটার উঠিয়া যাওয়াতে ) "রঙ্গমঞ্চে দধীচির স্থান হইল না।"—কেন ? দেশে আর কি রঙ্গমঞ্চ নাই ? রঙ্গমঞ্চওয়ালারা যাহা খোঁজেন অর্থাৎ ভাল ভাল ম্যাজিক, তাহা ত এ নাটকে যথেষ্টই রহিয়াছে। যথা—

( ১ ) বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন।

অকস্মাৎ মধ্যমস্তক হইতে বৃত্রাসুর, দক্ষিণ ও বাম মস্তক হইতে যথাক্রমে তরবারি ও কমণ্ডলুর উত্থান ( ২ পৃঃ )

( ২ ) অকস্মাৎ নন্দীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষের উত্থান। ধ্যানমগ্ন নন্দী। (১৫ পৃঃ)

( ৩ ) অকস্মাৎ নদীবক্ষ হইতে সরস্বতীর উত্থান। (২৫ পৃঃ)

( ৪ ) অকস্মাৎ মধ্যগগনে শিবের কমণ্ডলুকরে আবির্ভাব। (২৭ পৃঃ)

এইরূপ রাশি রাশি "অকস্মাৎ" এই নাটকখানির মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে অপ্সরাগণ, দৈত্যবালাগণ আসিয়া নাচিয়া গাহিয়াও যাইতেছেন। সবই ত আছে—অভাব কিসের ? অভাব কেবল অন্নবস্ত্রের—কবিত্বের ও নাট্যকলার। ভাবের ও ভাষার মৌলিকতাও লেখকের অসামান্য। একটা গানের মধ্যে পাইলাম -"চলে বীরবর ববিতে বিরহে বিহারে।" ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ। বীররস ও আদিরস, বাঘ ও গোরুর মত, লেখকের প্রতাপে একঘাটে জল খাইতেছে।—একস্থানে মহেশ্বর অর্থে তিনি "মহেষাস" লিখিয়াছেন। (নজির আছে, দাশুরায়ও কোদাল অর্থে কোদণ্ড শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে মহাদেবকে কবি বাঙ্গালী ঘরের অভিমানিনী পিসিমা করিয়া আঁকিয়াছেন—

শঙ্কর। কেরে কেরে কেরে
মম ভক্তে করে অপমান ?
বিশ্বের বিধান বিশ্বেশ্বর আর না রাখিবে করে।
যেবা পার বিশ্বভার করহ গ্রহণ
মম প্রয়োজন আজি হতে হল অবসান !
আর কৈলাসে না রব,
দূরে দূরে চলে যাব,
ভক্ত মম মরম বেদনা পাবে।

পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তোরা আমায় হতগ্রাজ্যি করিস্? যা আর তোদের সংসারে আমি থাক্‌ব না বৃন্দাবন চলে যাব।"

অশোক অনুশাসন। মূলপাঠ, অনুবাদ, বিবিধ টীকা ভৌগলিক ঐতিহাসিক বিবরণ ও সংস্কৃত তাৎপর্য্য সহিত। শ্রীচারুচন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৩১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।৹, কাপড়ে বাঁধাই ২৲।

উপক্রমণিকায় সম্পাদকগণ লিখিয়াছেন—"প্রাচীন ভারতে মহারাজ অশোকই উৎকীর্ণ শিলালিপির সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। * * * অতি প্রাচীন কাল হইতেই সভ্যদেশ মাত্রেই রাজকীয় শাসন বা ঘোষণা, ধর্ম্মানুশাসন, নৃপতিবর্গের কীর্ত্তি কাহিনী, একাধিক জাতির মধ্যে সন্ধি বা স্মরণীয় ঘটনা-বিশেষ জনসাধারণের গোচরে আনয়ন করিবার বা চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে শিলাখণ্ডে বা ধাতুফলকে উৎকীর্ণ করিয়া সাধারণের গমনাগমন বা সম্মিলিত হইবার স্থানে রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।"—এই উপক্রমণিকা পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, অশোক অনুশাসনের ভাব ও রচনা প্রণালীর সহিত পারস্য সম্রাট দারয়বুসের অনুশাসনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পার্থক্যও আছে—"পারস্য অনুসাসনের মধ্যে কেবলমাত্র কতকগুলি রাজকীয় ঘটনা বর্ণিত আছে, অশোক অনুশাসনের মধ্যে অতি উচ্চ নীতি তত্ত্বের মূলসূত্রগুলি পরিষ্কার সরল ভাষায় মানবের কল্যাণার্থে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

এই বিংশ পৃষ্ঠা ব্যাপি উপক্রমণিকাটি অত্যন্ত সুলিখিত—যাহারা প্রত্নতাত্ত্বিক নহে—সাধারণ পাঠক—তাহাদেরও বোধগম্য। মূল পুস্তকে বঙ্গাক্ষরে প্রথমে লিপিগুলি পরে সংস্কৃত ভাষায় সেগুলির অনুবাদ তৎপরে বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট আছে। পরিশিষ্টে মূললিপিগুলি সম্বন্ধে টিপ্পনী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

সমগ্র পুস্তকখানি আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-বিভাগে এখানি উচ্চস্থান লাভ করিবে সন্দেহ নাই। শুধু বিশেষজ্ঞের নিকট নহে, সাধারণ পাঠকের নিকটেও এ গ্রন্থখানি সমাদর লাভের যোগ্য।

# শেষ অর্ঘ্য

সুখশৈশবে অতসী-পলাশে সেবিয়া সরস্বতী
লভিনু যা'ফল—"ধর' লক্ষণ"! লাভ নাই একরতি!

মধুযৌবনে বকুল-চাঁপায় সাজানু খোঁপায় যাঁর—
গৃহেরই দেবতা! বরে তাঁর তবু ঘরে ঢেঁকা হ'ল ভার!

ক্ষুব্ধ প্রৌঢ়ে কমলে-কুন্দে পূজিনু কমলাপায়—
চিরচঞ্চল—বিত্তেরে শুধু চিত্তে কি বাঁধা যায়?

রিক্ত শিশিরে দেখা দিল শিরে শুভ্র তুষাররাশি—
উপহাসসম—দন্তবিহীন বার্দ্ধক্যের হাসি!
সব ফুল গেছে ঝরিয়া মরিয়া—ধুস্তূর শুধু বাকী;
ধূর্জ্জটি পদে স'পিলাম তাই—তিনিও না দেন ফাঁকি!
গঙ্গাধরকে চাহিনাক, তাঁর গঙ্গায় আজি লোভ—
সেই কোলে ঠাঁই যদি আজি পাই, ভুলে' যাই সব ক্ষোভ।

# পত্রপুষ্প *

এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে কেমন একটা আবেশ আসিল। সে আবেশ স্বপ্নের কি না বুঝিতে পারিলাম না। মানস নেত্রে সহসা একটি বিচিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম যেন এই বিরাট বিশ্ব-মন্দিরের মধ্যভাগে মর্ম্মর বেদীতে মানসীর চিণ্ময়ী মূর্ত্তি। সেই প্রতিমার পদতলে প্রেম-বিহ্বল কবি দণ্ডায়মান। কবির অপলক নেত্র দেবীর সুন্দর বদনমণ্ডলে ন্যস্ত, ওষ্ঠদ্বয় মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, যুক্ত করপুটে পত্রপুষ্পের অঞ্জলী।

এসেছে শরৎ ল'য়ে পত্রপুষ্প তার,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসিছে গগন ;
ভরিয়াছে করপুট কুসুমে পল্লবে,—
দেবতারে করিবে অর্পণ।

এই দেবী একদিন রক্তমাংসের দেহ ধরিয়া কবির বক্ষে বিজড়িত ছিলেন। তখন কবি তাঁহাকে মানবী ভাবিয়া তাঁহার সহিত তুচ্ছ ক্রীড়ায় নিরত ছিলেন। কিন্তু কবির সে মোহ নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিয়া দেবীর স্থূল দেহ শ্মশানের চিতায় ভস্মীভূত হইয়া গেল। তারপর কবি প্রাণ প্রতিমার কত সন্ধান করিয়াছিলেন, হৃদয়ে ধরিবার জন্য কত আকুল হইয়াছিলেন। তাই এই গ্রন্থের প্রথমেই কবি বলিতেছেন :—

তোমারে পাইনি কাছে,
ফুল তাই পড়ে আছে—
কে পরিবে কেশে ?
পারিনি গাঁথিতে মালা,
তাই গো জুড়াতে জ্বালা
দিতেছি উদ্দেশে।

এই অদর্শন, অনুসন্ধান, আক্ষেপোক্তি, আকুলতা, চঞ্চলতা ধীরে ধীরে কবিকে প্রেম-সাধনের পবিত্র পন্থায় তুলিয়াছিল। কবি সেই পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে এমন এক মন্দিরে গিয়া পড়িলেন—যেখানে তাঁহার কামনা আরাধনায় পরিণত হইল, ক্রীড়া পূজায় পর্য্যবসিত হইল, স্থূলদর্শনলিপ্সা সূক্ষ্ম ধ্যানে

* গীতিকাব্য। শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বিলীন হইল, কাম্য সুখ দেবত্বের আনন্দ আনিয়া দিল। কবি দেখিলেন—তাঁহার হৃদয়-পদ্মে রক্ত মাংসের সংস্রবহীন প্রেমের চিন্ময় দেহ তাঁহার আরাধ্যাকে দেবীপদে আরূঢ় করিয়াছে। কবি তন্ময় হইয়া সেই দেবীর চরণ-কমলে অঞ্জলি ভরিয়া সুগন্ধ পুষ্পপত্রের অর্ঘ্য দিতেছেন। দেবীকে যখন মানবী ভাবিয়াছিলেন, তখন ফুল পাতার মালা গাঁথিয়া কেশে জড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দেবীকে যখন কবি দেবী বলিয়া চিনিতে পারিলেন তখন সেই দেবী-প্রতিমার চরণ-পদ্মে একটি একটি করিয়া হৃদয়ের পবিত্র ভক্তি পুষ্পপত্র সমস্ত অর্পণ করিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি এই সাধন কাহিনীর আরম্ভ, এবং শেষ কবিতার শেষাংশ তাহার অপূর্ব্ব পরিসমাপ্তি।

এই পবিত্র প্রেম-পন্থার অনুসরণে যিনি কবির সহিত ভ্রমণ করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন—এই দীর্ঘ পথ কোথাও ঋজু, কোথাও বক্র, কোথাও দিবালোকে উজ্জ্বল, কোথাও রজনীর অন্ধকারে নিবিড়, কোথাও জ্যোৎস্নার মিষ্ট জ্যোতিতে স্নিগ্ধ, কোথাও বর্ষার ঝঞ্ঝাপ্লাবনে কঠোর। কিন্তু সর্ব্বত্রই কবি-ভোগ্য সৌন্দর্য্যের মহিমায় মণ্ডিত। এই কাব্য-পথের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বিরাম-স্থল এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

( ১ ) প্রেমের স্বরূপ, ( ২ ) কবিতার প্রতি, ( ৩ ) কবি-প্রিয়া, ( ৪ ) অভি-জ্ঞান, ( ৫ ) বিরহে, ( ৬ ) গীত-শেষ, ( ৭ ) সুখ-স্মৃতি, ( ৮ ) অনন্ত মিলন ( ৯ ) হাসি ও অশ্রু, ( ১০ ) অবশেষ, ( ১১ ) গাও কবি, ( ১২ ) আর কতদূর।

কবি এই পথে আসিতে আসিতে ক্লান্তিভরে যখন বলিতেছেন ঃ—

আর কতদূর ওগো আর কতদূর ?
কত পথ আসিয়াছি,
কাঁদিয়াছি, হাসিয়াছি,
বল না আমায়—আমি বড় শ্রমাতুর—
আর কত দূর ?

তখন কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি—কবি পথের শেষে আসিয়াছেন, সিন্ধুর আহ্বান কাণে আসিতেছে, মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। কেন বুঝিয়াছি তাহা কবির নিম্ন উক্তিতেই প্রকাশ।

আমি যে ভুলেছি কভু, সেত ভুলে নাই তবু,
আঁধারে বিদ্যুৎ সম দিয়াছে সে দেখা !
জনকের আশীর্ব্বাদে জননীর শুভ সাধে
পাইয়াছি তার স্বাদ—প্রিয়মুখ লেখা—
তারি প্রেম দেখা !

কবি যখন প্রেমের প্রতি রূপের মধ্যেই সেই বিদ্যুচ্চমক উপলব্ধি করিতেছেন তখন পথের যে শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থের একমাত্র ত্রুটী—অমার্জ্জনীয়; তাহা দেবী দর্শনের চিত্রাভাব। আশা করি দেবীদর্শন করিয়া কবি একাই যেন তাহা উপভোগ না করেন, সহযাত্রীর সহিত যেন সেই মহাপ্রসাদ বাঁটিয়া খান্।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

# বন্ধুর জন্ম দিনে

এই শুভদিন যেন চিরদিন বর্ষ বর্ষ ধরি'
সুখ শান্তি সান্ত্বনারে নিত্য সঙ্গী করি'
দেখা দেয় তব দ্বারে,
তব মনোনন্দন মাঝারে
শত ভারে,
নিত্য বিকশিত হোক আনন্দ মঞ্জরী,
জীবন যোগাক্ সুধা নিত্য তব পাণপাত্র ভরি';
বসন্তের বৈতালিক
কলকণ্ঠ পিক
নিত্য গাক্ তব স্তুতিগান,
ঊষার অরুণোদয়ে নিত্য যবে খুলিবে নয়ান;
সুনীলিম গগনের গায়
হেসে যাক পূর্ণ চাঁদ, হাসে যথা প্রতি পূর্ণিমায়,
সুকোমল সজ্জা পাতি
চামেলী চম্পক যুঁই জাতি
মেগে' নি'ক সার্থক মরণ,
কঠিন ধরণী 'পরে যেথা তব রাখিবে চরণ;
মনোরথ যদি কিছু অপূর্ণ রহিয়া
অতৃপ্ত কাতর ক্লিষ্ট রেখে থাকে হিয়া,
হোক্ পরিপূর্ণ সব,
আনন্দের নিত্য কলরব
চির বদ্ধ থাক তব অঙ্গনের মাঝে,
তোমারে ঘেরিয়া যেন নিত্য সুখ রাজে।

বসন্তের বর্ণভরা সুবাসিত পুষ্পিত উষায়
কিম্বা কভু শরতের শেফালী সন্ধ্যায়,
আবাসের মণি-হর্ম্ম্যে, প্রান্তরের তরুতল ছায়,
কোন দিন এ জীবনে,
একান্ত আবেগময় স্নেহ সম্মিলনে
আনন্দ পুলক যদি জেগে থাকে মনে,
সে সুখ-স্মৃতিরে বন্ধু, মাঝে মাঝে আনিও স্মরণে;
অম্লান স্নেহের ভারে মনের ভাণ্ডার
পূর্ণ থাক হে জীবন-বান্ধব আমার।

রাঁচি
"নিভৃত কুটীর"
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৫।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

## প্রবাসী অগ্রহায়ণ—

"নিশীথরাতের বাদলধারা" ও "রাতে ও সকালে" রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা; একবার পড়িলে কিছু অস্পষ্ট মনে হইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়বার একটু মনোযোগ করিয়া পড়িলে ইহাদের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। নিশীথ-রাতের বাদলধারা কবিতায় পূর্ণ প্রাণ লাভ করিয়াছে; সে 'অন্ধকারের অন্তরধন,' 'যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে' তখন সে কবির ঘুম হরণ করিয়া 'চোখের জলে সাড়া' দিয়া উঠিতেছে। কবিমাত্রেই অচেতনে চৈতন্য আরোপ করেন, কিন্তু অচেতনকে চেতনে রূপান্তরিত করা, অচেতনের অচেতনত্বটুকু একেবারে লুপ্ত করিয়া দেওয়া সকলের সাধ্য নয়। দ্বিতীয় কবিতাটি মনোজ্ঞ, তবে ইহার ভাব নূতন নয়—লেখকেরই অন্য কবিতায় আমরা এ ভাব পাইয়াছি।

"কবিতার ভাষা ও ছন্দে" শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন বাংলায় accent বা টান ও emphasis বা ঝোঁকের অস্তিত্ব আছে। পদ্যে এই টান এবং ঝোঁক গুলি সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে হইবে, নহিলে পদ্য স্বাভাবিক হইবে না। ছন্দ এবং ঝঙ্কারের খাতিরে কদাচ অস্বাভাবিকরূপে স্বরান্ত উচ্চারণ প্রবর্ত্তন করা চলে না। কথাগুলি ভাল, কিন্তু তাহা কাজে পরিণত করা বড় সহজ নয়। বাংলায় লেখক যাহাকে টান

ও ঝোঁক বলেন তাহা আছে, তাহাদের উড়াইয়া দিবার যো নাই, তবে নূতন নূতন ছন্দে বিশেষতঃ মাত্রাবৃত্তে তাহাদের সব সময়ে মানিয়া চলা যায় না। লেখকের উপদেশ যদি শুনিতে হয়, তাহা হইলে বাংলার অনেকগুলি ছন্দের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। 'পৌষপ্রখর শীতজর্জ্জর ঝিল্লীমুখর রাতি।" এখানে 'পৌষ' 'প্রখর' 'শীত' 'জর্জ্জর' ও 'মুখর' কথাকয়টি হসন্ত শব্দের মত পাঠ করিলেই স্বাভাবিক হয়, কিন্তু তাহাতে ছন্দের লালিত্য ও ছন্দে ভাবের ধ্বনিটুকু প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। বিজয় বাবুর মত মানিলে অনেক ভাল ভাল কবিতা অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্য বঙ্গ সাহিত্য এতগুলি কবিতায় দোষারোপ করিয়া বিজয়বাবুর এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিকে মাথায় তুলিয়া লইবে কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

শ্রীরামলাল সরকার "চীনদেশে ভারতবর্ষের প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে চীনের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছেন। বাংলায় এ আলোচনা নূতন। "প্লেটোর এয়ুথুফোন" শ্রীরজনীকান্ত গুহের রচনা, লেখক বলিতেছেন ইহা মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত। লেখকের বিষয়নির্ব্বাচন প্রশংসনীয়। তিনি যে বিদেশীয় গল্প ও কবিতা যাহার রস ও সৌন্দর্য্য আমাদের দেশ সব সময়ে প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারে না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মনস্বীর জ্ঞানসম্ভার-যাহা দেশের ও সমাজের গণ্ডির বাহিরে, যাহা সমগ্র পৃথিবীর আলোচ্য, যাহার উপর কোন বিশিষ্ট জাতি নয়, সমগ্র মানবজাতির অধিকার আছে. তাহাই বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন, ইহা শুধু আনন্দের বিষয় নয়, ইহাতে বঙ্গবাসীর মনে একটা আশারও সঞ্চার হয়। ইংরাজী ভাষায় কত বিদেশীয় বহুদর্শীদের জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, আর আমরা অন্যের জন্য মুক্তাফলগুলি রাখিয়া দিয়া বিশ্বসাহিত্যের উপকূলে শুধু উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি। আমরা গ্রীক ভাষা জানি না, তবুও অনুবাদটি সুরচিত তাহা বুঝিতে পারি। তবে লেখক স্থানে স্থানে রচনাটির উপর একটা দেশীয় আবরণ দিয়াছেন, এরূপ খাঁটি অনুবাদে তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। সোক্রাটিস একস্থলে 'ও হরি' বলিয়াছেন। 'হরি' কথাটার অর্থ যে ভাবেই লওয়া যাক্ না কেন, সোক্রাটিসের মুখে তাহা একটু হাস্যকর হইয়াছে। লেখকের নিকট আমরা অন্য বিদেশীয় প্রবন্ধের অনুবাদ আশা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত কয়েকটি লালন ফকিরের গান প্রকাশিত হইয়াছে। লালন ফকিরের গানে কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব মিশ্রন ঘটিয়াছে। বাংলার আধ্যাত্মিক সাহিত্যে ফকিরের গান কয়টি রত্নের মত দীপ্ত উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী"তে উন্নত বিজ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবাসীর নিকট একটা উচ্চ উন্নত জগতের চিত্র প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

## ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ—

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক শলিমপুরের পাষাণ-প্রশস্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্বান্বেষীরা এ প্রবন্ধের আদর করিবেন। শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত গল্পচ্ছলে সুললিত ভাষায় ইতালীর গত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। শ্রীবিনয়-কুমার সরকার জাপানের কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়। বিনয়বাবু তাহা করিতেছেন, এবং পরকেও সে জ্ঞান লাভ করিতে সাহায্য করিতেছেন। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্নের "বর্ণমালার সম্মিলনে" সান্ন্যাল পরিবারের চিত্রটি উপভোগ্য, এ চিত্রে যে আনন্দ লাভ করা যায় তাহা স্থায়ী, প্রবন্ধের বাকী অংশের রস ক্ষণিক।

"পাড়ি" শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা—তত্ত্ব ও কবিত্বের সুন্দর মিশ্রন। কবি অশান্ত; তাঁহার আত্মা বন্দী। কিন্তু আজ যখন 'মাঝ আকাশে পাড়ি দিয়ে পৌঁছিল চাঁদ অস্ত লীলাচলে,' তখন তাঁহার 'ছড়িয়ে পড়া' মনটি ভাবের সমুদ্রে ভাসিয়া গেল। তিনি বলিতেছেন—

তোমার শোভার দরবারে নাথ, পাড়ি দেব
মুক্তি-ত্রিবেণীতে,
কেটে যাবে বর্ষা-আঁধার, ভাঙ্গবে স্বপন
মর্ত্ত্য-রজনীতে
তত্ত্বকমল ফুটবে পথে
সত্য-সাগর তরঙ্গে,
ভুবনভরা তপন তারার
কিরণ তারের সারঙ্গে।

ভগবানের শোভার দরবারে কবির আত্মার মুক্তি। কবিতার মধ্যে কবির আকুলতার সুরটুকু মধুর। কবিতাটির দু এক স্থলে অর্থ কিছু অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

## সবুজপত্র-কার্ত্তিক—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক বলেন "আমরা ইভলিউসন্‌পন্থী—সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠছে। আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্ত্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এই উপেক্ষিত বর্ত্তমানই যখন আমাদের অদূর ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয়ত এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।" কথাটা সত্য; তবে লেখক যে বলিয়াছেন "অতীত একটা জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারিদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়, সুতরাং অতীতের গুণকীর্ত্তন করা সহজ বিশেষতঃ চোক বুজে" একথাটা আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। অতীত জড় নয়, ভবিষ্যৎ যদি বর্ত্তমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই যুক্তি অনুসারেই বর্ত্তমানও অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুদূর অতীত হইতে নানা উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি ও জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া একই সত্য ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে যাহাকে আমরা নূতন বলিতেছি তাহাও অতীত-ভূমি হইতে রস গ্রহণ করিয়াই সঞ্জীব হইয়া উঠিয়াছে একথা কি অস্বীকার করা যায়? অতীতের সহিত যদি তাহার সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহা নশ্বর, অচিরস্থায়ী। অতীত রসময়, প্রাণময় ভূমি, জড় নয়; মানুষ যতই ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন, শক্তিলাভ করিবার জন্য তাহাকে এ মাটির স্পর্শ রাখিতেই হইবে। আমরা ইহাই বুঝি, সুতরাং অতীতের গুণকীর্ত্তন চোখ চাহিয়া করাও আমাদের পক্ষে খুব সহজ। লেখক অন্য স্থলে বলিয়াছেন—"আজ কাল লেখকের সংখ্যা অগণ্য, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা অগণ্য, সে ক্ষেত্রে কোনও লেখক-এরণ্ড সাহিত্যক্রমস্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না,—এ বড় কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হলেও একথা সম্পূর্ণ সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোন কোন এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গসাহিত্যের পুরাণো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিঁদুর লেপে অপরকে পূজা করতে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন কেউ না জান্‌লেও তিনি যে একজন বড় লেখক তা সকলেই জানেন —এমন প্রথিতযশঃ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল নয়।" একথার বিশেষ কোন সার্থকতা খুজিয়া পাইলাম না। লেখক যে লেখক-এরণ্ডদের উদ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রেও কম বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবেন, তবে তাঁহাদের নাম বেশী দিন টিকিবে না, সেই জন্য আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তাঁহাদের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার জন্য অপ্রিয় সত্য প্রচার করিয়া আমরা বিশেষ লাভবান হইব না। আর একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি—এমন যদি কোন লেখক থাকেন যাহাকে 'সকলেই' বড় লেখক বলিয়া মান্য করে, মহাবোধিদ্রুম মনে করিয়া সকলেই যাহাকে আশ্রয় করে, তাঁহাকে এরণ্ড বলিতে গেলে বক্তাই বা কোথায় আশ্রয় পাইবেন তাহাত ভাবিয়া পাই না।

লেখক বলিতেছেন—"আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড় শকুন্তলাতত্ত্ব রচনা করিলে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার—অতএব সংক্ষিপ্ত।" একথাটা আমরাও বুঝি। তবে এদেশে শুধু তত্ত্ব নাই, তাহার ভাষ্য টীকা টিপ্পনীও আছে। অনেক তাত্ত্বিক স্বকৃত সূত্রের ভাষ্যও লিখিয়াছেন। সেই জন্য কাব্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ যদি সেই কাব্যের চেয়েও বড় হয়, শুধু তাহাকেই আমরা দোষ বলিয়া মনে করি না। তবে অল্পকথা ফেনাইয়া লিখিবার পক্ষপাতী আমরা নই, একথা সুধীরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। "কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাই চাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য নয়" একথা আমরাও মানিয়া থাকি। তবে কোন নব্য কবিতা যদি স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হয় এবং যদি তাহা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কবিতার কবিত্বের দীর্ঘ বিশ্লেষণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। আমাদের ধারণা দু একটা এইরূপ কবিতার দীর্ঘ সমালোচনা ভাল, তাহাতে

পাঠকের উপকার হইতে পারে, পাঠক সংখ্যাও বাড়িতে পারে। পাঠকদের আমরাও ভক্তি করি তবে অতিভক্তি করি না, কেননা সেটা সাধুতার লক্ষণ নয়।

লেখক বলেন "গতযুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন্—সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব্ব যুগের বঙ্গসাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে তাঁদের তেড়ে ফুঁড়ে উঠতে হয় নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং নূতন এবং অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্‌বৃটিশযুগের বঙ্গসাহিত্যের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না।" কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে প্রাক্‌ব্রিটিশযুগের যদি "কোন" প্রভুত্বই না থাকিত তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বা মাইকেলের পক্ষে বাংলা রচনা করাই সম্ভব হইত না। গত যুগের লেখকেরা তৎপূর্ব্ব যুগের বঙ্গসাহিত্যের চাপের ভিতর হইতেই উঠিয়াছিলেন। Milton বা Scott তাঁহাদের গুরু ছিলেন কি না, ঠিক বলা যায় না তবে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি যে গুরুস্থানীয় ছিলেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। Milton বা Scottএর শক্তি গত যুগের লেখকেরা অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, তখন যে প্রাক্‌বৃটিশযুগের লেখকেরাই তাঁহাদের হাতে কলমে সহায়তা করিয়াছিলেন এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

লেখক অন্যস্থলে বলিয়াছেন—"যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য্য আছে,—একথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্ত্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই।" যিনি যাহাই বলেন তাহাই সত্য হয় না। প্রাচীন কবিদের এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে আমরা ভাবের দিব্যমূর্ত্তিই দেখিয়াছি এবং তাহাতে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় নাই। আর্ট নবীন কবিদের করায়ত্ত হোক আর নাই হোক, সাধনার জিনিস সন্দেহ নাই, তাহাদের ভাবসম্পদও আছে—তবে পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা তাঁহাদের অনেক কবিতা আর্ট অংশে অনেক ভাল একথা বলিতে গেলে অন্যমনস্কতার পরিচয় দিতে হয়। আর্ট বলিতে শুধু ছন্দ, মিল, তাল বা মান বোঝায় না। শব্দের সম্পদ ও সৌন্দর্য্য এবং গঠনের পারিপাট্য প্রভৃতিও বুঝিতে হয়। আজ কাল কতকগুলি কবিতায় ছন্দ, মিল তাল ও মান সুলভ, কিন্তু শব্দের সৌন্দর্য্য ও সম্পদ বা গঠনের পারিপাট্যের একান্ত অভাব। অবশ্য নবীন কবিদের আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে যে রত্ন মিলে না একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নবীন কবিরা যে পথ ধরিয়াছেন, তাঁহারা সে পথে সিদ্ধিলাভ করিবেন, কেহ তাঁহাদের আশা দিক আর নাই দিক। আমরা বরং তাঁহাদের নিরাশার কথা বলিতে প্রস্তুত, তবুও তাঁহারা গতযুগের কবিদের ছাপাইয়া উঠিয়াছেন একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলেও দেশের রীতি অনুসারে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব না। পৃথিবীতে অনেক সত্য আছে, যাহা অনেকেই জানে এবং অনেকেই যাহা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। সেই সত্যগুলিকে প্রকাশ করিতে গেলে সত্যবাদিতার স্পর্দ্ধাই করা হয়,

কাহারও কোন উপকার করা হয় না বরং অপকারই হইয়া থাকে। লেখক বলিয়াছেন "নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিংবা নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জনীর তুলনা করলে, নবযুগের কবিতা পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে।" আশার কথা বটে, তবে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী বা নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জনীর সহিত তুলনা করিলেই নবযুগের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। দেখিতে হইবে পূর্ব্বযুগের কবিতা আর্টের যে ধাপে উঠিয়াছে, নবীন কবিদের কবিতা সে ধাপ ছাড়াইয়াছে কি না। কোন্ নবীন কবি এবং তাঁহার কবিতার নাম করিয়া বিশেষভাবে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতে লেখককে অনুরোধ করি। ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট কথার উপর আমাদের শ্রদ্ধা নাই।

প্রবন্ধে লেখকের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে সংযম প্রয়োজনীয় তাহার কিছু অভাব দেখিলাম। লেখক বলিতেছেন "ইউরোপে আজও গদ্যে এমন এমন নভেল লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের সমান না হলেও রামায়ণের তুল্যমূল্য।" আমাদের দেশের লোকেরা একটু স্বাধীন চিন্তা করিতে বসিলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া বসেন, যাহা খুসি তাহা বলিতে দ্বিধা করেন না, আর স্বাধীন চিন্তা যাহাদের অভ্যস্ত তাঁহারা কিন্তু সংযমের বাঁধনটাকে খুবই মানেন। সে দিন একজন বিদেশী সমালোচক epicএর আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

Its form is so great that it requires a vast volume of thought, and thought of the highest kind, to endow it with dignity, and a genuine powerful source of inspiration to endow it with life Properly it should sum up the thought of an epoch or give expression to the aspiration of a people ; and that is why in the nature of things the great epicscan almost be counted upon the fingerly of two hands. লেখক কয়খানা epicএর নাম করিয়াছেন। তাহার মধ্যে রামায়ণের নামটা বাদ যায় নাই। ইউরোপে আজও এমন নভেল লেখা হয় যাহা ওজনে বা আকারে হয়ত রামায়ণের তুল্য হইতে পারে, কিন্তু "তুল্যমূল্য" এ কথাটা বলিলে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়।

"বলাকা" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা; কবি এখানে কবির ভাষায় স্তব্ধ রাত্রে হংসশ্রেণীর পক্ষধ্বনি তাঁহার অন্তরে যে ভাবরাশি পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। ভাবুক পাঠক এই কবিতার মধ্যে সৃষ্টি যে উত্থানপতন উন্নতি অবনতি ও জন্মমৃত্যুর চক্রের মধ্য দিয়া একটা অস্পষ্ট লক্ষ্যের অনুসরণে উর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে এই তত্ত্বের আভাষ পাইবেন। রজনী স্তব্ধ, কিন্তু কবি বলিতেছেন—

দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কাল জলে—
অন্ধকার গিরিতট তলে
দেওদার সারে সারে,
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে ;

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

রাত্রিতে জোয়ার আসিয়াছে, দেওদারবন স্বপ্নে কথা কহিতে চায়। সকলের মধ্যে একটা শক্তি স্তম্ভিত হইয়া আছে। এমন সময় হংসশ্রেণীর পক্ষধ্বনি।

ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল করি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।

কবির মনে হইল—

* * * এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ!
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিণারা
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাঁশী নিখিলের প্রাণে,
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে'

গতির অন্ত নাই; গতিই সৃষ্টির চরম, স্থিতি কোথাও আছে কিনা কে বলিতে পারে?

কবি নিম্নলিখিত অংশে এই অবিরাম গতির ও প্রযত্নের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর, এ কাজ রবীন্দ্রনাথেরই সাধ্য।

হে হংস বলাকা
আজরাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা;
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—

মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

বর্ণনা মনোজ্ঞ ; দর্শন কাব্যরসে ভরিয়া উঠিয়াছে। উপরের বর্ণনাটুকু পড়িলে মনে হয় কবি চেতন ও জড়জগতের ব্যবধানটুকু চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন, জড় চেতনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

"ঘরে-বাইরে" চলিতেছে ; নিম্নের বর্ণনাটুকু গম্ভীর ও সুন্দর ; গদ্যে এরূপ জিনিস আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ।

"দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এ মিল! এক একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের ক্ষেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারো পরপারে বনের রেখা সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্ এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মত অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েচে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পেয়েচি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারি মত একটি মেয়ে! সে ছিল আপন আঙ্গিনার কোণে—আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েচে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেচে সাম্‌নের অন্ধকারে—একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি, এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠ্‌চে পড়চে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকচে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্চে যেন পেয়েচি, যেন পৌঁছেচি যেন এখন চোখ বুজে চল্লেও কোনো ভয় নেই। না, এত মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধূলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা ত এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েচে কাজ ভুলেচে। এর কাছে কেবল অন্তহীন আবেগ—সেই আবেগে সে চলেচে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েচি, পথও হারিয়েচি। উপায় এবং লক্ষ্য দুই-ই আমার কাছে একেবারে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে, তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবিনে। কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজাল সে যদি আমার সর্ব্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে

আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালের মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে, তারপরে কোথায় ভাল কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি, কোথা কান্না।"

পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কবিতা পড়িতেছি। শব্দসম্পদ, ভাষার মাধুর্য্য মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ কিছুরই অভাব নাই। দেশের চিত্রটি প্রাঞ্জল ভাবে ফুটিয়াছে। সে চিত্রের সৌন্দর্য্যও মনোরম। অস্পষ্ট উদ্দেশ্যের পিছনে অবিরাম গতির বর্ণনায় দর্শনের কথা আছে। ভাবুক পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন; দর্শনের কথা না পাড়িয়া এখানে কবিত্বকেই আমরা উচ্চস্থান দিতে চাই।

## ভারতী অগ্রহায়ণ—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার ইদানীং মাসিক পত্রে যে ভ্রমণকাহিনীগুলি লিখিতেছেন তাহাতে বেশ নূতনত্ব আছে। আমরা সমালোচনায় এরূপ অনেকগুলি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এ ভ্রমণকাহিনীগুলি শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনা নয়, অক্ষম কবির কবিত্ব প্রকাশের ব্যর্থপ্রয়াস এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখক কাজের কথাই বলিতে চান---বিশেষতঃ ভারতবাসীর সমক্ষে এমন কতকগুলি চিত্র তিনি আনিয়া দিতে চান যাহা তাহাদের ভাবাইতে পারে এবং একটা সুনির্ব্বাচিত পথ ধরিয়া লইতে সহায়তা করে। "দুনিয়ার পশ্চিমনগর" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে উক্ত কথা কয়টি মনে আসিল।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "মেরুদণ্ডের বিকাশ" সুখপাঠ্য; শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের "ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য" সাময়িক আলোচনা---এ শ্রেণীর প্রবন্ধ এখন বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

রাবিশের মধ্য হইতে রত্ন বাছিয়া লওয়া সমালোচনার একটা বড় উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা মাসিক সাহিত্যের সমালোচক তাঁহাদের শুধু রত্ন বাছিলে চলে না, রাবিশের মাত্রাও ওজন করিয়া দেখিতে হয় তাহা বাড়িতেছে কি না। দ্বিতীয় কাজটা বড় প্রীতিকর নয় বলিয়া আমরা যথাসাধ্য তাহা ত্যাগ করিয়া ভাল জিনিসের কথাই প্রকাশ করিয়া থাকি। সেই জন্য ভারতীর অন্য প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না স্থির করিয়াছি, তবে ভারতীর ভাষার নমুনা একটি দিতে ইচ্ছা করে---

(১) আয়র্লণ্ড ছেড়ে পারিতে (paris) এলাম—ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় (পৃ ২৩৮) (২) যেমন গঙ্গার মাঝখান দিয়া ষ্টীমার চলিয়া গেলে তাহার আন্দোলন দুই তটকে স্পর্শ করে তেমনি মালতী বাবুদের জনতা ভেদ করিয়া যাইবার সময় দুধারের হৃদয়ে আন্দোলন নাচিয়া উঠিল (পৃ ৭৭১)

উপরের দুইটি উদাহরণ দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন ভারতী ভাষাজ্ঞান হারাইয়াছেন বয়স হইয়াছে কি না। 'ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা' ইংরাজীর অনুবাদ বটে, কিন্তু বাংলা ভাষা নয় দ্বিতীয় উদাহরণে অলংকারের দোষ আছে।

## গৃহস্থ কার্ত্তিক—

কাগজখানি আমাদের ভাল লাগে, কেননা সাধারণ মাসিক পত্রে যে ভাবে বিষয় নির্ব্বাচিত হয়, ইহার বিষয়নির্ব্বাচনে সে ভাবটা প্রবল নয়। কাগজখানি পড়িলেই বোধ হয় ইহার কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বাধীন, পাঠকসাধারণ যাহা চায় তাহাই ইঁহারা পত্রস্থ করেন না, যাহা তাঁহারা দেশের উপকারী বোঝেন তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—এ সংখ্যায় কবিতা গল্প বা উপন্যাস নাই। আজকালকার বাজারে এরূপ কাগজ প্রকাশ করায় সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "মার্কিন রাষ্ট্রের ফেডারাল কেন্দ্র" ও "আটলাণ্টিক বক্ষে" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বত্রই লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এ জাতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা বলিয়াছি। পুনরুক্তি করিতে চাই না। লেখকের অন্তর্দৃষ্টির উদাহরণও অনেক স্থলে আছে। স্থানাভাববশতঃ তাহা উদ্ধৃত করিতে পরিলাম না।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদারের 'ফরাসী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী' ও কোন আমেরিকা প্রবাসীর 'নিগ্রোনায়ক ডুবয়েস্' পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম।

বাংলার বিস্তর মাসিক পত্রের মধ্যে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ একথা বলি না, তবে ইহার স্বাতন্ত্র্য আছে, এবং সে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে দেশের প্রাণের মিলও আছে বলিয়া মনে হয়। এই স্বাতন্ত্র্যটুকু চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

# সাহিত্য-সমাচার

অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার "সাহিত্য-পঞ্জিকা" নামক একখানি বাৎসরিক পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। ইহাতে বঙ্গীয় জীবিত লেখকগণের নাম ও পুস্তকাদির নাম, মাসিক ও অন্যান্য বঙ্গীয় পত্রাদির বৃত্তান্ত, সাময়িক পত্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও বঙ্গদেশীয় পাঠাগারসমূহের তালিকা থাকিবে। এরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশ অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে যে বঙ্গীয় লেখকগণ অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়কে সাহায্য করিবেন। "সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়, মোরাদপুর ( পাটনা ) ঠিকানায় এই সম্বন্ধীয় পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইবে।

---

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ষোড়শী"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

---

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার দ্বাদশ উপন্যাস "জাল জর্ম্মান-গোয়েন্দা" যন্ত্রস্থ। অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
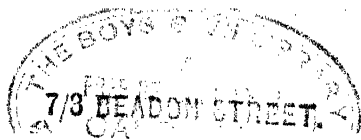
৭ম বর্ষ | মাঘ, ১৩২২ সাল | ২য় খণ্ড
২য় খণ্ড | | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## মানসী

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এম্‌নি নিবিড় করে'
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে'
তাইত আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবন খানি
অকূল মানসসাগরজলে
কমল টলমল।
তাইত আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

শ্রীনগর, ৭ই কার্ত্তিক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ

জীবজগতে মানবের স্থান সর্ব্বোচ্চে। গরিলা, বনমানুষ ও ভল্লুকাদি জীবগণ আবহমানকাল একই অবস্থায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রবল পীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছে। বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাবকে গর্ব্ব বা ব্যর্থ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখ সচ্ছন্দে বসবাসের ইচ্ছা ইতরজীবের মধ্যে কখনও দেখা দেয় না। নতুবা তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবে কেন? মানবগণ জীব পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ অন্যান্য জীবগণ যাহা করিতে পারে নাই মানব তাহা কিরূপে আয়ত্ত করিবে ইহা কৌতূহলের বিষয় নহে কি?

উদ্ভিদ ও ইতর জীবের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত দুইটি প্রবল শক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রথমটি ক্ষুন্নিবারণ ও তদ্বারা আত্মরক্ষা; দ্বিতীয়টি সন্তানোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা। আহার্য্য সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদদিগকে জীবের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে হয় না, কারণ মৃত্তিকা হইতে রসের সহিত আবশ্যক খাদ্য সংগৃহীত হয় কিন্তু বংশরক্ষার জন্য বীজোৎপাদন ও অসহায় উদ্ভিদশিশুর সুবিধার জন্য বীজমধ্যে বীজপত্র বা "ডাল" আকারে খাদ্য সংস্থান (যেমন ছোট, মটরাদির বীজে) ছায়াময় তলদেশ পরিত্যাগ করতঃ দূরবর্ত্তী উর্ব্বরভূমিতে গমনের সুবিধার জন্য বীজের মস্তকে তূলার মুকুট (আকন্দ বীজে) পশুপক্ষী ও মনুষ্যের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কঠিন বীজাবরণের চতুর্দ্দিকে সুমিষ্ট শাঁস (আম জাম) নিকটস্থ সমুদ্র বারির হস্ত হইতে রক্ষার নিমিত্ত ছোব্‌ড়া (নারিকেল) পশ্বাদির গ্রাস হইতে পরিত্রাণের জন্য হুল (ধান, যব, গম) ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য উপায় সকলের আশ্রয় লইতে হয়।

পশ্বাদি নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে আহারান্বেষণ ও সন্তানপালন নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। অসহায় শিশুসন্তান রক্ষার জন্য মাতাকেই সমধিক সচেষ্ট দেখা যায়। বিড়ালের গ্রাস হইতে বিড়ালী, বানরের হস্ত হইতে বানরী সন্তান রক্ষার ও পালনের জন্য কত অসুবিধাই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বয়স্ক ও সক্ষম হইলে সন্তানের সহিত মাতার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। মানব সমাজে এই নিয়মের অনেকটা অন্যথা দেখা যায়।

আদিম অবস্থায় মানবগণ পশুদিগের ন্যায় বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অরিনকো নদীতটে ও অষ্ট্রেলিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে

এখনও এইরূপ মানবপশুর অভাব ঘটে নাই। ক্ষুন্নিবারণের পক্ষে একাকী ভ্রমণ উপযোগী হইলেও সন্তানোৎপাদনের জন্য সঙ্গিনীর আবশ্যক। আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার সুবিধার জন্যও মহিষাদি অনেক জীবকে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ফলমূলাদির অপ্রতুলতাবশতঃ কষ্ট সহ্য করে তথাপি আপন পেটের জন্য হনুমানেরাও দলত্যাগ করে না। ইহাদিগের ভিতরে সন্ন্যাসী বা পুরুষেরা একদলে ও মেয়েরা অপর দলে বিভক্ত হইয়া বাস করে।

অসভ্য বা স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা দেখা যায় না। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া পশু শিকার করে ও আপনাপন দলের মেয়েরা পুরুষদিগের সাধারণের স্ত্রীরূপে গণ্য হইয়া থাকে। সন্তানেরাও সাধারণের সন্তান বলিয়া বিবেচিত হয়। উহাদিগের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন বলিয়া কোন পদার্থ দেখা যায় না। হিমাচলের তিব্বত সীমাস্থ হিন্দুদিগের মধ্যেও এই প্রথার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে ভ্রাতৃগণ বা বিভিন্ন বর্ণের ধর্ম্ম-ভ্রাতৃগণ একই স্ত্রীলোককে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাচীন আরব সমাজে ও মোতা বা সম্মিলিত বিবাহ প্রচলিত ছিল।

রক্তের সৌসাদৃশ্যবশতঃ ভ্রাতাভগিনী বা তৎসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষের মিলনে সন্তান রুগ্ন হইয়া থাকে। অসভ্য সমাজের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের মিলনের পক্ষে বাধা দেখা না গেলেও বাস্তবিকই এই অনিষ্টকর প্রথার প্রচলন নাই মানুষের কথা দূরে থাকুক উদ্ভিদ সমাজেও ইহা পরিত্যাজ্য। ভ্রাতাভগিনী সম্পর্কীয় পুষ্পগণ একই স্থলে আবদ্ধ থাকিলেও পুংপুষ্পের রেণু স্ত্রীপুষ্পকে নিষিক্ত করে না। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম সর্ব্বত্রই অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। কে সহজে উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে? স্বাভাবিক প্রবৃত্তির গুণেই অসভ্যগণ নানাবিধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সগোত্রে মিলিত হয় না। ফলতঃ এই আদিম মানব সমাজ নরপশু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মানবের এই আদ্যযুগ।

এই পশুভাব কিরূপে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল তাহা স্থির করা নিতান্তই দুরূহ। তবে ইহার পরেই যে গোষ্ঠীপতি (Patriarchal) সমাজের সৃষ্টি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। বন্য মানবগণ যখন মৎস্য বা পশুশিকারের জন্য পশুবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত তখনও উহাদিগের মধ্যে সম্পত্তির উহার অধিকারের ধারণাই থাকিতে পারে না। মেষ, হস্তী প্রভৃতি অনেক পশু-

সহজেই মানবের বশীভূত হইয়া থাকে। আহার্য্য সংগ্রহের জন্য অনিশ্চিত বন্যপশুর অনুসরণ অপেক্ষা পশুপালন অবশ্যই অধিকতর সুবিধা জনক; উহাদিগের মাংস হইতে নিয়মিতরূপে খাদ্য সংস্থান ও চর্ম্মদ্বারা শীত নিবারণের উপায় কেহ একবার আবিষ্কার করিলে অন্যেরা উহা অনুকরণ করিয়া থাকে। পোষিত জীবের অধিকারী সমাজে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। "ধনবান্ বলবান্ লোকে" ধনবান ব্যক্তি সংসারে চিরকালই প্রবল হয়। সুতরাং সে যে পোষিত জীবটিকে সাধারণের ভোগ্য হইতে না দিয়া নিজস্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহার প্রতি সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় তাহাকে রক্ষার জন্য লোকবলের প্রয়োজন। সভ্য সমাজেরও স্ত্রী এবং পুত্রকন্যার ন্যায় সহায় মানুষের পক্ষে বিরল। সুতরাং ভরণপোষণের সামর্থ্য অনুসারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং তাহাদিগের বহু সংখ্যক সন্তানদ্বারা লোকবল বৃদ্ধি সমাজে স্বাভাবিক প্রথা হইয়া উঠে। এই অবস্থায় রাক্ষস বিবাহের উৎপত্তি হয়; সকলেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণে ব্যস্ত হইলে "পাশবিক বল" প্রয়োগ বা যুদ্ধ দ্বারা কন্যা সংগ্রহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। রাজপুত জাতির মধ্যে এইরূপ রাক্ষস বিবাহের চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু রাক্ষস বিবাহদ্বারা কন্যা সংগ্রহকরা সকলের পক্ষে সকল সময় সুবিধাজনক নহে। সুতরাং গবাদি পশু (অর্থ) বিনিময়ে কন্যা সংগ্রহের প্রথা প্রাদুর্ভূত হয়। সাঁওতালেরা আজপর্য্যন্ত অনেকস্থলে কন্যার পিতাকে একটি ষাঁড় (গরু) প্রদান করিয়া থাকে। মুদ্রা আবিষ্কারের পর হইতে অর্থ বিনিময়ে স্ত্রী সংগ্রহের প্রথা আবির্ভূত হইয়াছে। শিমলা অঞ্চলের পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে উহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সভ্য সমাজেও কর্ম্মকার গোয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্ত্রী ক্রয়ের প্রথা অদ্যাবধি লোপ পায় নাই।

এইরূপ সমাজে গোষ্ঠীপতি স্ত্রী ও সন্তানগণের কর্ত্তা হইয়া থাকে। পালিত পশুর ন্যায় স্ত্রী ও তাহার গর্ভজ সন্তান স্বামীর সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। উহাদিগের শ্রমলব্ধ দ্রব্যাদি গোষ্ঠীপতির নিজস্ব হইয়া থাকে। শস্য যেরূপ ক্ষেত্রস্বামীর অধিকারে থাকে, ক্রীতাদাসীর সন্তানও সেইরূপ ক্রেতার সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। তিব্বত সীমাস্থিত হিন্দু বুসাহর রাজ্যে অদ্যাবধি এইরূপ ক্ষেত্রজ সন্তান প্রথার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এইরূপ ক্ষেত্রজ সন্তান ছিলেন।

এই অবস্থায় পরলোকের অসুবিধা দূরীকরণ উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে মৃতস্বামীর সহিত নিহত করা হয়; এই সময়েই সতীদাহ প্রথার সৃষ্টি হয়। এই অভাব দূরীকরণার্থে অশ্ব ও ভৃত্যাদির পর্য্যন্ত সমাধির ব্যবস্থা হয়। সতী হইতে অস্বীকৃতা স্ত্রীলোক এইকালে দেবরের ভোগ্য হইত। উড়িষ্যায় অদ্যাপিও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেবরকে "ঘটে" বা বিবাহ করার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও তজ্জন্য অক্ষম স্ত্রীজাতি গবাদি পালিত পশুর ন্যায় পুরুষের সম্পত্তি বিশেষ হইয়া থাকে। গোষ্ঠীপতির মৃত্যুতে স্ত্রী অন্যের অভাবে আপন সন্তানের অধীন হইতে বাধ্য হয়। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সমাজে আদৌ স্বীকৃত হয় না। স্ত্রীজাতির উপর গোষ্ঠীপতির এতাদৃশ আধিপত্য জন্মে যে ব্যভিচারিণীর গর্ভজ কুণ্ড সন্তানও ঔরসজাত সন্তানের অধিকার পায়। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর কুণ্ড সন্তান। অবিবাহিতা কন্যার কানীন পুত্রও মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে (কর্ণ কুন্তীর কানীনপুত্র)। এরূপস্থলে অবশ্য মাতুলের অভাব থাকা আবশ্যক। এমনকি ঔরসজাত, কুণ্ড, ক্ষেত্রজ ও কানীন পুত্রের অভাবে ক্রীতদাসও গোষ্ঠীপতির সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক-দিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। অদ্যাবধি হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে উপপত্নীর গর্ভজ সন্তানও বংশের ভৃত্য বলিয়া গণ্য হয় এবং ভরণ-পোষণের জন্য সাধারণ শস্যক্ষেত্রের একাংশ ভোগ করিয়া থাকে।

সগোত্র বিবাহ অপকারমূলক। ইহা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ সন্তান লাভের অন্তরায়। মেষাদি পশুপালন দ্বারা এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মধ্যে উহার প্রচলন হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান অসগোত্র বিবাহের ইহাই মূল সূত্র বলিয়া মনে হয়। এইরূপ সমাজেই পশুপালনের প্রাধান্য দেখা যায় তৃণাদির অন্বেষণে গোষ্ঠীপতিকে সদলবলে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে হয়; এইরূপেই যাযাবর সমাজের সৃষ্টি হইয়া থাকে! এই অবস্থায় পিতৃপিতামহের পূজার প্রথা উদ্ভূত হয়। চীনদেশে উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দু সমাজের শ্রাদ্ধাদি উহারই স্মৃতিচিহ্নমাত্র। এই অবস্থায় জ্ঞাতিত্বের উৎপত্তি। কন্যা-জামাতার সম্পত্তিও ভিন্নগোত্রা হইয়া যায় সুতরাং ভ্রাতাবর্ত্তমানে পিতার সম্পত্তিতে তাহার অধিকার না জন্মিবারই কথা। সন্তান হীনের পক্ষে পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা এই অবস্থাতেই সম্ভব। ফলতঃ গোষ্ঠীপতি সর্ব্বেসর্ব্বা। দলের অন্যান্য গোষ্ঠীপতিগণের মতামত ভিন্ন স্ত্রী পুত্রের পক্ষে

তাহাকে সংযত করা অসম্ভব। এই অবস্থায় শালিশী প্রথার উৎপত্তি হয়। গোষ্ঠীপতিগণের মধ্যে একজন সর্ব্বসম্মতিক্রমে মণ্ডল বা দলপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গোয়ালা সমাজে মণ্ডলের প্রাধান্য সম্যক্ বিদ্যমান রহিয়াছে।

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশুচর্ম্মের পরিবর্ত্তে বল্কলবাস ও কুশনির্ম্মিত মেথলা (Belt) বা কোমরবন্ধের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি অনেক অসভ্য জাতি পত্রাদিদ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। ক্রমে সমাজমধ্যে পশু-বিনিময় প্রথার সৃষ্টি হয়। পরে যখন নিরঙ্কুশ গোষ্ঠীপতি পশুপালকে হস্তান্তর দ্বারা আপন পরিবারবর্গকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে তখন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের "দাবী" স্বীকৃত হয়। ইহাই মিতাক্ষরার মূল সূত্র মনে হয়।

পালিত পশুমাংস খাদ্য সংস্থানের পক্ষে সহায় হইলেও বৃহৎ পরিবারের জন্য অনুরূপ পশুপালনের আবশ্যক। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও শিলাবৃষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে বৃহৎ পশুপালকে রক্ষা করা অসম্ভব। এই কারণে বাধ্য হইয়া যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিকার্য্যের সূত্রপাৎ অবশ্যম্ভাবী। পশুগণ কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে। কৃষিসহায় অত্যাবশ্যক পশুদিগকে মাংসের জন্য হত্যাকরা মূঢ়তার কার্য্য মনে হয়। ক্রমে ঐ সকল পশুর অযথা বিনাশ সমাজে দূষণীয় হইয়া উঠে; মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি গোধন পূজা করিয়া ঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করে। এইরূপে উষ্ট্র, গো, মহিষাদি পূজার উদ্ভব হয়। কৃষি সাহায্যে অন্ন সংস্থানের উপায় হওয়ায় যাযাবর-সম্প্রদায় ক্রমে পল্লীবাসী হইয়া উঠে ও গ্রামের সৃষ্টি হয়।

আম মাংসভোজী মানবসমাজে রন্ধন প্রথার উদ্ভব সম্বন্ধে চীনদেশে একটি কৌতূহলজনক প্রবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি রুগ্ন শূকর শাবককে পর্ণকুটীরেআবদ্ধ রাখিয়া শিশুপুত্রের উপরে উহার রক্ষণের ভার ন্যস্ত করতঃ পিতামাতা স্থানান্তরে গমন করে। ক্রীড়াকালে বালকের হস্তস্খলিত অগ্নি কুটীরখানিকে দগ্ধ করে। ঐ সঙ্গে শূকর শাবকটিও দগ্ধ হইয়া যায়। প্রিয় ছানাটির অকালমৃত্যুতে দুঃখিত বালকটি উহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করিতে যায়। অঙ্গুলির গাত্রে দগ্ধ অত্যুষ্ণ মাংসখণ্ড সংলগ্ন হওয়ায় শিশুস্বভাববশতঃ বালকটি অঙ্গুলিকে মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাহযন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করে। যন্ত্রণা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ মাংসের সুস্বাদ পাইয়া বালকটি অঙ্গুলি সাহায্যে ক্রমশঃ উহার অধিকাংশ উদরস্থ করে।

মাতা আসিয়া পুত্রকে দগ্ধ শূকরমাংস ভক্ষণ করিতে দেখে। বালকের আগ্রহাতিশয়ে মাতাও উহার আস্বাদ গ্রহণ করে। স্ত্রীর অনুরোধে পিতাকেও "অস্বাভাবিক" খাদ্য ভক্ষণ করিতে হয়। পরে গৃহদাহ উপলক্ষে শূকরশিশু দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা ঐ পরিবারের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠে। ঘন ঘন গৃহদাহ হইলেও গোষ্ঠীপতিকে অবিচলিত দেখিয়া প্রতিবেশিগণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ক্রমে ঐ অদ্ভুত কার্য্যের জন্য গোষ্ঠীপতি-সমাজে ঐ পরিবার বিচারার্থ আনীত হয়। বিচারকগণ দগ্ধমাংস ভক্ষণান্তে উহার শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোপনে নিজেরাও ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ক্রমে মাংস দাহ হইতে রন্ধন প্রথার উদ্ভব হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভিন্ন গোত্রের প্রবেশ নিষেধ হয় এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে ক্রমে সকলেরই সমান অধিকার জন্মে। তাহার ফলে প্রতিযোগিতার অভাবে ঐ পরিবার বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না। এইজন্যই গোষ্ঠীপতি-সমাজ অনুন্নত অবস্থায় থাকে!

নদ, নদী, সমুদ্র, উর্ব্বর সমতলক্ষেত্র, অনুর্ব্বর মরুভূমি ও পর্ব্বতাদি প্রাকৃতিক পদার্থের প্রভাবে মানবগণ সভ্যতার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। বন্য ফলমূল, পশু ও মৎস্য মাংসাদির অনিশ্চয়তা আদিম মানবকে পশুপালনে প্রবৃত্ত করে এবং তৎপরে পশুচারণের সুবিধার জন্য উর্ব্বর তৃণক্ষেত্রের সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে অবশেষে কৃষিকার্য্যের আবিষ্কার হয়। নদীমাতৃক নাতিশীতোষ্ণ উর্ব্বর প্রদেশ সকল কৃষিকার্য্যের উপযোগী। ঐ সকল প্রদেশে বহুসংখ্যক গোষ্ঠীপতি বসবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় পরস্পরের স্বার্থ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ক্রমে একটা সামঞ্জস্য দেখা দেয় ও সমাজের সৃষ্টি হয়। সভ্যতার দিকে মানবগণ আর একপদ অগ্রসর হয়। আর্য্যাবর্ত্ত চীন ও মিশরের সভ্যতা তাহার প্রমাণ।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেরূপ হিংস্র জীব জন্তুর হস্ত হইতে অপঘাত মৃত্যু নিবারিত হয়, অন্যদিকে সেইরূপ ভূতপ্রেত, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়া-ফোঁকা প্রভৃতির বিলোপ হইয়া রোগ নিবারণের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। অপঘাত:মৃত্যু নিবারণ ও প্রচুর আহার্য্যের ফলে লোকের বংশ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। উহার ফলে পরিবার মধ্যে পুনরায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন দুঃসাহসিক নেতার অধীনে সাহসী যুবক সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া লুণ্ঠনে বহির্গত হয়, শ্রমসাধ্য অনিশ্চিৎ কৃষিকার্য্যের পরিবর্ত্তে ক্রমে লুণ্ঠন ও যুদ্ধকার্য্য

ইহাদিগের উপজীবিকা হইয়া উঠে। একদিকে শত্রু হইতে আত্মরক্ষা; অপরদিকে লুণ্ঠন দ্বারা উপজীবিকা সংগ্রহের ফলে সমাজে লাঠিয়াল বা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এইরূপেই চেঙ্গিস খাঁ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ দস্যু দলপতির অভ্যুত্থান হইয়া থাকে।

শান্তির সময়েই কৃষি, শিল্প ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব। লাঠিয়াল সম্প্রদায় বা বহিশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য লোকে দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতে বাধ্য হয়। তখন বৃহৎ পল্লী বা নগরের সৃষ্টি হয়। গ্রীস, ইতালী ও জর্ম্মণীতে এইরূপ নগর উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ঐ সকল নগরী পরস্পরকে সাহায্য করে ও ক্রমে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। দুর্দ্দমনীয় দস্যুদলপতি নগরাদি জয় করিয়া সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করে। পরাজিত শত্রুগণ বশ্যতা স্বীকার করে ও বিজেতাকে ভবিষ্যতে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়া নিষ্কৃতি পায়। এইরূপেই ইউরোপে সামরিক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। কিছুকাল শান্তির ফলে সমাজমধ্যে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিপায়। আবার অন্নচিন্তা আসিয়া মানবকে সভ্যতার দিকে আর একদল অগ্রসর হইতে বাধ্য করে। সাহসী লোকেরা দূর দূরান্তরে গমন করিয়া নূতন নূতন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। আদিম আর্য্যগণ যে কারণে আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ ও বিন্ধ্যগিরির পরপারে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হ'ন ইউরোপীয়গণও সেইরূপ নানা কারণে সুদূর সমুদ্র পারে আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশ সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। আদিম অধিবাসিগণ অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লয়। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের অত্যাচারে বাধ্য হইয়াই কোল, ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিকে হিমাচলের উপত্যকা ও ক্রমে অধিত্যকায় আশ্রয় লইতে হয়।

ধূম্রের ন্যায় জ্ঞান কখন এইস্থানে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এইজন্যই ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা সমতলের সভ্যতা ক্রমেই পার্ব্বত্য উপত্যকা ও তথা হইতে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি দেবীর সযত্নপালিত প্রথম সন্তান উর্ব্বর সমতল প্রদেশে অত্যধিক আদরের ফলে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে—অকূল সমুদ্র, অত্যুচ্চ পর্ব্বত প্রাচীর, ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ প্রকৃতির অপরিসীম শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেয়। লোকে অবনতমস্তকে প্রকৃতির উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির শান্তির জন্য পূজা করিতে শিখে।

কিন্তু অনুর্ব্বর উপত্যকাবাসী অযত্নপালিত আত্মনির্ভরশীল দ্বিতীয় সন্তান মাতার ভয়ে ভীত না হইয়া বরং তাঁহাকেই বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা পায়। ফলে গ্রীস, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে পার্ব্বতীয়গণ সভ্য হইয়া উঠে। হানিবল নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরগণ সসৈন্যে অবলীলাক্রমে প্রকৃতির শাসন অগ্রাহ্য করিয়া আল্‌পস পর্ব্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করে।

বাল্যকাল হইতে কখন বাত্যাতাড়িত উত্তাল তরঙ্গমালাবিক্ষোভিত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি, কখন বা নির্ব্বাত নিষ্কম্প মনোরম কমলা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমুদ্রতটবাসী মানবগণ জলে প্রভুত্ব স্থাপন দমন করিবার জন্য ভেলা, তরণী, অর্ণবযান ও বাষ্পীয়-পোতের সৃষ্টি করে। এক্ষণে দূরত্বের ব্যবধান অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া যায়। বাণিজ্যের ব্যপদেশে লোকে দূর দূরান্তে গমনাগমন করিতে শিখে। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও সংবাদবহ টেলিগ্রাফের উদ্ভব হওয়ায় দূরত্বের ব্যবধান প্রকৃতপক্ষে একেবারেই কমিয়া যায়।

গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া লোকে নিত্য নূতন রত্নের আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। কেহ বা তারহীন টেলিগ্রাফ, কেহ বা আকাশচারী "পুষ্পকরথের" সৃষ্টি করে। প্রকৃতিদেবী বয়স্থ সন্তানদিগকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীর বা বীচিবিক্ষোভিত বিকট সমুদ্র দেখাইয়া আর আপন অঙ্কে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া প্রকৃতির যে বাধাকে মানবগণ অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল আজ তাহা সফল হয়—পর্ব্বত ও সমুদ্রের ন্যায় আকাশও বিজিত হয়। বর্ত্তমান মহাসমরে আমরা বিমানচারী পুষ্পকরথের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। ইহারই ফলে অদূর ভবিষ্যতে সুইজারলণ্ড, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পর্ব্বতবাসিগণ ক্রমে অনায়াসে দূর দূরান্তে গমন করিয়া নবনব জ্ঞান সঞ্চয়ের অবসর পাইবে। সমতল ও উপত্যকা ছাড়িয়া সভ্যতা এইবার অধিত্যকা আক্রমণ করিবে। ফলতঃ অন্নচিন্তাই উন্নতির মূল এবং প্রকৃতিই মানব সভ্যতার নিয়ামক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায়।

# প্রেয়সী-মঙ্গল।

## ( উর্ব্বশী-ছন্দ )

প্রণয়-সাগর মথি' কি অমৃত-পাত্র ল'য়ে হাতে,—
জীবনের নবীন প্রভাতে,—
যৌবন-নিকুঞ্জ-দ্বারে এলে তুমি স্বর্গের অতিথি ;
তোমার চরণ-স্পর্শে আনন্দের উঠে কল-গীতি,
স্নিগ্ধ সুধাধারা তব আনে প্রাণে নব উন্মাদনা,
স্বপ্ন ? মায়া ? ভ্রান্তি একি ? হোল বুঝি বিলুপ্তচেতনা,—
সব আরাধনা
তোমাপানে গেল ছুটি' প্রেম-অর্ঘ্যে তোমারে অর্চ্চিতে,
অয়ি শুচিস্মিতে !

শত জন্মজন্মান্তরে তুমি ছিলে আমার প্রেয়সী,
মম হৃদিচকোরের শশী ;
কত যুগ যুগ ধরি' আমি ছিনু তোমারে ঘিরিয়া।
তব হৃদয়ের মাঝে লুপ্ত হয়ে ছিল মোর হিয়া,
তব কণ্ঠলগ্ন ছিল যুগে যুগে এই বাহুদু'টি,
তোমার পরশ পেয়ে প্রেম-পুষ্প উঠিত গো ফুটি',
মধু যেতো লুটি' ;—
এক হয়ে আছি দোঁহে বিধাতার কি যাদু-মন্তরে
কত কল্পান্তরে !

কল্পনা-কোরক-মাঝে ছিলে তুমি এতদিন ধরি'
ফুটিতে না ফুটি' ফুটি' করি' ;—
সহসা একদা প্রাতে হেমপদ্ম উঠিল বিকশি',
পদ্মাসনা তুমি তাহে রূপোচ্ছল যেন পূর্ণশশী ;—
তোমার অমৃতস্পর্শে লুপ্ত হোল সব শ্যামলিমা,
তব জ্যোতিকণা পেয়ে ধুয়ে গেল হিয়ার কালিমা
দিগ্বলয়-সীমা
কি স্বপ্ন-পুলক-মাঝে ভরি' গেল আনন্দ-চন্দনে,
অয়ি স্মেরাননে !

অপ্সরানিন্দিত-কায়, মূর্ত্তিমতী যেন সরলতা,
নয়নের পূর্ণ-সফলতা!
পুঞ্জ পুণ্য ফল যথা নামি' আসে সাধকের পাশে,
নন্দন-কানন-শোভা কবির নয়নে যথা ভাসে,
চাঁদের স্বপন-খেলা উছলিত সাগরের বুকে,
বসন্তের পুষ্পমেলা ধরা যথা দেখে মনসুখে;
আমার সম্মুখে
তেমতি উঠিলে জাগি' শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের অপ্সরী,
লো স্বপ্ন-সুন্দরী!

মঙ্গলের হেম ঝাঁপি হাতে লয়ে অন্নদার সম,
যবে তুমি এলে গৃহে মম,
আমার অদৃষ্ট-পদ্ম স্বর্ণদল উঠিল বিকশি'
নিরানন্দ-গৃহ-মাঝে বাজিল গো উৎসবের বাঁশী,
স্বর্গের সৌরভ যেন ছেয়ে গেল সংসারের মাঝে,
প্রকৃতি সেদিন হতে সাজিতেছে নিত্য নব সাজে,
শুভ শঙ্খ বাজে;—
গৃহলক্ষ্মী আছ বসি' মম হৃদি-কমল আসনে,
অয়ি বরাঙ্গনে!

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।

# জন্মান্তর*

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকখানি মাসিক-পত্রিকায় জন্মান্তরবাদের আলোচনা হইয়াছিল। এক পক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পুনর্জন্ম হইতেই পারে না—অন্য পক্ষ পুনর্জন্মবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। আমি এই দ্বিতীয় দলভুক্ত।

জীব মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ করে কি না, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ নাই।

* কৃষ্ণনগর সাহিত্য-পরিষদের কার্ত্তিক মাসের অধিবেশনে পঠিত।

আমাদের পুরাণে এবং থিয়সফির সাহিত্যে ব্যক্তিবিশেষের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু সেই সকল ইতিহাস প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জন্মান্তরবাদ যুক্তি-হীন নহে—অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবের দেহান্তরে পুনর্জন্ম হইলেও হইতে পারে এবং জন্মান্তরের কোন a priori অসম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, যদি জন্মান্তর থাকে, তবে আছে এবং যদি না থাকে, তবে নাই; সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া লাভ কি? ইহার উত্তরে আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিলে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, ব্যবহারে না লাগিলেও কেবল জ্ঞানের জন্য এবং সত্য নির্দ্ধারণের জন্য সর্ব্বপ্রকার আলোচনাতেই আমাদের আত্মিক উন্নতি হয়। চন্দ্র এবং মঙ্গল গ্রহে কোন জীবের বসতি আছে কি না, তাহার আলোচনা আমাদের কোন ব্যবহারেই আসে না, অথচ তাহা লইয়াও বৈজ্ঞানিকদিগের কত তর্ক বিতর্ক হইতেছে। সুতরাং আমার প্রার্থনা এই যে, সকলেই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রণিধান করিবেন।

প্রথমেই জন্মান্তরবাদের ইতিহাসের কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। জন্মান্তরবাদ যে, কেবল ভারতবর্ষেরই সম্পত্তি, তাহা নহে। পূর্ব্বকালে গ্রীক্ এবং সেমিটিক জাতির মধ্যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ছিল। খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরস্ জন্মান্তরবাদ মানিতেন। বাইবেল পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টের সময় পর্য্যন্ত ইহুদীরা জন্মান্তরবাদ মানিতেন। খ্রীষ্ট একদা তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কে? এ বিষয়ে লোকে কি বলে?" একজন শিষ্য উত্তর করিলেন "কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, আপনি ভাববাদী যিরিমিয় ( Je. miah )।" ভাববাদী যিরিমিয় কিন্তু খ্রীষ্টের ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তখন ইহুদী দেশে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস ছিল। অন্যত্র যিশুখ্রীষ্ট শিষ্য-দিগকে বলিলেন যোহন কে? এ বিষয়ে তোমাদের কি মত?" ইহার পর তিনি নিজেই বলিলেন "যোহন পূর্ব্বে ঈলীয় ( Elias অথবা Elijah ) ছিলেন।" ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যিশুখ্রীষ্টও পুনর্জন্মবাদে অবিশ্বাস করেন নাই।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় অনুসরণ করা যাউক। আমি এই প্রবন্ধে

কিন্তু অনুর্ব্বর উপত্যকাবাসী অযত্নপালিত আত্মনির্ভরশীল দ্বিতীয় সন্তান মাতার ভয়ে ভীত না হইয়া বরং তাঁহাকেই বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা পায়। ফলে গ্রীস, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে পার্ব্বতীয়গণ সভ্য হইয়া উঠে। হানিবল নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরগণ সসৈন্যে অবলীলাক্রমে প্রকৃতির শাসন অগ্রাহ্য করিয়া আল্‌পস পর্ব্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করে।

বাল্যকাল হইতে কখন বাত্যাতাড়িত উত্তাল তরঙ্গমালাবিক্ষোভিত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি, কখন বা নির্ব্বাত নিষ্কম্প মনোরম কমলা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমুদ্রতটবাসী মানবগণ জলে প্রভুত্ব স্থাপন দমন করিবার জন্য ভেলা, তরণী, অর্ণবযান ও বাষ্পীয়-পোতের সৃষ্টি করে। এক্ষণে দূরত্বের ব্যবধান অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া যায়। বাণিজ্যের ব্যপদেশে লোকে দূর দূরান্তে গমনাগমন করিতে শিখে। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও সংবাদবহ টেলিগ্রাফের উদ্ভব হওয়ায় দূরত্বের ব্যবধান প্রকৃতপক্ষে একেবারেই কমিয়া যায়।

গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া লোকে নিত্য নূতন রত্নের আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। কেহ বা তারহীন টেলিগ্রাফ, কেহ বা আকাশচারী "পুষ্পকরথের" সৃষ্টি করে। প্রকৃতিদেবী বয়স্থ সন্তানদিগকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীর বা বীচিবিক্ষোভিত বিকট সমুদ্র দেখাইয়া আর আপন অঙ্কে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া প্রকৃতির যে বাধাকে মানবগণ অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল আজ তাহা সফল হয়—পর্ব্বত ও সমুদ্রের ন্যায় আকাশও বিজিত হয়। বর্ত্তমান মহাসমরে আমরা বিমানচারী পুষ্পকরথের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। ইহারই ফলে অদূর ভবিষ্যতে সুইজারলণ্ড, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পর্ব্বতবাসিগণ ক্রমে অনায়াসে দূর দূরান্তে গমন করিয়া নবনব জ্ঞান সঞ্চয়ের অবসর পাইবে। সমতল ও উপত্যকা ছাড়িয়া সভ্যতা এইবার অধিত্যকা আক্রমণ করিবে। ফলতঃ অন্নচিন্তাই উন্নতির মূল এবং প্রকৃতিই মানব সভ্যতার নিয়ামক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায়।

# প্রেয়সী-মঙ্গল।

## ( উর্ব্বশী-ছন্দ )

প্রণয়-সাগর মথি' কি অমৃত-পাত্র ল'য়ে হাতে,—
জীবনের নবীন প্রভাতে,—
যৌবন-নিকুঞ্জ-দ্বারে এলে তুমি স্বর্গের অতিথি ;
তোমার চরণ-স্পর্শে আনন্দের উঠে কল-গীতি,
স্নিগ্ধ সুধাধারা তব আনে প্রাণে নব উন্মাদনা,
স্বপ্ন ? মায়া ? ভ্রান্তি একি ? হোল বুঝি বিলুপ্তচেতনা,—
সব আরাধনা
তোমাপানে গেল ছুটি' প্রেম-অর্ঘ্যে তোমারে অর্চ্চিতে,
অয়ি শুচিস্মিতে !

শত জন্মজন্মান্তরে তুমি ছিলে আমার প্রেয়সী,
মম হৃদিচকোরের শশী ;
কত যুগ যুগ ধরি' আমি ছিনু তোমারে ঘিরিয়া।
তব হৃদয়ের মাঝে লুপ্ত হয়ে ছিল মোর হিয়া,
তব কণ্ঠলগ্ন ছিল যুগে যুগে এই বাহুদু'টি,
তোমার পরশ পেয়ে প্রেম-পুষ্প উঠিত গো ফুটি',
মধু যেতো লুটি' ;—
এক হয়ে আছি দোঁহে বিধাতার কি যাদু-মন্তরে
কত কল্পান্তরে !

কল্পনা-কোরক-মাঝে ছিলে তুমি এতদিন ধরি'
ফুটিতে না ফুটি' ফুটি' করি' ;—
সহসা একদা প্রাতে হেমপদ্ম উঠিল বিকশি',
পদ্মাসনা তুমি তাহে রূপোচ্ছল যেন পূর্ণশশী ;—
তোমার অমৃতস্পর্শে লুপ্ত হোল সব শ্যামলিমা,
তব জ্যোতিকণা পেয়ে ধুয়ে গেল হিয়ার কালিমা
দিগ্বলয়-সীমা
কি স্বপ্ন-পুলক-মাঝে ভরি' গেল আনন্দ-চন্দনে,
অয়ি স্মেরাননে !

অপ্সরানিন্দিত-কায়, মূর্ত্তিমতী যেন সরলতা,
নয়নের পূর্ণ-সফলতা!
পুঞ্জ পুণ্য ফল যথা নামি' আসে সাধকের পাশে,
নন্দন-কানন-শোভা কবির নয়নে যথা ভাসে,
চাঁদের স্বপন-খেলা উছলিত সাগরের বুকে,
বসন্তের পুষ্পমেলা ধরা যথা দেখে মনসুখে;
আমার সম্মুখে
তেমতি উঠিলে জাগি' শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের অপ্সরী,
লো স্বপ্ন-সুন্দরী!

মঙ্গলের হেম ঝাঁপি হাতে লয়ে অন্নদার সম,
যবে তুমি এলে গৃহে মম,
আমার অদৃষ্ট-পদ্ম স্বর্ণদল উঠিল বিকশি'
নিরানন্দ-গৃহ-মাঝে বাজিল গো উৎসবের বাঁশী,
স্বর্গের সৌরভ যেন ছেয়ে গেল সংসারের মাঝে,
প্রকৃতি সেদিন হতে সাজিতেছে নিত্য নব সাজে,
শুভ শঙ্খ বাজে;—
গৃহলক্ষ্মী আছ বসি' মম হৃদি-কমল আসনে,
অয়ি বরাঙ্গনে!

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।

# জন্মান্তর*

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকখানি মাসিক-পত্রিকায় জন্মান্তরবাদের আলোচনা হইয়াছিল। এক পক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পুনর্জ্জন্ম হইতেই পারে না—অন্য পক্ষ পুনর্জ্জন্মবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। আমি এই দ্বিতীয় দলভুক্ত।

মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ করে কি না, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ নাই।

* কৃষ্ণনগর সাহিত্য-পরিষদের কার্ত্তিক মাসের অধিবেশনে পঠিত।

আমাদের পুরাণে এবং থিয়সফির সাহিত্যে ব্যক্তিবিশেষের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু সেই সকল ইতিহাস প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জন্মান্তরবাদ যুক্তি-হীন নহে—অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবের দেহান্তরে পুনর্জন্ম হইলেও হইতে পারে এবং জন্মান্তরের কোন a priori অসম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, যদি জন্মান্তর থাকে, তবে আছে এবং যদি না থাকে, তবে নাই; সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া লাভ কি? ইহার উত্তরে আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিলে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, ব্যবহারে না লাগিলেও কেবল জ্ঞানের জন্য এবং সত্য নির্দ্ধারণের জন্য সর্ব্বপ্রকার আলোচনাতেই আমাদের আত্মিক উন্নতি হয়। চন্দ্র এবং মঙ্গল গ্রহে কোন জীবের বসতি আছে কি না, তাহার আলোচনা আমাদের কোন ব্যবহারেই আসে না, অথচ তাহা লইয়াও বৈজ্ঞানিকদিগের কত তর্ক বিতর্ক হইতেছে। সুতরাং আমার প্রার্থনা এই যে, সকলেই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রণিধান করিবেন।

প্রথমেই জন্মান্তরবাদের ইতিহাসের কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। জন্মান্তরবাদ যে, কেবল ভারতবর্ষেরই সম্পত্তি, তাহা নহে। পূর্ব্বকালে গ্রীক্ এবং সেমিটিক জাতির মধ্যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ছিল। খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরস্ জন্মান্তরবাদ মানিতেন। বাইবেল পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টের সময় পর্য্যন্ত ইহুদীরা জন্মান্তরবাদ মানিতেন। খ্রীষ্ট একদা তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কে? এ বিষয়ে লোকে কি বলে?" একজন শিষ্য উত্তর করিলেন "কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, আপনি ভাববাদী যিরিমিয় (Jor miah)।" ভাববাদী যিরিমিয় কিন্তু খ্রীষ্টের ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তখন ইহুদী দেশে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস ছিল। অন্যত্র যিশুখ্রীষ্ট শিষ্য-দিগকে বলিলেন যোহন কে? এ বিষয়ে তোমাদের কি মত?" ইহার পর তিনি নিজেই বলিলেন "যোহন পূর্ব্বে ঈলীয় (Elias অথবা Elijah) ছিলেন।" ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যিশুখ্রীষ্টও পুনর্জন্মবাদে অবিশ্বাস করেন নাই।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় অনুসরণ করা যাউক। আমি এই প্রবন্ধে

দুইটি কথা স্বীকার্য্য বলিয়া মানিয়া লইব এবং বিশ্বাস করি যে, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না। কথা দুইটি এই যে (১) এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন এবং (২) তিনি ন্যায়বান্, দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান্।

অনেক ঘটনার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। সেই কারণগুলি কখন কখন অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমানকে বাঙ্গলায় মত ও ইংরাজীতে theory বলে। কোন মত দ্বারা যদি ঘটনার প্রত্যেক অংশ সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে সেই মত সুধীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদেরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী স্থির এবং সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিৎ কোপরনিকাস যখন দেখিলেন যে, এই মতের সহিত বুধ ও শুক্রের গতির মিল হয় না, তখন তিনি এই নূতন মতে উপনীত হইলেন যে, পৃথিবী স্থির নহে, তাহা গ্রহগণের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, ইহা কেহ দেখিতে না পাইলেও এখন সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, এই মতের সহিত বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি সমস্ত গ্রহের গতি মিলিয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যাঁহারা জন্মান্তরবাদ মানেন না, তাঁহাদের মতের সহিত ঈশ্বরের দয়া, ন্যায় ও সর্ব্বশক্তিমত্তার সামঞ্জস্য হয় না।

হিন্দুরা সকলেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমি সে বিষয়ে কোন গ্রন্থ পাঠ করি নাই। দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত "শঙ্কর দর্শন" পুস্তকের শেষভাগে জন্মান্তর বিষয়ের যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলিকে ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভাষায় transcendental nonsense বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে বিশপ্ হোয়াইট্‌হেড্ (whitehead) বলেন যে, হিন্দুরা পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে যাহা হউক আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে কাহারও মত উদ্ধৃত না করিয়া কেবল উল্লিখিত স্বীকার্য্যদ্বয় এবং গোচরীভূত দুই একটি তথ্য হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিব।

## জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি।

একটা বস্তু ছোট, একটা বড়; একজন রাজা, একজন প্রজা, এই সকল বৈষম্য দেখিয়া জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হয় না। ছোট এবং বড় সকলেরই

যদি সুখের পরিমাণ সমান হয় অর্থাৎ ধনী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি পয়োদধিযুক্ত শাল্যন্ন, ঐণমাংস, মাহিষ দধি, কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের কবিতা প্রভৃতি উপভোগ করিয়া যে পরিমাণ সুখ অনুভব করেন, দরিদ্র কৃষক যদি দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া এবং পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া তৎপরিমাণ সুখ অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার মনে কখনই এরূপ প্রশ্ন উদিত হয় না যে, ঈশ্বর তাহাকে ছোট করিলেন কেন এবং ধনীকে বড় করিলেন কেন? কিন্তু সে যদি কোন দুঃখ অনুভব করে, এবং সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া না পায়, তাহা হইলেই তাহার মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, সে দুঃখ পায় কেন? পরে সে যখন ভাবিতে ভাবিতে মনে করে যে, দয়াময় পরমেশ্বর বিনা অপরাধে কাহাকেও দুঃখ দেন না এবং যখন তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, এই জীবনে তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন অপরাধ সে করে নাই, তখনই তাহার মনে হয় যে, হয় ত এজন্মের পূর্ব্বে তাহার আর একটা জন্ম হইয়াছিল এবং সেই জন্মেই হয় ত সে সেইরূপ পাপ করিয়াছিল, যাহার ফলে এজন্মে সে দুঃখ পাইতেছে। এ জগতে যে অনেক দুঃখ আছে, তাহা ফ্রান্সিস্ নিউসান্, চাড্‌উইক্, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। নিউমান তাঁহার Soul নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"A difficulty is nevertheless encountered from the fact of human suffering —suffering of the good and of the innocent, of the innocent beasts as well as man. পার্কার তাঁহার Immortal Life নামক পুস্তকে বলেন—men suffering all their life and by no fault of theirs. চাড্‌উইক্ তাঁহার Immortal Hope নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—The hope of immortality by the side of human misery. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত ধর্ম্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে এ জগতে অনেক দুঃখ আছে, যাহা মানবের আয়ত্ত নহে—মানবের ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া ঘটিয়া থাকে।" ইহার অল্প পরেই শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই অপরাধ নিরপেক্ষ দুঃখ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে "দুঃখ মানবের কর্ম্মবিপাক জনিত; তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল।" এই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখা যায় যে, নিউমান্ ভিন্ন অপর কেহই মানবেতর জীবের কেন এত দুঃখ, সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবের দুঃখের কথা অবশ্যই চিন্তনীয়। কেন নিরপরাধ মূষিক বিড়ালের দংষ্ট্রাঘাতে এত কষ্ট পায়, কেন সর্প কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভেক এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, কেন

ভারতবর্ষের যানবাহী অশ্ব ও বলদের জীবনব্যাপী কষ্ট, কেন আসাম প্রদেশে বর্ষাকালে নদীর স্রোতে শত সহস্র হরিণ, মহিষ এবং শূকর ভাসিয়া যায় এবং সেই ঘোরতর বিপন্ন অবস্থায় শীকারীরা তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করে,—অথচ যে বিশ্বনিয়ন্তাকে আমরা দয়াময় বলিতে শিখিয়াছি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করেন না—এই সকল প্রশ্ন স্বতই চিন্তাশীল মানবের মনে উদিত হয়। এই প্রশ্নের সমাধানে এই সত্য উৎপন্ন হয় যে, ইহারা সকলেই পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের এই শাস্তি; নতুবা ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ শাস্তি বা কষ্ট পাইতে দিতেন না। কেহ কেহ বলেন যে "স্বভাবের নিয়ম হইতেই এইরূপ দুঃখের উৎপত্তি হয়—ঈশ্বর সেইরূপ দুঃখ বিধান করেন না।" কিন্তু স্বভাব ও স্বভাবের নিয়মের কর্ত্তা কে? কর্ত্তা কি ঈশ্বর নহেন? মিল (Mill) বলেন "Nature is more cruel than the cruellest vivisectionist." এই ঘোরতর নিষ্ঠুর স্বভাব যে, ঈশ্বরের স্রষ্ট ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান এবং ন্যায়বান্ তাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কেন না ঈশ্বর দয়াবান্ হইয়া অকারণে যে কাহাকেও শাস্তি দিবেন তাঁহাদের মতে ইহা অসম্ভব। এজন্মে সেই শাস্তির উপযুক্ত কোন কার্য্য করা হয় নাই সুতরাং পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই ছিল যাহাতে সেইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল যে, যাহাদের কোন দোষ আমরা দেখিতে পাই না তাহাদের দুঃখ দেখিয়াই জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, লোকে যাহা কিছু কার্য্য করে তাহা সমস্তই পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফল। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, জন্মের সময়ে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকেই ভাল মন্দ কার্য্য বুঝাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সৎকার্য্য করিবার বল এবং অসৎকার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেন। মিল্টন্ বলেন ঈশ্বর মনুষ্যকে "Enough to stand but free to fall" করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারও এই মত। অতএব মনুষ্য যখন পাপাচরণ করে তখন ইচ্ছা করিয়াই তাহা করে এবং সে তাহা না করিলেও না করিতে পারিত এরূপ বল তাহার আছে, সে ইচ্ছা করিয়া যে পাপ করে সেই পাপের ফল কতক এজন্মে ভোগ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভোগ করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়; পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবার

পরও তাহার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই পাপকার্য্য করিতে পারে অথবা পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে; অনেক সময়ে সে সৎকার্য্য করে বা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহার দুঃখ ঘোচেনা; এই দুঃখ তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল; সেই দুঃখে তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপের ক্ষয় হয় এবং সদাচরণ বা সদাচরণের চেষ্টার ফলে তাহার মুক্তি হয়, নতুবা এমন পুনর্জ্জন্ম হয় যে, তাহাতে তাহার দুঃখ থাকে না; সেই জন্মে সে ইচ্ছা করিয়া পাপ করিলেও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে সে সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী হয়; এইরূপে আমরা সাধুদিগের দুঃখ এবং অসাধুদিগের সুখ কখন কখন দেখিয়া থাকি। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, দুঃখ দেখিয়া জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হয় এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে লোকে এ জন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে।

## আপত্তি ও উত্তর

কিন্তু পৃথিবীর স্থিরত্বের সহিত বুধ ও শুক্রের গতির মিল হয় না বলিয়া পৃথিবী যে স্থির—এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই দেখা যাউক এমন কোন ঘটনা ঘটে কি না যাহার সহিত পুনর্জ্জন্মবাদের মিল হয় না বলিয়া পুনর্জ্জন্মবাদ পরিত্যক্ত হইতে পারে। এ বিষয়ে জন্মান্তরবাদবিরোধীগণের যে সকল যুক্তি আমি পাঠ করিয়াছি সেইগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রত্যেকটি সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

জন্মান্তরবাদবিরোধীগণের একটি আপত্তি এই যে যদি পুনর্জ্জন্ম থাকিত তাহা হইলে স্মৃতি তাহা বলিয়া দিত—স্মৃতি সেতুস্বরূপ হইয়া পূর্ব্বজন্মের 'আমি'র সহিত বর্ত্তমান জন্মের 'আমি'র সংযোগ করিয়া দিত—অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা আমাদের মনে থাকিত। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যখন নাই তখন পূর্ব্বজন্ম মানিতে পারা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেকেই অবগত আছেন, কখন কখন কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটে যে, সেই ঘটনার পর তাহাদের জীবনের পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র মনে থাকে না। তাহা বলিয়া কি সেই ঘটনার পূর্ব্বের আত্মা এবং ঘটনার পরের আত্মা দুটি পৃথক? সেই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মা এবং তাহার পরবর্ত্তী আত্মা যে একই—একথা কেহই অস্বীকার করেন না। সেইরূপ ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্ব্বের কথা মনে

দুইটি কথা স্বীকার্য্য বলিয়া মানিয়া লইব এবং বিশ্বাস করি যে, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না। কথা দুইটি এই যে (১) এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন এবং (২) তিনি ন্যায়বান্, দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান্।

অনেক ঘটনার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। সেই কারণগুলি কখন কখন অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমানকে বাঙ্গলায় মত ও ইংরাজীতে theory বলে। কোন মত দ্বারা যদি ঘটনার প্রত্যেক অংশ সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে সেই মত সুধীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদেরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী স্থির এবং সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিৎ কোপরনিকাস যখন দেখিলেন যে, এই মতের সহিত বুধ ও শুক্রের গতির মিল হয় না, তখন তিনি এই নূতন মতে উপনীত হইলেন যে, পৃথিবী স্থির নহে, তাহা গ্রহগণের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, ইহা কেহ দেখিতে না পাইলেও এখন সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, এই মতের সহিত বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি সমস্ত গ্রহের গতি মিলিয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যাঁহারা জন্মান্তরবাদ মানেন না, তাঁহাদের মতের সহিত ঈশ্বরের দয়া, ন্যায় ও সর্ব্বশক্তিমত্তার সামঞ্জস্য হয় না।

হিন্দুরা সকলেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমি সে বিষয়ে কোন গ্রন্থ পাঠ করি নাই। দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত "শঙ্কর দর্শন" পুস্তকের শেষভাগে জন্মান্তর বিষয়ের যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলিকে ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভাষায় transcendental nonsense বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে বিশপ্ হোয়াইট্‌হেড্ (whitehead) বলেন যে, হিন্দুরা পুনর্জন্ম বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে যাহা হউক আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে কাহারও মত উদ্ধৃত না করিয়া কেবল উল্লিখিত স্বীকার্য্যদ্বয় এবং গোচরীভূত দুই একটি তথ্য হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিব।

## জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি।

একটা বস্তু ছোট, একটা বড়; একজন রাজা, একজন প্রজা, এই সকল বৈষম্য দেখিয়া জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হয় না। ছোট এবং বড় সকলেরই

যদি সুখের পরিমাণ সমান হয় অর্থাৎ ধনী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি পয়োদধিযুক্ত শাল্যন্ন, ঐণমাংস, মাহিষ দধি, কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের কবিতা প্রভৃতি উপভোগ করিয়া যে পরিমাণ সুখ অনুভব করেন, দরিদ্র কৃষক যদি দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া এবং পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া তৎপরিমাণ সুখ অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার মনে কখনই এরূপ প্রশ্ন উদিত হয় না যে, ঈশ্বর তাহাকে ছোট করিলেন কেন এবং ধনীকে বড় করিলেন কেন? কিন্তু সে যদি কোন দুঃখ অনুভব করে, এবং সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান্ করিয়া না পায়, তাহা হইলেই তাহার মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, সে দুঃখ পায় কেন? পরে সে যখন ভাবিতে ভাবিতে মনে করে যে, দয়াময় পরমেশ্বর বিনা অপরাধে কাহাকেও দুঃখ দেন না এবং যখন তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, এই জীবনে তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন অপরাধ সে করে নাই, তখনই তাহার মনে হয় যে, হয় ত এজন্মের পূর্ব্বে তাহার আর একটা জন্ম হইয়াছিল এবং সেই জন্মেই হয় ত সে সেইরূপ পাপ করিয়াছিল, যাহার ফলে এজন্মে সে দুঃখ পাইতেছে। এ জগতে যে অনেক দুঃখ আছে, তাহা ফ্রান্সিস্ নিউসান্, চাড্‌উইক্, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। নিউমান তাঁহার Soul নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"A difficulty is nevertheless encountered from the fact of human suffering —suffering of the good and of the innocent, of the innocent beasts as well as man. পার্কার তাঁহার Immortal Life নামক পুস্তকে বলেন—men suffering all their life and by no fault of theirs. চাড্‌উইক্ তাঁহার Immortal Hope নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—The ho e of immortality by the side of human misery. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্বপ্রণীত ধর্ম্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে এ জগতে অনেক দুঃখ আছে; যাহা মানবের আয়ত্ত নহে—মানবের ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া ঘটিয়া থাকে।" ইহার অল্প পরেই শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই অপরাধ নিরপেক্ষ দুঃখ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে "দুঃখ মানবের কর্ম্মবিপাক জনিত; তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল।" এই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখা যায় যে, নিউমান্ ভিন্ন অপর কেহই মানবেতর জীবের কেন এত দুঃখ, সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবের দুঃখের কথা অবশ্যই চিন্তনীয়। কেন নিরপরাধ মূষিক বিড়ালের দংষ্ট্রাঘাতে এত কষ্ট পায়, কেন সর্প কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভেক এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, কেন

ভারতবর্ষের যানবাহী অশ্ব ও বলদের জীবনব্যাপী কষ্ট, কেন আসাম প্রদেশে বর্ষাকালে নদীর স্রোতে শত সহস্র হরিণ, মহিষ এবং শূকর ভাসিয়া যায় এবং সেই ঘোরতর বিপন্ন অবস্থায় শীকারীরা তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করে,—অথচ যে বিশ্বনিয়ন্তাকে আমরা দয়াময় বলিতে শিখিয়াছি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করেন না—এই সকল প্রশ্ন স্বতই চিন্তাশীল মানবের মনে উদিত হয়। এই প্রশ্নের সমাধানে এই সত্য উৎপন্ন হয় যে, ইহারা সকলেই পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের এই শাস্তি; নতুবা ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্ব-শক্তিমান হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ শাস্তি বা কষ্ট পাইতে দিতেন না। কেহ কেহ বলেন যে "স্বভাবের নিয়ম হইতেই এইরূপ দুঃখের উৎপত্তি হয়—ঈশ্বর সেইরূপ দুঃখ বিধান করেন না।" কিন্তু স্বভাব ও স্বভাবের নিয়মের কর্ত্তা কে? কর্ত্তা কি ঈশ্বর নহেন? মিল (Mill) বলেন "Nature is more cruel than the cruellest vivisectionist." এই ঘোরতর নিষ্ঠুর স্বভাব যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান এবং ন্যায়বান্ তাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কেন না ঈশ্বর দয়াবান্ হইয়া অকারণে যে কাহাকেও শাস্তি দিবেন তাঁহাদের মতে ইহা অসম্ভব। এজন্মে সেই শাস্তির উপযুক্ত কোন কার্য্য করা হয় নাই সুতরাং পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই ছিল যাহাতে সেইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল যে, যাহাদের কোন দোষ আমরা দেখিতে পাই না তাহাদের দুঃখ দেখিয়াই জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, লোকে যাহা কিছু কার্য্য করে তাহা সমস্তই পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফল। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, জন্মের সময়ে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকেই ভাল মন্দ কার্য্য বুঝাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সৎকার্য্য করিবার বল এবং অসৎকার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেন। মিল্টন্ বলেন ঈশ্বর মনুষ্যকে "Enongh to stand but free to fall" করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারও এই মত। অতএব মনুষ্য যখন পাপাচরণ করে তখন ইচ্ছা করিয়াই তাহা করে এবং সে তাহা না করিলেও না করিতে পারিত এরূপ বল তাহার আছে, সে ইচ্ছা করিয়া যে পাপ করে সেই পাপের ফল কতক এজন্মে ভোগ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভোগ করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়; পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবার

পরও তাহার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই পাপকার্য্য করিতে পারে অথবা পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে; অনেক সময়ে সে সৎকার্য্য করে বা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহার দুঃখ ঘোচেনা; এই দুঃখ তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল; সেই দুঃখে তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপের ক্ষয় হয় এবং সদাচরণ বা সদাচরণের চেষ্টার ফলে তাহার মুক্তি হয়, নতুবা এমন পুনর্জ্জন্ম হয় যে, তাহাতে তাহার দুঃখ থাকে না; সেই জন্মে সে ইচ্ছা করিয়া পাপ করিলেও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে সে সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী হয়; এইরূপে আমরা সাধুদিগের দুঃখ এবং অসাধু-দিগের সুখ কখন কখন দেখিয়া থাকি। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, দুঃখ দেখিয়া জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হয় এবং পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মের ফলে লোকে এ জন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে।

## আপত্তি ও উত্তর

কিন্তু পৃথিবীর স্থিরত্বের সহিত বুধ ও শুক্রের গতির মিল হয় না বলিয়া পৃথিবী যে স্থির—এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই দেখা যাউক এমন কোন ঘটনা ঘটে কি না যাহার সহিত পুনর্জ্জন্মবাদের মিল হয় না বলিয়া পুনর্জ্জন্মবাদ পরিত্যক্ত হইতে পারে। এ বিষয়ে জন্মান্তরবাদবিরোধী-গণের যে সকল যুক্তি আমি পাঠ করিয়াছি সেইগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রত্যেকটি সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

জন্মান্তরবাদবিরোধীগণের একটি আপত্তি এই যে যদি পুনর্জ্জন্ম থাকিত তাহা হইলে স্মৃতি তাহা বলিয়া দিত—স্মৃতি সেতুস্বরূপ হইয়া পূর্ব্ব-জন্মের 'আমি'র সহিত বর্ত্তমান জন্মের 'আমি'র সংযোগ করিয়া দিত—অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা আমাদের মনে থাকিত। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যখন নাই তখন পূর্ব্বজন্ম মানিতে পারা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেকেই অবগত আছেন, কখন কখন কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটে যে, সেই ঘটনার পর তাহাদের জীবনের পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র মনে থাকে না। তাহা বলিয়া কি সেই ঘটনার পূর্ব্বের আত্মা এবং ঘটনার পরের আত্মা দুটি পৃথক? সেই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মা এবং তাহার পরবর্ত্তী আত্মা যে একই—একথা কেহই অস্বীকার করেন না। সেইরূপ ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্ব্বের কথা মনে

করাইয়া দিলে তখন মনে হয়, ইহাও দেখা গিয়াছে। সুতরাং জন্মরূপ একটা মহৎ পরিবর্ত্তনে যে আমাদের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। যেমন বিস্মৃত বিষয় মনে করাইয়া দিলে মনে পড়ে, তদ্রূপ যদি কাহারও আমাদিগকে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে করাইয়া দিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমাদেরও পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়িত। মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরেরই এক অংশ; কিন্তু কয়জন মনুষ্য সহজজ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারে? বহুশিক্ষার ফলে অথবা কেহ পুনঃ পুনঃ মনে করাইয়া দিলে আমরা অল্পে অল্পে উপলব্ধি করিতে পারি যে, আমাদের আত্মা ঈশ্বরেরই অংশ। কিন্তু পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত এমন কোন শিক্ষা আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা আমরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম, তাহা জানিতে পারি। তবে কিছু যে ছিলাম, ইহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। যাহা হউক, এগুলি অবান্তর কথা। প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, কেবল স্মৃতি নাই বলিয়াই পূর্ব্বজন্ম নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, যেহেতু এ জীবনেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের স্মৃতিলোপ হয়।

জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি এই যে, যদি বর্ত্তমান জন্মের সুখ দুঃখ পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পুরস্কার ও শাস্তি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকা উচিত, কেন না কোন কার্য্যের কথা ভুলিয়া যাইবার পর সেই কার্য্যের জন্য পুরস্কার বা দণ্ডবিধান করিলে পুরস্কার ও দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু আমরা স্বভাবে কি দেখিতে পাই? একজন লোক গাঁজা খাইয়া পাগল হইয়া অবশেষে দুর্গতি ভোগ করে। তখন তাহার এরূপ স্মৃতি থাকে না যে, সে গাঁজা খাইয়াছিল বলিয়াই তাহার এত শাস্তি। একজন মদ্যপান করিয়া রাস্তায় পড়িয়া ছিল, তাহার উপর দিয়া একখানা গাড়ী চলিয়া গেল এবং অশেষ যন্ত্রণায় তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু সে যে মদ খাইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল না। প্রত্যেক রোগের কারণ আছে; কিন্তু যত লোক রোগ ভোগ করিতেছে, সকলেই কি সেই রোগের কারণ অবগত আছে? পুরস্কার সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাও দেখিবে বালক, বালিকা, গো, মহিষ, বিড়াল, কুকুর, সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে। তাহারা কি সকলেই জানে যে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করার পুরস্কার তাহাদের

স্বাস্থ্যের উন্নতি? যদি এইরূপে এজন্মেই বিনাস্মৃতিতে দণ্ড পুরস্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের দণ্ড পুরস্কার এজন্মে স্মৃতি বিনা হইতে পারিবে না কেন?

জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় একটা আপত্তি এই যে, "যদি প্রথমবারের সৃষ্ট আত্মাগুলিরই পুনঃপুন জন্ম হইত, তাহা হইলে প্রাণীর সংখ্যা বাড়িত না; কিন্তু, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণীর সংখ্যা দিন দিনই অধিক হইতেছে। প্রত্যহই নূতন আত্মার সৃষ্টি হইতেছে এবং পুরাতন আত্মারও পুনর্জ্জন্ম হইবে—ইহা অসম্ভব।" এই আপত্তি সম্বন্ধে আমার দুইটি বক্তব্য আছে। প্রথম এই যে, ইহাতে apriori অসম্ভাবনা কিছুই নাই। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, যেমন একটি প্রদীপ হইতে শত সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে পারে এবং সেই শত সহস্র প্রদীপের প্রত্যেকটি হইতে আরও শত সহস্র প্রদীপ প্রজ্বালিত হইতে পারে, যেমন একটি ধান্য হইতে শত সহস্র ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপে প্রথম সৃষ্ট আত্মা হইতেই বর্ত্তমান সময়ের এবং ভবিষ্যতের কোটি কোটি আত্মা হইতে পারিবে না কেন? বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানও নূতন সৃষ্টির সমর্থন করে না।

বিরুদ্ধবাদীদের কেহ কেহ বলেন যে "যে সকল দুঃখ আমাদের চক্ষে নিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল নহে, কিন্তু সামাজিকতার ফল। সমাজ একসূত্রে গাঁথা। সূত্রের একস্থানে আঘাত করিলে গ্রথিত বস্তুর প্রত্যেকটীতেই যেমন কম্পন হয়, তদ্রূপ সমাজের কাহারও দুঃখ হইলে সকলেরই দুঃখ হয়।" আমি এই আপত্তির সারবত্তা মোটেই বুঝিতে পারি নাই। যদি সমাজের একজনের দুঃখ সংক্রামক হয়, তাহা হইলে প্রতিবেশী-দিগের মধ্যে কেহ অনশনে এবং অপরে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটায় কিরূপে? গত ভূমিকম্পের সময়ে পার্ব্বত্যপথ দিয়া যাইবার সময়ে একজন লোকের উপর বড় একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়াছিল; তাহাতে তাহার শরীরের নিম্নার্দ্ধ চাপা পড়ে; সে তিন চারি দিন সেখানেই সেইভাবে চাপা পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে যন্ত্রণা পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দুঃখ কি সামাজিকতার ফল? আর একস্থানে ভূমিকম্পে একটা বাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল। বাড়ীর কোন লোক বা জীবজন্তু নষ্ট হয় নাই, কেবল দুইটা ছাগশিশু পাওয়া গেল না। কিন্তু দেখা গেল যে, ছাগীটা একটা ঘরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভূমিকম্পের আটদিন পরে সেই ভগ্নাবশেষ

সরাইয়া দেখা গেল যে, সেই ছাগশিশু দুইটী একখানা খাটের নীচে মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে। এই আটদিন সেই নিরাপরাধ ছাগশিশুদ্বয় যে অসীম কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, তাহা কি সমাজের কোন দোষের জন্য ?

যখন টাইটানিক জাহাজ ডুবিয়াছিল, তখন বিরুদ্ধবাদী এখানকারই একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, যাহারা এই ঘটনায় কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, তাহারা সকলেই যে পূর্ব্বজন্মে এমন কাজ করিয়াছিল যে ঠিক এক সময়ে একরূপ কষ্ট পাইবে, ইহা অসম্ভব। ইয়োরোপে বর্ত্তমান সময়ে যে বহুলোক অনন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া একজন বিরুদ্ধবাদী লিখিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে "বহুসহস্র পরিবার অনাথ হইতেছে, অযুত অযুত রমণী বিধবা হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিপদাপন্ন হইয়া জীবন কাটাইতেছে, সুদূর ভারতবর্ষেও কত পরিবারকে হাহাকার করিতে হইতেছে; ইহাদের প্রত্যেক নরনারী কি পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করিতেছে? তাহা হইলে ত ব্যাপার বড় অদ্ভুত। আর কোন যুগের এত নরনারী এত অপরাধ করিল না, আর হঠাৎ এইযুগের নরনারী এত অপরাধে অপরাধী হইল ?" এই সকল প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলিতে কি কোন a priori বাধা আছে ? ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রথমে কলিকাতায় নীত হয়। সেখানে তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে একত্র করিয়া এক জাহাজে আণ্ডামানে প্রেরণ করা হয়। সেইরূপে যাহারা বঙ্গে এবং অন্যান্য নানাস্থানে দুষ্কৃতি করিয়াছিল, তাহারাই কি বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ, বেল্‌জিয়ম, ইলণ্ড, ফ্রান্স্‌, জর্ম্মানি, রুসিয়া প্রভৃতিস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির শাস্তি পাইতে পারে না ?

প্রেতত্ত্ববাদ (Spritualism) বিষয়ে এত সাক্ষ্য ও প্রমাণ আছে যে, তাহাতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা যায় না। শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রেততত্ত্ববাদিগণ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মাসকল বিদেহ অবস্থায় থাকে বলিয়া যখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, তাহারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট যুক্তি। কিন্তু আমি অদ্য এই বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমার বিবেচনায় এই উভয় মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে। আনীবেসাণ্ট উভয় মতই বিশ্বাস করেন। হিন্দুরাও উভয় মতই মানেন। তাঁহারা ভূতপ্রেতও মানেন এবং পুনর্জ্জন্মেও বিশ্বাস করেন। বিদেহ

প্রেতগণের জন্য শ্রাদ্ধ তর্পণও করেন অথচ বিশ্বাস করেন যে, সেই প্রেতগণ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন!

জন্মান্তরবাদীরা বলেন যে, জগতে কখন কখন যে আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অধিগত ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই তাঁহাদের সেইরূপ প্রতিভার বিকাশ হয়। গ্লাড্‌ষ্টোন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি মহাত্মারা শিক্ষা ও সাধনার ফলে স্বস্ব কার্য্যক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং করিয়াছেন। কিন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণদেব প্রায় নিরক্ষর হইয়াও কোথায় কখন তাঁহার সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন? জেরা কলবর্ণ নামক আটবৎসরবয়স্ক একটী ইংরেজ-বালক গণিতে অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহার বিবরণ Proctor's Byways of Science নামক পুস্তকে বিবৃত আছে। তাহাকে সাত আটটা অঙ্কবিশিষ্ট দুইটী রাশি দেওয়া মাত্র সে তাহাদের গুণফল, ভাগফল বলিয়া দিত। তাহা অপেক্ষাও বড় বড় রাশির বর্গমূল, ঘনমূল অবিলম্বে মুখে মুখে বলিতে পারিত। $২^{৩২}+১$ অর্থাৎ দুইকে বত্রিশবার দুই দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে একযোগ করিলে যে রাশি হয় তাহার বিভাজক বা factor নাই বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু একজন গণিতবেত্তা বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া তাহার দুইটী factor বাহির করিয়াছিলেন। জেরা কলবর্ণকে সেই রাশিটি দেওয়া হইল; সে অল্প পরেই সেই দুইটী factor বলিয়া দিল। ইয়োরোপ হইতে বহু পণ্ডিত তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কেমন করিয়া তত বড় অঙ্কের সমাধান করে। তাহার কিন্তু বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। সে তাঁহাদের জিজ্ঞাসায় এই উত্তর দিত যে "God put these things into my head and I cannot put them into yours" তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা শিক্ষা এবং বয়স এমন ছিল না যে, তাহার এই অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ হইতে পারে। সুতরাং জন্মান্তরবাদীরা বলেন যে, সে পূর্ব্বজন্মের অধিগত বিদ্যা লইয়া

## উপসংহার

এখন, আমি কেন পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করি, পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস না করিলে সমাজের কি অকল্যাণ হয় এবং বিশ্বাস করিলে কি মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

একদিন একজন জর্ম্মান অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, লাইব্‌নিট্‌সের একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঈশ্বর যদি দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান হ'ন, তাহা হইলে জগতে দুঃখ থাকে কেন? এই সমস্যার উত্তর ইয়োরোপে নাকি কেহ করিতে পারে নাই। জীব কোন অপরাধ না করিয়াও দুঃখ পাইতেছে। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হ'ন, তাহা হইলে এই দুঃখ অনায়াসেই অপসারিত করিতে পারেন। এই ক্ষমতা থাকিতেও যখন তিনি এই দুঃখ দূর করেন না তখন তাঁহার দয়ার সত্ত্বা কিরূপে স্বীকার করিব? তাঁহার দয়া আছে স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, এই দুঃখ দূর করিবার শক্তি তাঁহার নাই।

অপরপক্ষে থিওডর্ পার্কার, চাড্‌উইক্, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনস্বীগণ এই দুঃখ হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে। কেন না মনুষ্য যখন অকারণে একবার কষ্ট পাইয়াছে এবং এ জীবনে যখন তাহার কোনরূপ ক্ষতিপূরণ হয় নাই এবং ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান্, তখন অবশ্যই এমন সময় আসিবে যখন তাহাদের এই দুঃখের ক্ষতিপূরণ হইবে। এ জীবনে যখন সেই ক্ষতিপূরণ হইল না, তখন দেহান্তের পর সেই সময় আসিবে, ইহা অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত। সুতরাং দেহনাশের পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে।

ইহা অতি সরল এবং সুন্দর যুক্তি। কিন্তু যেমন একটি সরল রেখাকে উভয় দিকেই বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, সেইরূপ এই যুক্তিটিও পশ্চাৎদিকে বর্দ্ধিত করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের এজন্মের পূর্ব্বেও আমাদের আত্মা কর্ম্মশীল ছিল। উপরে যে কয়েকজন মনস্বীর নাম করা হইল, তাঁহারা জীবের দুঃখ এবং ঈশ্বরের দয়া এবং ন্যায়, এই কয়েকটি স্বীকার করিয়া দুঃখের পরিণাম কি তাহা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, দুঃখের পরিণাম মৃত্যুর পরও আত্মার সত্ত্বা। আমি তাঁহাদের স্বীকৃত কয়েকটি কথা লইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে দুঃখের আদি মূল বা কারণ কি? এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান্, তখন বিনা অপরাধে জীবের এই দুঃখ সম্ভব হইতে পারে না এবং যখন এ জন্মে সেরূপ কোন অপরাধ নাই, তখন ইহাও অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত যে, এজন্মের পূর্ব্বে আত্মা ছিল এবং তখন সে এই অপরাধ করিয়াছে। এবং যখন এজন্মে আত্মা জড়দেহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে তখন তাহা

পূর্ব্বজন্মে এবং পরজন্মেও জড়দেহে প্রবেশ করিবে, ইহার সম্ভাবনা কোথায় ?

পূর্ব্বজন্মে পাপ করিলে এজন্মে শাস্তি হয়, ইহা বিশ্বাস করিলে এজন্মে পাপ করিবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাস কর এবং জগতের দুঃখ মনুষ্যের দুঃখ, কীট পতঙ্গের দুঃখ দেখ, তোমার মন ঈশ্বরের প্রেমে ঈশ্বরের ন্যায়ে সন্দিহান হইয়া উঠিবে। রাজা লিয়ার যখন দেখিলেন যে তিনি এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহার সেইরূপ মনঃপীড়া হইতে পারে, তখন তিনি ঈশ্বরকে গালি দিলেন। কিন্তু জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুর যতই কেন দুঃখ কষ্ট হউক না, তিনি চিরকালই ঈশ্বর ন্যায়বান্ বলিয়া তাঁহার বিচার অবনতমস্তকে মানিয়া ল'ন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

## কুঞ্জভঙ্গ

আর—নাহিক রাতি,
জাগে—কুসুমপাঁতি,
ঐ—প্রাচীর সীথির পরে সিঁদূর ভাতি।
পাখী—কুলায়ে জাগে
দেয়—পালক নাড়া,
আঁখি—অরুণ রাগে
তায়—জাগিল তারা,
তারা—মধুর গাহে
ঘুম—ভাঙাতে চাহে ;
তারা—জাগায় জাগিয়া বনে সকল সাথী॥
ঐ—চক্রবাকী—
হের—চক্রবাকে।
নদী—পুলিনে থাকি—
এবে—মিলিতে ডাকে।
যত—কাননবালা
ধরে—ফুলের ডালা
কিবা—নীহারমালা
আহা—সাজায় তাকে।

শুক—তারকাভূষা,
সুখে—হাসিছে উষা
ঐ—পিঙ্গলরূপ ধরে—কুঞ্জবাতি ॥
সাঁঝে—পদ্মকোষে
মধু—হরণ ছলে,
অলি—আত্মদোষে
অব—রুদ্ধ হলে।
ঐ—পদ্মকলি
পুনঃ—বক্ষ খোলে,
এস—আলোকে অলি
রেণু—গন্ধ মাখি'
জাগো—পিয়ারী মণি
বাহু—বন্ধ হ'তে,
নীবি—বন্ধ, ধনি!
বাঁধো—স্বপ্নপথে
বাঁধো—কবরী ভাঙা
অয়ি—রভস রতে!
মুছ—জাগর-রাঙা
দুটী—হরিণ আঁখি।
শেজ—চরণে লুটে
সাজ—গিয়েছে টুটে,
পরো—নববনফুলমালা রেখেছি গাঁথি।
আর—নাহিক রাতি
ফুটে—প্রসূনপাতি
ঐ—প্রাচী দিকবধূ-ভালে সিঁদুর ভাতি ॥

শ্রীকালিদাস রায়

# কবির সুবুদ্ধি।

"কাব্যং করোষি কিমু তে সুহৃদো ন সন্তি
যে ত্বামুদীর্ণপবনং ন নিবারযন্তি।
গব্য ঘৃতং পিব নিবাতগৃহং প্রবিশ্য
বাতাধিকা হি পুরুষাঃ কবয়ো ভবন্তি॥"

ইত্যুদ্ভটঃ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরোজকান্ত বাল্যকাল হইতেই কবি। কাব্যচর্চ্চায় অত্যধিক মনোনিবেশ বশতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষাটি সে আর কিছুতেই পাস করিতে পারিল না। কয়েক-বার উপর্য্যুপরি ফেল হইয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিল —ভাবিল এমন করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে। ক্ষেতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, বাগানে তরীতরকারী ছিল, গোহালে দুধ ছিল, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তাহার অভাব ছিল না। চাকরি সে করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়া-ছিল, কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় উপর্য্যুপরি তাহার দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। তখন জননীর অনুরোধে, পত্নীর অনুযোগে, জ্ঞাতি প্রতিবেশীর পরামর্শে, নিন্দুকের টিট্‌কারিতে এবং যুগলকন্যার চিৎকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে কবি অগত্যা চাক্‌রী করিতেই রাজী হইল।

শুভদিনে শুভক্ষণে সরোজ কলিকাতা আসিল। চাকরি অন্বেষণে তাহার কোনও ব্যগ্রতা কিন্তু দেখা গেলনা; মেসের বাসায় বসিয়া বসিয়া সর্ব্বদা সে কবিতাই লিখিত। সকাল সন্ধ্যা সে কোন না কোন মাসিক সম্পাদকের গৃহে কিম্বা আফিসে বসিয়া আড্ডা জাঁকাইত। ক্বচিৎ কখনও খেয়াল হইলে কোনও আফিসে বেগারঠেলা গোছের এক আধবার যাইত; ঐ পর্য্যন্ত।

কলিকাতায় আসিবার বছর দেড়েক পূর্ব্বে হইতেই সরোজের কবিতা মাসিক পত্রাদিতে ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন "সুধা" "জননী" "শান্তি" প্রভৃতি মাসিকে তাহার কবিতা অজস্র ধারায় বাহির হইতে লাগিল।

যখনি সময় পাইত, কি নূতন কি পুরাতন মাসিকগুলি খুলিয়া, সরোজ আপন কবিতার নিম্নে ছাপার হরফে নিজের নাম দেখিতে দেখিতে আনন্দে

গৌরবে আশায় একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। যে যে সংখ্যায় সরোজের কবিতা আছে, সেই সেই সংখ্যা কাগজগুলি তাহার মেসের কক্ষে ছোট টেবিলটির উপরে অথবা বিছানায় সর্ব্বদা এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিত যে, সে ঘরে কেহ প্রবেশ করিবামাত্র তাহার নজরে পড়ে।

মেসের লোককে কবিতা শুনাইয়া, মাসিকপত্রের আপিসে আপিসে আড্ডা দিয়া, সরোজ একটি বৎসর কাটাইয়া দিল, অথচ আসল কাযের কিছুই করিতে পারিল না। তাহার জননী তখন তাহাকে একখানি কড়া করিয়া পত্র লিখি-লেন যে, যদি চাকরী না মিলে তবে সে যেন বাড়ী ফিরিয়া আসে, কারণ তাঁহার এমন সঙ্গতি নাই, যাহা দ্বারা তিনি নিয়মিতভাবে পুত্রকে মাসিক পনেরটি করিয়া টাকা সাহায্য করিতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাকে নাকি কিছু ঋণ-গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইত্যাদি। এ পত্রে যখন কোন ফল ফলিল না, তখন অগত্যা তাঁহাকে টাকা বন্ধ করিতেই হইল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই মাসিক পনের টাকা পারিশ্রমিকে একটি টিউ-টারী সরোজের জুটিয়া গেল। মায়ের এই গুণগ্রাহিতার অভাবে এবং এবম্বিধ মনীষী পুত্রকে হঠাৎ বিপন্ন করায় সরোজ খুবই চটিয়া গেল, তবু বাড়ী গেল না। চাকরীর চেষ্টায় এইবার ভাল করিয়াই লাগিয়া গেল—এবং অর্থের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে একটি কবিতাও লিখিয়া ফেলিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এমন সময়ে "মেঘমল্লার" নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র বাহির হইবে বলিয়া গুজব উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দৈনিক সমস্ত সংবাদপত্রে অজস্রধারে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, ডবলক্রাউন অষ্টাংশিত মাসিক দুইশত পৃষ্ঠায়, প্রতিমাসে সাতচল্লিশখানি রং-বেরংয়ের চিত্রে এবং বঙ্গের তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনায় পরিপূর্ণ হইয়া "মেঘমল্লার" প্রকাশিত হইবে। লোভনীয় ও মনভুলানো ভাষায়, আইন বাঁচাইয়া যত প্রকারের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা চলে, বিজ্ঞাপনে তাহার কোনও ত্রুটি হইল না। সে যাহাই হউক, বিজ্ঞাপনে লেখকগণের যে ফিরিস্তি ছাপা হইয়াছিল—তাহাতে এখন সরোজেরও নাম ছিল। যশের উন্মাদনায় সরোজ একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল।

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী কোম্পানির আফিসে ত্রিশ মুদ্রার একটি চাকরীর

সম্ভাবনা সরোজের হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহমধ্যে একবার সেদিকে যাইবারও ফুরসুৎ তাহার হইল না।

অষ্টম দিনে সরোজকান্ত তাহার মসীকৃষ্ণ অংসবিলম্বী কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ দোলাইয়া, বোতাম-খোলা সার্ট গায়ে দিয়া আফিসে হাজির হইয়া শুনিল যে, তাহার অদর্শন জন্য, সে পদ সাহেব জনৈক অকবিকে দান করিয়াছেন। সে তখন ম্লানমুখে বড়বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবু লোকটি ভাল। তিনি সসংকোচে মৃদু একটু ভর্ৎসনা করিয়া স্নেহপরবশ হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, যা হবার তাতো হয়ে গেছে—তার তো আর উপায় নাই। দেখি দাঁড়াও। আর একটা চাকরি খালি ছিল—আমাদের আপিসে নয়, অন্য আপিসে। কিন্তু সেটা এখনও খালি আছে কিনা জানি না। যাই হোক্, আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি। এখানা নিয়ে কাল বেলা দশটার সময় একবার ষ্টেড্ কোম্পানির আফিসে যেও। সেখানে সুরেনবাবু বড়বাবু, তাঁকে এই খানা দিও—যদি কাযটা খালি থাকে তো পাবে বোধ হয়।"

এই বলিয়া বড়বাবু সরোজের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সরোজ কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল আরক্তিম করিয়া হাত কচ্‌লাইতে লাগিল। বড়বাবু পত্র লিখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সরোজ তাহার চতুঃপার্শ্বে একবার চাহিল। দেখিল—দূরে, অদূরে সারি সারি অগণিত যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ মাথা নত করিয়া কত কি লিখিতেছে। তাহাদের আশে পাশে কত কাগজ, কেতাব ও খাতা। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল—হায় রে কপাল, যে লেখনী কাব্যের পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরভিত করিয়া দিবে, আশা করিয়াছিলাম, সেই লেখনী এই সকল খাতাপত্রের মরুবক্ষে ক্ষয় করিতে হইবে!

চিঠি শেষ করিয়া বড়বাবু বলিলেন—"এই নাও, এই চিঠিখানা সুরেনবাবুকে দিও। (ঘড়ি পানে তাকাইয়া) আজ আর বোধ হয় হবে না—কাল বেলা দশটা এগারটার মধ্যেই যেও যেন। কি হয় আমায় একটা সংবাদ দিও।" বলিয়া বড়বাবু সরোজের হাতে পত্রখানি দিলেন।

সরোজ কি বলিতে গেল—কিন্তু কণ্ঠের কাছে আসিয়া কথাগুলি সব ঘুরপাক খাইতে লাগিল, মুখ দিয়া বাহির হইল না। কৃতজ্ঞতার ভাষা অনুচ্চারিত রাখিয়াই একটি ঢোক গিলিয়া, পত্রখানি লইয়া সে প্রস্থান করিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মেসে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সে দিন আর কবি টিউসনি করিতে গেল না। আস্তে আস্তে বারান্দায় যেথান মৈসিক বন্ধুবর্গ দিবাবসানে বিশ্রম্ভালাপ অর্থাৎ নিজ নিজ আফিসের ও সাহেবদের সমালোচনা করিতে-ছিলেন, সরোজ আসিয়া সেইখানে উপবেশন করিল।

বিষ্ণুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কবিবর, আজ যে বড় বিমর্ষ? মনটা থারাপ, না নূতন কিছু লিখ্‌বে তাই ভাব্‌চো?"

কবি আকাশপানে একবার উদাস চাহনি চাহিয়া ভাবুকের মত গম্ভীর-ভাবে উত্তর করিল—"না কিছু ভাবি নাই, মনটাই তেমন ভাল নাই।"

দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন—"কেন? কেন? বাড়ীর সব থবর ভাল তো?"

অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন—"কারু ব্যারাম-স্যারাম হয় নাই তো?"

সরোজ বলিল—"সে সব কিছু নয়। বাড়ীর সবাই ভাল আছে।"

শশধরবাবু মেসে একটু রসিক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কবিজায়ার বিরহই কবির হঠাৎ এই ভাব-পরিবর্ত্তনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া হো হো করিয়া নিজেই সর্ব্বাগ্রে হাসিয়া উঠিলেন।

সরোজ তথন, যাহা ব্যাপার বলিল।

এবার সমবেদনার পালা। "তাই ত" "তবে?" "না হয়—" "মুকুন্দের আফিসে" প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বাক্যদ্বারা সকলে আপন আপন দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

এটি "অফিসারস্ মেস্"। সুতরাং রাত্রি আটটা বাজিতে না বাজিতেই ভৃত্য রামচরণ হাঁক পাড়িল "বাবু, রসুই তৈয়ারী।" অমনি সকলেই আপন আপন লেবু ঘৃত চিনি আচার লণ্ঠন গামছা প্রভৃতি মেস্-বহির্ভূত খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের সরঞ্জাম লইয়া নিম্নতলে সশব্দে সদলে অবতরণ করিয়া আসন লইলেন।

পরদিন যথাসময়ে সরোজ ষ্টড্ কোম্পানির আফিসে গিয়া হাজিরা দিল।

চাপ্‌রাশিদিগের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সরোজ একেবারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বড়বাবুর সম্মুখে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

ব বুটির নাম সুরেন্দ্রনাথ দে, জাতিতে তিলি। অপরিচিতের নিকট হইতে প্রথমেই নমস্কার লাভ করিয়া এবং তৎসঙ্গে একথানি সুপারিসের পত্র পাইয়া তাঁহার মনটা অকস্মাৎ একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পত্রখানি মনোযোগের সহিত

পাঠ করিয়া নিতান্ত বড়বাবুর ধাঁচে মুরুব্বীয়ানার চা'লে তিনি সরোজকে অনেক-ক্ষণ যাবৎ একটি বক্তৃতা দিলেন। সরোজ নিরুপায়, চাকরীর উমেদার, সুতরাং শুনিতে বাধ্য—শুনিলও তাই।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি সরোজকে সম্মুখের খালি চেয়ারখানি দেখাইয়া বসিতে বলিয়া, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনও দরখাস্ত টরখাস্ত এনেছ?"

সরোজ অপ্রতিভ হইয়া কাতরস্বরে জানাইল—"আজ্ঞে না। তবে যদি অনুমতি করেন এবং কোনও আশা থাকে তো—এখানে বসেই লিখে দিতে পারি।"

বড়বাবু চশমা জোড়াটি নামাইয়া রাখিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সম্মুখস্থ একসারি লিখন-নিরত কেরাণীবর্গের পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া বলিলেন—

"তুমি তো বাপু তবু এণ্ট্রান্স্ ফেল্ করেছ; আর ঐ যে সব গাধার দল—ফাষ্টবুকের এঁড়ে গরুর গল্প পর্য্যন্ত বিদ্যে, ওদিকে তবে ঢোকালাম কি করে? সবাই এসে আমাকেই ধরে' পড়ে। আরে এ কি আমার বাবার আফিস? তা' কিছুতেই কেউ শুন্‌বেনা। সায়েব আমার কথাটথা একটু আধটু শোনেন কি-না—ঐ হয়েছে আমার বিপদ। কি কুক্ষণেই বড়বাবু হয়েছিলাম।"

সরোজ নীরব অধোমুখে শুনিতেছিল।

বড়বাবু কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় সরোজের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; শেষে নিজেই আবার প্রশ্ন করিলেন—"তুমি হরিপদকে পাক্‌ড়ালে কোথা? সে বড় ভাল ছেলে।"

সরোজ বিনয়-সঙ্কুচিতস্বরে বলিল—"তাঁর আফিসেই। তিনি নিজে হতেই দয়া করে' আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন।"

বড়বাবু ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"দয়া করে' চিঠি দেওয়ার চেয়ে একটা চাক্‌রী দিলে যে বেশী দয়া করা হতো! আমার কাছে কেন তবে?"

হঠাৎ সরোজের মাথা খুলিয়া গেল। সে ভাবিল—কবিতা লিখিয়া কাগজে ত ছাপাইয়াছি অনেক, একটু মৌখিক প্রয়োগ করিয়া দেখি না। তাই সে বলিল—"এখন আপনার দয়া। তরুতল আশ্রয় কর্‌তে গেলে লোকে বটগাছই তো খোঁজে!"

সুরেন্দ্রবাবু এ কথা শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শেষে

বলিলেন—"আমাকে বুঝি বটগাছ ঠাওরালে ? আচ্ছা তুমি একটা দরখাস্ত লিখে ফেল' দিকিন্, দেখি একবার চেষ্টাবেষ্টা করে। (কিয়ৎক্ষণ মুদিতনয়নে চিন্তা করিয়া) খালি একটা আছে! হাঁ, আছে, আছে।" বলিয়া দেরাজ হইতে একখানি শাদা কাগজ ও দোয়াত কলমটি সরোজের পানে সরাইয়া দিলেন।

সরোজ তাহার জ্ঞানমত একখানি দরখাস্ত লিখিয়া বড়বাবুকে দেখিতে দিল। তিনি সেখানি পড়িয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাপ্‌রে বাপ্! করেছ' কি হে ? এই কি দরখাস্তের ইংরিজী ? দরখাস্ত লিখ্‌তে জান না ? এ রকম করে' লেখে কা'রা ? বড় বড় সাহেব বড় বড় সাহেবেদিগে এ ভাবে লেখে। বাঙ্গালী-দের কি এ ভাবে লেখা শোভা পায় ? বিশেষতঃ চাকুরী কর্‌তে এসে ?"

সরোজ হতভম্ব হইয়া বড়বাবুর মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"নাও লেখ, পাঠ লেখ Most respected Sir, আর You গুলো সব কেটে লেখ Your Honour আর শেষে লেখ for which act of kindness I shall ever pray for Your Honour's long life, health wealth, progeny and prosperity, ব্যস, তা' হলেই হবে, আর কোনও ভুল টুল্ নেই।"

সরোজ, অন্নচিন্তা প্রবল বলিয়া আর ব্যাকরণ বা লিখনপদ্ধতির বিষয়ে কোন দ্বিধা না করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষায় একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিল।

চশ্‌মাজোড়াটি মুছিয়া, চাপ্‌কান ঝাড়িয়া, বড়বাবু দরখাস্তখানি হস্তে করিয়া সাহেব সন্দর্শনে গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সাহেবের খাস্‌কাম্‌রায় সরোজের ডাক পড়িল। তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। গোটাকয়েক ঢোক গিলিয়া, একটু কাসিয়া সাহেবের সম্মুখে আসিয়াই কবি আকব্বরীগজি এক সেলাম ঠুকিল। সাহেবের প্রতি প্রশ্নের উত্তরেই সরোজ Sir এবং Your Honour বলিল। সাহেব সরোজের বিনয় ও নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বড়বাবুকে বলিলেন

"Oh, I think he will doo"—

সেই দিনই সরোজ মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মেসে ফিরিল। মেসের বন্ধুগণ ভোজের হিসাব করিতে বসিয়া গেল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জননীর উপর সরোজের আর অভিমান রহিল না—তাঁহাকে খুব আহ্লাদ করিয়া সে এক পত্র লিখিল। কবিপ্রিয়াও প্রিয়ের পত্রে বঞ্চিত হইলেন না।

বহুদিন হইতেই পত্নীকে কবিতায় পত্র লিখিবার সরোজের এক প্রবল সাধ ছিল; কিন্তু প্রবাসের অভাবে ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই, কলিকাতা আসিয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আজ আনন্দের আতিশয্যে আর কবিতা যোগাইল না বলিয়া পদ্মময়ী গদ্য ভাষাতেই কায সারিল।

সরোজকান্ত চাকরী আরম্ভ করিল। এখন আর তাহার পোষাকে বিশৃ-ঙ্খলতা নাই, আহারনিদ্রায় অনিয়ম নাই, আফিস যাওয়া আসাতেও ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই। কবিসুলভ এলোমেলো কার্য্যকলাপগুলি একবারে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে যুক্ত, নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল।

মেসে ও আফিসের জলখাবারের ঘরে বাবুদের, কে কবে বড় সাহেবের খাস্ আর্দ্দালিকে ধমক দিয়াছেন, কার ড্রাফ্‌ট সাহেব না পরিবর্ত্তন করিয়া সহি করিয়াছিলেন, সেখানে অনুপস্থিত কোন্ বাবুকে কবে সাহেব গালি দিয়া-ছেন, প্রভৃতি বিষয়ের সদালোচনাতেও সরোজ ক্রমশঃ যোগ দিতে আরম্ভ করিল।

চাকরি হইয়া তাহার কবিতা রচনা ত কমিলই না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াই গেল। সকল কাগজেই সে কবিতা পাঠাইতে লাগিল—ছাপাও হইতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যদি কেহ বাজি রাখিয়া, কবি সরোজ-কান্তের কবিতা আছে বলিয়া বিখ্যাত অবিখ্যাত কোনও একটি মাসিকপত্র খুলিত, তবে তাহার বাজি হারিবার কোন আশঙ্কাই ছিল না।

এক বৎসর কাটিয়া গেল—সরোজের পাঁচ টাকা বেতনবৃদ্ধি হইয়া চল্লিশ হইল। এই অল্পদিনের মধ্যেই সরোজকে সাহেব একটু অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। কাযেই তাহার প্রতি বড়বাবুরও স্নেহ বৃদ্ধি হইল। অন্যান্য বাবুদের দরখাস্ত কৈফিয়ৎ প্রভৃতি লিখিয়া দিত বলিয়া তাহারাও সরোজকে খাতির করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া সে যে একজন কবি, মাসিকপত্রে তাহার রচনা ছাপা হয়, এজন্যও সরোজের প্রতি সকলের একটু সম্ভ্রমের ভাব দেখা যাইত। কোন কোন বাবু সওদাগরী আফিসের কায বন্ধ রাখিয়াও তাহার কাছে আসিয়া বসিতেন, কিছু কিছু কাব্যালোচনা করিতেন। মেজাজটা ভাল থাকিলে বড়বাবু বলিতেন—"দেখো সরোজ, লেজার বইয়ে যেন 'আমায় দেমা তবিলদারী' লিখে ফেলোনা।" বড়বাবু এই রসিকতাটুকুকে খুবই মূল্যবান্ মনে করিতেন। সে যাহাই হউক সরোজ ইহাতে বেশ খুসীই থাকিত, এবং হাসিমুখেই আফিসের কায করিত।

এক বৎসরকাল অজস্র ধারে "মেঘমল্লারে" স্থান পূরাইবার কাবতা সরবরাহ করায় বর্ষশেষে কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সরোজকে কিছু পারিশ্রমিক দিলেন। বাড়ীতে মাসে মাসে পনের বিশ টাকা সাহায্য করিয়াও সরোজ নিজের কাছে কিছু জমাইয়াছিল। এইবার তাহার চিরজীবনের একটি সাধ পূর্ণ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। সেটি গ্রন্থকার হওয়া। বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁহাদের মানবচরিত্র-জ্ঞান আছে, তাঁহারা উৎসাহই দিলেন। যাঁহারা সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ —যাঁহারা বই ছাপাইতে নিষেধ করিলেন; সরোজ তাঁহাদের সহিত মহা-তর্ক জুড়িয়া দিল।

বন্ধু বলিলেন—"এই আক্রাগণ্ডার দিন, দুই দুইটি আবার মেয়ে আছে বল্‌চ', কেন মিছামিছি কতকগুলো টাকা বরবাদ কর্‌বে?"

সরোজ বলিল—"বই যদি বিক্রী হয়, তো টাকা উঠ্‌তে ক'দিন?"

বন্ধু বলিলেন—"বিক্রী হলে তো? একে তো এ দেশের লোকে বইই পড়ে না। যদি পড়ে' তো দু' একখানা চুট্‌কি চাট্‌কী উপন্যাস—তাও আবার চেয়ে ভিক্ষে করে। তোমার এ হচ্ছে কবিতার বই, ও তো কেউ চেয়ে পড়া দূরে থাক্—অম্‌নি পেলেও পড়্‌বে না।"

সরোজ রাগিয়া বলিল—"থাক্, ও কথায় আর কায নাই। বই আমি ছাপাবই।"

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপিত হইল যে, অমুক অমুক মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত সেনের অভিনব কাব্য "মোতির মালা"—এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ভাবে ও ভাষায় অতুলা, কাব্যে ও কল্পনায় অমূল্য, বঙ্গসাহিত্যের অভিনব সম্পদ। গ্রন্থকারের চিত্রশোভিত—মূল্য একটাকা।

সরোজের ধারণা বইয়ের কাট্‌তি বিজ্ঞাপনের বাহুল্য ও আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া যাহার কবিতা এত লোকে ভাল বাসে—তাহার কবিতাগ্রন্থ তো লোকে কিনিবার জন্য উৎসুক হইয়াই বসিয়া আছে।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর হইতেই সরোজ ভাবিতে লাগিল যে, হয়ত গুরুদাস বাবুর দোকানে শতশত অর্ডার আসিয়া জমিয়াছে। প্রেস শীঘ্র ছাপিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার মনে বড়ই অশান্তি উপস্থিত হইল। সকাল-সন্ধ্যা কবি স্বয়ং প্রেসে গিয়া ধন্না দেওয়া আরম্ভ করিল। যে যে ফর্ম্মা ছাপা হইল—সেই

সেই ফাইলগুলি কবির পকেটে পকেটেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত অপরিচিত যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই ফাইলগুলি দেখাইয়া জানাইল যে অচিরে একখণ্ড "মোতির মালা" তাঁহার হস্তগত হইবে।

"মোতির মালা" ছাপা হইয়া যেমন প্রস্তুত হইল অমনি অপরিসীম আনন্দে ও উৎসাহে একটি ঝাঁকামুটের মাথায় একশতখানি পুস্তক চাপাইয়া দোকানে দোকানে দিবার জন্য সরোজ বাহির হইল।

ভাদ্র মাস। বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, বিষম গুমোট। বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সরোজ মাত্র ২৫ খানি বই গতাইতে পারিল। স্থানাভাব জন্য প্রায় সকল পুস্তক-বিক্রেতাই পুস্তক রাখিতে অস্বীকার করিল। কেহ কেহ বই তো রাখিলই না, অধিকন্তু তাহাকে খুনখারাবী জালজুয়াচুরিওয়ালা একখানা রগ্‌রগে গোছের ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস লিখিতে উপদেশ দিল।

রাত্রি ৮ টার সময়ে ৭৫ খানি বহি লইয়া মুখখানি মলিন করিয়া কবি মেসে ফিরিলেন। মুটিয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে চুক্তির দ্বিগুণ পারিশ্রমিকেও অসন্তুষ্ট হইয়া নিষ্ক্রমণ করিল।

তথাপি সরোজ দমিল না। ভাবিল যখন কাগজে কাগজে উচ্চ সমালোচনা হইবে, নানা পদস্থব্যক্তির অভিমত সম্বলিত-বিজ্ঞাপন বাহির হইবে—তখন এই প্রত্যাখ্যানকারী মূঢ় পুস্তকবিক্রেতার দল উপযাচক হইয়া পুস্তক লইতে আসিবে, সেই সময়ে এ অপমানের প্রতিশোধ সে লইবে। বই দিতে চাহিবে না —অনেক কাকুতিমিনতির পরে তবে দিবে, তাও অত্যন্ত অল্প কমিশনে।

সেই রাত্রি হইতেই প্রায় দশদিনকাল পর্য্যন্ত সরোজ বাঙ্গলার সমস্ত মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে "সমালোচনার্থ" প্রায় ১০০ কপি "মোতির মালা" পাঠাইল। প্রায় দুইশত খণ্ড পুস্তক "বন্ধুবরেষু" হইল। মেসের ও আফিসের বন্ধুবর্গ কেহই এক একখানি "মোতির মালা" লাভে বঞ্চিত হইলেন না।

বাসায় নীচের তলে একটা অব্যবহার্য্য স্যাঁৎসেতে খালিঘর পড়িয়া ছিল। মেস্‌বাসিগণের অনুমতিক্রমে, সাড়ে তিনটাকায় একখানি তক্তাপোষ কিনিয়া সরোজ সেই ঘরে বাকী সাতশত পুস্তক সাজাইয়া রাখিয়া দিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল।

প্রথম প্রথম সরোজ পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট এত ঘন ঘন যাতায়াত

আরম্ভ করিল যে, তাহারা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। এবম্বিধ তাগিদের দৌরাত্ম্যে কেহ কেহ শতকরা ত্রিশটাকা কমিশনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও বই ফেরৎ দিতে চাহিল। সেইজন্য সরোজ আর বড় সেদিকে যায় না—কি জানি যদি আবার বহি ফেরৎ দিতেই চাহে।

পূজার হিসাবে জানা গেল সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র দুইখানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। এতদিনে সরোজ যথার্থই আশাভঙ্গ হইল। এই কাব্যরসজ্ঞতার অভাবে এবং নিদারুণ মূর্খতার দরুণ সরোজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটার উপরেই একবারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। তাহার প্রধান আপ্‌শোষ—"বাঙ্গালী আমায় চিন্‌লে না! বাঙ্গলা দেশে জন্মেছি বলেই আমার আদর হলোনা।"

এদিকে সমালোচনার্থ যে সকল মাসিকপত্রে পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই "মোতির মালা"র উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিল। সে সকল সমালোচনা পড়িয়া সরোজকান্তের বুক দশ হাত হইল।

আষাঢ়ের নব মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সরোজের আবার কাব্য প্রকাশের উৎকট অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অর্থাভাবে এবার আর সে বাসনা ততটা প্রবল হইবার সুবিধা পাইল না। তথাপি সে ভাবিল—হাজার না ছাপাইয়া বরং পাঁচশো কপি বহি ছাপা যাউক। এমন দিনে ইয়ুরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল।

ব্যবসায়ে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। জাহাজ আর আসে না। কাগজ যাহা দেশে মজুত ছিল—তাহা অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল। বাঙ্গলা-সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইতে কাগজের রীম দ্বিগুণ দরেও হু হু করিয়া কাট্‌তি হইয়া গেল। পূর্ব্বকাব্যের গতি নিরীক্ষণ করিয়া সরোজ পিছাইল। এতদ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের লাভ হইল কি লোকসান্ হইল, তাহা সমালোচকগণই ভাল বলিতে পারেন।

সরকারী ও বেসরকারী আফিসের কর্ম্মচারী এবং সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণ সাধ্যমত যখন যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, সরোজও তখন পাঁচ টাকা চাঁদা সহি করিল। সরোজ পূর্ব্বে কখনও সংবাদ পত্র পড়িত না, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি সে সংবাদপত্রের একজন একান্ত অনুরক্ত পাঠক হইয়া পড়িল। তাহার তখন একমাত্র চিন্তা—বোধ হয় সাম্রাজ্যাধিপতি যুদ্ধলিপ্ত সম্রাটের অপেক্ষাও প্রবল চিন্তা—এ যুদ্ধ কবে শেষ হয়। কারণ শেষ না হইলে আর কাগজ দেশে আসিতে পারিতেছে না।

নানা দেশের রাজা মহারাজা ধনী বণিকগণ শিবিরোপযোগী সামগ্রীসম্ভার

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। নারীরা আহত সৈনিকবর্গের জন্য ব্যাণ্ডেজ, যোদ্ধাদের জন্য পায়জামা, তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যক বস্তুগুলি নিজে তৈরি করিয়া পাঠাইতেছেন। ধনিগণ কেহ সিগারেট, কেহ দেশ্‌লাই, কেহ খাদ্য পাঠাইয়া চরিতার্থ হইতেছে। সরোজ বলিল, যে তাহার ইচ্ছা সেও তাহার হাতের নির্ম্মাণ কোনও জিনিষ পাঠায়।

কালীবাবু বলিলেন—"তুমি তোমার বইগুলি পাঠাও, আর কি পাঠাবে?" সকলে হাসিয়া আকুল। কবি বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া সরোজ এই কথায় মনে মনে হাসিতেছিল। হঠাৎ সে এক ফন্দী ঠাওরাইল। কাহাকেও কিছু বলিল না বা কাহারও নিকট কোন পরামর্শও চাহিল না।

পরদিন আফিসে বড় সাহেবকে গিয়া সরোজ জানাইল যে সে একজন গ্রন্থকার, কবি হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার নামও কিছু আছে। সে এই যুদ্ধে আরও কিছু সাহায্য করিতে চাহে। তাহার অবিক্রীত প্রায় ৭০০ কপি কাব্যগ্রন্থ সে যুদ্ধের জন্য দান করিতে প্রস্তুত।

সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একটু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা ত বাঙ্গলা জানে না—তোমার বই তারা পড়্‌তেই পারবে না।"

সরোজ একটু সলজ্জভাবে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল—"বই যাবে না, যাবে টাকাই। যদি সাহেবের Honour এদিকে একটু নেকনজর দেন্ তো—"

সাহেব বাধা দিয়া উল্লসিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা? টাকা কি করে হবে?"

সরোজ সবিনয়ে নিবেদন করিল—"হুজুর যদি হুকুম দেন্ তো আমাদের আফিসের সকলেই এক এক খানি করে বই কিনিতে বাধ্য হবে। এ আফিসে যা বিক্রী হবার হবে, বাকীগুলি যদি হুজুর অন্য হাউসের বড় সাহেবদের বলে তাঁদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে চালিয়ে দেন—তা হ'লে আর বিক্রী হ'তে কতক্ষণ? একটাকা দাম বইতো নয়—তা সবাই দিতে পার্‌বে, বিশেষ, এমন সৎকার্য্যের জন্য। তার উপর আবার বড় সাহেবের হুকুম।"

সাহেবের মুখ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সোল্লাসে টেবিল চাপ্‌-

ড়াইয়া বলিলেন—"অতি চমৎকার কথা!. এ আমি নিশ্চয়ই কর্‌বো। **Capital idea, I must do it!"**

বড়বাবুর ডাক পড়িল। সাহেব বড়বাবুকে আদেশ দিলেন যে—এ মাসের বেতন বিলির সময় প্রত্যেক কর্ম্মচারীই যেন একটাকা দিয়া সরোজের বহি একখানি কেনে—এ টাকা ওয়ার রিলীফ্ ফণ্ডে যাইবে। কোনও কর্ম্মচারী যদি কিনিতে আপত্তি করে, তবে তাহার নাম যেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ জানান হয়।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে যে দোকানে "মোতিরমালা" ছিল, সরোজ কয়দিন যাবৎ তত্তৎ দোকান ঘুরিয়া, দোকানদারদিগকে আশাতীত রূপে বিস্মিত করিয়া দিয়া বইগুলি ফেরৎ আনিয়া বাসায় রাখিয়াছিল। ফেরৎ আনিবার সময় সরোজ তাহা-দিগকে ইচ্ছা করিয়াই দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া ও চড়া মেজাজ দেখাইয়া আত্মতৃপ্তির সুযোগ ছাড়ে নাই। দোকানদারগণ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-কারদের এরূপ রক্তচক্ষু মধ্যে মধ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু কবিতাগ্রন্থের লেখক যে উক্তরূপে জোর করিয়া বই ফিরাইয়া লইয়া যায়—ইহা তাহাদের নিকট একেবারে স্বপ্নাতীত নূতন বলিয়াই অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিল।

যথাসময়ে বেতন বাঁটিবার দিন আসিল। আফিসে অন্য কোনও বাবুর আসিবার আগে হইতেই সরোজ তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি আনাইয়া বড়বাবুর টেবিলের নিকট স্তূপীকৃত করিল। সাতাশো "মোতির মালা"য় ঘরে ন স্থানং তিল ধারণং।

সাহেবও সেদিন অপেক্ষাকৃত সকালেই আফিসে পদার্পণ করিলেন। সরোজ বারান্দাতেই ঘুরিতেছিল। সাহেব যেমন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, অমনি তাঁহাকে ধরণী সমান্তরাল মেরুদণ্ডে এক সেলাম দিল। সাহেব কবির পৃষ্ঠ চাপ্‌ড়াইয়া শুভ-প্রভাতের প্রতিদান দিলেন।

আফিসের সব বাবুই একখণ্ড করিয়া "মোতির মালা" ক্রয় করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এতদিন যে সরোজকে সকলে সাধারণ মনুষ্যস্তর হইতে একটা উচ্চতর জীব বলিয়া প্রশংসা করিতেন এবং "মোতির মালা" উপহার পাইয়া যে কাব্যের শতমুখে গুণগান করিয়াছেন—আজ তাঁহারাই সেই কাব্যের উপরে আচম্বিতে বিরূপ হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ খাজাঞ্চিবাবুর মুখটিই সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রসন্ন, কারণ তাঁহাকে কোন্ আফিসে কত বই পাঠাইতে হইবে, কোথা হইতে কত টাকা আসিল, কত বাকী, প্রভৃতির জন্য আর একটি নূতন বহি খুলিতে হইল। কায বাড়িল—কিন্তু দুপয়সা পাইবার কোন আশা নাই।

এদিকে সপ্তাহকাল হইতে প্রায় প্রত্যহই দেখা যাইতেছে যে বেলা পাঁচটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আফিস ফেরতা অধিকাংশ বাবুই এক একখণ্ড "মোতির মালা" হস্তে গৃহে ফিরিতেছে।

অচিরেই কলিকাতা সহরে গুজব উঠিয়া গেল, "মোতির মালা" নামক একখানি কবিতাগ্রন্থের আজকাল খুব চল্‌তি। গ্রন্থকারগণ, ক্রমশঃ পুস্তকবিক্রেতাগণও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেন। নবস্থাপিত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক "দত্ত কোম্পানী" আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহারা খোঁজখবর করিয়া জানিলেন যে "মোতির মালা" প্রণেতা কবি সরোজ কান্ত ১৮নং বেণেটোলা লেন মেসের বাসায় বাস করেন।

পরদিন স্বয়ং দত্ত মহাশয় বেণেটোলায় কবি-সন্দর্শনে আসিলেন। নানা কথাপ্রসঙ্গে ও কবির সুখ্যাতির সূত্রে তিনি তাঁহাদের ব্যয়ে সরোজের একখানি কাব্য প্রকাশের আগ্রহ জ্ঞাপন করিলেন। সরোজ মনে মনে হাসিয়া অনেক অনিচ্ছার ভান দেখাইয়া শেষে স্বীকার করিল। তিনদিনের মধ্যে কাপি পাইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া দত্ত মহাশয় বিজয়-উল্লাসে বিদায় লইলেন।

একমাসের মধ্যেই কাব্য বাহির হইল। নাম—"উপচার", মূল্য একটাকা। বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য প্রকাশকদের নিকট হইতে মাত্র পঞ্চাশখানি পুস্তক সরোজ পাইল; সেগুলি যথারীতি "বন্ধুবরেষু" হইল।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনখানির বেশী "উপচার" বিক্রয় হইল না দেখিয়া দত্ত মহাশয় অত্যন্ত দমিয়া গেলেন।

আবার একদিন দত্ত মহাশয় বেণেটোলার বাসায় উপস্থিত। মুখখানি তাঁহার আজ ম্লান, বিপন্নের মত দেখাইতেছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন, খরচ উঠিয়া গেলে লভ্যাংশের শতকরা ত্রিশটাকা তিনি পাইবেন বাকী টাকা গ্রন্থকার পাইবেন, এই মর্ম্মে যে চুক্তিপত্র হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি শতকরা পনেরো টাকা মাত্র লইতে প্রস্তুত—যদি সরোজ প্রকাশ-ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকাটা এখন তাঁহাকে নগদ দেয়। তাঁহাদের নূতন কারবার, এতটাকা লোক্‌সানে সর্ব্বনাশ হইতে পারে প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া বৃদ্ধ দত্ত মহাশয়

কবির করুণার উদ্রেক করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। আজ আর সরোজ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে টাকা দিতে তো স্বীকৃত হইলই না, বরং শাণিত বিদ্রূপের বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দত্ত মহাশয় নিজ মান নিজের কাছে বিবেচনা করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেলেন।

* * *

সরোজের এই মহনীয় রাজভক্তি ও সর্ব্বানুকরণীয় ত্যাগস্বীকারের বার্ত্তা বর্ণনা করিয়া সাহেব বিলাতের বড় আফিসে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আফিসে এবং সরোজকেও স্বতন্ত্র এক পত্র দিয়াছেন। সরোজের একশত টাকা বেতনে পদোন্নতি হইল।

সরোজ এখন মেস ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ীভাড়া করিয়া "ফ্যামিলি" লইয়া আসিয়াছে। জননী বাড়ীতে আছেন।

মাহিনাবৃদ্ধির প্রীতিভোজে নানা বাক্যালাপের মধ্যে জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ সরোজ বাবুর পদ্যটদ্য আর কাগজে দেখি না যে? লেখা ছেড়ে দিলেন নাকি?"

সরোজ হাঃ হাঃ করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—"নাঃ, সে সব ব্যারাম ভাল হ'য়ে গেছে। আমার বিশ্বাস-ম্যালেরিয়া দেশের যতটা না ক্ষতি হয়েছে, তার বেশী অনিষ্ট করেচে ঐ মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা।"

সম্পাদকের পূর্ব্বে সরোজ সম্পূর্ণ অমূলক একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল; আমরা বাহুল্যভয়ে সেটি আর লিপিবদ্ধ করিলাম না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

# অন্ধ-প্রেম

যে দিন প্রথম হেরিনু তাহায়
আপনা হারানু ক্ষণে,
না জানি কখন সারাটী হিয়ায়
সঁপে দিনু ও চরণে!

নিবে কি সে জন দেখিনি ভাবিয়া
করিনি কিছুই আশা,
হয়েছিনু সুখী শুধু বিকাইয়া
বুকভরা ভালবাসা!

সাধনা কামনা সে ছিল আমার,
সে ছিল প্রাণের প্রাণ,—
কত নিশি হায়, ধেয়ানে তাহার
হয়ে গেছে অবসান!

চাহিবার আগে দিয়েছিনু ধরা
সেই ত গৌরব মানি;—
জীবন সফল হল হেরি তার
হাসিভরা মুখখানি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

১২

তখন গোধূলির রক্তধূসর মিশ্রিতালোক তালগাছের মাথায় মাথায় নৃত্য করিতেছিল। দীঘি ঘেরিয়া যে ঘনগাছের ঝোপে আসন্নপ্রায় সন্ধ্যার ছায়া প্রায় কালো হইয়া আসিয়াছে, তাহারি ভিতর হইতে কতকগুলা শালিক চড়াই কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করিয়া যেন বাকি সবাইকে ধমক দিতেছিল। বাঁশপাতা অল্পবাতাসেই থর থর কাঁপে; সে কম্পনে আমারও বুকের মধ্যে ঠিক তেমনি কাঁপন কাঁপিতেছিল। আমার চোখের সাম্‌নে দুখানি পাংশু অধরোষ্ঠের ওই ওম্‌নি সঘন-কম্পন যেন স্পষ্টতর হইয়া রহিয়াছে। তাই বাহিরেও তাহার অনুকৃতি চোখে পড়িতেই চোখ ঢাকা দিতে ইচ্ছা করিল।

দূর হইতে দেখিতে পাইলাম অদূরে দীঘির ধারে একটা ফলন্ত কুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া শৈলেন কুলগাছের কাঁটাভরা ডাল সাবধানে নামাইয়া ধরিয়াছে, আর নির্লজ্জা লক্ষ্মী তা হইতে কুল পাড়িয়া-পাড়িয়া একখানি ডালায় ভরিতেছে। নির্জ্জন-প্রকৃতির নীরব সাধনা ও তপস্যাপরায়ণা মূর্ত্তির পাশে এই লজ্জাহীন অভিনয় কোন পাশ্চাত্য রঙ্গভূমে ভালই মানাইতে পারিত বটে, কিন্তু কোন হিন্দু পরিবারের নরনারীর মধ্যে—বিশেষতঃ তাহার মধ্যে একজন বিবাহিত,—এই পাশ্চাত্য কোর্টশিপের অভিনয় শুধু বেমানান, বিসদৃশই নয়, এদৃশ্য দর্শনে দ্রষ্টার সর্ব্বশরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠে,

আর সেই আগুন সে শুধু নিজের শরীর মনে সহ্য করিতে না পারিয়া অনল-পর্ব্বতের মতই গৈরিক-নিঃস্রাবে তাহার চারিদিক মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেও এক পলের চেয়ে বেশীক্ষণ দ্বিধা করিতে পারে না। সিংহের এ রকম অবস্থায় বোধ করি ঘাড়ের কেশর ফুলিয়া চারিগুণ হইয়া উঠিত; বাঘ হইলে তাহার শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বাভাসে শরীরটা দ্বিগুণ লম্বা ও সোজা হইয়া যাইত; কিন্তু মানুষ বলিয়া সে রকম কিছু বাহ্যলক্ষণে ব্যতিক্রম ঘটিল না। কেবল ক্রুদ্ধ সাগরতরঙ্গের মতই ভিতরে ভিতরে গর্জ্জিয়া সমস্তশরীরের রক্তটা ফুটিয়া ফেনাইয়া গাঁজাইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্মী, রাক্ষসী, পিশাচী, সয়তানি,—আমি তাহাকে চাহি না। তাহার ছায়া মাড়াইতেও চাহি না; কিন্তু সে কেন শৈলেনের মোহের ইন্ধন হইতে গেল! কেন সে তাহাকে সগর্ব্ব-প্রত্যাখ্যানে দূর করিয়া দিয়া বিজয়িনী রাণীর মত আমারি এই একচ্ছত্র রাজসিংহাসনের তলে আসিয়া দাঁড়াইল না? না হয় শৈলেন আমার চেয়ে বড়লোক, আমার চেয়ে তাহার চেহারাও হয়তো একটু ভাল হইলেও হইতে পারে। হইলই বা; কিন্তু আমার চেয়ে তবু সে কিসে তাহার যোগ্য? গীতাকারের বাক্যই ঠিক। তামস প্রকৃতির নরনারীরা তমঃপ্রধান আহার-বিহারেরই ভক্ত হয় যে! টাট্‌কা জিনিসে তাদের রুচি হইবে কেন? উচ্ছিষ্ট পূতি পর্য্যুষিতেই না তাদের প্রবৃত্তি। তিনি বলেন নাই, 'যাত যাম্ গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।'

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্॥

তেমনি যজ্ঞ দান তপ সবেরি কথাই ত বলেচেন, যে তাদের সকল কর্ম্মই এই নিয়মানুসারে 'বিধিহীন' 'মন্ত্রহীন' 'অদক্ষিণম্, 'শ্রদ্ধাবিরহিত' পরস্যোৎসাদনার্থ এই সবই হইয়া থাকে। ওদের দোষ কি? প্রকৃতিকে পরাভব করা ত আর সহজ নয়। সবাই ত আর ত্যাগীর সাত্ত্বিক প্রকৃতি লইয়া জন্মাইতে পারে নাই!

একটু কাছাকাছি আসিতেই দুজনকার মুখের ছবিও চোখে পড়িল। গোধূলির রাঙা আলোতেই হোক, কিম্বা প্রিয়ব্যক্তির সান্নিধ্যেই হোক, লক্ষ্মীর মুখখানা যেন আজ অধিকতর সরক্তরাগে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল। চোখের পাতা-দুখানি যেন তাহার সুখাবেশে স্বপ্ন-বিভোরের ন্যায় গলিয়া-ঢলিয়া পড়িতে-ছিল। লজ্জাবিপন্ন সেই মুখচ্ছবি যে একবার ভাল করিয়া দেখিয়াছে, সে কি আর কখন তাহা ভুলিতে পারে? বেচারা শৈলেনকেই বা আমি দোষ দিব কি! বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাহার অতবড় অপরাধও যেন

ছোট হইয়া দাঁড়ায়। সে বরং উল্টা নালিশ এই বলিয়া করিতে পারে যে, সে এই মোহিনীর সম্মোহনশক্তিতে সম্মোহিত (হিপ্‌নোটাইজ্‌ড) হইয়া গিয়া কি করিয়াছে না করিয়াছে কিছুই জানিতে পারে নাই!

কিন্তু সে কথা যাক্। এসকল কাব্য, কবিতা কল্পনা করিবার অবসর বা অবস্থা আমার মনে ছিল না এবং বাহিরেও ছিল না। তা ভিন্ন, আমি এতবড় নিঃস্বার্থ সাধু সত্যপীর নই যে, এই পরিতৃপ্ত প্রেমাভিনয় দর্শনে চরিতার্থ হইয়া ভাবিব—।

না না, সাধু সত্যপীর নই বা আমি কেন? আচ্ছা যাক্, ঘরে ঘরের লক্ষ্মী এখনও এই লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড হইতে মুক্তি লইয়া গেলেও তাঁর কাঠামোখানা এখনও ঘরেই পড়িয়া আছে। আমিও ত আর উহাদের সঙ্গেসঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান-হারা হই নাই।

"কি লক্ষ্মী, আরো কুল পাড়ি গোটা ছয়? না, এতেই তোমার দিদিকে খুসী করতে পারবে মনে হচ্চে? জানো লক্ষ্মী! দিদি তোমার—উঁ হুঁঃ লক্ষ্মী বল্‌চি কেন? এই না বলে রাখলাম, আজ থেকে তোমায় আমি 'রতিদেবী' বলে ডাক্‌বো! ওগো জন্ম—"

আমি আর এ অভিনয় দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিলাম না। যা শুনিলাম, তাহাতেই যেন আমার কর্ণরন্ধ্রে এনার্কিষ্টের বোমার নিকট-গর্জ্জন ধ্বনিত হইল। মানুষের এমন অধঃপতনও হয়? রবীন্দ্রনাথের 'বর' সাজিয়া এই মধ্যযৌবনে বিবাহিত শিক্ষিত যুবক আজ অবিবাহিতা কুমারীর সঙ্গে এ কি বালকোচিত অভিনয় করিতেছে! কঠিনস্বরে ডাকিলাম "শৈলেন?"

শৈলেন আমার সেই অতর্কিত সম্বোধনে প্রথমটা যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপরই আমার দিকে চোক পড়াতে সে গাছের অবনত-শাখা পরিত্যাগ করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াই সে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আমাদের দেশে যে মেয়েরা বলে, সাধ্‌লে জামাই খায় না, শেষ আর পায় না; তোমার অবস্থা দেখি সেই রকমই। আজ আর বুঝি ক্ষুধার জ্বালায় লাজলজ্জায় জলাঞ্জলি না দিয়ে পারলে না? এতবড় প্রকাণ্ড ক্ষুধায় জ্বলে,—"

কর্কশকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম "থামো! জানো, তুমি তোমার এই হীন আনন্দের আজ কি মূল্য তুমি পরিশোধ করলে? তোমার মনস্কামনা

পূর্ণ হবার সুযোগ তোমায় দিয়ে সে ত পথ ছেড়েই দাঁড়িয়েছে। আজ এই সর্ব্ব-নাশের দিনটাতেও একটু ধৈর্য্য রাখো।—"

এসব কথা, এই তিরস্কারের কথাগুলা, পরে অনেকবারই ভাবিয়া দেখিয়াছি, বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ও জায়গায় একথা খাটেও না। বোধ-করি যে বিষয়টার দায়িত্ব নিজের উপরই নিজের বিবেক না টানিয়া আনিয়া থাকিতে পারিতেছিল না, সেইটেকেই নিজের উপর হইতে সরাইয়া খসাইয়া অপরের ঘাড়ের উপরে পূরাপূরি রকমে ফেলিতে পারিলে তবে না বুকের নিঃশ্বাস একটু সহজে পড়ে! যে গেল, সে যে আমারই জন্য গেল,—আমার দোষে, আমার অপরিণামদর্শী আকস্মিক-উত্তেজনাপূর্ণ উদ্ধত কাণ্ডের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া চলিয়া গেল, এ যে মনে করিতে, সহ্য করিতে পারা যায় না!

শৈলেন্দ্রের হাসিমুখে সেই যে আমার তীব্র তিরস্কারে অকস্মাৎ কি একটা অপ্রত্যাশিত, অজ্ঞাত, নিদারুণ আতঙ্কের রেখাপাত করিল, সে দাগ আর বুঝি এজন্মে, তাহার মুখ হইতে না হোক, বুক হইতে আর ঘুচিল না। সে যেন কি এক রকম হইয়া গিয়া মুহূর্ত্তে স্তম্ভিতভাবে চাহিল। "সর্ব্বনাশ! সে কি মণ্টু! আমার, আমার মণ্টুধন, আমার মণ্টু!" তাহার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত হইল। সে যেন হাঁফাইতে লাগিল। এই একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সে স্বর্গসুখে বিভোর থাকিয়া প্রিয়তমাকে 'রতি-দেবী' সাজাইতেছিল না! এর নাম সুখ! আমি তখনও তাহাকে দয়ার্হ মনে করিতে পারি নাই। কেমন করিয়াই বা করিব? সকলেই বিচার করিয়া বলুন, যথার্থই কি সে দয়ার্হ? কি কাণ্ডটাই না সে তাহার একটা চপলতার দরুণ ঘটাইয়া তুলিল! এখন বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া মন একটু বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই এতবড় পাষণ্ডের প্রতি খামকা অমনি দয়া আসিবে? না, কেন আসিবে?

আমি বলিলাম, "মণ্টু না, সে ভাল আছে। ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আজ যাঁকে তোমার আর দরকার ছিল না, তোমার সেই এক-দিনের বড় আদরের স্ত্রী—"

"ও কি রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়া তুমি কথা বল্‌চো মন্মথ? কি বল্‌বে? কি সংবাদ আমার জন্যে এনেছ, স্পষ্ট করে তাই বলো না।—তড়িৎ, আমার তড়িতের কি হয়েচে? না সে ত ভাল ছিল।—

কিছু ত তার হয় নি। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্চ। তুমি কি বল্‌চো মনু ?”

এমনি করিয়া সে কথাগুলা বলিল যে, আমার মনের ভিতর জমাট-বাঁধা করুণা যেন ঈষৎ নাড়া পাইয়া উঠিল। কে জানে কেন, অনেক-খানি যেন গরম হইয়া পড়িয়াই সহানুভূতির ব্যথিতস্বরে কেমন করিয়া সেই পত্নীঘাতী পাপিষ্ঠকেই বলিয়া বসিলাম, “বিশ্বাস করতে পারচো না শৈলেন! এই তোমাকে সইতে হবে। তিনি নেই, তিনি আমাদের জন্মের মত ছেড়ে গেছেন—”

উন্মত্তের ন্যায় শৈলেন ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল, “নেই বলো না। সে আছে, আছে গো আছে। আমার তড়িৎ নেই! কে বল্লে এ কথা? পাগল হয়েছ মন্মথ! আমার তড়িৎ নেই? নিশ্চয়, নিশ্চয় সে আছে। আছে। আমায় ছেড়ে সে চলে গ্যাছে? পাগল হয়েছ মনু! সে, সে তড়িৎ চলে যাবে? আমায় ছেড়ে? আমায় সে ছেড়ে যাবে? এই তোমাদের বিশ্বাস হয়? আমার হয় না। বলো সে যায় নি? বলো—”

আর আমি থাকিতে পারিলাম না। ঝর ঝর করিয়া আমার চোখে জল ঝরিয়া পড়িল। কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া বলিলাম, “কি বল্‌বো ভাই, যা সত্য, তাই বল্‌ছি।”

শৈলেনের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন এই কথায় একবার সঘনে কাঁপিয়া উঠিল। সে বিস্ফারিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন বুক ফাটাইয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, “এই সত্য! এত বড় ভয়ঙ্কর মিথ্যাও তোমাদের কাছে সত্য হল? তড়িৎ নেই! একে বলো সত্য? আমার তড়িৎ, আমার তড়িৎ নেই! আচ্ছা আমি গিয়ে দেখ্‌বো, আমি তাকে যেতে দিলে তবে তো সে যাবে। সে তো আমার অনুমতি না নিয়ে কিছু করে না, কোথাও যায় না।”

উন্মত্তের মত ছুটিয়া শৈলেন সাইকেলটা টানিয়া লইয়া উঠিয়া বসিল, এবং একমুহূর্ত্তেই যেন উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি নামিয়া সেটা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তাহার গতি দেখিয়া ও অবস্থা দেখিয়া আমার যেন একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। কি জানি কেমন করিয়া ঐ মত্তাবস্থার মত অবস্থায় সে ঐ পূর্ণবলে চালান মোটরে কেমন করিয়া নিজেকে ও পরকে বাঁচাইয়া বাড়ী পৌছিবে। তার চেয়ে দুজনে একসঙ্গে তাহার টমটমে চড়িয়া গেলেই ভাল

হইত। ইচ্ছা তো তাই ছিল, মাঝে হইতে ও যে এরকমটা করিবে, তা কেমন করিয়া জানিব? যাই হোক, যা হইয়াছে এখন আর তার চারাই নাই, তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিবার কল্পনা বাতুলের জল্পনা মাত্র। মোটর সাইকেলের পূর্ণতেজের সঙ্গে কে ছুটিতে পারিবে—ঘোড়া না মানুষ?

যখন আসিয়াছিলাম, তখন মস্ত বড় কর্ত্তব্যের খাতিরে গায়ে বল আসিয়াছিল; এখন যেন আর ফিরিতে পা উঠিতেছিল না। কোথায় ফিরিতে হইবে মনে হইলেই যেন বুকটা চড়চড় করিয়া ফাটিয়া উঠে। যে গৃহে ফিরিব, সে গৃহের লক্ষ্মীকে নিজেই বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি।

পিছনে কাহার ভয়ার্ত্ত ঘনশ্বাস অনুভব করিলাম। চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখি, যাহার সহিত অমন কাছাকাছি হইয়া মুখামুখি হইয়াছি, সে লক্ষ্মী। আমি এক নিমেষের জন্য যেন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, ভাল, মন্দ, যা কিছু সব ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব হারাইয়া আমার সন্নিকটবর্ত্তিনী সেই লক্ষ্মীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলাম।

কোন্ সে মায়াবী ভাস্কর এই মায়ামূর্ত্তি রচনা করিয়া, এই মোহবদ্ধ মানবমণ্ডলীকে মোহিনীমন্ত্রে মোহিত করিবার জন্য ইহাকে মর্ত্ত্যবাসিনী করিয়াছিল? এই তিলোত্তমা কি সুন্দউপসুন্দসম সোহদরাধিক প্রিয়বন্ধুদ্বয়ের আজীবন সৌহার্দ্দ-বন্ধন ছেদনার্থ কুচক্রী দেবতার চক্র? অনেক দেখিয়াছি, এমন দেখি নাই,—দেখিয়া এমন হই নাই।

লক্ষ্মীর সেই রাগরক্তিম গোলাপী গণ্ডের উজ্জ্বলতা তখন আর একটুও বিকশিত ছিল না। শিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র অলক্তরঞ্জিতবৎ ঠোঁটদুখানি ছাইএর মত পাংশু হইয়া গিয়াছিল। তড়িতার সে নীল ঠোঁটও যেন এর চেয়ে জীবন্ত মনে হইতেছিল। ফুটন্ত ফুলটা যেন হঠাৎ রৌদ্রের তেজে ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া এম্‌নি মনে হইল। সে যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে! আমার কত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিঃশ্বাস আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, তাহার বস্ত্রের অংশ আমার গায়ে ঠেকিতেছে; সে সব সে কিছুই বোধ করি বুঝিতে পারে নাই। শুধু মৃদুনিক্ষিপ্তশ্বাসে সে যেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াই আমায় এইটুকু জিজ্ঞাসা করিল;—যেন না করিয়া পারিল না বলিয়াই বড় বিপন্ন, বড় ব্যাকুলভাবেই বলিল—"ওঁর কি হয়েছে? উনি কেন অমন করে চলে গেলেন?"

হায় রে তিলেতিলে গড়িয়া-তোলা তিলোত্তমা! তোর অধমতার কথা

ভুলাইয়া আমাকেও কি তোর ওই ছার মোহমন্ত্রের পাশে বাঁধিতে আসিয়াছিলি, রাক্ষসি? তা বেশ করিয়াছিস্। তোর ভিতরকার গরল তবু একটু এইসঙ্গে ছড়াইয়া দিলি। আমার অজ্ঞানের অঞ্জনটুকু চোখে লাগিতে আসিয়াও তাই আর লাগিল না।

আমার সর্ব্বশরীর মনের আগুনে আবার জ্বলিয়া উঠিল; সামলাইতে ইচ্ছাও হইল না। দুকথা যদি বলিবার সুযোগ পাইয়াছি, কালামুখী যখন আপনি আমায় তা আনিয়া দিয়াছে, তখন কেনই বা না তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া লই? রাগের মাথায় অনেক কথাই বলিয়া গেলাম। ঠিক যে কি কি বলিয়াছিলাম, তা এখন আর বেশ স্মরণ হয় না। দু একটা এই রকম ভাসাভাসা যেন মনে আসে, "কি হয়েছে? তোমরা দুজনেই যা কামনা করছিলে, তাই হয়েছে! আর কি হবে? ছি ছি লক্ষ্মী, না হয় গরীব হয়েই জন্মেছ, কিন্তু মনটাকে তো অত ছোট না করলেও পারতে? বিয়ে যদি তা'তে না হতো, না হয় নাই হতো। অমন করে একজনের সর্ব্বনাশ করে কি সাধুলোকটার মাথা খেতে হয়? ও না হয় তোমায় গরীব অনাথ বলে দয়াই করতে এসেছিল, তাই কি না তুমি ওকে রূপের ফাঁদে ফেলে ওর জীবনটাকে জন্মের মত এত বড় একটা কলঙ্কের দাগে দাগী করে দিলে? নিজেকে এই লালসাবহ্নির পতঙ্গ না করে এর চেয়ে যদি দীঘির জলে—"

আর না, আর কিছু বলা আমার উচিত নয়। কি জানি সত্যসত্যই যদি আমার এই উচিত উপদেশটাকে সে মান্য করিয়া লয়। কেন আবার এ কথা মুখ দিয়া বাহির করিলাম? আবার কি একটা স্ত্রীহত্যা-পাতকের ভাগীদার হইয়া দাঁড়াইব না কি?

না, সে ভয় নাই! ভালমানুষের মত মুখটি টেপা হইলে কি হয়, মানুষ যে খুবই ভাল নয়, লক্ষ্মী ইতিমধ্যেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। আজিকার এই শুভগ্রহের শুভদৃষ্টিপাতের পরে কোথাকার কে একটা মানুষের একটু তিরস্কারে সে তাহার সম্মুখে প্রসারিত এই অপ্রতিহত সাম্রাজ্যভোগ ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইবে না। দুদিন বাদেই তো শৈলেনের প্রাসাদতুল্য গৃহের সর্ব্বময়ী হইয়া সে সেখানে বিরাজ করিতে পাইবে; দীঘির তলায় যে থাকিবার, সেই তলাইয়া গেল।

নতশিরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী মৌন-স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া অবিচলিতভাবে আমার সেই শরক্ষেপ নিজের বক্ষে গ্রহণ করিল। যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক তেমনি রহিল; আমার কথা শেষ হইলেও সে মুখ তুলিল না, কি একটু নড়িল না।

তাহার পরিধানে সেদিন একখানি আধময়লা শান্তিপুরে-সাড়ি ছিল ; এরই জোড়া আমি তড়িতাকে পরিতে দেখিয়াছি। খুবসম্ভব শৈলেনের দেওয়া। তাহার হাতে কয়গাছি কাচের চুড়ি ; কিন্তু কণ্ঠে তাহার সেই লক্ষ্মী-মনোগ্রামকরা লকেট-দেওয়া সরু হার। শৈলেন দিয়াছে ; বোধ করি নিজেই তাহার গলায় পরাইয়া দিয়াছে!—ঘর্ম্মাক্ত-ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ নজর পড়িয়া গেল, তাহার সেই আনত-মস্তকে চিক্কনকালো চুলের উপরে দু একটা ধান ও দুর্ব্বা যেন বাঁকানো চুলের ফাঁকের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে। মঙ্গল-আশীর্ব্বাদের শুভ মাঙ্গল্যচিহ্ন!

বুকটা কেমন যেন ধড়ফড় করিয়া উঠিল। কেন একবার বড় ইচ্ছা হইল এখনই বলিয়া উঠি, 'না না লক্ষ্মী, না না, যা বলিয়াছি তোমায় বলি নাই! রাগ চণ্ডাল! কি বলিতে কি বলাইয়াছে কিছু মনে করো না।' কিছু যেন ঠিক করিতে না পারিয়া আমি নিজে নিজের বাষ্পের চাপে ফাটিতেছি, আর যে যে আমার কাছে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাকেও সেই বিস্ফোরকের তেজে ফাটাইয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছি। আমি যেন একটা দুর্দ্দান্ত উল্কা। নিজের কেন্দ্র হারাইয়াছি ; তাই এখন আমার কাজ শুধু সকলকেই সেইরূপ কেন্দ্রচ্যুত করা।

ধর্ম্মবল ভিতরে থাকিলে অনেক ফাঁড়া কাটিয়া ওঠে। যা হোক, এই মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ফিরিতে তো শক্তি হইল। রাস্তায় আসিয়া জীবনে এই শেষবারের জন্য একবার মাণিকতলাও দীঘির দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। সহিস ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়িখানা ততক্ষণ গাছের তলা হইতে মাঝপথে সরাইয়া আনিতেছিল।

দীঘির কালোজল স্থির প্রশান্তমুখে উদ্ধাকাশে যেমন চাহিয়া থাকে, তেমনি চাহিয়া আছে। এই জপের নক্ষত্রমালা বুকের উপর ধরা তপস্বিনী দেবতার কাছে যে নিজের ভক্তি নিবেদন করিতেছিলেন, তারমধ্যে কি আমাদের দিদিমায়েদের মতন সংসারের শত খুঁটিনাটির ছোট বড় কামনাটুকু মাখানো ছিল? না তিনিও গীতা পাঠ করিয়াছেন? দেখিলাম—সেই দূর হইতেই দেখিলাম,—নতবদনা ভূমিলগ্নদৃষ্টি প্রস্তরপ্রতিমার মত লক্ষ্মী ঠিক সেইভাবে সেইখানে, তেমনি স্তব্ধ, তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গাড়ির উপর উঠিয়া লাগাম তুলিয়া লইলাম। যে করুণার্হ নয়, তাহার প্রতি করুণা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যমাত্র। তাহা ক্লৈব্য ; ভগবানই তাহার নিষেধকর্ত্তা! আমি কে?

( ১৩ )

প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ কি ? সেই বাড়ী সেই ঘর, তেমনি সাজান সেই ড্রইংরুম ; কৌচের উপর তড়িতারই হাতের নির্ম্মিত সেই ভেলভেটের 'কুসন' ; টেবিলে রেশমের লতাকাটা সেই আস্তরণ ; দেওয়ালে সেই কার্পেটের, ভেলভেটের হাতে-আঁকা ছবি ; তাঁহার বৃহৎ আলোকচিত্র দরজার মাথায় তেমনি সম্মুখে শৈলেনের চিত্রের দিকে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি পূর্ব্বেও দেখিয়াছি ; কিন্তু তার মধ্যে যে কি ছিল, তা এতদিন দেখিতে পাই নাই। আজ দেখিয়াছিলাম। এই দৃষ্টিই সেই হাসির বিদ্যুতের মাঝখানে সেই তড়িচ্ছটায় জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা সতীপ্রাণের গভীর প্রেমের দৃষ্টি !

সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। আজ সকালেও এ বাড়ীতে কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কতখানি জীবন ছিল ; আর এই সন্ধ্যায় তাহার সেই সবটুকু মধু সরস রস, তাহার সমস্তটুকু জীবনী যেন মধুমক্ষির মৌচাকের মতই কে নিঙ-ড়াইয়া কাড়িয়া লইয়াছে। এই মধুচক্রটি আজ তাহার রাণী হারাইয়াছে।

কে যেন বুকের মধ্য হইতে ডাকিয়া বলিয়া দিল "তুইই এই সুখের বাসাটিতে আগুন লাগাইয়া ভস্ম করিয়া দিলি! এই করিতেই কি বন্ধুগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলি ?

আমার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—কাঁপিবেই বা কেন ? আমার দোষ কি ? বন্ধু করিল পাপ, সেই পাপের আগুনে তার ঘর না পুড়িয়া পুড়িল বলিতে হইবে কি না আমার সেই অগ্নিনির্ব্বাণচেষ্টার ফুৎকারেই ! তা এ বিচার মন্দ না। কথামালার বাঘ নিরীহ মেষশাবকের এইরকমই বিচার করিয়াছিল।

আচ্ছা, আমি কি দোষটা করিলাম ? তড়িতার স্বামী শৈলেন, স্ত্রীকে লুকাইয়া অপর একজনকে বিবাহ করিতেছিল, আমি সেটা দৈবক্রমে জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রমাণপ্রয়োগও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষেত্রে কি আমার জড়ের মত মিটিমিটি চাহিয়া চুপ করিয়া বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর দুর্দ্দশা দেখা উচিত ছিল ? না মানুষের মত ইহার প্রতিকারচেষ্টা করাই উচিত হইয়াছিল ?—এ আমি কেমন করিয়া মনে করিব যে, এই আমাদেরই মত একটা মানুষ, সে না বিছানায়-শোওয়া রোগী, না তিন-হাঁটু এক-করা দুর্ব্বল বৃদ্ধ ; সে খাই-তেছে, বেড়াইতেছে, সাজিতেছে, গায়িতেছে, বাজাইতেছে, সে যে আমার মুখের

এই একটি খবরের ঘাও সহিতে পারিবে না! অমনি ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার বাড়া করিয়া মরিয়া যাইবে, তা কেমন করিয়া জানিব?

আচ্ছা, তাও না হয় হইল; কিন্তু আমি না বলিলেই কি আর চিরদিন এ ঘটনা তার কাছে অজ্ঞাত থাকিত? বিশেষ এই একই দেশে তিনজনে বাস করিয়া? যা নিশ্চয়ই ঘটিত, তাই ঘটিয়াছে। আমার কি এত দোষ?

ছেলেটাকে লইয়া তার দাসী বড়ই বিব্রত হইয়াছে। সে যে সেই হইতে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কোনমতেই চাপরাসী আর্দ্দালি ভৃত্যগণ, ধাত্রী নিজে—কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে বুকে চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ক্রন্দনক্লান্ত ভাঙ্গাগলায় সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, "আইয়া মেলা মেমতাব্ কাঁহালে? মেলা মায়িদী কাঁহা? আমায় পাইয়া তাহার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। "আমাল মা কোথালে? বল্না আমাল্ মা কোথা গেল?" বলিয়া সে আমায় যেন পাগল করিয়া দিতে লাগিল। ওরে মাতৃহীন অভাগা! যা গেল শুধু তোরই গেল। আর কার কি?

শৈলেন শ্মশান হইতে ফিরিয়াছে জানিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হয় নাই। আয়াটা আমায় বলিল "সাহেব কি রকম হয়ে গিয়েছেন। যখন বাড়ী এলেন, মনে হলো তিনি খুব নেশা করে এসেছেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না। কিন্তু তারপর থেকেই একেবারে স্থির হয়ে গেছেন। যেন কিছুই হয় নি। এ রকম আমি দেখি নি।"

মনে মনে বলিলাম, কোথা থেকে দেখবি? সবার তো আর লক্ষ্মী থাকে না। সেই তাপশুষ্ক শ্যামলতার পরিবর্ত্তে এই সব পল্লবিনী আলোকলতা যে অনেকখানি সান্ত্বনার।

একটু বেশি রাত্রে সে কি করিতেছে, কোথায় আছে খবর লইবার জন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া শেষে তড়িতার শয়নকক্ষে তাহাকে পাইলাম। এলোমেলো বিছানার উপর সে উপুড় হইয়া মুখটা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

গৃহের বিশৃঙ্খলা ও শূন্যতা যেন আমার দিকে চাহিয়া অনুযোগের কান্না কাঁদিয়া কহিল 'নাই, সে নাই। যে এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী ছিল, এ ঘরের যে লক্ষ্মী ছিল, সে আজ ইহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, সে আর নাই—নাই—নাই!'

প্রাণের মধ্যে যেন আনচান করিতে লাগিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

নিঃশব্দে খাটের উপরে শৈলেনের পাশে বসিলাম। কি যে বলিব, তা যেন ভাবিয়া পাইলাম না।

বসিবার সময় বোধ করি খাটখানা একটু নড়িয়া থাকিবে, সেই শব্দেই হয় তো শৈলেন চমকিয়া মুখ তুলিল। পরক্ষণেই আবার তাহার মুখেচোখে সেই অফুরন্ত যন্ত্রণার শোকচিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল। পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে ঈষৎ ক্ষীণহাসি হাসিয়া কহিল, "মানুষের কি মন মনু? একটুমাত্র আমার ইহজন্মের একমাত্র সুখ, শান্তি, আনন্দ, আমার ঘরের মঙ্গললক্ষ্মী, আমার মণ্টুর মা, আমার ভবিষ্যতের আশাকেন্দ্র, আমার সব, আমার সমস্তই আমি নিজের হাতে জ্বলন্ত চিতার বুকে তুলে দিয়ে এলুম। যে মুখ আজ এই পাঁচ বৎসরে রাত্রিদিন দেখেও আমি দেখার তৃপ্তি পাই নি; পাছে সে আমার এ দৃষ্টিটুকুও সইতে না পেরে ক্লান্ত হয়, এই ভয়ে আমি যেন সাহস করে যে মুখের দিকে বেশীক্ষণ চাইতেও পারতুম না, সেই মুখে,—কি বলবো তোমায় মনু, সেই মুখে—নিষ্ঠুর আমি,—আমি নিজে হাতে করে—, উঃ, ভগবান! মানুষকে তুমি কত সইতে দাও! তার শেষ ভস্ম জলে ধুয়ে দিয়ে ফিরে এলুম! আমার তড়িতের যে আমি কিছু শেষ রাখলুম না! একেবারে তাকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে, নিশ্চিহ্ন করে রেখে এলুম। তুমি এসে বসতেই মনে হলো বুঝি সেই-ই এসেছে।"

শৈলেন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি নীরবে নিজের অশ্রুবিন্দুগুলা মুছিয়া শেষ করিতে চাহিলাম; কিন্তু শৈলেনের কণ্ঠস্বর যে তখনও সেই স্তব্ধকক্ষের বাহ্য-স্তব্ধতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহার প্রতিধ্বনি আমার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মথিত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া তাহাকে সান্ত্বনারভাবে কহিলাম, "কি করবে ভাই, পৃথিবীর নিয়মই এই।"

"না না, এ ত পৃথিবীর নিয়ম নয় মনু! এ তো পৃথিবীর সে বাঁধা-নিয়ম নয়। সেতো, সবাই যেমন করে যায়, তেমনি করে গেল না! সে যে আমায় না জানিয়ে, না শুনিয়ে বজ্রের মত মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল। এ কি রকম করে গেল সে! একে কি যাওয়া বলে? তুমি এমন যাওয়া কারু কখন দেখেছ? যাবার আগে সে যেখানেই যাক্, একটুও ত জানিয়ে যায়। এমন করে কারু কেউ কি কখনও কোথায় গেছে?"

আমি নীরবে রহিলাম; কি বলিব! এর কি কোন উত্তর আছে?

শৈলেন আবার বলিল, অত্যন্ত মৃদু ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, "সব শেষ হ'য়ে গেছে, তবু বিশ্বাস করতে পারচি না ; তবু মনে করতে ইচ্ছা করচে না যে, এ কথা বিশ্বাস করি। কি দোষে সে আমায় এমন নিষ্ঠুরের মতন ফেলে চলে গেল ? আমার কি অপরাধে সে আমায় এত বড় শাস্তি দিলে ? সে তো কথনও একটি দিনের জন্য আমার উপর এতটুকু অভিমান করেনি। আমায় ছেড়ে থাকতে হবে বলে কখন আমার সঙ্গছাড়া বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত যেত না। আমার সেই তড়িতা আমায় এমন করে ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল! মনু, বল ভাই, এ কি বিশ্বাস করা যায় ? বাজ পড়বার আগেও তো একবার ডেকে পড়ে। আমি যে একটুকু পূর্ব্বে তাকে সহজ, সবল, আমার আনন্দময়ী তড়িৎ দেখে গেছি! ফিরে এসে আর তাকে দেখ্‌তে পেলাম না, সে আমার এমন করে চলে গেল! আমার এ কি হ'ল মনু,আমার এ কি হ'ল!"

আমি অশ্রুবিন্দুকে ধারায় পরিবর্ত্তিত হওয়া রোধ করিতে পারিলাম না। শৈলেনের এই কাতরতায় যে একটা যন্ত্রণা ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে তাহার সকল পাপ যেন গলিয়া পড়িতেছিল। নিজের মনের অপরাধ স্মরণ করিয়াই হয় ত সে এখন এতখানি অনুতপ্ত। স্ত্রীকে যে সে সত্যই বড় ভালবাসিত! মোহে হয়ত তাহা অপহরণ করিতেছিল, নষ্ট ত করিতে পারে নাই। কাতর না হইবে কেন ?

আমি বলিলাম, "যাঁকে এতখানি ভালবাস্‌তে শৈল, কেন যে তোমার এ মতি ঘটলো, হঠাৎ তাঁর প্রতি অতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে গেলে—"

শৈলেন্দ্র মাথা তুলিল, আক্রমণকারীর প্রতি আক্রান্ত যেমন করিয়া তাকায়, সেইরূপ ভয়বিহ্বল-বিস্ফারিতনেত্রে সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আজ বারেবারেই এ সব কি বলছ মনু ? আমি কার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি ?"

আমি অনিচ্ছাসত্বেও, কেবলমাত্র বলা উচিত বোধেই বলিলাম, "এখন আর ও সব আলোচনা না করাই ভাল। তবু জিজ্ঞেস করচো, তাই বলি, লক্ষ্মীকে যদি এমন ব্যস্ত হয়ে, হিতাহিতজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়ে বিয়ে করতে না যেতে, তা হলে হয়তো তিনি আরও কিছুদিন থাক্‌তে পারতেন। জীবন তাঁর তো একটি সরু সূতোয়ই ঝুলছিল।"

শৈলেন নির্ব্বাক-বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ধীরেধীরে বলিল, "কি, তুমি কি বল্‌চো ?"

তাহার ন্যাকামির চেষ্টা দেখিয়া এ অবস্থায়ও আমার একটুএকটু রাগ হইতেছিল। মনের অগোচর ত আর পাপ নাই! অনর্থক এ প্রহসনের দৃশ্যে মাত্রাতিরিক্ত লোকহাসানয় ফল কি? দ্বিধাহীনভাবেই তাই বলিতে পারিলাম, "বুঝতেই ত পারচো শৈলেন, তুমিও ত তাঁকে কম ভালবাসতে না, শুধু কি একটা মতিভ্রমে পড়ে এত বড় পাপটা করতে গেলে। যদিও আমি নিজের কাণে লক্ষ্মীকে তোমার ভালবাসার কথা বলতে শুনেচি, তবু আমার বিশ্বাস যে তার উপর তোমার যে ভাব, তা শুধু মোহ।" যন্ত্রণার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শৈলেন অতিকষ্টে উচ্চারণ করিতে পারিল, "এ কি ভয়ানক কথা!" আর কিছু বোধ করি সে বলিতে পারিল না বলিয়াই সাতঙ্ক বিস্ময়ে শুধু আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অমি কহিতে লাগিলাম, "কথা নিশ্চয়ই ভয়ানক! শিরোমণির চিঠিতে দেখিলাম বিয়ের আর দিন নাই, উদ্যোগপর্ব্বও দেখিতে পাইতেছি। লক্ষ্মীকেও 'ভালবাসা' জানাচ্চ, এসব দেখে কি করে চুপ করে থাকা যায় শৈল? কাজেই আমায় এ সব কথা শুধু প্রতিকারের জন্যই তাঁকে জানাতে হলো।—তিনি অবশ্য কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি। আর বিশ্বাস করেও একটিবারের জন্য তোমায় দোষী করেন নি। বরং এ'ও বলেছিলেন যে যদি তুমি সত্যই এ সঙ্কল্প করে থাকো তিনি তাতে কিছুমাত্র বাধা দেবেন না; সতীলক্ষ্মী—তিনি, কিন্তু দুর্ব্বল বুক তাঁর তিনি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সায় দিতে পারলেন না।"

সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া উন্মাদের ন্যায় অধীরকণ্ঠে শৈলেন বলিয়া উঠিল, "এই তুমি জেনে গেলে? ও আমার আদরিণি! এই অবিশ্বাসের আগুনে আমায় চিরজন্মের মত দগ্ধ করতে রেখে, এই আগুনে তুমি নিজেকে ভস্ম করে দিলে! ফিরে এসো, ফিরে এসো, তড়িৎ! একবার ফিরে এসো! ফিরে এসো তড়িৎ, একটিবারের জন্য ফিরে এসে শুধু শুনে যাও, যা তুমি জেনে গেছ, তা নয়। তা কিছুই নয়, তার কোন ভিত্তিই নেই। তোমার শৈলেন তোমারি আছে, তোমারি থাক্‌বে। উঃ—কি অসহ্য যন্ত্রণায় বুক তোমার ফেটে গ্যাছে! সেই যন্ত্রণার চিরস্মৃতি ত আমার এ শক্ত বুককে ফাটাতে পারবে না। আমি এ কেমন করে সহ্য করবো? ও তড়িৎ, তড়িৎ, তড়িৎ! এই অবিশ্বাস নিয়ে কেমন করে চলে গেলে, কেন তুমি একবার আমায় জিজ্ঞেস করবার জন্য এতটুকু বিলম্ব করলে না? কেন তড়িৎ, কেন এমন করে আমায় এতবড় দণ্ড দিলে?—"

শৈলেনের এইবার দুইচোক দিয়া অজস্রধারে জল পড়িতে লাগিল। ঘটনাটা যেন সহসা কেমন একটা দুর্ভেদ্য রহস্যজালজড়িত অস্পষ্ট ও ধূসর মনে হইয়া আসিল। একটা আগন্তুক ভয়ে যেন আমার হাতপা অবশ হইয়া আসিল। অঁ্যা তবে কি আমারি কিছু ভুল হইয়াছে! সত্য-সত্যাই ও সকল কিছুই ঘটে নাই? অনর্থক কি আমি একটা নিজের মিথ্যা অনুমানের বশে একটি নিরপরাধীর জীবন চিরদুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিয়া দিলাম! নারীহত্যা করিলাম! আতঙ্কে শিহরিয়া কহিয়া উঠিলাম, "তবে কি তুমি লক্ষ্মীকে বিয়ে করবার বন্দোবস্ত করছিলে না? আমি কি তবে তাঁকে মিথ্যা করে এতবড় আঘাত দিয়েছি? বলো, বলো, বলো?"

বুকে যেন আমার হাঁফ ধরিয়া গলা পর্য্যন্ত কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়াছিল; তাহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক্ নিশ্বাস আর বাহির হইতে পারিল না।

শৈলেন অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর অবরুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "যদি এমন ভয়ঙ্কর সন্দেহ তোমার মনে এসেছিল, আমায় যদি এতবড় পাপিষ্ঠই মনে করতে পেরেছিলে, তুমি তা স্পষ্ট করে আমায় বল্লে না কেন মন্মথ? আমি লক্ষ্মীকে ভালবাসি তা আমি ত কখনও অস্বীকার করিনি। ভাল কি মানুষকে একরকমেই বাস্‌তে হয়? তাকে বড্ডই ভাল বেসেছিলাম বলে, তাকে কৌশলে তোমার হাতেই দেবার উদ্যোগ করেছিলুম। আমি জানি যে, তুমিও তাকে ভালবেসেছ; কিন্তু নিজের জিদের বশে কিছু প্রকাশ করতে পারচো না। তাই তোমার দাদার ও মায়ের অনুমতি নিয়ে ভিতরে ভিতরে সমস্ত ব্যবস্থা করে তুলেছিলাম। ইচ্ছা ছিল তোমার মা ও দাদা নিজে এসেই তোমায় সব বলবেন, তখন আশীর্ব্বাদও হয়ে যাবে; আর তুমি না বল্‌তে পারবে না। আজ তোমার দাদার চিঠি পেয়ে তাঁর অনুমতিক্রমে শুভদিন বলে আজই আমি লক্ষ্মীকে আশীর্ব্বাদও করে এসেছি। তড়িৎকে যে বলিনি, তাও এই শুধু একটু বেশি করে তাকে আনন্দ দেবার ইচ্ছা ছিল বলেই; যা কখন করিনি, তাও করেছিলুম। তাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তও আমার আজ হয়ে গ্যাল, আমি, আমি তাকে হারালুম শুধু তাই নয়, এমন নিষ্ঠুরভাবে হারিয়ে ফেল্লুম—"

আমার মাথা ঘুরিয়া ক্রমে চারিদিকই ঘূর্ণিত হইতেছিল, চারিদিক যেন অন্ধকার—গাঢ়, গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইয়া আসিল। সবলে খাটের একটা ডাণ্ডা চাপিয়া ধরিলাম। আমি তবে কি করিয়াছি? এ আমি কি করি

য়াছি? নিজের হেয় সন্দেহের ঝোঁকে হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইয়া এই লঘু প্রমাণের উপর কতবড় একটা ভয়ঙ্কর অপবাদ এই আমার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক প্রিয়তম বন্ধুর উপর আনিয়া, তাহাকে শতবার পাষণ্ড আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছি। তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছি, আবার সেই প্রকার নিরপরাধা নারী, তাকেও ত কম বিঁধিয়া আসি নাই। লক্ষ্মীর সেই অবনতশির পাষাণমূর্ত্তি মনে পড়িল। তারপর—তারপর ক্রমেই সব ঝাপ্‌সা, সব কুহেলিকা; সমস্ত শূন্য! কে যেন সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারের শূন্যতার মধ্যে স্নেহকোমলকণ্ঠে এই নারীঘাতক রাক্ষসকে সাদরে সম্বোধন করিতেছিল, "মনু, মনু, ভাই—"

আর কিছুই শুনিতে, জানিতে, বুঝিতে পারিলাম না।

* * * *

অবিরাম কালস্রোত জগতের বক্ষ প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। দিন মাস বর্ষ গত'র পরে গতই হইতেছিল। কি ভাগ্য যে, এ পৃথিবী ঠিক একভাবে একই স্থানে বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। তা যদি থাকিত, তবে সেই যে মানবজীবনের এক একটা দিন যা তাহার মরণান্তব্যাপী স্মরণীয় হইয়া থাকে, তাহারি অরুন্তুদ মর্ম্মঘাতে সে যে কি করিত, কি হইত, ভাবিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া, শিরার মধ্যে সমস্ত রক্ত জমিয়া যায়।

কত বর্ষই চলিয়া গেল। আশাহীন উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্মীছাড়ার মত কোথায় কোথায়ই না ঘুরিলাম। কত দেশ, কত তীর্থ, কত সাধু কত অসাধুই দেখিলাম কিন্তু কোথাও আর শান্তি পাইলাম না, বোধকরি এজন্মটায় আর পাইবও না। গীতাপাঠ আর করি নাই। আমার মনে হয় আমার সে অধিকার ভগবান স্বয়ং সেইদিন আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন, যেদিন আমি তা'র উপদেশের ঠিক উল্টা পথে চলিয়া সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাভিযায়তে, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি তার এই বাক্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়া নিজেও প্রণষ্ট হইয়াছি।

অনেক স্থানেই গিয়াছি; বাঁকিপুরের ষ্টেশন অনেকবার অতিক্রমই করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সেখানকার মাটিতে আর পদস্পর্শ করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত করি নাই। শৈলেন এখনও সেই বাঁকিপুরে, সেই বাড়ীতেই আছে। বদলীর ব্যবস্থায় সে অমন চাকরি ছাড়িয়া অসময়ের যৎসামান্য পেন্‌সন গ্রহণ করিয়াছে। সেই বাড়ীখানি কিনিয়া সেইখানেই আছে। কেন এত

সব করিয়াছে, আর কেহ জানুক না জানুক, আমি তাহা খুবই জানি। তড়িতা যে বলিয়াছিল, সে মৃত্যুর পরেও অপর কোন গতি চাহে না, এই-খানে তাহার স্বামীর সান্নিধ্যেই যে কোন অবস্থায় বাস করিবে। সে কথা আমারও মনে আছে, খুবই সম্ভব শৈলেনও তা ভোলে নাই। তার মত মেধাবী লোকের পক্ষে কোন্ কথাটাই বা ভোলা সম্ভব। সে এখনও মধ্যে মধ্যে আমায় চিঠিপত্র লেখে, এতবড় পাপিষ্ঠ বন্ধুরূপী পিশাচকে সে কেমন করিয়া যে এতবড় ক্ষমা করিল, আমি তাহা ভাবিয়া যেন বিস্মিত হই, কারণ আমি বুঝিতে পারি নিশ্চয়ই সে আমায় ক্ষমা করিয়াছে। আমি কিন্তু নিজেকে আজও ক্ষমা করিতে পারিলাম না। বুঝি কোনদিনই তা পারিব না। সে যে আমার এই অনলদগ্ধ ক্ষতজ্বালাপূর্ণ বিড়ম্বিত জীবন এমন করিয়া অমৃতসিঞ্চনে যখন তখন স্নিগ্ধ, শান্ত করিতে আসে, সেই যেন আমার অসহ্য বোধ হয়। অমিয়কুমার তার মণ্টু—সে এখন একটা পাশ করিয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে। সর্ব্বদা চিঠিপত্র সেও লেখে, দায়ে পড়িয়া উত্তরও দিই। কিন্তু বড় ভয় করে, কি জানি আমার হাতের ছোঁয়া এই কাগজ টুকুই বা আবার তাদের অবশিষ্ট সুখের সলিতা-টুকুকেই বা ফুৎকার দেয়!

এমনি করিয়াই দিন কাটিবে। উদ্দেশ্যহীন, বন্ধনহীন, জীবনতরণী অকূলসাগরে ভাসাইয়া দিয়া, নিজেও অসহায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছি; জানিনা এ মহাযাত্রার শেষ কোনখানে আছে কি না। কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতই অসীম গগনবর্ত্মে লক্ষ্যশূন্য তীব্রবেগে অহর্নিশিই কি বিরাম-হীন বিশ্রামহীন ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বেড়াইব? এ গতির বেগ কি কখন কোন কেন্দ্রের সহিত আমায় কেহ বাঁধিয়া দিবে না? সবাই চলে, নিজের একটা গতিপথ ত তাহাদের থাকে। আমার যেন তাও নাই। অমি তড়িতাকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্মীকে যে কি করিয়াছি, তা আমি আজ পর্য্যন্তও জানিলাম না। সেই কালরাত্রি প্রভাতের পর আর কেহই কেশব শিরোমণি বা লক্ষ্মীর কোন সংবাদই এ পৃথিবীতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। আমি যদিও তাহাদের অনুসন্ধান করি নাই, কিন্তু অনেক দেশে ত ঘুরিলাম, অনেক নরনারী ত চোখে পড়িল; কিন্তু যাহাদের সহিত চোখের দৃষ্টিবিনিময়ের সাহস বা শক্তি আমার হৃদয়ে ছিল না, তাদের সহিত সাক্ষাৎও হইল না।

অর্দ্ধোদয়যোগে অনেক বাঙ্গালীর ছেলেই যখন ভলণ্টিয়ার হইয়া স্নানার্থী

বিপন্ন নরনারীগণের সাহায্যকল্পে কোমর বাঁধিয়া লাগিল, তখন অনুরুদ্ধ হইয়া আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম। এসব এ'কেলে ধরণের ধার্ম্মিকতা দেখান বলিয়া পূর্ব্বে আমি এসব কাজে বড় একটা মন দিই নাই। এখন মনে হইল, না এ সব কাজ একেলে সেকেলে নয়, এ সবকেলে। ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম এ দুই সর্ব্বগুণ। ইহার কালাকাল নাই। তখনও ভাল কাজ ভাল লোকেই করিয়াছে, আজও তাহারাই ত করে। আমি ভাল ত নইই, কিন্তু ভাল কাজ করিতে ত আমারও মানা নাই। অন্ততঃ যতক্ষণ ভালটুকু করিব, ততক্ষণের জন্যও ত ভাল হইতে পারিব।

ঘাটে ঘাটে ভিড়ের সীমা ছিল না। কোলাহলে কলরবে ঠেলাঠেলিতে অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুতকাণ্ডই হইয়া উঠিয়াছে।

আমি যৌবনের নিকট বিদায় লইয়াছি, অবশ্য একটুই যেন লইতে হইয়াছিল। এতটা ধাক্কাধাক্কিতে তাল সমলান আমার কাজ নয় দেখিয়া অপেক্ষাকৃত একটু নিরিবিলি জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। যেখানে দাঁড়াইয়াছি, সেটা একেবারে জলের ধার। হঠাৎ একস্থানে চোক পড়িল; মনে হইল এই মানবমুণ্ডলহরীর মধ্যে, এই খরস্রোত গঙ্গাজলে যেন একটি পদ্ম ফুটিয়া আছে। আমার মনে পাপ নাই, থাকিলে হয়ত তখনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতাম; তাই চাহিতে সঙ্কোচও ছিল না। চাহিতে চাহিতে চিনিলাম এমুখ আমার পরিচিত,—বড় পরিচিত। কর্ত্তিত কুন্তলা সাদাথান পরা ও বিধবা মূর্ত্তি লক্ষ্মীর!······আর একটু হইলে মানুষের ঠেলাঠেলিতে জলে পড়িয়া যাইতাম! গেলাম না কেন? ······লক্ষ্মী স্নান সারিয়া চার পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে তীরে উঠিয়া কোন দিকে না চাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল। প্রবল ইচ্ছাস্বত্বেও সঙ্গ লইতে, কাছে যাইতে, কথা কহিতে সাহসী হইলাম না। কে যেন আমায় সেইখানেই বাঁধিয়া রাখিল। লক্ষ্মী আজ বিধবা! সন্তানবতী! এও ভাল। এ অসহনীয় দৃশ্যেও আজ আমার মুক্তি। সে সহিয়াছে।

রাস্তায় দেখিলাম একজন বৃদ্ধ তাহাদের সমভিব্যাহারী। দশাশ্বমেধের মোড় ঘুরিয়া তাহারা বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। আমি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিলাম, পায়ে যেন গতিশক্তিই ছিল না, চলিব কি করিয়া?

পাশেই দুটি ভদ্রলোকে কথা কহিতেছিলেন। একজন বলিলেন, "আমি অন্নদাবাবুর কাছে ওঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি। উনি, বিধবা নন, কুমারী। উনি অনাথাশ্রমে ঐ অনাথাগুলিকে পালনভার নিয়ে আছেন। কোথাও বাহির হন না,

কারো সঙ্গে মেশেন না, নিজের দিব্যতেজে যেন জ্যোতির্ম্ময়ী। পাছে কেউ কিছু কথা তোলে, তাই নিজের বিধবা পরিচয় প্রচার করে রেখেছেন। শিরোমণি মৃত্যুকালে অন্নদাবাবুকে সব কথা বলে গেছেন। মনে অকস্মাৎ বড় ব্যথা পেয়ে মেয়েটি সংসারের সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে কাশী এসেছিল।"

আমি এক পা এক পা করিয়া সরিয়া একটা গ্যাসপোষ্ট অবলম্বন করিয়া নিজের পতন নিবারণ করিলাম। পা টলিতেছিল।......অনাথআশ্রম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। ভিতরে যাই নাই। পাঁচহাজার টাকা মাত্র অনুতপ্তের সাহায্য দান লিখিয়া ডাকে অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছি।

শ্রীঅনুরূপা দেবী

সমাপ্ত

# অনাদর

সময় তোমার হ'লোনা নিতে,
যা ছিল মোর সব দিয়েছি তেমন কি কেউ পারবে দিতে?
গগন ঘেরা ভরা বাদর
বিন্দু পাতের হয় কি আদর?
নিদাঘ দিনে আবার তৃষা জাগবে চাতকিনীর চিতে!
ফাল্গুন দিনে ফুলের বাহার,
রঙ্ বেরঙে ছায় চারিধার,
শূন্য দেখি শরৎ শেষের শিশিরভরা দারুণ শীতে।

বারাকপুর, বিজনালয় ৯।১।১৬ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# খেদা

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ৩ )

শিবির হইতে যেখানে কোট তৈরি হইতেছিল সেই স্থান পর্য্যন্ত চলাচলের সুবিধার জন্য জঙ্গল কাটিয়া একটী স্বল্প-পরিসর রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথের

উভয় পার্শ্বস্থিত নল-খাগড়া ও বেতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নমিত দু-একটা গাছ ও তাহার লম্বা লম্বা পাতাগুলি চোখে মুখে ও দেহের উপর পতিত হইয়া বিরক্তি ও বাধা উৎপাদন পূর্ব্বক আমাদের গতিবেগ হ্রাস করিয়া দিতেছিল; আমরাও কৌতূহল-তাড়িত উত্তেজিত-ত্বরিত-বেগে সেই বাধাগুলিকে হেলায় অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অল্প কিছুদূর আসিয়া আমরা এক প্রশস্ত, গভীর, বেগবতী নদীর পারে উপস্থিত হইলাম। আমাদের এ স্থানের শিবিরও এই নদীর তীরেই সংস্থাপিত।

এই নদীর উপর অর্দ্ধ-হস্ত-প্রস্থ একটী-বংশ-সেতু পারাপারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার উপর দিয়া চলা অনেকেরই অত্যন্ত মুস্কিল হইয়া পড়িল;— বিশেষতঃ যাঁহাদের দেহ কিঞ্চিৎ মাংস-বহুল। কামলাদের হাত ধরিয়া শঙ্কিত চিত্তে, অতি কষ্টে কোনও রকমে তাঁহারা পার হইলেন। এই পারাপারের ব্যাপারে কতকটা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

পাশাপাশী দুজন যাইবার মত বিস্তৃত স্থান সে রাস্তায় নাই। আমি সকলের অগ্রে, প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়া "পাত বেড়ে"র নিকট পৌছিলাম। তৎপশ্চাৎ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"পাত বেড়" দিবার প্রণালী একটু বিশেষত্বপূর্ণ। আরণ্য গজ-যূথের অনুসন্ধান করিয়াই "পাঞ্জালী"গণ ত্বরায় জমাদারকে সংবাদ দেয়। জমাদার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই, সমগ্র কুলীগণসহ যে জঙ্গলে হস্তীযূথ অবস্থান করিতেছে, তথায় অতি দ্রুত গমন করে;— রাস্তায় মুহূর্ত্তের জন্যও অযথা বিলম্ব করে না। কুলীগণ প্রত্যেকে তাহাদের পাকপাত্র, বস্ত্রাদি ও দশপনর দিনের উপযুক্ত আহার্য্য-সামগ্রী একত্রে বাঁধিয়া লম্বা বংশ-যষ্টীর অগ্রভাগে ঝুলাইয়া স্কন্ধদেশে স্থাপন পূর্ব্বক, এক হস্তে সেই যষ্টী ধরিয়া অন্য হস্তে একখানা দা লইয়া অগ্রসর হয়।

যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হস্তীযূথ অবস্থান করিতেছে, তাহা হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া, জমাদার তাহার কুলী ও পাঞ্জলীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ প্রদান করে। আদেশ শ্রবণ মাত্রই কুলীগণ, দু-দুজনে এক-এক লাইন করিয়া, এক লাইনের পশ্চাতে অন্য লাইন, এইভাবে দণ্ডায়মান হয়। লাইনের পুরোভাগে অবস্থিত দুজন সর্দ্দার-পাঞ্জালীর নেতৃত্বে অতি সত্বর ও নিঃশব্দে সেই কুলীবাহিনী দক্ষিণাবর্ত্তন ও বামাবর্ত্তন ক্রমে (Right-turn and Left-turn) দুভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণভাগ—দক্ষিণ দিকে, বামভাগ—বামদিকে,—বৃত্তাকারে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রকারে গমন

করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে কুলীগণ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত অন্তর অন্তর দুজন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে থাকে; এবং শেষে উভয় সর্দ্দার-পাঙ্গালী একত্রে মিলিত হইলেই, ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বেষ্টনী-সম্পূর্ণতা-সূচক জয়ধ্বনি করিয়া থাকে। এই জয়ধ্বনি করিবার অন্য উদ্দেশ্যও আছে;—বেষ্টনী মধ্যস্থিত হস্তী-যূথ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে, হটাৎ ঐ চীৎকার শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া একত্রে মিলিত হইবে।

হস্তীযূথকে কেন্দ্র করিয়া এবম্প্রকার চক্র-ব্যূহ রচনা করার প্রণালীকে "পাতবেড়" দেওয়া বলে। "পাতবেড়ে"র পরিধি তিন মাইল, সাড়ে তিন মাইল হইয়া থাকে। অবস্থাবিশেষে বেশী বা কমও হয়।

কখনও কখনও কতক হস্তী "পাতবেড়ে"র বাহিরে থাকিয়া যায়; কারণ, চড়িতে চড়িতে হয়ত কতক হস্তী কিছু দূরেও চলিয়া যাইতে পারে; তখন তাহাদিগকে বেড়ের মধ্যে তাড়াইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। অথবা বন্দুক আওয়াজ করিয়া, কিম্বা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে দূরে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন তাহারা আক্রমণ করিয়া কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে। "পাতবেড়" সম্পূর্ণ করিতে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে।

"পাতবেড়" দেওয়া শেষ হইলে, কুলীগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানের—চলিত ভাষায় ইহাকে এক একটি "পুঞ্জী" বা ঘাঁটী বলে—জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া লয় এবং গাছের ছোট ছোট ডাল, পাতা ও বাঁশদ্বারা এক একটী অতিক্ষুদ্র বেড়া-হীন "ছাপ্পর" বা এক-চালা প্রস্তুত করে। সেই চালার সম্মুখে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড ছাপ্পরের অতি নিকটে একত্র জমা করিয়া রাখে ও দার সাহায্যে বাঁশের কঞ্চির এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের ছোট ছোট বাঁশি তৈরি করে। ইহা ছাড়া ছোট একখণ্ড বংশের এক দিকের দুপাশের কতকটা অংশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া লয়, এবং সেই খণ্ডিত অংশ মোচড়াইয়া কুকুরের কাণের মত ঝুলাইয়া দেয়; ঐ বংশখণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া চালনা করিলেই এক প্রকার খট্ খট্ শব্দ হয়।

হস্তীযূথ অনেক সময় "পাতবেড়ে"র নিকটে আসিয়া পড়িলে, সহসা ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও পরিষ্কৃত স্থান দর্শন করিয়া, ভয়ে দূরে চলিয়া যায়, ও সবগুলি হস্তী একত্রে মিলিত হইয়া-চুপ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। গৃহপালিত কিম্বা বন্য-হস্তীমাত্রেই ভয় পাইলে ঐরূপ একস্থানে মিলিত হইয়া পড়ে। ইহা তাহাদের স্বভাব।

কুলীগণ তাহাদের "ছাপ্পরে"র সম্মুখস্থ কতকটা স্থান খুব পরিষ্কার করিয়া রাখে, এইজন্য দূর হইতেই হস্তীর আগমন দেখিতে পায়, ও তৎক্ষণাৎ সেই বাঁশের বাঁশী বাজায়, চীৎকার করে, সেই বিভক্ত বংশখণ্ড নাড়িয়া খট্ খট্ শব্দ করে; ও সংগৃহীত বংশখণ্ডগুলি হস্তীর দিকে নিক্ষেপ করিতে থাকে। হস্তীগণও সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিয়া, বংশীধ্বনি, চীৎকার বিশেষতঃ সেই খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া, অতি ভীত হইয়া পড়ে, এবং পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বেড়ের মধ্যস্থিত গভীর বনে আশ্রয় লয়।

সময় সময় হস্তীযূথ পূর্ব্বোক্ত বাধাতে ভীত না হইয়া, "পাতবেড়" হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করে, তখন বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইতে হয়। এই সময় "ছর্‌রা" ( Shots ) ব্যবহার করা হয়; তাহাতেও না দমিলে গুলি ( Balls ) চালাইয়া থাকে। প্লেন্‌বোর গাদা বন্দুক ( Plain bore muzzle loader) অথবা প্লেন্ বোর ব্রীচ্‌লোডার (Plainbore breech looder) বন্দুক সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কখনও কখনও তুই একটা হস্তী অথবা হস্তীযূথ অত্যুগ্র-প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সক্রোধ-প্রবলবেগে সর্ব্বপ্রকার ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া, "পাতবেড়" হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সম্মুখে পাঞ্জালী বা কুলীদের কেহ পড়িলে, পদতলে দলিত করিয়া, শুণ্ডদ্বারা জড়াইয়া আছ্‌ড়াইয়া, ছিঁড়িয়া তাহাকে সমন সদনে প্রেরণ করিয়া পলায়ন করে। তবে এপ্রকার তুর্ঘটনা খুব কমই ঘটে।

প্রত্যেক চব্বিশজন কুলীর উপর অর্থাৎ, বারটা "পুঞ্জী" বা ঘাঁটীর উপর একজন করিয়া "পাঞ্জালী" নিযুক্ত হয়। কুলীগণ রীতিমত পাহারা দেয় কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করাই ইহাদের কার্য্য। জমাদার স্বয়ং মধ্যে মধ্যে যাইয়া, পাঞ্জালী ও কুলীগণ আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করে। জমাদার এবং পাঞ্জালীদের প্রত্যেকের হস্তে বন্দুক ও দা কিম্বা ছোরা থাকে।

আমরা আহাম্মদ মিঞা জমাদারকে পাঁচটী প্লেন্‌বোর ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক ও যথেষ্ট পরিমাণ ছর্‌রা ও গুলির কার্ত্তুস ( Cartridge ) দিয়াছিলাম। সে নিজে পনরটা গাদা-বন্দুক ভাড়া করিয়া লইয়াছিল।

স্বাধীন ত্রিপুরায় বন্দুক ব্যবহার করিতে "পাশ" লাগে না। সে রাজ্যের কর্ম্মকারগণ বহু উৎকৃষ্ট গাদা বন্দুক তৈরি করিয়া সেই রাজ্যমধ্যে বিক্রয় করে। সে স্থানের প্রায় সকলেই বন্দুক ছুড়িতে পারে। গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এই প্রদেশে

শ্বাপদ জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত, তদ্দেশবাসী প্রত্যেকের বন্দুক চালান শিক্ষা করা প্রয়োজন।

স্বাধীন ত্রিপুরায় কাহারও বিদেশী "রাইফ্‌ল্" ( Rifle ) অথবা প্লেনবোর বন্দুক রাখিবার দরকার হইলে স্বাধীন-ত্রিপুরা রাজ-সরকারে দরখাস্ত করিতে হয়। রাজসরকার বৃটীশ-গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দরখাস্তকারীকে বন্দুক আনাইয়া দেন। দরখাস্তকারী মূল্য ও খরচ বহন করে। স্বাধীন ত্রিপুরা-রাজ্যের ভিতর সেই বন্দুকও ব্যবহার করিতে পাশের দরকার হয় না।

কুলীগণ দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা বিনিদ্র সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। এই জন্য প্রত্যেক "পুঞ্জী"বা ঘাটীতে দুই জন করিয়া কুলী দেওয়া হয়। একজন যে সময় বিশ্রাম বা খাদ্যাদি প্রস্তুত করে, সে সময় অন্য ব্যক্তি প্রহরায় নিযুক্ত থাকিবে।

জমাদার, এক অভিনব প্রণালীতে পাঞ্জালী ও কুলীগণ যথারীতি সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করে। জমাদার কোনও এক কুলীর "পুঞ্জী"তে দাঁড়াইয়া কোনও একটী অভিজ্ঞান ( অনেক সময় এক টুকরা কাগজে কিছু লিখিয়া বা নাম দস্তখত করিয়া ) সেই "পুঞ্জী"র কুলীর হস্তে প্রদান করে; সে তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া যাইয়া তাহার পরবর্ত্তী "পুঞ্জী"র কুলীর হস্তে উহা অর্পণ করে; এইভাবে সেই অভিজ্ঞান সমস্ত "পাতড়" ঘুরিয়া পুনরায় জমাদারের হস্তে পৌছে। ইহাতে প্রায় দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। দিনরাত্রির মধ্যে তিন চারবার এই প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। তদ্ব্যতিরেকে জমাদার স্বয়ং হাঁটিয়াও দু'একবার সমগ্র পাতবেড় ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসে এবং পাঞ্জালী বা কুলীদের কোনও প্রকার অসুবিধা, অভাব বা অভিযোগ থাকিলে, তাহা পূরণকরিবার ব্যবস্থা করে। বিশেষতঃ, কুলীদের রসদাদির কোনও অনটন না হয়, কিম্বা যাহারা আফিং, গাঁজা প্রভৃতি নেশা করে, তাহাদের ঐ সব দ্রব্যের অভাব না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

খেদায় কুলীদের কার্য্যও গুরুতর শ্রমসাধ্য, কষ্টকর ও বিপদপূর্ণ। অতি সামান্য অর্থলাভাশায় ইহারা কত অনশন, অর্দ্ধাশন, পথকষ্ট ও বিপদ অম্লানবদনে বিনা আপত্তিতে সহ্য করে, তাহা চিন্তা করিতেও মর্ম্মে আঘাত লাগে।

কুলীদের মধ্যে কেহ কেহ এত কষ্ট সহ্য করিতে অপারগ হইয়া পলায়ন করে। ধরা পড়িলে তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ধরা

না পড়িলেও নালিশ করিয়া, তাহাদিগকে নানা উপায়ে নাকাল করা হইয়া থাকে। কারণ, কুলীগণ চুক্তি অনুসারে অগ্রিম টাকা লইয়া কার্য্য করিতে আসে। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার জগৎ জোড়া!

জমাদারের নির্দ্দেশানুসারে, উভয় সর্দ্দার পাঞ্জালীদ্বারা পরিচালিত, দুই বাহিনীর যদি পরিশেষে একত্র মিলন সংঘটিত না হয়, তবে আর "পাতবেড়" সম্পূর্ণ হইল না। সমগ্র কুলীগণসহ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যদি হস্তীযূথ সে সময় পর্য্যন্তও সেই স্থানে অবস্থান করে, পুনরায় "পাতবেড়" দিতে হয়। একদিনে দুবার "পাতবেড়" দেওয়া সম্ভবপর হয় না; সেইজন্য সেই দিবসই আবার "বেড়" দিতে না পারিলে, পর দিবসই "পাতবেড়" দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গজযূথ সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া গেলে, তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব বেড় দেওয়া উচিত। অনেক সময়েই প্রথম চেষ্টাতে "পাতবেড়" দিতে সক্ষম না হইলে, সে হস্তীযূথের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে।

শুনিয়াছি আমাদের এই খেদাতেই আহম্মদ মিঞা জমাদার আর একদল হস্তীকে "বেড়" দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু "পাতবেড়" মিলাইতে না পারাতে সে হস্তীযূথের আর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। কথাটা গোপন রাখিবার চেষ্টা সত্বেও তাহা আমাদের কর্ণে পৌছিয়াছিল।

জমাদার ও পাঞ্জালীগণ অতি নিপুণতার সহিত ও খুব হিসাব করিয়া "পাতবেড়" দিয়া থাকে। বহু খেদা করিয়া এ সম্বন্ধে তাহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। কার্য্যকরী অভিজ্ঞতার ফলে প্রায় সর্ব্বদাই তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া থাকে;—দৈবাৎ অকৃতকার্য্য হয়।

"পাতবেড়ে"র কয়েকটা "পুঞ্জী" পরিদর্শন করিয়া, আমরা যে স্থানে কোট তৈরি হইতেছিল, তথায় তাহা দেখিতে গেলাম। আমাদিগকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্মিতবদনে অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজাবাহাদুরকে প্রণাম করিলেন; তৎপর অন্যান্যের সহিত প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন ও পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, আমরা সকলে মিলিয়া কোট তৈরির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

এতগুলি লোক শ্রম-বিভাগ অনুযায়ী যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এত সহজে, ক্ষিপ্রগতিতে, সুশৃঙ্খলার সহিত, নীরব, নিপুণভাবে সম্পাদন করিতেছে যে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সকলেই নির্ব্বাক,—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া

গেলাম ;—একটা গর্ব্ব-মিশ্রিত অস্ফুট প্রশংসাধ্বনি নিজের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রত্যেকের মুখ হইতে এক সময়ে নিঃসৃত হইয়া পড়িল।

প্রত্যেক "পুঞ্জী" হইতে একজন করিয়া লোক উঠাইয়া আনিয়া কোট নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রায় দুইশত লোক এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তত্রাচ একমাত্র গাছ কাটার শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার শব্দ হইতেছে না। কাহাকেও কিছু বলিতে কিম্বা আদেশ করিতে হইলে, ইসারায় অথবা অতি নিম্ন স্বরে, প্রায় কাণাকাণি করিয়া, স্বল্প কথায় তাহা ব্যক্ত করিতেছে।

পর-ছিদ্রান্বেষী হীনচেতা স্বার্থপর একদল লোক আমাদিগকে গালি দিয়া বলিয়া থাকে যে, ভারতবাসীরা একত্র-মিলিত-বহু লোকে একটা কাজ গোল-যোগ না করিয়া সুনিয়ম পরিচালিত সংযতভাবে দ্রুত সম্পাদন করিতে পারে না। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, সেই সব ক্রূরমতি স্বার্থকামী লোকগুলাকে ধরিয়া আনিয়া, তাহাদের চোখে আঙুল দিয়া শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কথা দূরে থাক, আমাদের দেশের এই সব নিরক্ষর গ্রাম্য সাধারণ লোকদের অদ্ভুত সংযম সরল প্রফুল্ল ব্যবহার, কার্য্যতৎপরতা, শ্রম-সক্ষমতা সহ্যশক্তি প্রভৃতি দেখাইয়া দিয়া আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের কিঞ্চিৎ চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া দিই!

কোটের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; যে কিছু কাজ অবশিষ্ট আছে, তাহা অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অথবা কল্য প্রাতেই শেষ হইয়া যাইবে।

জমাদার স্বয়ং অভিজ্ঞ পাঞ্জালী সহ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক, "পাতবেড়ে"র ভিতর কোট প্রস্তুত করিবার স্থান নির্ণয় করে, যাহাতে "পাতবেড়ে"র চতুর্দ্দিক হইতে হস্তীগুলিকে তাড়না করিলে, সহজে তাহারা কোট অভিমুখে ধাবিত হয়। কোটের স্থান যথাতথা নির্দ্দিষ্ট হইলে তন্মধ্যে গজযূথকে প্রবিষ্ট করান দুরূহ হইয়া পড়ে।

কোটের আকৃতি সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, গোলাকারই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক উহা সম-ত্রয়োদশভুজাকৃতি বিশিষ্ট। এক ভুজকে এক "পাট" বলে। তন্মধ্যে দরজা এক "পাট" বা ভুজ এবং কোট অবশিষ্ট দ্বাদশ "পাট" বা ভুজ। এক "পাট" দশ হস্ত প্রস্থ; সুতরাং সমগ্র ত্রয়োদশভুজ ক্ষেত্রের পরিধি একশত ত্রিশ হাত। প্রতি "পাটে" ছয়টি করিয়া প্রধান খুঁটি (Main-post)। বড় বড় গাছ কাটিয়া এই খুঁটিগুলি প্রস্তুত করা হয়। এক একটি খুঁটি বার হাত লম্বা এবং তিন হাত পরিধিবিশিষ্ট। খুঁটিগুলি লম্বা বা খাড়া-

ভাবে ( perpendicularly ) সমান্তরালে প্রোথিত। মৃত্তিকাগর্ভে তিন হস্ত এবং ভূমির উপর ঊর্দ্ধদিকে বাকী নয় হস্ত। কোট খুব দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যেক পাটে এক একটি খুঁটি অন্তর অন্তর কোটের ভিতর দিকে একটি ও বহির্ভাগে একটি, এইভাবে প্রধান খুঁটিগুলির অনুরূপ স্থূল ও লম্বা অতিরিক্ত ছুটি করিয়া খুঁটি, সেই প্রকারে প্রোথিত। সুতরাং প্রতি "পাটে" মোট বারটি খুঁটি হইল।

কোটের ভিতর দিকে প্রতি "পাটে", বারটী করিয়া কাঠ ( বৃক্ষ কাণ্ড ) সমান্তর বার লাইনে বা সারিতে প্রধান খুঁটিগুলির সহিত সমকোণ-আড়াআড়ি-ভাবে (Crosswise at right angles) স্থূল-রজ্জু দ্বারা দৃঢ় গ্রন্থি বাঁধা। গ্রন্থি ও রজ্জু এত শক্ত যে হস্তীর সমস্ত দেহের ভার অথবা সমগ্র শক্তি উহার উপর পতিত হইলেও ঐ গ্রন্থি বা রজ্জু উন্মোচিত বা ছিন্ন হইয়া যাইবে না।

সাধারণতঃ আড়াআড়ি-ভাবে দশটি কাঠ সমান্তর দশ লাইনে বাঁধা হয় কিন্তু এই "পাত-বেড়ে" একটি খুব শক্তিশালী বৃহৎ "গুণ্ডা" হস্তী আছে বিবেচনায়, অতিরিক্ত দু'সার কাঠ বাঁধা হইয়াছে।

আড়াআড়ি-ভাবে বাঁধা কাঠগুলিকে "ডাসা" বলে। "ডাসা"র কাঠগুলি প্রধান খুঁটির কাঠগুলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম স্থূল। "ডাসা"র কাঠগুলির প্রত্যেকটা লম্বায় এগার হাত ; অর্থাৎ কোটের এক "পাট" যতটা প্রস্থ "ডাসা"র কাঠগুলি তদপেক্ষা একহাত বেশী লম্বা। প্রত্যেক দুই ভূজ বা "পাটের মিলন-স্থানে, দুই পাটের "ডাসা"গুলি উত্তমরূপে দৃঢ় করিয়া বাঁধিবার সুবিধার জন্যই, "ডাসা"গুলি কিছু বড় রাখা হয়।

প্রধান খুঁটিগুলির ভূমির উপরের নয়হাতমধ্যে, সর্ব্বোচ্চ স্থানের ( মাথার দিকের ) একহাত বাদ দিয়া বাকী আটহাত মধ্যে সমান্তরালে ঐ বারটা আড়া-আড়ি কাঠ বাঁধা হইয়াছে।

"ডাসা"গুলি কোটের ভিতর দিকে না বাঁধিয়া, বহির্দ্দেশেও বাঁধা যাইতে পারে, কিন্তু বহির্ভাগ অপেক্ষা ভিতর দিকে "ডাসা"গুলি বাঁধাতে, কোট খুব দৃঢ় হয় ; এবং হস্তীর সজোর আঘাতেও, "ডাসা"গুলি ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা কম থাকে।

কোটের বহির্ভাগেও দু'সার "ডাসা" বাঁধা হইয়াছে। উপরের "ডাসা", মৃত্তিকা হইতে ছয় হাত ঊর্দ্ধে, এবং নীচের "ডাসা", মৃত্তিকা হইতে তিন হাত ঊর্দ্ধে বাঁধা রহিয়াছে।

কোট আরও দৃঢ় করিবার জন্য,প্রত্যেক দুই পাটের সংযোগ স্থলে অতিরিক্ত তিনটী করিয়া খুঁটী, খাড়া বা লম্বভাবে পুতিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অতিরিক্ত খুঁটীগুলিও প্রধান খুঁটীগুলির ন্যায় স্থূল ও লম্বা।

কোটের প্রতি"পাটে"র বহির্দ্দেশের উপরের "ডাসা"র সহিত, সমান্তর তির্য্যকভাবে ছয়টি করিয়া, এবং নীচের ডাসাতেও সেই ভাবে চারটী করিয়া "প্যালা" বা ঠেক্‌নো ( Support ) দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক "প্যালা"র এক-প্রান্ত কোটের "ডাসা"র সহিত সংযোগ করিয়া, অন্য প্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া, হস্তীর প্রবল আঘাতেও "প্যালা" স্থানচ্যুত না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে, প্রত্যেক "প্যালা"র যে স্থান ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, তাহার প্রান্তভাগে এক একটি ছোট খুঁটী বা "পিন" পুতিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্যালার খুঁটীগুলি প্রধান খুঁটী-গুলি অপেক্ষাও অনেক মোটা।

কোটের ত্রয়োদশ "পাটে"র দ্বাদশ "পাট" উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া, অবশিষ্ট এক"পাট" আরণ্য গজযূথের প্রবেশদ্বার স্বরূপ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। তথায় ঝুলান দরজা থাকিবে।

কোটের এই উন্মুক্ত প্রবেশ পথের দুই প্রান্তভাগে, ( অর্থাৎ যে দুই প্রান্ত-ভাগ হইতে কোটের বেড়া সুরু হইয়াছে ) কোটের বেড়া ঘেঁসিয়া কোটের প্রধান খুঁটীগুলি অপেক্ষা অনেক স্থূল ও লম্বা—সাধারণতঃ প্রায় চব্বিশ পঁচিশ-হাত লম্বা,—দুটী খুঁটী প্রোথিত করিয়া, তাহার সহিত "কপিকলে"র সাহায্যে সুদৃঢ় রজ্জু ( স্থূল দড়ি বা "কাছি" ) দ্বারা এমন ভাবে দরজা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে যেন উহা ইচ্ছানুযায়ী অতি দ্রুত উঠান নামান যাইতে পারে। গজযূথ কোটের ভিতর প্রবেশ করিলেই, ঐ দরজা নামাইয়া দিয়া সেই উন্মুক্ত প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং দরজা দৃঢ় করিবার জন্য, উহার বহির্ভাগে কতকগুলি খুঁটী পুতিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়।

দরজা প্রস্তুত করিবার প্রণালী একটু ভিন্ন প্রকার।

দরজার সমান্তর আড়াআড়িভাবের আটটি "ডাসা"র উপর, চুয়াল্লিশটি, নয় হস্ত লম্বা, সরু খুঁটী খাড়া বা লম্বভাবে বাঁধা। এই লম্বা, সরু খুঁটীগুলিকে "পারণ" বলে। "পারণ"গুলি পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া, এত ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে "ডাসা"র সহিত বাঁধা যে তাহাদের মধ্যে এতটুকুও ফাঁক নাই। দরজা প্রস্থে আট হাত। এক"পাটে"র দশ হাত স্থান, মধ্যে দরজা ঝুলাইবার জন্য দুই প্রান্তের

দুই খুঁটী দুইহাত স্থান অধিকার করিয়াছে; বাকী আটহাত স্থানে দরজা থাকিবে। এই জন্যই দরজা আট হাত প্রস্থ করা হইয়াছে।

দরজার সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন "ডাসা" দুইটি বাদে বাকী ছয়টি "ডাসা"তে লৌহ-নির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা প্রোথিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক "ডাসা"তে ছয়টি করিয়া কাঁটা দেওয়া হইয়াছে। দরজা কোটের বেড়ার ন্যায় সুদৃঢ় নয়, সেই জন্যই ঐ কাঁটাগুলি প্রোথিত করা হয়। প্রত্যেকটী কাঁটা "ডাসা" ভেদ করিয়া, কোটের ভিতর দিকে অর্দ্ধ হস্ত অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ বহির্গত হইয়া, রহিয়াছে। হস্তী দরজার উপর "জোর" করিলে, অর্থাৎ সজোরে ধাক্কা দিলে ঐ সূক্ষ্মাগ্র-লৌহ-কণ্টক হস্তীদেহে বিদ্ধ হইয়া যাইবে, ও তাহাতে হস্তী অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, তথায় বেশী বল প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না।

দরজার দুই দিকের দুই প্রান্ত হইতে,অর্থাৎ দরজা ঝুলাইবার দুইদিকের দুইখুঁটী হইতে, কোটের বহির্দ্দেশে ক্রমপ্রশস্ত ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া দুটী বেড়া সরলভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বাহুদ্বয়কে প্রচলিত ভাষায় "আন্নি" কহে। আন্নির বেড়াও, কোটের বেড়ার প্রণালী অনুসারেই প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার খুঁটীগুলিও কোটের বেড়ার খুঁটীর মতই স্থূল ও লম্বা, এবং ইহার ভিতর ও বহির্ভাগে কোটের "ডাসা"র ন্যায়ই "ডাসা" বাঁধা আছে। কোটের বেড়ার বহির্ভাগের দুই "ডাসা"র সহিত যে ভাবে "প্যালা" বা ঠেক্‌নো দেওয়া আছে, "আন্নি"র বেড়াতেও সেই ভাবে "প্যালা" দেওয়া হইয়াছে। তবে দরজার নিকটবর্ত্তী স্থানের "আন্নি"র বেড়া অপেক্ষা, দূরের বেড়া অনেকটা কম মজবুত করা যাইতে পারে।

দরজার নিকট "আন্নি"র দুই বাহুর মধ্যবর্ত্তী স্থান দশ হাত প্রস্থ,—অর্থাৎ কোটের একভুজের সমান; এবং যে খানে "আন্নি" শেষ হইয়াছে তথায় "আন্নি"র দুই বাহুর মধ্যবর্ত্তী স্থান, তিনশত সাড়ে তিনশত হাত প্রস্থ। "আন্নি" প্রায় পাঁচ ছয়শত গজ লম্বা। "আন্নি"র দক্ষিণ ভাগের বেড়াকে "ডান আন্নি" ( Light wing ); বাম ভাগের বেড়াকে "বাম আন্নি" ( Left wing ) বলে।

কোটের কার্য্য শেষ হইলে, সমগ্র কোট ও "আন্নি" বৃক্ষের শাখা ও পত্র দ্বারা এমন ভাবে আবৃত করিতে হইবে, যেন বন্যহস্তী সকল কিছুতেই বুঝিতে না পারে যে, তাহাতে কোনও প্রকার কৃত্রিমতা আছে। এবং উহাকে চতুর্দ্দিকস্থ পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যের ন্যায় স্বাভাবিক অরণ্যই মনে করে। এই প্রকারে কোট ও

"আন্নি", বৃক্ষপত্র ও শাখা দ্বারা আচ্ছাদিত করাকে "মায়া-কানন" তৈরি করা বলা হয়।

কোটের দরজার অপর দিকে "আন্নি" যথায় শেষ হইয়াছে, তথায় "ডান-আন্নির" দক্ষিণ দিকের এবং "বাম-আন্নি"র বাম দিকের কতকটা স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলা হইয়াছে। দরকার বোধ করিলে তথায় সাদা কাপড়ও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। "আন্নি"র মুখের সন্নিকটে কতকগুলি শুষ্ক বৃক্ষ খণ্ড জমাইয়া রাখা হইয়াছে।

মোটামুটী ইহাই কোট প্রস্তুত করিবার সাধারণ প্রণালী। তবে প্রদেশ বিশেষে এবং অবস্থানুযায়ী এই প্রনালীর সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইলেও, ইহাই প্রচলিত প্রথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

# প্রিয়ের পত্র

মূল্য ও তোর বুঝ্‌বে কিবা স্বামী?
বুঝ্‌বে সে একজনা।
তিনি তো এই লিখেই খালাস,—সে যে
কর্‌চে উপাসনা!
চিঠি লিখে জবাব পেতে
সাধ্‌চে সে যে দিনে রেতে,
এই ছ-টা দিন কোনও মতে
গেলেই পাবে তো'কে;
তোর এ কালি প্রীতির আঁজন হবে
বিরহিণীর চোখে।

তোর আশাতে সে যে বাসে ভাল
হীরু হর্‌করাকে ;
ডাক্‌টি নিয়ে আস্‌বে কখন বলে'
পথটি চেয়ে থাকে !
মুগ্ধচিত্ত পরাণ মন
পড়্‌বে চিঠি যতক্ষণ,
প্রণয়-সোহাগ-নিদর্শন
পাবে শত শত ;
পতি তারে ভাল বাসে-ভেবে,
তন্ময় সে কত !

ওরে লিপি, ওরে কাগজখানি
প্রীতির কবচ ওরে,
ওরে দূতী, কিসের লাগি বালা
প্রতীক্ষিছে তোরে ?
লেখা তো এই কয়টা কথা,
এর তরে এই কাতরতা ?
অর্থ তো এর খুবই সোজা,
এতেই এত সুখী ?
যত্ন করে' রত্ন ভেবে এরে
কর্‌বে লুকোলুকি ?

বাড়ীর লোকে পাবেই কতক টের
ভাবখানা তার দেখে ;—
ছেলেদের সাথ এত কিসের কথা
আড়ালপানে ডেকে ?
কাণ খাড়া তার সকাল হ'তে,
ঘন ঘন চাওয়া পথে,
সদা-বন্ধ সদর দো'রের
একপাটি আজ খোলা ;
ডাকের আওয়াজ নাই যদি পায়
দেখ্‌তে পাবে ঝোলা।

চিঠিখানি পাওয়া মাত্র হাতে
উজ্জল হবে মুখ ;
কি মহার্ঘ রত্ন সেটি যেন
এম্‌নি পাওয়ায় সুখ !
কায কি, কোথাও রাখ্‌লে পরে
কি জানি কেউ চুরিই করে ?
কাযের সময় না পায় যদি,
এই ভয়েতে প্রিয়া
রাখে তারে যত্নে কাপড়তলে,
নাচ্‌চে যথা হিয়া।

সে দিন তাহার খেতে হবে ভুল,
থাক্‌বে খাবার পড়ে',
তাড়াতাড়ি খিড়্‌কি-ঘাটটি সেরে
ঢুক্‌বে মায়ের ঘরে।
পাকা চুল তাঁর তুল্‌বে বলে'
ঘুম পাড়িয়ে কেমন ছলে
হাল্কা পায়ে আস্‌বে চলে'
নিজের কুঠারিতে—
দেখ্‌তে খুলে এই সে লেখা চিঠি
স্তব্ধ দু'পুরটিতে।

কতক কথার মানেই বুঝবে নাক'
হতাশ নহে তায় ;
হয় ত এমন টানা-লেখা তার
পড়াই হবে দায় !
হাতের লেখা ভাষার বাহার,
এ সবে নাই ভ্রুক্ষেপ তাহার,
বুঝুক্ কিম্বা নাই বুঝুক্
চিঠি পেলেই হ'ল—
শুরুর শেষের পাঠ দু'টি যে তার
মর্ম্মে গাঁথা র'ল।

ছোট চিঠি হবার জোটি নেই,
বড় হওয়াই চাই।
নৈলে সে যে কর্‌বে অভিমান
পড়্‌তে পারুক্ নাই।
যেমন ছুটি রাত্রিদিনে,
পড়বে তবু আখর চিনে ;
পড়ার নেশায় বিভল সুখে,
সে দিন বধূর, হায়,
বন্ধ হবে সন্ধ্যায় গা ধোওয়া
অসুখ-অছিলায়।

ওরে বন্ধ পতির প্রীতির ডাক,
ভর্‌সা অবলার,
প্রিয়ের পত্র, মানস-মরাল ওরে,
পরম-দেবতার!
বধূর সকল সোহাগপ্রীতি
করবি আদায় প্রতিনিধি!
চোখে বুকে বুলাবে তো'য়
সুখের অসীমায়—
প্রিয়ের আদর স্মৃতি হ'য়ে চির
থাক্‌বি পেটিকায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

# কৃষ্ণোপাসনায় খৃষ্টীয় প্রভাব।

কৃষ্ণ ভক্তের ভগবান, দার্শনিকের তত্ত্বজ্ঞানের চরম লক্ষ্য এবং আধুনিক কালের ধর্ম্ম-সংস্কারকের আদর্শ মনুষ্য। যাঁহারা ভক্ত বা দার্শনিক বা ধর্ম্মসংস্কারক নহেন, কিন্তু স্বাভাবিক কৌতূহল বা জ্ঞানপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় সভ্য-

তার মূলানুসন্ধান করিতে চাহেন, কৃষ্ণোপাসনার মূল অনুসন্ধান তাঁহাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ভারতের হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ এই ২৪ কোটি মানবেরই উপাস্য-দেবতা। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে ভারতীয় মানবতত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। এই নিমিত্তই সংস্কৃত ভাষানুরাগী অনেক য়ুরোপীয় এবং এদেশীয় পণ্ডিত বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ মানব-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত ধর্ম্মবিজ্ঞানের এবং তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ববিচারের ( comparative religionএর ) রীতি-অনুসারে বিশেষ যত্নের সহিত কৃষ্ণোপসনার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এই আলোচনার ফলে নানা প্রকার মত প্রচার লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণোপাসনায় খৃষ্টীয় প্রভাব একটি প্রবল মত। এই প্রবন্ধে এই মতের আলোচনা করিব।

কৃষ্ণ এবং খৃষ্টের নামের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। অনেক স্থানে কৃষ্ণ নাম কিষ্ট বা কেষ্টরূপে উচ্চারিত হয়। কৃষ্ণের জন্মকথার সহিত মথিলিখিত সুসমাচারে বর্ণিত খৃষ্টের জন্মকথার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী উভয়েই সগুণ ঈশ্বরের ভক্ত। এই সকল কারণে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত ওয়েবার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত জন্মাষ্টমী নামক নিবন্ধে এবং অন্যান্য লেখায় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, বালকৃষ্ণের উপাসনা এবং ভক্তি খৃষ্টধর্ম্মীর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের নারায়ণীয় খণ্ডে কথিত হইয়াছে, নারদ ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া স্বয়ং নারায়ণের শ্রীমুখ হইতে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র ধর্ম্মে উপদেশ লাভ করিয়া আসেন। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইত। ওয়েবারের মতে এই শ্বেতদ্বীপ মিশরের ( ইজিপ্তের ) রাজধানী আলেক্জেন্দ্রিয়ারই নামান্তর মাত্র। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের শেষার্দ্ধে বা পঞ্চম শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে কোন সময়ে হয় ভারতবর্ষীয় বণিকগণ মিশরে যাইয়া খৃষ্টের জন্মকাহিনী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, আর না হয় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তাহা প্রচারিত করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বৈষ্ণব এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা (Comparative studies in Vaishnavism and Christianity &c.)" নামক গ্রন্থে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

"Now this নারায়ণীয় record, in my opinion, contains decisive evi-

dence of an aotual journey or voyage undertaken by some Indian Vaishnavas to the coast of Egypt or Asia Minor, and makes an attempt in the Indian eclectic fashion to include Christ among the Avatars or Incarnations of the supreme spirit Narayana, as Buddha came to be included in a later stage" (p. 3o ).

অর্থাৎ, "আমার মতে "নারায়ণীয়" নিঃসন্দিগ্ধভাবে সপ্রমাণ করে যে, কয়েকজন ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব মিশর বা এসিয়া-মাইনরের উপকূলে গমন করিয়াছিলেন, এবং ভারতবাসিদিগের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়ের যে রীতি আছে, তদনুসারে ( নারায়ণীয় মধ্যে ) খৃষ্টকে নারায়ণের অবতাররূপে গণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।" মোটের উপর ওয়েবারের সহিত অধ্যাপক শীল মহাশয়ের প্রভেদ এইটুকু যে, অধ্যাপক শীল তাঁহার মত যেমন দৃঢ়স্বরে (dogmatically) প্রকাশ করিয়াছেন, ওয়েবর বা তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ তাহা করেন নাই। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অধ্যাপক শীল মহাশয়ের উল্লিখিত কয়েকটি যুক্তিপ্রমাণ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মহাভারতে আছে—

খমুৎপপাতোত্তমযোগযুক্ত
স্ততোধিমেরৌ সহসানিলিল্যে।
তত্রাবতস্থে চ মুনির্মুহূর্ত্ত
মেকাংতমাসাদ্য গিরেঃ স শৃংগে॥
আলোকয়ন্নুত্তরপশ্চিমেন
দদর্শচাপ্যদ্ভুতমুক্তরূপম্।
ক্ষীরোদধের্যোত্তরতো হি দ্বীপঃ
শ্বেতঃ স নাম্না প্রথিতো বিশালঃ॥ শান্তিপর্ব্ব ৩৩৬। ৭-৮

"উত্তমযোগযুক্ত (নারদ) আকাশে উত্থিত হইলেন এবং তৎপর সহসা মেরু-পর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলেন। গিরির সেই শৃঙ্গে উপনীত হইয়া নারদ মুনি তথায় একাকী এক মুহূর্ত্ত অবস্থান করিলেন; এবং উত্তরপশ্চিম কোণে বা বায়ুকোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরদিকে শ্বেত নামে প্রসিদ্ধ অপরূপরূপ বিশাল দ্বীপ দেখিতে পাইলেন।"

অধ্যাপকে শীল এই শ্বেতদ্বীপকে জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভূত চন্দ্রদ্বীপের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হিরণ্ময় বর্ষ এবং রম্যক বা রমণকবর্ষের সীমান্তে শ্বেতপর্ব্বত অবস্থিত। এই শ্বেতপর্ব্বত ক্ষীরোদাবধি বা ক্ষীর-

সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্বেতদ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর দিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্বেতপর্ব্বতের সহিত শ্বেতদ্বীপের সম্বন্ধ রহিয়াছে ( It is evidenty connected with the mountain range of that name )। এবং শ্বেতদ্বীপ অবশ্যই রম্যক বা রমণক বর্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল ( It must have, therefore, adjoined the Ramake ( or Ramyake ) Varsha ]। জ্যোতিষশাস্ত্রে যে রোমকপত্তনের কথা আছে, অধ্যাপক শীল বলেন, সেই রোমকপত্তন রম্যক বা রমণক বর্ষের অন্তর্ভূত ছিল এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। [ There is reason to assign Ramaka or Ramakapattana to the Ramyaka ( or Romanaka ) Varsha. ] কিন্তু সেই কারণ (reason)টি কি, তাহা এখানে উল্লেখ করেন নাই। পৌরাণিক ভূগোল যে অত্যন্ত জটিল এবং গালগল্প পরিপূর্ণ, অধ্যাপক শীল তাহা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন, আফ্রিকার অপরিজ্ঞাত প্রদেশের ভীষণ অরণ্যের মধ্যে যে ভাবে পথ কাটিয়া বাহির করিতে হয়, পৌরাণিক ভূগোল আলোচনা করিয়া সেইভাবে তথ্যোদ্ধার করিতে হয় ( One can only manage to cut his way through this jungle as in the monstrous forests of Darkest Africa ) তিনি নানাশাস্ত্রের সাহায্যে পৌরাণিক ভৌগোলিক জঙ্গল কাটিয়া যে পথ বাহির করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। পশ্চিম রুষিয়া এবং সাইবিরিয়া উত্তরকুরু। ইরাণ, আর্মিনিয়া এবং এসিয়া-মাইনরের উভয়পার্শ্বস্থ মালভূমি শৃঙ্গবান্ এবং শ্বেতপর্ব্বত। ইরাণ হিরণ্ময় বর্ষ ; ভূমধ্য-সাগর ক্ষীরসমুদ্র ; সিরিয়া এবং ইজিপ্ত রম্যক বর্ষ। এসিয়া-মাইনরের উপকূল শ্বেতদ্বীপ। বৈদ্যক "ভাব-প্রকাশ" গ্রন্থে আছে, ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেত-দ্বীপ গন্ধকের উৎপত্তিস্থান। অধ্যাপক শীল বলেন, "This is a valuable hint" "ইহা একটি মূল্যবান ইঙ্গিত।" জর্ডন নদীর এবং ডেডসির (Dead Sea) তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে প্রাচীনকালে গন্ধকাদি পদার্থ রপ্তানি করা হইত। *

পৌরাণিক ভৌগোলিক জঙ্গলে অধ্যাপক শীলের আবিষ্কৃত পথের সম্পূর্ণ অনু-সরণ করা এখানে অসাধ্য। তিনি শ্বেতদ্বীপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। সিরিয়াকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার আর দ্বীপত্ব থাকে না, অথবা বলিতে হয়, পৌরাণিকেরা দ্বীপের লক্ষণ জানিতেন না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। যথা বায়ুপুরাণ (৫১।৩১)—

"দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতা দ্বীপাঃ সর্ব্বতশ্চোদকাবৃতাঃ।"

* Vaishnavism and Christanity,pp. 47-50.

"দুইদিকে জল থাকে বলিয়া সকলদিকে জলে বেষ্টিত স্থলভাগকে দ্বীপ বলে।"

দ্বিতীয় কথা—রমণক বা রম্যক বর্ষ এবং শ্বেতপর্ব্বত জম্বুদ্বীপে অবস্থিত। এই

"লাবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।"

তারপর প্লক্ষদ্বীপ লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। যথা, বায়ু পুরাণ ৫১।২—

"তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদকঃ।"

প্লক্ষদ্বীপ ইক্ষুরসসাগরের দ্বারা বেষ্টিত। এই ইক্ষুরসসাগর শাল্মলি দ্বীপের দ্বারা বেষ্টিত। শাল্মলি দ্বীপের বেষ্টনী সুরাসাগর। সুরাসাগরকে বেষ্টন করিয়া কুশদ্বীপ অবস্থিত। কুশদ্বীপ ঘৃতসাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঘৃতোদকসমুদ্রের বেষ্টনী ক্রৌঞ্চদ্বীপ। ক্রৌঞ্চদ্বীপের চারিদিকে দধিমণ্ডোদক সমুদ্র। দধিমণ্ডোদক সমুদ্র বেষ্টন করিয়া শাকদ্বীপ অবস্থিত। এই শাকদ্বীপ—

"ক্ষীরোদেন সমুদ্রেন সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।"

এই শাকদ্বীপ সকলদিকে ক্ষীরসমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। পুষ্কর দ্বীপ ক্ষীরোদসমুদ্র বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। এই ক্ষীরোদসমুদ্রকে ভূমধ্যসাগর ধরিয়া লইলে পৌরাণিক ভূগোলের কিছু থাকে না। পৌরাণিক ভূগোলের, বিশেষতঃ লবণসমুদ্রের পরপারববর্ত্তী যে সকল দ্বীপের ও সমুদ্রের নাম পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের রহস্যোদ্ঘাটন করিতে হইলে পুরাণকারের উপদেশ একেবারে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র এখনকার ছাপা মানচিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। সপ্তদ্বীপপ্রসঙ্গে বায়ুপুরাণকার উপদেশ দিয়াছেন (৩৪।৭-৮)—

"সপ্তদ্বীপং তু বক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ।
যেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং তর্কেণ ভাবয়েৎ।"

"চন্দ্র, সূর্য্য এবং গ্রহগণসহ সপ্তদ্বীপের কথা বলিতেছি। মনুষ্যেরা তর্ক করিয়া ইহাদের সম্বন্ধীয় প্রমাণনিচয় উল্লেখ করে। কিন্তু যে সকল বিষয় অচিন্ত্যনীয়, সেই সকল বিষয়ে তর্ক করা অনুচিত।"

ক্ষীরোদসাগর এবং শ্বেতদ্বীপকে এইরূপ অচিন্ত্যভাবের হিসাবে দেখিলে পুরাণ এবং সত্য উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। আর যদি শ্বেতদ্বীপকে এসিয়া মহাদেশের অংশবিশেষই মনে করিতে হয়, তবে সিরিয়া ভিন্ন অন্য অংশে শ্বেত-

দ্বীপের অবস্থিতি নিরূপণ করা সুকঠিন নহে। কেনেডি (Mr Kennedy) বেবরের মিশরের রাজধানী আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের আমদানী সম্বন্ধীয় মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, মহাভারতে শ্বেতদ্বীপের অবস্থিতির যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,তাহা পরিষ্কার।" এই পরিচয় পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দুকুশ এবং পামির পর্ব্বতমালার উত্তরদিকে বক্ত্রিয়া ( বাল্‌খ্‌ ) দেশে বা তাহার উত্তরদিকে অবস্থিত কোন ও ভূখণ্ড শ্বেতদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রদেশে একসময় বহুসংখ্যক নেষ্টরীয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ান বাস করিত। †

অধ্যাপক শীল মহাশয় ভারতীয় বৈষ্ণবগণের মিশরে বা সিরিয়ায় গিয়া শিক্ষালাভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রমাণ অবতারণা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "Now I come to the most extraordinary passage in the record, a passage, which to my mind, is absolutely decisive of a visit to a centre of Christianity" অর্থাৎ আমি এখন নারায়ণীয় খণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত অংশের কথা বলিব। আমার মতে এই অংশ ( এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের ) খৃষ্টধর্ম্মের কোনও কেন্দ্রস্থানে গমন সম্বন্ধে চরম প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। উল্লিখিত অংশটি এই ( শান্তি-পঃ ৩৩৬।১১-১২ ):—

"ছত্রাকৃতি শীর্ষা মেঘৌঘনিনাদাঃ
সমমুষ্কচতুষ্কারাজীবচ্ছদপাদাঃ।
ষষ্ঠ্যাদংতৈর্যুক্তাঃ শুক্লৈরষ্টাভির্দংষ্ট্রাভির্যং
জিহ্বাভির্যোবিশ্ববক্ত্রং লেলিহ্যন্তে সূর্যপ্রখ্যম্‌॥ ১১॥
দেবং ভক্ত্যাবিশ্বোৎপন্নং যস্মাৎ সর্বেলোকাসংপ্রসূতাঃ।
বেদাধর্মামুনয়ঃ শাংতাদেবাঃ সর্বেতস্যানিসর্গাঃ॥ ১২॥

এই শ্লোকদ্বয়ের প্রধান কথা, শ্বেতদ্বীপবাসিগণ জিহ্বা দ্বারা সূর্য্যপ্রখ্য বিশ্ববক্ত্র দেবতাকে লেহন করিতেছে। নীলকণ্ঠ "সূর্য্যপ্রখ্য" অর্থ লিখিয়াছেন "সূর্য্যের দ্বারা যাহা স্ফুটীকৃত হয় দিন মাস ঋতু সংবৎসরাত্মক সেই মহাকাল ( সূর্যেন প্রখ্যায়তে স্ফুটীক্রিয়তে দিনমাসর্ত্তু সংবৎসরাত্মা মহাকালঃ )।" অধ্যাপক শীল এই ব্যাসকূটের নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন— "The Eucharist is here described. The inhabitants drink up the Logos সূর্য্যপ্রখ্যং বিশ্ববক্ত্রং দেবং, All these epithets are applicable to the

† Journal of the Royal Asiatic Society, 1907, p.

Logos, especially as conceived by the Syrian Christians and Gnostics" অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপবাসিরা সূর্য্যপ্রখ্য দেবতাকে লেহন করিতেছে অর্থ পরমেশ্বরের রুধির মাংস পান ভোজন রূপ সিরীয় খৃষ্টীয়ানগণের অনুষ্ঠিত ইউকেরিষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছে। কিন্তু রুধির মাংস পান ভোজন বৈষ্ণব-সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী। বৈষ্ণবসমাজে ইউকেরিষ্টের মত উৎসবের কল্পনা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং শ্বেতদ্বীপের অধিবাসিগণ কর্তৃক এই সূর্য্যপ্রখ্য দেবতা লেহন আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। যেমন রামপ্রসাদের—

"এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ী।"

গ্রিয়ার্সন, কেনেডি প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত নারায়ণীয় খণ্ডে খৃষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অধ্যাপক শীলের উদ্ধৃত বচনের উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (শান্তিপর্ব্ব ৩৩২।৩৫-৪৮) যে একত, দ্বিত এবং ত্রিত নামধেয় সাধকত্রয়ের প্রত্যক্ষিত শ্বেতদ্বীপের নারায়ণোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইউকেরিষ্টের আভাস স্বীকার করিয়াছেন।* নারায়ণীয় খণ্ডের এই অংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক শীলও অবশ্য বলেন, "This passage is an unmistakable description of communion in the early Christian Church" অর্থাৎ এই অংশ যে প্রাচীন প্রাচ্য খৃষ্টীয়সমাজে প্রচলিত উপাসনার বর্ণনা, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না।† এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শীল নারায়ণীয় খণ্ডের একটি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একত, দ্বিত, এবং ত্রিত বলিতেছেন তখন কেবল এই শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ॥"

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক; হে বিশ্বভাবন, হৃষীকেশ, মহাপুরুষ, এবং পূর্ব্বজ, তোমাকে নমস্কার।"

অধ্যাপক শীল বলেন, "Christ is here invoked—(1) as পুণ্ডরীকাক্ষ incarnation of the Logos—God in the flesh; (2) as বিশ্বভাবন—the Logos as Creator; (3) as হৃষীকেশ, মহাপুরুষ, পূর্ব্বজ—i. e., the Logos,

* Journal of the Royal Asiatic Society, 1907, pp. 314-316.

the first-begotten, or only-begotten Son." অর্থাৎ খৃষ্ট তিন ভাবে স্তুত হইয়াছেন; প্রথম—পুণ্ডরীকাক্ষ বা দেহধারী ঈশ্বর (Logos), নরদেবরূপী খৃষ্ট। দ্বিতীয়—বিশ্বভাবন বা বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর (Logos)। তৃতীয়—পূর্ব্বজ মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের একমাত্র তনয়। কিন্তু আর এক স্থলে (৬১ পৃঃ) নারায়ণীয় খণ্ডে উল্লিখিত দশাবতারের তালিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক শীল লিখিয়াছেন, "Christ is not named separately, Christ is Narayana's আদিমূর্ত্তি in Svetadvipa." অর্থাৎ খৃষ্ট স্বতন্ত্র অবতাররূপে উল্লিখিত হয়েন নাই, কেন না, খৃষ্ট শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের আদিমূর্ত্তি। এখন জিজ্ঞাস্য, নারায়ণীয়ে উল্লিখিত পুণ্ডরীকাক্ষ Logos in the flesh—Christ as man-God or God-man ভিন্ন আর কিছু—পদ্মপলাশলোচন বাসুদেব বুঝাইতে পারে না কি? কোন পণ্ডিতই পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর এদিকে ঠেলিয়া আনিতে প্রস্তুত নহেন। পাণিনির (৪।৩।৯৮) "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" সূত্রে যে ভগবান বাসুদেবের ভক্তের কথা আছে, মহাভাষ্যকার এবং কাশিকাকারের অনুসরণ করিয়া একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। পাণিনির "ইবে প্রতিকৃতৌ" (৫।৩।৯৬) এবং "জীবিকার্থে চাপণ্যে" (৫।৩।৯৯) সূত্রে দেবপ্রতিমার অস্তিত্বও সূচিত হইয়াছে। রাজপুতানার অন্তর্গত ঘসুণ্ডী নামক স্থানে আবিষ্কৃত এক-খানি শিলালিপিতে ভগবান সংকর্ষণ এবং বাসুদেবের জন্য নারায়ণবাটে শিলা-প্রাকার নির্ম্মাণের কথা আছে। প্রাচীন অক্ষরবিদ্‌গণ মনে করেন, এই লিপি খৃষ্টের অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছিল। অধ্যাপক শীলের গ্রন্থরচনার ১২ বৎসর পূর্ব্বে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছিল।* পতঞ্জলির মহাভাষ্য যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দের মাঝামাঝি রচিত হইয়াছিল, একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। মহাভাষ্যে (পাণিনি ২।২।৩৪) "অথাতন্ত্রং" বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

"মৃদঙ্গ শঙ্খতূণবাঃ পৃথঙ্‌ নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতি রামকেশবানামিতি"

"ধনপতি, বলরাম, এবং কেশবের মন্দিরে জনসঙ্ঘের মধ্যে মৃদঙ্গ, শঙ্খ এবং তূণব পৃথক্ বাজান হইতেছে।"

লোকে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে, আর যাহারা খৃষ্ট জন্মের এতকাল পূর্ব্বাবধি মন্দিরে নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৃদঙ্গ শঙ্খাদি

---

* Luders List of Brahmi Inscriptions, No. 6; Bhandarkar's Vaishnavism &c p. 3.

বাত্মসংযোগে তাঁহার উপাসনা করিয়া আসিতেছিল, তাহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে সিরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে নারায়ণকে "পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া স্তব করিত না, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অধ্যাপক শীলের উপরোক্ত গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় রচিত এবং য়ুরোপীয় সভায় পঠিত হইয়া থাকিলেও গ্রিয়ার্সন, কেনেডি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিত ইদানীং বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহারা কেহই এই গ্রন্থে নিবন্ধ কোন মতের কোন্ প্রকার আলোচনা করেন নাই।

এই সকল পণ্ডিতের মতে বাসুদেব কৃষ্ণের উপাসনায় খৃষ্টীয় প্রভাব না থাকিলেও, নন্দ-নন্দন বালকৃষ্ণের কাহিনীতে এবং উপাসনায় খৃষ্টীয় প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। হপ্‌কিন্‌স, কেনেডি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আগন্তুকগণের প্রভাবে ভারতে বালকৃষ্ণের উপাসনা অভ্যুদিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের একটা ঘোর আপত্তি এই যে, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা খিল হরিবংশে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে এবং খিল হরিবংশে একুনে এখন শত সহস্র বা লক্ষ শ্লোক দৃষ্ট হয়। উচ্ছকল্পের রাজা সর্ব্বনাথের ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসনে পরাশরতনয় বেদব্যাস রচিত মহাভারত শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকাত্মক সংহিতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।* সুতরাং খিল হরিবংশ সম্বলিত মহাভারত যে ৫৩২ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নতুবা কখনই উহা ঐ সময়কার প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থরূপে উল্লিখিত হইতে পারিত না। এবং হরিবংশে বর্ণিত বৃন্দাবনলীলা প্রসঙ্গের পরিগ্রহকাল ৬০০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। যদি উহা পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই ৫৩২ খৃষ্টাব্দের দীর্ঘকাল পূর্ব্বে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

পুনার সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর ও জর্ম্মণি হইতে ( ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ) প্রকাশিত তাঁহার "বৈষ্ণব, শৈব এবং অপরাপর সম্প্রদায়" বিষয়ক গ্রন্থে বালকৃষ্ণের উপাসনা খৃষ্টধর্ম্মমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পতঞ্জলির "ব্যাকরণ মহাভাষ্যে" বা "মহাভারতে" বৃন্দাবন-লীলার কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।"

* "উক্তঞ্চ মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পরমর্ষিণা পরাশর সুতেন বেদব্যাসেন ব্যাসেন" Fleet's Gupta Inscription, p. 136

সভাপর্ব্বে (৪১ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করার সময় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোকুলে সম্পাদিত পুতনা বধাদি বীরকীর্ত্তির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ভীষ্ম এ সকল কীর্ত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ভীষ্ম কৃষ্ণসম্বন্ধে যে সকল প্রসংশাবাক্য প্রয়োগ করেন (৩৮ অঃ) তন্মধ্যে পুতনা বধাদি কীর্ত্তির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং [৪১ অধ্যায়ের] এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত। ভাণ্ডারকার লিখিয়াছেন—

"এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান হয় যে গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে জানা ছিল না। এই কাহিনীর প্রধান আকর "হরিবংশে" "দীনার" শব্দটি আছে। "দীনার" শব্দটি লাটিন ভাষার "দিনেরিয়াস" শব্দমূলক; সুতরাং [রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাতের পর] আনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে "হরিবংশ" রচিত হইয়াছিল। উহার কিছুকাল পূর্ব্বেই অবশ্য কৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণ পালক পিতা নন্দকে ইন্দ্রোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে বিরত এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজায় রত করিবার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন সেই উক্তি হইতে গোপ-গণের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

বয়ং বনচরা গোপাঃ সদা গোধন জীবিনঃ
গাবোঽস্মদ্দৈবতং বিদ্ধি গিরয়শ্চ বনানি চ॥ ৩৮০৮

"আমরা বনচর গোপ, গোধন পালন করিয়া আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। গরু, পর্ব্বতনিচয় এবং বনসমূহ আমাদের দেবতা। গোপগণ ঘোষে অর্থাৎ অস্থায়ী আবাসে বাস করিবেন। এই ঘোষ সহজে একস্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যাইত। যথা গোপগণ ব্রজত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ৩৫৩২)। ঘোষ শব্দের অর্থ আভীরপল্লী, গোপ গণের আবাস ক্ষেত্র। কিন্তু "আভীর" শব্দের মূল অর্থ গোপ নহে। আভীর একটি জাতির নাম। গোরক্ষা তাহা-দিগের বৃত্তি ছিল। এই নিমিত্ত আভীর শব্দ পরবর্ত্তীকালে গোপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই সকল কারণে অনুমান হয়, বালক কৃষ্ণ যাহাদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহারা যাযাবর আভীর জাতি। এই আভীরগণ দ্বারকার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মথুরার নিকটস্থ মধুবন হইতে অনূপ ও আনর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিত (হরিবংশ, ৫১৬৩—৫১৬৩)। মহাভারতে কথিত হইয়াছে (মুসলপর্ব্ব, ৭ম অঃ) বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের বিনাশের পর অর্জ্জুন যখন বৃষ্ণি-কুলের কামিনীগণকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, তখন

আভীরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আভীরগণ পঞ্চনদের অর্থাৎ পঞ্জাবের নিকটে বাসকারী দস্যু বা ম্লেচ্ছ বলিয়া [ মহাভারতে ] বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে আভীরগণকে অপরান্ত ( কোঙ্কণ ) এবং সৌরাষ্ট্রের নিকট স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং বরাহমিহিরও আভীরগণকে প্রায় ঐ দেশেই স্থাপন করিয়াছেন। ····· প্রাচীন আভীরগণের বংশধরদিগকে এখন আহির বলা হয়, এবং এখনকার আহিরগণের মধ্যে ছুতার, সোণার, গোপ, এবং পুরোহিত ব্যবসায়ীও আছে। এক সময়ে আভীরগণ মরাঠা দেশের উত্তরভাগে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। নাসিকে আভীর শিবদত্তের পুত্র আভীররাজ ঈশ্বর সেনের একটি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। অক্ষরের আকার হইতে অনুমান হয়, এই লিপিখানি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের শেষভাগে সম্পাদিত হইয়াছিল। পুরাণে আভীরবংশীয় দশজন নৃপতির উল্লেখ আছে। কাঠিবারের অন্তর্গত গুণ্ডা নামক স্থানে প্রাপ্ত আর একটি পুরাতন লিপিতে আভীর বলিয়া কথিত রুদ্রসিংহ নামক সেনাপতির দানের কথা আছে। এই লিপি রুদ্রসিংহ নামক ক্ষত্রপ রাজের সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল। রুদ্রসিংহ ১০২ শকে বা ১৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। যেহেতু আভীরগণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দের শেষভাগে এবং তৃতীয় খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই আভীরগণই সম্ভবতঃ শিশুদেবতার উপাসনা, সেই দেবতার নীচকুলে জন্মের কথা, যে ব্যক্তি সেই দেবতার পিতৃরূপে পরিচিত ছিলেন, তিনি যে জানিতেন শিশু তাঁহার পুত্র নয়, এই বৃত্তান্ত এবং শিশুহত্যার বৃত্তান্ত লইয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। আভীরগণ সম্ভবতঃ খৃষ্ট নামটিও আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং এই সূত্রেই সেই শিশুদেবতার এবং বাসুদেব কৃষ্ণের অভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।" *

স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ব্রজের গোপগণকে আভীর বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিশেষ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতে আভীরগণকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। হরিবংশে বালক কৃষ্ণ গোপগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, ইন্দ্র গোপগণের দেবতা নহেন, গরু, গিরি, এবং বন গোপগণের দেবতা। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ং।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥

* Vaishnavism &c. pp. 36-38.

তস্মাদ্‌গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।"

(১০।২৪।২৩—২৪)

"হে তাত! আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে বসতি করি, পত্তন, দেশ ও গ্রাম এ সকল আমাদের কল্যাণহেতু হইতে পারে না, বরং শৈলাদিই যোগক্ষেমের কারণ। অতএব গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন।"

"হরিবংশে" ব্রাহ্মণের কথা নাই, কেবল গরু এবং পর্ব্বতের কথা আছে। যথা--

"অর্চ্চয়ামো গিরিং দেবং গাশ্চৈব সবিশেষতঃ। (৭৩ অঃ, ৩৮৪৮)

"আমাদের এই গিরিরূপী দেবতাকে এবং ধেনুগণকে সবিশেষ পূজা করা কর্ত্তব্য।"

যাহাদের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মমত প্রচারিত এবং আদৃত হইত সেই গোপগণকে ধর্ম্মের হিসাবে ম্লেচ্ছ বলা যাইতে পারে। এই গোপগণ প্রকৃত প্রস্তাবে যাযাবর পশুপালক ছিলেন। হরিবংশে কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন—

"বিক্রীয়মাণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ শাকৈশ্চ বন সম্ভবৈঃ।
উৎসন্নসঞ্চরতৃণো ঘোষোঽয়ং নগরায়তে॥
* * *
তস্মাদ্বনং নবতৃণং গচ্ছন্তু ধনিনো ব্রজাঃ।
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা॥
প্রশস্তা হি ব্রজা লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ।"

(৬৫ অঃ)

"বনজাত কাষ্ঠ এবং শাক বিক্রীত হওয়ায় এবং তৃণরাজি উৎসন্ন হওয়ায় এই আভীর পল্লী [ ঘোষ ] নগরে পরিণত হইয়াছে। * * এই নিমিত্ত ধনবান গোপ-গণের নবতৃণশোভিত বনে যাওয়া উচিত। গোপগণ দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীরমধ্যে বাস করে না; তাহাদের গৃহ এবং ক্ষেত্র নাই। গোপগণ পক্ষিদিগের ন্যায় সদা-গমনশীল বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ।"

যাদবরাষ্ট্রের অধিবাসী, গিরিদেবতা, বনদেবতা, এবং গোদেবতার উপাসক যাযাবর গোপগণই যে মহাভারতোক্ত ম্লেচ্ছ আভীর, এই অনুমান সুসঙ্গত। হরিবংশে (৯৪ অধ্যায়ে) যাদবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে একথা একরূপ পরিষ্কার করিয়াই বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুকুলে হর্য্যশ্ব নামে এক জন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। হর্য্যশ্ব মধুনামক দৈত্যের দুহিতা

মধুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হর্য্যশ্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক অযোধ্যা হইতে তাড়িত হইয়া পত্নী এবং কতিপয় অনুচরসহ বনগমন করিয়াছিলেন; পরে মধুমতীর উপদেশানুসারে শ্বশুর মধুদৈত্যের রাজধানী মধুবনের অন্তর্গত মধুপুরে উপনীত হইয়াছিলেন। মধু হর্য্যশ্বকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন—

"স্বাগতং বৎস হর্য্যশ্ব প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ।
যদেতন্মম রাজ্যং বৈ সর্ব্বং মধুবনং বিনা॥
দদানি তব রাজেন্দ্র বাসশ্চ প্রতিগৃহ্যতাং।
বনেঽস্মিন্ লবণশ্চৈব সহায়স্তে ভবিষ্যতি॥
অমিত্রনিগ্রহে চৈব কর্ণধারত্বমেষ্যতি।
পালয়ৈনং শুভং রাষ্ট্রং সমুদ্রানূপভূষিতং॥
গোসমৃদ্ধং শ্রিয়াজুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষং।
তত্র তে বসতস্তাত দুর্গং গিরিপুরং মহৎ॥
ভবিতা পার্থিবাবাসঃ সুরাষ্ট্রবিষয়ো মহান্।
অনূপ বিষয়শ্চৈব সমুদ্রান্তে নিরাময়ঃ॥
আনর্ত্তং নাম তে রাষ্ট্রং ভবিষ্যত্যায়তং মহৎ।

*

যযাতমপি বংশস্তে সমেষ্যতি চ যাদবং॥
অনুবংশঞ্চ বংশস্তে সোমস্য ভবিতা কিল।"

হে বৎস হর্য্যশ্ব, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত। তোমাকে দর্শন করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। মধুবন ব্যতীত আমার এই সমস্ত রাজ্য তোমাকে দান করিতেছি, তুমি এইখানে বাস কর। এই বনে লবণ তোমার সহায় হইবে, এবং শত্রুনাশ কার্য্যে কর্ণধারস্বরূপ হইবে। এই সমুদ্রবেলাভূষিত, গোধনপূর্ণ, শ্রীসম্পন্ন, অধিকাংশস্থলেই আভীরজাতি নিবসিত এই শুভ রাষ্ট্র পালন কর। তুমি এখানে বাস করিলে মহান্ গিরিপুর এবং দুর্গ রাজার বাসস্থানে পরিণত হইবে এবং এই রাষ্ট্র মহান্ সুরাষ্ট্র হইবে; সমুদ্রপ্রান্তস্থ অনূপদেশ নিরাপদ হইবে; এবং তোমার বিস্তৃতরাজ্য আনর্ত্ত নামে পরিচিত হইবে।...... তোমার বংশ যযাতি হইতে উৎপন্ন যদুবংশ নামে পরিচিত হইবে। তোমার বংশ চন্দ্রবংশে পরিণত হইবে।"

হর্য্যশ্ব ও মধুমতীর পুত্রের নাম যদু; এই যদু হইতে যাদবগণের উৎপত্তি।

ফুলওয়ালী

Manasi Press

যদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মাধব। মাধবের পুত্র সত্বত। এই সত্বত হইতে যাদবগণ সাত্বত নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সত্বতের পুত্র ভীম। ভীম যে সময় আনর্ত্তে রাজ্য করিতেছিলেন, সেই সময় রামানুজ শত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে বধ এবং মধুবন ধ্বংস করিয়া তথায় মথুরানগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন পরলোকগমন করিলে সত্বত তনয় ভীম মথুরা অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় মথুরা হইতে সাগরান্ত পর্য্যন্ত যাদবগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এবং আভীরগণই এই রাজ্যের প্রধান অধিবাসী ছিল। সুতরাং "আভীর প্রায় মানুষঃ" বা আভীরজাতীয় মনুষ্যপূর্ণ যাদবরাজ্যের যাযাবর এবং অবৈদিক দেবতার উপাসক গোপগণকে আভীর মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের অপর সিদ্ধান্ত,—আভীরগণ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—গ্রহণ করা অসম্ভব। হরিবংশকার যে লিখিয়াছেন যে, আভীরগণ মধুদৈত্যের এবং যদুর পিতা হর্য্যশ্বের সমসময়ে ভাবী যাদব রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, একথা অন্ততঃ সপ্রমাণ করিতেছে যে, হরিবংশ রচনার সময়ে আভীরগণ আনর্ত্ত এবং মথুরা প্রদেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইত। "পেরিপ্লাস ইরিথ্রি মেরি" নামক খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দের শেষার্দ্ধে রচিত নৌভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বলিত একখানি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, "অবিরিয়া" ( Abiria ) বা আভীর জনপদ সিথিয়া বা শকরাষ্ট্র এবং সাগর প্রান্তবর্ত্তী সিরষ্ট্রিন বা সৌরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত। ক্ষত্রপ নহপানের রাজ্য এখানে সিথিয়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে যদি আভীর জনপদ ক্ষত্রপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং সৌরাষ্ট্রের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া থাকে, তবে তৎকালের আভীরগণকে নবাগত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

পতঞ্জলির "ব্যাকরণ মহাভাষ্য" খৃষ্টজন্মের প্রায় সার্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থেও "ঘোষ" শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা ( পাণিনি ২।৪।১ ), "কঃ পুনরার্য্যনিবাসঃ। গ্রামো ঘোষো নগরং সংবাহ ইতি।" সুতরাং খৃষ্টজন্মের ১৫০ শত বৎসরের পূর্ব্বেও দেশে "ঘোষ" ছিল একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহার অনেক পূর্ব্বে এদেশে যে আভীর ছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন পতঞ্জলির দীর্ঘকাল পূর্ব্বে—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অন্যূন ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে—প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন পাণিনির "অজাদ্যতষ্টাপ্" সূত্রের বার্ত্তিক করিয়াছেন, "শূদ্রা চামহৎপূর্ব্বা জাতিঃ"।

"মহাশূদ্র" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "মহাশূদ্রা" হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বার্ত্তিক করিয়া কাত্যায়ন বিধান করিয়াছেন, জাতিবাচক মহাশূদ্র শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মহাশূদ্রী হইবে। কাশিকাকার লিখিয়াছেন, "মহাশূদ্র শব্দো হ্যাভীর জাতি বচনঃ;" "মহাশূদ্র শব্দ আভীর জাতিবাচক।" অমরকোষেও আছে, "আভীরী তু মহাশূদ্রী।" সুতরাং কাত্যায়নের সময়েও যখন আভীর পাওয়া যাইতেছে, তখন বালকৃষ্ণ-চরিত কথায় গোপ এবং ঘোষের উল্লেখ আছে বলিয়াই তাহা খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী কালের কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কৃষ্ণের বাল্যচরিত কথায় এবং খৃষ্টের বাল্যচরিত কথায় কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যে উভয় কাহিনীর মূল এক, এরূপ অনুমানকরাও সঙ্গত নহে। উভয় কাহিনীর মূলেই কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকিতে পারে। কংস নামে যাদব রাজ্যের অধীশ্বর হয়ত ছিলেন। ঐ রাজ্যের প্রজাসাধারণ আভীর জাতীয় ছিল। ভগিনী দেবকীর গর্ভজাত সন্তান হইতে পুরাণ কথিত দৈববাণী ছাড়াও কংসের ভীত হইবার অন্যরূপ কারণ অনুমিত হইতে পারে, এবং মাতুলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বসুদেবের পক্ষে বলদেব এবং কৃষ্ণকে আভীর পল্লীতে কোনও আভীর বন্ধুর গৃহে রাখিয়া আসা এবং শিশুদ্বয়ের আভীর গৃহে লালিত পালিত হওয়া বিশ্বাসের একেবারে বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর যদি কৃষ্ণের ব্রজলীলা একেবারেই কল্পনামূলক মনে করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষে এরূপ কাহিনী স্বাধীনভাবে কল্পিত হইবার কোনও অন্তরায় দেখা যায় না। অনেক অংশে অনুরূপ পার্সিয়াসের কাহিনী খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে গ্রীক-জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্গসের রাজা এক্রিসিয়াসের ডেনি নামক কন্যা ছিল। একজন দৈবজ্ঞ একসময় এক্রিসিয়াসকে বলিয়াছিল, "তোমার কন্যা ডেনির একটি পুত্রসন্তান হইবে এবং সেই পুত্র তোমাকে নিহত করিবে।" এই কথা শুনিয়া এক্রিসিয়াস অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং ডেনিকে একটি গহ্বরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গহ্বরে দেবতার প্রসাদে পার্সিয়াসের জন্ম হয়। এক্রিসিয়াস তখন ডেনিকে এবং শিশু পার্সিয়াসকে একটা বড় বাক্সে ভরিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। মাতা পুত্র ভাসিতে ভাসিতে সেরিফসদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেখানে ডিক্‌টিসের গৃহে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। পার্সিয়াস গর্গন মেডুসা নাম্নী রাক্ষসীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন এবং সাগর হইতে বহির্গত একজন দৈত্যের বিনাশ সাধন করতঃ এণ্ড্রোমেডা নাম্নী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেম। কৃষ্ণের চরিত কথার সহিত

খৃষ্টের চরিত কথার যত সাদৃশ্য পার্সিয়াসের চরিত কথার সহিত সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। পার্সিয়াস কর্ত্তৃক মেডুসার শিরশ্ছেদ এবং জল দৈত্যবধ পুতনাবধ এবং কালিয়দমন স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

# অপলক আঁখি

গৃহহারা পথিক ব'লে সাঁঝের আঁধারে,
মলিন বয়ান সজল নয়ান সে এলো দ্বারে।
হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে গো কাঙ্গাল ভিখারী,
কেমন করে বল তারে ফিরা'তে পারি?
ভিক্ষা দিতে গেলাম যখন দু'হাত ভরিয়া,
দখিন হাওয়ায় মাথার কাপড় গেল সরিয়া,
বদ্ধ হাতে কবরী মোর ঢাকা হ'লোনা,
চেয়ে দেখি তারো আঁখির পলক প'লোনা;
ভাবছি বসে ভিখারীর এ কেমন ব্যবহার,
আবার এসে মুখের পানে চাইবে না সে আর?

রাঁচি, নিভৃত-কুটীর
২৫শে ডিসেম্বর

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# ভুল

সত্য যদি কাঙ্গাল হ'তো বুঝিতাম তবু,
রাজার দুলাল ভিখারী হয় শুনিনি কভু!
যে দান তারে দিতে গেলাম ওঠেনা তার মন,
তুষ্ট তারে করতে পারি, কি আছে এমন?
ছিল ছিল কণ্ঠমালা, গেলাম ভুলিয়া,
পড়লে মনে সেইটি তারে দিতাম খুলিয়া।
সে দিন থেকে সে মালা আর পরিনি গলে,
ভুলের তরে নয়ন ভরে নয়নের জলে!

রাঁচি, নিভৃত-কুটীর
২৫ ডিসেম্বর

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

# জীবনের মূল্য

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### পিসিমার দৌত্য

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিরিশ তাঁহার পিসিমাকে বলিলেন—"পিসিমা, আজ হল গিয়ে মাসের আটুই, আর ত বেশী দিন নেই, আশীর্ব্বাদটা হয়ে গেলে হত না?"

ভাইপোর এই আগ্রহদর্শনে মনে মনে হাস্য করিয়া পিসিমা বলিলেন—"এখনও দিন আছে বৈ কি বাবা—প্রায় একমাস রয়েছে। এদিকের সব যোগাড়যন্ত্র হোক্, মাসের শেষাশেষি তখন আশীর্ব্বাদ হলেই হবে।"

গিরিশ বলিলেন—"তুমি বোঝ না পিসিমা। চারি দিকে শত্রু। গ্রামের লোককে বিশ্বাস নেই। কেউ ত কারু ভাল দেখতে পারে না, বুক ফেটে মর্‌ছে সব। কত লাগাচ্ছে, কত ভাঙাচ্ছে, আমরা কি সব খবর পাই? অতগুলি টাকার গহনাপত্র গড়াতে দিয়ে এলাম, যদি শেষে কোনও রকম গোলযোগ হয় ত দাঁড়িয়ে লোকসান।"

পিসিমা বলিলেন—"আচ্ছা, পটলির মার সঙ্গে দেখা হলে বলব।"

কবে পিসিমা পটলিদের বাড়ীতে যাইবেন, কি ভাবে কথাটা তুলিবেন, অতঃপর এই সকল পরামর্শ চলিতে লাগিল। গিরিশ বলিলেন—"বরং এই রকম বোলো পিসিমা, বুঝলে? বোলো যে গিরিশের কল্‌কাতায় অনেক কায রয়েছে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই তাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে। ফিরবে হয় ত সেই বিয়ের দু তিন দিন থাক্‌তে। তখন আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ করতে হলে বড়ই তাড়াতাড়ি হবে, ওগুলো তার চেয়ে এইবেলা সেরে ফেল্লেই ভাল।"

আগামী কল্য বেলা পড়িলে পিসিমা পটলিদের বাড়ী যাইবেন স্থির হইল। গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা পিসিমা, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলে একরকম পাকাপাকি হল ত?"

পিসিমা বলিলেন—"একবারে পাকা বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, কতকটা পাকা বৈ কি। গায়ে হলুদ হয়ে গেলে যেমন বিয়ে হতেই হবে, নইলে মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে, তেমনতর নয়।"

"আশীর্ব্বাদ হয়েও বিয়ে ভেঙ্গে যায় ?"

"যায় বৈ কি। সে বছর আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে—"

গিরিশ বাধা দিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদের পর কোনও পক্ষ যদি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়, তা হলে তার একটা নিন্দে আছে ত ?"

"তা আর নেই ? নিন্দে আছে বৈ কি। তবে, মেয়ের জাত যায় না, এই পর্য্যন্ত।"

পিসিমা যথা পরামর্শ পরদিন অপরাহ্নকালে, তসর পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। সকল কথা শুনিয়া জগদীশের স্ত্রী স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। কেবল বলিলেন, কর্ত্তা বাড়ী আসুন তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপ হয়, কল্য সংবাদ পাঠাইবেন।

বাড়ী আসিয়া পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন—"কি জানি বাবা, ওদের ভাবভঙ্গী কিছু বুঝতে পারলাম না।"

গিরিশ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?"

"কেমন যেন আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। একটা আঁঠা নেই। আচ্ছা—দেখি—হচ্ছে—হবে—এই ভাবের কথা।"—বলিয়া পিসিমা, উহাদের বাড়ীতে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্তই বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া গিরিশ বলিলেন—"দেখ্‌লে পিসিমা—বলেছিলাম কি না। লোকে ভাঙচি দিচ্ছে। তা, ভাল পাত্র পান, দিন না ওঁরা মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায়।" —মনে মনে গিরিশ স্থির করিলেন, যেদিন ওরূপ কোনও কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবে, তৎপরদিনই হুগলির আদালতে নালিশ দায়ের করিয়া জগদীশের ঐ বাড়ী ক্রোক করাইবেন।

পিসিমা গিরিশের মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"দিলে দিলে, না দিলে না দিলে। কিসের খোসামোদ ? ওঃ—মেয়ে আর দুনিয়ায় নেই কিনা! ওরা রাজি না হয়, পষ্ট বলুক—মেয়ের ভাবনা কি ? এই জষ্টিমাসেই ওর চেয়ে ভাল মেয়ে দেখে তোমার বিয়ে দেব। এদ্দিন তুমি বিয়ে করতে চাওনি তাই—কত মেয়ে—ওর চেয়ে ভাল মেয়ে—গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

"দেখা যাক্, কাল কি খবর ওরা পাঠায়"—বলিয়া গিরিশ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ওদিকে জগদীশের বাড়ীতে, কর্ত্তা ও গৃহিণীতে বড়ই দুশ্চিন্তান্বিত অবস্থায়

বসিয়া ছিলেন। গৃহিণী বলিলেন—"তাই ত, করাই বা যায় কি? ওদের যে রকম আকিঞ্চন, টালমাটাল করলে হয় ত চটেই যাবে। হরিপদ যদি কিছু কর্‌তে না পারে, তখন কি একূল ওকূল দুই যাবে?"

কর্ত্তা বলিলেন—"তাই ত! বিষম সমস্যায় পড়া গেল যে!"—বলিয়া তিনি শেষ প্রাপ্ত হরিপদর চিঠিখানি বাহির করিয়া, চশমা চোখে দিয়া প্রদীপের আলোকে আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অর্দ্ধেক রাত্রি অবধি পরামর্শ করিয়া অবশেষে ইহাই স্থির হইল, আশীর্ব্বাদ এখন হউক, পরে ওদিকে যদি সুবিধা হয় ত এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেই হইবে। লোকে নিন্দা করিবে—কিন্তু উপায় কি?"

সুতরাং জগদীশ পরদিন বেলা দশটার সময় ডাকঘর হইয়া (হরিপদর কোনও পত্র আসে নাই) গিরিশের বাড়ী গিয়া তাহার পিসিমাকে বলিয়া আসিলেন, অন্ত বেলা চারিটা অবধি বারবেলা আছে, বারবেলাটা গতে গোধূলি লগ্নে আসিয়া "বাবাজী"কে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে পিসিমাতার অমত হইল না।

গিরিশ শুনিয়া ময়রাবাড়ীতে সন্দেশের ফরমাইস দিতে লোক ছুটাইলেন। বৈকালে আসিয়া মিষ্টমুখ করিবার জন্য কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকেও নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### আশীর্ব্বাদ

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। গিরিশবাবুর বৈঠকখানায় আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সতীশ দত্ত, মাধব চক্রবর্ত্তী এবং পাড়ার নিত্যানন্দ রায়, দুর্গাদাস অধিকারী প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন। এই বৈঠকখানা ঘরটি আজ সারাদিন ঝাড়পোঁছ হইয়াছে। মেঝের উপরকার সেই মলিন মসীচিহ্নিত পুরাতন জাজিমখানি অন্তর্হিত, পীতবর্ণের জমির উপর খদিরবর্ণের বুটিছাপা অন্য:একখানি তাহার স্থান:অধিকার করিয়াছে। ধোলাই করা ওয়াড়-দেওয়া কয়েকটি মোটা মোটা তাকিয়া এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। দুইটা বাঁধা হুঁকায় অনবরত তামাক চলিতেছে। গিরিশ আজ বেশ ফিটফাট—তাঁহার পরিধানে একখানি ধোপদস্ত নরুণপেড়ে ধূতি, গায়ে ইস্ত্রীকরা

একটি হাতকাটা পিরাণ। দাড়ী কামাইয়াছেন; মস্তকে কেশগুলি (যাহা অবশিষ্ট আছে)—সুবিন্যস্ত। অন্য সকল অভ্যাগতগণও একটু সাজিয়া আসিয়াছেন। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, হাস্যরঞ্জিত—সতীশ দত্ত ত আজ কথায় কথায় উদ্ভট শ্লোক আওড়াইতেছে। হাস্য ও গল্পগুজবে বৈঠকখানা ঘরটি যেন জম্‌জম্ করিতেছে। কেবল মাধব চক্রবর্ত্তী যেন একটু ম্রিয়মাণ, কারণ সম্প্রতি তাঁহার সর্দ্দিটা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছে।

নিত্যানন্দ বলিল—"গিরিশ বিবাহ করবেন আমাকে আগে যদি বলতেন, আমি এর চেয়ে ঢের ভাল সম্বন্ধ জুটিয়ে দিতে পারতাম।"

চক্রবর্ত্তী বলিল—"কেন? এটাই বা মন্দো কি?"

নিত্যানন্দ বলিল—"মন্দ বলছিনে। তবে বড্ড গরীব, এক পয়সা পাওনা নেই। শুন্‌লাম, উল্টে গিরিশ ভায়ারই অনেক টাকা খরচ।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"মেয়েটি ভাল। দেখ্‌তেও সুন্দরী—আর বড় লক্ষ্মী। গিরিশের টাকা খরচ সার্থক হবে।"

সতীশ দত্ত রূপার রেকাবী হইতে একটা পাণ তুলিয়া লইয়া বলিল—

"ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষ্বধনেষু বন্ধুষু
ধনব্যয়স্তেষু ন গণ্যতে বুধৈঃ॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এর প্রায় সকলগুলিই মিলে যাচ্ছে। ক্রতৌ কিনা যজ্ঞে—কত বড় একটা যগ্যি হবে তা ভাবুন। এত বড় যগ্যি—এটা যে যশস্কর কর্ম্ম, তাতে সন্দেহ কি? তার পর, মিত্র-সংগ্রহে—এই বিবাহটির সূচনাতেই আমরা এতগুলি মিত্র এসে আজ যুটেছি ত —আরও কত যুটবে। অধনেষু বন্ধুষু—আমরা এই সব গরীব বন্ধু, বিবাহের সাতদিন আগে থাক্‌তে আর সাতদিন পর পর্য্যন্ত বাড়ীতে আর হাঁড়ি চড়াচ্ছিনে বাবা।"—বলিয়া তিনি একটিপ নস্য লইলেন। সকলে হাসিতে লাগিল।

মাধব চক্রবর্ত্তী সর্দ্দির প্রভাবে ভাল করিয়া হাসিতে না পারিয়া বলিল—"দিল্‌ত একটু লষ্যি। লষ্যি লিলে সর্দ্দি কবে।"

সতীশ বলিল—"সবগুলোই ব্যাখ্যা করলেন। প্রিয়াসু নারীষু—ওটা ব্যাখ্যা করলেন না ভট্‌চায মশায়?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"গিরিশ আমায় দাদা বলে যে। তোমরা করতে পার।"

সতীশ বলিল—"রিপুক্ষয়েটাও মিলে যাচ্ছে। নাম করতে চাইনে, এই গ্রামে এমন দু চারজন লোক আছেন, যাঁরা গিরিশ দাদার বিয়ে হবে শুনে বুক ফেটে মরছেন।"

দুর্গাদাস অধিকারী বলিল—"আছে বৈ কি। সেদিন যাচ্ছি ভট্‌চায্যি পাড়া দিয়ে, পথে যাদব ভট্‌চায্যির সঙ্গে দেখা। আমাকে বল্লে ওহে শুনেছ, পটলি নাকি গিরিশ মুখুয্যেকে বিয়ে করবে বলে কোট্ করে বসেছে?—আমি বল্লাম হ্যাঁ, বিয়ে স্থির হয়েছে তা শুনেছি, কোট্ করে বসার কথা টথা শুনিনি। সে বল্লে হ্যাঁ—গ্রামে খুব রাষ্ট্র! ঘোর কলিকাল হয়ে দাঁড়াল।"

সতীশ দত্ত বলিল—"আমাকেও বলছিল যাদু ভটচায্যি। কাল—না, পর্শু—না কাল। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল বলি হ্যাঁহে—ঐ বুড়োকে বিয়ে করবার জন্যে পট্‌লি ক্ষেপল কেন কিছু বলতে পার? বুড়োকেই অত ওর মিষ্টি লাগল কেন?"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উত্তর দিলে?"

সতীশ বলিল—"আমার যা রোগ—একটা উদ্ভট শ্লোক বলে তার উত্তর দিলাম। বল্লাম—কাকে কার মিষ্টি লাগে তা কি বলা যায় যাদু? জানইত—

দধি মধুরং মধু মধুরং
দ্রাক্ষা মধুরা সুধাপি মধুরৈব।
তস্য তদেব হি মধুরং
যস্য মনো যত্র সংলগ্নম্॥"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিল—"অর্থাৎ?"

সতীশ বলিল—"অর্থাৎ—

দধি মিষ্ট, মধু মিষ্ট,
আঙুর মিষ্ট, সুধাও মিষ্ট বটে।
তার কাছেতে সেই মিষ্ট,
মনখানি তার বাঁধা যার নিকটে।"

—বলিয়া সতীশ মুহূর্ত্তের জন্য গিরিশের প্রতি স্মিত কটাক্ষপাত করিল।

চক্রবর্ত্তী বলিল—"বাহবা বাহবা—এ অনুবাদটি কি তুমি নিজে করেছ নাকি সতীশ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"নিজে করেছে বৈ কি! পূর্ব্বে ওর দিব্য রচনাশক্তি ছিল। কত কবিতা আমায় শোনাত।"

নিত্যানন্দ বলিল—"বটে, তাত জানতাম না। এখনও আপনি কবিতা লেখেন না কি ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"এখন বহুকাল ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছে।"

গিরিশ বলিলেন—"কেন সতীশ, ছাড়লে কেন ?"

সতীশ নিজ উদরে হস্তার্পণ করিয়া বলিল—"আর দাদা, পেটের চিন্তা করব না কবিতা লিখব ? এখানে আগুন জ্বলতে থাকলে কি আর কবিতা বেরোয় ?

অন্তঃপ্রতপ্তমরুসৈকতদহ্যমান-
মূলস্য চম্পকতরোঃ ক বিকাসচিন্তা।
প্রায়ো ভবত্যনুচিতস্থিতিদেশভাজাং
শ্রেয়ঃ স্বজীবপরিপালনমাত্রমেব॥

—আগুনের মত মরুভূমির মধ্যে যে চাঁপা গাছটির শিকড় পোঁতা রয়েছে, নিজের প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতেই সে ব্যতিব্যস্ত, ফুল ফোটাবে কখন বলুন ?"

গিরিশ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"যদি শাস্ত্রের কথা ফলে যায়, এবার আমার ছেলে হলে, কিছু বেশী বেতন দিয়ে সতীশকে তার প্রাইবেট মাষ্টার নিযুক্ত করব। ছাঁপোষা মানুষ, অল্প আয়, আহা বেচারির বড় কষ্ট।"

সতীশ দত্ত মুখ তুলিয়া নাসিকায় ঘ্রাণ লইবার মৃদু শব্দ করিয়া বলিল—"লুচী ভাজার খাসা গন্ধ বেরিয়েছে। চক্রবর্ত্তী মশায়, বুঝতে পারছেন ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"লা। লাক যে বল্‌দো।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"বেলা যে পড়ে এল, জগদীশ কৈ ? এত দেরী করছে কেন ?"

সতীশ সুর করিয়া বলিল—"এস বাবা জগদীশ, আশীর্ব্বাদটা সেরে নাও, ফলারে বসি। ইস্কুলে সারাদিন ছেলে ঠেঙ্গিয়ে ক্ষিধেয় পেট যে চোঁ চোঁ করছে।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
খাস্তালুচীসৌরভমুগ্ধচিত্তং
বুভুক্ষিতং মাং জগদীশ রক্ষ॥

—জগদীশ, প্রাণে মের না বাবা।"

এ কথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ বোধ করিয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"তুবি যে অবাক্ [illegible] সতীশ !—জগদীশের

নামেও শ্লোক বলে ফেল্লে?—আচ্ছা, আবার নামে একটা শ্লোক বল দিকিন। তা যদি পার তবেই বুঝি তোবার পাণ্ডিত্য।"

সতীশ ক্ষণকাল মাত্র চিন্তা করিয়া বলিল—"বলব? শুন্‌বেন? আচ্ছা তবে শুনুন—

আপদ্গতঃ খলু মহাশয়চক্রবর্ত্তী
বিস্তারয়ত্যকৃতপূর্ব্বমুদারভাবম্।
কালাগুরুর্দহনমধ্যগতঃ সমন্তাৎ
লোকোত্তরং পরিমলং প্রকটীকরোতি॥"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"অ্যা—অ্যা? বল্‌তে না বলতেই? মুখে মুখে রচনা করে দিলে নাকি হে?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—"না, ও পুরাণো শ্লোক।"

এমন সময় দেখা গেল জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আর তিনজন ভদ্রলোক আসিতেছেন। ইঁহারা প্রবেশ করিতেই সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুকগণ ধূমপান করিলে পর, জগদীশ যথাশাস্ত্র আশীর্ব্বাদ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

পরদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরপক্ষ হইতে গিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। গিরিশবাবু ভাবিতে লাগিলেন—"এতদিনে কতকটা পাকা হইল।'

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

# রবি ও ধরণী

নিশা শেষে—ধরণীর পার্শ্ব হ'তে ধীরে রবি জাগে,
স্নিগ্ধ-নেত্রে প্রিয়া মুখে চায়;
তখনো ভাঙ্গেনি ঘুম,—ধীর স্পর্শ কত অনুরাগে,
বলিবে কি—'প্রেয়সি, বিদায়!'
পর্ণে-পর্ণে,—তৃণে-তৃণে ঝলিছে কি শিশির উজ্জ্বল?
না, না,—ও যে অশ্রু দয়িতার!
মর্ম্মরিছে পত্র একি প্রভাতের সমীরে চঞ্চল?
দীর্ঘশ্বাস এ যে ব্যথিতার!

অতি দূরে, অতি ঊর্দ্ধে দীপ্ত রথে জলিছে তপন,
নিম্নে ধূলি ধূসরিতা ধরা ;
চেয়ে আছে প্রিয়পানে—অনিমেষ, বিশুষ্ক বদন,
বল্লভের বিরহে কাতরা।
স্বর্ণরথে ভ্রমে রবি - অতি দীর্ঘ পথ-পর্য্যটন,
ক্ষোভে দহে ধরণীর বুক ;
কতক্ষণে প্রিয়স্পর্শে শান্ত হবে উদ্বেলিত মন,—
কত দূরে মিলনের সুখ !

দিনান্তে কনককান্তি তপনের লভিয়া চুম্বন
লজ্জা রাগ ফুটে ধরা মুখে ;
দিক্‌চক্রে অপরূপ শোভিল সে রক্তিম বরণ—
দিগন্তের মেঘ-বুকে-বুকে !
স্বর্ণকরে ধরণীর শ্যাম অঙ্গ বেষ্টিয়া আদরে—
নিলা রবি নিজ বক্ষ' পরি ;
অন্ধকার যবনিকা দম্পতির মিলনের পরে
ধীরে ধীরে পড়িল আবরি।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

# শ্রুতি-স্মৃতি

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কমিশনারকে জানাইয়া আমার চিকিৎসার এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করাইয়া লইব বলিয়া আমার অভিভাবকবর্গকে ভয় দেখাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত করিতে হয় নাই। এ যে সময়ের কথা, তখন আমাদের বাড়ীতে সবেমাত্র ডাক্তারি চিকিৎসা প্রবেশ করিয়াছে ; অর্থাৎ আমার এবং আমার ভগিনীপতির জ্বর প্রভৃতি অসুখ হইলে আমরা ডাক্তারি চিকিৎসাই পাইতাম। ততদিনে ডাক্তারি চিকিৎসা যে ম্যালেরিয়া জ্বরের আশুফলপ্রদ চিকিৎসা, এ ধারণা আমাদের দেশে এবং আমাদের

বাড়ীতে অনেকের হইয়াছে। আমার অসুখের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত হইল এবং ডাক্তারের মত হইলে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া হইবে, এরূপ আশ্বাসও আমাকে দেওয়া হইল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না। যে ব্যাধি মনে, দেহের চিকিৎসায় তাহার ফল লাভের আশা দুরাশা, আমি তাহা বুঝিতাম। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় অকৃতকার্য্য হইলেন, তাঁহার আরক, পিল, পাউডারে তিনি রোগ আরোগ্য করিতে পারিলেন না। বায়ুজল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক এ কথা সহসা স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন, তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। সুতরাং কিছুকাল ধরিয়া খুব আড়ম্বরের সহিত আমার চিকিৎসা চলিল। আমার শিরোঘূর্ণনের হেতু যে অনিদ্রা এবং অনিদ্রার হেতু দুশ্চিন্তা তাহা তিনি না বুঝিয়া আমার মাথায় রক্তাধিক্যই যে শিরোরোগের কারণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমার মাথার রক্ত কম করিবার মানসে আমার নাসিকার মধ্যে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। অস্ত্রপ্রয়োগ করা হইল, রক্তস্রাব আরম্ভ হইল, সে রক্ত আর থামে না! পুষ্করিণীর তীরে আমায় লইয়া গিয়া মাথায় জলধারা এবং নাসিকা দ্বারা জল টানানো আরম্ভ হইল, দীঘির কাল জল লাল হইয়া গেল, তবু আমার নাসারন্ধ্রের রক্তস্রাবের নিবৃত্তি নাই! বহু সাধ্যসাধনা চেষ্টার পর দেহের রক্ত যখন কম হইয়া আসিল, দুর্ব্বলতায় যখন মাথা আরও বেশী করিয়া ঘুরিতে লাগিল, তখন রক্ত বন্ধ হইল। আমি নিতান্ত দুর্ব্বলদেহে সেই পুকুর ঘাটেই শুইয়া পড়িলাম। প্রাণ বাঁচিয়া গেল এই পরম লাভের জন্য আমাদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রাঙ্গণে মহা ঘটা করিয়া নাম সংকীর্ত্তন এবং হরিলুট দেওয়া হইল। দিনদেবতা অস্তাচলে গেলেন, আমিও ঘরে আসিয়া শয্যাতলের আশ্রয় লইলাম। প্রচলিত ভাষায় যাহাকে শৈশবে 'নাসা' বলে, সেই ব্যাধি আমার ছিল। মধ্যে মধ্যে বিনা কারণে আমার নাসারন্ধ্র দিয়া প্রচুর রক্ত পড়িত, কালক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 'নাসা' সারিয়া গিয়াছিল, আর রক্তস্রাব হইত না, ডাক্তারবাবু অনুমান করিয়াছিলেন 'নাসা'রোগ সারিয়া যাওয়াই আমার বর্ত্তমান জ্বর ও শিরোঘূর্ণনের কারণ এবং সেই অনুমানের বলে নীরোগ নাসিকায় অস্ত্রপ্রয়োগ করাই অতিরিক্ত রক্তস্রাবের কারণ। গোতম, কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিদিগের মতে অনুমান একটি প্রধান প্রমাণ, কিন্তু অনুমাতার বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে সব সময়ে অনুমানের উপর একান্ত নির্ভর করা যায় না,

এ শিক্ষা অনেক কষ্ট পাইবার পরে সেবারে লাভ করিয়া ছিলাম। কিন্তু এই অভিজ্ঞতায় ডাক্তারবাবুর কোন ফল হইয়াছে কি না এবং অন্যান্য রোগী এই অভিজ্ঞতার কোন ফল পাইয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া আজও বলিতে পারি না। রোগের কোন উপশম হইল না, দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলাম, উপরন্তু চিকিৎসার গোলযোগে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছিলাম। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনে আমার অভিভাবকদিগের মত হইল, এবং সে বৎসর শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মতানুযায়ী এক শুভদিনে এবং শুভলগ্নে আমি তুষারস্নিগ্ধ হিমবৎ শৈলের অধিত্যকাস্থিত দুর্জ্জয়লিঙ্গের স্বাস্থ্য-নিবাসের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। তাহার পূর্ব্বে কখনও ক্ষুদ্র পাহাড়ও চক্ষে দেখি নাই—হিমালয় দর্শন ত দূরের কথা। হিমালয়ের নানাবিধ বর্ণনা ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থে পড়িয়াছি। পূর্ব্বাপর তোয়নিধিতে অবগাহন করিয়া অনন্ত-রত্নের আকর হিমাচল পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ কেমন করিয়া তুষারমণ্ডিত শুভ্র মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিবার জন্য মন আমার নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। নিরানন্দময় কারাগৃহস্বরূপ বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিব, এই আনন্দে আমার জ্বর জ্বালা শিরোঘূর্ণন সমস্তই যেন কম হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বাহ্যতঃ তাহার কোন লক্ষণ দেখাইলাম না। পাছে রোগমুক্ত হইয়াছি দেখিয়া কারামুক্ত না হইতে পারি, এই ভয় আমার মনে ছিল। আজ সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে, কেহ শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে অধিক পরিমাণে দুর্ব্বলতার ভাণ করিতাম।

নির্দ্ধারিত দিবসে মাতৃপদ বন্দনা করিয়া এবং মাতৃআজ্ঞায় গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত জানাইয়া ই, বি, এস রেল-পথের দার্জ্জিলিং মেলে রাত্রি দশটার সময়ে আমি হিমালয়-দর্শনে যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে পঁহুছিয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীখানিতে শয়ন বিছাইয়া লইলাম, গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন আমার অন্তরে সে কি আনন্দ! লৌহবর্ত্মের উপর লৌহচক্রের গতির শব্দ কে বলে শ্রবণে মধুবর্ষণ করে না? সংস্কৃত গ্রন্থে পড়িয়াছি মহর্ষি নারদের বীণা হইতে সমুত্থিত মধুর ঝঙ্কার না কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়াছে। পড়িয়াছি দেবসভায় মনোহর যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত নারায়ণের চরণ কমল হইতে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর সৃজন করিয়াছিল। শুনিয়াছি করস্থিত কঙ্কণ-ঝঙ্কার এবং

চরণাশ্রিত নূপুর-সিঞ্জনের তালে তালে সৌভাগ্যবানের হৃদয়-স্পন্দন না কি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকে। কিন্তু আমার কর্ণে সে রাত্রির মেল-গাড়ীর লৌহচক্রের ধ্বনি অপ্সরা-কণ্ঠোত্থিত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় সঙ্গীতধ্বনি অপেক্ষা কত অধিক মিষ্ট যে লাগিয়াছিল তাহা আমিই জানি। দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে সে রজনীর দণ্ডপল মুহূর্ত্তগুলি যেন নৃত্যলীলায় অতিবাহিত হইতেছিল। শশীতারকাসমন্বিত নির্ম্মল শারদাকাশ যে এত শোভাময়, তাহা সেই দিন বুঝিয়াছিলাম। শারদীয় নৈশবায়ু যে রোগ আরোগ্য করিবার স্বর্ণ-রসায়ণ তাহা সেই রাত্রিতে আমার প্রথম উপলব্ধি হইল। অপূর্ব্ব পুলকে আমার দেহমন পরিপূর্ণ হইয়া গেল; হিমালয়-দর্শন লালসায় রাণী মেনকা যদি কোন দিন অভিসারে যাত্রা করিয়া থাকেন, তবে তিনিও বোধ হয় আমার মত আনন্দ পান নাই।

শৈলাধিরাজের পাদমূলস্থিত শিলিগুড়ি ষ্টেশন হইতে পার্ব্বত্য লাইনের ছোট গাড়ী যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ক[illegible] পর্ব্বত আরোহণ করিব, এই ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া উঠিলাম। কিছুদূর সমতল ভূমিতেই গাড়ী দৌড়িয়া চলিল। তাহার পর শুকনা ষ্টেশন ছাড়াইয়া যখন ক্রমে গাড়ী ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তখন হইতে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের শোভা যে কি অপূর্ব্ব, তাহা যাঁহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। লৌহবর্ত্মের উভয় পার্শ্বস্থিত বিস্তীর্ণ বনভূমির সুস্নিগ্ধ শ্যামশোভা যে কি মনোহর, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার নহে, সে অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইবার মত মন যাহাকে বিধাতা দিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন। প্রতি মুহূর্ত্তে যখন রেলগাড়ী ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে থাকে, চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে বক্রবিসর্পিত পথে সমস্ত ট্রেণটা যখন পর্ব্বতারোহণ করিতে থাকে, তখন ইংরাজের রেলপথ নির্ম্মাণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন, এমন লোক ত আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত যে পথ অতিক্রম করিতে হয় কারসিয়ং নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রায় তাহার অর্দ্ধ । এই স্থান প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উচ্চ। দার্জ্জিলিঙের কটিবন্ধ স্বরূপ এই কারসিয়ঙে দাঁড়াইয়া বঙ্গদেশের সমতলক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতশীর্ষে দাঁড়াইয়া নদীমেখলা, হরিদঞ্চলা, স্থির-যৌবনা-চিরশ্যামা বঙ্গভূমিকে দেখিয়াছে, তাহার নয়ন সার্থক। পূর্ব্বে মানচিত্রে ছাড়া কখনও পর্ব্বত দেখি নাই। জীবনে এই প্রথম দেখিলাম,দেখিয়া কি আনন্দই পাইয়াছিলাম তাহা

আমিই জানি। নিরানন্দময় গৃহের কারা প্রাচীরের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কর্ম্মহীন জীবন এবং জড়িত দেহ বহন করিবার ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করাই আমার পক্ষে পরমানন্দকর। তাহার উপর বিশ্বপ্রকৃতির এই সুমহান্ সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার তরুণ মন আনন্দের অরুণাভায় মণ্ডিত হইয়া গেল। শৈশব হইতে সে দিন পর্য্যন্ত এমন দিন আমার জীবনে আর আসে নাই। গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দেহ যেমন মুক্তি পাইয়াছিল, দিক্‌চক্রবালস্পর্শী সুউচ্চ শৈল শ্রেণীর অনন্ত প্রসার আমার মনে আনন্দের আভাস আনিয়া দিয়া মনকেও যেন তেমনি করিয়াই মুক্ত করিয়া দিল। রৌদ্রোদ্ভাসিত তুষার-রাশি হিমালয়ের মস্তকে যেমন হীরকমণ্ডিত হৈমমুকুটের শোভা সম্পাদন করে, প্রকৃতির সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যসম্পদ আমার মনের মধ্যেও তেমনি হীরকজড়িত সুবর্ণের দীপ্তিই বিকাশ করিত। সুন্দর এবং সুমহানের এমন একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই।

যখন গৃহ হইতে [illegible] হইয়াছিলাম, তখন শারদীয়া পূজার অল্প সময় মাত্র বাকি ছিল। স্কুল কলেজে পড়িবার সময়ে পূজার অবকাশে বাড়ী আসিবার দিন যখন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিত তখন কি অপূর্ব্ব আনন্দচাঞ্চল্যে দেহ মন ভরিয়া উঠিত, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পাওয়া কঠিন। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার সম্ভাবিত দিনের জন্য কি বিপুল আগ্রহে, কি উগ্র উৎকণ্ঠার সহিতই যে প্রতীক্ষা করিতাম, তাহা আর কি বলিব? একান্ত প্রণয়মুগ্ধজনেও বোধ করি তাহার বিরহান্ত-দিনের জন্য, পুনর্মিলনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য এমন আবেগময় আগ্রহে প্রতীক্ষা করে না, এমন করিয়া দিনে লক্ষবার করিয়া দিন গণিয়া গণিয়া অঙ্গুলির পর্ব্বগুলি ক্ষয় করিতে পারে না! এ আগ্রহ কিসের জন্য? পাঠ্যপুস্তকগুলি হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইতে পারিব; অমূল্য মাতৃস্নেহের বেষ্টনের মধ্যে স্বজনগণ পরিবৃত হইয়া কিছুদিন সুখে দিন যাইবে, শুধু কি সেই আশার আনন্দে মন এমন করিয়া ভরিয়া উঠিত? তাহা নহে। জানি না শরৎ ঋতুর মধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয়তা রহিয়াছে, স্বচ্ছ নীল আকাশ-গঙ্গায় শুক্লা-রজনীর খণ্ডচাঁদের সোণার নৌকা ভাসাইয়া কে প্রতিদিন খেয়া বাহিয়া অস্তশিখরীর পরপারে কোথায় যায়, জানি না। মানবের মনও সেই সঙ্গে কোন্ অজ্ঞাত নদীকূলের কোন্ অজানা সমুদ্রের প্রবাল-বেলার, কোন্ সোণার বন্দরের রত্নহাটের জন্য কেমন করিয়া আকুল হইয়া ওঠে, তাহা বলিতে কি পারি? প্রৌঢ়ের পরিপূর্ণ লাবণ্যময়ী, শিশিরস্নাতা, নবীনারুণহাস্য-সমন্বিতা

ধরিত্রীর অঞ্চল নির্ম্মুক্ত শেফালির গন্ধ আজ এই দুঃখ দুর্দ্দিনের ঘনায়মান সান্ধ্য-অন্ধকারেও আমার মনপ্রাণ কেমন করিয়া মোহিত করিতে [illegible], তাহা বলিবার সাধ্য আমার কি আছে? এই পরিণত প্রৌঢ়ে, বিগতপ্রায় বাসরে আমার পরিশুষ্ক জীর্ণ মন অপহরণের জন্য যে শারদ-লক্ষ্মীর আজও চেষ্টার অন্ত নাই, আমার কৈশোরে বা যৌবনে আমার উপর তাঁহার কি অখণ্ড ও অব্যাহত প্রভাব ছিল, তাহার অনুমান বোধ করি সুকঠিন নহে। আমি এমন শারদাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া যে হিমশৈল সন্দর্শনে গেলাম, তাহা হইতেই অনুমান হইবে সেদিনের কণ্টকশয়ন আমার পক্ষে কি দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমালয়ের পাদমূল হইতে যখন যাত্রা করি, তখন পঞ্জিকার মতে শরৎঋতু হইলেও গ্রীষ্মতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইতেছিল। অনুমান দেড় দুই ঘণ্টার মধ্যে যে সকল স্থান দিয়া রেলগাড়ী চলিতেছিল সে সকল স্থানে তখন আমাদের সমতল বঙ্গভূমির পৌষ মাঘ মাসের শীত অপেক্ষাও অনেক অধিক শীত বলিয়া আমার অনুমান হইতে লাগিল। এত অল্প সময় [illegible] ঋতুর এমন পরিবর্ত্তন আর কোন উপায়ে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; যদি তা[illegible] সম্ভব হইত, যদি ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড, পল, মাস, সম্বৎসর প্রভৃতিও এমনি-ই দ্রুত অতিবাহিত হইতে পারিত, তাহা হইলে এ সংসারের অনেক দুঃখী কত দুঃসহ বেদনার হাত হইতে অনেক আগেই নিস্তার পাইয়া যাইত; হয় ত বা অনেক দুঃখ ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহাদের ব্যর্থ অপেক্ষাও ব্যর্থ জীবনলীলার অবসান ঘটিতে পারিত।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত রেলপথে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে। রেলগাড়ী সব ষ্টেশনেই একবার করিয়া দাঁড়ায়, অনেক যাত্রী ওঠে নামে, স্নান পান আহার সারিয়া লয়। এঞ্জিনগাড়ীও প্রাণ ভরিয়া তাহার অগ্নিগর্ভ তৃষা নিবারণার্থ অনেক স্থানে জলপান করে। এইরূপ করিতে করিতে সেকালে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙের শৈলনিবাসে গিয়া রেলগাড়ী পঁহুছিত। দার্জ্জিলিঙের পূর্ব্বের ষ্টেশনের নাম ঘুম। কেন এই নাম তাহা জানি না—রেলপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যায় বলিয়া ইহা ঘুম, কিংবা পরাশরসৃষ্ট কুজ্ঝটিকা গঙ্গাবক্ষ ত্যাগ করিয়া আজ কালবশে হিমালয়-বক্ষের এই ঘুম ষ্টেশনে তাহার বাস্তভিটা স্থাপন করিয়াছে এবং দিনযামিনী-নির্ব্বিশেষে তুহিনাবরণা, অসূর্য্যম্পশ্যা এই ক্ষুদ্র পল্লীখানি চিরসন্ধ্যাকে তাহার বক্ষে চির আদরের স্থান দিয়াছে বলিয়া ইহার নাম ঘুম, তাহা বলিতে পারিলাম না। এই স্থানে এক প্রাচীনা ভুটিয়ানী বাস করিত, তাহার নাম 'ঘুমবুড়ী।' হিমালয় যে দিন সমুদ্রস্নান করিয়া ধরাধারণ

করিবার জন্য তাহার উন্নত মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়াছিল, প্রায় সেই সময়েই এই বৃদ্ধার বোধ করি জন্ম হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির প্রায় সমবয়স্কা এই নারী পুরাকালের কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট লগ্নে, কোন্ ভুটিয়ার কুটীর আলো করিবার জন্য জন্মলাভ করিয়াছিল, কোন্ পিতার উটজ প্রাঙ্গণ তাহার শৈশবহাস্যে মুখরিত হইত, আগতপ্রায়যৌবনা অন্তরুল্লসিতা এই কিশোরী কোন্ ভুটিয়া কিশোরের হৃদয়তটে কবে রূপতরঙ্গের আঘাত করিয়া তাহার চক্ষে বিশ্বসৃষ্টিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল, কোন্ শিশুকে জন্ম দিয়া কাহার ঘরে তাহার মাতৃত্বের বিকাশ হইয়াছিল, কবে কোন্ জীবনসহচরকে জন্মের মত বিদায় দিয়া জীবনভরা দুঃসহ দুঃখকে বক্ষে ধরিয়া [illegible]ছিল, তাহা আমরা জানি না। আমরা তাহাকে ভিক্ষাটনে ব্যস্ত বৃদ্ধাই দেখিয়াছি। এই দার্জ্জিলিঙে বহুবার গিয়াছি। প্রতিবারই গাড়ী পৌছিবার নির্দ্ধারিত সময়ে ভিক্ষা[illegible]ণের জন্য দক্ষিণ কর প্রসারণ করিয়া এই বৃদ্ধাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। একবার দেখিলাম বৃদ্ধা নাই। তাহা[illegible]র্ত্তে আড়ম্বরবিহীন মূক শুভ্রসমাধি, ঘুমবুড়ী যে অনন্ত ঘুমের মধ্যে ভূশয়নে নিলীন হইয়া [illegible]ছে, সেই সংবাদ শতকণ্ঠে প্রচার করিতেছে। জরামরণবিহীন হিমালয়কে দেখিয়া পাছে মানুষ জরামরণকে বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই জন্যই কি অপূর্ব্ব কৌশলে বিশ্বস্রষ্টা এই জরাপীড়িতা অতিবৃদ্ধাকে লোকলোচনের সমক্ষে বহুকাল রাখিয়া দিয়াছিলেন? কে জানে?

দিননায়ক যখন অস্তশিখরীর অন্তরালে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে গিয়া দার্জ্জিলিং পৌছিলাম। লাউইস জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাসে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে স্থানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং ষ্টুয়ার্ড ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরাগুলির দিকে চলিলাম এবং তাঁহাদের সাহায্যে আমার জিনিষপত্র গুছাইয়া কামরাগুলির মধ্যে আমার নিঃসঙ্গ-সংসার পাতিয়া নিলাম।

স্বাস্থ্যনিবাসটি অপেক্ষাকৃত নীচুস্থানে। আমার কক্ষের বারান্দায় বসিয়া [illegible]খের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, হিমগিরি তাহার সুমহান সৌন্দর্য্যসম্ভার মাথায় লইয়া স্তরে স্তরে তাহার অনন্ত প্রসার বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যতদূর চক্ষু যায়, শ্যামস্নিগ্ধ বনভূমির অপরূপ রূপ নয়নমনের কি তৃপ্তিই যে বিধান করে, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? সুপরিপুষ্ট অতুচ্চ দেওদারকানন বল্লরীর কোমলবাহু বক্ষে কণ্ঠে জড়াইয়া অহঙ্কারে তাহার গর্ব্বোদ্ধত মস্তক গগনভেদ করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে—শক্তি ও সুষমার কি অপূর্ব্ব

সম্মিলন তাহার মধ্যে যে দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। তরুণ মনে সে দিন যাহা বলিয়াছিল, আজ সে কথা কেমন করিয়া শুনাই? সে দিন কি আর আছে? গিরিনির্ঝরের কলগীতি সে দিন আমার কাণে অপ্সরাকণ্ঠের স্বরলহরী অপেক্ষা মধুর শুনাইয়াছিল। গৃহ-সংলগ্ন উপবনের বৃক্ষলতার অন্তরাল হইতে গৃহস্থিত উজ্জল দীপালোক লক্ষকোটি নক্ষত্রের মত জ্বলিতে দেখিয়া স্বর্গের তারাকেও তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। বিশ্বরাণী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আমার নয়নমন ভরিয়া উঠিয়াছে কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ভাগ করিয়া ভোগ করিবার মত সঙ্গী আমার কেহ ছিল না, তাই উপভোগের পূর্ণ আস্বাদ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। [illegible] এবং প্রকৃতির সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব শোভাময়ী এই শৈলনগরী দেখিয়া মোগল [illegible]শাহ-বিরচিত শ্লোক আমার বারংবার মনে আসিয়াছে

"আগর্ ফিরদোস্ বর্রুয়ে জমীনস্ত
হামিনস্তো হামিনস্তো হা[illegible]
স্বর্গ যদি এ[illegible]ধরায় থাকে কোন স্থানে,
এখানে, এখানে, শুধু রয়েছে এখানে।

রূপ দেখিয়া রোগ সারিল কি দার্জ্জিলিঙের জলবায়ুর ব্যাধি আরোগ্য করিবার শক্তি আছে, জানি না; আমার রোগ কিন্তু সারিয়া গেল। প্রায় পক্ষাধিক-কাল সেখানে ছিলাম। অ[illegible]ণে শৈলনিবাসের নিকটবর্ত্তী নানা স্থান দেখিয়া বেড়াইতাম। চন্দ্রিকাস্নাত শারদযামিনীর চন্দ্রকরোদ্ভাসিত কাঞ্চন-শৃঙ্গ দেখিলাম। সন্নিকটবর্ত্তী সুউচ্চ শৈলশৃঙ্গ টাইগার-হিলে দাঁড়াইয়া অরুণ-সারথি-পরিচালিত চক্রবন্ধুর আলোকরথের পূর্ব্বদ্বারে প্রথম সমাগম দেখিলাম। রঙ্গীত তরঙ্গিণীর লাস্যলীলা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া সেবারের মত দার্জ্জিলিং-শৈলকে সম্ভাষণ জানাইয়া পূজার দিনে কামাখ্যা দর্শন করিতে কামরূপ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যে পুরম[illegible], বিবেকী মহেশ্বরকে বিরহ-ব্যথায় তাণ্ডব করাইয়াছিল, যে প্রেমাস্পদার শবদেহের খণ্ডৈক মাত্র স্পর্শে ধূলার ধরণী পবিত্র হইয়া গিয়াছে, সেই মহাপীঠে মহামায়াকে দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইল। তাই তাঁহার জন্মান্তরের পিতৃভবন হইতে সেবারের মত বিদায় লইলাম। পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া আসামের গাড়ীতে চড়িলাম। প্রভাতে ত্রিস্রোতা পার হইয়া যাত্রাপুর, যাত্রাপুর হইতে ধরলা পার হইয়া ধুবড়ী গিয়া বড় ষ্টীমার ধরিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষ্টীমার ছাড়িল।

আমি আমার ক্যাবিনে আশ্রয় নিলাম। রাত্রি তখন কত জানি না, এক সময়ে উন্নিদ্র অবস্থায় মনে হইল ষ্টীমার চলিতেছে না, যেন একস্থান থাকিয়া ক্রমাগত ঘূর্ণীবায়ুর বেগে ঘুরিতেছে। ক্যাবিনের দ্বার খুলিবামাত্র বৃষ্টিধারা এবং নদীতরঙ্গ দুইই আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার যাহা কিছু জিনিষ পত্র ছিল, সব ভিজাইয়া দিল। আমার দেহও অসিক্ত রহিল না।

বাহির হইয়া দেখি সমস্ত আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, দিক্ প্রান্ত হইতে বিদ্যুৎস্ফুরণে চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে, রবে কাণ বধিরপ্রায়, বৃষ্টির ধারা এবং পবনদেবের মধ্যে কে বড় বলিয়া ঘোর তর্ক বাঁধিয়া গিয়াছে এবং মজ্জমান তরণীর আরোহী যাত্রীর দল [illegible] মৃত্যুর ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া কম্পান্বিত কলেবরে এক নিঃশ্বাসে [illegible]নাম এবং আত্মীয়স্বজনের নাম করিয়া বিপন্মুক্ত হইবার প্রার্থনা এবং বিলাপ দুই-ই করিতেছে। [illegible]ষ্ঠে কাপ্তেন যেখানে দাঁড়াইয়া, সেইখানে গেলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার আশঙ্কা কতদূর পর্য্যন্ত যাইতেছে [illegible], দুইটি শিকল ছিঁড়িয়াছে আর দুইটি যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে জলান্তর্মজ্জিত শৈলে আ[illegible]ইয়া নৌকাডুবির সম্ভাবনা নাই, এমন কথা বলিয়া সে আমায় বৃথা আশ্বাস দিতে চাহে না। সত্য কথা বলিতেছি আমার বিন্দুমাত্রও মৃত্যুভয় হয় নাই, বিরহী বিরূপাক্ষের বিপ্রয়োগে তাণ্ডবনৃত্যের কথাই আমার অন্তরে কয়দিন [illegible] জাগিতেছিল। এই ঝড়ের মধ্যে জলস্থল অন্তরীক্ষচারিণী পরমা [illegible]কে স্কন্ধে করিয়া মহাকালের সেই তাণ্ডবের আভাস নূতন করিয়া যেন পাইতেছি; এই ভাবিয়া নিজকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করি[illegible]।—মৃত্যু অপেক্ষা জীবনই যে সব সময়ে বাঞ্ছনীয়, তাহা সে দিনও মনে করি নাই, আজও মনে করিবার কোন কারণ পাইতেছি না।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

শেষ আয়োজন সাঙ্গ যখন,
বিদায় নিয়েছি ধরণীতে—
চরণ বাড়াব বৈতরণীর তরণীতে ;
তখন তোমার সময় হ'ল কি,
হ'ল অবকাশ অবশেষে ?
সব বন্ধন ছিঁড়েছে যখন—

রবিশশীহীন আকাশেতে ক্ষীণ
পোঁহাতি তারার আলো জ্বলে—
তারি আভাখানি মূরছি কাঁপিছে কালো জলে ;
অজানা নূতন শীত-শিহরণ —
বুকে এসে লাগে খোলা হাওয়া ;
বৃথা অভিসার আজিকে তোমার—
'এখন কি যায় ফিরে' যাওয়া ?

ক্ষতি ক্ষোভ যত এবা[illegible]
রয়ে [illegible] এ কি[illegible]
বুকে করে' করে' ফিরি[illegible] যারে দিনেরাতে !
ছু[illegible]লে আর ফিরে কি বন্দী,
বন্ধু তাহারে ডাক' মিছে
বুকের পাঁজরে আজও ব্যথা ক[illegible]
আর কি[illegible]তে পারি পিছে ?

কত কাঁদাহাসা কত যাওয়া আসা,
ঘা[illegible] ঘাটে আনাগোনা—
হৃদয়-হাটের বেচাকেনা কত জানাশোনা
সব সঁপিয়াছি ঐ কালো জলে
আর কি ফিরা'তে পারি তারে
ওপারের আলো নয়ন ভুলালো—
এখনও চাহিব চারিধারে ?

বন্ধু আমার, নিশীথ-আঁধার
ঘনায় তোমার কালো কেশে—
আঁখিতারা দুটি জ্বলিছে তাহারি তলদেশে !
মাঝে-মাঝে তাই ভুল হয়ে যায়,
এপারে ওপারে মেশামেশি ;
কোথা ধ্রুবতারা কোথা বা কিনারা—
জীবন হ'ল যে শেষাশেষি !

ছিল একদিন চাহিলে যেদিন
নয়ন ভুলিত সব চাওয়া,
নিমেষে যেদিন পরাণ পাইত সব পাওয়া !
সব সমীরণ দখিণ পবন
নন্দন হ'ত ধরণী যে !
আজ আর তবে চাহিয়া কি হবে—
সেদিন স্মরণ করনি যে !

রাত্রি ঘ[illegible] যাত্রীরা যায়,
[illegible]ক ঐ কানে আসে—
[illegible]র অভাগ্য ! এ সময়ে কেউ ভালবাসে !
তরী উঠে দুলে' রশি যায় খুলে' !
ঊর্ম্মিরা করে কানাকানি—
পবনে সাগরে গগনে
এখনি [illegible] জানাজানি !

আর দেরী নাই—যাই তবে যাই,
ক্ষমা কর' প্রিয় ক্ষমা কর'—
বিদায়ের [illegible]নের মধু মুখে ধর' ;
বয়ে যায় ক্ষণ—এখনও নয়ন
ফিরাও করুণ ব্যথামাখা—
খাঁচার পাখীরে ছেড়ে দিয়ে ফিরে'
কেন আর তারে ধরে' রাখা ?

দুলে' উঠে [illegible] ঘুরে যায় হাল,
গরজে ঊর্ম্মি—হাওয়া হাঁকে—
হায়রে অবোধ, এ সময়ে কেউ ধরে' রাখে ?
বিদায় বিদায় ! ফিরে' দেখি হায় !
তরণী কোথায় নদীকূলে—
হায়রে কপাল ! ইহপরকাল
গেল জীবনের একই ভুলে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

# গ্রন্থ সমালোচনা

নির্ম্মাল্য। গল্পগ্রন্থ, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত, চুঁচুড়া, "ভূদেবভবন" হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৩১৯। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৬১ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ॥৵০

এখানি লেখিকা মহাশয়া[illegible] প্রথম-প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"ইহার দুই চারিটি গল্প ইং[illegible] গল্পের ভাব লইয়া রচিত, অপরগুলি মৌলিক।"—কেবলমাত্র এ ভাবে ঋণ স্বীকার করিলে যথেষ্ট হয় না। কোন্ ইংরাজি লেখকের কোন গল্পটির ভাব লওয়া হইয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা উচিত[illegible] পড়ে দুষ্কর্ম্মা নষ্টাচার্য্য এই শ্রেণীর লেখাকেই "অর্দ্ধচৌরিক" আখ্যা দিয়াছি[illegible] বলিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, ঋণস্বীকারও নহে—সেই[illegible] এক[illegible] ইঙ্গিত[illegible]

যাহা হউক, "নির্ম্মাল্যে[illegible]শিত মৌলিক গ[illegible]লিই [illegible] সমধিক আদরের সহিত পাঠ করিয়াছি—এবং পাঠ[illegible] আনন্দিত হইয়াছি। গল্পগুলির মধ্যে কুত্রাপি "ন্যাকামী" নাই—নূতন লেখকের পক্ষে এটা অল্প প্রশংসার কথা নহে।

রচনাটি বেশ ঝর্‌ঝরে তর্‌তরে—অন[illegible] আড়ম্বর [illegible]ল্প কথায় নিজ বক্তব্য লেখিকা পরিস্ফুট করিয়া তুলি[illegible]ন। তবে কোনও কোনও গল্পে নাটকীয় কৌশলের একটু যেন অভাব লক্ষিত হয়। কোনও কোনওটিতে [illegible] অকিঞ্চিৎকর হওয়াতে গল্পটি জমে নাই। আরম্ভের দিকে দুই একটি গল্পে, পূর্ব্বগামী বাঙ্গালা গল্পলেখকগণের ছায়াপাত বড় স্পষ্ট—প্রায় অ[illegible]ত দাঁড়াইয়াছে তথাপি "নির্ম্মাল্য" পড়িলে মনে হয় লেখিকার ক্ষমতা আছে, [illegible]মে এই দোষগুলি অদৃশ্য হইবে; গুণের অংশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। সর্ব্বসমেত দশটি গল্প এ গ্র[illegible]স্থান পাইয়াছে—অধিকাংশই সুপাঠ্য। তথাপি, "ভাল হত আরও ভাল হলে।"

[illegible]তকী। গল্পগ্রন্থ, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। কলিকাতা "[illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, চুঁচুড়া "ভূদেবভবন" হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৩২২। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৯০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে[illegible]ই, [illegible] ১[illegible]

এ গ্রন্থে সর্ব্বসুদ্ধ ১০টি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকা[illegible] লেখিকা মহাশয়া বলিয়াছেন যে কয়েকটি গল্প ইংরাজি গল্পের ছায়াব[illegible]

"কেতকী"র [illegible]গুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, "নির্ম্মাল্য"[illegible]কাশের পর লেখিকা মহাশয়া অনেকাংশে উন্নতিলাভ করিয়াছেন। কোনও মৌলিক গল্পে, পূর্ব্বগামী লেখকগণের ছায়াপাত আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গল্প বলিবার কৌশলটিও তিনি বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে নির্মল হাস্যরসের আভাও চমকিয়া উঠিতেছে। "জ্যোতিঃহারা," "বহ্বারম্ভ", "জন্মতিথি" এবং "অপয়া"; এই চারিটি গল্প বাস্তবিকই উপভোগযোগ্য। ইহার মধ্যে "অপয়া" গল্পটিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। সেই কালো মেয়েটির দুর্ভাগ্যের যে চিত্রটি লেখিকা মহাশয়া আমাদের